আমার ছেলেবেলা

অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলকাতা • বোম্বে • দিল্লী • হায়দ্রাবাদ

প্রকাশক :
রাজীব নিয়োগী
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩

প্রথম সংস্করণ :
পৌষ ১৩৬২
জানুয়ারি ১৯৫৫

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শিবব্রত রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীশিবনাথ পাল
প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৪

আমার পুত্রের উদ্দেশে

এক

ছোট ঘুপ্‌সি ঘর। জানলার ঠিক নিচেই মেঝের উপরে আগাগোড়া সাদা পোশাক পরিয়ে আমার বাবাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। অস্বাভাবিক লম্বা দেখাচ্ছে তাঁকে। খোলা পায়ের পাতা, পায়ের আঙ্গুলগুলো অদ্ভুত রকমের ফাঁক-ফাঁক হয়ে রয়েছে। বুকের উপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখা দুটি নিশ্চল শান্ত হাত — কিন্তু এই কোমল হাতের আঙ্গুলগুলো পায়ের আঙ্গুলের মতই বিকৃত। হাসি-হাসি চোখদুটো ঢেকে দেওয়া হয়েছে দুটি গাঢ় রঙের তামার মুদ্রার চাকতি দিয়ে। দরদভরা মুখখানা হয়ে উঠেছে সীসের মত বিবর্ণ। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুসংবদ্ধ দাঁতের আভাস। আর সেদিকে তাকিয়ে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি।

বাবার পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে আছে আমার মা, পরনে একটা লালরঙের স্কার্ট। বসে বসে কালো একটা চিরুনি দিয়ে বাবার নরম চুলগুলো আঁচড়ে দিচ্ছে: এই কালো চিরুনিটাই আমার হাতে তরমুজের খোসা কাটবার করাত হয়েছিল। মা বসে আছে আর ভাঙা গম্ভীর গলায় বিড়বিড় করে বলছে কি যেন। আর চোখদুটো ফুলো ফুলো, কান্নায় গলে পড়ছে মনে হয়।

আমার একটা হাত ধরে আছেন দিদিমা। দিদিমার চেহারাটা গোলগাল, মস্ত মাথা, প্রকাণ্ড চোখ, মজার থ্যাবড়া নাক। তাঁর সর্বাঙ্গ কোমল, হাবভাব গম্ভীর — কী যেন এক যাদু তাঁকে ঘিরে আছে। তিনিও কাঁদছেন, কিন্তু অদ্ভুত তাঁর কান্না — আমার মা'র কান্নার সঙ্গে সেই কান্না চমৎকার পোঁ ধরেছে যেন। তিনি কাঁপছেন আর অনবরত আমাকে ঠেলছেন বাবার দিকে। কিন্তু আমি তাঁকে আকড়ে ধরে আছি, তাঁর স্কার্টের পিছনে লুকোচ্ছি। আমার ভয় হচ্ছে, আমি অস্বস্তি বোধ করছি।

ইতিপূর্বে আর কোনো দিন আমি বড়দের কাঁদতে দেখিনি। দিদিমা আমাকে অনবরত বলে চলেছেন, 'যাও বাছা, বাবাকে একবার দেখে এসো, আর এই তো শেষ দেখা! সময় না হতেই তোমার বাবা মারা গেছে...' কিন্তু দিদিমার এই কথাগুলোর অর্থও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি নিজে সবেমাত্র খুব শক্ত একটা অসুখ থেকে উঠেছি। স্পষ্ট মনে আছে, অসুখের সময় বাবা আমার কাছে আসতেন এবং নানারকম খেলার ভিতর দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। তারপর হঠাৎ তাঁর আসা বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই জায়গায় আসতে লাগলেন এই বিচিত্র স্ত্রীলোকটি, আমার দিদিমা।

দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'দিদিমা, কোথা থেকে হেঁটে এলে তুমি?'

দিদিমা জবাব দিলেন, 'আমি আসছি সেই উঁচু দেশ, নিজ্‌নি* থেকে। হেঁটে আসিনি, জাহাজে চেপে এসেছি। আরে ওঁচা, জলের উপর দিয়ে কি হাঁটা যায়?'

কথাগুলো আমার কাছে ভারি এলোমেলো মনে হয়েছিল। আমাদের বাড়ির উঁচুতলায় থাকে একদল দাড়িওয়ালা পারসী। পরনে তাদের নানা রঙের জামাকাপড় আর নিচুতলার কুঠরিতে থাকে হলুদরঙা বুড়ো কালমিক, ভেড়ার চামড়ার কারবারি। ওপর থেকে নিচে আসতে হলে রেলিংএর পিছনে গা বেয়ে বেয়ে নামা যায়, কিংবা পা হড়কে গেলে ডিগবাজি খেতে খেতে। এসব কথা আমি খুব ভালো করে জানি। এই তো সোজা কথা, কিন্তু এখানে আবার জল আসে কোত্থেকে? বুড়ী ঠিক কথা বলেননি, আগাগোড়া একেবারেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন।

'তুমি আমাকে ওঁচা ছেলে বললে কেন?'

হাসতে হাসতে তিনি জবাব দিলেন, 'কারণ তুই যে বড় চেঁচাস।'

তাঁর কথা বলার ধরণটা ভারি মিষ্টি, ভারি সরস, কথাগুলো যেন খুশিতে ভরা। সেই প্রথম দিন থেকেই আমাদের দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এই ঘরের মধ্যে আমার আর ভালো লাগছে না। দিদিমা যদি আমার হাত ধরে আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যান তাহলে বেঁচে যাই।

মা'র অবস্থা দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। মা'র এই কান্না আর আর্ত চিৎকার আমার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। মা'র এমন অবস্থা আমি আর কোনো দিন দেখিনি। এমনিতে মা খুব কড়া মেজাজের লোক, বাড়তি কথা বলে না। ফিটফাট পরিষ্কার ও মাদীঘোড়ার

* 'নিজ্‌নি' হচ্ছে নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদের সংক্ষিপ্ত নাম, এই শব্দের বাংলা অর্থ নিম্নদেশ। — সম্পাঃ

মত মস্ত। শরীরের বাঁধুনি আছে এবং হাত দুটি দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। কিন্তু এখন আমার মা বিশ্রীরকম ফুলে উঠেছে, কেমন যেন এলোমেলো। পরনে ছেঁড়া জামা, আলুলায়িত চুল। এমনিতে আমার মা'র ফিকে চুলগুলো মাথার উপরে ভারি সুন্দর মনোরম ভঙ্গিতে চুড়ো করে বাঁধা থাকে, কিন্তু এখন সেই চুল অনাবৃত কাঁধ আর চোখের উপর দিয়ে খসে পড়েছে; আমার বাবার ঘুমন্ত মুখের উপরে দুলছে চুলের একটা গুচ্ছ। বেশ কিছুক্ষণ হল আমি এই ঘরের মধ্যে আছি কিন্তু আমার মা একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পায়নি — সারাক্ষণ শুধুই আর্তনাদ করে কেঁদেছে আর বাবার মাথার চুল আঁচড়ে দিয়েছে।

একজন পুলিস ও জনকয়েক কালো রঙের চাষী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বিরক্তির সঙ্গে পুলিসটি বলল, 'নাও, হয়েছে।'

জানলায় একটা কাল রঙের পর্দা টাঙানো হয়েছিল, দমকা বাতাসে পর্দাটা নৌকোর পালের মত ফুলে উঠেছে। মনে আছে, বাবার সঙ্গে একবার আমি একটা পালতোলা নৌকোয় চেপে বেড়াতে গিয়েছিলাম আর হঠাৎ মেঘ-গর্জন শোনা গিয়েছিল। বাবা আমাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'বোকা ছেলে, ভয় পাবার কী আছে, ও কিচ্ছু নয়!'

হঠাৎ মা'র শরীরটা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল; চিত হয়ে মেঝেয় আছড়ে পড়ল; তার চুলগুলো লুটোপুটি খাচ্ছে, ফ্যাকাশে মুখটা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি অন্ধ। তার দাঁত কপাটি লেগেছে — ঠিক বাবার দাঁতের মতো।

যন্ত্রণাকাতর বিকৃত স্বরে মা বলল, 'দরজা বন্ধ করে দাও — আলেক্সেই'কে বাইরে যেতে বলো!'

দরজার দিকে ছুটে এগিয়ে যেতে যেতে দিদিমা আমাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। চিৎকার করে বললেন:

'ভয় পেয়ো না, ভালো মানুষের ছেলেরা! যিশু খৃস্টের দোহাই, তোমরা এখান থেকে চলে যাও, ওকে ছুঁয়ো না। ওর কলেরা টলেরা কিছু হয়নি, গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়েছে। দয়া করো, বাবারা!'

অন্ধকার কোণের দিকে একটা ট্রাঙ্কের পিছনে আমি গা-ঢাকা দিয়েছিলাম। সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার মা যন্ত্রণায় মেঝের উপর গড়াগড়ি

দিতে দিতে গোঙাচ্ছে আর দাঁতে দাঁত চেপে ধরছে। এদিকে দিদিমা মা'র চার দিকে হামা দেন, কোমল ও সানন্দস্বরে বলেন:

'জগৎপিতা ও তাঁর সন্তানের নামে বলছি! আরেকটু সহ্য করতে চেষ্টা করো, ভারিয়া*! হে পরমকরুণাময়ী জগৎমাতা, হে সর্বজীবরক্ষিকা...'

আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম। আমার বাবাকে যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে তারই চারপাশে মেঝের ওপরে ওঁরা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছেন, গোঙানি আর চিৎকার করছেন; মাঝে মাঝে বাবার গা স্পর্শ করেছেন, কিন্তু বাবা স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছেন, মনে হচ্ছে ওঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছেন যেন। অনেকক্ষণ ধরে চলে এই ব্যাপার। আমার মা কয়েকবার দু-পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু প্রত্যেকবারেই টলে পড়ে যায়। প্রকাণ্ড একটা কালো বলের মতো দিদিমা বারকয়েক ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি করেন এবং তারপর এক সময়ে হঠাৎ অন্ধকার থেকে শিশুর কান্না শোনা যায়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দিদিমা বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ছেলে হয়েছে গো!'

দিদিমা একটা মোমবাতি জ্বাললেন।

আমি বোধ হয় ঘরের সেই কোণেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কারণ আর কিছু আমার মনে নেই।

তারপরেই আমার স্মৃতিতে যে-ঘটনা অম্লান হয়ে আছে তা হচ্ছে এই: বর্ষার দিন, সমাধিস্থানের এক জনবিরল অংশ এবং একটা পিচ্ছিল মাটির ঢিবির উপরে আমি দাঁড়িয়ে। একটা গর্তের মধ্যে আমার বাবার কফিন নামানো হয়েছে আর সেদিকে তাকিয়ে আছি আমি। গর্তের তলায় জল জমেছে, ব্যাঙ লাফালাফি করছে — দুটো ব্যাঙ কফিনের হলদে ডালাটার উপরে লাফিয়ে উঠেছে।

সেই কবরের পাশে লোক বলতে আমরা কয়েকজন মাত্র। ভিজে জুবজুবে পুলিস, কোদাল হাতে দুজন রুক্ষ মেজাজী চাষা, আমার দিদিমা ও আমি। ঝিরঝিরে ইল্‌শে-গুঁড়ি বৃষ্টিতে আমরা সকলেই ভিজে গেছি।

'নে, এবার মাটি ফেল্‌।' বলে প্রহরীটি চলে গেল।

চাদরের খুঁটে মুখ চাপা দিয়ে দিদিমা কাঁদতে লাগলেন। লোক দুটি ঝুঁকে পড়ে কোদালভর্তি মাটি ফেলল। ঝপাং করে মাটি পড়তেই ছিট্‌কে

* ভারিয়া হচ্ছে ভারভারার সংক্ষিপ্ত নাম। — সম্পাঃ

এল গর্তের জল, ব্যাঙগুলো গর্তের গায়ে লাফালাফি করতে লাগল কিন্তু তাল তাল মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

আমার কাঁধে হাত দিয়ে দিদিমা বললেন, 'আয় রে, আলিওশা*।' কিন্তু আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না, দিদিমার হাত থেকে আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম।

'হায় প্রভু!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন। এমন সুরে কথাগুলো বললেন যে সন্দেহ থেকে গেল তাঁর অভিযোগটা কার বিরুদ্ধে, আমার না প্রভুর? বহুক্ষণ তিনি সেখানে মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন; এমন কি কবরের গর্তটা পুরোপুরি ভরাট হয়ে যাবার পরেও দাঁড়িয়ে রইলেন।

লোক দুটি কোদালের উল্টো দিক দিয়ে ঠুকে ঠুকে কবরের ওপরকার মাটি সমান করে দিল। বাতাস বইছে, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে বৃষ্টি। দিদিমা আমার হাত ধরে দূরের গির্জার দিকে আমাকে নিয়ে চললেন। গির্জার চারদিকে অনেকগুলো কবর, কবরের ওপরকার কালো ক্রুশচিহ্নগুলো ঝাপ্সা হয়ে গেছে।

সমাধিস্থান থেকে বেরিয়ে আসার পর দিদিমা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তুই কাঁদছিস না কেন? একটুখানি কেঁদে নে।'

আমি বললাম, 'আমার কান্না পাচ্ছে না দিদিমা।'

শান্তস্বরে তিনি জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, যদি কান্না না পায় তো কাঁদিস নে।'

দিদিমা যে আমাকে কাঁদতে বললেন এটা খুবই অবাক হবার মতো কথা। আমি সচরাচর কাঁদি না, শারীরিক কোনো যন্ত্রণায় তো নয়ই। মনের দিক থেকে কোনো রূঢ় আঘাত পেলেই আমার কান্না আসে। আমাকে কাঁদতে দেখলে আমার বাবা হো-হো করে হেসে উঠতেন কিন্তু মা ধমক দিত:

'চুপ কর বলছি।'

পরে আমরা গাড়িতে চেপে ফিরে এলাম। চওড়া কাদা-প্যাচপেচে রাস্তা, দু-পাশে গাঢ় লাল বাড়ি।

'ব্যাঙগুলো কি বেরিয়ে আসতে পারবে না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, পারবে না। ভগবান ওদের মঙ্গল করুন!' দিদিমা জবাব দিলেন।

* আলিওশা হচ্ছে আলেক্সেইয়ের সংক্ষিপ্ত নাম। — সম্পাঃ

মা কিংবা বাবার মুখে কখনো এত ঘন ঘন এবং এমন আপনজনের মত ভগবানের উল্লেখ শুনিনি।

কিছুদিন পরে আমার মা, দিদিমা আর আমি একটা জাহাজের ছোট কেবিনে চেপে পাড়ি দিলাম। আমার ছোট ভাই মাক্সিম মারা গেছে এবং কোণের একটা টেবিলের ওপরে লাল ফিতে বাঁধা সাদা কাপড় জড়ানো অবস্থায় রাখা হয়েছে তাকে।

আমি বসে আছি আমাদের বাক্সপেঁটরা-পোঁটলাপুঁটলির ওপরে। আমার সামনে একটা উদ্গত গোল জানলা, ঠিক ঘোড়ার চোখের মতো দেখতে। বাইরের দিকে আমার দৃষ্টি। জানলার কাঁচের ঠিক নিচ দিয়েই ফেনাতোলা ঘন কালো জল ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে একেবারে জানলার কাঁচের উপরেই ঝাপ্টা দিয়ে যায় আর চমকে উঠে। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি মেঝের উপরে লাফিয়ে পড়ি।

আমার দিদিমা নরম দুটি হাত দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে আবার সেই পোঁটলার উপরে বসিয়ে দিয়ে বলেন, 'ভয় পাসনে যেন।'

ধূসর ভিজে কুয়াশা জলের উপরে জমে আছে। মাঝে মাঝে যেই দূরের এক টুকরো কালো জমি কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে আবার তা মিলিয়ে যায়। আমাদের চারপাশে সবকিছু কাঁপছে। শুধু আমার মা দাঁড়িয়ে আছে স্থির ও অবিচল, চোখদুটো শক্ত করে বোজা, মাথার পিছনে হাত দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখটা কালো, থমথমে আর অন্ধ। মা একটিও কথা বলছে না আর কেমন জানি মনে হচ্ছে মা একেবারে বদলে গেছে, সেই পুরনো মানুষ আর নেই। এমন কি মা যে পোশাক পরে আছে তাও আমার কাছে নতুন ঠেকছে।

বার বার দিদিমা খুব নরম গলায় বলছেন, 'ভারিয়া, লক্ষ্মীটি, একটু কিছু মুখে দে।'

কিন্তু আমার মা নির্বাক ও নিশ্চল।

দিদিমা আমার সঙ্গে কথা বলছেন ফিস্‌ফিস্ করে; মা'র সঙ্গে কথা বলবার সময় আরেকটু উচ্চকণ্ঠে, কিন্তু যেন খুবই ভয়ে ভয়ে এবং খুবই সাবধানে। তাও কচিৎ কখনো। আমার মনে হচ্ছে, দিদিমা আমার মা'কে ভয় করেন। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি এবং এই কারণেই দিদিমার ওপর আমার টান আরো বেড়ে যায়।

আচমকা আমার মা উঁচু কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল, 'সারাতভ। কোথায় গেল সেই নাবিক?'

'সারাতভ', 'নাবিক'... মা'র এই কথাগুলোও কেমন যেন অদ্ভুত অপরিচিত মনে হতে লাগল আমার কাছে।

ঘরে ঢুকল একজন বিশালস্কন্ধ পক্বকেশ লোক, পরনে নীল পোশাক, হাতে ছোট একটা বাক্স। দিদিমা তার হাত থেকে বাক্সটা নিলেন এবং আমার ছোট ভাইয়ের দেহকে সেই বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর প্রসারিত দুই হাতের ওপরে বাক্সটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। কিন্তু দিদিমা এত মোটা যে একপাশ না হয়ে তাঁর পক্ষে সেই দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কি করবেন বুঝতে না পেরে হাস্যকরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।

'মা যে কী!' বলে মা ধৈর্য হারিয়ে দিদিমার হাত থেকে কফিনটা কেড়ে নিল। তারপর দুজনেই বেরিয়ে চলে গেল। আমি সেই নীল পোশাক পরা লোকটির সঙ্গে কেবিনে রয়ে গেলাম।

লোকটি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'তাহলে কি, তোমার ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেল?'

'তুমি কে?'

'আমি একজন নাবিক।'

'আর সারাতভ কে?'

'সারাতভ একটা শহরের নাম। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওই হচ্ছে সারাতভ!'

কুয়াশার মালা জড়ানো অন্ধকার উঁচুনিচু জমি জানলার বাইরে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে পাঁউরুটি থেকে কেটে নেওয়া মস্ত একটা টুকরোর মতো মনে হচ্ছিল আমার।

'দিদিমা কোথায় গেল?'

'নাতিকে কবর দিতে।'

'ওকে কি মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

আমার বাবাকে কবর দেবার সময় কি-ভাবে কতগুলো জ্যান্ত ব্যাঙ মাটিতে চাপা পড়েছিল — সে-কথা আমি নাবিকটিকে বললাম। শুনে লোকটি

আমাকে দু-হাতে তুলে নিল এবং বুকের উপরে শক্ত করে চেপে ধরে চুমু খেল।

'ভাই, তুমি এখনো কিচ্ছু বুঝতে পারনি! ব্যাঙের জন্যে অত দরদ দেখাবার দরকার নেই — ব্যাঙের দল চুলোয় যাক্! তোমার মা'র জন্যে দরদ দেখাও, তাঁর অবস্থা দেখতে পাচ্ছ তো? শোক পেয়ে পেয়ে কী হয়ে গেছেন!'

হঠাৎ ওপরের দিক থেকে প্রচণ্ড একটা সোরগোল এবং তীক্ষ্ন শব্দ ভেসে এল। আমি জানতাম শব্দটা স্টীমবোটের, সুতরাং আমি ভয় পেলাম না। কিন্তু নাবিকটি তাড়াতাড়ি আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল 'আমাকে যেতে হবে' বলতে বলতে।

আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল, বেরিয়ে যাই। কেবিনের বাইরে এলাম। অন্ধকার সরু চলা পথটায় একজন লোকও নেই। দেখতে পাচ্ছিলাম, পিতলমোড়া সিঁড়িটা ঝক্‌ঝক্ করছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পোঁটলাপুঁটলি হাতে নিয়ে দলে দলে লোক চলেছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, সবাই জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার মানে আমাকেও যেতে হবে।

কিন্তু যখন আমি জাহাজ থেকে নামবার পাটাতনের কাছে ভিড়ের মধ্যে ডেকের উপরে গিয়ে দাঁড়ালাম, সবাই আমাকে ধমক দিতে শুরু করল:

'তুমি কোত্থেকে এলে? কার সঙ্গে এলে?'

'আমি জানি না।'

অনেকক্ষণ ধরে তারা আমাকে নিয়ে ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি করল। শেষকালে সেই পাকাচুল নাবিকটি এসে হাজির। সে বলল, 'ও এসেছে আস্ত্রাখান থেকে, একা একাই কেবিন থেকে বাইরে চলে এসেছে...'

আমাকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড়ে কেবিনে ফিরে এল সে, সেখানে পোঁটলার উপরে আমাকে বসিয়ে তর্জনী তুলে বলল, 'খবরদার!'

এই বলে শাসিয়ে সে চলে গেল।

উপরের হৈচৈ-সোরগোল আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছে। থেমে গেছে স্টীমারের ঝাঁকুনি আর জলের শব্দ। কেবিনের জানলাটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে একটা ভিজে দেওয়াল; ফলে কেবিনের ভিতরটা গুমোট আর অন্ধকার। আমার মনে হতে লাগল, পোঁটলাগুলো যেন ফুলেফেঁপে আমাকে পিষে ফেলতে চাইছে। তাই আমার অস্বস্তি হতে লাগল। এই জনমানবহীন

স্টীমারে আমাকে একেবারে ফেলে রেখে যদি সবাই চলে গিয়ে থাকে, তাহলে কী হবে?

আমি দরজার কাছে গেলাম। দরজাটা শক্তভাবে বন্ধ করা, দরজা খোলবার পিতলের হাতল আমি কিছুতেই ঘোরাতে পারলাম না। একটা দুধের বোতল নিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘা মারলাম হাতলটার উপরে। বোতলটা চুরমার হয়ে গিয়ে আমার পা ও জুতোর উপরে দুধ গড়িয়ে পড়ল।

কোনো দিক দিয়ে কিছু করতে না পেরে আমি মনমরা হয়ে পোঁটলা-গুলোর উপরে শুয়ে রইলাম এবং কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম, স্টীমারটা আবার কাঁপছে, শোনা যাচ্ছে জলের শব্দ, কেবিনের জানলাটা সূর্যের মত ঝল্সে উঠেছে। দিদিমা আমার পাশে বসে চুল আঁচড়াচ্ছেন আর কপাল কুঁচকে নিজের মনে মনেই বিড়বিড় করে কী বলছেন যেন। দিদিমার মাথায় গোছা গোছা নীলাভ কালো চুল দেখে অবাক হতে হয়। সেই চুলের গোছা তাঁর কাঁধ বুক আর হাঁটুর উপর দিয়ে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ছে। একহাতে তিনি সেই চুলের গোছাকে মেঝের উপর থেকে তুলে শক্ত করে ধরে আছেন এবং অপর হাতে একটা মোটা কাঠের চিরুনি দিয়ে গোছা গোছা চুলের জট্ ছাড়াতে চেষ্টা করছেন। তাঁর মুখ কুঁচকে উঠেছে, রাগে জ্বলছে কালো চোখদুটো, আর গোছা গোছা চুলের মাঝখানে ছোট আর হাস্যকর দেখাচ্ছে মুখখানাকে।

দিদিমাকে দেখে মনে হচ্ছিল আজ তাঁর মেজাজ ভালো নেই। কিন্তু তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর চুলগুলো এত লম্বা কেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গলার স্বরটা নরম হয়ে এল। তখন আগের দিনের মতোই দরদভরা সুরে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

'চুলের কথা বলছিস, এটা খুব সম্ভব ভগবানের দেওয়া একটা শাস্তি। ভগবান বলেছেন — এই নে, তোকে একমাথা চুল দিলাম, এই আপদ সামলাতে সামলাতেই তোর দিন কাটুক! অল্প বয়সে এই চুল নিয়েই আমার দেমাক ছিল কত! আর এখন এটা হয়েছে আমার দু-চোখের বিষ। কিন্তু দাদু, এবার ঘুমোও তো। এখনো ভালো করে সূর্য ওঠেনি — এত তাড়াতাড়ি উঠতে হবে না।'

'আমি আর ঘুমোব না দিদিমা।'

'বেশ, ইচ্ছে যদি না হয় তো ঘুমিও না।' বেণী বাঁধতে বাঁধতে তিনি সায় জানালেন। একটা খাটিয়ার উপরে আমার মা তীরের মত টান হয়ে

চিত হয়ে শুয়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কাল দুধের বোতলটা ভাঙলি কী করে রে? চেঁচাসনে বাপু, যা বলবি নীচু স্বরে বল।'

তাঁর কথা বলার বিশেষ একটা ভঙ্গি ছিল। গানের সুরের মত কথাগুলো — ফুলের মত সুস্পষ্ট ও মনোরম। একবার শুনে সহজেই আমি মনে রাখতে পারি। তিনি যখন হাসেন তখন তাঁর চেরির মত কালো চোখের মণি বড়ো হয়ে যায় আর একটা বর্ণনাতীত দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাসলে দেখা যায় দৃঢ়সংবদ্ধ সাদা দাঁতের সারি। ময়লা রঙের গালদুটিতে অসংখ্য বলিরেখা ফুটে ওঠা সত্ত্বেও সারা মুখটায় তারুণ্য ও আলো ফুটে ওঠে যেন। মুখের একমাত্র খুঁৎ হচ্ছে সেই মাংসল নাকটি; এই বড় বড় দুটো নাসারন্ধ্র ও লাল নাসাগ্র। রুপোর গুটি লাগানো কালো একটি কৌটো থেকে তিনি নস্যি নেন। বহিরাবয়বে তিনি ফর্সা নন, কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে অন্তরের এক অনির্বাণ আলোর উষ্ণ ও উদ্দীপ্ত শিখায় তিনি উজ্জ্বল। শরীরটা এত নুয়ে পড়েছে যে তাঁকে প্রায় কুঁজো বলে মনে হয়। কিন্তু মস্ত একটা বেড়ালের মতো অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর চলাফেরায় এবং পুশি বেড়ালের মতোই তুলতুলে তিনি।

আমার মনে হয়েছিল, আমার জীবনে তাঁর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আমি এক অন্ধকার সুপ্তিতে অবলুপ্ত ছিলাম। কিন্তু তিনি এসে আমাকে জাগিয়ে দিলেন এবং আমার হাত ধরে নিয়ে এলেন এক আলোর রাজ্যে। আমার সমগ্র পরিবেশকে অখণ্ড ও একক একটি সূত্রে গ্রথিত করে এক বিচিত্রবর্ণ জরিতে রূপান্তরিত করলেন। প্রথম দিনটি থেকেই তিনি হলেন আমার সারা জীবনের বন্ধু, আমার সবচেয়ে নিকট ও আপনার জন। জীবনের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমাকেও সমৃদ্ধ করেছে এবং কঠোর ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি জুগিয়েছে আমার মধ্যে।

চল্লিশ বছর আগে স্টীমার চলত আস্তে আস্তে। নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ পেঁছতে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগল। সৌন্দর্যস্নাত সেই প্রথম কয়েকটি দিনের কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে।

আবহাওয়াটা চমৎকার, আর সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমি দিদিমার সঙ্গে ডেকের উপরে থাকি। উজ্জ্বল আকাশের নিচ দিয়ে, শরৎকালের স্বর্ণময়

রেশমি কারুকার্য-খচিত ভল্‌গার দুই তীরের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলি আমরা। বাদামী রঙের স্টীমারটার সঙ্গে একটা বজ্‌রা বাঁধা; স্রোতের বিরুদ্ধে জল কেটে কেটে, নীলাভ ধূসর জলে চাকার ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ তুলে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে স্টীমারটা। ধূসর রঙের বজ্‌রাকে দেখায় জলের পোকার মতো। অলক্ষ্যে সূর্য ভল্‌গা নদীর ওপরে সাঁতার দিয়ে ভেসে যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রূপান্তর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুনের আবির্ভাব। সবুজ পাহাড়গুলো যেন মাটির বহুমূল্য পোশাকের ভাঁজ। দূরে দূরে শহর ও গ্রাম পার হয়ে যায়; তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় সেগুলো বুঝি মিষ্টি পাঁউরুটির টুকরো দিয়ে তৈরি। শরৎকালের গাছের সোনালী পাতা ভাসে জলের ওপরে।

'দেখ্‌, দেখ্‌, কী সুন্দর!' আমার দিদিমা বলে চলেন; আর উদ্ভাসিত মুখে, খুশিভরা বড়ো বড়ো চোখে ডেকের একদিক থেকে আরেক দিকে ঘুরে বেড়ান।

মাঝে মাঝে তীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার উপস্থিতি একেবারে ভুলে যান। তখন তাঁর অন্য চেহারা। দুই হাত বুকের ওপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখা, ঠোঁটদুটো হাসিতে সম্প্রসারিত, চোখভরা জল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি আর তখন আমি তাঁর গাঢ়রঙের ফুলকাটা স্কার্ট ধরে টান দিই।

'এ্যাঁ,' বলে তিনি চমকে সজাগ হয়ে ওঠেন, তারপর বলেন, 'ও তুই! কী মনে হচ্ছিল জানিস? আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি।'

'তুমি কাঁদছ কেন দিদিমা?'

'বাছা আমার, সোনা আমার, কেন কাঁদছি জানিস? ভালো লাগছে বলে কাঁদছি, শরীরে জোর নেই বলে কাঁদছি,' হাসতে হাসতে তিনি বলেন, 'বুড়ো হয়ে গেছি দাদু, তিন কুড়ি বয়স হয়ে গেছে...'

তারপর তিনি একটিপ্‌ নস্যি নিয়ে আমাকে অদ্ভুত সব গল্প বলতে শুরু করেন; সাধুদের গল্প, জন্তুজানোয়ারের গল্প, দয়ালু ডাকাত আর অশুভ শক্তির গল্প।

আমার মুখের কাছে মুখ এনে রহস্যভরা শান্ত গলায় তিনি গল্প বলেন, তাকিয়ে থাকেন আমার চোখের দিকে। তাঁর চোখের মণিদুটো বড়ো হয়ে ওঠে — আর তাঁকে দেখে মনে হয়, তিনি আমার মধ্যে শক্তিপ্রবাহ সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন, যাতে আমি অবলম্বন পাই। তিনি যেন কথা বলেন না, গান গেয়ে ওঠেন। আর যতোই কথা বলেন ততোই তাঁর বলার ভঙ্গির

মধ্যে আরও বেশি ছন্দ আসে। তাঁর কথা শুনে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর তাই একটা গল্প শেষ হলেই আমি বলে উঠি:

'আরো বলো দিদিমা!'

'তাহলে শোন্ তারপর কী হল। উনুনের মধ্যে যে দানোটা থাকত সে তো বসে আছে উনুনের নিচে; থাবায় চিলতে ভিদেছে। বসে বসে দুলছে আর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলছে—ছোট ইঁদুর, ছোট ইঁদুর! হায় হায়, আর তো আমি বাঁচব না, ছোট ইঁদুর!'

তিনি নিজেই নিজের পা-টা আঁকড়ে ধরে দুলতে শুরু করেন, তাঁর চোখমুখ কুঁচকে ওঠে — মনে হয়, না-বাঁচতে পারার কষ্টটা তাঁকেই ভোগ করতে হচ্ছে।

ভালোমানুষ গোঁফদাড়িওলা নাবিকরা চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গল্প শুনতে শুনতে হেসে ওঠে, বাহবা দেয়, একটা গল্প শেষ হলে আরেকটা শুনতে চায়।

'থেমো না ঠানদি, আরো বলো!'

আর তারপর বলে:

'ঠানদি, আমাদের সঙ্গে রাত্রের খাওয়া খেতে চলো!'

রাত্রিবেলা খাবার সময় তারা দিদিমাকে ভদ্‌কা খেতে দেয় আর আমাকে দেয় ফুটি আর তরমুজ। ব্যাপারটা চুপি চুপি সারতে হয়, কারণ স্টীমারের ওপরে ফল খাওয়া নিষিদ্ধ। কেউ যাতে ফল না খায় সে-বিষয়ে খবরদারি করবার জন্যে একজন লোক আছে। যদি সে কাউকে ফলসমেত হাতে-হাতে ধরতে পারে তাহলে ফল ছিনিয়ে নিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। লোকটির সাজপোশাক পুলিসের মতো, জামায় পিতলের বোতাম, সব সময়ে মাতাল অবস্থায় থাকে। তার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকে সবাই।

আমার মা ক্বচিৎ কখনো ডেক্'এ আসত। পারতপক্ষে মা আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। মা সব সময় গম্ভীর, তার চেহারা আজো আমার মনে আছে — দীর্ঘ সুন্দর গড়ন, থমথমে গম্ভীর মুখ, আর মাথায় সোনালী চুলের গুচ্ছ। মনে হত তার সমস্ত শক্তি ও কাঠিন্য যেন কুয়াশা বা স্বচ্ছ মেঘের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই। এত বছর পরেও দেখতে পাচ্ছি তার ধুসর চোখের সেই অনাত্মীয় চাউনি। ঠিক আমার দিদিমার মতোই বড়ো বড়ো চোখ আমার মা'র।

একদিন মা কঠোর স্বরে দিদিমাকে বলে, 'মা, তোমায় কাণ্ডকারখানা দেখে লোকে হাসাহাসি করে।'

অত্যন্ত সহজ ভাবে কথাটা নিয়ে দিদিমা জবাব দেন, 'লোকের যদি ইচ্ছে হয় তো হাসুক না বাপু। ভালো কথাই তো, যতো হাসতে পারবে ততোই ভালো।'

আমার মনে আছে, নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ চোখের সামনে ভেসে উঠতেই ছেলেমানুষের মতো দিদিমার সে কী আনন্দ!

'দেখ্‌, দেখ্‌, কী চমৎকার!' বলে তিনি আমার হাতটা আঁকড়ে ধরে রেলিং'এর দিকে আমায় ঠেলে দিলেন, 'দেখেছিস তো, এই হচ্ছে নিজ্‌নি! কি সুন্দর! ভগবানের শহর আমার! গির্জার চুড়োগুলোকে দেখ্‌— ঠিক যেন উড়ছে!'

তারপর তিনি আমার মা'র দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, 'ভারিয়া! তুই তো এতদিনে বোধ হয় সব ভুলেই গেছিস। দু চোখ ভরে দেখে নে!'

মা বিষণ্ণ ভাবে হাসল।

সেই সুন্দর শহরের সামনে এসে স্টীমারের গতি বন্ধ হল, নদীর মাঝখানে থামল স্টীমারটা। চারদিকে নৌকো আর জাহাজের ভিড়, আকাশ ছেয়ে শ'য়ে শ'য়ে মাস্তুল উঠেছে। লোকবোঝাই মস্ত একটা নৌকো এসে আমাদের স্টীমারের নামিয়ে দেওয়া সিঁড়ির পাটাতনের গায়ে লাগল। তারপর সেই সিঁড়ি দিয়ে একে একে লোক উঠে এল স্টীমারের ডেক্‌'এ। সেই দলের সবচেয়ে আগে এলেন লম্বা কালো জামা গায়ে রোগামত একজন বৃদ্ধ। তাঁর চোখদুটো সবুজ, বঁড়শির মত নাক, সোনার মতো টকটকে দাড়ি।

'বাবা!' বলে চেঁচিয়ে ডেকে উঠেই আমার মা বৃদ্ধের দু-হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছোট ছোট লাল দুটি হাতের মধ্যে মা'র মাথাটা তুলে ধরে গালের উপরে মৃদু চাপড় দিতে দিতে চাপা উত্তেজিত স্বরে বৃদ্ধ বললেন, 'ফিরে এলি পাগলী! আহা-রে!'

চাকার মতো ঘুরপাক খেতে খেতে দিদিমা সবাইকে জড়িয়ে ধরছেন আর চুমু খাচ্ছেন।

'আয়, আয়, এগিয়ে আয়,' বলে আমাকে সেই ভিড়ের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে তোর মামা মিখাইল, এই হচ্ছে ইয়াকভ, আর এই হচ্ছে

তোর মামী নাতালিয়া। আর এই যে বাচ্চাদের দেখছিস, এরা সব তোর মামাতো ভাইবোন—এই দুজনেরই নাম সাশা, আর এর নাম কাতেরিনা। দেখছিস তো কতো লোক— সবাই আমাদের জাত!'

আমার দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেমন আছ গিন্নী?'

তারপর তাঁরা পরস্পরকে তিনবার চুমু খেলেন।

আমি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমাকে এক হ্যাঁচ্‌কা টানে টেনে নিয়ে মাথার ওপর একটা হাত রেখে দাদামশাই বললেন, 'তারপর তুই কে, তোর নাম কী?'

'আমি এসেছি আস্ত্রাখান থেকে, কেবিনে থাকি...'

'কী বলে ও?' মা'র দিকে ফিরে তাকিয়ে দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই আমাকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'ঠিক বাপের মতো গালের হাড়গুলো হয়েছে।' মন্তব্য করলেন চলতে চলতে।

'নৌকোয় নামো,' বললেন তিনি।

তীরে পেঁছে একটা পাথর-বাঁধানো পথ ধরে আমরা ওপরে উঠে এলাম। দু-দিকে উঁচু বাঁধ, মাঝে পায়ে-দলা হল্‌দে ঘাসে ঢাকা পথ।

সবচেয়ে আগে চলেছেন আমার দাদামশাই আর আমার মা। লম্বায় দাদামশাই আমার মা'র কাঁধের কাছাকাছি, ছোট পদক্ষেপে খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে তিনি চলছেন। দাদামশাইয়ের দিকে উঁচু থেকে মা তাকাচ্ছে আর মনে হচ্ছে যেন উড়ে চলেছে। তাদের দুজনের পিছনে চলেছে আমার দুজন মামা—একজন হচ্ছে মিখাইল, খাড়া খাড়া কালো চুল আর দাদামশাইয়ের মতোই রোগা শরীর, অপরজন ইয়াকভ, কোঁকড়ানো সোনালী চুল। তারপরেই রঙচঙে পোশাক পরিহিতা কয়েকজন মোটা স্ত্রীলোক, সঙ্গে গুটি ছয়েক ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েরা সকলেই আমার চেয়ে বড়ো আর সকলেই ভারি চুপ্‌চাপ। আমি চলেছি আমার দিদিমা আর ছোট নাতালিয়া-মামীর সঙ্গে। নাতালিয়া ফ্যাকাশে চেহারা, নীল চোখ আর মস্ত পেট। খানিকক্ষণ পর পরেই নাতালিয়া-মামীর হাঁপ ধরে যায়, দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে ফিসফিস করে বলে, 'উঃ, আর চলতে পারছি না।'

রেগে উঠে আমার দিদিমা বিড়বিড় করে বলেন, 'তোমাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছে তারা? কী বোকা গুষ্টি!'

এদের কাউকেই আমার ভালো লাগছে না; না বয়স্কদের, না বাচ্চাদের। নিজেকে একেবারে বাইরের লোক বলে মনে হচ্ছে। এমন কি আমার

দিদিমাও যেন এখানে এসে ম্লান হয়ে গেছেন এবং দূরে সরে গেছেন।

বিশেষ করে দাদামশাইকে আমার একেবারেই পছন্দ নয়। প্রথম থেকেই মনে মনে বুঝতে পারছি, তিনি আমার শত্রু হবেন। তিনি আমার মধ্যে একটা সন্দিগ্ধ ভাব জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর প্রতি আমি বিশেষ নজর রাখছি।

উঁচু পথটার শেষ মাথায় এসে পেঁছলাম আমরা। একেবারে এই শেষ মাথায় ডানদিকের বাঁধের গা ঘেঁষে একটা নিচু একতলা বাড়ি। এখান থেকেই শহরের রাস্তা শুরু। বাড়িটার কেমন ময়লা ময়লা গোলাপী রং, জানলাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর বাড়ির ছাদটা নিচু হয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জানলাগুলোর ওপরে। বাইরে থেকে দেখে বাড়িটাকে বেশ বড়োই মনে হয়েছিল আমার, কিন্তু ভিতরে ঘরগুলো ছোট ছোট ও অন্ধকার। আর সর্বত্র লোক গিজগিজ করছে; বিরক্তিকর একদল লোক অনবরত ব্যস্ত হয়ে চলেছে এঘরে-ওঘরে। স্টীমারে যাত্রীরা ওঠা-নামা করার সময়ে যেমন অবস্থা হয়, অনেকটা তাই। ফিকিরসন্ধানী চড়ুইপাখির মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বাচ্চাগুলো। আর বাড়ির সর্বত্র কেমন একটা ঝাঁঝালো অপরিচিত গন্ধ।

তারপর বাইরে উঠোনে এসে দেখলাম, সেখানকার অবস্থাও কোনো দিক দিয়েই উন্নত নয়। ঘন রং গোলা জলভর্তি বড় বড় গামলা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তাতে কাপড় আর মস্ত মস্ত কাপড় টাঙানো হয়েছে শুকোবার জন্যে। এক কোণের একটা নিচু চালাঘর থেকে দেখা যাচ্ছে আগুনের আভা; কাঠের উনুন জ্বলছে, চিড়বিড় শব্দে সিদ্ধ হচ্ছে কি যেন। আর শোনা যাচ্ছে একজন অদৃশ্য মানুষের উচ্চকণ্ঠ চিৎকারে কতগুলো অদ্ভুত শব্দ:

'চন্দন — ম্যাজেণ্টা -- সালফিউরিক এসিড ...'

দুই

তারপর থেকেই এক দ্রুত, ঘটনাবহুল ও অবর্ণনীয় রকমের আশ্চর্য জীবনের শুরু। এক বিষাদগম্ভীর গল্পের মতো এই জীবনের কথা আমার মনে পড়ে; একজন দয়াবান প্রতিভাধর ব্যক্তি, যিনি এত বেশি বাস্তবানুগ যে এতটুকু বিচ্যুতিও সহ্য করেন না — তাঁর মুখেই যেন শোনা এই গল্প।

আজ যখন অতীতের কথা ভাবি তখন মাঝে মাঝে বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে যে সত্যিই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল কারণ দিদিমা যাদের বলেছেন 'বোকা গুষ্টি' তাদের জীবনটা ছিল খুবই অন্ধকার আর ভয়ঙ্কর হিংস্র। আজো ইচ্ছে হয়, ঘটনাগুলোকে মুছে ফেলে দিই, জোর করে ভাবি যে ঘটনাগুলো সত্যি নয়।

কিন্তু ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বা না-লাগার ওপরে সত্যি নির্ভর করে না; আর তাছাড়া এই কাহিনী আমার নিজের সম্পর্কে নয়। সে-সময়ে রাশিয়ার সাধারণ মানুষরা যে শ্বাসরোধী ও আতঙ্কজনক পরিবেশে বাস করত এবং এখনো করে — তারই চিত্র এই কাহিনী।

আমার দাদামশাইয়ের বাড়িটা ছিল পরস্পর বিদ্বেষের বাষ্পে ঠাসা। কেউ কাউকে পছন্দ করত না। বয়স্কদের হাড়েমজ্জায় এই বিদ্বেষের বিষ ঢুকেছিল, এমন কি ছোটরাও এর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচতে পারেনি। পরে দিদিমার মুখে গল্প শুনে আমি জেনেছি — আমার মা এমন এক সময়ে এই বাড়িতে হাজির হয়েছিল যখন মামারা উভয়ই দাবি তুলেছে, দাদামশাই তাঁর বিষয়সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিক। আমার মা'র ফিরে আসাটা অপ্রত্যাশিত এবং এই ব্যাপারে এই দাবিটা আরো জোরালো হয়ে ওঠে। মামাদের ভয় হল যে মা হয়তো এবার তার বিয়ের যৌতুক দাবি করে বসবে। মা বিয়ে করেছিল 'নিজের পছন্দমত', মা'র বিয়েতে দাদামশাইয়ের মত ছিল না — তাই তিনি কোনো যৌতুক দেননি। মামারা মনে করেছিল যে এই যৌতুকও তাদের মধ্যেই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। অনেকদিন ধরেই মামাদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছে, কে বা শহরে থেকে কারখানা খুলবে, কে বা যাবে ওকা নদীর অপর তীরে কুনাভিনো বসতিতে।

আমরা আসার কিছুদিনের মধ্যেই একদিন রান্নাঘরে খেতে বসে শুরু হয়ে যায় ঝগড়া। মামারা দুজনেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর টেবিলের ওপরে ঝুঁকে কুকুরের মত তেড়েফুঁড়ে আর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে দাদামশাইয়ের মুখের ওপরেই যা-তা চীৎকার করতে লাগল। রাগে লাল হয়ে ওঠেন দাদামশাই, তারপর টেবিলের ওপর চামচ ঠুকে মোরগের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন:

'রাস্তায় রাস্তায় তোদের ভিক্ষে করাব!'

যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে দিদিমা বলেন, 'কর্তা, দিয়ে দাও ওদের সব। যা আছে দিয়ে দাও। কী দরকার এত অশান্তির!'

'থামো গো, সায়-দিউনী!' আগুন-ঝরা চোখে দাদামশাই হুংকার দিয়ে ওঠেন। এই ছোট মানুষটিও এমন কান-ফাটানো চিৎকার করতে পারেন — অবাক কাণ্ডই বলতে হবে!

আমার মা উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীর পায়ে জানলার কাছে গিয়ে ঘরের মানুষগুলোর দিকে পিঠ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ মিখাইল-মামা তার ভাইয়ের মুখে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারে। ঘুষি খেয়ে ভাইটি গাঁ গাঁ করে জাপটে ধরে মিখাইল-মামাকে। তারপরেই শুরু হয় মেঝের ওপরে গড়াগড়ি, গালাগালি, ঘোঁৎ ঘোঁৎ চিৎকার আর হাঁপানি।

বাচ্চারা কান্না জুড়ে দিয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা নাতালিয়া-মামী জুড়েছে বিলাপ, মা তাকে দু-হাতে ধরে বাইরে কোথায় নিয়ে যায়। বসন্তের দাগওলা হাসিখুশি ইয়েভগেনিয়া-ধাই ছেলেমেয়েদের তাড়া দিয়ে বার করে দেয় রান্নাঘর থেকে, চেয়ারগুলি পড়ে যায়। তরুণ বিশালস্কন্ধ শিক্ষানবীশ ৎসিগানক মিখাইল-মামার পিঠে বসে তাকে চেপে ধরে আর গ্রিগরি ইভানোভিচ ধীরেসুস্থে একটা তোয়ালে দিয়ে মামাকে পিঠমোড়া করে বাঁধে। গ্রিগরি ইভানোভিচের মাথায় টাক, মুখে দাড়ি, চোখে কালো চশমা। সে হচ্ছে একজন ওস্তাদ কারিগর।

আমার মামা পাতলা পাতলা কালো দাড়িসমেত চিবুকটা মেঝের উপর ঘষতে ঘষতে গলা ফাটিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার জুড়ে দেয়।

'কী লোক সব! এরা নাকি আবার এক মায়ের পেটের ভাই। ছিঃ, কী সব লোক!' টেবিলের চারপাশে ঘুরপাক খেতে খেতে আমার দাদামশাই করুণ স্বরে চিৎকার করতে থাকেন।

কথা কাটাকাটি শুরু হতেই আমি ভয়ে চুল্লির ওপরে গিয়ে উঠেছিলাম। সেখান থেকে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে দেখি, আমার দিদিমা ইয়াকভ-মামার মার-খাওয়া মুখ থেকে রক্ত ধুয়ে দিচ্ছেন। ইয়াকভ-মামা কাঁদছে আর দাপাচ্ছে আর দিদিমা ভারী গলায় বলছেন:

'তোদের বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে রে জংলী গুষ্টি!'

আর গায়ের ছেঁড়া জামাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে দাদামশাই দিদিমার দিকে তেড়ে আসছেন আর চিৎকার করছেন:

'ডাইনী বুড়ী, দ্যাখ্, তুই কী অসভ্য জংলীদের পেটে ধরেছিলি!'

ইয়াকভ-মামা বেরিয়ে যাবার পর দিদিমা জড়োসড়ো হয়ে এক কোণে গিয়ে বসে ভীষণ আর্তনাদ করতে থাকেন:

'হে পুণ্যময়ী জগৎমাতা! আমার এই ছেলেগুলোকে একটু সুবুদ্ধি দিও!'

টেবিলের উপরে জিনিসপত্রগুলো ছত্রাকার হয়ে উল্‌টে-পাল্‌টে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে দাদামশাই বলেন, 'গিন্নী, তোমার এই ছেলেগুলোর দিকে নজর রেখো। বিশ্বাস নেই, হয়তো ভারভারাকে খুন করেই ফেলবে...'

'ভগবান জানেন তুমি কী বলছো! আচ্ছা, এবার তোমার গায়ের শার্টটা খুলে দাও তো, সেলাই করে দিই।'

দাদামশাইয়ের মুখটা দু-হাতে ধরে দিদিমা তার কপালে চুমু খান। দিদিমার তুলনায় দাদামশাই মানুষটি ছোটখাটো — দিদিমার কাঁধের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকেন তিনি।

'গিন্নী, মনে হচ্ছে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়াই ভালো।'

'তাই ভালো, কর্তা।'

বহুক্ষণ তাঁরা কথা বলেন। প্রথম দিকে কারও কথাবার্তার মধ্যে উষ্মা ছিল না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দাদামশাই ফুঁসে ওঠেন। লড়াই শুরু করার আগে মোরগ যেমন মাটি আঁচড়ায় তেমনিভাবে মেঝেয় পা ঘষে তিনি দিদিমার দিকে আঙুল তুলে শাসাতে শাসাতে বলতে থাকেন, 'তোমাকে ভালো করেই চিনি। ওদের চিন্তাতে তুমি পাগল—আমাদের কথা ভাববে কেন?' তীক্ষ্ন চাপা গলায় দাদামশাই চিৎকার করতে থাকেন, 'ওই যে তোমার মিখাইল — ওটার মুখে এক, মনে এক! ইয়াকভটা হচ্ছে একটা আসল শয়তান! ওদের হাতে পড়লে দুদিনে ফুটফাট করে উড়িয়ে দেবে সব!'

হঠাৎ আমি একটা কান্ড করে বসি। অসাবধানে নড়তে গিয়ে আমার কাঁধের ধাক্কায় একটা ইস্ত্রি পড়ে যায়। প্রচন্ড শব্দে চুল্লির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে ইস্ত্রিটা। কাপ-ডিশের তলানি ফেলবার জন্যে একটা বড় গামলা ছিল — ইস্ত্রিটা গিয়ে পড়ে তার মধ্যে। চম্‌কে লাফিয়ে উঠে আমার দাদামশাই এক হ্যাঁচ্‌কা টানে আমাকে টেনে নিয়ে আসেন, তারপর মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যেন এই তিনি প্রথম আমাকে দেখছেন।

'তোকে ওই চুল্লির ওপরে কে উঠিয়ে দিয়ে গেল? তোর মা?'

'আমি নিজেই উঠেছি।'

'মিথ্যে কথা বলছিস।'

'না, মিথ্যে কথা বলছি না। ভয় পেয়ে আমি নিজেই চুল্লির ওপরে উঠেছি।'

আমাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে কপালে ধাঁই করে একটা চাটি মেরে বলেন:

'ঠিক বাপের স্বভাব পেয়েছে! বেরিয়ে যা এখান থেকে!'

আমিও তাই চাই। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পেরে খুশিই হই আমি।

বেশ বুঝতে পারতাম দাদামশাইয়ের ধারালো সবুজ চোখের দৃষ্টি সব সময়ে আমাকে অনুসরণ করছে, তাই আমি তাঁকে ভয় করে চলতাম। মনে আছে, সেই কুৎকুতে চোখের দৃষ্টিকে সব সময়ে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতাম আমি। আমার মনে হত, তিনি নীচ প্রকৃতির লোক; লোকের আঁতে ঘা দিয়ে এবং লোকে যা পছন্দ করে না সেইভাবে সবার সঙ্গে কথা বলেন তিনি, লোককে রাগিয়ে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আনন্দ পান।

'হুঃ, তোমরাই-ই!' কথাটা তিনি প্রায়ই বলতেন এবং বলতে ভালোবাসতেন। 'ই' বলবার সময় অনেকক্ষণ ধরে টেনে টেনে উচ্চারণ করা 'ই' শব্দটুকু শুনে আমার শরীরটা শির-শির করে উঠত আর ভারি একা মনে হত নিজেকে।

সন্ধ্যার চা খাবার সময়টা ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারখানা খালি করে বেরিয়ে আসতেন আমার দাদামশাই, আমার মামারা আর কারিগররা। ক্লান্ত পায়ে সবাই এসে ঢুকত রান্নাঘরে। এ্যাসিড-ঝলসানো চন্দনের রঙমাখা হাত আর ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা উলটানো চুল — অন্যরকম হয়ে যেত চেহারাগুলো। রান্নাঘরের কোণে রাখা সাধুসন্তদের কালো কালো আইকনের মতো মনে হত মানুষগুলোকে। আর ঠিক সেই বিপজ্জনক মুহূর্তে আমার দাদামশাই আমার সামনাসামনি বসে কথা বলতেন। আমার সঙ্গে যতো বেশি কথা বলতেন, অন্য নাতিনাতনিদের সঙ্গে তা বলতেন না; আর আমার ওপর ঈর্ষা হত তাদের। আমার দাদামশাইয়ের চেহারার মধ্যে বেশ একটা পারিপাট্য ছিল, পাথর কুঁদে গড়া অত্যন্ত মসৃণ মূর্তির মতো।

তিনি যে রেশমকাটা সাটিন ফতুয়া গায়ে দিতেন তা ছিল পুরনো ও জীর্ণ, সুতির কামিজ কুঁচকনো, হাঁটুর কাছে তালিমারা প্যাণ্ট; ওদিকে তাঁর ছেলেরা কোট গায়ে দিত, গলায় রেশমি রুমাল — তবুও মনে হত ছেলেদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং তাঁর সাজপোশাকটাও অনেক ভালো।

আমরা পেঁছবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিলেন: কি-ভাবে উপাসনা করতে হয় তা শেখা। বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড়ো এবং তারা ইতিমধ্যেই লিখতে পড়তে শিখেছে। আমাদের বাড়ির জানলা দিয়ে তাকালে একটা সোনালী চুড়ো দেখা যায়। গির্জাটার নাম উস্পেনস্কি ক্যাথেড্রাল। এই ক্যাথেড্রালের পুরুত এ-বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

আমাকে শিখিয়েছিল আমার মামী নাতালিয়া। শান্ত ভীরু স্বভাব, মুখখানা ঠিক ছেলেমানুষের মতো, আর তার চোখদুটো এত স্বচ্ছ যে সেই চোখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে একেবারে তার মাথার পিছনদিকটা পর্যন্ত দেখে নেওয়া যায় যেন।

চুপ করে বসে নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগত আমার। মামীমা অস্বস্তি বোধ করত, চোখ কুঁচকিয়ে মাথা বেঁকিয়ে কথা বলত চাপা ফিস্‌ফিসানির মতো স্বরে।

'লক্ষ্মীটি, আমি যা বলছি বলো — "আমাদের পিতা যিনি হন..."'

'"যিনি হন" মানে কী?'

'চুপ, প্রশ্ন কোরো না।' চকিতে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মামীমা জবাব দিত, 'প্রশ্ন করলে কথাগুলো আরো গুলিয়ে ফেলবে। আমি যেমনটি বলছি, তেমনটি বলে যাও — "আমাদের পিতা..." কই, চুপ করে আছ যে?'

প্রশ্ন করলে কথাগুলো আরো গুলিয়ে ফেলব কেন, আমি তা কিছুতেই বুঝতে পারি না। আমার মনে হয়, 'যিনি হন' কথাগুলোর অন্য কিছু একটা গুপ্ত অর্থ আছে। আমি ইচ্ছা করে সঠিক কথাগুলো না বলে উল্‌টো-পাল্‌টা বলতে শুরু করি:

'"যিনি জন", "বিনি ধন"...'

মামীমার সাদা ধবধবে মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হত, যেন মামীমা আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। ধৈর্য না হারিয়ে আমার ভুল ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করত।

'না, তা নয়, আমি কী বলছি শোন — "যিনি হন..."'

কিন্তু আমার কাছে মামীমা এবং মামীমার মুখের কথা দুটোকেই জটিল বলে মনে হত। আমি রেগে উঠতাম আর তাই উপাসনার কথাগুলো আমার পক্ষে মনে রাখা আরো শক্ত হত।

একদিন দাদামশাই আমার সারা দিনের কাজের হিসেব নিতে বসলেন:

'এই যে লেক্সেই, আজ সারাটি দিন কী করেছ শুনি? শুধু খেলা হয়েছে — না? হুঃ, কপালটা যে-রকম ফুলে উঠেছে তা থেকেই বুঝতে পারছি। ওহে বাপু, খেলতে গিয়ে কপাল ফুলিয়ে আসাটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, সবাই পারে — কিন্তু লেখাপড়ার কদ্দুর? "আমাদের পিতা" উপাসনাটা শিখেছ?'

মামীমা ফিসফিস করে বলল, 'ওর মুখস্থ হতে একটু সময় লাগে।'

মুচকে হেসে আমার দাদামশাই লাল লাল ভুরুদুটো তুলে বললেন:

'তাই যদি হয় তো ওকে একটু উত্তম-মধ্যম দিতে হয়।'

'কিরে, তোর বাবার হাতে মাঝে মাঝে প্রহারেণ হত?' আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

দাদামশাই কী বলছেন বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে রইলাম।

আমার মা জবাব দিল, 'না, মাক্সিম কক্ষণো ছেলের গায়ে হাত তুলত না। আমাকেও বারণ করত।'

'কেন?'

'মাক্সিম বলত, মারধোর করে কাউকে কোনো কিছু শেখানো যায় না।'

ফুঁসে উঠে দাদামশাই স্পষ্টভাবে বললেন, 'মাক্সিমের আত্মা যেন শান্তি পায়। কিন্তু তবুও বলি, লোকটার কোনো বিষয়েই বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে ছিল না।'

দাদামশাইয়ের কথাগুলোতে আমি যে দুঃখিত হলাম, তা তিনি বুঝতে পারলেন।

'থাক্, আর ঠোঁট বাঁকাতে হবে না। বরং বুঝেশুনে চলতে চেষ্টা কোরো! দেখ না, আঙুটির জন্যে সাশকাকে এই শনিবার কেমন ধোলাই হয়।' কথাগুলো বলে তিনি নিজের মাথার লাল ও রুপোলি চুলগুলোকে হাত দিয়ে মসৃণ করতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ধোলাই মানে কী?'

সবাই হেসে উঠল। আমার দাদামশাই জবাব দিলেন, 'সবুর করো, নিজেই দেখতে পাবে এর মানে কী।'

ঘরের এক কোণে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আমি ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। ধোলাই দিতে হলে কাপড়চোপড়কে আলাদা আলাদা বাছাই করে ভাঁটিতে দিতে হয়। কিন্তু উত্তম-মধ্যম দেওয়া আর প্রহার দেওয়া বোধ হয় একই ব্যাপার। আচ্ছা, লোকে তো প্রহার দেয় কুকুর ঘোড়া আর বেড়ালকে। আস্ত্রাখানে পুলিস পারসিকদের ধরে প্রহার দেয়—এটা আমার নিজের চোখে দেখা। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের প্রহার দিতে আমি কাউকে দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, মামাদের অবশ্য মাঝে মাঝে দেখেছি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কপালে বা মাথার পিছনদিকে দু-একটা চাঁটি মারতে — কিন্তু যারা চাঁটি খায় তারা এতে বিশেষ কিছু মনে করে না। শুধু ব্যথার জায়গায় দু-একবার হাত বুলিয়েই ভুলে যায় ব্যাপারটা। মাঝে মাঝে আমি ওদের জিজ্ঞেস করি, ওরা ব্যথা পেয়েছে কিনা।

বুক ফুলিয়ে ওরা জবাব দেয়, 'উঁহু, কিচ্ছু ব্যথা লাগেনি।'

আঙুঠির বিখ্যাত ঘটনাটি আমি জানতাম। চা-পানের পর রাত্রের খাওয়া পর্যন্ত সময়টুকুতে আমার মামারা ও কারিগর সেলাই নিয়ে বসে। রঙ ছোপানো কাপড়ের টুকরোগুলো পর-পর জোড়া দিয়ে কার্ডবোর্ডের চাক্তি লাগিয়ে রাখে। সেদিন আধা-অন্ধ গ্রিগরিকে নিয়ে খানিকটা তামাসা করবার জন্যে মিখাইল-মামা একটা কাণ্ড করেছিল। ন-বছরের ভাইপোকে বলে, গ্রিগরির আঙুঠিটা মোমবাতির ওপরে ধরে গরম করতে। সেই কথা শুনে সাশা একজোড়া চিমটে দিয়ে আঙুঠিটাকে মোমবাতির শিখার ওপরে ধরে থাকে। তারপর যখন আঙুঠিটা তেতে লাল হয়ে ওঠে তখন সেটাকে গ্রিগরির পাশে রেখে দিয়ে লুকিয়ে থাকে চুল্লির পিছনে। ঠিক সেই সময়ে আমার দাদামশাই সেখানে আসেন এবং কাজ করবার জন্যে বসে গরম আঙুঠিটা তুলে নেন।

আমার মনে আছে, কিসের এত গণ্ডগোল জানবার জন্যে আমি ছুটে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম। দেখলাম, আমার দাদামশাই হাস্যকরভাবে দাপাদাপি করছেন আর পোড়া আঙ্গুলগুলো দিয়ে কান চেপে ধরে চিৎকার করছেন:

'কোন বেল্লিকের কাণ্ড এটা?'

মিখাইল-মামা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আঙুঠিটা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে আর ফুঁ দিচ্ছে; গ্রিগরির কোন দিকে খেয়াল নেই, আপন মনে সেলাই করে চলেছে — লম্বা লম্বা ছায়া এসে পড়েছে তার মাথার মস্ত টাকের ওপরে। ইয়াকভ-মামা ছুট্তে ছুট্তে এল, তারপর হাসি চাপবার জন্যে লুকিয়ে

রইল চুল্লির পিছনে। আমার দিদিমা পুলটিস দেবার জন্যে কাঁচা আলু বাটতে শুরু করলেন।

'ইয়াকভের ছেলে সাশকার কান্ড এটা,' হঠাৎ বলে উঠল মিখাইল-মামা।

'মিথ্যে কথা,' উনুনের পিছনে থেকে লাফিয়ে এসে বলল ইয়াকভ।

ওদিকে ঘরের এক কোণ থেকে ইয়াকভের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে:

'না বাবা, মিথ্যে বলছে! জেঠা নিজেই তো আমাকে আঙুঠিটা গরম করতে বলল!'

তারপর শুরু হয়ে গেল মামাদের মধ্যে ঝগড়া। আর সেই ঝগড়া শুনে আমার দাদামশাই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। আর একটি কথাও বললেন না, আঙ্গুলে পুলটিস লাগিয়ে বেরিয়ে এলেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

সকলে মিখাইল-মামাকেই দোষ দিতে লাগল। সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনে প্রশ্ন জাগল, মিখাইল-মামাকে এবার ধোলাই এবং প্রহার দেওয়া হবে কিনা। চা-পানের সময়ে প্রশ্নটা আমি জিজ্ঞেস করে বসলাম।

'তাই দেওয়াই তো উচিত।' আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন আমার দাদামশাই।

'শোনো ভারভারা, তোমার ওই কুকুরছানার মতো ছেলেকে যদি না সামলাও তাহলে ওর মুণ্ডুটা আমি ছিঁড়ে ফেলব।'

আমার মা জবাব দিল, 'ওর গায়ে একবার হাত তুলেই দেখ না!'

সকলে চুপ করে রইল।

আমার মা'র এই একটা ক্ষমতা আছে। ছোট দু-একটা কথাকে এমন প্রচণ্ড শক্তিতে ছুঁড়ে মারতে পারে যে অন্যরা পিছু হটে যায়।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, সবাই মা'কে ভয় করে চলে। এমন কি মা'র সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার দাদামশাইয়েরও গলার সুর বদলে যায়। অন্যদের সঙ্গে যে-ভাবে তিনি কথা বলেন, তার চেয়েও অনেক শান্তভাবে বলেন মা'র সঙ্গে। এতে আমি খুশি হতাম।

'আমার মা'র মতো ক্ষমতা আর কারও নেই।' মামাতো ভাইদের কাছে জাঁক করে বলতাম আমি।

আমার মামাতো ভাইরাও কথাটা অস্বীকার করত না।

কিন্তু তার পরের শনিবারের ঘটনায় আমার মা'র সম্পর্কে আমার সমস্ত ধারণা টলে উঠল।

শনিবারের আগেই আমিও একটা কাণ্ড করে বসলাম এবং নিজেই পড়ে গেলাম গণ্ডগোলের মধ্যে।

বড়রা যে-ভাবে কাপড়ের রং বদলায় তা দেখে আমি খুবই অবাক হতাম। হয়তো একটা হলদে কাপড়ের টুকরো নিয়ে কালো জলে ডোবায় আর সঙ্গে সঙ্গে কাপড়টা হয়ে ওঠে গাঢ় নীল — এই হচ্ছে 'বনজ নীল'। কিংবা হয়তো একটা ছাইরঙা কাপড় নিয়ে লাল্‌চে জলে ছুপিয়ে নেয় আর কাপড়টা হয়ে ওঠে টক্‌টকে লাল — এই হচ্ছে 'তুঁতে লাল'। কাজগুলো খুবই সহজ কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয় কিছুই বোঝা যায় না।

মনে মনে আমার খুবই ইচ্ছে ছিল, কাপড় রং করাটা একবার নিজে পরখ করে দেখি। ইয়াকভের ছেলে সাশার কাছে আমি মনের এই ইচ্ছা প্রকাশ করে বললাম। ছেলেটি বিনয়ী, গম্ভীর প্রকৃতির আর সব সময়ে বড়দের পিছনে ঘুর-ঘুর করে এবং বড়দের সব কাজে সাহায্য করতে চায়। ওর এই বুদ্ধি ও বাধ্য স্বভাবের জন্যে এক দাদামশাই বাদে আর সবাই প্রশংসা করে ওকে।

'দূর দূর, একেবারে তোষামুদে!' ছেলেটির দিকে অপছন্দের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাদামশাই বলেন।

ইয়াকভের ছেলে সাশার গায়ের রং কালো, হাড়-জিরজিরে শরীর, চোখদুটো কাঁকড়ার মত ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চাপা স্বরে তড়বড়িয়ে কথা বলে, অর্ধেক কথা মুখ দিয়ে বেরোয় আর অর্ধেক বেরোয় না, আর কথা বলতে বলতে এমনভাবে চোরের মত এদিক-ওদিক তাকায় যেন ছুটে পালিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দেবার মতলব আঁটছে। এমনিতে তার কটা চোখদুটো অনড় কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠলে মনে হয়, তার চোখের মণিদুটো পর্যন্ত কাঁপছে।

ওকে আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে মিখাইলের ছেলে সাশাকে অনেক বেশি ভালো লাগে — যদিও এই সাশার মধ্যে লক্ষণীয় কিছু নেই এবং একটু যেন হাবাগোবা ধরনের। সাশার স্বভাব শান্তশিষ্ট, মায়ের মতই দুটি বিষণ্ণ চোখ ও ভুবনজয়ী হাসি। ওর দাঁতগুলি ভারি বিশ্রী; মুখ থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর দুই সারি দাঁত গজিয়েছে উপরের মাড়িতে। এই দাঁতের পিছনেই সর্বক্ষণ লেগে থাকে ও, মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরে অনবরত শুধু চেষ্টা করে পিছনের দাঁতগুলোকে টেনেটুনে আল্‌গা করে তুলে ফেলা যায় কিনা। কেউ যদি আঙ্গুল দিয়ে ওর দাঁতগুলোকে পরখ

করতে চায়, তাহলেও ওর কোনো উচ্চবাচ্য নেই, বাধ্য ছেলের মত হাঁ করে। শুধু এইটুকু ছাড়া ওর মধ্যে আর কোনো বিশেষত্ব আমি খুঁজে পাইনি। বাড়ির মধ্যে মানুষ গিজ্‌গিজ করছে কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যেও ও যেন একা, ওকে দেখতে পাওয়া যায় কোনো একটা অন্ধকার কোণে হয়তো আপন মনে বসে আছে কিংবা জানলার ধারে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে সারাটা সন্ধ্যা। ওর পাশে বসলে বক্‌বক্‌ করতে হয় না, খুশিমত চুপচাপ থাকা যায়। জানলার ধারে ওর পাশটি ঘেঁষে বসে একটি কথাও না বলে পুরো এক ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া চলে। শুধু চেয়ে থাকা যায় — উস্পেনস্কি ক্যাথেড্রালের চারপাশে দাঁড়কাকগুলো চক্রাকারে উড়ছে আর সূর্যাস্তের লাল আভার পটভূমিতে ক্যাথেড্রালের সোনালী চূড়াগুলো উৎকীর্ণ লিপির মত অপরূপ হয়ে উঠেছে। পাখিগুলো অনেক উপরে উঠে যায়, আবার নিচে নেমে আসে, তারপর সহসা একসময়ে ম্লানায়মান আকাশে কালো একটি জাল বিস্তার করে অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে; পিছনে পড়ে থাকে এক সীমাহীন শূন্যতা। এই ধরনের দৃশ্যের দিকে চেয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে না; আনন্দে ও বিষণ্ণতায় বুকটা টনটন করে ওঠে।

এদিকে ইয়াকভ মামার ছেলে সাশার স্বভাবটা ঠিক উল্‌টো। বড়োদের মতো যে কোনো বিষয়ে যতক্ষণ খুশি চটকদার কথা বলতে পারে ও। কাপড়চোপড়ে রং করার বিদ্যে আয়ত্ত করবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব এ কথা জানতে পেরে ও আমাকে পরামর্শ দিতে এল। ও বলে যে ছুটির দিনে পাতবার জন্যে যে টেবিল-ঢাকনাটি দেরাজে আছে সেটিকে বার করে নিয়ে আমি গাঢ় নীল রঙে চুবিয়ে নিতে পারি।

'আমার তো মনে হয়, সাদা কাপড়ে সব রং যেমন ফোটে, এমন আর কোনো কিছুতে নয়। আমার এই কথাটি জেনে রাখ।' খুব ভারিক্কী চালে বলে ও।

সেই মস্ত টেবিল-ঢাকনাটা আমি টেনে বার করলাম, তারপর ছুটে গেলাম উঠোনে। গামলাতে গাঢ় নীল রং তৈরি করা ছিল, সেই গামলাতে সবেমাত্র ঢাকনাটার একটা প্রান্ত চুবিয়েছি এমন সময় ৎসিগানক একেবারে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আমার হাত থেকে টেবিল-ঢাকনাটা কেড়ে নিয়ে প্রকাণ্ড থাবার মতো দুই হাত দিয়ে নিঙড়াতে শুরু করল। আমার মামাতো ভাই অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাণ্ড দেখছিল, তার দিকে তাকিয়ে ৎসিগানক চেঁচিয়ে বলল:

'যাও তো, ছ্বটে গিয়ে ঠাকুমাকে ডেকে নিয়ে এস!'

তারপর উস্কখ্বস্ক চুলের কাল মাথাটা আমার দিকে ফিরিয়ে অর্থপ্বর্ণ দ্বষ্টিতে তাকিয়ে বলল:

'দেখ না, কেমন মজাটা টের পাবে।'

আমার দিদিমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন, তারপর চোখের সামনে এই কান্ড দেখে তাকিয়ে রইলেন হাঁ করে। এমন কি আমাকে হাস্যকরভাবে ধমক দিতে গিয়ে তাঁর চোখ দিয়ে দ্ব-এক ফোঁটা জল পর্যন্ত বেরিয়ে এল। তাঁব নিজস্ব অদ্ভুত ঢঙে তিনি আমাকে ধমক দিলেন:

'ওরে, বাঁধাকপির মতো কানওলা পাজিছোঁড়া, তোকে মেরে গ্বঁড়ো করে ছ্বঁড়ে ফেলা উচিত।'

তারপর তিনি ৎসিগানককে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন:

'ভানিয়া, ঠাকুরদার কানে ওঠাসনে যেন! আমি কাউকে টের পেতে দেব না, তাহলে আর কোনো গোলমাল হবে না...'

'আমার সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। বরং আপনি সাশাকে সাবধান করে দিন, ও যেন এ নিয়ে ফিস্‌ফাস না করে।' পরনের চিত্রবিচিত্র এপ্রনে হাত ম্বছতে ম্বছতে উদ্বিগ্ন স্বরে ভানিয়া জবাব দিল।

'ওর হাতে কিছ্ব পয়সা দিলেই ওর ম্বখ বন্ধ করা যাবে।' আমার হাত ধরে বাড়ির ভিতরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে দিদিমা বললেন।

শনিবার, সন্ধ্যা প্রার্থনা-সভার আগে, কে যেন আমাকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম, ঘরের ভিতরটা অন্ধকার ও চুপচাপ। মনে আছে, বাইরের দিকের এবং এই ঘর থেকে অন্যান্য ঘরে যাতায়াতের দরজাগ্বলো শক্ত করে আঁটা ছিল। জানলার বাইরে ঝিরঝিরে ব্বষ্টি ও কুয়াশাম্লান শারদ সন্ধ্যা। চুল্লির কালো ম্বখটার সামনে একটা বেঞ্চিতে অস্বাভাবিক রকমের ক্রুদ্ধ ম্বখে ৎসিগানক বসে আছে। আমার দাদামশাই দাঁড়িয়ে আছেন এক কোণের একটা গামলার কাছে, বার্চগাছের ডাল দিয়ে তৈরি লম্বা লম্বা বেতগ্বলোকে জল থেকে টেনে টেনে তুলছেন, বেতগ্বলোকে এক জায়গায় জড়ো করছেন আর তীক্ষ্ন শিস তুলে শপ্ শপ্ বেতের বাড়ি মারছেন হাওয়ায়। আমার দিদিমা ঘরের অন্ধকারে কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন যেন এবং জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে নস্যি নিতে নিতে বিড়বিড় করে বলছেন:

'পাষন্ড, এই কাজেই তোমার আনন্দ...'

রান্নাঘরের মাঝখানটিতে একটি চেয়ারে বসে আছে ইয়াকভের ছেলে সাশা। দুই হাতের মুঠি দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে বুড়ো ভিখিরির মত করুণ সুরে টেনে টেনে বলে চলেছে:

'যীশু খ্রীস্টের দোহাই, আমি এবারকার মতো মাপ চাইছি...'

মিখাইল-মামার ছেলে সাশা ও তার বোন খুঁটির মতো টান হয়ে চেয়ারের পিছনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

'আগে তোমার উপযুক্ত শাস্তি হোক, তারপরে মাপ করব।' একটা লম্বা ভিজে বেত মুঠোর মধ্যে টানতে টানতে দাদামশাই জবাব দেন। 'আচ্ছা বেশ, এবার প্যান্ট খোল।'

শান্তভাবে তিনি কথা বলেন। রান্নাঘরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার, ধোঁয়ায় কালো সিলিং — আর ঘরের মধ্যে এমন এক স্তব্ধতা যা ভোলা যায় না। আমার দাদামশাইয়ের কথা, নড়বড়ে আর কিচ্‌কিচ্‌-শব্দ-হওয়া চেয়ারের ওপরে ছেলেটির নড়াচড়া, আমার দিদিমার এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভর দিয়ে দাঁড়ানো — কোনো কিছুতেই ঘরের এই স্তব্ধতা ভঙ্গ হয় না।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় সাশা। প্যান্টটা খুলে হাঁটু পর্যন্ত নামায়, তারপর ঝুঁকে পড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় বেঞ্চির দিকে। ওর এই অবস্থা দেখে গা শির্‌শির্‌ করে ওঠে। আমারও হাঁটুদুটো কাঁপছে। কিন্তু তারপরের দৃশ্য আরো ভয়াবহ। অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো সাশা উপুড় হয়ে বেঞ্চির ওপরে শুয়ে পড়ে আর ভানিয়া একটা লম্বা তোয়ালে ওর বগলের তলা দিয়ে নিয়ে ঘাড়ের ওপরে বাঁধে শক্ত ভাবে। তাবপর হেলে ওর পায়ের কব্‌জিদুটো চেপে ধরে থাকে।

'লেক্সেই!' আমার দাদামশাই ডাকেন, 'সামনে এগিয়ে এস। কী হে, কথা কানে ঢুকছে না বুঝি? ধোলাই কাকে বলে জানতে চেয়েছিলে, এবার তা চোখের সামনে দেখতে পাবে। ভালো করে তাকিয়ে দেখ। এক!...'

অনুচ্চে হাত তুলে তিনি সাশার খোলা গায়ের ওপরে বেতের বাড়ি মারেন। ছেলেটি আর্তনাদ করে ওঠে।

দাদামশাই বলেন, 'বাড়াবাড়ি কোরো না। ওতে তোমার কিচ্ছু ব্যথা লাগেনি! তবে এবারে ব্যথা লাগবে!'

সপাং করে তিনি বেত চালান; সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চামড়া চাকা চাকা হয়ে ফুলে লাল দাগ হয়ে ওঠে। আর আমার মামাতো ভাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়।

'কেমন লাগছে?' গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার মতো আমার দাদামশাইয়ের হাতটা একবার ওপরে ওঠে, একবার নিচে নামে, আর তিনি প্রশ্ন করে চলেন, 'মিষ্টি লাগছে না বুঝি? এইবার বোঝ আঙুঠিতে হাত দিলে কী হয়!'

যতোবার তিনি হাত ওঠান, আমার মনে হয়, আমার বুকের মধ্যে থেকে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে ঠেলে উঠে আসে; আর যতোবার তিনি হাত নামান, আমার মনে হয়, আমিও পড়ে যাচ্ছি।

ভাঙা-ভাঙা চেরা গলায় সাশা চিৎকার করে চলেছে। কান পেতে শোনা যায় না।

'আর কক্ষণো এমন কাজ করব না-আ... টেবিল-ঢাকনার কথাটা আমি কি বলিনি... আমিই তো বলেছি...'

'আরেকজনের নামে লাগালেই তো আর নিজের দোষ কাটে না।' শান্তস্বরে দাদামশাই বলে চললেন — 'লাগানিভাঙানিরাই প্রথম মার খায়। আচ্ছা, এবারে টেবিল-ঢাকনাকে ধরা যাক্।'

আমার দিদিমা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যান।

'খবরদার বলছি! যতো বড় পাষণ্ডই তুমি হও না, কিছুতেই তোমাকে লেক্সেইয়ের গায়ে হাত তুলতে দেব না!'

দিদিমা দরজার ওপরে লাথি মারতে থাকেন আর চিৎকার করেন, 'ভারিয়া! ভারভারা!'

দাদামশাই ছুটে আসেন, ধাক্কা দিয়ে দিদিমাকে ফেলে দেন, তারপর আমাকে সাপটিয়ে ধরে বেঞ্চির দিকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চলেন। আমি তাঁর হাতের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে দিই, তাঁর লাল দাড়িটা ধরে টানি, তাঁর আঙ্গুল কামড়ে দিই। তিনি গাঁ গাঁ করে চিৎকার করে ওঠেন এবং আমাকে চেপে ধরে শেষ পর্যন্ত এনে ফেলেন বেঞ্চির ওপরে। আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যাই। মনে আছে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দাদামশাই তখন চিৎকার করছেন:

'বাঁধ্ শক্ত করে! খুন করব!'

আর মনে আছে আমার মা'র সাদা ফ্যাকাশে মুখখানি আর বড়ো বড়ো চোখদুটো। বেঞ্চির পাশে মা অনবরত ছুটোছুটি করছে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে:

'বাবা, এবার থাম... ছেড়ে দাও ওকে!'

দিদিমাকে প্রণাম জানিয়ে বলল অস্বাভাবিক গভীর স্বরে: 'আকুলিনা ইভানোভনা, আপনি যদি আমাদের একটু নাচ দেখান তো ভারি খুশি হই। মাক্সিম সাভাতেয়েভিচের সঙ্গে আপনি যেমন নাচতেন তেমনি আজও আপনাকে একটু নাচ দেখাতে অনুরোধ করছি।'

'তুমি কি পাগল হলে নাকি গ্রিগরি ইভানোভিচ? বলছ কি তুমি? কী লজ্জার কথা গো!' বলে হেসে উঠে দিদিমা আরো জড়োসড়ো হয়ে বসলেন — 'আমাকে নাচতে বলছ তুমি? আমি যদি এই বয়সে নাচতে শুরু করি লোকে হাসাহাসি করবে...'

কিন্তু ততোক্ষণে সবাই দিদিমাকে ধরে বসেছে, নাচতেই হবে। সকলের পীড়াপীড়ির মধ্যেই দিদিমা হঠাৎ একসময়ে তরুণী মেয়ের মতো উঠে দাঁড়ালেন। পরনের স্কার্টটা ঠিক করে নিয়ে, শিরদাঁড়া টান করে, ভারী মাথাটা পিছন দিকে ঝাঁকিয়ে নাচের ভঙ্গিতে মেঝের ওপর দিয়ে চলতে চলতে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'হাসুক, যে যতো খুশি হাসুক! কোথায় রে ইয়াকভ, সুর তোল্!'

ইয়াকভ-মামা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি। আধ-বোজা চোখে, পা ফাঁক করে বসে ধীর লয়ে সুর তুলল। একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল ৎসিগানক, তারপর লাফিয়ে উঠে এসে দিদিমার চারপাশে পাক দিতে দিতে শুরু করল লম্ফঝম্ফ। দিদিমা নিঃশব্দ সঞ্চারে মেঝের ওপরটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছেন, যেন ভেসে বেড়াচ্ছেন বাতাসে; লীলায়িত হাতের ভঙ্গি, উচ্চকিত ভুরু আর কালো চোখের দূরচারী দৃষ্টি। দিদিমাকে দেখে আমার কেন জানি হাসি পেয়ে গেল, হাসি চাপতে গিয়ে গলা দিয়ে একটা চাপা শব্দ করে ফেললাম। কিন্তু আর কেউ তাতে যোগ দিল না; গ্রিগরি তর্জনী তুলে আমাকে ধমক দিল, বয়স্করা রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

হাসতে হাসতে গ্রিগরি হাঁক দিল, 'সরে এস ইভান!' বাধ্য ছেলের মতো ৎসিগানক একপাশে সরে এসে চৌকাঠে বসে পড়ল। আর তখন চমৎকার ভরাট গলায় গান ধরল ইয়েভগেনিয়া-ধাই; গান গাইতে গাইতে তার গলার কণ্ঠমণিটা উঁচু হয়ে উঠেছে। গানটা এই:

> একটি দিনের নেই অবসর কাজের বোঝা ফেলি,
> নিথর বসে তরুণী চলে লেসের মালা বুনি,
> বিবশ হল শুকিয়ে আসা হাতের আঙুলগুলি,
> লালিমা কোথায় ফ্যাকাশে মুখখানি।

দিদিমাকে দেখে মনে হচ্ছে, এটা তাঁর নাচ নয়, ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে তিনি একটি গল্প বলে চলেছেন। এই তো অতি ধীর গতি, কী যেন একটা চিন্তা প্রকাশ পায়। শরীরটা এদিক-ওদিক দোলে। উত্তোলিত বাহুভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় চোখের দৃষ্টি। পায়ে পায়ে পথ খুঁজে দ্বিধা ভরে নড়েন। মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে যান থমকে। মুখটা কাঁপে আর ভুরু কুঁচকে থমথমে হয়ে ওঠে। আবার একেক সময়ে একটা দরদী ও অন্তরঙ্গ হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠে সমস্ত অঙ্গ। সরে দাঁড়ান একপাশে, যেন কোনো একজনের জন্যে পথ করে দিচ্ছেন। মাথা নিচু করে উৎকর্ণ হয়ে শোনেন কি যেন, একটা খুশির হাসিতে ধীরে ধীরে সারা মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তারপর এক সময়ে সহসা প্রচণ্ড উল্লাসে নেচে ওঠেন, একটা উদ্দাম ঘূর্ণিপাকে শরীরটা যেন আগের চেয়েও লম্বা ও ঋজু হয়ে ওঠে। উজ্জীবিত তারুণ্যের এই মুহূর্তটিতে তিনি এত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন যে কিছুতেই অন্য দিকে চোখ ফেরানো যায় না।

এদিকে সারাক্ষণ ইয়েভগেনিয়া-ধাই ফুঁ দেওয়ার মতো গেয়ে চলেছে:

রবিবারের উপাসনার পরে সময় থেকে
নাচল সে ভোরের আলো উঠল যখন ফুটে;
হায়গো পলক ফেলার আগেই সোমবার এল হেঁকে—
হৈচৈ আর ছুটির দিনটা কেমনে গেল কেটে।

নাচ শেষ হয়ে গেলে দিদিমা সামোভারের পাশে নিজের জায়গাটিতে এসে বসলেন। সবাই তাঁর নাচের প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু তিনি সকলের কথার প্রতিবাদ করলেন:

'থাক্, থাক্, হয়েছে! সত্যিকারের নাচ কাকে বলে তোমরা তা দেখনি।' মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো ঠিক করতে করতে তিনি বলে চললেন, 'তাহলে শোন তোমাদের একটি মেয়ের কথা বলি। আমি তখন থাকতাম বালাখ্‌নাতে, সেখানকারই মেয়ে। তার নাম কি, কোন্ বাড়ির মেয়ে সে, তা আমার মনে নেই। কিন্তু সে কেমন নাচে! হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হত। কিছুতেই চোখ ফেরানো যেত না—জল এসে যেত কারো কারো চোখে। শুধু চোখের দেখা, তাতেই মনে হত মন ভরে গেছে—এর চেয়ে বড়ো আনন্দ আর কিছুতে নেই। কী হিংসে করতাম মেয়েটাকে আমি পাপিনী!'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই খুব ভারিক্কি চালে বলল, 'নাচিয়ে আর গাইয়েরাই তো পৃথিবীর সেরা মানুষ।' তারপর রাজা ডেভিড সম্পর্কে একটা গান গাইতে শুরু করে দিল। ওদিকে ইয়াকভ-মামা ৎসিগানকের গলা জড়িয়ে ধরে বলছে, 'তোমার উচিত নাচ করা সরাইখানায়। তাহলে দেখবে, তোমার নাচ দেখবার জন্যে সবাই ভিড় করে আসবে।'

ৎসিগানক নালিশ জানায়, 'আমি গান গাইতে চাই। ভগবান যদি আমাকে গান গাইবার গলা দিতেন তাহলে সারা দিন সারা রাত শুধু গানই গাইতাম। দশটি বছর শুধু গানই গাইতাম আমি। গাইয়ে হবার জন্যে যদি আমাকে মঠের বাবাজী হয়েও থাকতে হয় তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

সবাই ভদ্‌কা খাচ্ছে, বিশেষ করে গ্রিগরি। দিদিমা গ্রিগরিকে গ্লাসের পর গ্লাস মদ ঢেলে দিচ্ছেন আর বার বার সাবধান করছেন, 'দেখো বাবা, বেশি খেও না যেন, একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে।'

গ্রিগরি গভীরভাবে জবাব দেয়, 'হলে হব — তাতে আর কি। দুনিয়াটাকে যথেষ্ট দেখে নিয়েছি, আর দেখার দরকার নেই।'

মদ খেয়ে গ্রিগরির নেশা হয় না। তবে আরো বেশি কথা বলতে শুরু করে। ভদ্‌কা টানছে আর অনবরত আমার সঙ্গে কথা বলে চলেছে — বলছে আমার বাবার কথা।

'বড়ো দরাজ দিল ছিল হে! আর আমার ছিল প্রাণের বন্ধু মাক্সিম সাভাতেয়েভিচ!'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দিদিমাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, 'আহা অনাথ বাছা রে!'

এসব কথা আমি সাগ্রহে শুনি আর উত্তেজনায় দম বন্ধ করে টান হয়ে বসে থাকি। একটা শান্ত বিষণ্ণতায় আবহাওয়া নিরন্ধ্র ও ভারী হয়ে ওঠে। বিষণ্ণতা ও আনন্দ একই সঙ্গে বাসা বাঁধে মানুষের মনে; একটি থেকে অপরটিকে কিছুতেই আলাদা করা যায় না। আর কখন যে একটির জায়গায় অপরটি এসে জুড়ে বসে তার হদিশ পাওয়া যায় না।

একদিন ইয়াকভ-মামার মদের নেশাটা তখনো ভালো করে চাপেনি, হঠাৎ সে গায়ের জামাটা ফালা ফালা করে ছিঁড়তে শুরু করে, মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আর সাদাটে গোঁফ ধরে টান দেয়, নাকে আর ঝুলে-পড়া ঠোঁটে খাম্‌চি কাটে — আর জলভরা চোখে ককিয়ে ওঠে:

'কেন? কেন এমন হয়?'

নিজের গালে, কপালে, বুকে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে:

'আমি একটা হতভাগা, কাপুরুষ, আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না... নরকেও স্থান হবে না আমার!'

'আহ-হা, ঠিক কথা, ঠিক তাই!' ভারী গলায় সায় দেয় গ্রিগরি।

আমার দিদিমা বলেন, 'ইয়াকভ, এবার একটু থাম্ বাছা তুই! ভগবান জানেন আমাদের কী শেখাতে হবে।' বলতে বলতে ছেলের হাতটা চেপে ধরেন; মদের নেশায় তাঁর অবস্থাও ঠিক স্বাভাবিক নেই।

মদ খেতে পেলে দিদিমার রূপ আরও খুলে যায়। হাসি-হাসি কালো চোখদুটো থেকে উষ্ণ আলোর ধারা ঝরে পড়ে সবার ওপরে, রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে দুই গালে, রুমাল নেড়ে নেড়ে হাওয়া খান আর জড়ানো গলায় সুর করে করে বলতে থাকেন:

'প্রভু, মঙ্গলময়, তোমার জগতে সবই কেমন চমৎকার! সবই কী ভালো!'

প্রাণের অন্তস্তল থেকে কথাটা বেরিয়ে আসে। আর এই হচ্ছে তাঁর সমস্ত জীবনের মূলমন্ত্র।

আমার বেপরোয়া প্রকৃতির মামাটিকে কাঁদতে ও হা-হুতাশ করতে দেখে সত্যিই অবাক হই। একদিন দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়াকভ-মামা এভাবে কাঁদে কেন আর কেনই বা এভাবে কপাল চাপড়ায়।

আমার প্রশ্ন শুনে যে সুরে দিদিমা জবাব দিলেন সেটা ঠিক তাঁর স্বাভাবিক সুর নয়; যেন তিনি একটু বিরক্ত হয়েছেন এমনি অনিচ্ছুক ভাবে বললেন, 'সব কথাই তোর জানা চাই দেখছি! কোনো সবুর সয় না— এসব ব্যাপারে নাক গলাবার ঢের সময় পড়ে আছে!'

একথা শুনে আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। কারখানায় গিয়ে ইভানকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। কিন্তু সেও জবাব দিতে চায় না, কারিগরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে শুধু নিঃশব্দে হাসে, আর আমাকে ঠেলে কারখানা থেকে বার করে দেয়।

বলে, 'বাস্, আর একটি কথাও নয়! এক্ষুণি যদি বেরিয়ে না যাও তো ধরে রঙের গামলায় চুবিয়ে দেব। তখন দেখবে, সারা গায়ে কেমন রঙদার সবুজ ফুটে বেরোয়।'

কারিগর একটা নিচু থ্যাবড়া উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে গামলা তৈরি করা হয়েছে উনুনটার ওপরে। মস্ত একটা কালো লাঠি দিয়ে

সে একটি গামলার ভিতরটা নাড়াচাড়া করছিল। মাঝে মাঝে সেই লাঠি তুলে ধরে আর তাকিয়ে থাকে তার থেকে ঝরে পড়া রঙিন জলের দিকে। উনুনে গনগনে আঁচ — আর তার আভা এসে পড়েছে কারিগরের চামড়ার এপ্রনে; পাদ্রীদের আলখাল্লার মতো চিত্রবিচিত্র সেই এপ্রন। গামলাগুলিতে রঙগোলা জল চিড়বিড় শব্দে বুদ্‌বুদ তুলে ফুটছে আর একটা ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। সেই গন্ধ দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বাইরের শীতার্ত উঠোনে।

লাল-লাল টস্‌টসে দুটি চোখ তুলে চশমার ফাঁক দিয়ে কারিগর তাকাল আমার দিকে, তারপর ইভানের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'চোখ নেই নাকি? দেখছ না উনুনে কাঠ দিতে হবে?'

কাঠ আনবার জন্যে ৎসিগানক ছুটে বেরিয়ে গেল। আর তখন লাল চন্দন-রঙের একটা বস্তার উপরে বসে গ্রিগরি ডাকল আমাকে।

'এদিকে শুনে যাও তো হে।' বলল সে।

আমাকে কোলের ওপরে বসাল; তার সিল্‌কের মতো ফুরফুরে আর নরম দাড়ির ছোঁয়া লাগছে আমার গালে। তারপর আমি তার মুখে যে-কথাগুলো শুনলাম তা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

'তোমার মামা পিটোতে পিটোতে তার বৌকে মেরে ফেলেছে। আর এখন তার বিবেক কোনো শান্তি পায় না। সব কথাই তোমার জেনে রাখা ভালো, বুঝেছ? আর হ্যাঁ, একটু চোখ খোলা রেখে চলাফেরা কোরো বাপু, নইলে কপালে দুঃখ আছে।'

দিদিমার মতো গ্রিগরির সঙ্গেও সহজেই কথা বলা যায় কিন্তু তার কথাগুলো শুনে গা শির-শির করে ওঠে। কালো চশমার ফাঁক দিয়ে যখন তাকায় সে, তখন মনে হয় যেন শরীরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

তেমনি শান্ত নির্বিকার গলায় সে বলে চলল, 'কেমন করে পিটোতে পিটোতে বৌটাকে মেরেই ফেলল? ব্যাপারটা হত এই রকম -- বৌয়ের সঙ্গে শুতে গিয়ে করত কি, বৌকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে জড়াতো — তারপর কিল, চড়, ঘুষি, লাথি। এমনি চলত রাতের পর রাত। শেষ পর্যন্ত মরেই গেল বৌটা। জিজ্ঞেস করো, এত মারপিট কেন বাপু? তা সে নিজেই বলতে পারত না।'

এক বোঝা কাঠ নিয়ে ঢুকল ইভান, তারপর আগুনের সামনে বসে

হাত গরম করতে লাগল। কিন্তু গ্রিগরি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আগের কথার জের টেনেই বলে যেতে লাগল:

'কেন মারপিট করত জান? হয়ত মনে মনে বুঝত যে বৌয়ের সঙ্গে ও টেক্কা দিতে পারবে না, তাই বৌয়ের ওপর ওর ছিল হিংসে। একটা কথা কি জান দাদু, কাশিরিনরা কোনো ভালো কিছু সহ্য করতে পারে না। ভালো কিছু দেখলেই ওদের হিংসে। কিন্তু সেই ভালোটুকু দেখে যে নিজেরা শিখতে পারবে তা নয়, তাই সেই ভালোটুকুর যাতে কোনো চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে সেই ব্যবস্থা করবে। তোমার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমার বাবার এ-বাড়িতে থাকতে কী হাল হয়েছিল। দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলে সবই জানতে পারবে। দিদিমা তোমার কাছে কিছু ঢাকবেন না। তোমার দিদিমা হচ্ছেন সত্যিকার খাঁটি মানুষ, ছলচাতুরী তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না, ছলচাতুরী বুঝতেও চান না। ঋষিতুল্য মানুষ তিনি। অবশ্য মাঝে মাঝে মদ খান বটে, নস্যি নিতেও ভালোবাসেন — তা হোক্। তুমি দাদু কক্ষণো তোমার দিদিমার কাছছাড়াটি হয়ো না যেন...'

গ্রিগরি আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। বিমূঢ় ও আতঙ্কিত হয়ে আমি উঠোনে চলে এলাম। অলিন্দে যাবার আগেই ভানিয়া এসে আমার নাগাল ধরল এবং আমার মাথার ওপর হাত রেখে কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ওকে তুমি ভয় কোরো না যেন — ভারি ভালো লোকটি। সোজাসুজি চোখ তুলে ওর চোখের দিকে তাকাবে — এইটুকুই ও চায়, এমনি ধরনের লোককেই ও পছন্দ করে।'

সমস্ত কিছু বড়ো অদ্ভুতভাবে উল্‌টেপাল্‌টে যাচ্ছে। অন্য কোনো ধরনের জীবনের সঙ্গে আমার এতদিন পরিচয় ছিল না। তবুও অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ে, আমার বাবা ও মা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবন কাটিয়েছেন। তাঁদের কথাবার্তা ও আমোদপ্রমোদের ধরন ছিল অন্য রকম। দুজনে পাশাপাশি বসেছেন, পাশাপাশি চলেছেন — তার মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল না। সন্ধ্যার সময়ে জানলার ধারে বসে দুজনে প্রাণখুলে হাসতেন আর মনের আনন্দে গান গাইতেন। সেই গান আর হাসি শুনে জানলার নিচে লোক জড়ো হয়ে যেত। আমার মনে আছে, জানলার নিচে দাঁড়িয়ে যারা মাথা উঁচু করে তাকিয়ে থাকত তাদের দেখে কেন জানি অদ্ভুত একটা ধারণা আসত আমার মনে। মনে হত যেন খাওয়াদাওয়ার পরে কার এ'টো বাসনপত্র। আর এখানে ঠিক উল্‌টো ব্যাপার। এখানে মানুষ কদাচিৎ হাসে; আর যদিও বা হাসে, তা

অতি রহস্যময়, তার অর্থ বোঝা সর্বদা যায় না। সারাক্ষণ গালিগালাজ, হুমকি, শাসানি, ফিসফাস। বাচ্চারা চুপচাপ থাকে, তাদের দিকে কারও নজর নেই। আর বৃষ্টির সময়ে ধুলোর মতো তাদেরও মারতে মারতে মিশিয়ে ফেলা হয় মাটির সঙ্গে। এই বাড়ির সঙ্গে আমি কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না। চারদিককার এই জীবন হাজারটা সুচের মতো অনবরত আমাকে বিঁধছে। আমি সবকিছুকে সন্দেহের চোখে দেখছি আর চোখ-কান খাড়া করে সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি সবকিছু।

ইভানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেড়ে চলল। সূর্যোদয় থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত আমার দিদিমা সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং সারাটি দিন আমার কাটে ৎসিগানকের পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করে। যখনই আমার দাদামশাই আমাকে উত্তম-মধ্যম দিতে শুরু করেন তখনই রীতিমত ৎসিগানক নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে চলে এবং পরদিন নিজের ফুলে-ওঠা আঙুলগুলো আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে নালিশ জানায়, 'দূর দূর! তোমাকে আর কোনোদিন আমি বাঁচাতে চেষ্টা করব না। দেখ তো, আমার কী অবস্থা হয়েছে! এই কিন্তু শেষবার বলে রাখলাম। পরের বার থেকে যা কপালে আছে তোমাকেই ভুগতে হবে!'

কিন্তু দেখা যায়, পরের বারেও আমার প্রাপ্য শাস্তি সে অনর্থক হাত পেতে নিচ্ছে।

'কী, বলেছিলে না যে তুমি আর এর মধ্যে নেই?'

'কথা আর কাজ তো এক জিনিস নয় — কখন যে আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি নিজেই টের পাইনি।'

কিছুদিনের মধ্যেই ৎসিগানক সম্পর্কে আরও কিছু খবর আমি জানতে পারলাম। শুনে ওর প্রতি আমার আগ্রহ ও আনুগত্য আরও বেড়ে গেল।

প্রতি শুক্রবার ৎসিগানক বাজারে যায় সপ্তাহের খাবার কিনে আনবার জন্যে। কটা-লালরঙের ঘোড়া শারাপকে জুড়ে দেওয়া হয় চওড়া স্লেজগাড়িটার সঙ্গে (শারাপটা অত্যন্ত ধূর্ত ও বেয়াড়া জাতের ঘোড়া, মিষ্টি খুবই পছন্দ করে — আমার দিদিমার ভারি আদরের)। মস্ত একটা টুপি মাথায় দেয় ৎসিগানক, খাটো ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরে, কোমরে শক্ত করে আঁটে সবুজ রঙের উড়ুনী। কোনো কোনো বার বাজারে গিয়ে অনেক দেরি হয় ফিরতে। আর তখন ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করে সবাই, বারবার জানলার

কাছে যায়, তুষারঢাকা জানলার শার্সিতে ভাপ দিয়ে একটু সাফ করে নেয় আর তাকিয়ে দেখে রাস্তার দিকে।

'কী, আসছে?'

'দেখতে পাচ্ছি না তো।'

দুশ্চিন্তাটা আমার দিদিমারই সবচেয়ে বেশি। স্বামী আর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'পোড়া কপাল আমার! তোমাদের জন্যেই এই ভালো মানুষটা আর ভালো ঘোড়াটা মরবে! নির্লজ্জ বেহায়ার দল! তোমাদের কি বিবেক বলেও কিছু নেই? কেন রে বাপু, নিজেদের যা আছে তা নিয়েই খুশি থাকলেই হয়! বোকা গুষ্টি! হ্যাংলার দল! দেখ না, এজন্যে ভগবানের কী শাস্তি তোমাদের পেতে হয়!'

দাদামশাই চোখ কুঁচকিয়ে বিড়বিড় করে বলেন:

'আচ্ছা, আচ্ছা, আর পাঠাব না... এই শেষবার...'

কোনো কোনো বার দুপুর গড়িয়ে যাবার পরে ৎসিগানক ফিরে আসে। উঠোনে গাড়ি ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন আমার দাদামশাই ও মামারা। পিছনে পিছনে আসেন দিদিমা। ফোঁস ফোঁস করে নস্যি টানেন আর ভল্লুকের মতো এগিয়ে আসেন। যে জন্যেই হোক্, এই সময়টিতে তাঁর মধ্যে কেমন যেন একটু এলোমেলো ভাব দেখা যায়। বাচ্চারা ছুট্‌তে ছুট্‌তে বেরিয়ে আসে আর তারপরে শুরু হয় মহা উল্লাসে স্লেজগাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামান। জিনিসপত্রে ঠাসা গাড়িটা; আস্ত আস্ত শুয়োরছানা, মাছ আর ছোটবড়ো নানা আকারের মাংসের টুকরো।

ছোট কুতকুতে চোখ দিয়ে স্লেজগাড়িটাকে ভালো করে দেখে নিয়ে দাদামশাই জিজ্ঞেস করেন, 'কী হে, যা যা আনতে বলেছিলাম এনেছ তো সব?'

আনন্দে উঠোনের চারদিকে লাফাতে লাফাতে ইভান জবাব দেয়, 'সব এনেছি, একটি জিনিসও বাদ পড়েনি।' হাতদুটোকে গরম করবার জন্যে দস্তানা না খুলেই হাতে হাত ঘষে সশব্দে।

দাদামশাই কড়া স্বরে ধমক দিয়ে ওঠেন, 'দস্তানা শুদ্ধ হাত ওভাবে ঘষাঘষি কোরো না — দস্তানা কিনতে পয়সা লাগে। খুচরা কিছু ফেরৎ এনেছ?'

'না।'

আমার দাদামশাই স্লেজগাড়িটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখেন আর বিড়বিড় করে বলেন:

'কী হে, মনে হচ্ছে একেবারে বাজার উজাড় করে জিনিসপত্র এনেছ?

তাই তো, এত কেনাকাটার সবই কি আর বিনে পয়সায় হয়েছে? তোমায় বলে রাখছি বাপু আর যেন এমনটি না হয়।'

মুখটাকে বিকৃত করে তিনি তাড়াতাড়ি চলে যান।

তারপর মামারা স্লেজগাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়ায়। আহ্লাদে আটখানা হয়ে মুরগী, মাছ, মেটে, বাছুরের ঠ্যাঙ আর বড়ো বড়ো মাংসের টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর কোনটার কত ওজন হতে পারে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলে।

'বাঃ, চমৎকার বাছাই করেছ কিন্তু — বেশ, বেশ!' তারিফ করার ভঙ্গিতে চিৎকার করে আর শিস দেয়।

বিশেষ করে আমার মামা মিখাইল একেবারে গদ্‌গদ হয়ে ওঠে। স্লেজগাড়িটার চারপাশে এমন লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে যেন তার পায়ে স্প্রিং লাগানো আছে। কাঠঠোক্‌রার মতো নাক উঁচু করে শুঁকে শুঁকে দেখে, ঠোঁট চাটে, আবেশে মুদে আসে তার চঞ্চল চোখদুটো। লোকটির শুকনো চেহারা তার বাপের মতো, তবে লম্বায় বেশি আর পোড়া কাঠের মতো কালো।

'বুড়ো কত দিয়েছিল বাজার করতে?'

'পাঁচ রুবল।'

'আর এখানে যা জিনিস আছে তার দাম অন্তত পনেরো রুবল। কত খরচ হয়েছে তোমার?'

'চার রুবল দশ কোপেক।'

'তার মানে নব্বই কোপেক্ ফেরৎ নিয়ে এসেছ — নয় কি? শুনছ তো ইয়াকভ? এও একটা পয়সা আয়ের রাস্তা।'

ইয়াকভ-মামা আল্‌তোভাবে হাসে। শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকে আর শীতল ঝাপ্‌সা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্‌পিট করে।

'তবে আর কী ভানিয়া, আমাদের এক গেলাশ করে খাইয়ে দাও হে!' টেনে টেনে বলে সে।

দিদিমা, ঘোড়ার লাগাম খুলে দিয়েছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন: 'লক্ষ্মী সোনা আমার, বাছা আমার! ওহো, বুঝেছি, একটু খেলা করতে ইচ্ছে হচ্ছে? তাতে আর কী হয়েছে — যাও, যাও, একটু খেলা করে এসো... একটু-আধটু খেলা করলে কোনো দোষ নেই, ওতে ভগবান রাগ করেন না...'

তখন সেই প্রকাণ্ড শারাপ ঘোড়া তার কেশর দুলিয়ে সাদা সাদা দাঁত বার করে দিদিমার ঘাড়ের ওপর আঁচড় দিতে থাকে। টেনে খুলে ফেলে দিদিমার মাথার সিল্‌কের রুমাল। খুশিভরা চোখে তাকিয়ে থাকে দিদিমার চোখের দিকে। আর মৃদু হ্রেষা তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের পাতা থেকে তুষারের কণাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে।

'এক টুকরো রুটি খেতে চাও বুঝি যাদুমণি?' দিদিমা জিজ্ঞেস করেন আর তারপর চমৎকার ভাবে নুন মাখিয়ে মস্ত একটা রুটির টুকরো গুঁজে দেন ঘোড়ার দাঁতের ফাঁকে। ঘোড়াটা রুটি চিবোয় আর ওর মুখের তলায় এপ্রনটা মেলে ধরে তিনি তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন।

বাচ্চা ঘোড়ার মতোই তড়বড়িয়ে লাফাতে লাফাতে এসে ৎসিগানক বলে, 'ঠাক্‌মা, কী সুন্দর ঘোড়াটা — না? আর কী বুদ্ধিমান!'

'যা, যা, সরে যা এখান থেকে, খবরদার, এখানে ঘুরঘুর করবি না!' মাটিতে সজোরে পা ফেলে দিদিমা চিৎকার করে ওঠেন, 'তোকে বলেছি না যে হাটের দিনগুলোতে তোকে পছন্দ করি না!'

পরে দিদিমা আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন। ৎসিগানক বাজারে গিয়ে যতোটা না কেনাকাটি করে তার চেয়ে বেশি করে চুরি।

রুষ্ট স্বরে তিনি বললেন, 'এই ধর্‌, তোর দাদামশাই যদি ওকে পাঁচ রুবলের নোট দেয় তাহলে ও করে কি, তিন রুবল খরচ করে আর দশ রুবল দামের জিনিস চুরি করে আনে। হতচ্ছাড়াটার যেন চুরি করতে ভালো লাগে। প্রথমবার হয়তো এমনি করেছিল — হাতসাফাইটা ঠিকমতো লেগে যায়... ফিরে আসার পরে সবার কী নাচানাচি আর সে কী গুণকীর্তন... তারপর থেকে এটা ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর তোর দাদামশাইয়ের ব্যাপারটা কি জানিস, সারা জীবনটা এমন অভাব-অনটনের মধ্যে কাটিয়েছে যে এখন এই বুড়ো বয়সে হাত দিয়ে কিছুতেই পয়সা গলতে চায় না। ছেলেমেয়েদের চেয়েও পয়সার ওপরে টান বেশি। কাজেই, পয়সা খরচ করতে হয় না অথচ জিনিস আসে এতে তোর দাদামশাই ভারি খুশি। আর মিখাইল ও ইয়াকভের কথা যদি বলিস...'

হাত নেড়ে দুজনকেই তিনি বাতিল করে দেন, তারপর নস্যির কৌটোর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলে চলেন:

'আলিওশা, এ যেন এক অন্ধ বুড়ীর হাতে বোনা একটা ফিতে — আগাগোড়া জট্‌ পাকিয়ে গেছে, আসল নক্‌শাটা কিছুতেই চেনা যায় না।

তবু জানো, একবার যদি ভানিয়া চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে মারতে মারতে ওকে খুন করে ফেলবে...'

আবার কিছুক্ষণের জন্যে দিদিমা চুপ করে থাকেন, তারপর আবার যখন তিনি কথা বলেন তখন তাঁর গলার স্বর অত্যন্ত নরম ও মৃদু শোনায়:

'ভাব দিকিনি আলিওশা, নীতিকথা তো অনেক কিছু আছে কিন্তু নীতিবোধের বেলা সব ফাঁকা...'

পরের দিন আমি ৎসিগানকের হাতেপায়ে ধরে তাকে চুরি করতে বারণ করলাম। 'যদি ধরা পড়ো তো মারতে মারতে তোমাকে খুন করে ফেলবে...'

'ইস্, আমাকে ধরতে পারলে তো — আমি ঠিক পালিয়ে যাব... আমি তো চালাক আর আমার ঘোড়াও যথেষ্ট জোরে ছুট্তে পারে।' বলে ও হেসে উঠল; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসিটাকে গ্রাস করল একটা গম্ভীর বিমর্ষ ভাব, বলল, 'তুমি কি ভাবছ আমি জানি না, আমি জানি, চুরি করাটা অন্যায়, বিপজ্জনক। তবু আমি চুরি করি শুধু এতেই আমি খুশি। ভাবছ, চুরি করে যা দু-একটা পয়সা আমার হাতে আসে তা আমি জমাই — কক্ষণো না। এই যে তোমার মামারা আছে, তারাই সপ্তাহখানেকের মধ্যে সব পয়সা উড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমার তাতে বয়েই গেছে — ওরা যতো পারে নিক। খাবার ভাবনা আমার নেই।'

হঠাৎ সে আমাকে দু-হাতে তুলে নিয়ে অল্প একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল:

'তোমার শরীরটা রোগা আর হাল্কা বটে কিন্তু হাড়গুলো শক্ত আছে। দেখবে, বড়ো হলে তাগ্ড়া জোয়ান চেহারা হবে তোমার। আমি একটা কথা বলছি শোন, গীটার বাজাতে শেখো — ইয়াকভ-মামাকে বলো তোমাকে শেখাতে — ঠাট্টা নয়! অবশ্য আরেকটু বড়োসড়ো না হলে সুবিধে হয় না, তুমি একেবারেই বাচ্চা! কিন্তু বাচ্চা হলেও সত্যিকার মেজাজ তোমার আছে! আচ্ছা, তোমার ঐ দাদামশাই লোকটিকে তুমি পছন্দ করো না? কী বলো?'

'জানি না।'

'এক ঠাক্‌মা ছাড়া এই কাশিরিনদের মধ্যে একটা লোকও ভালো নেই। লোকগুলোকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না — শয়তানের ঝাড় সবকটা!'

'আর আমি?'

'তুমি তো আর কাশিরিন নও। তুমি হচ্ছ পেশ্‌কভ। পেশ্‌কভরা হচ্ছে একেবারে আলাদা একটা পরিবার, আলাদা একটা বংশ।'

হঠাৎ সে আমাকে দু-হাতে চেপে ধরে প্রায় কান্নার মতো ফুঁপিয়ে উঠল:

'হা ঈশ্বর, আমার যদি গান গাইবার ক্ষমতা থাকত! তাহলে গান গেয়ে লোকের মন গলিয়ে দিতে পারতাম! আচ্ছা ভাই, চলি। এবার কাজ শুরু করতে হবে।'

আমাকে সে মেঝের ওপরে নামিয়ে দিল। তারপর একমুঠো ছোট পেরেক মুখে পুরে লেগে গেল কাজে। মস্ত একটা চৌকো তক্তার ওপরে ভিজে কালো একটা কাপড়ের টুকরো পেরেক ঠুকে ঠুকে লাগিয়ে চলল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ৎসিগানক মারা যায়।

ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে: গেটের কাছে উঠোনের বেড়ার গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে মস্ত এক ওক্‌কাঠের ক্রুশ রাখা ছিল। ক্রুশের তলার দিকটা থামের মতো ভারী ও মোটা। অনেক দিন ধরে পড়ে ছিল ওটা। আমার মনে আছে, আমি যখন প্রথম এ-বাড়িতে আসি তখন থেকেই এই ক্রুশটা দেখছি। তখন অবশ্য নতুন অবস্থায় ছিল, গায়ের হল্‌দে রঙ চটে যায়নি -- আর এখন সারা শরৎকালের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে রঙটা কাল্‌চে হয়ে গেছে আর রোদজলে পোক্ত করা ওক্‌কাঠের ঝাঁঝালো একটা গন্ধ ছাড়ছে আমাদের ময়লা, নানা হাবিজাবি জিনিসে ঠাসা উঠোনটায় — তর মধ্যে ক্রুশটা ভারি অসুবিধের সৃষ্টি করত।

ক্রুশটা কিনে এনেছিল ইয়াকভ-মামা, বৌয়ের কবরের ওপরে বসাবার জন্যে। প্রতিজ্ঞা করেছিল বৌয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে নিজেই এই ক্রুশটা সমাধিস্থানে বয়ে নিয়ে যাবে।

শীতকালের শুরুতে এক শনিবারে পড়ল এই মৃত্যুবার্ষিকী। দিনটা ঠাণ্ডা, ঝোড়ো বাতাস বইছে, বাড়ির ছাদের ওপর থেকে বরফের টুকরো উড়ে উড়ে আসছে বাতাসে। মৃতের জন্য উপাসনায় যোগ দিতে আমার দিদিমা ও দাদামশাই তিনজন নাতিনাতনীকে নিয়ে গাড়িতে চেপে আগেই চলে গেলেন সমাধিস্থানের দিকে। অন্যেরা এসে দাঁড়াল উঠোনে। আমি যেন কী একটা দোষ করেছিলাম। তার শাস্তি হিসেবে আমাকে বাড়িতে আটক থাকতে হল।

আমার মামারা সবাই একই ধরনের কালো কোট পরেছে। দুজনে মিলে ধরাধরি করে ক্রুশটার একটা হাতল চাপিয়ে দিল ইয়াকভের ঘাড়ে, অন্য

হাতলটা মিখাইলের ঘাড়ে। গ্রিগরি এবং আর একজন অপরিচিত লোক অতি কষ্টে ক্রুশের থামের মতো তলাটা তুলে চাপিয়ে দিল ৎসিগানকের চওড়া কাঁধের ওপরে। ভারী জিনিসটা কাঁধে নিয়ে ৎসিগানক একবার টলে উঠল, তারপর দুটো পা ফাঁক করে কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে।

'কী হে, পারবে তো?' জিজ্ঞেস করল গ্রিগরি।

'কী জানি, বুঝতে পারছি না। ভয়ানক ভারী।'

মিখাইল-মামা ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফটক খোল্ না চোখ-কানা হতভাগা!'

ইয়াকভ-মামা বলল, 'কী লজ্জার কথা ভানিয়া তুমি বলছ — ভারী! অথচ আমরা তো দুজনেই তোমার তুলনায় রোগাপট্‌কা — আমরা তো নিয়ে চলেছি।'

কিন্তু গ্রিগরি ফটক খুলে দিয়ে ইভানের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় ধমক দিল: 'খবরদার বলছি! বেশি গায়ের জোর ফলাতে যেও না। ভগবান তোমাদের সহায় হোন!'

'ওরে টেকো বুড়ো শয়তান!' রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে উঠল মিখাইল-মামা।

উঠোনে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা সবাই হেসে উঠল আর জোরে জোরে কথা বলতে লাগল। ক্রুশটা যে এতদিনে নড়ানো গেছে এতে যেন সবাই খুশি।

আমার হাত ধরে আমাকে কারখানার ভিতরে নিয়ে এল গ্রিগরি। বলল, 'তোমার দাদামশাই হয়তো আজ আর তোমাকে মারবে না — মনে হচ্ছে আজকে তার মেজাজটা খুবই ভালো আছে।'

এক রাশি পশম জড়ো করা ছিল, তার ওপরে আমাকে বসিয়ে দিয়ে সযত্নে আমার সারা গায়ে পশম জড়িয়ে সে কথা বলতে লাগল। গামলা থেকে ফুটন্ত রঙের ধোঁয়া উঠছে আর সেই ধোঁয়া শুঁকতে শুঁকতে চিন্তাভারগ্রস্ত সুরে পুরনো দিনের কথা বলছে সে:

'জান দাদু, তোমার দাদামশাইকে আমি সাঁইত্রিশ বছর ধরে চিনি। এই ব্যবসা যখন শুরু হয় তখনো আমি ছিলাম আর এখন এই ব্যবসার শেষ অবস্থা — এখনো আমি আছি। সেকালে আমরা দুজনে ছিলাম সত্যিকার বন্ধু — একসঙ্গে ব্যবসা করতাম, একসঙ্গে ব্যবসার কথা ভাবতাম। ভারি চালাক-চতুর লোক তোমার এই দাদামশাই। দেখছ তো, সে এখানকার কর্তা

হয়ে বসেছে — আমার সাধ্য কি তার সঙ্গে টেক্কা দিই। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে কে টেক্কা দেবে বলো? ভগবানের কাছে মানুষ তো শিশু — তিনি যদি শুধু একটু হাসেন, তাহলেও সেই হাসির সামনে পৃথিবীর সেরা বুদ্ধিমান লোক বোকার মতো দাঁড়িয়ে চোখ পিট্‌পিট করবে। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার তোমার কিছু জানা নেই — কিন্তু আমার মনে হয়, সব কথা তোমার জেনে রাখাই ভালো। বাপ-মরা ছেলেকে জীবনে অনেক ঝক্কি পোয়াতে হয় কিনা। তোমার বাবা মাক্সিম সাভাতেয়েভিচ ছিল সত্যিকার খাঁটি মানুষ; সবকিছু সে বুঝত। আর এইজন্যেই তোমার দাদামশাই তাকে পছন্দ করত না, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি...'

দরদী কথাগুলো শুনতে আমার ভারি ভালো লাগছিল — এইভাবে চুপ করে বসে থাকা আর এই ধরনের কথা শোনা, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা — উনুনের ওপরে লাল্‌চে সোনালী আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে, গামলাগুলো থেকে দুধালো সাদা মেঘের মতো উঠছে বাষ্প আর ঢালু ছাদের তক্তার গায়ে আটকে গিয়ে জমে জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। তক্তার ফাঁকগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফিতের মতো টুকরো টুকরো নীল আকাশ। বাতাস শান্ত হয়েছে, ঝক্‌ঝক করছে সূর্যের আলো, উঠোনের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন ঘষা কাঁচের টুক্‌রো ছড়ানো রয়েছে চারদিকে। রাস্তা থেকে শোনা যায় বরফকে ভেঙে গুঁড়িয়ে স্লেজগাড়ি টেনে নিয়ে যাবার শব্দ। চারদিকের বাড়ির চিম্‌নি থেকে নীল ধোঁয়া উঠছে পাক খেয়ে খেয়ে। বরফের ওপরে হাল্‌কা ছায়া পড়ে, দ্রুত সরে তারা — তারাও যেন বলছে তাদের গল্প।

চ্যাঙা রোগা চেহারা গ্রিগরির। লম্বা দাড়ি, প্রকাণ্ড কান। মাথায় টুপি নেই, খোলা মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গামলায় ফুটন্ত রঙ মেশাচ্ছে। দেখে মনে হয়, এক পরদুঃখকাতর যাদুকর দাঁড়িয়ে আছে সামনে আর আমাকে নানা উপদেশ দিচ্ছে:

'সোজাসুজি তাকাবে মানুষের চোখের দিকে। তাহলে দেখো, কুকুর তাড়া করলে সেও পালাবে ল্যাজ গুটিয়ে...'

তার চশমার পুরু কাঁচদুটো নাকের ওপর চেপে বসেছে, ফলে দিদিমার নাকের মতো তার নাকও নীল হয়ে উঠেছে।

'কী হল?' হঠাৎ থেমে গিয়ে সে বলল। এক মুহূর্ত শুনল কান পেতে, তারপর পা দিয়ে বন্ধ করে দিল চুল্লির দরজা আর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট্‌ল উঠোনের দিকে। পিছন পিছন আমিও ছুটলাম।

রান্নাঘরের মেঝের মাঝে বরাবর ৎসিগানক চিত হয়ে পড়ে আছে। জানলা দিয়ে গলে দুটো চওড়া আলোর ধারা এসেছে ঘরের মধ্যে — একটা পড়েছে তার মাথায় আর বুকে, আরেকটা পায়ে। অদ্ভুত একটা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার কপাল থেকে, উৎক্ষিপ্ত ভুরু, বাঁকা চোখদুটো তাকিয়ে আছে ঝুলকালিমাখা ছাদের দিকে। কালো ঠোঁটদুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে আর লাল্‌চে ফেনা বেরিয়ে আসছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে রক্ত, রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে তার কাঁধের ওপর দিয়ে মেঝে পর্যন্ত আর প্রচুর রক্ত ধারা বেরিয়ে আসছে তার শরীরের তলা থেকে। দুমড়ে বেঁকে আছে পা দুটো; তার পরনের ঢিলে প্যাণ্ট লেপ্‌টে রয়েছে মেঝের সঙ্গে, বোঝা যায় প্যাণ্টটা ভিজে সপ্‌সপে। ঘরের মেঝে বালি দিয়ে ঘষে ঘষে এমন পরিষ্কার করা হয়েছিল যে এখন চক্‌চক করছে সূর্যের আলোয়। রক্তের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে; সূর্যের আলোর সীমানাটুকু পার হবার সময় ঝলসে উঠে, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

ৎসিগানকের শরীরটা স্থির, অনড়। শুধু নড়ছে তার প্রসারিত হাতের আঙুলগুলো। মেঝেটাকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে সেই আঙুলগুলো — রঙের ছোপ-লাগা নখগুলোর ওপরে সূর্যের আলো পড়ে চক্‌চক করছে।

ইয়েভগেনিয়া-ধাই ইভানের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তার হাতে একটা মোমবাতি দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ইভান মোমবাতিটাকে ধরতে পারছে না। মোমবাতিটা তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে রক্তে নিভে গেল তার শিখা। ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার তুলে নিল মোমবাতিটা, ভালো করে রক্ত মুছে নিয়ে আবার চেষ্টা করল ইভানের অস্থির আঙুলগুলোর মুঠোয় ধরিয়ে দিতে। চাপা উত্তেজনার একটা ঢেউ রান্নাঘরের ভিতরে ফুঁসে উঠছে যেন। এই ঢেউ প্রচণ্ড একটা ঝাপ্‌টার মতো আমাকে দরজার চৌকাঠ থেকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল কিন্তু আমি দরজার বাজু শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে রইলাম।

'মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে।' মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেমন যেন নিষ্প্রাণ গলায় ইয়াকভ-মামা বলল। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ভাঁজ পড়েছে মুখের চারদিকে। নিষ্প্রাণ চোখদুটো অনবরত পিট্‌পিট করছে।

'ও পড়ে গেল আর ক্রুশটা পড়ল ওর পিঠের ওপরে — একেবারে পিষে ফেলেছে। আমরা যদি সময়মত ক্রুশ ছেড়ে দিয়ে সরে না দাঁড়াতাম তাহলে আমাদেরও পিষে ফেলত।'

ভাঙা-ভাঙা গলায় গ্রিগরি বলে উঠল, 'ওকে পিষে মারবার জন্যে তোমরা ইচ্ছে করে এ কাজ করেছ!'

'বললেই হল আর কি! আমরা কী করে...'

'হ্যাঁ, তোমরা!'

রক্ত গড়াচ্ছে। দরজার কাছে ইতিমধ্যেই একটা পুকুর হয়ে গেছে রক্তের। টক্‌টকে লাল রঙটা কাল্‌চে হয়ে গেছে আর ফুলে ফুলে উঠছে যেন। ৎসিগানক তেমনিভাবে পড়ে আছে, ঘুমের ঘোরে থাকার মতো ঘড়ঘড় শব্দ বেরচ্ছে গলা থেকে আর মুখ থেকে লাল্‌চে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। শরীরটা গলে যাচ্ছে একটু একটু করে, চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, মেঝের সঙ্গে মিলিয়ে যাবার মতো এক হয়ে যাচ্ছে।

চাপা স্বরে ইয়াকভ-মামা বলল, 'বাবাকে ডেকে আনবার জন্যে মিখাইল ঘোড়ায় চেপে গির্জায় গেছে। আর আমি একটা দ্রশ্‌কিতে ওকে চাপিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে এসেছি... বাবাঃ, ক্রুশের তলার দিকটা নিলেই হয়েছিল আর কি... তাহলে এতক্ষণে আমারও ওই অবস্থা হত...'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার মোমবাতিটা নিয়ে ৎসিগানকের হাতের মধ্যে দিল। ফোঁটা ফোঁটা মোম আর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল ৎসিগানকের হাতের তালুতে।

কর্কশ রুক্ষ স্বরে গ্রিগরি চেঁচিয়ে উঠল, 'মোমবাতিটা মাথার কাছে মেঝের ওপর রাখ না — বোকা কোথাকার!'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে!'

'মাথা থেকে টুপিটা খুলে নাও!'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই টুপিটা টেনে খুলে ফেলল। ইভানের মাথাটা একটা ফাঁপা আওয়াজ তুলে ঠক্ করে ঠেকল মেঝের সঙ্গে। এবার মাথাটা একপাশে হেলে গেছে আর গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। সারা মুখ দিয়ে নয়, মুখের একটা কোণ থেকে। শংকায় ভরা দীর্ঘ কাল ধরে এইভাবে রক্ত বেরিয়ে এল। প্রথম দিকে প্রতি মুহূর্তে আমি আশা করছিলাম, এই বুঝি ৎসিগানক খানিকটা বিশ্রামের পরেই উঠে বসবে, তারপর বিরক্তির সঙ্গে থুথু ফেলে স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলে উঠবে:

'ফুঃ! কী বিশ্রী গরম!'

রবিবারে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার পরে ঘুম ভাঙলে ঠিক এই কথাগুলোই শোনা যেত তার মুখে। কিন্তু আজ উঠে বসা দূরে থাকুক ক্রমশ যেন গলে

দিদিমাকে প্রণাম জানিয়ে বলল অস্বাভাবিক গভীর স্বরে: 'আকুলিনা ইভানোভনা, আপনি যদি আমাদের একটু নাচ দেখান তো ভারি খুশি হই। মাক্সিম সাভাতেয়েভিচের সঙ্গে আপনি যেমন নাচতেন তেমনি আজও আপনাকে একটু নাচ দেখাতে অনুরোধ করছি।'

'তুমি কি পাগল হলে নাকি গ্রিগরি ইভানোভিচ? বলছ কি তুমি? কী লজ্জার কথা গো!' বলে হেসে উঠে দিদিমা আরো জড়োসড়ো হয়ে বসলেন — 'আমাকে নাচতে বলছ তুমি? আমি যদি এই বয়সে নাচতে শুরু করি লোকে হাসাহাসি করবে...'

কিন্তু ততোক্ষণে সবাই দিদিমাকে ধরে বসেছে, নাচতেই হবে। সকলের পীড়াপীড়ির মধ্যেই দিদিমা হঠাৎ একসময়ে তরুণী মেয়ের মতো উঠে দাঁড়ালেন। পরনের স্কার্টটা ঠিক করে নিয়ে, শিরদাঁড়া টান করে, ভারী মাথাটা পিছন দিকে ঝাঁকিয়ে নাচের ভঙ্গিতে মেঝের ওপর দিয়ে চলতে চলতে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'হাসুক, যে যতো খুশি হাসুক! কোথায় রে ইয়াকভ, সুর তোল্!'

ইয়াকভ-মামা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি। আধ-বোজা চোখে, পা ফাঁক করে বসে ধীর লয়ে সুর তুলল। একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল ৎসিগানক, তারপর লাফিয়ে উঠে এসে দিদিমার চারপাশে পাক দিতে দিতে শুরু করল লম্ফঝম্ফ। দিদিমা নিঃশব্দ সঞ্চারে মেঝের ওপরটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছেন, যেন ভেসে বেড়াচ্ছেন বাতাসে; লীলায়িত হাতের ভঙ্গি, উচ্চকিত ভুরু আর কালো চোখের দূরচারী দৃষ্টি। দিদিমাকে দেখে আমার কেন জানি হাসি পেয়ে গেল, হাসি চাপতে গিয়ে গলা দিয়ে একটা চাপা শব্দ করে ফেললাম। কিন্তু আর কেউ তাতে যোগ দিল না; গ্রিগরি তর্জনী তুলে আমাকে ধমক দিল, বয়স্করা রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

হাসতে হাসতে গ্রিগরি হাঁক দিল, 'সরে এস ইভান!' বাধ্য ছেলের মতো ৎসিগানক একপাশে সরে এসে চৌকাঠে বসে পড়ল। আর তখন চমৎকার ভরাট গলায় গান ধরল ইয়েভগেনিয়া-ধাই; গান গাইতে গাইতে তার গলার কণ্ঠমণিটা উঁচু হয়ে উঠেছে। গানটা এই:

> একটি দিনের নেই অবসর কাজের বোঝা ফেলি,
> নিথর বসে তরুণী চলে লেসের মালা বুনি,
> বিবশ হল শুকিয়ে আসা হাতের আঙুলগুলি,
> লালিমা কোথায় ফ্যাকাশে মুখখানি।

দিদিমাকে দেখে মনে হচ্ছে, এটা তাঁর নাচ নয়, ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে তিনি একটি গল্প বলে চলেছেন। এই তো অতি ধীর গতি, কী যেন একটা চিন্তা প্রকাশ পায়। শরীরটা এদিক-ওদিক দোলে। উত্তোলিত বাহুভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় চোখের দৃষ্টি। পায়ে পায়ে পথ খুঁজে দ্বিধা ভরে নড়েন। মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে যান থম্‌কে। মুখটা কাঁপে আর ভুরু কুঁচকে থমথমে হয়ে ওঠে। আবার একেক সময়ে একটা দরদী ও অন্তরঙ্গ হাসিতে ঝল্‌মলিয়ে ওঠে সমস্ত অঙ্গ। সরে দাঁড়ান একপাশে, যেন কোনো একজনের জন্যে পথ করে দিচ্ছেন। মাথা নিচু করে উৎকর্ণ হয়ে শোনেন কি যেন, একটা খুশির হাসিতে ধীরে ধীরে সারা মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তারপর এক সময়ে সহসা প্রচণ্ড উল্লাসে নেচে ওঠেন, একটা উদ্দাম ঘূর্ণিপাকে শরীরটা যেন আগের চেয়েও লম্বা ও ঋজু হয়ে ওঠে। উজ্জীবিত তারুণ্যের এই মুহূর্তটিতে তিনি এত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন যে কিছুতেই অন্য দিকে চোখ ফেরানো যায় না।

এদিকে সারাক্ষণ ইয়েভগেনিয়া-ধাই ফু দেওয়ার মতো গেয়ে চলেছে:

রবিবারের উপাসনার পরে সময় থেকে
নাচল সে ভোরের আলো উঠল যখন ফুটে;
হায়গো পলক ফেলার আগেই সোমবার এল হেঁকে—
হৈচৈ আর ছুটির দিনটা কেমনে গেল কেটে।

নাচ শেষ হয়ে গেলে দিদিমা সামোভারের পাশে নিজের জায়গাটিতে এসে বসলেন। সবাই তাঁর নাচের প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু তিনি সকলের কথার প্রতিবাদ করলেন:

'থাক্, থাক্, হয়েছে! সত্যিকারের নাচ কাকে বলে তোমরা তা দেখনি।' মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো ঠিক করতে করতে তিনি বলে চললেন, 'তাহলে শোন তোমাদের একটি মেয়ের কথা বলি। আমি তখন থাকতাম বালাখ্‌নাতে, সেখানকারই মেয়ে। তার নাম কি, কোন্ বাড়ির মেয়ে সে, তা আমার মনে নেই। কিন্তু সে কেমন নাচে! হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হত। কিছুতেই চোখ ফেরানো যেত না—জল এসে যেত কারো কারো চোখে। শুধু চোখের দেখা, তাতেই মনে হত মন ভরে গেছে—এর চেয়ে বড়ো আনন্দ আর কিছুতে নেই। কী হিংসে করতাম মেয়েটাকে আমি পাপিনী!'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই খুব ভারিক্কি চালে বলল, 'নাচিয়ে আর গাইয়েরাই তো পৃথিবীর সেরা মানুষ।' তারপর রাজা ডেভিড সম্পর্কে একটা গান গাইতে শুরু করে দিল। ওদিকে ইয়াকভ-মামা ৎসিগানকের গলা জড়িয়ে ধরে বলছে, 'তোমার উচিত নাচ করা সরাইখানায়। তাহলে দেখবে, তোমার নাচ দেখবার জন্যে সবাই ভিড় করে আসবে।'

ৎসিগানক নালিশ জানায়, 'আমি গান গাইতে চাই। ভগবান যদি আমাকে গান গাইবার গলা দিতেন তাহলে সারা দিন সারা রাত শুধু গানই গাইতাম। দশটি বছর শুধু গানই গাইতাম আমি। গাইয়ে হবার জন্যে যদি আমাকে মঠের বাবাজী হয়েও থাকতে হয় তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

সবাই ভদ্‌কা খাচ্ছে, বিশেষ করে গ্রিগরি। দিদিমা গ্রিগরিকে গ্লাসের পর গ্লাস মদ ঢেলে দিচ্ছেন আর বার বার সাবধান করছেন, 'দেখো বাবা, বেশি খেও না যেন, একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে।'

গ্রিগরি গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, 'হলে হব—তাতে আর কি। দুনিয়াটাকে যথেষ্ট দেখে নিয়েছি, আর দেখার দরকার নেই।'

মদ খেয়ে গ্রিগরির নেশা হয় না। তবে আরো বেশি কথা বলতে শুরু করে। ভদ্‌কা টানছে আর অনবরত আমার সঙ্গে কথা বলে চলেছে—বলছে আমার বাবার কথা।

'বড়ো দরাজ দিল ছিল হে! আর আমার ছিল প্রাণের বন্ধু মাক্সিম সাভাতেয়েভিচ!'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দিদিমাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, 'আহা অনাথ বাছা রে!'

এসব কথা আমি সাগ্রহে শুনি আর উত্তেজনায় দম বন্ধ করে টান হয়ে বসে থাকি। একটা শান্ত বিষণ্ণতায় আবহাওয়া নিরন্ধ্র ও ভারী হয়ে ওঠে। বিষণ্ণতা ও আনন্দ একই সঙ্গে বাসা বাঁধে মানুষের মনে; একটি থেকে অপরটিকে কিছুতেই আলাদা করা যায় না। আর কখন যে একটির জায়গায় অপরটি এসে জুড়ে বসে তার হদিশ পাওয়া যায় না।

একদিন ইয়াকভ-মামার মদের নেশাটা তখনো ভালো করে চাপেনি, হঠাৎ সে গায়ের জামাটা ফালা ফালা করে ছিঁড়তে শুরু করে, মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আর সাদাটে গোঁফ ধরে টান দেয়, নাকে আর ঝুলে-পড়া ঠোঁটে খাম্‌চি কাটে—আর জলভরা চোখে ককিয়ে ওঠে:

'কেন? কেন এমন হয়?'

নিজের গালে, কপালে, বুকে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে:

'আমি একটা হতভাগা, কাপুরুষ, আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না... নরকেও স্থান হবে না আমার!'

'আহ-হা, ঠিক কথা, ঠিক তাই!' ভারী গলায় সায় দেয় গ্রিগরি।

আমার দিদিমা বলেন, 'ইয়াকভ, এবার একটু থাম্ বাছা তুই! ভগবান জানেন আমাদের কী শেখাতে হবে।' বলতে বলতে ছেলের হাতটা চেপে ধরেন; মদের নেশায় তাঁর অবস্থাও ঠিক স্বাভাবিক নেই।

মদ খেতে পেলে দিদিমার রূপ আরও খুলে যায়। হাসি-হাসি কালো চোখদুটো থেকে উষ্ণ আলোর ধারা ঝরে পড়ে সবার ওপরে, রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে দুই গালে, রুমাল নেড়ে নেড়ে হাওয়া খান আর জড়ানো গলায় সুর করে করে বলতে থাকেন:

'প্রভু, মঙ্গলময়, তোমার জগতে সবই কেমন চমৎকার! সবই কী ভালো!'

প্রাণের অন্তস্তল থেকে কথাটা বেরিয়ে আসে। আর এই হচ্ছে তাঁর সমস্ত জীবনের মূলমন্ত্র।

আমার বেপরোয়া প্রকৃতির মামাটিকে কাঁদতে ও হা-হুতাশ করতে দেখে সত্যিই অবাক হই। একদিন দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়াকভ-মামা এভাবে কাঁদে কেন আর কেনই বা এভাবে কপাল চাপড়ায়।

আমার প্রশ্ন শুনে যে সুরে দিদিমা জবাব দিলেন সেটা ঠিক তাঁর স্বাভাবিক সুর নয়; যেন তিনি একটু বিরক্ত হয়েছেন এমনি অনিচ্ছুক ভাবে বললেন, 'সব কথাই তোর জানা চাই দেখছি! কোনো সবুর সয় না— এসব ব্যাপারে নাক গলাবার ঢের সময় পড়ে আছে!'

একথা শুনে আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। কারখানায় গিয়ে ইভানকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। কিন্তু সেও জবাব দিতে চায় না, কারিগরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে শুধু নিঃশব্দে হাসে, আর আমাকে ঠেলে কারখানা থেকে বার করে দেয়।

বলে, 'বাস্, আর একটি কথাও নয়! এক্ষুণি যদি বেরিয়ে না যাও তো ধরে রঙের গামলায় চুবিয়ে দেব। তখন দেখবে, সারা গায়ে কেমন রঙদার সবুজ ফুটে বেরোয়।'

কারিগর একটা নিচু থ্যাবড়া উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে গামলা তৈরি করা হয়েছে উনুনটার ওপরে। মস্ত একটা কালো লাঠি দিয়ে

সে একটি গামলার ভিতরটা নাড়াচাড়া করছিল। মাঝে মাঝে সেই লাঠি তুলে ধরে আর তাকিয়ে থাকে তার থেকে ঝরে পড়া রঙিন জলের দিকে। উনুনে গন্‌গনে আঁচ — আর তার আভা এসে পড়েছে কারিগরের চামড়ার এপ্রনে; পাদ্রীদের আলখাল্লার মতো চিত্রবিচিত্র সেই এপ্রন। গামলাগুলিতে রঙগোলা জল চিড়বিড় শব্দে বুদ্‌বুদ তুলে ফুটছে আর একটা ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। সেই গন্ধ দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বাইরের শীতার্ত উঠোনে।

লাল-লাল টস্‌টসে দুটি চোখ তুলে চশমার ফাঁক দিয়ে কারিগর তাকাল আমার দিকে, তারপর ইভানের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'চোখ নেই নাকি? দেখছ না উনুনে কাঠ দিতে হবে?'

কাঠ আনবার জন্যে ৎসিগানক ছুটে বেরিয়ে গেল। আর তখন লাল চন্দন-রঙের একটা বস্তার উপরে বসে গ্রিগরি ডাকল আমাকে।

'এদিকে শুনে যাও তো হে।' বলল সে।

আমাকে কোলের ওপরে বসাল; তার সিল্‌কের মতো ফুরফুরে আর নরম দাড়ির ছোঁয়া লাগছে আমার গালে। তারপর আমি তার মুখে যে-কথাগুলো শুনলাম তা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

'তোমার মামা পিটোতে পিটোতে তার বৌকে মেরে ফেলেছে। আর এখন তার বিবেক কোনো শান্তি পায় না। সব কথাই তোমার জেনে রাখা ভালো, বুঝেছ? আর হ্যাঁ, একটু চোখ খোলা রেখে চলাফেরা কোরো বাপু, নইলে কপালে দুঃখ আছে।'

দিদিমার মতো গ্রিগরির সঙ্গেও সহজেই কথা বলা যায় কিন্তু তার কথাগুলো শুনে গা শির-শির করে ওঠে। কালো চশমার ফাঁক দিয়ে যখন তাকায় সে, তখন মনে হয় যেন শরীরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

তেমনি শান্ত নির্বিকার গলায় সে বলে চলল, 'কেমন করে পিটোতে পিটোতে বৌটাকে মেরেই ফেলল? ব্যাপারটা হত এই রকম -- বৌয়ের সঙ্গে শুতে গিয়ে করত কি, বৌকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে জড়াতো — তারপর কিল, চড়, ঘুষি, লাথি। এমনি চলত রাতের পর রাত। শেষ পর্যন্ত মরেই গেল বৌটা। জিজ্ঞেস করো, এত মারপিট কেন বাপু? তা সে নিজেই বলতে পারত না।'

এক বোঝা কাঠ নিয়ে ঢুকল ইভান, তারপর আগুনের সামনে বসে

হাত গরম করতে লাগল। কিন্তু গ্রিগরি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আগের কথার জের টেনেই বলে যেতে লাগল:

'কেন মারপিট করত জান? হয়ত মনে মনে বুঝত যে বৌয়ের সঙ্গে ও টেক্কা দিতে পারবে না, তাই বৌয়ের ওপর ওর ছিল হিংসে। একটা কথা কি জান দাদু, কাশিরিন্‌রা কোনো ভালো কিছু সহ্য করতে পারে না। ভালো কিছু দেখলেই ওদের হিংসে। কিন্তু সেই ভালোটুকু দেখে যে নিজেরা শিখতে পারবে তা নয়, তাই সেই ভালোটুকুর যাতে কোনো চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে সেই ব্যবস্থা করবে। তোমার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমার বাবার এ-বাড়িতে থাকতে কী হাল হয়েছিল। দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলে সবই জানতে পারবে। দিদিমা তোমার কাছে কিছু ঢাকবেন না। তোমার দিদিমা হচ্ছেন সত্যিকার খাঁটি মানুষ, ছলচাতুরী তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না, ছলচাতুরী বুঝতেও চান না। ঋষিতুল্য মানুষ তিনি। অবশ্য মাঝে মাঝে মদ খান বটে, নস্যি নিতেও ভালোবাসেন — তা হোক্‌। তুমি দাদু কক্ষণো তোমার দিদিমার কাছছাড়াটি হয়ো না যেন...'

গ্রিগরি আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। বিমূঢ় ও আতঙ্কিত হয়ে আমি উঠোনে চলে এলাম। অলিন্দে যাবার আগেই ভানিয়া এসে আমার নাগাল ধরল এবং আমার মাথার ওপর হাত রেখে কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'ওকে তুমি ভয় কোরো না যেন — ভারি ভালো লোকটি। সোজাসুজি চোখ তুলে ওর চোখের দিকে তাকাবে — এইটুকুই ও চায়, এমনি ধরনের লোককেই ও পছন্দ করে।'

সমস্ত কিছু বড়ো অদ্ভুতভাবে উল্‌টেপাল্‌টে যাচ্ছে। অন্য কোনো ধরনের জীবনের সঙ্গে আমার এতদিন পরিচয় ছিল না। তবুও অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ে, আমার বাবা ও মা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবন কাটিয়েছেন। তাঁদের কথাবার্তা ও আমোদপ্রমোদের ধরন ছিল অন্য রকম। দুজনে পাশাপাশি বসেছেন, পাশাপাশি চলেছেন — তার মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল না। সন্ধ্যার সময়ে জানলার ধারে বসে দুজনে প্রাণখুলে হাসতেন আর মনের আনন্দে গান গাইতেন। সেই গান আর হাসি শুনে জানলার নিচে লোক জড়ো হয়ে যেত। আমার মনে আছে, জানলার নিচে দাঁড়িয়ে যারা মাথা উঁচু করে তাকিয়ে থাকত তাদের দেখে কেন জানি অদ্ভুত একটা ধারণা আসত আমার মনে। মনে হত যেন খাওয়াদাওয়ার পরে কার এঁটো বাসনপত্র। আর এখানে ঠিক উল্‌টো ব্যাপার। এখানে মানুষ কদাচিৎ হাসে; আর যদিও বা হাসে, তা

অতি রহস্যময়, তার অর্থ বোঝা সর্বদা যায় না। সারাক্ষণ গালিগালাজ, হুমকি, শাসানি, ফিসফাস। বাচ্চারা চুপচাপ থাকে, তাদের দিকে কারও নজর নেই। আর বৃষ্টির সময়ে ধুলোর মতো তাদেরও মারতে মারতে মিশিয়ে ফেলা হয় মাটির সঙ্গে। এই বাড়ির সঙ্গে আমি কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না। চারদিককার এই জীবন হাজারটা সূচের মতো অনবরত আমাকে বিঁধছে। আমি সবকিছুকে সন্দেহের চোখে দেখছি আর চোখ-কান খাড়া করে সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি সবকিছু।

ইভানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেড়ে চলল। সূর্যোদয় থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত আমার দিদিমা সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং সারাটি দিন আমার কাটে ৎসিগানকের পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করে। যখনই আমার দাদামশাই আমাকে উত্তম-মধ্যম দিতে শুরু করেন তখনই রীতিমত ৎসিগানক নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে চলে এবং পরদিন নিজের ফুলে-ওঠা আঙ্গুলগুলো আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে নালিশ জানায়, 'দূর দূর! তোমাকে আর কোনোদিন আমি বাঁচাতে চেষ্টা করব না। দেখ তো, আমার কী অবস্থা হয়েছে! এই কিন্তু শেষবার বলে রাখলাম। পরের বার থেকে যা কপালে আছে তোমাকেই ভুগতে হবে!'

কিন্তু দেখা যায়, পরের বারেও আমার প্রাপ্য শাস্তি সে অনর্থক হাত পেতে নিচ্ছে।

'কী, বলেছিলে না যে তুমি আর এর মধ্যে নেই?'

'কথা আর কাজ তো এক জিনিস নয় -- কখন যে আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি নিজেই টের পাইনি।'

কিছুদিনের মধ্যেই ৎসিগানক সম্পর্কে আরও কিছু খবর আমি জানতে পারলাম। শুনে ওর প্রতি আমার আগ্রহ ও আনুগত্য আরও বেড়ে গেল।

প্রতি শুক্রবার ৎসিগানক বাজারে যায় সপ্তাহের খাবার কিনে আনবার জন্যে। কটা-লালরঙের ঘোড়া শারাপকে জুড়ে দেওয়া হয় চওড়া স্লেজগাড়িটার সঙ্গে (শারাপটা অত্যন্ত ধূর্ত ও বেয়াড়া জাতের ঘোড়া, মিষ্টি খুবই পছন্দ করে — আমার দিদিমার ভারি আদরের)। মস্ত একটা টুপি মাথায় দেয় ৎসিগানক, খাটো ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরে, কোমরে শক্ত করে আঁটে সবুজ রঙের উড়ুনী। কোনো কোনো বার বাজারে গিয়ে অনেক দেরি হয় ফিরতে। আর তখন ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করে সবাই, বারবার জানলার

কাছে যায়, তুষারঢাকা জানলার শার্সিতে ভাপ দিয়ে একটু সাফ করে নেয় আর তাকিয়ে দেখে রাস্তার দিকে।

'কী, আসছে?'

'দেখতে পাচ্ছি না তো।'

দুশ্চিন্তাটা আমার দিদিমারই সবচেয়ে বেশি। স্বামী আর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'পোড়া কপাল আমার! তোমাদের জন্যেই এই ভালো মানুষটা আর ভালো ঘোড়াটা মরবে! নির্লজ্জ বেহায়ার দল! তোমাদের কি বিবেক বলেও কিছু নেই? কেন রে বাপু, নিজেদের যা আছে তা নিয়েই খুশি থাকলেই হয়! বোকা গুষ্টি! হ্যাংলার দল! দেখ না, এজন্যে ভগবানের কী শাস্তি তোমাদের পেতে হয়!'

দাদামশাই চোখ কুঁচকিয়ে বিড়বিড় করে বলেন:

'আচ্ছা, আচ্ছা, আর পাঠাব না... এই শেষবার...'

কোনো কোনো বার দুপুর গড়িয়ে যাবার পরে ৎসিগানক ফিরে আসে। উঠোনে গাড়ি ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন আমার দাদামশাই ও মামারা। পিছনে পিছনে আসেন দিদিমা। ফোঁস ফোঁস করে নস্যি টানেন আর ভল্লুকের মতো এগিয়ে আসেন। যে জন্যেই হোক্, এই সময়টিতে তাঁর মধ্যে কেমন যেন একটু এলোমেলো ভাব দেখা যায়। বাচ্চারা ছুট্‌তে ছুট্‌তে বেরিয়ে আসে আর তারপরে শুরু হয় মহা উল্লাসে স্লেজগাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামান। জিনিসপত্রে ঠাসা গাড়িটা; আস্ত আস্ত শুয়োরছানা, মাছ আর ছোটবড়ো নানা আকারের মাংসের টুকরো।

ছোট কুতকুতে চোখ দিয়ে স্লেজগাড়িটাকে ভালো করে দেখে নিয়ে দাদামশাই জিজ্ঞেস করেন, 'কী হে, যা যা আনতে বলেছিলাম এনেছ তো সব?'

আনন্দে উঠোনের চারদিকে লাফাতে লাফাতে ইভান জবাব দেয়, 'সব এনেছি, একটি জিনিসও বাদ পড়েনি।' হাতদুটোকে গরম করবার জন্যে দস্তানা না খুলেই হাতে হাত ঘষে সশব্দে।

দাদামশাই কড়া স্বরে ধমক দিয়ে ওঠেন, 'দস্তানা শুদ্ধ হাত ওভাবে ঘষাঘষি কোরো না — দস্তানা কিনতে পয়সা লাগে। খুচরা কিছু ফেরৎ এনেছ?'

'না।'

আমার দাদামশাই স্লেজগাড়িটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখেন আর বিড়বিড় করে বলেন:

'কী হে, মনে হচ্ছে একেবারে বাজার উজাড় করে জিনিসপত্র এনেছ?

তাই তো, এত কেনাকাটার সবই কি আর বিনে পয়সায় হয়েছে? তোমায় বলে রাখছি বাপু আর যেন এমনটি না হয়।'

মুখটাকে বিকৃত করে তিনি তাড়াতাড়ি চলে যান।

তারপর মামারা স্লেজগাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়ায়। আহ্লাদে আটখানা হয়ে মুরগী, মাছ, মেটে, বাছুরের ঠ্যাঙ আর বড়ো বড়ো মাংসের টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর কোনটার কত ওজন হতে পারে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলে।

'বাঃ, চমৎকার বাছাই করেছ কিন্তু — বেশ, বেশ!' তারিফ করার ভঙ্গিতে চিৎকার করে আর শিস দেয়।

বিশেষ করে আমার মামা মিখাইল একেবারে গদ্‌গদ হয়ে ওঠে। স্লেজগাড়িটার চারপাশে এমন লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে যেন তার পায়ে স্প্রিং লাগানো আছে। কাঠঠোক্‌রার মতো নাক উঁচু করে শুঁকে শুঁকে দেখে, ঠোঁট চাটে, আবেশে মুদে আসে তার চঞ্চল চোখদুটো। লোকটির শুকনো চেহারা তার বাপের মতো, তবে লম্বায় বেশি আর পোড়া কাঠের মতো কালো।

'বুড়ো কত দিয়েছিল বাজার করতে?'

'পাঁচ রুবল।'

'আর এখানে যা জিনিস আছে তার দাম অন্তত পনেরো রুবল। কত খরচ হয়েছে তোমার?'

'চার রুবল দশ কোপেক।'

'তার মানে নব্বই কোপেক্ ফেরৎ নিয়ে এসেছ — নয় কি? শুনছ তো ইয়াকভ? এও একটা পয়সা আয়ের রাস্তা।'

ইয়াকভ-মামা আল্‌তোভাবে হাসে। শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকে আর শীতল ঝাপ্‌সা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্‌পিট করে।

'তবে আর কী ভানিয়া, আমাদের এক গেলাশ করে খাইয়ে দাও হে!' টেনে টেনে বলে সে।

দিদিমা ঘোড়ার লাগাম খুলে দিয়েছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন: 'লক্ষ্মী সোনা আমার, বাছা আমার! ওহো, বুঝেছি, একটু খেলা করতে ইচ্ছে হচ্ছে? তাতে আর কী হয়েছে — যাও, যাও, একটু খেলা করে এসো... একটু-আধটু খেলা করলে কোনো দোষ নেই, ওতে ভগবান রাগ করেন না...'

তখন সেই প্রকান্ড শারাপ ঘোড়া তার কেশর দুলিয়ে সাদা সাদা দাঁত বার করে দিদিমার ঘাড়ের ওপর আঁচড় দিতে থাকে। টেনে খুলে ফেলে দিদিমার মাথার সিল্কের রুমাল। খুশিভরা চোখে তাকিয়ে থাকে দিদিমার চোখের দিকে। আর মৃদু হ্রেষা তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের পাতা থেকে তুষারের কণাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে।

'এক টুকরো রুটি খেতে চাও বুঝি যাদুমণি?' দিদিমা জিজ্ঞেস করেন আর তারপর চমৎকার ভাবে নুন মাখিয়ে মস্ত একটা রুটির টুকরো গুঁজে দেন ঘোড়ার দাঁতের ফাঁকে। ঘোড়াটা রুটি চিবোয় আর ওর মুখের তলায় এপ্রনটা মেলে ধরে তিনি তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন।

বাচ্চা ঘোড়ার মতোই তড়বড়িয়ে লাফাতে লাফাতে এসে ৎসিগানক বলে, 'ঠাক্‌মা, কী সুন্দর ঘোড়াটা — না? আর কী বুদ্ধিমান!'

'যা, যা, সরে যা এখান থেকে, খবরদার, এখানে ঘুরঘুর করবি না!' মাটিতে সজোরে পা ফেলে দিদিমা চিৎকার করে ওঠেন, 'তোকে বলেছি না যে হাটের দিনগুলোতে তোকে পছন্দ করি না!'

পরে দিদিমা আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন। ৎসিগানক বাজারে গিয়ে যতোটা না কেনাকাটি করে তার চেয়ে বেশি করে চুরি।

রুষ্ট স্বরে তিনি বললেন, 'এই ধর্, তোর দাদামশাই যদি ওকে পাঁচ রুবলের নোট দেয় তাহলে ও করে কি, তিন রুবল খরচ করে আর দশ রুবল দামের জিনিস চুরি করে আনে। হতচ্ছাড়াটার যেন চুরি করতে ভালো লাগে। প্রথমবার হয়তো এমনি করেছিল — হাতসাফাইটা ঠিকমতো লেগে যায়... ফিরে আসার পরে সবার কী নাচানাচি আর সে কী গুণকীর্তন... তারপর থেকে এটা ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর তোর দাদামশাইয়ের ব্যাপারটা কি জানিস, সারা জীবনটা এমন অভাব-অনটনের মধ্যে কাটিয়েছে যে এখন এই বুড়ো বয়সে হাত দিয়ে কিছুতেই পয়সা গলতে চায় না। ছেলেমেয়েদের চেয়েও পয়সার ওপরে টান বেশি। কাজেই, পয়সা খরচ করতে হয় না অথচ জিনিস আসে এতে তোর দাদামশাই ভারি খুশি। আর মিখাইল ও ইয়াকভের কথা যদি বলিস...'

হাত নেড়ে দুজনকেই তিনি বাতিল করে দেন, তারপর নস্যির কৌটোর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলে চলেন:

'আলিওশা, এ যেন এক অন্ধ বুড়ীর হাতে বোনা একটা ফিতে — আগাগোড়া জট্ পাকিয়ে গেছে, আসল নক্‌শাটা কিছুতেই চেনা যায় না।

তবু জানো, একবার যদি ভানিয়া চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে মারতে মারতে ওকে খুন করে ফেলবে...'

আবার কিছুক্ষণের জন্যে দিদিমা চুপ করে থাকেন, তারপর আবার যখন তিনি কথা বলেন তখন তাঁর গলার স্বর অত্যন্ত নরম ও মৃদু শোনায়:

'ভাব দিকিনি আলিওশা, নীতিকথা তো অনেক কিছু আছে কিন্তু নীতিবোধের বেলা সব ফাঁকা...'

পরের দিন আমি ৎসিগানকের হাতেপায়ে ধরে তাকে চুরি করতে বারণ করলাম। 'যদি ধরা পড়ো তো মারতে মারতে তোমাকে খুন করে ফেলবে...'

'ইস্, আমাকে ধরতে পারলে তো — আমি ঠিক পালিয়ে যাব... আমি তো চালাক আর আমার ঘোড়াও যথেষ্ট জোরে ছুট্‌তে পারে।' বলে ও হেসে উঠল; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসিটাকে গ্রাস করল একটা গম্ভীর বিমর্ষ ভাব, বলল, 'তুমি কি ভাবছ আমি জানি না, আমি জানি, চুরি করাটা অন্যায়, বিপজ্জনক। তবু আমি চুরি করি শুধু এতেই আমি খুশি। ভাবছ, চুরি করে যা দু-একটা পয়সা আমার হাতে আসে তা আমি জমাই — কক্ষণো না। এই যে তোমার মামারা আছে, তারাই সপ্তাহখানেকের মধ্যে সব পয়সা উড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমার তাতে বয়েই গেছে — ওরা যতো পারে নিক। খাবার ভাবনা আমার নেই।'

হঠাৎ সে আমাকে দু-হাতে তুলে নিয়ে অল্প একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল:

'তোমার শরীরটা রোগা আর হাল্‌কা বটে কিন্তু হাড়গুলো শক্ত আছে। দেখবে, বড়ো হলে তাগ্‌ড়া জোয়ান চেহারা হবে তোমার। আমি একটা কথা বলছি শোন, গীটার বাজাতে শেখো — ইয়াকভ-মামাকে বলো তোমাকে শেখাতে — ঠাট্টা নয়! অবশ্য আরেকটু বড়োসড়ো না হলে সুবিধে হয় না, তুমি একেবারেই বাচ্চা! কিন্তু বাচ্চা হলেও সত্যিকার মেজাজ তোমার আছে! আচ্ছা, তোমার ঐ দাদামশাই লোকটিকে তুমি পছন্দ করো না? কী বলো?'

'জানি না।'

'এক ঠাক্‌মা ছাড়া এই কাশিরিনদের মধ্যে একটা লোকও ভালো নেই। লোকগুলোকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না — শয়তানের ঝাড় সবকটা!'

'আর আমি?'

'তুমি তো আর কাশিরিন নও। তুমি হচ্ছ পেশ্‌কভ। পেশ্‌কভরা হচ্ছে একেবারে আলাদা একটা পরিবার, আলাদা একটা বংশ।'

হঠাৎ সে আমাকে দু-হাতে চেপে ধরে প্রায় কান্নার মতো ফুঁপিয়ে উঠল:

'হা ঈশ্বর, আমার যদি গান গাইবার ক্ষমতা থাকত! তাহলে গান গেয়ে লোকের মন গলিয়ে দিতে পারতাম! আচ্ছা ভাই, চলি। এবার কাজ শুরু করতে হবে।'

আমাকে সে মেঝের ওপরে নামিয়ে দিল। তারপর একমুঠো ছোট পেরেক মুখে পুরে লেগে গেল কাজে। মস্ত একটা চৌকো তক্তার ওপরে ভিজে কালো একটা কাপড়ের টুকরো পেরেক ঠুকে ঠুকে লাগিয়ে চলল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ৎসিগানক মারা যায়।

ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে: গেটের কাছে উঠোনের বেড়ার গায়ে ঠেস্ দিয়ে মস্ত এক ওক্‌কাঠের ক্রুশ রাখা ছিল। ক্রুশের তলার দিকটা থামের মতো ভারী ও মোটা। অনেক দিন ধরে পড়ে ছিল ওটা। আমার মনে আছে, আমি যখন প্রথম এ-বাড়িতে আসি তখন থেকেই এই ক্রুশটা দেখছি। তখন অবশ্য নতুন অবস্থায় ছিল, গায়ের হল্‌দে রঙ চটে যায়নি — আর এখন সারা শরৎকালের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে রঙটা কাল্‌চে হয়ে গেছে আর রোদজলে পোক্ত করা ওক্‌কাঠের ঝাঁঝালো একটা গন্ধ ছাড়ছে আমাদের ময়লা, নানা হাবিজাবি জিনিসে ঠাসা উঠোনটায় — তর মধ্যে ক্রুশটা ভারি অসুবিধের সৃষ্টি করত।

ক্রুশটা কিনে এনেছিল ইয়াকভ-মামা, বৌয়ের কবরের ওপরে বসাবার জন্যে। প্রতিজ্ঞা করেছিল বৌয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে নিজেই এই ক্রুশটা সমাধিস্থানে বয়ে নিয়ে যাবে।

শীতকালের শুরুতে এক শনিবারে পড়ল এই মৃত্যুবার্ষিকী। দিনটা ঠান্ডা, ঝোড়ো বাতাস বইছে, বাড়ির ছাদের ওপর থেকে বরফের টুকরো উড়ে উড়ে আসছে বাতাসে। মৃতের জন্য উপাসনায় যোগ দিতে আমার দিদিমা ও দাদামশাই তিনজন নাতিনাতনীকে নিয়ে গাড়িতে চেপে আগেই চলে গেলেন সমাধিস্থানের দিকে। অন্যেরা এসে দাঁড়াল উঠোনে। আমি যেন কী একটা দোষ করেছিলাম। তার শাস্তি হিসেবে আমাকে বাড়িতে আটক থাকতে হল।

আমার মামারা সবাই একই ধরনের কালো কোট পরেছে। দুজনে মিলে ধরাধরি করে ক্রুশটার একটা হাতল চাপিয়ে দিল ইয়াকভের ঘাড়ে, অন্য

হাতলটা মিখাইলের ঘাড়ে। গ্রিগরি এবং আর একজন অপরিচিত লোক অতি কষ্টে ক্রুশের থামের মতো তলাটা তুলে চাপিয়ে দিল ৎসিগানকের চওড়া কাঁধের ওপরে। ভারী জিনিসটা কাঁধে নিয়ে ৎসিগানক একবার টলে উঠল, তারপর দুটো পা ফাঁক করে কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে।

'কী হে, পারবে তো?' জিজ্ঞেস করল গ্রিগরি।

'কী জানি, বুঝতে পারছি না। ভয়ানক ভারী।'

মিখাইল-মামা ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফটক খোল্ না চোখ-কানা হতভাগা!'

ইয়াকভ-মামা বলল, 'কী লজ্জার কথা ভানিয়া তুমি বলছ — ভারী! অথচ আমরা তো দুজনেই তোমার তুলনায় রোগাপট্কা — আমরা তো নিয়ে চলেছি।'

কিন্তু গ্রিগরি ফটক খুলে দিয়ে ইভানের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় ধমক দিল: 'খবরদার বলছি! বেশি গায়ের জোর ফলাতে যেও না। ভগবান তোমাদের সহায় হোন!'

'ওরে টেকো বুড়ো শয়তান!' রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে উঠল মিখাইল-মামা।

উঠোনে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা সবাই হেসে উঠল আর জোরে জোরে কথা বলতে লাগল। ক্রুশটা যে এতদিনে নড়ানো গেছে এতে যেন সবাই খুশি।

আমার হাত ধরে আমাকে কারখানার ভিতরে নিয়ে এল গ্রিগরি। বলল, 'তোমার দাদামশাই হয়তো আজ আর তোমাকে মারবে না — মনে হচ্ছে আজকে তার মেজাজটা খুবই ভালো আছে।'

এক রাশি পশম জড়ো করা ছিল, তার ওপরে আমাকে বসিয়ে দিয়ে সযত্নে আমার সারা গায়ে পশম জড়িয়ে সে কথা বলতে লাগল। গামলা থেকে ফুটন্ত রঙের ধোঁয়া উঠছে আর সেই ধোঁয়া শুঁকতে শুঁকতে চিন্তাভারগ্রস্ত সুরে পুরনো দিনের কথা বলছে সে:

'জান দাদু, তোমার দাদামশাইকে আমি সাঁইত্রিশ বছর ধরে চিনি। এই ব্যবসা যখন শুরু হয় তখনো আমি ছিলাম আর এখন এই ব্যবসার শেষ অবস্থা — এখনো আমি আছি। সেকালে আমরা দুজনে ছিলাম সত্যিকার বন্ধু — একসঙ্গে ব্যবসা করতাম, একসঙ্গে ব্যবসার কথা ভাবতাম। ভারি চালাক-চতুর লোক তোমার এই দাদামশাই। দেখছ তো, সে এখানকার কর্তা

হয়ে বসেছে — আমার সাধ্য কি তার সঙ্গে টেক্কা দিই। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে কে টেক্কা দেবে বলো? ভগবানের কাছে মানুষ তো শিশু — তিনি যদি শুধু একটু হাসেন, তাহলেও সেই হাসির সামনে পৃথিবীর সেরা বুদ্ধিমান লোক বোকার মতো দাঁড়িয়ে চোখ পিট্‌পিট করবে। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার তোমার কিছু জানা নেই — কিন্তু আমার মনে হয়, সব কথা তোমার জেনে রাখাই ভালো। বাপ-মরা ছেলেকে জীবনে অনেক ঝক্কি পোয়াতে হয় কিনা। তোমার বাবা মাক্সিম সাভাতেয়েভিচ ছিল সত্যিকার খাঁটি মানুষ; সবকিছু সে বুঝত। আর এইজন্যেই তোমার দাদামশাই তাকে পছন্দ করত না, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি...'

দরদী কথাগুলো শুনতে আমার ভারি ভালো লাগছিল — এইভাবে চুপ করে বসে থাকা আর এই ধরনের কথা শোনা, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা — উনুনের ওপরে লাল্‌চে সোনালী আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে, গামলাগুলো থেকে দুধালো সাদা মেঘের মতো উঠছে বাষ্প আর ঢালু ছাদের তক্তার গায়ে আটকে গিয়ে জমে জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। তক্তার ফাঁকগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফিতের মতো টুকরো টুকরো নীল আকাশ। বাতাস শান্ত হয়েছে, ঝক্‌ঝক করছে সূর্যের আলো, উঠোনের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন ঘষা কাঁচের টুক্‌রো ছড়ানো রয়েছে চারদিকে। রাস্তা থেকে শোনা যায় বরফকে ভেঙে গুঁড়িয়ে স্লেজগাড়ি টেনে নিয়ে যাবার শব্দ। চারদিকের বাড়ির চিম্‌নি থেকে নীল ধোঁয়া উঠছে পাক খেয়ে খেয়ে। বরফের ওপরে হাল্‌কা ছায়া পড়ে, দ্রুত সরে তারা — তারাও যেন বলছে তাদের গল্প।

ঢ্যাঙা রোগা চেহারা গ্রিগরির। লম্বা দাড়ি, প্রকাণ্ড কান। মাথায় টুপি নেই, খোলা মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গামলায় ফুটন্ত রঙ মেশাচ্ছে। দেখে মনে হয়, এক পরদুঃখকাতর যাদুকর দাঁড়িয়ে আছে সামনে আর আমাকে নানা উপদেশ দিচ্ছে:

'সোজাসুজি তাকাবে মানুষের চোখের দিকে। তাহলে দেখো, কুকুর তাড়া করলে সেও পালাবে ল্যাজ গুটিয়ে...'

তার চশমার পুরু কাঁচদুটো নাকের ওপর চেপে বসেছে, ফলে দিদিমার নাকের মতো তার নাকও নীল হয়ে উঠেছে।

'কী হল?' হঠাৎ থেমে গিয়ে সে বলল। এক মুহূর্ত শুনল কান পেতে, তারপর পা দিয়ে বন্ধ করে দিল চুল্লির দরজা আর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট্‌ল উঠোনের দিকে। পিছন পিছন আমিও ছুটলাম।

রান্নাঘরের মেঝের মাঝে বরাবর ৎসিগানক চিত হয়ে পড়ে আছে। জানলা দিয়ে গলে দুটো চওড়া আলোর ধারা এসেছে ঘরের মধ্যে — একটা পড়েছে তার মাথায় আর বুকে, আরেকটা পায়ে। অদ্ভুত একটা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার কপাল থেকে, উৎক্ষিপ্ত ভুরু, বাঁকা চোখদুটো তাকিয়ে আছে ঝুলকালিমাখা ছাদের দিকে। কালো ঠোঁটদুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে আর লাল্‌চে ফেনা বেরিয়ে আসছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে রক্ত, রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে তার কাঁধের ওপর দিয়ে মেঝে পর্যন্ত আর প্রচুর রক্ত ধারা বেরিয়ে আসছে তার শরীরের তলা থেকে। দুমড়ে বেঁকে আছে পা দুটো; তার পরনের ঢিলে প্যাণ্ট লেপ্‌টে রয়েছে মেঝের সঙ্গে, বোঝা যায় প্যাণ্টটা ভিজে সপ্‌সপে। ঘরের মেঝে বালি দিয়ে ঘষে ঘষে এমন পরিষ্কার করা হয়েছিল যে এখন চক্‌চক করছে সূর্যের আলোয়। রক্তের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে; সূর্যের আলোর সীমানাটুকু পার হবার সময় ঝলসে উঠে, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

ৎসিগানকের শরীরটা স্থির, অনড়। শুধু নড়ছে তার প্রসারিত হাতের আঙ্গুলগুলো। মেঝেটাকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে সেই আঙ্গুলগুলো — রঙের ছোপ-লাগা নখগুলোর ওপরে সূর্যের আলো পড়ে চক্‌চক করছে।

ইয়েভগেনিয়া-ধাই ইভানের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তার হাতে একটা মোমবাতি দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ইভান মোমবাতিটাকে ধরতে পারছে না। মোমবাতিটা তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে রক্তে নিভে গেল তার শিখা। ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার তুলে নিল মোমবাতিটা, ভালো করে রক্ত মুছে নিয়ে আবার চেষ্টা করল ইভানের অস্থির আঙ্গুলগুলোর মুঠোয় ধরিয়ে দিতে। চাপা উত্তেজনার একটা ঢেউ রান্নাঘরের ভিতরে ফুঁসে উঠছে যেন। এই ঢেউ প্রচণ্ড একটা ঝাপ্‌টার মতো আমাকে দরজার চৌকাঠ থেকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল কিন্তু আমি দরজার বাজু শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে রইলাম।

'মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে।' মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেমন যেন নিষ্প্রাণ গলায় ইয়াকভ-মামা বলল। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ভাঁজ পড়েছে মুখের চারদিকে। নিষ্প্রাণ চোখদুটো অনবরত পিট্‌পিট করছে।

'ও পড়ে গেল আর ক্রুশটা পড়ল ওর পিঠের ওপরে — একেবারে পিষে ফেলেছে। আমরা যদি সময়মত ক্রুশ ছেড়ে দিয়ে সরে না দাঁড়াতাম তাহলে আমাদেরও পিষে ফেলত।'

ভাঙা-ভাঙা গলায় গ্রিগরি বলে উঠল, 'ওকে পিষে মারবার জন্যে তোমরা ইচ্ছে করে এ কাজ করেছ!'

'বললেই হল আর কি! আমরা কী করে...'

'হ্যাঁ, তোমরা!'

রক্ত গড়াচ্ছে। দরজার কাছে ইতিমধ্যেই একটা পুকুর হয়ে গেছে রক্তের। টক্‌টকে লাল রঙটা কাল্‌চে হয়ে গেছে আর ফুলে ফুলে উঠছে যেন। ৎসিগানক তেমনিভাবে পড়ে আছে, ঘুমের ঘোরে থাকার মতো ঘড়ঘড় শব্দ বেরচ্ছে গলা থেকে আর মুখ থেকে লাল্‌চে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। শরীরটা গলে যাচ্ছে একটু একটু করে, চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, মেঝের সঙ্গে মিলিয়ে যাবার মতো এক হয়ে যাচ্ছে।

চাপা স্বরে ইয়াকভ-মামা বলল, 'বাবাকে ডেকে আনবার জন্যে মিখাইল ঘোড়ায় চেপে গির্জায় গেছে। আর আমি একটা দ্রশ্‌কিতে ওকে চাপিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে এসেছি... বাবাঃ, ক্রুশের তলার দিকটা নিলেই হয়েছিল আর কি... তাহলে এতক্ষণে আমারও ওই অবস্থা হত...'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার মোমবাতিটা নিয়ে ৎসিগানকের হাতের মধ্যে দিল। ফোঁটা ফোঁটা মোম আর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল ৎসিগানকের হাতের তালুতে।

কর্কশ রুক্ষ স্বরে গ্রিগরি চেঁচিয়ে উঠল, 'মোমবাতিটা মাথার কাছে মেঝের ওপর রাখ না — বোকা কোথাকার!'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে!'

'মাথা থেকে টুপিটা খুলে নাও!'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই টুপিটা টেনে খুলে ফেলল। ইভানের মাথাটা একটা ফাঁপা আওয়াজ তুলে ঠক্ করে ঠেকল মেঝের সঙ্গে। এবার মাথাটা একপাশে হেলে গেছে আর গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। সারা মুখ দিয়ে নয়, মুখের একটা কোণ থেকে। শংকায় ভরা দীর্ঘ কাল ধরে এইভাবে রক্ত বেরিয়ে এল। প্রথম দিকে প্রতি মুহূর্তে আমি আশা করছিলাম, এই বুঝি ৎসিগানক খানিকটা বিশ্রামের পরেই উঠে বসবে, তারপর বিরক্তির সঙ্গে থুথু ফেলে স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলে উঠবে:

'ফুঃ! কী বিশ্রী গরম!'

রবিবারে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার পরে ঘুম ভাঙলে ঠিক এই কথাগুলোই শোনা যেত তার মুখে। কিন্তু আজ উঠে বসা দূরে থাকুক ক্রমশ যেন গলে

গলে যাচ্ছে সে। সূর্য আরো নিচে নেমে গেছে। আর সূর্যের আলোর ফলকদুটি ছোট হতে হতে এখন জানলার কপাটে একটুখানি লেগে আছে মাত্র। কালো হয়ে গেছে ৎসিগানকের মুখ আর হাতদুটো, হাতের আঙ্গুল এখন আর নড়ছে না, মুখ থেকে এতক্ষণ যে ফেনা বেরিয়ে আসছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে। তিনটে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মাথার তিনদিকে, সেই সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার মাথার একরাশ নীল্‌চে কালো চুল, নাকের সরু ডগা আর রক্তমাখা দাঁত। তার কালো-হয়ে-আসা গালদুটির ওপরে সেই আলোর টুক্‌রো টুক্‌রো ছোপ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ইয়েভগেনিয়া-ধাই তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদতে লাগল।

'সোনা আমার, মাণিক আমার! তোর হাসি মুখ দেখে সব দুঃখ ভুলে যেতাম রে!' গুমরে গুমরে বলল সে।

ঘরের ভিতরটা যেমন ঠান্ডা তেমনি ভয়ানক। আমি গুড়ি মেরে টেবিলের তলায় লুকিয়ে রইলাম। তার পরেই ভারী ভারী পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন দাদামশাই; পরনে লোমের কোট। দাদামশাইয়ের পিছনে লোমওলা কলার লাগানো লম্বা কোট গায়ে দিদিমা। তাঁদের পিছনে পিছনে এল মিখাইল-মামা, বাড়ির বাচ্চারা এবং আরো অনেক অপরিচিত লোক।

দাদামশাই গায়ের কোটটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠলেন:

'হারামজাদার দল! এমন ছেলেটাকে মেরে ফেললি! বছর পাঁচেক পরে সোনা দিয়ে ওজন করলেও যে ওর দাম দেওয়া যেত না!'

মেঝের উপরে জামা-কাপড়ে আমার সামনের দিকটা আড়াল হয়ে গিয়েছিল, ইভানকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। গুড়ি মেরে আরো ভালো জায়গায় যেতে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম একেবারে আমার দাদামশাইয়ের সামনে। লাথি মেরে আমাকে একপাশে সরিয়ে দিলেন তিনি, তারপর ক্ষুদে লাল হাতের মুঠি মামাদের দিকে শাসানির ভঙ্গিতে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তোরা মানুষ নস, নেকড়ের দল!'

একটা বেঞ্চির ওপরে ধপ্‌ করে বসে পড়লেন। দু-হাতে আঁকড়ে ধরলেন বেঞ্চিটা। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ইনিয়ে-বিনিয়ে, ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন:

'জানি... ওকে যে তোরা দু-চোখে দেখতে পারতিস না তা আমি জানি... কী বোকা ছেলে তুই, ভানিয়া!.. আমাদের কপাল ভেঙেছে... এখন

আর কিচ্ছু করবার নেই... কিচ্ছুটি নয়... ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে, লাগাম পচে গেছে... ভগবান আমাদের কী অবস্থাই করেছেন গিন্নী গত কয়েক বছর ধরেই... কথা বলছ না যে তুমি?'

দিদিমা ঘরে ঢুকেই ইভানের পাশে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছিলেন। হাত স্পর্শ করে দেখছিলেন ইভানের মুখে, মাথায়, বুকে; নিশ্বাস ফেলছিলেন চোখের ওপরে, হাতদুটো তুলে নিয়ে ঘষছিলেন নিজের হাতে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন মোমবাতিগুলো। এবার তিনি ভারী পায়ে উঠে দাঁড়ালেন — প্রকাণ্ড কালো একটি মূর্তি, পরনের কালো পোশাক জ্বলজ্বল করছে, কালো চোখ ঘুরপাক খেতে খেতে ফুঁসে উঠছে। চাপা স্বরে বললেন:

'দূর হ, দূর হ সব হারামজাদারা!'

শুধু দাদামশাই ঘরের মধ্যে রইলেন, আর সবাই সরে এল।

বিনা সমারোহে, বিনা সোরগোলে সমাধিস্থ করা হল ৎসিগানককে।

চার

মোটা একটা কম্বল আষ্টেপৃষ্ঠে কয়েক পাক জড়িয়ে চওড়া একটা বিছানায় আমি শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে শুনছি, দিদিমা প্রার্থনা করছেন। হাঁটু মুড়ে বসেছেন তিনি, একহাতে বুক চেপে ধরেছেন, অপর হাতে মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছেন।

জানলার বাইরে ভীষণ শীত। জানলার শার্সির ওপরে বরফ জমে জমে বিচিত্র নক্‌শা তৈরি হয়েছে — সেই নক্‌শার ভিতর দিয়ে সবুজ চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে ঘরের মধ্যে। সেই অদ্ভুত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সদয় মুখখানি, উদ্‌গত নাক আর কালো চোখ। দিদিমার চুলগুলো রেশমি রুমাল দিয়ে বাঁধা আর সেটি ঠিক ধাতুর মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। পরনের কালো পোশাক কাঁধের কাছ থেকে ঢেউ তুলে ভাঁজের পর ভাঁজে নেমে এসেছে আর স্তূপ হয়ে রয়েছে মেঝের ওপরে।

প্রার্থনা শেষ হলে তিনি পোশাক বদলাতেন, কোণের একটা ট্রাঙ্কের ওপরে সযত্নে ভাঁজ করে রাখতেন পোশাকগুলো, তারপর এসে দাঁড়াতেন বিছানার কাছে। গভীর ঘুমের ভান করে আমি পড়ে থাকতাম।

নরম সুরে তিনি বলতেন, 'ওরে মিট্‌মিটে ক্ষুদে শয়তান, ভাবছিস মট্‌কা মেরে পড়ে থাকলেই আমি বিশ্বাস করব যে তুই ঘুমিয়েছিস! তুমি তো

ঘুমোওনি সোনামণি, যাদু আমার! এবার দেখি, কম্বলের একটা দিক ছেড়ে দাও তো।'

এর পরে কী ঘটবে তা আমি জানতাম। তাই কিছুতেই আর হাসি চাপতে পারতাম না। দিদিমা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'এই তো ধরা পড়ে গেছিস! বুড়ী দিদিমার সঙ্গে খেলা হচ্ছে — না?'

কম্বলের একটা প্রান্ত তিনি চেপে ধরলেন। তারপর এমন কৌশলে এমন একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিলেন যে ঘুরপাক খেতে খেতে শাঁ করে শূন্যে উঠে গেলাম, আবার তেমনি ঘুরপাক খেতে খেতে ধুপ্‌ করে এসে পড়লাম নরম বিছানার ওপরে। দিদিমা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

'কী গো ক্ষুদে বিচ্ছু! হল কী? কুটুস্‌ করে মশা কামড়ে দিয়ে গেছে বুঝি?'

মাঝে মাঝে তিনি এত বেশিক্ষণ প্রার্থনা করেন যে আমি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ি এবং কখন তিনি শুতে আসেন টের পাই না।

যেদিন কোনো গোলমাল বা ঝগড়া-মারামারি হয়, বিশেষ করে সেই দিনেই দিদিমার প্রার্থনাও চলে অনেকক্ষণ ধরে। আর প্রার্থনা করতে বসে ভগবানের কাছে দিদিমা সংসারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা যে-ভাবে বলে যান তা শুনতেও ভারি মজা লাগে। মস্ত পাহাড়ের মতো শরীরটি নিয়ে তিনি তো বসেন প্রার্থনা করতে, প্রথমদিকে তাঁর উচ্চারণটা হয় দ্রুত ও দুর্বোধ্য, শেষদিকে তা হয়ে ওঠে গভীর বিক্ষোভের প্রকাশ।

'প্রভু, তুমি তো নিজেও জানো যে সব লোকই নিজের অবস্থা ভালো করতে চায়। এতে আর অন্যায় কী আছে বলো? এই ধরো মিখাইলের কথা। ছেলেদের মধ্যে ও-ই তো সবচেয়ে বড়ো, তাই ওর একটু স্থিতি হওয়া দরকার; কাজেই ওকেই থাকতে দেওয়া উচিত শহরে। এখন ওকে যদি নদীর ওপারে নতুন জায়গায় গিয়ে থাকতে বলা হয় — সেটা কি অন্যায় নয়? বলো তুমি? ওই নতুন জায়গাটা কেমন হবে তা কেউ জানে না, কেউ গিয়ে এর আগে থেকে দেখেওনি। কিন্তু তবুও কর্তার ইচ্ছে, ইয়াকভ এ-বাড়িতে থাকুক। ইয়াকভকেই তার বেশি পছন্দ। আচ্ছা, বাপ হয়ে এক ছেলেকে বেশি ভালোবাসা, আরেক ছেলেকে কম ভালোবাসা — এটা কি ঠিক কাজ? কিন্তু বুড়ো কর্তা তো একগুঁয়ে মানুষ। প্রভু, কর্তার মাথায় তুমি দু-এক ফোঁটা বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিও — কর্তা যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে।'

বড়ো বড়ো জ্বলজ্বলে চোখ মেলে তিনি তাকিয়ে থাকেন কালো কালো আইকনগুলোর দিকে, তারপর আবার তাঁর ভগবানকে উপদেশ দিয়ে চলেন:

'প্রভু, কর্তাকে তুমি বরং খুব একটা ভালো স্বপ্ন দিও। স্বপ্ন দেখে যেন বুঝতে পারে, কি ভাবে নিজের ছেলেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করতে হয়।'

বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে নিচু হয়ে প্রণাম করেন। এত নিচু হন যে তাঁর মোটা ভুরুটা ঠেকে যায় গালিচায়। তারপর আবার সোজা হয়ে বসে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে বলতে থাকেন:

'আচ্ছা, ভারভারাকে যদি দু-এক ফোঁটা আনন্দ দাও তাহলে কি কোনো ক্ষতি হয়? বলো তো প্রভু, ভারভারা কি এমন কোনো অপরাধ করেছে যে তোমার কৃপা থেকে বঞ্চিত হবে? ওর কপালটাই বা সবার চেয়ে মন্দ হবে কেন? দেখো তো প্রভু, শক্তসমর্থ শরীর, অল্প বয়স, আর এই মেয়ে এত দুঃখ ভোগ করবে — এমন কথা কে কবে শুনেছে বলো? তারপর প্রভু, গ্রিগরির কথাও তোমাকে একটু মনে করিয়ে দিই — ওর চোখদুটির কথা ভুলো না যেন — চোখদুটির অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। ও যদি অন্ধ হয়ে যায় তাহলে ওর গতি কি হবে বলো? দোরে দোরে ভিক্ষে করতে হবে যে! সেটা কি ভালো? যে নাকি সারা জীবন ধরে বুড়োকর্তার এই ব্যবসায়ে শরীরপাত করল — তার কি এমনটি হওয়া উচিত?.. কিন্তু বুড়ো ওকে একটি কাণাকড়িও সাহায্য করবে না... আহ্-হা প্রভু, প্রভু!..'

বহুক্ষণ তিনি নির্বাক হয়ে থাকেন, মাথাটা বুকের ওপর নেমে আসে, হাতদুটো ঝুলতে থাকে — মনে হয় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

'আর কী বলব?' আত্মগতভাবে ভুরুদুটো কুঁচকে অবশেষে তিনি আবার বলতে থাকেন, 'তোমার ওপর যাদের বিশ্বাস অটুট আছে, তাদের সবাইকে কৃপা কোরো। আর আমার দোষ নিও না প্রভু, আমাকে, বোকা বুড়ীকে ক্ষমা কোরো... তোমাকে আর কি বলব প্রভু, তুমি তো ভালো করেই জান আমি যে পাপ করি তা এই বোকা মনের জন্যেই, অসৎ অন্তঃকরণের জন্যে নয়।'

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলেন:

'প্রভু, প্রভু আমার, তোমার তো অজানা কিছুই নেই। হে পরম পিতা, তুমি তো সবই বোঝ!' শেষ কথাগুলো বলবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে ভালোবাসা ও আত্মতৃপ্তির সুর ফুটে ওঠে।

দিদিমার এই একান্ত আপন ও একান্ত নিকট ভগবানকে আমার ভারি পছন্দ হয়। প্রায়ই আমি বলি:

'আমাকে ভগবানের কথা বলো দিদিমা।'

ভগবানের কথা বলবার একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে দিদিমার, কখনো তার ব্যতিক্রম হয় না। সোজা হয়ে বসেন, চোখ বুজে খুব নরম সুরে কথা বলতে থাকেন, অদ্ভুতভাবে টেনে টেনে উচ্চারণ করেন শব্দগুলো। হঠাৎ উঠে তিনি রুমাল জড়ান মাথায় আর তারপর আবার বসে আপন মনে কল্পনার জাল বুনে চলেন। শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তিনি বলেন:

'শোন্ তবে। চারদিকে স্বর্গের উদ্যান, মাঝখানে একটা পাহাড়, আর সেই পাহাড়ের ওপরে রুপোলী লিন্ডেনগাছের তলায় নীলকান্তমণির সিংহাসনে বসে আছেন প্রভু। সেই গাছগুলিতে সারা বছর ধরে ফল ফলে — জানিস তো স্বর্গে শীত-গ্রীষ্ম বলে কিছু নেই। বছরের প্রথম দিনটি থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত সেখানে ফুল ফোটে। স্বর্গের সাধুরা সেই ফুল দেখে খুশি হন। আর প্রভু সর্বক্ষণই কত কত দেবদূতদের পাঠাচ্ছেন — তুষারকণার মতো ঘন — কিংবা এক ঝাঁক মৌমাছির মতো — কিংবা এক ঝাঁক শাদা পায়রার মতো যারা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসে আবার স্বর্গে ফিরে যায় — ফিরে গিয়ে প্রভুর কাছে আমাদের কথা বলে। জানিস তো, আমাদের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা দেবদূত আছে—তোর আছে, আমার আছে, তোর দাদামশাইয়ের আছে — সবার প্রতিই প্রভুর সমান ভাব। যেমন ধর্, তোর কথা বলবার জন্যে যে দেবদূত আছে সে গিয়ে প্রভুর কাছে বলল, "লেক্সেই তার দাদামশাইকে জিভ বার করে দেখিয়েছে।" এই শুনে প্রভু আদেশ দিলেন, "তাহলে দাদামশাই লেক্সেইকে ধরে আচ্ছা করে মার দিক।" এই নিয়মই সব ব্যাপারে চলে আসছে — যেমন কর্ম তেমনি ফল। কেউ বা দুঃখ পায়, কেউ বা আনন্দ। আর সে কী মধুর দৃশ্য ভাব্ তো দেখি, দেবদূতরা ডানা কাঁপিয়ে প্রভুর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আনন্দে গাইছে: "প্রভুর গুণ গাই! জয় হোক্ হে প্রভু!" সেই গান শুনে প্রভু হাসেন আর সেই হাসি যেন বলে: বেশ তো গান গেয়ে যদি তোমরা আনন্দ পাও বাছারা তবে গাও।'

দিদিমাও হাসছেন, মাথা দুলিয়ে, যেন তিনি নিজেই এ সব দেখেছেন।

'আচ্ছা দিদিমা, তুমি কি এ সব নিজের চোখে দেখেছ?'

আত্মগত সুরে দিদিমা জবাব দেন: 'না, দেখিনি, তবে আমি জানি।'

দিদিমা যখন প্রভুর কথা এবং স্বর্গ ও দেবদূতের কথা বলতে শুরু করেন, তখন তিনি যেন অনেক ছোট হয়ে যান, ভারি একটা কোমলতা আসে তাঁর মধ্যে, বয়সের ছাপগুলি মুছে যায় তাঁর মুখ থেকে, আর ভিজে চোখদুটি থেকে ভারি উষ্ণ ও অন্তরঙ্গ একটি আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তাঁর মাথার চিকন রেশমের মতো বেণীটা আমার গলায় জড়াতে জড়াতে চুপটি করে বসে আমি দিদিমার মুখের বিরতিহীন গল্প শুনে চলি এবং শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যাই। যতো শুনি কিছুতেই যেন আর আশ মেটে না।

'আমাদের মতো এই মরজগতের জীবরা প্রভুর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না — তাকালে তাদের চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। শুধু সাধুপুরুষরাই প্রভুর দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারে। কিন্তু দেবদূতদের আমি দেখেছি। মনে যদি কোনো পাপ বা গ্লানি না থাকে তাহলে দেবদূতদের দেখা যায়। একবার মনে আছে, গির্জায় ভোরের উপাসনা হচ্ছে আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি — এমন সময় আমি দুজন দেবদূতকে দেখতে পেলাম। ঠিক যেন সাদা কুয়াশার মতো — দৃষ্টিকে আটকায় না। আলো দিয়ে গড়া তাদের শরীর, ডানা নেমে এসেছে মেঝে পর্যন্ত, ঝল্‌মলে লেস বা সূক্ষ্ম কাপড় যেন বাতাসে উড়ছে। দেবদূতরা বেদীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে বুড়ো পাদরি ইলিয়াকে সাহায্য করছে। পাদরি যখন প্রার্থনা করবার জন্যে শীর্ণ হাত দুখানি তুল্‌ছেন — অমনি তারা আসে সেখানে, কনুইয়ের কাছে ধরে পাদরির হাত দু-খানি তুলে ধরে থাকে। পাদরি খুবই বুড়ো হয়েছেন, চোখে একেবারেই দেখতে পান না — চলতে ফিরতে যেখানে-সেখানে ধাক্কা খান। কিছুদিন পরেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। দেবদূত দুজনকে দেখে আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে আনন্দে আমার মূর্ছা যাবার উপক্রম, বুকের ভিতরটা এমন টন্‌টন করে ওঠে যে মনে হচ্ছিল বুকটা যেন ফেটে যাবে। চোখ দিয়ে ধারাস্রোতের মতো জল গড়াচ্ছিল। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আনন্দ যে প্রভুর স্বর্গে — আর আলিওশা, সোনা আমার, মানিক আমার, কী আনন্দ যে এই পৃথিবীতে, সবকিছু কতো ভালো, কতো সুন্দর!'

'দিদিমা, আমাদের এই বাড়িতেও সবকিছু ভালো?'

বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিদিমা জবাব দেন, 'হ্যাঁ বাবা, এই বাড়িতেও। পুণ্যময়ী মেরীমাতার জয় হোক্‌।'

দিদিমার এই কথাগুলো আমার কেমন গোলমেলে লাগে। আমাদের এই বাড়িতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে ক্রমশই বেশি চিড় ধরছে — এই বাড়িতেও সবকিছু ভালো একথা বিশ্বাস করা শক্ত।

আমার মনে আছে, মিখাইল-মামার ঘরের খোলা দরজার সামনে দিয়ে যেতে যেতে একবার আমি নাতালিয়া-মামীকে এক লহমার জন্যে দেখেছিলাম। নাতালিয়া-মামীর পরনে আগাগোড়া সাদা পোশাক, বুকের ওপরে দুই হাত চেপে ধরে নাতালিয়া-মামী ঘরের চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে আর মর্মান্তিক ও চাপা স্বরে চিৎকার করে চলেছে: 'ভগবান, আমাকে তুমি তোমার ওখানে নিয়ে যাও... এ-বাড়ি থেকে মুক্তি দাও আমাকে...'

ভগবানের কাছে নাতালিয়া-মামীর এই প্রার্থনা আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেনি। তেমনি দুর্বোধ্য ঠেকেনি গ্রিগরির কতগুলো কথা যখন সে বিড়বিড় করে বলেছে:

'যেদিন একেবারে অন্ধ হয়ে যাব সেদিন বেরোব ভিক্ষে করতে... এখানকার এই জীবনের চেয়ে ভিক্ষে করাও ঢের ভালো!'

আমার ভারি ইচ্ছে করত, গ্রিগরি একটু তাড়াতাড়ি অন্ধ হয়ে যাক্। তাহলে গ্রিগরি যখন ভিক্ষে করতে বেরোবে, আমি তার হাত ধরে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাব — ভিক্ষে করতে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব দুজনে। আমার এই পরিকল্পনার কথা গ্রিগরির কাছে বলেছিলাম। শুনে দাড়ির আড়ালে মুচকে হেসে গ্রিগরি বলেছিল:

'ঠিক আছে দাদু, আমরা দুজনেই যাব একসঙ্গে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সমস্ত লোককে শুনিয়ে আমি চিৎকার করে বলব: ' "রঙের কারখানার মালিক ভাসিলি কাশিরিনের নাতিকে, তার মেয়ের ছেলেকে নিয়ে আমি চলেছি। ভিক্ষে দাও গো তোমরা!" ভারি মজা হবে, না?'

মাঝে মাঝে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, নাতালিয়া-মামীর ঠোঁটদুটো ফুলে উঠেছে আর তার হলদেটে মুখের উপর কালশিটের দাগ।

'মামা কি মামীমাকে মারধোর করে?' দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'করে বৈকি। তবে লুকিয়ে। মিখাইলটা একটা জানোয়ার! তোর দাদামশাই এসব পছন্দ করে না, তাই হতভাগা রাত্রিবেলা বৌকে ধরে মারে। মিখাইলটা জানোয়ার আর ওর বৌটা হয়েছে এমনি মিন্‌মিনে।'

তারপর নিজের কথায় মত্ত হয়ে নিজেই বলে চলেন:

'তাও তো আজকাল আর তেমন মারধোর নেই — আগেকার কালে যা ছিল! আজকাল আর কি আছে — দাঁতে বা কানে দু-একটা ঘুষি বা দু-এক মিনিট বেণী ধরে টানা। কিন্তু সেকালে এমন দু-এক মিনিটের ব্যাপারই ছিল না। মারধোর চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা! মনে আছে, একবার তোর দাদামশাই আমাকে সারাদিন ধরে মেরেছিল। সেটা ছিল ইস্টার-সপ্তাহের প্রথম দিন। দুপুরের উপাসনার সময় থেকে মারতে শুরু করেছিল, আর থামল সূর্য ডুবে যাবার পরে। এক-একবার মারে — একটু বিশ্রাম নেয় — আবার শুরু করে। ঘোড়ার চাবুক বা হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়েই মারে।'

'কী দোষ করেছিলে তুমি?'

'তা এখন আমার মনে নেই। একবার তো মারতে মারতে একেবারে আধ-মরা করে ফেলেছিল — তারপর পাঁচ দিন ধরে কিচ্ছু খেতে দেয়নি। কি-ভাবে যে বেঁচেছিলাম, তা আর তোকে কি বলব। কিংবা ধর্ না, সেই সেবারের কথা...'

এসব কথা শুনে আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি, মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়। চেহারার দিক থেকে দাদামশাইয়ের চেয়ে আমার দিদিমা অন্তত দ্বিগুণ। সুতরাং দাদামশাই কি করে যে দিদিমাকে মারপিট করতে পারতেন — তা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

'আচ্ছা দিদিমা, তোমার চেয়ে দাদামশাইয়ের গায়ের জোর কি এত বেশি?'

'গায়ের জোর বেশি নয়, কিন্তু বয়সে বড়ো। তাছাড়া, আমার স্বামী। ভগবান তো এই স্বামীর ওপরেই আমার ভার সঁপে দিয়েছেন। স্বামীকে মেনে চলতে হবে, এ তো ভগবানেরই আদেশ রে।'

দিদিমা যখন দেবতা ও সাধুদের আইকনগুলোকে ঝাড়পোঁছ করতে শুরু করেন তখন বসে বসে তাঁর হাতের কাজ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। আমাদের বাড়ির এই আইকনগুলোর নানারকমের বহু অলঙ্কার আছে। আইকনগুলোর গায়ে বসানো আছে রুপোর চুম্‌কি, বহুমূল্য পাথর ও মণিমুক্তো। তাঁর নিপুণ আঙ্গুল দিয়ে দিদিমা আইকনগুলোকে নাড়া-চাড়া করেন। এক-একটা আইকন হাতে নেন আর বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে তাতে চুমু খেয়ে হেসে আপন মনে বলেন: 'কী মিষ্টি মুখ! কী সুন্দর মূর্তি!'

'ইস্, কী ধুলোকালিই না পড়েছে! পরম মঙ্গলময়ী মেরীমাতা, হে শক্তি-রূপিণী, হে আনন্দদায়িনী! আলিওশা, সোনা আমার, মানিক আমার,

দ্যাখ্, দ্যাখ্, কী সুন্দর আইকন! এত ছোট ছোট মূর্তিগুলি — কিন্তু তবুও প্রত্যেকেই আলাদা-আলাদা দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে তাকিয়ে দ্যাখ্, এটার নাম—"বারোটি পুণ্য দিন"—ফিওদরোভস্কির পুণ্যময়ী মাতা দাঁড়িয়ে আছেন মাঝখানে—দয়া ও কারুণ্যের কি অপরূপ চিত্র! আর এই আইকনটির নাম—"ওগো মা, আমার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদো না..."'

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার বোকা মামাতো বোন কাতেরিনা যেমন অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তার পুতুল নিয়ে খেলা করে, আমার দিদিমাও ঠিক তাই করেন সাধুসন্তদের আইকনগুলো নিয়ে।

মাঝে মাঝে দিদিমা শয়তানদেরও দেখেন; শয়তানরা থাকে কখনো বা একা, কখনো বা দল বেঁধে।

'তাহলে শোন কী হয়েছিল। এক রাতে লেন্ৎ'এ। রুদল্‌ফ্'এর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি—চাঁদের আলোয় চারদিক ঝক্‌ঝক করছে—এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, ছাদের ওপরে চিমনির কাছে কালো অন্ধকার মতো কি যেন একটা জিনিস ঠ্যাঙ ফাঁক করে বসে আছে। কালো কুৎকুতে মস্ত চেহারা জিনিসটার, দুটো শিং ঢুকিয়ে দিয়েছে চিম্‌নির মধ্যে। ফোঁস ফোঁস করে নাক টানছে আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শব্দ করছে। ছাদের ওপরে আছড়ে আছড়ে পড়ছে লেজটা। আমি তার দিকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বলে উঠলাম, "যীশু খৃষ্টের পুনরভ্যুত্থান হোক, আর নিপাত যাক তাঁর শত্রুরা।" সঙ্গে সঙ্গেই সেটা আর্ত চিৎকার করে উঠল আর ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ে উঠোনের মধ্যে, অদৃশ্য হয়ে গেল! মনে হয়, রুদলফরা উপোসের দিনে খাবাব জন্যে কী যেন নিষিদ্ধ রান্না করছিল—এই রান্নার গন্ধেই ওটা এসেছে, লোলুপ নয়নে...'

শয়তান ডিগ্‌বাজি খেয়ে উঠোনের মধ্যে পড়ছে ভাবতেই আমার হাসি পায়। দিদিমাও সঙ্গে সঙ্গে হাসেন।

'বাচ্চারা যেমন দুষ্টুমি করতে ভালোবাসে, এই শয়তানগুলোও তাই। একদিন রাত্রে কাজ শেষ করতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় মাঝরাত্রে আমি স্নানের ঘরে কতগুলি জামাকাপড় ধুয়ে নিচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ চুল্লির দোরটা ঠাস্ করে খুলে গেল আর পিলপিল করে বেরিয়ে এল শয়তানের দল। কোনোটা লাল, কোনোটা সবুজ, কোনোটা কালো—কোনোটা ছোট, কোনোটা আরো ছোট— যেন এক ঝাঁক আরশোলা। আমি দরজার দিকে ছুটে যেতে চাইলাম কিন্তু শয়তানগুলো কিছুতেই যেতে দিল না। তখন আমার সে কী অবস্থা! আমার নড়বার-চড়বার উপায় নেই — আর হাজার-

হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি শয়তান আমাকে ঘিরে আছে। সারা স্নানের ঘরটা জুড়ে আছে তারা — পায়ের তলায় রয়েছে, পায়ের ওপরে রয়েছে — আঁচড়িয়ে, কামড়িয়ে, হুল ফুটিয়ে এমন একটা অবস্থা করে তোলে যে হাত তুলে ক্রুশচিহ্ন এঁকে শয়তানগুলোকে ভাগিয়ে দেব — সেই অবস্থাও আমার আর থাকে না। বেড়ালছানার মতো শয়তানগুলোর সারা গায়ে লোম, তেমনি তুলতুলে আর উষ্ণ ছোঁয়া। পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘুরপাক খায়, ডিগবাজি দিয়ে লাফিয়ে পড়ে, ইঁদুরের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁত বার করে, ছোট ছোট সবুজ চোখে পিট্‌পিট করে তাকায়, মাথার শিং গজাবার জায়গায় এইটুকু এইটুকু মুণ্ডি — সেই মুণ্ডি সমেত মাথা ঝাঁকিয়ে গুঁতো মারে, শুয়োরের ছানার মতো লেজগুলোকে পাকায়... সে যে কী অবস্থা আমার সে এক ভগবানই জানেন! প্রায় জ্ঞান হারাই আর কি। তারপর যখন আবার পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখলাম, মোমবাতিটা পুড়ে-পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে গেছে, কাপড়কাচার জল একেবারে ঠাণ্ডা, কাপড়কাচার আরক মেঝের ওপর ছিটিয়ে পড়েছে। মনে মনে ভাবলাম, চুলোয় যা তোরা, চুলোয় যা, মর্ মর্, নরকের কীট!'

আমি চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করি। চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে। ছাইরঙা পাথরের তৈরি চুল্লিটার মুখ খুলে গেছে আর হুড়মুড় করে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা রঙের ক্ষুদে-শয়তান বেরিয়ে আসছে, সারা গায়ে লোম। স্নানের ঘরটা ভর্তি হয়ে গেছে এই ক্ষুদে-শয়তানদের ভিড়ে আর হাওয়ার ঝাপ্‌টা লাগছে মোমবাতির শিখায়, লাল লাল জিভ বার করছে তারা। দৃশ্যটা যেমনি মজার তেমনি আতঙ্কজনক। দিদিমা নিঃশব্দে মাথা নাড়তে থাকেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার কতগুলি নতুন চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে ঝল্‌সে ওঠে এবং তিনি বলতে থাকেন:

'শয়তানে পাওয়া লোককেও আমি দেখেছি। এই ঘটনাও ঘটে রাত্রিবেলা, সময়টা ছিল শীতকাল আর একটা তুষার-ঝড় প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে। দ্যুকভ নালা আমি পার হচ্ছি। সেখানে পুকুরের ওপর জমে-থাকা বরফের একটা ফাঁক দিয়ে ইয়াকভ ও মিখাইলো তোর বাপকে ঠেলে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। সে কথা তোকে আরেকদিন বলেছি। সেদিনও সেই একই জায়গায় আমি চলেছি। রাস্তা ধরে নিচে নেমে নালাটার একেবারে নিচে এসে দাঁড়িয়েছি — এমন সময় সে কী প্রচণ্ড শিস আর আর্ত চিৎকার, সে আর কী বলব! চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি তিনটে কালো ঘোড়া একটা

গাড়ি টেনে আনছে; প্রচণ্ড গতিতে নেমে আসছে আমার দিকেই। গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে আসছে একটা গোলগাল শয়তান, মাথায় ছুঁচলো লাল টুপি, চালকের আসনে দাঁড়িয়ে উঠে দু-হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে আছে। ঘোড়াগুলোকে সে চালাচ্ছে লাগাম দিয়ে নয়, শেকল দিয়ে। লোকে পেরতে পারে না, অথচ তারা ঘোড়া নিয়ে নালা পেরিয়ে সোজা ছোটাল পুকুরের দিকে, পিছনে উড়তে লাগল বরফের মেঘ। গাড়ির মধ্যে যারা ছিল, সেগুলোও শয়তান; শিস দিচ্ছে, চিৎকার করছে, টুপি নাড়ছে। এইভাবে সাত-সাতটা ত্রয়কা আমার পাশ দিয়ে দমকলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। ঘোড়াগুলো সব কুচকুচে কালো, আর তারা সবাই মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো ছেলে। এই লোকগুলোর ওপরেই তো শয়তান ভর করে। শয়তানরা ঠিক খুঁজে খুঁজে বার করে এই লোকগুলোকে, এই লোকগুলোকে তাড়িয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায় হুল্লোড় করবার জন্যে। আমার মনে হচ্ছিল, শয়তানের বিয়ে হচ্ছে আর সেই দৃশ্য আমি চোখের সামনে দেখছি...'

এমন একটা সরল ও প্রত্যয়ের সুরে দিদিমা কথা বলেন যে তাঁর কথা কিছুতেই অবিশ্বাস করা চলে না।

আরো অনেক গল্প দিদিমা বলেন আর সেই গল্পগুলির মধ্যে সেরা ছিল ওই কবিতা যাতে বলা হয়েছে কি করে মেরীমাতা হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন পৃথিবীর যন্ত্রণাকাতর পথ দিয়ে, কি ভাবে তিনি 'ডাকাত-রাজকুমারী' ইয়েনগালিচেভা'কে অনুরোধ জানালেন রুশদেশে লুটপাট ও ডাকাতি বন্ধ করতে; আর ঈশ্বরানুগত আলেক্সেইয়ের সম্পর্কে কবিতা, বীরযোদ্ধা ইভানের গল্প, জ্ঞানপরী ভাসিলিসা, ছাগল-পুরোহিত ও ঈশ্বরানুগৃহীত লোকটির কাহিনী, মার্ফা-পসাদ্‌নিৎসা, ডাকাত-সর্দারণী উস্তা-মেয়ে, মিশর-পাপী মারিয়া, ডাকাত-মায়ের শোকের রূপকথা। কত গল্প, রূপকথা আর ছড়া যে দিদিমা জানেন তার কোনো সংখ্যা নেই — সে এক অফুরন্ত ভাণ্ডার।

কোনো মানুষকেই তিনি ভয় করেন না। এমন কি দাদামশাইকে নয়, শয়তানকে নয়, অন্য কোনো অশুভ শক্তিকেও নয়। কিন্তু আরশোলা দেখলে তাঁর মরণ-আতঙ্ক। অনেক দূরেও যদি থাকেন তবু চোখে না দেখেও আরশোলার উপস্থিতি টের পান তিনি। মাঝে মাঝে এমন হয় যে মাঝ-রাত্রে আমাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে চাপা স্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন:

'আলিওশা, লক্ষ্মীটি, একবার উঠে দ্যাখ্‌ তো — ঘরের মধ্যে একটা

আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্মী বাবা, যীশু খ্রীষ্টের দিব্যি আরশোলাটা মেরে ফ্যাল্।'

আধো-ঘুমে উঠে আমি মোমবাতি জ্বালাই এবং হামাগুড়ি দিতে দিতে শত্রুর সন্ধানে ঘরের চারদিকে ঘোরাফেরা করি। কিন্তু প্রত্যেকবারেই যে আমার প্রচেষ্টা সফল হয় তা নয়।

'কোথায় দিদিমা, আরশোলা তো নেই।' আমি হয়তো বলি।

দিদিমা ততোক্ষণে কম্বলের মধ্যে মাথা শুদ্ধ গুঁজে দিয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে আছেন। আমার কথা শুনে কোনো রকমে মুখ দিয়ে কতগুলি শব্দ বার করেন মাত্র।

'ওরে, আমি বলছি আছে। দ্যাখ্ বাবা, ভালো করে খুঁজে দ্যাখ্। লক্ষ্মী বাবা আমার! আমি বলছি, আছে, নিশ্চয়ই আছে।'

আর শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে তাঁর কথাই ঠিক। সাধারণত আরশোলাটা খুঁজে পাওয়া যেত হয় বিছানার কাছাকাছি নয় তো তার অনেক দূরে।

'কী রে, মেরেছিস তো? এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কাজ। ভগবান তোর ভালো করবেন!' বলে তিনি মাথার ওপর থেকে লেপ সরিয়ে নেন, তাঁর সারা মুখে খুশির হাসি ফুটে ওঠে।

কিন্তু আরশোলাটা যখন কিছুতেই খুঁজে পেতাম না—তখন সে রাতের মতো তাঁর ঘুমের দফা শেষ। বেশ টের পাই, রাত্রিবেলা বিছানায় হয়তো একটু খসখস আওয়াজ হয়েছে, অমনি তাঁর সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। আর রুদ্ধ নিশ্বাসে বিড়বিড় করে তিনি বলে চলেন:

'ওই তো, দরজার কাছে... এবার ট্রাঙ্কের তলায় ঢুকেছে...'

'আচ্ছা দিদিমা, আরশোলা দেখে তুমি এত ভয় পাও কেন বলো তো?'

এ-প্রশ্নের খুব ভালো একটা জবাবও তাঁর আছে। তিনি বলেন: 'আচ্ছা বল্, আরশোলা থেকে জগতের কারও কোনো উপকার হয়? ওগুলোর কাজ হচ্ছে শুধু গুটি-গুটি এগিয়ে চলা — শুধুই গুটি-গুটি এগিয়ে চলা। কেলে শয়তান! ভগবানের সৃষ্ট এই জগতে নিকৃষ্টতম প্রাণীরও জীবনের একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। এমন যে হাজার-ঠেঙে বিছের জাত—ওগুলোকে দেখেও অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে বাড়ি স্যাঁৎসেঁতে হয়েছে। বিছানায় যদি ছারপোকা হয় তাহলে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে ঘরের দেওয়ালে ময়লা জমেছে। শরীরে যদি উকুন হয় তাহলে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে শরীরে

রোগের বীজ ঢুকেছে। কেমন, ঠিক বলিনি? কিন্তু একবার ভাব তো ওই আরশোলাগুলোর কথা। বলতে পারিস ওগুলো কেন আছে? জগতের কোনো কাজেই যখন আসে না — তবে ওগুলো কেন বেঁচে থাকবে?'

একদিন দিদিমা নতজানু হয়ে ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করছিলেন এমন সময় দাদামশাই দরজাটা খুলে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠলেন:

'গিন্নী শুনছো, প্রভু একেবারে সাক্ষাৎদূত পাঠিয়েছেন। কারখানায় আগুন লেগেছে!'

'বলছ কি!' ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে পড়ে দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন। তারপর দুজনেই ধুপ্‌ধাপ শব্দে ছুটলেন মস্ত বৈঠকখানা ঘরের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে।

'ইয়েভগেনিয়া, আইকনগুলো নামাও! আর নাতালিয়া, তুমি ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় পরিয়ে তৈরি করে রাখ দেখি!' দিদিমার অবিচলিত উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দাদামশাই আর্ত স্বরে শুধু 'আ-আ-আ' বলে বিলাপ করে চললেন।

আমি রান্নাঘরে ছুটে এলাম। এই ঘরে উঠোনের দিকে একটা জানলা আছে। জানলাটা সোনার মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। টুকরো টুকরো সোনালী আলোর এক-একটা ঝলক মেঝের ওপরে ছুটোছুটি করে লুকোচুরি খেলা শুরু করেছে যেন। ইয়াকভ-মামা রয়েছে ঘরের মধ্যে, খালি পায়ে জুতো গলিয়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে — তাকে দেখে মনে হয় আলোর ঝলকে যেন পায়ের তলাটা পুড়ে যাচ্ছে তার। দাপাচ্ছে আর চিৎকার করছে:

'এটা নিশ্চয়ই মিখাইলের কান্ড! ও-ই আগুন লাগিয়েছে! আগুন লাগিয়ে পালিয়েছে!'

'চুপ কর্‌ হতভাগা!' বলে দিদিমা তাকে এমন একটা ধাক্কা দিলেন যে ইয়াকভ-মামা দরজার ওপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

জানলার শার্সির ওপর তুষার জমেছে; সেই তুষারের ভিতর দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি কারখানার ছাদে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে, লক্‌লকে আগুনের শিখা আবর্তিত হচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে। শান্ত রাত্রিতে নির্ধূম লাল আগুন ফুলের মতো ফুটে রয়েছে যেন। শুধু আকাশের অনেক উঁচুতে থিতিয়ে রয়েছে এক টুকরো কালো মেঘ। কিন্তু এই কালো মেঘ ছায়াপথের

রুপোলি ধারাকে আড়াল করতে পারেনি। আগুনের শিখায় টক্‌টকে লাল হয়ে ঝল্‌সে উঠেছে বরফ। বাইরের দিক্‌কার ঘরগুলোর দেয়াল যেন কাৎ হয়ে পড়েছে আর কাঁপছে — মনে হয়, দেয়ালগুলো সরে যেতে চায় উঠোনের কোণের দিকে যেখানে প্রচণ্ড আগুন জ্বলছে। কারখানা-ঘরের চওড়া চওড়া ফাটলগুলো ফুটে উঠেছে আগুনের আলোয়, আর সেইসব ফাটল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে আগুনের লক্‌লকে দীপ্ত জিহ্বা। কারখানার ছাদের ওপরে শুক্‌নো কাঠের তক্তা লাগানো, তক্তাগুলোর ওপর দিয়ে লাল আর সোনালী ফিতের মতো আগুনের স্রোত বইছে; ছাদের ফাঁক দিয়ে উঠেছে লম্বা সরু একটা মাটির চিম্‌নি। তার চারপাশ দিয়ে পাতলা একটা ধোঁয়ার ঢেউ উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। এত দূরে জানলার শার্সির ওপরে আগুনের শব্দটা অনেক মৃদু শোনায়, রেশমি কাপড়ের খস্‌খসের মতো। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, আগুনের দ্যুতিতে অপরূপ দেখাচ্ছে কারখানাটা, ঠিক যেন গির্জার উপাসনা-বেদী। এই আশ্চর্য দৃশ্য দুর্নিবার আকর্ষণে টানে, কিছুতেই চোখ ফেরানো যায় না।

একটা ভারী ভেড়ার চামড়ার জামা আমি মাথায় গলিয়ে নিলাম। কার যেন জুতো ছিল সামনে পড়ে, সেটাই পরে দিয়ে থপ থপ করে এগিয়ে গেলাম উঠোনের দিকে, তারপর অলিন্দে এসে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতেই আমার সমস্ত চেতনা অবশ হয়ে এল — দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা, প্রচণ্ড গর্জনে কানে তালা ধরে যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে দাদামশাইয়ের, মামার আর গ্রিগরির চিৎকার। এর ওপরে দিদিমার কাণ্ড দেখে ভয়ে তটস্থ হয়ে গেলাম। দিদিমা করেছেন কি, একটা খালি বস্তা মাথায় জড়িয়েছেন, আস্তাবল থেকে একটা কাঁথা টেনে এনে জড়িয়েছেন গায়ে আর তারপর জ্বলন্ত কারখানার দিকে ছুটে চলেছেন আর চিৎকার করছেন:

'ওরে হাঁদার দল, কারখানার ভিতরে সালফিউরিক এসিড আছে যে! ওই এসিডে আগুনের ছোঁয়া লাগলে আর রক্ষে আছে? উড়িয়ে নিয়ে যাবে যে সব।'

দাদামশাই আর্ত স্বরে চিৎকার করছেন, 'গ্রিগরি... ধরো... ধরো, ওকে যেতে দিও না... কি সর্বনাশ, ধরতে পারলে না তো গ্রিগরি... দেখো, আর ফিরে আসতে হচ্ছে না!..'

কিন্তু দিদিমা ফিরে এসেছেন। সর্বাঙ্গ দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, মাথা ঝাঁকুনি

দিচ্ছেন; দু-হাতে সালফিউরিক এসিডের মস্ত একটা পাত্র, সেই পাত্রের ওজনে নুয়ে পড়েছেন একেবারে।

প্রচন্ড কাশির দমক সামলাতে সামলাতে ভাঙা ভাঙা গলায় দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন, 'কর্তা, আস্তাবল থেকে ঘোড়াটাকে বার করে আনো... ওরে, হাঁ করে দেখছিস কি? এই কাঁথাটা টেনে খুলে নে আমার গা থেকে... দেখছিস না চারদিকে আগুন ধরে গেছে?'

কাঁথাটায় ধোঁয়া উঠছে। দিদিমার কাঁধ থেকে তাড়াতাড়ি কাঁথাটা টেনে নিল গ্রিগরি, তারপর একটা কোদাল নিয়ে প্রচন্ডভাবে কাজে লেগে গেল। চাঁই চাঁই তুষার নিয়ে কারখানার দরজার ভিতরে আগুনের মধ্যে ফেলছে। একটা কুড়ুল হাতে নিয়ে গ্রিগরির চারদিকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে ইয়াকভ-মামা। দাদামশাই চলেছেন দিদিমার পিছনে পিছনে, গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার ছিটিয়ে দিচ্ছেন দিদিমার গায়ে। এসিডের পাত্রটা নিয়ে একটু দূরে সরে এলেন দিদিমা, বরফ দিয়ে চাপা দিলেন পাত্রটাকে, তারপর ছুটে এলেন সদর দরজা খুলে দেবার জন্যে। পাড়ার লোকেরা ছুটতে ছুটতে এসেছিল, সদর দরজা খুলে দিয়ে তাদের সকলকে কাকুতি-মিনতি করে দিদিমা বলতে লাগলেন, 'আপনারা পাড়ার লোক, আসুন আমাদের সঙ্গে আপনারাও একটু হাত লাগান। আমাদের এই গোলাঘরটা যে-করে হোক্ বাঁচাতে হবে। গোলাঘরে যদি আগুন লাগে তাহলে খড়ের গাদাতেও আগুন ছড়াবে। এই গোটা বাড়িটাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে একেবারে। তা যদি হয় তো আশেপাশের আপনাদের বাড়িগুলোও আগুন থেকে বাঁচবে না। আসুন আপনারা, সকলে হাত লাগিয়ে গোলাঘরের চালাটা আগে খুলে ফেলুন। খড়ের গাদাটাও আছে, ওটাকে কোদালে করে সরিয়ে দিন বাগানের দিকে! ওকি গ্রিগরি, শুধু মাটিতে বরফ ফেলে লাভ কি? উঁচু দিকেও খানিকটা ছুঁড়ে দাও। আর ইয়াকভ, তোর ওই ছুটোছুটি বন্ধ কর্ তো দেখি। কোদাল আর কুড়ুল নিয়ে এসে সবার হাতে হাতে দে! আসুন আপনারা, সকলে হাতে হাত লাগিয়ে পড়শীর উপযুক্ত কাজ করুন। ভগবান সহায় আছেন!'

আগুনের মতো দিদিমার দিকেও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। আগুনের লক্‌লকে শিখা দিদিমাকে যেন গ্রাস করতে চাইছে; উজ্জ্বল লাল আভায় আলোকিত হয়ে কালো একটা ছায়ার মতো দিদিমা ছুটোছুটি করছেন, সর্বত্র দেখা যাচ্ছে তাঁকে, সবদিকে তিনি চোখ রাখছেন, সবাইকে হুকুম করছেন।

শারাপ ঘোড়াটা ছুটে এসেছে উঠোনের মাঝখানে, পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাদামশাই ঘোড়ার লাগামটা ধরেছিলেন, টাল সামলাতে না পেরে ছিট্‌কে পড়লেন। আগুনের আভায় ঘোড়াটার ঘূর্ণায়মান চোখদুটো রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে আর ঝল্‌সে উঠেছে, কিছুতেই ঘোড়াটাকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। সামনের দুপায়ে জোরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা। দাদামশাই ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

'গিন্নী ঘোড়া সামলাও!' চিৎকার করে বললেন তিনি।

দিদিমা এগিয়ে এলেন, তারপর দু-হাত প্রসারিত করে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন ঘোড়াটার সামনে। ঘোড়াটা বশ মানল; নরম সুরে দু-একবার চিঁহি ডাক ছেড়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে দু-একবার আগুনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল শেষকালে।

'ভয় কী রে?' সান্ত্বনা দেবার সুরে দিদিমা বললেন, তারপর লাগামটা হাতে নিয়ে, ঘোড়ার ঘাড়ে আদর করে চাপড় মারতে মারতে বললেন, 'এই তো আমি আছি। হ্যাঁ রে দুষ্টু পুঁচকে ইঁদুর, তোর বিপদের সময়ে আমি কাছে থাকব না, এই বুঝি ভাবিস তুই?'

দিদিমার চেয়ে আকারে তিন গুণ বড়ো সেই পুঁচকে ইঁদুর কথাগুলো শুনে অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল; যেতে যেতে দিদিমার টক্‌টকে মুখখানার দিকে তাকিয়ে চিঁহি-চিঁহি করে ডাক ছাড়ল কয়েক বার।

ওদিকে ইয়েভগেনিয়া-ধাই বাচ্চাদের একসঙ্গে জড়ো করে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসেছে। কাপড়-জড়ানো বাচ্চাগুলোকে দেখাচ্ছে পোঁটলার মতো; পোঁটলাগুলোর ভিতর থেকে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন বেরিয়ে আসছে।

দাদামশাইকে ইয়েভগেনিয়া-ধাই বলল, 'ভাসিলি ভাসিলিচ, লেক্সেইকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

দাদামশাই জবাব দিলেন, 'যাও, যাও, এক্ষুণি বাইরে চলে যাও!'

অলিন্দের সিঁড়ির নিচে আমি লুকিয়ে রইলাম, যাতে ইয়েভগেনিয়া-ধাই খুঁজে পেয়ে আমাকে শুদ্ধ বাইরে না নিয়ে যায়।

কারখানার ছাদটা ভেঙে পড়েছে। বেরিয়ে পড়েছে ছাদের কঙ্কাল, আকাশের পটভূমিতে মোটা মোটা কড়িকাঠ পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে জ্বলন্ত কড়িকাঠ থেকে। আর এই কঙ্কালের ভিতর থেকে বিস্ফোরণের মতো দমকে

দমকে বেরিয়ে আসছে লাল সবুজ আর নীল আগুনের শিখা, লক্‌লকে জিভ বাড়িয়ে দিয়েছে উঠোন পর্যন্ত। উঠোনে অনেক মানুষের ভিড়; কোদালে বরফ ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারা এই প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড নেবাতে চেষ্টা করছে। আগুনে ঘেরা গামলা, টগ্‌বগ করে ফুটছে গামলার ভিতরকার তরল পদার্থ। রাশি রাশি ধোঁয়া উঠছে, ঘন ধোঁয়ার মেঘে ভরে গেছে উঠোনটা। বিশ্রী রকমের সব গন্ধ, আর সেই ধোঁয়ায় চোখে জল আসে। সিঁড়ির তলা থেকে আমি গুটি-গুটি বেরিয়ে আসতেই পড়ে গেলাম একেবারে দিদিমার সামনা-সামনি।

দিদিমা হাঁক দিলেন, 'যা এখান থেকে! এখানে ঘুরঘুর করছিস, একেবারে পিষে যাবি যে! যা এক্ষুণি বাইরে!'

এমন সময় টগবগিয়ে ঘোড়ায় চেপে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল পেতলের হেল্‌মেট মাথায় একজন অশ্বারোহী। লাল্‌চে বাদামী রঙের ঘোড়াটার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। অশ্বারোহীর হাতে চাবুক, শাসানির ভঙ্গিতে চাবুকটা তুলে সে হাঁক দিতে লাগল:

'হট্ যাও! হট্ যাও!'

শোনা যাচ্ছে ঢঙ ঢঙ শব্দে ঘণ্টা বাজার শব্দ। যেন উৎসব-দিনের মতো আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠেছে চারদিক। অলিন্দে দিদিমা আমায় ঠেলে বললেন:

'কথা কানে ঢোকেনি বুঝি? যা বলছি এখান থেকে!'

ঠিক এই মুহূর্তে দিদিমার আদেশ কিছুতেই অমান্য করা চলে না। আমি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম এবং আবার দাঁড়ালাম জানলার পাশে। কিন্তু জানলার সামনেই কালো কালো একদল মানুষের ভিড়ে আগুনটা আড়াল হয়ে গেছে। শুধু দেখা গেল লোকের মাথার শীতের কালো টুপি আর ক্যাপ আর তারই ফাঁকে ফাঁকে এক-একবার ঝল্‌সে উঠছে পেতলের হেল্‌মেট।

দমাদম পিটিয়ে আর জল ঢেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিবিয়ে ফেলা হল। মানুষের ভিড়কে দূরে সরিয়ে দিল পুলিস। তারপর এক সময়ে আমার দিদিমা এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে।

'কে, কে এখানে? ও, তুই? ঘুমোসনি বুঝি? ভয় পেয়েছিস? ভয় পাস্‌নে। ভয়ের আর কিছু নেই। আগুন নিবিয়ে ফেলা হয়েছে।'

দিদিমা আমার পাশে বসলেন, তারপর একটিও কথা না বলে দুলতে লাগলেন। আবার সেই নিঃশব্দ রাত্রি আর সেই অন্ধকার ফিরে এসেছে। ভালো লাগছে আমার। কিন্তু সেই আগুন আর নেই!

দাদামশাই এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

'গিন্নী?'

'উঁ?'

'পুড়ে-টুড়ে যাওনি তো?'

'না, তেমন কিছু নয়।'

ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালেন দাদামশাই। দেশলাইয়ের নীল আলোয় তাঁর ঝুলকালিমাখা কাঠবেড়ালির মতো ছোট মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। টেবিলের মোমবাতিটা জ্বালিয়ে তিনি এসে ধীরেসুস্থে একেবারে গা ছেড়ে দিয়ে বসলেন দিদিমার পাশে।

'একটু হাতমুখ ধুয়ে এলে পারতে।' দিদিমা বললেন। দিদিমা নিজেও ঝুলকালি মেখে বসে আছেন, তাঁর গা থেকেও ধোঁয়ার গন্ধ বেরোচ্ছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাদামশাই বললেন, 'মাঝে-মাঝে তোমাকে ঈশ্বর তাঁর করুণার পরিচয় দেন। অকস্মাৎ বুদ্ধি জোগান।'

দিদিমার কাঁধের ওপর মৃদু চাপড় দিতে দিতে হাসিমুখে তিনি বলে চলেন:

'অল্প কয়েক মিনিটের জন্য, সামান্য ক্ষণের জন্য হলেও তিনি বুদ্ধি জোগান।'

দিদিমাও মুচকে হাসছিলেন এবং কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে ভুরু কুঁচকিয়ে দাদামশাই বললেন:

'এই গ্রিগরিটাকে দূর করে দিতে হবে। ওর অসাবধানেই তো এই কাণ্ড হল! ওকে দিয়ে আর কিচ্ছু কাজ হবে না। ওর দিন অনেক আগেই ফুরিয়েছে। ওদিকে দেখ, বোকা ইয়াকভটা বারান্দায় বসে বসে কান্না শুরু করে দিয়েছে। তুমি বরং একটু ইয়াকভের কাছে যাও গিন্নী...'

দিদিমা উঠে দাঁড়ালেন, তারপর একটা হাত তুলে আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে বেরিয়ে চলে গেলেন।

'কী হে ছোক্‌রা, আগাগোড়া কাণ্ডটা দেখলে তো?' আমার দিকে না ফিরেই দাদামশাই নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'দিদিমাকে কী মনে হয় তোমার? আর ভুলে যেও না যেন, তোমার দিদিমা বুড়ী হয়েছে... অনেক ঝড়ঝাপ্‌টা গেছে, অনেক দুঃখ সয়েছে... তবুও দেখলে তো, মানুষ বলতে এই একজন... বাকি সব — ছ্যাঃ।'

কিছুক্ষণ একটিও কথা না বলে তিনি ঘাড় নিচু করে বসে রইলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মোমবাতির পোড়া সল্‌তেটা টোকা দিয়ে ভেঙে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে:

'তুমি ভয় পাওনি তো?'

'না।'

'এই তো চাই। ভয় পাবার কি আছে? কিচ্ছু নেই।'

বিরক্তির সঙ্গে গা থেকে জামাটা খুলে ফেললেন, তারপর রান্নাঘরের অন্ধকার কোণে গেলেন হাত-মুখ ধোবার জন্যে।

'নেহাৎ গো-মুখ্যু না হলে কারও বাড়িতে আগুন লাগে?' মেঝের ওপরে পা ঠুকতে ঠুকতে উচ্চকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, 'এবার থেকে নিয়ম হয়ে যাওয়া উচিত যে যার বাড়িতে আগুন লাগবে তাকে ধরে নিয়ে আসা হবে খোলা ময়দানে। কারণ সে লোক হয় বোকা নয় চোর, তা ও দুয়েতে কোনই তফাৎ নেই, আর সেই জন্যে শাস্তি দেওয়া উচিত তাকে। ধরে ধরে জনকয়েক লোককে এমনি শাস্তি দিতে পারলেই—ব্যস সব ঠান্ডা! আর কারও বাড়িতে আগুন লাগবে না!.. ওখানে বসে আছ কেন হে ছোকরা? শুতে-টুতে যাও!'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি শুতে গেলাম। কিন্তু সে-রাত্রে ঘুম আমার কপালে ছিল না। সবেমাত্র বিছানায় শুয়েছি এমন সময় প্রচণ্ড একটা অমানুষিক চিৎকার আমাকে বিছানা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার আমি ছুটে গেলাম রান্নাঘরে। দেখলাম, রান্নাঘরের মাঝখানে মোমবাতি হাতে খালি গায়ে দাদামশাই দাঁড়িয়ে আছেন; মোমবাতিটা তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে কাঁপছে, অনবরত তিনি এক পা থেকে আর-এক পায়ে শরীরের ভর দিচ্ছেন। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে একটুও নড়ছেন না।

রুদ্ধ স্বরে তিনি বলছেন, 'কী হয়েছে গিন্নী? ইয়াকভ, বল্‌ না কী হয়েছে?'

ছুটে এসে চুল্লির ওপর উঠে আমি এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে লুকিয়ে রইলাম। ঠিক আগুন লাগার সময় যেমন অবস্থা হয়েছিল তেমনি আবার সারা বাড়িতে প্রচণ্ড একটা হৈ-হট্টগোল- ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। ভীষণ চিৎকার ঠিক যেন একটা ছন্দের তালে তালে এসে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে দেওয়াল আর ছাদের গায়ে। পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন আমার দাদামশাই আর মামা। দিদিমা দুজনকেই ধমক দিয়ে রান্নাঘর থেকে চিৎকার

করে বার করে দিলেন। ওদিকে গ্রিগরি প্রচন্ড সোরগোল তুলে চুল্লির মধ্যে কাঠ পুরে চলেছে। জল গরম করবার বয়লারগুলির কয়েকটাতে সে জল ভরে দিয়ে গেল। চলাফেরা করছে আস্ত্রাখানের উটের মতো ঘাড় নাড়তে নাড়তে।

দিদিমা হুকুম করলেন, 'আগে আগুনটা ঠিক করো দেখি!'

কিছু জ্বালানি কাঠ নামিয়ে নেবার জন্যে গ্রিগরি চুল্লির ওপরে উঠে এল। আমার পায়ের সঙ্গে তার পায়ের ছোঁয়া লাগতেই আঁতকে চিৎকার করে উঠল সে:

'কে? কে এখানে? ওঃ তুই! কী ভয় পাইয়েই দিয়েছিলি! এমন বিদকুটে স্বভাব তোর, যেখানে তোর আসার কোনো দরকার নেই, ঠিক সেখানেই আসা চাই।'

'আচ্ছা, এত হৈচৈ কিসের?'

চুল্লির ওপর থেকে নিচে লাফিয়া নেমে শান্ত স্বরে সে জবাব দিল, 'তোর মামী নাতালিয়ার বাচ্চা হবে।'

আমার মনে পড়ে, আমার মা'র যখন বাচ্চা হয়েছিল তখন কিন্তু মা এমন অমানুষিক চিৎকার করেনি।

চুল্লি জ্বালিয়ে তার ওপরে জলের পাত্রগুলি চাপিয়ে দিয়ে গ্রিগরি আবার ওপরে উঠে এল। পকেট থেকে একটা পোড়ামাটির পাইপ বার করে দেখাল আমাকে:

'এই দ্যাখ্, চোখ ভালো করবার জন্যে তামাক খেতে শুরু করেছি। তোর দিদিমা বলেছিল নস্যি নিতে কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, নস্যি নেওয়ার চেয়ে তামাক খাওয়া ঢের ভালো...'

চুল্লির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে সে তাকিয়ে রইল মোমবাতির মিটমিটে আলোর দিকে। তার গালে আর কানে বিশ্রীরকম কালিঝুলি লেগেছে, কামিজটা ছেঁড়া, আর তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আংটার মতো উঁচু উঁচু পাঁজরার হাড়। চোখের চশমার একটা কাঁচ ফাটা আর সেই কাঁচ থেকে খসে পড়েছে বড়ো একটা টুকরো। ফাঁক দিয়ে লাল-লাল ভিজে-ভিজে চোখের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়; মনে হয় যেন চোখ নয়, দগ্‌দগে ঘা। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকটি সমানে কাৎরে চলেছে। শুনতে শুনতে গ্রিগরি পাতা-তামাক ঠেসে ভরে নিল পাইপটাতে। সে নিজেও অনেকটা যেন মাতালের মতো বিড়বিড় করে অনবরত কি বলে চলেছে।

'কী আগুন বাবাঃ... তোর দিদিমার হাত-টাত নিশ্চয়ই ঝল্‌সে গেছে...

ওই পোড়া হাত নিয়ে কি করে যে প্রসব করাবে জানি না... তোর মামীমার কথা ভুলেই গিয়েছিল সকলে... আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তো তার কাৎরানি শুরু হয়... ভয়ে কাৎরাতে শুরু করেছিল... দেখছিস তো, একটি জীবন্ত মানুষকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসা কী শক্ত কাজ... কিন্তু তবুও স্ত্রীলোকের কাণাকড়িও দাম নেই। প্রত্যেকটি স্ত্রীলোককে সম্মান করে চলা উচিত — অর্থাৎ মাকে, নয় কি? — তুই কিন্তু এ-কথাটি কখনো ভুলিস না ভাই!'

ঢুলতে ঢুলতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আবার প্রচন্ড একটা সোরগোলে ঘুম ভেঙে গেল। দুমদাম করে দরজা বন্ধ হচ্ছে, মাতালের মতো চিৎকার করছে মিখাইল-মামা, একসঙ্গে গোলমাল জুড়ে দিয়েছে সবাই। আর শুনতে পেলাম, দুর্বোধ্য ভাষায় কারা যেন কথা বলছে:

'স্বর্গের ফটক অবাধ উন্মুক্ত হবার সময় হয়েছে...'

'এক কাজ কর হে, খানিকটা বাতির তেল, খানিকটা রাম আর কাজল মিশিয়ে খেতে দাও দেখি ওকে... পরিমাণটা কি হবে জান? আধ গ্লাশ তেল, আধ গ্লাশ রাম আর টেবিল-চামচ কাজল...'

মিখাইল-মামা অনবরত একই কথা বলে চলেছে, 'আমাকে একটু দেখতে দাও, আমি একবার দেখব ওকে।'

মেঝের ওপরে দু-পা ছড়িয়ে বসে আছে সে, দু-পায়ের মাঝখানে মেঝের ওপর থুথু ফেলছে মাঝে মাঝে, দু-হাতে চাপড় দিচ্ছে মেঝের ওপরে। চুল্লির ওপরে তাতটা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল, সুতরাং আমি নীচে নেমে এলাম। কিন্তু মামার কাছে আসতেই মামা আমাকে এক-পায়ে জড়িয়ে ধরে এমন একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিল যে আমি চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলাম, মাথাটা ঠক্ করে লাগল গিয়ে মেঝের সঙ্গে।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'বোকা কোথাকার!'

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আমার মামা। তারপর থাবার মধ্যে আমাকে তুলে নিয়ে শূন্যে দোলাতে দোলাতে গর্জন করতে লাগল:

'তোকে আজ আমি উনুনের গায়ে পিষে মেরে ফেলব!'

আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলাম দাদামশাইয়ের কোলের ওপর আমি শুয়ে আছি। আইকনের নীচে তিনি বসে আছেন এবং আমাকে কোলের ওপর নিয়ে দোলা দিচ্ছেন। চোখের দৃষ্টি ছাদের দিকে নিবদ্ধ আর বিড়বিড় করে বলছেন তিনি:

'আর আমাদের কারও রেহাই নেই... একজনেরও নেই...'

তাঁর মাথার উপরে, আইকনের সামনেকার প্রদীপ জ্বলছে আর ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা মোমবাতি। বাইরে শীতকালের কুয়াশাম্লান ভোরের আবির্ভাব জানলা দিয়ে দেখা যায়।

আমার ওপরে ঝুঁকে পড়ে দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'যন্ত্রণা হচ্ছে?'

সারা শরীরে যন্ত্রণা। ভিজে মাথাটা, শরীরটা হয়ে উঠেছে সীসের মতো। কিন্তু এসব কথা বলবার ইচ্ছে আমার নেই — চারদিকে তাকিয়ে অদ্ভুত সব লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি; ঘরের মধ্যে চেয়ারগুলোতে যারা বসে আছে তাদের অধিকাংশকে আমি চিনি না। বেগুনে রঙের আল্‌খাল্লা পরে বসে আছে একজন পুরোহিত, চশমা চোখে আর সামরিক উর্দি গায়ে একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ, এবং আরো অনেকে। কাঠের মূর্তির মতো সকলে স্থির হয়ে বসে আছে। কাছেই কোথায় যেন জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে আর উদগ্রীব হয়ে সেই শব্দ শুনছে সকলে। পিঠের দিকে দুটো হাত রেখে ইয়াকভ-মামা টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

দাদামশাই বললেন, 'ইয়াকভ ছেলেটাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দে তো।'

মামা আমাকে ইসারায় ডাকল এবং আমরা পা টিপে টিপে দিদিমার ঘরের দিকে চললাম। তারপর আমি যখন বিছানায় গুটিসুটি হয়ে শুয়েছি, এমন সময় মামা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'তোর নাতালিয়া-মামী গেছে রে...'

খবরটা শুনে খুব বেশি অবাক হলাম না। অনেককাল ধরেই আমি নাতালিয়া-মামীকে এ-বাড়ির কোথাও দেখতে পাইনি; নাতালিয়া-মামী একবারও রান্নাঘরে আসেনি বা খাবার টেবিলে এসে বসেনি।

'দিদিমা কোথায়?'

'ওখানে।' বলে হাত বাড়িয়ে দেখাল মামা। তারপর যেমনভাবে পা টিপে টিপে ঢুকেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই নগ্ন পায়ে বেরিয়ে গেল।

আমি বিছানায় শুয়ে রইলাম। উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি চারদিকে। অন্ধ আর পাকা চুলওলা শীর্ণ কতগুলি মুখ যেন জানলার শার্সি ঘেঁষে রয়েছে। কোণের দিকে ট্রাঙ্কের ওপরে একটা পোশাক ঝুলছে; আমি জানি ওটা দিদিমার পোশাক — কিন্তু তবুও এখন মনে হয়, একটা জীবন্ত প্রাণী ছায়া-ছায়া অন্ধকারে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। একটা চোখ দরজার দিকে রেখে বালিশে মুখ গুঁজে আমি শুয়ে থাকি, ইচ্ছে হয় পালিয়ে চলে যাই এ ঘর থেকে। বিশ্রী গরম ঘরটা, আর একটা শ্বাসরোধী ভারী গন্ধ — মনে

পড়ছে ৎসিগানকের মৃত্যুর দৃশ্য, সেই রান্নাঘরের মেঝের ওপরে রক্তের ধারা। আমার মাথাটা আর বুকের ভিতরটা ফুলে উঠেছে যেন; এ-বাড়িতে যে-সব দৃশ্য আমি দেখেছি, সেগুলো ঘষটে চলেছে আমার ভিতর দিয়ে শীতের রাস্তায় স্লেজগাড়ির মতো। আমাকে পিষে দিয়ে যাচ্ছে, আমার অস্তিত্বকে শুষে নিচ্ছে...

আস্তে আস্তে ঘরের দরজাটা খুলে গেল আর দিদিমা কাৎ হয়ে গলে এলেন দরজার ফাঁক দিয়ে। কাঁধের ধাক্কায় বন্ধ করে দিলেন দরজাটা, তারপর ঠাকুরের আইকনের সামনে নীল শিখার দিকে দু-হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালেন দরজায় ঠেস দিয়ে আর ছেলেমানুষের মতো কান্না-ভাঙা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন এক সময়ে:

'আমার এই হাত দুটো... কী যন্ত্রণা যে হচ্ছে...'

পাঁচ

সেই বছরেই বসন্তকালে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেল। ইয়াকভ রয়ে গেল শহরে আর মিখাইল গেল নদী পেরিয়ে। দাদামশাই পলেভায়া স্ট্রীটে একটি চমৎকার নতুন বাড়ি কিনলেন। বাড়িটির নিচুতলায় ছিল একটা শুঁড়িখানা আর ছাদের ওপরে ভারি স্বাচ্ছন্দ্যের ছোট একটি ঘর। বাড়ির পিছনে বাগান, বাগান পেরিয়ে এক নালা। নিষ্পত্র উইলো চারায় নালাটা ছেয়ে গেছে।

'এখানে দেখছি বেতের অভাব হবে না!' আমার দিকে চোখ ঠেরে মুচ্‌কি হেসে দাদামশাই বললেন। আমরা দুজনে বাগান দেখবার জন্যে বেরিয়েছিলাম, কাদাভর্তি প্যাঁচপেঁচে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম দুজনে। দাদামশাই বললেন, 'এবার আমি তোমাকে নিয়ে বর্ণপরিচয় শুরু করব। আর তখন এই বেতগুলো খুব কাজ দেবে।'

সারা বাড়িতে ভাড়াটে গিজগিজ করছে। নিজের ব্যবহারের জন্যে এবং অভ্যাগতদের বসবার জন্যে একটি মাত্র বড়ো ঘর দাদামশাই রেখে দিলেন এবং আমি আর দিদিমা আশ্রয় নিলাম ছাদের ওপরের ঘরে। আমাদের এই ঘরটিতে রাস্তার দিকে একটি জানলা আছে। এই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে তাকালে দেখা যায়, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে মাতালরা শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। টল্‌তে টল্‌তে তারা রাস্তা দিয়ে চলে, গলা

ফাটিয়ে চিৎকার করে আর ধুপ্‌ধাপ পড়ে রাস্তার ধারে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, এক-একজন লোককে ময়দার বস্তার মতো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু লোকগুলো আবার এগিয়ে আসে দরজার দিকে। দরজা খোলা-বন্ধ হওয়ায় ঠুন্‌ঠুন্‌ শব্দ পাওয়া যায়, আর শোনা যায় মর্‌চে-পড়া কব্‌জার কিচকিচ। তারপর মারামারি চলছে। ওপরের জানলা থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে খুব মজা লাগে আমার। রোজ সকালে দাদামশাই বেরিয়ে যান। মামারা দুটি আলাদা-আলাদা কারখানা খুলেছে; কারখানাগুলো যাতে চালু হয় সেই উদ্দেশ্যে দাদামশাই দেখাশোনা করতে যান; অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এবং মন মেজাজ খারাপ করে ফিরে আসেন সন্ধ্যার সময়।

দিদিমা ব্যস্ত থাকেন সেলাই, রান্না আর বাগান নিয়ে। সারা দিনে এক মুহূর্তও ফুরসৎ ছিল না তাঁর, অদৃশ্য এক সুতোর টানে মস্ত এক লাট্টুর মতো যেন অনবরত ঘুরপাক দিয়ে চলেছেন তিনি। মাঝে মাঝে নস্যি নেন, সশব্দে হাঁচেন, আর মুখের ঘাম মুছতে মুছতে আপন মনে বলেন:

'চিরকাল সব মানুষ যেন সুখী থাকে। আলিওশা, সোনা আমার, মানিক আমার, এতদিনে আমরা শান্ত ও নির্বিঘ্ন জীবন পেয়েছি। পুণ্যময়ী মেরীমাতার অশেষ কৃপায় এতদিনে আমাদের সমস্ত অশান্তি কেটে গেছে!'

তবে আমার কিন্তু সেই জীবনকে খুব বেশি শান্ত ও নির্বিঘ্ন বলে মনে হয় না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ভাড়াটেরা বাইরের উঠোনে আর এঘর থেকে ওঘরে ছুটোছুটি করে; পাশের ঘরের স্ত্রীলোক এঘরে হুড়মুড় করে ঢোকে; আর সব সময়েই তাদের কোথাও না কোথাও যাবার তাড়া পড়েছে, সব সময়েই তাদের কোনো না কোনো একটা কাজে দেরি হয়ে গেছে, সব সময়েই তারা কিছু না কিছু একটা করবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

'আকুলিনা ইভানোভনা!' দিদিমাকে তারা ডাকে।

আর এই ডাক শুনে আকুলিনা ইভানোভনারও ক্লান্তি নেই। তাঁর নিজস্ব অন্তরঙ্গতার ধরনে সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলেন, সবার কথা শোনেন মন দিয়ে। আর মাঝে মাঝে বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে নস্যি গোঁজেন নাকের মধ্যে; মস্ত একটা লাল চেক্‌কাটা রুমাল দিয়ে পরিষ্কার ভাবে মুছে নেন নাক আর আঙুল।

'উকুনের কথা বলছেন? উকুন তাড়াতে হবে?' বলেন তিনি, 'উকুনের হাত থেকে যদি বাঁচতে চান তাহলে একটি কাজ করতে হবে গিন্নী। স্নানঘরে গিয়ে আর-একটু ঘন ঘন স্নান করতে হবে। আর যদি পেপারমিণ্ট তেলের ধোঁয়া

দিয়ে শরীরটাকে মেজে নিতে পারেন তাহলে তো আর কথাই নেই। আর ধরুন যদি এমন হয় যে উকুন চামড়ার ওপরে না হয়ে ভিতরে হয়েছে, তাহলে করবেন কী জানেন — প্রথমে নেবেন বড় চামচের এক চামচ হাঁসের খাঁটি চর্বি, তারপর নেবেন চায়ের চামচের এক চামচ বিষ আর তিন ফোঁটা পারা; একটা খলের মধ্যে নিয়ে সাতবার জিনিসগুলোকে মেশাতে হবে। বাস্, তৈরি হয়ে গেল আপনার ওষুধ। শরীরের যেখানে উকুন হয়েছে সেখানে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিলেই ফল পাবেন। তবে খবরদার, হাড় বা কাঠের চামচ কক্ষণো ব্যবহার করবেন না যেন, তাহলে পারাটা নষ্ট হয়ে যায়; আর তামা বা রুপোর সঙ্গে যেন কিছুতেই ছোঁয়া না লাগে — সেটা শরীরের পক্ষে হবে খুবই ক্ষতিকর।'

জিজ্ঞেস করলেই যে ওষুধ বলেন তা নয়। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে কোনো একটি সমস্যা নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করে অবশেষে বলেন:

'আপনার অসুখের ওষুধ বাৎলানো আমার কর্ম নয় গিন্নী। আপনি বরং সাধু-আসাফের কাছে, পেচেরি মঠে যান।'

সব ব্যাপারেই আছেন তিনি। ধাইয়ের কাজ করেন, বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হলে মিটমাট করিয়ে দেন, ছেলেপুলের অসুখ হলে চিকিৎসা করেন। 'মেরীমাতার স্বপ্ন' আবৃত্তি করেন আর তাঁর কাছ থেকে শুনে শুনে অন্য মেয়েরা তা শিখে নেয় — 'গৃহস্থের কল্যাণে'। তাছাড়া সংসারের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে পরামর্শ দেন তিনি:

'শশা জরাতে তো ঝামেলা কিছু নেই। শশার গায়েই একরকম লেখা থাকে, কখন শশা দিয়ে আচার হবে। যদি দেখ যে শশা থেকে মাটি-মাটি বা অন্য কোনো গন্ধ ছাড়ছে না — তাহলেই হল। কেটে-ছাড়িয়ে নুন লাগাও, আর কোনো গোলমাল নেই — আচার হবেই। ভালো ক্ভাস* তৈরি করতে হলে পাঁচনটাকে ভালো করে ঘাঁটা দরকার। ক্ভাসের সঙ্গে মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু মিশ খায় না। কয়েকটা কিশমিশ কিংবা খানিকটা চিনি দেন — চায়ের চামচের এক চামচ এক বালতির জন্যে। ভারেনেৎস** অবশ্য নানাভাবে তৈরি করা যায়। এই ধরুন গিয়ে আপনার দানিয়ুব অঞ্চলের লোকরা একভাবে জিনিসটা তৈরি করেন। আবার স্পেন বা ককেশাস অঞ্চলের লোকরা অন্যভাবে তৈরি করেন। একেক অঞ্চলে একেক রকম স্বাদ-গন্ধ...'

সারাটি দিন আমি দিদিমার পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করি। তিনি হয়তো

---

* গমজাতীয় ফসলের ঝাঁজালো আরক। — সম্পাঃ

** দই। — সম্পাঃ

বাগানে বা উঠোনে গেছেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে আছি। তিনি পাড়াপড়শীর বাড়িতে বেড়াতে যান, আমিও চলি সঙ্গে সঙ্গে। পাড়াপড়শীর বাড়িতে গিয়ে দিদিমা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে চা খেতেন আর নানা রকমের গল্প বলতেন। মনে আছে, দিদিমার শারীরিক উপস্থিতির একটা অংশের মতো হয়ে উঠেছিলাম আমি। এই সময়ের কথা ভাবতে বসলে আমার মনে শুধু এই অক্লান্ত ও দয়ালু বৃদ্ধার কথাই ভেসে ওঠে — আর কিছু মনে পড়ে না।

মাঝে মাঝে কোথা থেকে মা আসে, অল্প কিছুদিন থেকেই চলে যায় আবার। তেমনি উদ্ধত, তেমনি ঋজু, পৃথিবীর দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকায় তা ছিল শীতকালের সূর্যালোকের মতো নিরুত্তাপ ও ধূসর। কোনো বারেই খুব বেশিদিন মা থাকে না, আর যখন চলে যায়, পিছনে নিজের কোনো স্মৃতি রেখে যায় না।

একদিন দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা দিদিমা, তুমি কি ডাইনী?'

দিদিমা হেসে উঠলেন: 'পাগল ছেলের কথা শোনো! কি দেখে একথাটা তোর মনে এল রে?' তারপরেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে চিন্তান্বিত স্বরে বললেন, 'তুক্‌তাক মন্ত্র জানাটা অত সহজ কথা নয়! আমি কোত্থেকে জানব বল্‌? আমার তো অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত নেই। ওদিকে তোর দাদামশাইকে দ্যাখ্‌, ভারি পণ্ডিত লোক তোর দাদামশাই। কিন্তু ভগবান আমাকে বিদ্যেবুদ্ধির দিক থেকে একেবারেই অপাত্র মনে করেছেন।'

তারপর তিনি তাঁর জীবনের এক নতুন পরিচ্ছেদের কাহিনী শোনালেন আমাকে:

'আমিও ছেলেবেলায় তোর মতোই ছিলাম রে। একেবারে অনাথা, বাপ ছিল না। আমার মা ছিল নেহাতই গরীব; বিকলাঙ্গ বলে কোথাও কাজ পেত না। মা যখন খুবই ছোট তখন এক বড়োলোকের বাড়িতে কাজ করত। একবার রাত্রে লোকটার ভয়ে মা জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। ফলে তার পাঁজরে আর কাঁধে এমন চোট লাগে যে তার একটা হাত আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। আসল হাতটাই অর্থাৎ ডান হাতটাই অক্ষম হয় এভাবে। আর লেসবোনার কাজে মা ছিল ভারি পাকা। কিন্তু হলে কি হবে, সেই ভদ্রলোক যখন দেখলেন যে মাকে দিয়ে আর কোনো কাজই করানো চলবে না তখন তিনি মাকে স্বাধীনতা দিলেন এবং তার ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ভাগ্য বললেই তো আর হবে না, নুলো লোকের কি আর ভাগ্য থাকতে পারে?

সুতরাং ভিক্ষে করা ছাড়া গতি ছিল না! যে সময়ের কথা বলছি, তখন বালাখ্না অঞ্চল ছিল খুবই বর্ধিষ্ণু। ছুতোর আর লেসবোনার কাজে এক দল আরেক দলকে টেক্কা দিত। আমার মা আর আমি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতাম। শরৎকাল আর শীতকাল এভাবেই কাটত। তারপর যখন দেবদূত গাব্রিলো তলোয়ারের খোঁচায় তুষারকে তাড়িয়ে দিতেন আর পৃথিবীর ওপরে নেমে আসত ঝক্‌ঝকে বসন্ত — তখন আমরা বেরিয়ে পড়তাম দূরে। যতোদূর চোখ যায় শুধু চলতাম, যতোক্ষণ না পা একেবারে ভারী হয়ে উঠত। কত নতুন নতুন জায়গায় যে যেতাম আমরা। যেতাম মুরোম'এ, ইউরিয়েভেৎস্'এ, ভল্‌গা আর শান্ত ওকা নদীর ধারে ধারে নানা জায়গায়। কী ভালোই যে লাগত, বসন্তকালে আর গ্রীষ্মকালে হেঁটে হেঁটে দেশ ঘুরে বেড়াতে কি চমৎকার লাগে! তুলতুলে নরম মাটি আর ভেল্‌ভেটের মতো সবুজ ঘাস। মাঠেঘাটে মেরীমাতার আশীর্বাদের মতো ফুল ফুটে থাকে। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। আর সেই খোলা আকাশের নিচে অবারিত প্রান্তর — কার মন আনন্দে ভরে ওঠে না বল্! তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মার নীল চোখদুটো বুজে আসত আর তার গানের সুর ডানা মেলে উড়ে যেত স্বর্গের দিকে। ভারি মোলায়েম আর মিষ্টি গলা ছিল আমার মায়ের — মনে হত যেন বিশ্বপ্রকৃতি চুপ হয়ে যায় সেই গান শুনে, নিশ্বাস বন্ধ করে শোনে। ভিক্ষে করবার জন্যে ঘুরে বেড়াতেও কী ভালো লাগত যে তখন! কিন্তু যখন আমার বয়স হল নয় বছর তখন আর মা আমাকে নিয়ে ভিক্ষেয় বার হত না। আর মা'র পক্ষে এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার ছিল। সুতরাং মা বালাখ্নাতেই পাকাপাকি ডেরা বাঁধল। একা একাই দোর থেকে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াত, রবিবার দিন গিয়ে বসত গির্জার চাতালে। আর আমি থাকতাম বাড়িতে, বাড়িতে বসে বসে লেসবোনা শিখতাম। কিন্তু আমার মনে হত, কাজটা শিখতে বড়ো দেরি হচ্ছে আমার। তখন আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, কি করে মা'র কিছুটা সুসার করতে পারি। এজন্যে আমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম যে যখনই আমি কোনো লেসের নক্সা ঠিকমত বুনতে পারতাম না, আমার দুচোখ ভরে জল আসত। যাই হোক্, বছর দুয়েকের মধ্যেই কিন্তু আমি কাজটা শিখে নিয়েছিলাম। আর সারা শহরে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। যখনই কোনো বিশেষ ধরনের কাজ করাবার প্রয়োজন হত, সবাই আসত আমার কাছে, এসে বলত, "কই গো আকুলিয়া, কাজ এনেছি, মাকুতে সুতো পরাও।" শুনে কত আনন্দই যে হত আমার। তবে একথাও ঠিক যে আমার জাঁক করবার কিছু ছিল না,

সবই আমার মা'র কাছ থেকে শেখা। মা নুলো হাতে লেস বুনতে পারত না বটে, কিন্তু অপরকে কি-ভাবে শেখাতে হয় জানত। আর এই শিক্ষাটাই তো আসল কথা, যে লোক ভালোভাবে শেখাতে পারে তার দাম দশজন হাতের কাজের লোকের চেয়েও বেশি। যাই হোক্ নিজেকে আর ছোট ভাবতাম না। মাকে বললাম, "মা, তুমি কিন্তু আর ভিক্ষে করতে বেরুতে পারবে না, এই বলে দিলাম। আমিই এখন হাতের কাজ করে তোমাকে খাওয়াতে পারব।" মা উত্তর দিল, "উরে বাস রে! তোর টাকা তোরই থাক বাপু, তোর বিয়ের সময় যৌতুকে লাগবে।" এর কিছুদিন পরেই এল তোর দাদামশাই — তখন তার বাইশ বছর বয়স, তরুণকান্তি চেহারা, সহজেই চোখে পড়ে। তার আগেই সে বুর্লাকদলের মোড়ল হয়েছে। তার মা আমাকে প্রথম দেখে বেছে নিল। যখন জানল, খুব গরীব আমরা আর আমি ভিখিরীর মেয়ে — তখনই ধারণা করে নিল যে আমি খুব খাটিয়ে বৌ হতে পারব... সে নিজে মিষ্টি রুটি বিক্রী করত আর ছিল খুব কড়া প্রকৃতির। যাক্ গিয়ে, মরা মানুষের নিন্দে করতে নেই... ঈশ্বর আমাদের সাহায্য না নিয়ে নিজেই সব দেখতে পান, তিনি দেখেন আর শয়তানদের তা ভালো লাগে।'

প্রাণ খুলে দরাজ গলায় দিদিমা হেসে উঠলেন। তাঁর নাকটা অদ্ভুতভাবে কাঁপতে লাগল, চোখদুটো গানের সুরের মতো আলতোভাবে আদর করতে লাগল আমাকে। ভাষায় যেটুকু বলা যায় তার চেয়েও অনেক বেশি তিনি বললেন চোখের দৃষ্টিতে।

একদিনের কথা মনে আছে, এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যা। দিদিমা আর আমি দাদামশাইয়ের ঘরে বসে চা খাচ্ছিলাম। দাদামশাইয়ের শরীরটা সুস্থ ছিল না, তিনি বসেছিলেন বিছানার ওপরে। গায়ে জামা ছিল না, কাঁধের ওপরে চাপানো ছিল মস্ত একটা তোয়ালে, মাঝে মাঝে তোয়ালেটা দিয়ে তিনি কপালের প্রচুর ঘাম মুছছিলেন। ঘড়ঘড় শব্দ করে ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছিলেন, সবুজ চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল, মুখটা লাল আর ফুলো ফুলো। বিশেষ করে তাঁর ছোট ছোট খাড়া খাড়া কানদুটো লাল হয়ে উঠেছিল। একপাত্র চা নেবার জন্যে যখন তিনি হাত বাড়ালেন, তখন দেখলাম তাঁর হাতদুটো করুণভাবে কাঁপছে। ভারি শান্ত আর নিরীহ হয়ে উঠেছেন তিনি — তাঁর স্বভাবের সঙ্গে যা একেবারেই খাপ খায় না।

'তুমি আমাকে চিনি দিচ্ছ না কেন?' আদুরে শিশুর মতো আব্দেরে গলায় দাদামশাই নালিশ জানালেন।

'চিনি দিচ্ছি না কারণ চিনির চেয়ে মধু তোমার শরীরের পক্ষে উপকারী।' সাদর তবু দৃঢ় স্বরে দিদিমা জবাব দিলেন।

তেমনি ঘড়ঘড় শব্দে নিশ্বাস নিতে নিতে, গলা দিয়ে হাঁসফাঁস শব্দ করতে করতে তাড়াতাড়ি গরম চা-টা গিলে ফেললেন তিনি আর বললেন, 'দেখো গিন্নী, আমাকে মরতে দিও না যেন।'

'তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। মরতে দেব না।'

'এই তো কথার মতো কথা। আমি যদি এখন মরে যাই তাহলে সমস্ত হিসেব গোলমেলে হয়ে যাবে — মনে হবে যেন কখনো আমি বেঁচে থাকিনি — সমস্তই নিরর্থক হবে।'

'এবার কথা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো তো দেখি।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে রইলেন তিনি। কালো ঠোঁটদুটো চাটতে লাগলেন জিভ দিয়ে। তারপর হঠাৎ এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলেন যেন কেউ তাকে চিম্‌টি কেটেছে।

'শোন গিন্নী, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় ইয়াকভ আর মিখাইলের বিয়ে দিতে হবে। বউ আর নতুন ছেলেপুলে হলে দুজনেই হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, কি বলো?'

শহরের বিবাহযোগ্যা কন্যাদের স্মরণ করে যেতে থাকেন দাদামশাই। আর দিদিমা একটিও মন্তব্য করেন না, বসে বসে শুধু গ্লাশের পর গ্লাশ চা খেয়ে যান। এদিকে আমি কোথায় যেন একটু অশোভন আচরণ করেছি, তারই শাস্তি হিসেবে দাদামশাই বাইরে যাওয়া বন্ধ করেছেন আমার। সুতরাং আমি জানলার সামনে বসে আছি, বসে বসে তাকিয়ে দেখছি বাইরের দিকে — সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর তার ঝক্‌ঝকে আলোয় কি চমৎকার লালই না দেখাচ্ছে আশেপাশের বাড়ির জানলাগুলো।

নিচে বাগানে বার্চগাছের ডালগুলোর মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে গুবরে পোকা গুন্‌গুন শব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। পাশের বাড়ির উঠোন থেকে আসছে পিপে তৈরি কাজের শব্দ — কাছেই কোথা থেকে শুনতে পাচ্ছি ছুরি শানানো চাকার আওয়াজ। বাগান পেরিয়ে নালা, সেখানে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে খেলা করছে ছোট ছেলেরা — শোনা যাচ্ছে তাদের কলধ্বনি। আমারও ভারি ইচ্ছে করছে বাইরে গিয়ে ওই ছেলের দলে যোগ দিই, আসন্ন প্রদোষের বিষণ্নতায় মনটা ভারী হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ দাদামশাই একটা নতুন বই বার করলেন। হাতের তাল্র ওপরে বইটা দিয়ে সশব্দে চপেটাঘাত করে খুশিভরা স্বরে ডাকলেন আমাকে:

'ওহে অকালকুষ্মান্ড, ওহে লম্বকর্ণ, এবার এদিকে এসো দিকি! বসো এখানে। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ এই চিহ্নটা? বলো, অ-য়ে অজগর, আ-য়ে আম, হ্রস্ব ই-য়ে ইঁদুর। আচ্ছা, এবার বল্ তো দেখি এটা কী?'

'আ-য়ে আম।'

'ঠিক হয়েছে। আচ্ছা এটা?'

'হ্রস্ব ই-য়ে ইঁদুর।'

'হল না! এটা হচ্ছে অ-য়ে অজগর। আচ্ছা, এবার এই চিহ্নটাকে ভালো করে দ্যাখ্, এটা হচ্ছে দীর্ঘ ঈ-য়ে ঈগল। হ্রস্ব উ-য়ে উট। পড়্লি তো? এবার বল্ দিকিনি এটা কি?'

'হ্রস্ব উ-য়ে উট।'

'ঠিক হয়েছে। এটা?'

'দীর্ঘ ঈ-য়ে ঈগল।'

'বাঃ, বেশ বেশ। এটা?'

'অ-য়ে অজগর।'

দিদিমা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবারে দাদামশাইকে বললেন, 'তুমি অত কথা বোলো না, একটু চুপ করে শুয়ে থাকো।'

'থামো তো তুমি। বরং এতেই আমি ভালো থাকছি। ভাবনাচিন্তাগুলো মনের মধ্যে থাকছে না। পড়ে যা লেক্সেই।'

দাদামশাই তাঁর উষ্ণ ভিজে-ভিজে একটা হাত আমার কাঁধের ওপর দিয়ে নিয়ে গেছেন; সে হাত দিয়েই তিনি বইয়ের অক্ষরগুলো আমাকে দেখাচ্ছেন। আর অপর হাতে বইটা ধরে আছেন প্রায় আমার নাকের ডগায়। ভিনিগার, ঘাম আর সেঁকা পেঁয়াজের একটা মেশানো গন্ধ আসছে তাঁর গা থেকে — আর এই গন্ধে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা এসেছে তাঁর মধ্যে, আর আমার কানের পাশে অনবরত চিৎকার করে বলেছেন:

'ভ-য়ে ভল্লুক, ম-য়ে মহিলা।'

শব্দগুলো আমার কাছে খুবই পরিচিত কিন্তু স্লাভনিক অক্ষরগুলোর সঙ্গে কোনো মিল নেই। ভ-অক্ষরটার সঙ্গে ভল্লুকের যতোটা মিল আছে, তার চেয়ে বেশি মিল আছে পোকার সঙ্গে। দীর্ঘ ঈ-কে দেখে কিছুতেই ঈগল বলে মনে হয় না, ওই অক্ষরটার সঙ্গে কুঁজোপিট গ্রিগরির মিলটাই যেন

বেশি। পেটমোটা ব-কে দেখে আমার মনে হয়, দিদিমা ও আমি দুজনে যেন একসঙ্গে রয়েছি। আর সমস্ত অক্ষরগুলোর মধ্যেই কোথায় যেন কি একটা আছে যা ঠিক আমার দাদামশাইয়ের মতো। দাদামশাই একেবারে উঠেপড়ে লেগেছেন, একটির পর একটি অক্ষর চিনিয়ে চলেছেন আমাকে। এক-একবার অক্ষরগুলোকে ঠিক পর-পর, যেটির পর যেটি আসে, তেমনিভাবে ধরছেন, এক-একবার ধরছেন উলটেপালটে। তাঁর উত্তেজনা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছে, আমিও ঘর্মাক্ত-কলেবর হয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলেছি। আমার কাণ্ড দেখে দাদামশাইয়ের বোধ হয় খুব মজা লাগছে। হেসে উঠতে গিয়ে তিনি ভয়ানকভাবে কেশে উঠলেন।

'দেখ, দেখ, গিন্নী, ছেলেটার কাণ্ড দেখ!' একহাতে বই এবং অন্য হাতে বুক চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন, 'ওরে আস্‌ত্রাখানী শয়তান, এমন হাঁকডাক শুরু করেছিস কেন রে?'

'আমি করছি না আপনি করছেন...'

দাদামশাই ও দিদিমার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভারি ভালো লাগছে আমার। টেবিলের ওপরে দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে, দুই হাতের মধ্যে গাল রেখে দিদিমা বসে আছেন আর আমাদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছেন।

'তোমরা থামো বাপু এবার দুজনে। মাথার খিল খুলে যাবে যে!' বললেন দিদিমা।

দাদামশাই এবারে সুর নরম করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, বুঝলি আমার না হয় অসুখ হয়েছে তাই আমি চেঁচাচ্ছি। কিন্তু তুই চেঁচাচ্ছিস কেন?'

ঘামে-ভেজা মাথাটা নাড়তে নাড়তে তারপর দিদিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাতালিয়া বেঁচে থাকতে যে-কথাটা বলেছিল তা কিন্তু ঠিক নয়। নাতালিয়া বলেছিল, ওর স্মৃতিশক্তি নাকি খুব দুর্বল। কিন্তু আমি তো দেখছি, ঘোড়ার মতো সব কথা মনে রাখতে পারে ও। ঠিক আছে থাঁদা-দাদু, এবার উঠেপড়ে লাগো!'

তারপরে একসময়ে তেমনি হাসতে হাসতে ও ঠাট্টা-তামাসা করতে করতে আমাকে বিছানা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন:

'বাস্ আর নয়। বইটা নিয়ে যা আর কষে পড়তে শুরু করে দে। কাল যদি আমাকে সবকটা অক্ষর ঠিক-ঠিক বলতে পারিস তবে আমি তোকে পাঁচ কোপেক্ দেব।'

হাত বাড়িয়ে আমি বইটা নিতে গেলাম। তিনি আমাকে নিজের দিকে টেনে নিলেন, তারপর ভাঙা-ভাঙা গলায় বিষণ্নস্বরে বলতে লাগলেন:

'কী ভাই, তোর মা'র কি একটুও দরদ নেই রে? নইলে এমন ছেলেকে ফেলে চলে যায়?'

'আবার কেন এসব কথা তুল্‌ছ? কিছু লাভ আছে?' বলে উঠলেন দিদিমা।

'বলি কি আর সাধে? আমার দুঃখ বলতে আমাকে বাধ্য করে যে... ইস্‌, ইস্‌, এমন মেয়েটা উচ্ছন্নে গেল!'

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন আমাকে।

'যা, এবার বাইরে একটু খেলা কর গিয়ে। কিন্তু খবরদার রাস্তায় যাসনে যেন — শুধু উঠোনে আর বাগানে খেলা করবি, বুঝলি?'

বাগানে যাবার জন্যেই আমি এতক্ষণ উস্‌খুস্‌ করছিলাম। জানি, যে-মুহূর্তে আমি বাগানে গিয়ে বাঁধের উপর দাঁড়াব, উল্‌টো দিকের ঝোপঝাড় থেকে ছেলের দল আমার দিকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করবে। আমিও তাই চাই, আমিও পাল্‌টা পাথর ছুঁড়তে শুরু করি।

আমাকে দেখলেই ওরা চিৎকার করে ওঠে, 'ওই আসছে রে, টুস্‌কা আসছে। নিয়ে আয় রে তাড়াতাড়ি!' তারপর সবাই মিলে ওদের অস্ত্রাগারের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে লেগে যায়।

টুস্‌কা বলে ওরা কি বোঝাতে চায় আমি জানি না। সুতরাং আমি একটুও অপমানিত বোধ করি না। কিন্তু যখন দেখি, একদিকে এক দঙ্গল ছেলে, আরেকদিকে আমি একা — তখন ভারি মজা লাগে আমার। একটিমাত্র পাথর ঠিক মতো তাক্‌ করে ছুঁড়তে পারলে শত্রুকে, ওরা পোঁ পোঁ করে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে লুকোয় ঝোপের আড়ালে। লড়াইটা হয় অত্যন্ত নির্দোষ ধরনের, এর মধ্যে কোনো রকম রাগারাগি ফাটাফাটি নেই বা লড়াইয়ের পর মনের মধ্যে কোনো ক্ষোভও থাকে না।

বর্ণপরিচয় হতে আমার খুব বেশি সময় লাগল না। আর বোধ হয় এই জন্যেই দাদামশাই আমার দিকে ক্রমশ বেশি করে নজর দিতে লাগলেন এবং ঘন ঘন বেতমারার অভ্যেসটা ছেড়ে দিলেন। তার মানে এই নয় যে আমি খুব সুবোধ বালক হয়ে উঠেছিলাম। বরং যতোই আমার বয়স ও সাহস বাড়ছিল ততোই দৌরাত্ম্য বাড়ছিল, আগের চেয়ে বেশি করেই দাদামশাইয়ের বিধিনিষেধ

ভাঙতে শুরু করলাম। কিন্তু তবুও তিনি পিঠে বেত না ভেঙে আমায় শুধু তিরস্কার করতেন আর ঘুষি উঁচিয়ে শাসাতেন।

আমার মনে হতে লাগল যে দাদামশাইয়ের হাতে নিতান্ত অকারণেই আমি বহু মার খেয়েছি। একদিন সে-কথাটা সোজাসুজি তাঁর মুখের ওপরে বললাম।

উত্তরে তিনি আমার থুত্‌নিটা একটু নেড়ে দিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'কি ব-ল্‌-লি-ই-ই কি-ই-ই?' তালুর সঙ্গে জিভের একটা শব্দ করে টেনে টেনে বললেন তিনি।

'ওরে ছুঁচো, ওরে গিদ্ধড়, তোকে উত্তম-মধ্যম দেব কি দেব না, তা ঠিক করব আমি — তুই ব্যাটা কে রে? আমি যা করব তাই হবে — বুঝলি হতভাগা?'

আমি মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, তিনি আমার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকালেন।

'তুই কি চালাক না একেবারে গবেট?'

'আমি জানি না।'

'জানি না বলছিস তো? তাহলে শোন্‌, আমি বলে রাখছি। ধূর্ত হতে চেষ্টা করিস — গবেট হওয়ার চেয়ে ধূর্ত হওয়া ভালো। গবেট হয় ভেড়ারা — বুঝেছিস? এবার যা, খেলা কর্‌ গিয়ে।'

কিছুদিনের মধ্যেই আমি আরম্ভ করি প্‌সাল্টির* পড়তে। বইয়ের যে-কোনো লাইনের প্রতিটি অক্ষর আমি ধরে ধরে পড়তে পারি। সাধারণত আমার পড়বার সময় হচ্ছে সন্ধ্যেবেলা চায়ের পরে। আর প্রত্যেকবারেই পুরো একটি স্তোত্র আমাকে পড়তে হয়।

'স-য়ে সময়, হ্রস্ব উ-য়ে উট, খ-য়ে খাবার, সুখ, ভ-য়ে ভল্লুক, ও-কার ওড়না, গ-য়ে গগন, দীর্ঘ ঈ-য়ে ঈগল, ভোগী, সুখভোগী...' এইভাবে বানান করে করে আমি পড়ে যাই আর পড়তে পড়তে এত বিরক্তি লাগে যে নানারকম প্রশ্ন জাগে মাথার মধ্যে।

'আচ্ছা, সুখভোগী কে? ইয়াকভ-মামা?'**

* প্রার্থনা সংগীত। — সম্পাঃ

** রুশভাষায় শব্দের খেলা। সুখভোগী শব্দের অন্য মানে — মূর্খ, নির্বোধ। — সম্পাঃ

দাদামশাই রেগে ওঠেন: 'হতভাগা, কষে মাথায় গাঁট্টা মারলে তারপর টের পাবি সুখভোগী কে!' দাদামশাই যখন এই ধরনের কথা বলেন তখনই আমি টের পাই দাদামশাই আসলে রাগেননি; এভাবে কথা বলা তাঁর একটা অভ্যেস। না বললে খারাপ দেখায় তাই তিনি বলেন।

এবং আমার এই ধারণা যে ভুল নয় তা টের পেতেও বেশি দেরি হয় না। একটু পরেই তিনি ভুলে যান আমার কথা আর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলেন:

'হুঃ, গান করতে বলো, খেলা করতে বলো, তার বেলা একেবারে রাজা ডেভিডের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু কাজের বেলায়... আবেসালোমের মতো শয়তান! আহা-হা! সারাদিন শুধু নাচ, গান আর হল্লা! কেন রে বাপু? "নেচে বেড়াই ফুর্তি করি সবুজ মাঠে-মাঠে।" কিন্তু লাভটা কি হবে শুনি? নাচ তোকে কতদূরে নিয়ে যেতে পারবে?'

আমার পড়া বন্ধ হয়ে যায়, তাকিয়ে থাকি দাদামশাইয়ের দিকে। সারা মুখটার ওপরে দুশ্চিন্তার ছাপ, ভুরু কোঁচকানো, সরু সরু চোখে তাকিয়ে আছেন দূরের দিকে। চোখের দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা, ভারি অন্তরঙ্গ বলে মনে হয়। যেন তাঁর মুখের কাঠিন্যটুকু আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। কাঁপছে সোনালী ভুরুদুটো, চক্‌চক করছে রঙের ছোপ লাগানো আঙুলের নখ, আঙুল দিয়ে অস্থিরভাবে টেবিলের ওপরে টোকা দিয়ে চলেছেন।

'দাদামশাই!'

'কী রে?'

'একটা গল্প বলো না দাদামশাই।'

'পড়ার বই পড় না, কুঁড়ে বাদশা!' তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন। এমনভাবে চোখ রগড়াতে থাকেন যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন, 'প্‌সাল্টিরে তো মন নেই দেখছি! গল্প পেলেই হল, তা যে গল্পই হোক না কেন!'

কিন্তু দাদামশাইয়ের কথা শুনে আমার মনে হতে থাকে, তিনি নিজেও বোধ হয় প্‌সাল্টির চাইতে গল্প বলতে ভালোবাসেন। প্‌সাল্টিরের স্তোত্রগুলি তাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে আছে এবং প্রতিদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে তিনি কয়েকটি স্তোত্র চেঁচিয়ে পড়েন। এই স্তোত্রপাঠকে তিনি নিত্যকর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং গির্জার পাদ্‌রিরা যেমন উপাসনা-পাঠ করে তেমনি তিনি স্তোত্র পাঠ করেন।

শেষ পর্যন্ত আমাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে বৃদ্ধ বাধ্য হয়ে বলতে শুরু করেন:

'আচ্ছা বাপু বলছি। শোন, তাহলে। আর প্সাল্টির তো থাকবেই, সারা জীবন ধরেই থাকবে। কিন্তু আমি আর ক-দিন! আমার তো ওপারের ডাক আসবার সময় হল!'

পুরনো আরামকেদারার সেলাই করা দিকটায় ঠেস দিয়ে বসেন তিনি, পিছনে মাথা হেলিয়ে, চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন ছাদের ওপরে — আর পুরনো দিনের নানা স্মৃতি বলে যেতে থাকেন। ব্যবসায়ী জায়েভ'এর দোকান লুট করবার জন্যে একবার নাকি বালাখ্নাতে ডাকাতের দল এসেছিল। বিপদ ঘণ্টি বাজাবার জন্যে দাদামশাইয়ের বাবা ছুটে যাচ্ছিলেন ঘণ্টাঘরের দিকে; ডাকাতের দল তাঁকে ধরে ফেলে, তলোয়ার দিয়ে তাঁর শরীরটাকে কুচি কচি করে কাটে আর টুকরোগুলো ঘণ্টাঘরের ওপর থেকে ছুঁড়ে দেয় মাটিতে।

'আমি তখন খুবই ছোট। এসব ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখিনি আর আমার কিছু মনেও নেই। প্রথম যে ঘটনা আমি মনে করতে পারি তা হচ্ছে ফরাসীদের এদেশে আসা। সেটা ছিল ১৮১২ সাল — আমার বয়স তখন ঠিক বারো। সে-সময়ে বালাখ্নাতে জন-ত্রিশ ফরাসী বন্দীকে নিয়ে আসা হয়েছিল। মানুষগুলো শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, রোগা হাড়-জিরজিরে চেহারা, হাতের সামনে যা পেয়েছে তাই পরেছে — ভিখিরিরও অধম অবস্থা। শীতে কুঁকড়ে গেছে লোকগুলো, ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। ঠাণ্ডা লেগে হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে কয়েকজনের — তাদের উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। গাঁয়ের চাষীরা লোকগুলোকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু লোকগুলোর সঙ্গে যে সান্ত্রীর দল ছিল তারা বাধা দিল। তারপর ছাউনি থেকে এল সৈন্যরা। চাষীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে ফিরিয়ে দিল যার যার ঘরের দিকে। এই ধরনের ঘটনা অবশ্য পরে আর কোনো দিন ঘটেনি — পাশাপাশি থাকতে থাকতে ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল দু-দলেই। দেখা গেল, ফরাসীরা ভারি চালাকচতুর, যে-কোনো অবস্থায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে, হাসি-খুশি-আমুদে। আর মেজাজ এলেই গলা ছেড়ে গান শুরু করে দেয়। ফরাসী বন্দীদের দেখবার জন্যে নিজ্নি-নভ্গরোদ থেকে হোমরাচোমরা লোকরা আসত ত্রয়কা চেপে। কেউ কেউ ফরাসীদের গালিগালাজ করত, কেউ কেউ তাদের মুখের সামনে ঘুষি উঁচিয়ে শাসাত, কেউ কেউ মারধোর পর্যন্ত করত। আবার কেউ কেউ ছিল যারা ফরাসী ভাষাতেই তাদের সঙ্গে খুব দরদের সঙ্গে

কথা বলত, তাদের খুশি করবার জন্যে টাকাপয়সা ও পুরনো জামাকাপড় দিত। এক বৃদ্ধের কথা আমার মনে আছে, শহরের এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, তিনি তো দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন আর বলতে লাগলেন— "এই শয়তান বোনাপার্টটার জন্যেই ফরাসীদের এই অবস্থা!" একবার ভাব্‌তো দেখি ব্যাপারটা। একে রুশদেশের লোক, তার ওপরে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক — কিন্তু কী নরম হৃদয়! বিদেশী লোকদের দুঃখেও তাঁর মন কাঁদে!...'

মুহূর্তের জন্যে তিনি চুপ করেন, চোখ বুজে আঙুল চালাতে থাকেন চুলের মধ্যে। পরে অতীতের মধ্যে ডুবে গিয়ে সতর্কভাবে আবার স্মৃতিমন্থন করে চলেন।

'সময়টা ছিল শীতকাল। সে কী হাড়কাঁপানো শীত, হি-হি হাওয়া আর তুষারঝড়। তুষার জমে জমে বাড়িঘর আট্‌কা পড়ে যেত। এই অবস্থায় ফরাসীরা ছুটে-ছুটে আসত আর আমাদের বাড়ির জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করত আমার মা'কে। আমার মা বাজারে বিক্রি করবার জন্যে এক ধরনের পিঠে তৈরি করতেন; সেই পিঠের জন্যে ফরাসীরা জানলার সামনে লাফঝাঁপ হাঁকডাক শুরু করে দিত আর ঠক্‌ঠক শব্দে টোকা দিত জানলায়। মা তাদের বাড়ির ভিতরে আসতে দিতেন না। জানলার ফাঁক দিয়ে পিঠে দিতেন তাদের হাতে। চুল্লির ভিতর থেকে সদ্য বার করে আনা সেইসব পিঠে, তখনো ধোঁয়া বার হচ্ছে আর আগুনের মতো গরম — কিন্তু লোকগুলো করত কি, সেই অবস্থাতেই পিঠেগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে জামার তলায় হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরত গায়ের চামড়ার ওপরে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শরীর আর বুকের ভিতরটাকে ছ্যাঁকা দিয়ে গরম করতে চেষ্টা করত এইভাবে। কি করে যে এতটা সহ্য করতে পারত জানি না! ওরা নিজেরা গরম দেশের লোক, এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর তুষারপাতে ওরা অভ্যস্ত নয়—ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে ওদের মধ্যে কত লোক যে মারা গিয়েছিল! আমাদের বাড়ির বাগানের দিকে ছিল একটা স্নানঘর, সেই ঘরে দুজন ফরাসী থাকত। একজন অফিসার, আর একজন তার এ্যাড্‌জুটাণ্ট — নাম মিরন। লম্বা, রোগা চেহারা অফিসারটির, যেন শুধু হাড় আর চামড়া। হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে-পড়া স্ত্রীলোকের কোট গায়ে চাপিয়ে ঘুরে বেড়াত। এমনিতে লোকটি ছিল সদয় কিন্তু রোজই মদ গিলত আর মাতলামি করত। আমার মা'র আরেকটা ব্যবসা ছিল — বীয়ার বানিয়ে বিক্রি করা। সেই লোকটি এই বীয়ার কিনে খেতে শুরু করত আর একেবারে মাতাল না হওয়া পর্যন্ত থামত না। আর তারপরেই শুরু হত গান।

আমাদের ভাষায় একটু-আধটু কথা বলতে পারার পর থেকেই সে মন্তব্য করত — "আপনাদের এই দেশটা সাদা নয়, দেশটা কালো — খারাপ!" তার কথাগুলো ছিল খুবই ভাঙা-ভাঙা কিন্তু সে কি বলতে চাইছে তা বুঝতে অসুবিধে হত না। আর সত্যি কথাই বলত সে, আমাদের দেশের এই উত্তরাঞ্চল সত্যিই তো আর স্বর্গরাজ্য নয়। কথাটা বুঝতে পারবি যদি ভল্‌গা নদী ধরে বরাবর দক্ষিণ দিকে নেমে যাস। দেখবি, দেশের আবহাওয়া ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছে। আর তারপর কাস্পীয় সাগর পেরিয়ে গেলে মনে হবে, সে-দেশের মাটি কোনো কালে বরফে ঢাকা পড়ে না। এ সব ঠিক। ধর্মের বই, সুসমাচার ও প্‌সাল্টিরে এ সব লেখা আছে। এই বইগুলিতে তুষারপাত বা শীতকালের কোনো উল্লেখ কোথাও নেই। তাহলেই ভেবে দ্যাখ্‌, যীশু খৃীষ্ট তো ওই দেশেই জীবন কাটিয়েছেন... এই তো আমরা এখন প্‌সাল্টির পড়ছি, এটা শেষ হয়ে গেলেই সুসমাচার ধরব।'

আবার তাঁর মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় যেন ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ ঘুমে ঢলে পড়েছেন, খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে আধ-চোখে তাকিয়ে থাকেন, আর সমস্ত শরীরটা হয়ে ওঠে ছোট ও কেমন যেন খাড়া।

'কই দাদামশাই, বলুন!' শান্তভাবে আমি তাগিদ দিই।

চমকে উঠে তিনি বলেন, 'ও হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন? ফরাসীদের কথা, না? হ্যাঁ শোন্‌ তাহলে। ওরাও তো মানুষ! আমাদের চেয়ে যে নিকৃষ্ট স্তরের জীব, তা তো নয়! আমার মা'কে ওরা ডাকত "মাদাম" বলে, ওদের ভাষায় "মাদাম" কথাটার মানে "ভদ্রমহিলা"। কিন্তু "ভদ্রমহিলাটিকে" দেখা যেত, আড়াই-মণি এক-একটা ময়দার বস্তা অক্লেশে বয়ে এনে সার দিয়ে দিয়ে রাখছেন। অসুরের মতো ক্ষমতা ছিল তাঁর গায়ে। আমার যখন উনিশ বছর বয়স তখনো তিনি আমার চুলের মুঠি ধরে পাখির পালকের মতো আমাকে তুলে নিয়ে যেখানে-সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখ্‌, বিশ বছর বয়সে আমি নিজেও এমন কিছু রোগাপট্‌কা ছিলাম না। এ্যাড্‌জুটান্ট মিরন ছিল উঁচুদরের ঘোড়ার সমঝদার, ঘোড়া সে খুব ভালোবাসত। ঘোড়াকে একটু পরিচর্যা করতে পাবার জন্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত সে, হাত নেড়ে ইঙ্গিতে অনুমতি চাইত সবার কাছে। প্রথম প্রথম লোকে ভয় পেত; হাজার হোক শত্রুপক্ষের লোক, হয়তো ঘোড়াগুলোর সর্বনাশ করে দেবে। কিন্তু কিছুদিন পরে গাঁয়ের চাষীরা নিজেরাই ডাকাডাকি

করত মিরনকে: "ওহে মিরন, একটু শুনে যাও তো এদিকে!" ডাক শুনে হাসত মিরন, ষাঁড়ের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে ছুটে আসত। তার চুলগুলো ছিল গাজরের মতো লাল, নাকটা প্রকাণ্ড, ঠোঁটদুটো পুরু। ঘোড়ার পরিচর্যা-কাজে সে ছিল ওস্তাদ এবং ঘোড়ার নানারকম অসুখের চিকিৎসাও সে জানত। পরে এই নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদে ঘোড়ার চিকিৎসক হিসেবে সে থেকে গেল। কিন্তু লোকটার মাথা খারাপ হয়ে যায়। দমকলের লোকেরা ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। আর সেই অফিসারটির হল কি, ক্রমেই কেমন যেন শুকিয়ে শুকিয়ে আসতে লাগল। তারপর বসন্তকালে একদিন দেখা গেল যে সে মরে পড়ে আছে। এত নিঃশব্দে মরেছে যে কেউ টের পায়নি। সেটা ছিল সেণ্ট নিকোলাই দিবস, স্নানঘরের জানলার সামনে বসে বসে সে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিল, সেই অবস্থাতেই জানলার ওপরে মাথা কাৎ করে মারা গেছে।

'লোকটার জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল, কেঁদেওছিলাম। ভারি ভালো লোক ছিল। আমার কানের কাছে মুখ এনে প্রায়ই সে নিজের ভাষায় শান্ত গলায় কি-সব বলত। তার কথা আমি বুঝতে পারতাম না, কিন্তু ভারি চমৎকার লাগত আমার, বুঝতে পারতাম আমাকে আদর করেই কিছু বলছে। এই সংসারে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে আদর করে কিছু বলছে— এ-জিনিসটাই তো দুর্লভ! একবার সে আমাকে তার নিজের ভাষা শেখাতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু আমার মা বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, মা আমাকে নিয়ে এক পাদরির কাছে হাজির হয়। সেই পাদরি অফিসারটির নামে নালিশ করে আর আমাকে আচ্ছা করে মার দেবার হুকুম দেয়। বুঝলি তো দাদু, সেকালে সব বিষয়েই খুব বেশিরকম কড়াকড়ি ছিল! সেকালে আমাদের যতো কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে একালে তোদের তা করতে হয় না। যেসব কষ্ট তোদের সহ্য করতে হত তা তোরা আসবার আগেই তোদের হয়ে অন্য আরেক দল সহ্য করে গেছে। এই কথাটি কখনো যেন ভুলিসনে দাদু! এই ধর না আমার কথা — কী কষ্টই না আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল!'

অন্ধকার হয়ে আসে। সেই অন্ধকারে দাদামশাই বেখাপ্পা রকমের বড়ো হয়ে ওঠেন, তাঁর চোখদুটো বেড়ালের চোখের মতো জ্বলতে থাকে। দাদামশাই যখন গল্প বলেন তখন তাঁর গলার স্বরটা শান্ত থাকে, ভেবেচিন্তে রসিয়ে-রসিয়ে কথা বলেন; কিন্তু নিজের সম্পর্কে বলতে শুরু করলেই তাঁর গলার স্বরটা আবেগদীপ্ত হয়ে ওঠে, তখন তিনি জাঁক করতে শুরু করেন। দাদামশাইয়ের মুখে তাঁর নিজের কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না।

আর, 'এটা মনে রাখিস, এটা ভুলিসনে' বলে তিনি অনবরত যে উপদেশামৃত বর্ষণ করেন তাও আমার পছন্দ নয়।

এমন অনেক বিষয়ে তিনি আমাকে বলেছেন যা ভুলে যেতে পারলেই আমি খুশি হই। কিন্তু কথাগুলো যন্ত্রণাদায়ক ছুঁচের মতো আমার মনের মধ্যে বিঁধে আছে। কিছুতেই ভুলতে পারি না। আর সেই বিশেষ কথাটি মনে রাখবার উপদেশ তিনি একবারও না দিলেও ভুলতে পারি না। তিনি আমাকে কোনো দিন রূপকথা বলেননি, যা বলেছেন সবই সত্যি ঘটনার বিবরণ। আর আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, প্রশ্ন করলে দাদামশাই বিরক্ত হন। আমিও সেইজন্যে ইচ্ছে করেই হাজার রকম প্রশ্ন করে চলি।

'আচ্ছা দাদামশাই, রুশরা ভালো না ফরাসীরা ভালো?'

'কে জানে বাপু, অত-শত জানিনে। ফ্রান্সে গিয়ে তো আর আমি ফরাসীদের দেখতে যাইনি।' তারপরেই আবার বলেন, 'নিজের গর্তের মধ্যে যখন বসে থাকে তখন ইঁদুরও ভালো!'

'তাহলে রুশরা? রুশরা সবাই ভালো?'

'সবাই নয়, কেউ কেউ। রুশরা যখন ভূমিদাস ছিল তখন তাদের অবস্থা এখনকার চেয়েও ভালো ছিল। ঠিক যেন পেটালোহার মতো। এখন স্বাধীনতা পেয়ে গেছে কিন্তু খাবার সংস্থান নেই। এই ধর্ না কেন ভদ্রলোকদের কথা। ওদের প্রাণে দয়ামায়া বলে কোনো পদার্থ নেই — কিন্তু চাষীদের চেয়ে ওদের সাধারণ বুদ্ধিটা বেশি। অবশ্য সব ভদ্রলোকদের সম্পর্কেই একথা বলা যায় না। কিন্তু কথাটা কি জানিস, কোনো ভদ্রলোক একবার যদি ভালো হয় তবে সে সত্যি সত্যিই খুব ভালো হয়। আবার ভদ্রলোকদের মধ্যেই কতগুলো আছে একেবারে নিরেট বোকা — ঠিক বস্তার মতো। যা খুশি তাই দিয়ে ঠেসে দাও, মুখে রা-টি নেই। আমাদের মধ্যে ভেতর-ফাঁপা লোকের সংখ্যাই বেশি। প্রথমে দেখে মনে হয় যেন একটা গোটা মানুষ, কিন্তু আরেকটু ভালো করে তাকালেই বোঝা যায় যে ভেতরের সমস্ত শাঁস পোকায় খেয়ে ফেলেছে, শুধু খোলসটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখন আমাদের কী দরকার জানিস? দরকার একটু শেখা, দরকার বুদ্ধিকে আরেকটু শানিয়ে তোলা... কিন্তু শান দেবার মতো কোনো জিনিসই নেই...'

'আচ্ছা রুশদের কি খুব শক্তি আছে?'

'তা কারও কারও আছে বৈকি। তবে শক্তিটা তো আর আসল কথা নয়,

আসল কথা হচ্ছে দক্ষতা। সবচেয়ে শক্তিশালী লোকও দেখবি একটা ঘোড়ার চেয়েও দুর্বল।'

'ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল কেন দাদামশাই?'

'যুদ্ধের কথাই যদি বলিস তো শোন্। ওটা হচ্ছে জারের ব্যাপার, যুদ্ধ হবে কি হবে না তা তিনিই বুঝবেন। আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে ওটা বুঝবার কথা নয়।'

আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, বোনাপার্ট কে? এই প্রশ্নের জবাবে দাদামশাই যা বলেছিলেন তা আমি জীবনে ভুলব না। দাদামশাই বলেছিলেন:

'ও ছিল খুব সাহসী একজন লোক। গোটা পৃথিবীটাকে ও দখল করে নিতে চেয়েছিল। কেন জানিস? ও চেয়েছিল, মানুষে মানুষে কোনো ভেদ থাকবে না — জমিদার থাকবে না, বড় চাকুরে থাকবে না, সব সমান হয়ে যাবে। মানুষের নামগুলোই শুধু আলাদা থেকে যাবে — কিন্তু সুযোগ-সুবিধার কোনো কমতি-বাড়তি হবে না। এমন কি মানুষের ধর্মকর্মগুলো পর্যন্ত এক হয়ে যাবে। কথাটার অবশ্যই কোনো মানে হয় না; একমাত্র কাঁকড়া ছাড়া আর কোনো প্রাণীই সবাই একরকম হয় না। এই ধর না মাছের কথা— মাছের মধ্যে পর্যন্ত কত আলাদা আলাদা ধরন-ধারণ রয়েছে। চাঁদামাছ সামন মাছ দেখলে পালিয়ে পালিয়ে যায়, হেরিংমাছ আর স্টার্জনমাছ তো পাশাপাশি থাকতেই পারে না। আমাদের দেশেও এমনি ধরনের বোনাপার্টরা ছিল — যেমন ধর, স্তেপান রাজিন বা এমেলিয়ান পুগাচভ*। কিন্তু এদের কথা আজ থাক্, আরেক দিন শুনবি...'

মাঝে মাঝে চোখদুটোকে বড়ো বড়ো করে আমার দিকে বহুক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হয় যেন তিনি এই প্রথম আমাকে দেখছেন। বড়ো অস্বস্তি লাগে আমার।

কিন্তু আমার বাবা বা মা'র কথা কোনো দিন আমি দাদামশাইয়ের মুখে শুনিনি।

আমাদের দুজনের মধ্যে যখন এই ধরনের কথাবার্তা হয় তখন মাঝে মাঝে দিদিমা এসে ঢোকেন ঘরে। নিঃশব্দে কোণের একটি আসনে বসে চুপচাপ শোনেন আমাদের কথা। তারপর হঠাৎ একেক সময়ে তাঁর স্বাভাবিক

* কৃষক-অভ্যুত্থানের দুজন নেতা। — সম্পাঃ

দরদভরা গলায় একেকটা প্রশ্ন করে বসেন, 'কর্তা, মনে পড়ে আমরা সেই যে মেরীমাতার কাছে প্রার্থনা করার জন্য মুরোম তীর্থে গিয়েছিলাম, কি ভালোই না লেগেছিলো? সেটা কোন বছর বল তো?'

'তা আমার ঠিক মনে নেই। তবে যে বছর কলেরা লেগেছিল, তার আগে। সেই যে গো, ওলন্‌চানরা বনে গিয়ে পালিয়েছিল আর তাদের খুঁজে বার করবার জন্যে সারা বন তোলপাড় করা হয়েছিল — সেই বছর।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। এবার আমার মনে পড়ছে, সেই লোকগুলোকে কী ভয়ই না করতাম আমরা!..'

'হুঁ!'

ওলন্‌চানরা কারা, আর কেনই বা তারা বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, আমি সেকথা জিজ্ঞেস করি। অনিচ্ছার সঙ্গে দাদামশাই জবাব দেন:

'ওরা হচ্ছে একদল গাঁয়ের লোক — ভূমিদাস। জারের কারখানায় কাজ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।'

'ওদের ধরল কী করে?'

'আর কী করে ধরবে? দেখিসনি, বাচ্চারা যখন খেলা করে তখন একদল ছোটে আর একদল তাদের পাকড়াও করবার জন্যে পেছনে পেছনে ধাওয়া করে। আর একবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। সমানে চলবে চাবুক আর বেতের বাড়ি, নাক ফেটে যাবে আর তারপর কপালের ওপরে দাগী বলে ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হবে।'

'কেন? ছাপ লাগাবে কেন?'

'কেন কে জানে? আগাগোড়া ব্যাপারটাই ছিল ভারি অস্পষ্ট। কেউ বলতে পারত না দোষটা কার — যারা পালিয়েছে তাদের না যারা পাকড়াও করেছে তাদের।'

দিদিমা আবার অন্য একটা কথা পেড়ে বসেন: 'মনে আছে গো তোমার, সেই যে মস্ত এক অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল — সেই সময়কার কথা?'

'কোন্ অগ্নিকাণ্ডের কথা বলছ তুমি?' একটা অবিচলিত জেদের সঙ্গে দাদামশাই প্রশ্ন করেন, যে-বিশেষ ঘটনার কথা দিদিমা বলছেন সে-সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে চান।

পুরনো স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়ে আমার উপস্থিতির কথা দুজনেই ভুলে যান। শান্তভাবে কথা বলেন দুজনে, সেই কথায় এমন একটা পরিমিত ছন্দ আছে যে মনে হয় একসঙ্গে একটা গান গাইছেন দুজনে। বড় বিষণ্ণ

বিষয়বস্তু সেই গানের — কবে আগুন লেগেছিল আর মহামারী শুরু হয়েছিল, কোথায় মানুষকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়েছে, দুর্ঘটনায় মারা গেছে কোন্ লোক, জাল-জোচ্চুরি, ধর্মান্ধতা, উচ্চতর শ্রেণীর ভদ্রলোকদের ক্রোধোন্মত্ততা, এই সব।

দাদামশাই বিড়বিড় করে বলেন, 'কত কিছুই না এই চোখদুটো দিয়ে দেখতে হয়েছে! কত ঝড়ঝাপ্টাই না গেছে এই জীবনটার ওপর দিয়ে!'

দিদিমা বলেন, 'আর আমাদের জীবনটা যে খুব খারাপ কাটিয়েছি— তাও নয়। কি বলো? ভারিয়ার যখন জন্ম হয়, কি সুন্দর বসন্তকাল এসেছিল সেবার!'

'সেটা ছিল ১৮৪৮ সালের কথা, সেই বছরেই হাঙ্গেরির ওপরে আমাদের সৈন্যরা চড়াও হয়। ভারভারাকে যেদিন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হল তার পরদিনই ওর ধর্মবাপ তিহনকে নিয়ে চলে যায়...'

দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, 'সেই যাওয়াই ওর শেষ যাওয়া।'

'হ্যাঁ, শেষ যাওয়া! সেই দিন থেকেই ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি আমরা পেয়েছি। ভেলার ওপর দিয়ে জল যেমন অনবরত গড়িয়ে পড়ে তেমনি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিও আমাদের ওপর গড়িয়ে এসেছিল। আহ-হা ভারভারা... সর্বনাশী...'

'যাক্ গিয়ে, ওসব কথা আর তুলো না...'

'কেন তুলব না?' দাদামশাই রেগে ওঠেন, 'ছেলেমেয়েগুলো সব অপোগণ্ড হয়েছে, একটাও যদি কোনো একটা দিকেও একটু ভালো হত! আমাদের শক্তি-সামর্থ্য মিথ্যেই আমরা জলাঞ্জলি দিয়েছি! আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম, একটা নিটোল ও অক্ষত পাত্রে চলেছে ভবিষ্যতের সঞ্চয়। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই লীলা যে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, যেটাকে আমরা নিটোল ও অক্ষত পাত্র বলে মনে করেছিলাম সেটা আসলে একটা ঝাঁজরা চালুনি...'

দাদামশাই এমনভাবে চিৎকার করে ওঠেন যেন কোনো কিছুতে ছ্যাঁকা লেগেছে, ঘরের চারদিকে ছুটোছুটি লাগিয়ে দেন, হা-হুতাশ করেন, নিজের ছেলেমেয়েদের যাচ্ছেতাই বলতে থাকেন আর হাড়-বের-করা হাতের মুঠি পাকিয়ে দিদিমাকে শাসাতে থাকেন।

'তোমার দোষেই ছেলেমেয়েগুলো উচ্ছন্নে গেছে। ডাইনী বুড়ী, সায় দিউনী!..'

গলার স্বরে এত বেশি তিক্ততা থাকে, যে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, ছুটে গিয়ে উপাসনা-বেদীর সামনে দাঁড়ান আর টিপ্‌টিপে রোগা বুকে চাপড় মারতে মারতে কান্নাভরা গলায় বিলাপ করতে থাকেন:

'তোমার কাছে আমি কী দোষ করেছি প্রভু? আমার মতো দুর্ভাগা আর তো কাউকে দেখিনে!'

ভিজে চোখদুটোতে যন্ত্রণা আর অভিসম্পাতের চিহ্ন ফুটে ওঠে, চক্‌চক করে চোখদুটো, সারা শরীর কাঁপে।

দিদিমা অন্ধকার কোণটিতে নিঃশব্দে বসে থাকেন আর বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন আঁকেন। শেষকালে দিদিমা উঠে এসে দাদামশাইয়ের কাছে দাঁড়ান, মিনতিভরা স্বরে বলেন:

'কেন মিথ্যে নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? প্রভুর লীলা একমাত্র তিনি নিজেই বোঝেন। আর সব বাড়িতেই তো এই এক অবস্থা — আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতোই অন্য সব বাড়ির ছেলেমেয়ে। দিনরাত শুধু ঝগড়া মারামারি নিয়েই আছে। সব বাপ-মাকেই চোখের জলে নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। একা তুমি নও...'

মাঝে মাঝে দিদিমার এই কথা শুনে দাদামশাই শান্ত হন, এবং ক্লান্তভাবে বিছানায় শুয়ে পড়েন। দাদামশাই শুয়ে পড়লে পর আমরা দুজনে পা টিপে টিপে ছাদের ঘরে চলে যাই।

কিন্তু একদিন হয়েছে কি, দাদামশাইকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে দিদিমা সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দাদামশাই দিদিমার মুখের ওপরে দুম্‌ করে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারলেন। দিদিমার সারা শরীরটা টলে উঠল, হাত দিয়ে তিনি নিজের ঠোঁটদুটো চেপে ধরলেন। তারপর একটু সামলে উঠতে পারলে পর শান্ত অনুত্তেজিত স্বরে বললেন:

'তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে...' বলে তিনি দাদামশাইয়ের পায়ের কাছে মুখ থেকে রক্ত ফেললেন। মাথার ওপর দু-হাত তুলে দাদামশাই চেরা গলায় চিৎকার করতে লাগলেন:

'বেরিয়ে যাও বলছি! নইলে খুন করব!'

'বুদ্ধিশুদ্ধি গেছে!' দরজার দিকে যেতে যেতে দিদিমা আবার বললেন। দাদামশাই ছুটে এলেন দিদিমার পিছনে পিছনে। কিন্তু দিদিমা একটুও তাড়াহুড়ো না করে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে এসে দাদামশাইয়ের মুখের ওপরেই সশব্দে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

'ডাইনী মাগী!' দাঁতে দাঁত চেপে দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন। জ্বলন্ত কয়লার মতো ফুঁসছেন তিনি, দরজার বাজুটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছেন, হাতের নখ দিয়ে আঁচড় কাটছেন বাজুর ওপরে।

চুল্লির উপরে মৃতপ্রায় অবস্থায় আমি বসেছিলাম। নিজের চোখকে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার সামনেই দিদিমার গায়ে হাত তুলতে দাদামশাইকে আমি এই প্রথম দেখছি। ব্যাপারটার কুশ্রীতায় আমি যেন চুরমার হয়ে গেছি! দাদামশাইয়ের এক নতুন চেহারা আমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে এবং এই চেহারাটা এমনই যে কোনো কিছু দিয়েই সমর্থন করা যায় না; ভয়ঙ্কর একটা বোঝার মতো সে চেপে ধরেছে আমাকে। দরজার বাজু আঁকড়ে ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন দাদামশাই। একটু একটু করে কুঁকড়ে যাচ্ছেন, একটু একটু করে ম্লান হয়ে যাচ্ছেন আর যেন সারা গায়ে ছাইয়ের গুঁড়ো এসে পড়েছে। হঠাৎ ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, হাঁটু মুড়ে বসে দুই হাতে ভর রেখে ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে। তারপরেই আবার শরীরটাকে টান করে নিয়ে দুই হাতে বুকের ওপর চাপড় মারতে মারতে চিৎকার করে উঠলেন:

'হায় ঈশ্বর! হায় ঈশ্বর!..'

চুল্লির আঁচে গরম তাকের ওপর থেকে আমি নেমে এলাম। তারপর ছুটে গেলাম ওপরে। দিদিমা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন আর জল দিয়ে মুখ কুলকুচো করছেন।

'ব্যথা লাগছে?'

এক কোণে গিয়ে ময়লা জল ফেলবার বালতির মধ্যে তিনি মুখ কুলকুচো করে জল ফেললেন। তারপর শান্তস্বরে জবাব দিলেন: 'নাঃ, ঠিক আছে। দাঁত ভাঙেনি, শুধু ঠোঁটের ওপর কেটে গেছে খানিকটা।'

'দাদামশাই কেন করলেন একাজ?'

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দিদিমা জবাব দিলেন, 'মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। বুড়ো হয়েছে তো, আর জীবনের ওপর দিয়ে কম ঝড়ঝাপ্টা তো যায়নি, এ-অবস্থায় মেজাজ ঠিক রাখা খুবই শক্ত... আচ্ছা, তুই এবারে শুয়ে পড় গে যা। এ ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলিস...'

আমি আরও কি যেন একটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক তীব্রতার সঙ্গে তিনি জবাব দিলেন, 'কথা কানে ঢুকছে না বুঝি?.. ভারি ত্যাঁদড় ছেলে তো...'

জানলার সামনে বসে তিনি ঠোঁট চুষতে লাগলেন। মাঝে মাঝে থুতু ফেলতে লাগলেন রুমালের মধ্যে। জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে আমি দিদিমার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দিদিমার মাথার ওপর দিয়ে একটুকরো চৌকোণা তারা-ছিটনো আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাইরে চারদিক ভারি শান্ত, ভিতরে থমথমে অন্ধকার।

আমি বিছানায় শুয়ে পড়তেই দিদিমা এগিয়ে এলেন বিছানার কাছে, আমার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তুই ঘুমো, ঘুমের মধ্যে ছট্‌ফট করিসনে যেন... আমি তোর দাদামশাইয়ের কাছে যাচ্ছি... সোনা আমার, আমার কথা ভেবে মন খারাপ করিসনে... আমার নিজের দোষটাও কম নয়... আচ্ছা, এবার ঘুমো তুই!'

আমাকে চুমু খেয়ে দিদিমা বেরিয়ে গেলেন। আমার মনটা অসহ্য খারাপ হয়ে গেল। নরম ও উষ্ণ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে আমি গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালাম। বাইরে জনশূন্য রাস্তা, অসহ্য এক যন্ত্রণায় বোবা হয়ে সেই রাস্তার দিকে চেয়ে রইলাম আমি।

ছয়

জীবনটা আমার আবার রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে উঠল। একদিন সন্ধ্যার সময় চা খাবার পরে আমি দাদামশাইয়ের পাশে বসে প্‌সাল্টির থেকে পড়া করছি, দিদিমা ডিশ ধুচ্ছেন—এমন সময় ছুটতে ছুটতে ইয়াকভ-মামা এসে হাজির। ইয়াকভ-মামার তেমনি চিরাচরিত উষ্ক-খুষ্ক চেহারা — জীর্ণ ঝাঁটার মতো দেখাচ্ছে তাকে। ঘরে ঢুকে কোনোরকম কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করল না; টুপিটা কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলে ভয়ানক উত্তেজিতভাবে হাত নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল:

'মিখাইলটা হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে, বাবা! আমাদের ওখানে সন্ধ্যের সময় খেতে এসেছিল, তারপর মদ খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে আর ভয়ানক পাগলামি শুরু করে দিয়েছে। সে যে কী পাগলামি তা আর কী বলব। কাপডিশ ভেঙেছে; একজনের ফরমাশী একটা পশমের পোশাক ছিল, সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে; জানলা ভেঙেছে; আমাকে আর গ্রিগরিকে গালাগালি দিয়েছে। এখন রাস্তায় বেরিয়েছে এদিকে আসবে বলে। আপনার ওপরে কী রাগ! রাগে ফুঁসছে আর বলছে, বুড়োকে আজ দেখে

নেব! বুড়োর দাড়িগুলো সব উপড়িয়ে ফেলব! বুড়োকে খুন করব! এসব কথা চিৎকার করে বলছে আর এদিকে আসছে। আপনি বরং রাস্তার দিকে একটু নজর রাখবেন...'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দাদামশাই আস্তে আস্তে দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মুখটা বেঁকে নাকের দিকে উঠে এল—ঠিক যেন একটা ধারালো টাঙ্গির মতো দেখতে হল।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে দাদামশাই উচ্চ স্বরে চিৎকার করলেন, 'শুনলে তো তোমার ছেলের কীর্তি! কী গুণধর ছেলে! নিজের বাপকেই খুন করতে চায়! কী মনে হচ্ছে গো তোমার! তবে হ্যাঁ, আমিও বলে রাখছি... আর সময় হয়ে এসেছে... সময় হয়ে এসেছে...'

কাঁধদুটোকে টান করে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন, তারপর দরজার কাছে গিয়ে প্রকাণ্ড লোহার হুড়কোটা তুলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

'আসল ব্যাপারটা যে কী, তা আমি জানি।' ইয়াকভ-মামার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'তোমাদের দুজনেরই নজর রয়েছে ভারভারার যৌতুকের টাকাটার ওপর। কিন্তু জেনে রেখো, কিচ্ছু লাভ নেই, এই অষ্টরম্ভাটি পাবে।' বলে তিনি হাতের আঙুলগুলো ইয়াকভ-মামার নাকের নিচে নাচাতে লাগলেন।

'তা আমার ওপর তম্বি করে লাভ কী?' লাফিয়ে দু-পা পিছনে সরে গিয়ে অপমানিত স্বরে ইয়াকভ-মামা বলল।

'তোমাকে চিনতে বাকি আছে? তুমিও এই দলে আছ।'

দিদিমা একটি কথাও বললেন না। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করে কাপডিশগুলো আলমারিতে তুলে রাখতে লাগলেন।

'আমি তো এসেছিলাম আপনাকে বাঁচাতে।'

বিদ্রূপের হাসি হেসে দাদামশাই বললেন, 'তাই নাকি? বেশ, বেশ! বাস্তবিক ভালো রসিকতা জানিস! কোথায় গেলে গো গিন্নী, তোমার এই শয়তানের ধাড়ী পুত্ররত্নটির হাতে যা-হোক একটা কিছু দিয়ে রাখ, চুল্লী খোঁচাবার লোহা বা ইস্ত্রি বা এই ধরনের যা-হোক কিছু। আর তোমাকেও বলে রাখছি ইয়াকভ ভাসিলিয়েভিচ — দরজা ভেঙে যেই না তোমার ভাইটি ঘরে ঢুকবে অমনি ধাঁই করে তাকে এক ঘা কষিয়ে দিও! সব দায়িত্ব আমার!'

মামা হাতদুটো পকেটে ঢুকিয়ে এককোণে সরে দাঁড়াল।

'বেশ, আমার কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়...'

মেঝের ওপরে পা ঠুকতে ঠুকতে দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন, 'তোর কথায় বিশ্বাস করব? তোর কথায়! আমি বরং বেড়ালকে বিশ্বাস করব, ইঁদুরকে বিশ্বাস করব, কুকুরকে বিশ্বাস করব — কিন্তু তোকে বিশ্বাস করব না। ভাবছিস, আমি কিছু বুঝি না? তোরই কাজ এটা — তুই-ই ওকে মদ খাইয়ে খাইয়ে মাতাল করে ক্ষেপিয়ে তুলেছিস! এখন হয় তুই তোর ভাইকে খুন করবি, না হয় আমাকে খুন করবি—যা-হোক একটা কিছু করতে হবে তোকে! কোন্‌টা করবি, এখন থেকেই ঠিক করে রেখে দে!'

আমার দিকে ফিরে দিদিমা চাপা স্বরে বললেন, 'যা তো, ছুটে ওপরের ঘরে চলে যা। জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ্‌ তো গিয়ে মিখাইল-মামা আসে কিনা। যদি দেখিস আসছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিয়ে যাবি। যা, ছুটে চলে যা!'

দিদিমার কথা শুনে আমি ওপরের ঘরে গিয়ে জানলার পাশে স্থান করে নিয়ে দাঁড়ালাম। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আমার মামা যখন এসে হাজির হবে তখন কী কান্ডটা যে হবে তা ভেবে একটু ভয়-ভয়ও করছিল আমার। আবার, এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার যে আমার ওপর দেওয়া হয়েছে তাই ভেবে গর্বে ফুলেও উঠছিল বুকটা। চওড়া রাস্তা, পুরু হয়ে ধুলো জমেছে আর সেই ধুলোর মধ্যে মধ্যে জেগে আছে পাথরের গোল কিনারাগুলো। রাস্তাটা বাঁ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে, একটা নালা ডিঙিয়ে অস্ত্রোজনায়া স্কোয়ার পর্যন্ত। সেখানে কাদামাটির মতো জমি, তারই ওপর টান করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো জেলখানার ছাইরঙা বাড়িটা। চারকোণে চারটে উঁচু উঁচু গম্বুজ। এই চিত্তাকর্ষক বাড়িটায় কেমন একটা বিষাদমাখা সৌন্দর্য আছে। ডানদিকে, আমাদের বাড়ি থেকে তিনটে বাড়ি পরেই রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে সেন্নায়া স্কোয়ারে। স্কোয়ারের অন্য দিকের সীমানায় আর একটি জেলের হল্‌দে ব্যারাক আর ছাইরঙা অগ্নি-গম্বুজ। কোথাও আগুন লেগেছে কিনা দেখবার জন্যে এই গম্বুজের ওপর থেকে একজন লোক চারদিকে নজর রাখে; শেকলবাঁধা কুকুরের মতো অনবরত চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায় লোকটি। কতগুলো সরু সরু নালা স্কোয়ারটাকে চিরে দিয়েছে, তার মধ্যে একটি নালা সবুজ ক্লেদে ভরা। ডানদিকে দ্যুকভ পুকুর। দিদিমার মুখে শুনেছি, এই দ্যুকভ পুকুরেই

একবার আমার মামারা আমার বাবাকে বরফের একটা ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। যে-জানলায় আমি দাঁড়িয়ে আছি তার প্রায় উল্‌টো দিকেই একটা গলি-রাস্তা, দু-ধারে বিচিত্রবর্ণের ছোট ছোট বাড়ি; 'তিন ঋষির' গির্জায় গিয়ে গলিটা শেষ হয়েছে। জানলা দিয়ে সোজাসুজি বাইরের দিকে তাকালে বাড়ির চালগুলোকে মনে হয় যেন সবুজ গাছপালার ঢেউয়ের মাঝখানে কতগুলো উল্‌টনো নৌকো।

আমাদের এই রাস্তার বাড়িগুলোর গায়ে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। সারাটা শীতকাল তুষার লেগে-লেগে আর শরৎকালের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ধুয়ে-ধুয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে বাড়িগুলো। গির্জার চত্বরে অপেক্ষমাণ ভিখিরির পালের মতো জড়াজড়ি গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলো, উদ্‌গত জানলার প্রচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে চারদিক। মনে হয়, আমি যেমন একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি, তেমনি এই বাড়িগুলোও কোনো কিছুর অপেক্ষা করছে। রাস্তায় যা দু-একজন লোককে দেখা যাচ্ছিল তাদের কারও কোনো তাড়াহুড়ো নেই; আরশোলা যেমন চিন্তাভারগ্রস্তের মতো উনুনের গা বেয়ে ওঠে, তাদের চলাফেরাও তেমনি। ভারী গরম বাতাসের হল্‌কা উঠে আসছিল জানলার কাছে, বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছিল বসন্তকালের পেঁয়াজ বা গাজরে ঠাসা 'পিরগ' রান্নার বিশ্রী একটা গন্ধ। এই গন্ধটায় আমার মন সর্বদা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

দৃশ্যটা অস্বস্তিকর — এমন অদ্ভুত রকমের অস্বস্তিকর যে প্রায় অসহ্য। আমার বুকের ভিতরটা যেন গলা সীসেতে ভর্তি হয়ে গেছে, বুকে আর পাঁজরে অনবরত ধাক্কা দিচ্ছে সেই সীসে, বুদ্‌বুদের মতো আমি যেন ক্রমশ ফুলে ফুলে উঠছি — শেষকালে মনে হতে লাগল, কফিনের ঢাকনার মতো সিলিং চাপা এই ছোট ঘরের মধ্যে আমি আর কিছুতেই আঁটতে পারি না।

হঠাৎ মিখাইল-মামাকে আমি দেখতে পেলাম। উল্‌টো দিকের গলি-রাস্তাটার কোণে যে ছাইরঙা বাড়িটা আছে তারই পিছন থেকে মিখাইল-মামা উঁকি দিয়ে দেখছে। মাথার টুপিটা টেনে নামিয়ে দিয়েছে নিচের দিকে, ফলে কানদুটো বেরিয়ে আছে দু-দিকে। পরনে খাটো লালচে রঙের কোট আর হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা ধুলো-মাখা বুটজুতো। একটা হাত ঢুকিয়েছে চৌকো নক্সার প্যাণ্টের একটা পকেটে, অপর হাতে দাড়ির গোছা মুঠো করে ধরে আছে। মিখাইল-মামার মুখটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু মিখাইল-মামার

দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন মতলব করছে, একলাফে রাস্তাটা পেরিয়ে এসে কালো লোমশ হাতের থাবা দিয়ে দাদামশাইয়ের বাড়িটাকে গ্রাস করবে। আমার উচিত ছিল তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গিয়ে সবাইকে বলা যে মিখাইল-মামা এসে গেছে কিন্তু জানলাটার কাছ থেকে আমি কিছুতেই নিজেকে সরিয়ে আনতে পারছিলাম না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, মিখাইল-মামা পা টিপে টিপে রাস্তা পার হচ্ছে — পা ফেলার ধরন দেখে মনে হতে পারে, ছাইরঙা বুটজুতোয় রাস্তার ধুলো-ময়লা লেগে যাবার আশঙ্কায় যেন সে সন্ত্রস্ত। তারপরেই শুনতে পেলাম, দরজা খোলার কিচ-কিচ শব্দ আর কাঁচের ঠুন্‌ঠুন্‌ আওয়াজ — মিখাইল-মামা শুঁড়িখানার দরজা খুলছে।

ছুটে নিচে গিয়ে আমি দাদামশাইয়ের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম।

দাদামশাই দরজা খুললেন না, ভিতর থেকে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে? ও, তুমি? কি চাই? শুঁড়িখানায় ঢুকেছে বলছ? আচ্ছা বেশ, যেখানে ছিলে সেখানেই যাও আবার!'

'আমার ভয় করছে...'

'কিছু হবে না।'

আমি আবার ফিরে গেলাম। অন্ধকার হয়ে আসছে। ক্রমশ আরো পুরু ও আরো কালো হয়ে আসছে রাস্তার ধুলো। জানলায় জানলায় দেখা যাচ্ছে চক্‌চকে হল্‌দে বাতি। রাস্তার উল্‌টো দিকের বাড়ি থেকে তারের বাজনার শব্দ ভেসে আসছে — বিষণ্ণ একটা গানের সুর কিন্তু ভারি চমৎকার। শুঁড়িখানায় কে যেন গান গাইছে। যখনই কেউ দরজা খোলে, একটা ভাঙা-ভাঙা ক্লান্ত স্বরের গান আমি শুনতে পাই। কানা ভিখিরি নিকিতুশ্‌কার গলা। বুড়ো হয়েছে নিকিতুশ্‌কা, একমুখ দাড়ি, বাঁ চোখের পাতা শক্তভাবে আঁটা, ডান চোখটা টকটকে লাল অঙ্গারের মতো। দরজাটা খুলছে, বন্ধ হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গানটাও কুড়ুল দিয়ে কাটার মতো টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

এই ভিখিরিটির ওপর আমার দিদিমার ভয়ানক হিংসে। যতোবার ওকে গান গাইতে শোনেন, ততোবারই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর বলেন, 'লোকটার কী বরাত! কতো সুন্দর গান গাইতে জানে!'

মাঝে মাঝে তিনি ওকে আমাদের বাড়ির মধ্যে ডেকে আনেন। অলিন্দের ওপর বসে ও, হাতের লাঠিটার ওপর শরীরের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে, তারপর

গান গায় ও আবৃত্তি করে। দিদিমা বসেন ঠিক ওর পাশটিতে, ওর গান বা আবৃত্তির মাঝখানেই মাঝে মাঝে নানারকম প্রশ্ন করে ওঠেন।

'তার মানে তুমি বলতে চাও যে মেরীমাতা র‍্যাজানেও গিয়েছিলেন?'

নীচু গলায় ও জবাব দেয়, 'মেরীমাতা যাননি এমন কোনো জায়গা নেই...'

একটা ক্লান্ত ঝিমুনি অলক্ষ্যে যেন রাস্তাটাকে গ্রাস করছে। আমার বুকের ওপরেও যেন চেপে বসেছে এই ঝিমুনির ভাব, আমার চোখদুটো ঘুমে ঢুলে আসছে। এই সময়ে যদি আমার দিদিমা আমার পাশটিতে থাকতেন! এমন কি, দাদামশাইও যদি থাকতেন! আমার বাবা নিশ্চয়ই এই বিচিত্র প্রকৃতির লোক ছিল। দাদামশাই ও মামারা আমার বাবার ওপরে এমন হাড়ে-হাড়ে চটা কেন? দিদিমা, গ্রিগরি আর ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার বাবার প্রশংসায় এমন পঞ্চমুখ কেন? আর মাই বা কোথায় চলে গেল?

সম্প্রতি মা'র কথাটাই আমার বারবার করে মনে পড়ে। কল্পনার চোখে দেখি, দিদিমা আমাকে যা-কিছু গল্প ও কাহিনী বলেন তার নায়িকা হচ্ছে আমার মা। মা যে নিজের বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকতে চায়নি এতে মা'র ওপরে আমার শ্রদ্ধা আরো অনেক বেশি বেড়ে গেছে। মনে মনে কল্পনা করি, মা আছে কোনো এক সরাইখানায় এক দস্যুদলের সঙ্গে। তারা ধনীদের টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলি করে। কিংবা মা হয়তো আছে গভীর অরণ্যে এক গুহার মধ্যে, এখানেও আছে তেমনি এক দরাজ-দিল ডাকাতের দল, মা তাদের জন্যে রান্না করে আর তাদের লুণ্ঠিত সোনা পাহারা দেয়। আবার কোনো কোনো সময়ে কল্পনা করি আমার মা যেন 'ডাকাত-রাজকুমারী' ইয়েনগালিচেভার মতো পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর ধনদৌলত গুণে দেখবার জন্যে। তার সঙ্গে আছেন পুণ্যময়ী মেরীমাতা। 'ডাকাত-রাজকুমারীকে' তিনি যা বলেছিলেন, আমার মাকেও তাই বলছেন:

> ধরণীর গর্ভে হতে, লুব্ধা, তব তরে --
> উত্তোলিত হয় নাই রজত-কাঞ্চন;
> ঢাকিতে নারিবে কভু, রে লালসাময়ী
> তব লজ্জা পৃথিবীর সকল সম্পদ...

এই শুনে 'ডাকাত-রাজকুমারী' যে-ভাষায় জবাব দিয়েছিল আমার মাও ঠিক সেই জবাবই দিচ্ছে:

> পুণ্যময়ী দেবী মোর ক্ষমা কর মাতা,
> আত্মা মোর কলুষিত, দয়া কর মোরে;

কিন্তু নহে নিজ তরে, প্রিয় পুত্র লাগি
আমার এ দস্যুবৃত্তি, সম্পদ লুণ্ঠন।

পুণ্যময়ী মেরীমাতার মনটা ছিল আমার দিদিমার মতোই নরম। আমার মা'র জবাব শুনে মাকে তিনি ক্ষমা করলেন এবং বললেন:

চতুরা শৃগালী সম রে ভারিয়া তুই
তাতারী চরিত্র তব শোধন অযোগ্য!
নিজ পথ একান্তই না ছাড়িবি যদি — তবে পথ বাছি লহ,
দিবাভাগ কর্ পরিহার
কিন্তু যেন রুশভূমি নিবাসী মানব নাহি হয়
তব হস্তে কভু নিপীড়িত,
অরণ্যের পথে মর্দোভীয় কেহ কষাঘাতে না হয় জর্জর,
কালমিক কেহ যেন স্তেপ-ভূমে না হয় নিহত ..

মনে হতে লাগল, আমি স্বপ্ন দেখছি। এই সমস্ত গল্পগাথা আমার স্মৃতিতে ভিড় করে আসতে লাগল আর আমি তার মধ্যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললাম। হঠাৎ নিচের বারান্দার দিক থেকে একটা তর্জন-গর্জন ও হুটোপাটির শব্দ প্রচন্ড ধাক্কায় জাগিয়ে দিল আমাকে। জানলা দিয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখলাম — আমার দাদামশাই, ইয়াকভ-মামা আর শুঁড়িখানার মালিকের অদ্ভুত চেহারার চাকর মেলিয়ান, এই তিনজনে ধাক্কা দিতে দিতে মিখাইল-মামাকে গেট দিয়ে রাস্তায় বার করে দিচ্ছে। মিখাইল-মামা তেড়েফুঁড়ে ফিরে আসছে বারবার আর ওরা তাকে লাথি মারছে, তার হাতে-পিঠে-কাঁধে সমানে কিল-চড় চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মিখাইল-মামা ছিট্‌কে গিয়ে রাস্তার ধুলোর ওপরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গেটটা দড়াম করে বন্ধ করে এঁটে দেওয়া হল একেবারে। দেওয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল মিখাইল-মামার দুমড়নো-মোচড়ানো টুপিটা। তারপরেই সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় পড়ে থেকে উঠে দাঁড়াল মিখাইল-মামা। জামাপ্যাণ্ট ছিঁড়ে গেছে, বিপর্যস্ত চেহারা, উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তা থেকে পাথর তুলে ছুঁড়ে মারল গেটের দিকে। নলের মধ্যে নুড়ি ফেললে যেমন ফাঁপা আওয়াজ হয় তেমনি আওয়াজ হল একটা। শুঁড়িখানা থেকে কালো মুখওলা একদল লোক পিলপিল করে বেরিয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল আর হাত নাড়তে লাগল। বাড়ির জানলাগুলো থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল মানুষের মাথা, হাঁকডাক-চিৎকার-হাসিতে প্রাণের সাড়া জাগল রাস্তায়। এও

একটা রূপকথার গল্পের মতো — মনকে টানে কিন্তু ভালো লাগে না, এমন কি ভয় জাগিয়ে তোলে।

হঠাৎ এই দৃশ্যের ওপরে যবনিকা নেমে এল। চারদিক জনমানবশূন্য ও নিস্তব্ধ।

...দরজার কাছে ট্রাঙ্কের ওপরে আমার দিদিমা বসে আছেন। নিশ্চল শরীরটা কুঁজো হয়ে দলা পাকিয়ে ছোট্ট এতটুকু হয়ে গেছে যেন, নিশ্বাসও পড়ছে না বোধ হয়। আমি দিদিমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তাঁর নরম উষ্ণ ভিজে গালের ওপরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে। কিন্তু মনে হচ্ছে, দিদিমা তা টের পাচ্ছেন না, বসে বসে আপন মনেই শুধু বিড়বিড় করে বলে চলেছেন:

'হায় প্রভু, তোমার বিচার-বিবেচনার ভাণ্ডার কি এতই ছোট যে আমার আর আমার ছেলেমেয়েদের বেলায় তার ছিটেফোঁটাটুকুও অবশিষ্ট রইল না? তুমিই সহায় প্রভু...'

যতোদূর মনে পড়ে, পলেভায়া স্ট্রীটের বাড়িতে এক বছরের বেশি আমার দাদামশাই ছিলেন না — এক বসন্ত থেকে আরেক বসন্ত পর্যন্ত। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়িটার কুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় প্রতি রবিবারেই রাস্তার চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলো ছুটতে ছুটতে আমাদের বাড়ির গেটের সামনে আসত আর সারা পাড়াকে জানানি দিয়ে প্রচণ্ড উল্লাসে চিৎকার করত:

ওরে, আয় রে আয়, কাশিরিনদের বাড়িতে আবার মারামারি শুরু হয়েছে!'

সাধারণত মিখাইল-মামা আসত সন্ধ্যার সময় আর সারা রাত এখান থেকে নড়ত না। বাড়ির লোকেরাও একটা আতঙ্ক নিয়ে মারামারির জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করত। মাঝে মাঝে আবার মিখাইল-মামার সঙ্গে থাকত তার দু-তিনজন চ্যালা—কুনাভিনো কারখানার গুণ্ডা-ধরনের ছোক্‌রা সব। নালা পার করে তারা এসে ঢুকত বাগানে আর সেখানে তাদের মাতলামির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে যেত। বাগানে ফুলফলের যা কিছু গাছগাছড়া ছিল সমস্ত উপড়ে ফেলেছিল। একদিন এসে তারা ঢুকল স্নানঘরে এবং সেখানে ভাঙবার মতো যা কিছু ছিল সমস্ত ভেঙে চুরে স্নানঘরটা একেবারে নষ্ট করে দিয়ে গেল। বেঞ্চি, তাক, জল ফুটবার বয়লার কিছুই তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল না। চুল্লিটাকে

ভেঙে দু-খানা করে ফেলল, মেঝে থেকে কয়েকটা পাটাতন টেনে উপড়ে ফেলল, বাজু সমেত দরজাটা ফাঁক করে ফেলল একেবারে।

দাদামশাই কালো মুখে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন তাঁর জিনিসপত্র ভাঙাচোরার শব্দ। দিদিমা ছুটে চলে গেলেন উঠোনের কোথায় এবং উঠোনের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন একেবারে। শুধু তাঁর কাতর মিনতিভরা গলার স্বর ভেসে আসল:

'মিখাইল! ওরে মিখাইল! কি করছিস তুই ভেবে দ্যাখ্!'

উত্তরে কুৎসিত প্রলাপের মতো কতগুলি গালি ভেসে এল। যে-জানোয়ারেরা এই গালিগুলো উগ্রিয়েছে তাদের নিশ্চয়ই এমন বুদ্ধি বা বিবেচনা ছিল না যে একবার ভেবে দেখে এই গালিগুলোর অর্থ কী।

এ রকম একবারে দিদিমার পিছনে পিছনে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু একা একা থাকতেও ভয় করে। নিচে নেমে আমি দাদামশাইয়ের ঘরে গেলাম।

'হারামজাদা, বেরিয়ে যা বলছি এখান থেকে।' আমাকে দেখতে পেয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন।

ছুটে গিয়ে আবার ছাদের ঘরে উঠলাম আর তাকিয়ে রইলাম বাগানের অন্ধকারের দিকে। চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা করি দিদিমাকে, চিৎকার করে ডাকতে থাকি তাঁকে। আমার ভয় হচ্ছিল, দিদিমাকে ওরা মেরে ফেলবে। দিদিমা ফিরে আসেন না। কিন্তু আমার গলার স্বর শুনতে পেয়ে মাতাল মিখাইল-মামা এবার আমার মাকে উদ্দেশ করেই কুৎসিত গালাগালি দিতে লাগে।

এমনি আরেক সন্ধ্যায় আমার দাদামশাই অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। বালিশে তোয়ালে মোড়া মাথাটা অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করতে করতে মনের দুঃখ প্রকাশ করছিলেন চিৎকার করে:

'সারা জীবন এত জ্বলেপুড়ে, এত পাপ করে, অন্যায় করে, আমি যে টাকাপয়সা জমালাম — তা এর জন্যে! আমারই মুখে কালি পড়বে, নইলে ওটাকে ধরে আমি পুলিসে দিতাম আর আগামীকালই লাটসায়েবের সামনে উপস্থিত করতাম... কিন্তু কী লজ্জার কথা! কস্মিনকালে কেউ শুনেছে যে নিজের ছেলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পুলিসের সাহায্য বাপমাকে চাইতে হয়? শুনে রাখ্ রে বুড়ো তাহলে, তোর আর কোনো উপায় নেই, এমনিভাবেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে চুপ করে সহ্য করতে হবে!..'

কিন্তু হঠাৎ দাদামশাই এক হ্যাঁচ্‌কা টানে পা-দুটো বিছানার ধার দিয়ে নামিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চললেন জানলার দিকে। দিদিমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দাদামশাইয়ের একটা হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একি, কোথায় চলেছ?'

'একটা আলো জ্বালাও তো!' বললেন দাদামশাই। ভয়ানকভাবে হাঁপাচ্ছিলেন তিনি।

দিদিমা মোমবাতি জ্বালালেন আর তখন তিনি সেই জ্বলন্ত মোমবাতিটাকে বন্দুকের মতো সামনের দিকে উঁচিয়ে ধরে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে জানলা দিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'ও রে মিশ্‌কা! রাত্রিবেলার চোর তুই, ঘেয়ো কুকুরের মতো হন্যে হয়ে...'

সঙ্গে সঙ্গে জানলার ওপরের দিকের শার্সির কাঁচটা ঝন্‌ঝন শব্দে ভেঙে পড়ল আর একটা আধলা ইট ঠক্‌ করে এসে পড়ল টেবিলটায় দিদিমার পাশে।

'ফস্‌কে গেছে!' দাদামশাইয়ের গলা দিয়ে একটা চেরা আওয়াজ বেরিয়ে এল; সে আওয়াজ কান্নারও হতে পারে, হাসিরও হতে পারে।

দিদিমা ঠিক যেমনভাবে আমাকে কোলে তুলে নেন, তেমনিভাবে দাদামশাইকে কোলে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানায় আর আতঙ্কিত স্বরে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন:

'তুমি কি পাগল হলে নাকি? যীশু খ্রীষ্টের দোহাই, একটু চুপ করে থাকো! যদি কিছু হয় তাহলে ছেলেটাকে যে সারা জীবনের জন্যে সাইবেরিয়ায় ঠেলে দেবে! ওর কি কিছু জ্ঞানগম্যি আছে? ও কি আর বুঝতে পারছে যে ও যা কাণ্ডকারখানা শুরু করেছে তাতে ধরা পড়লে সাইবেরিয়ায় যেতে হবে?'

দাদামশাই বিছানায় শুয়ে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে, কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় চিৎকার করল: 'খুন করুক, ও আমাকে খুন করুক...'

বাইরে থেকে একটা তর্জন-গর্জন ও দাপাদাপির আওয়াজ ভেসে এল। টেবিলের ওপর থেকে সেই আধলা ইটটা তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটলাম জানলার দিকে। কিন্তু দিদিমা সময় থাকতেই এক হ্যাঁচ্‌কা টানে আমাকে সরিয়ে এনে কোণের দিকে ঠেলে দিলেন।

'এই আর এক বিচ্ছু শয়তান!' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন তিনি।

আরেকবার মিখাইল-মামা এল মস্ত একটা লাঠি নিয়ে। অলিন্দের ওপর দাঁড়িয়ে সদর দরজা ভেঙে ফেলছিল। ওদিকে সদলবলে দাদামশাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, মিখাইল-মামা একবার এলেই হয় আর কি! তাঁর সঙ্গে আছে

লাঠিহাতে দ্বজন ভাড়াটে আর রুটি বেলবার বেলনটাকে হাতের মুঠোয় ধরে শ্বড়িখানা-মালিকের বিরাটবপ্ব বৌ। সবার পিছনে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করছেন দিদিমা। মিনতিভরা স্বরে দিদিমা বলে চলেছেন: 'আমাকে একবার ওর কাছে যেতে দাও! আমি একবার ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি!'

দাদামশাই হাতের লাঠিটাকে উ'চিয়ে ধরে এক পা সামনে বাড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'ভাল্লুক শিকার' ছবিটার বর্শা হাতে সেই চাষীর মতো তাঁকে দেখাচ্ছে। দিদিমা ছুটে এগিয়ে আসতেই দাদামশাই একটিও কথা না বলে পা আর কন্বইয়ের সাহায্যে ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাঁকে। প্রতীক্ষমাণ চারটি মান্বষ হিংস্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাতি ঝুলছে মাথার ওপরকার দেওয়ালে আর সেই বাতির কখনো-উজ্জ্বল কখনো-ম্লান আলো এসে পড়ছে মান্বষ চারজনের মুখের ওপরে। ছাদের ঘরে উঠবার সি'ড়িতে দাঁড়িয়ে আমি তাকিয়ে আছি, দিদিমার জন্যে উদ্বিগ্ন আমি, দিদিমাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারলে খ্বশি হই।

ওদিকে সদর দরজায় প্রচন্ডভাবে ঘা দিয়ে চলেছে মিখাইল-মামা। নিচের দিকের কব্জাটা ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে আর ভারি বিশ্রী একটা ঘশ্-ঘশ্ শব্দ হচ্ছে ওটা থেকে। দরজাটা এখন শ্বধ্ব ঝুলে আছে ওপরের কব্জার জোরেই। তবে ওটার আয়্বও আর বেশিক্ষণ নয়। দাদামশাই নিজের দলবলের দিকে তাকিয়ে গলা থেকে তেমনি বিশ্রী একটা ঘশ্-ঘশ্ শব্দ বার করে বললেন: 'খেয়াল রেখো, ওর হাত আর পা লক্ষ্য করে বাড়ি মারবে কিন্তু মাথায় নয়।'

সদর দরজার ঠিক পাশেই ছিল একটা ছোট জানলা। জানলাটা দিয়ে কোনো রকমে শ্বধ্ব একটা মান্বষের মাথা গলতে পারে। মিখাইল-মামা ইতিমধ্যেই এই জানলার কাঁচের শার্সি ভেঙে ফেলেছে। এখন কেবল অন্ধকারের দিকে একটা হাঁ-করা গর্ত আর ভাঙা কাঁচের টুকরো টুকরো অংশগ্বলো লেগে আছে গর্তের কিনারায় — চোখ উপড়ে নেওয়া শ্বন্য কোটরের মতো দেখাচ্ছে জানলাটাকে।

দিদিমা ছুটে গেলেন এই জানলার কাছে, তারপর ফাঁক দিয়ে একটা হাত বার করে দিয়ে মিখাইলের দিকে সেই হাতটা নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে বলতে লাগলেন:

'মিশা, ওরে মিশা, যীশ্ব খ্রীষ্টের দোহাই, তুই চলে যা! ওরা তোকে সারা জীবনের মতো ন্বলো করে দেবে! চলে যা তুই!'

মিখাইল-মামা হাতের লাঠিটা দিয়ে দিদিমার হাতের ওপর বাড়ি মারল।

আমি দেখতে পেলাম, ভারী একটা জিনিস বিদ্যুৎঝলকের মতো জানলার সামনে দিয়ে নেমে এসে পড়ল দিদিমার হাতের ওপরে। হাতের ওপরে বাড়ি খেয়ে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়লেন দিদিমা, কিন্তু নিশ্চল ও নির্বাক হবার আগে কোনো মতে আর একবার চিৎকার করে বলতে পারলেন: 'পালিয়ে যা, মিশ-শা...'

'হায় হায়, গিন্নী!' ভীতিপ্রদ গলায় কাৎরে উঠলেন দাদামশাই।

দরজাটা খুলে গেল আর খোলা দরজার কালো ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে ভিতরে ঢুকল মিখাইল-মামা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কোদালভর্তি ময়লার মতো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হল তাকে।

শুঁড়িখানা-মালিকের বৌ দিদিমাকে তুলে নিয়ে দাদামশাইয়ের ঘরে নিয়ে এল। শীঘ্রই সেখানে এলেন দাদামশাইও।

'হাড়-টাড় ভেঙেছে নাকি?' দিদিমার ওপরে বিষন্নমুখে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'তাই তো মনে হচ্ছে।' চোখ না খুলেই দিদিমা জবাব দিলেন, 'কিন্তু ছেলেটার কী দশা করেছো — বলো, বলো!'

দাদামশাই ফুঁসে উঠলেন, 'চুপ করো! আমি কি পশু? ওকে আমরা হাত-পা বেঁধে ভাঁড়ারে ফেলে রেখেছি। আর এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছি ওর মাথায়... পাষণ্ড দেখতে চাও তো তাকে দেখো! কেমন করে এমন সে হোলো?'

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন দিদিমা।

বিছানার ওপরে দিদিমার পাশটিতে বসে দাদামশাই বললেন, 'আর কিছুক্ষণ সহ্য করো। হাড় ঠিকমতো বসিয়ে দেবার জন্যে আমি লোক আনতে পাঠিয়েছি। এক্ষুণি এসে যাবে। আর এই তোমাকে বলে রাখছি, এই ছেলেমেয়েগুলোর জন্যেই আমাদের মরতে হবে — আয়ু না ফুরোতেই আশ্রয় নিতে হবে কবরে।'

'যা আছে সব ওদের দিয়ে দাও।'

'তাহলে ভারভারার কী হবে?'

অনেকক্ষণ ধরে চলল দুজনের কথাবার্তা। দিদিমার স্বরটা শান্ত ও যন্ত্রণাকাতর, দাদামশাইয়ের ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত।

তারপর ঘরে ঢুকল এক কুঁজো আর বেঁটে বুড়ী। আকর্ণবিস্তৃত মুখ, মাছের মতো মুখটা হাঁ-করা, তলার চিবুকটা সব সময়েই থর্‌থর্‌ করে কাঁপে

আর ওপরের ঠোঁটটাকে খাড়া একটা নাক দু-ভাগে চিরে দিয়েছে মনে হয়। বুড়ীর চোখ দেখা যায় না। পা-দুটো নাড়াবার ক্ষমতাও বুড়ীর প্রায় নেই। লাঠির ওপর ভর দিয়ে মেঝের ওপর দিয়ে পা ঘষতে ঘষতে বুড়ী এগিয়ে এল। তার হাতে ছিল একটা পুঁটলি; ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হতে লাগল পুঁটলিটার মধ্যে থেকে।

আমি ভাবলাম, এই বুড়ী আর কেউ নয়, স্বয়ং মৃত্যু দিদিমার কাছে আসছে। বুড়ীর সামনে ছুটে গিয়ে আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

দাদামশাই আমাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরলেন, তারপর কোনো রকম মায়ামমতা না দেখিয়ে হ্যাঁচ্‌কা টানে আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে উঠে এলেন ছাদের ঘরে...

সাত

অত্যন্ত অল্প বয়সে আমি বুঝতে পারলাম, আমার দাদামশাইয়ের ও দিদিমার ভগবান এক নয়।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দিদিমা সাধারণত অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় বসে বসে তাঁর মাথার সেই আশ্চর্য গোছা-গোছা চুল আঁচড়াতে থাকেন। কালো রেশমের মতো লম্বা সেই চুলের গোছা আল্‌গা করে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা ঝাঁকুনি দেন। আর নিজের চুলকে গালাগালি দিয়ে মনেব ঝাল প্রকাশ করেন। নিশ্বাস-চাপা স্বরে উচ্চারণ করেন শব্দগুলো যাতে আমার ঘুম না ভাঙে।

'তোদের মুখে আগুন, তোদের মুখে আগুন!'

তারপর চুলের জট্‌ মোটামুটি ছাড়ানো হয়ে গেলে চুলগুলোকে ঘন বেণীতে পাকিয়ে নেন এবং ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কুলকুচো করতে করতে দ্রুত হাতমুখ ধুতে শুরু করেন। ঘুমের পরে তাঁর প্রকান্ড মুখে চামড়ার ভাঁজগুলো গভীর হয়ে উঠেছে, মুখে বিরক্তির চিহ্ন — হাতমুখ ধোবার পরেও সেই বিরক্তির খানিকটা থেকে যায়। এই অবস্থাতেই তিনি এসে হাঁটু মুড়ে বসেন বিগ্রহের সামনে। তারপরেই শুরু হয় তাঁর সত্যিকার প্রাতঃকালীন অবগাহন যা তাঁর সমস্ত গ্লানিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করে দেয়।

শিরদাঁড়া সোজা করে, মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে দিয়ে তিনি প্রীতিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কাজানের মেরীমাতার গোল মুখখানার দিকে; মনের সমস্ত ভক্তি উজাড় করে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন বুকের ওপরে আর ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন:

'পুণ্যময়ী মেরীমাতা, আসন্ন এই দিনটিতে তোমার আশীর্বাদ ঢেলে দাও ...'

তারপর মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করেন, ধীরে ধীরে মাথা তোলেন, ভক্তিরুদ্ধ কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে থাকেন আবার:

'হে সকল আনন্দের উৎস, হে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, ফুলভারাবনত আপেলবৃক্ষের মতো হে ...'

অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাসকে প্রায় প্রতিদিনই তিনি নতুন নতুন ভাষার অলঙ্কারে প্রকাশ করেন। এই নতুন নতুন ভাষার অলঙ্কার শোনবার জন্যে রোজই আমি উৎকর্ণ মনোযোগে তাঁর প্রার্থনা-বাণী শুনি।

'ওগো আমার প্রাণনিধি, পবিত্র, স্বর্গীয়! তুমি আমার আত্মার আলো, আমার রক্ষক! তুমি স্বর্গের সূর্য, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি স্বর্ণাভ! তুমি স্বর্গের জননী! পাপ আমাদের দিকে ছুটে আসছে — আমাদের বাঁচাও সেই পাপের হাত থেকে, আমাদের বাঁচাও গালাগালির হাত থেকে, আর আমি যে মাঝে মাঝে অকারণে চটে যাই তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর ...'

তাঁর কালো চোখের গভীরে একটুখানি হাসি যেন ঝিকমিক করে, তাঁর বয়স আরো কমে গেছে মনে হয়, ভারি হাতখানা তুলে আস্তে আস্তে আবার তিনি বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন।

'ঈশ্বরের সন্তান হে পরমপ্রিয় যীশু, আমি এক অধম পাপী — আমাকে করুণা করো ... স্বর্গের জননীর নামে আমাকে করুণা করো ...'

তাঁর উপাসনা হয়ে ওঠে প্রশংসাসূচক নামকীর্তন, সরল ও নিষ্ঠাভরা অন্তর থেকে উৎসারিত স্তবগান।

সকালবেলা তিনি বেশিক্ষণ উপাসনা নিয়ে থাকতে পারেন না। সামোভার জ্বালানোর তাগিদ থাকে। দাদামশাই বাড়ির চাকর ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন; সুতরাং দিদিমার দেরির ফলে দাদামশাইকে যদি কোনো দিন সকালের চায়ের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয় তাহলে আর দিদিমার রক্ষে নেই। দাদামশাই সেদিন প্রচণ্ড ফাটাফাটি শুরু করে দেন আর সহজে তা থামতে চায় না।

কোনো দিন যদি দিদিমার চেয়ে আগে দাদামশাইয়ের ঘুম ভাঙে তাহলে তিনি উঠে আসেন ছাদের ঘরে আর এসে দেখেন দিদিমা উপাসনায় বসেছেন। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিদিমার উপাসনা শোনেন তিনি, তাঁর কালো পাতলা ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। পরে চায়ের টেবিলে বসে তিনি মন্তব্য করেন:

'তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হবে না গো! কি-ভাবে উপাসনা করতে হয় তা তোমায় কতদিন শিখিয়ে দিয়েছি কিন্তু সে সব তুমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছো না। জংলীদের মতো বিড়বিড় করে কী যে সব বলো কিছু বুঝি না। আর ভগবান যে কী করে এসব সহ্য করেন তাও মাথায় ঢোকে না আমার!'

বিশ্বাসভরা সুরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'ভগবান সবই বোঝেন। যা-ই বলা যাক্ না কেন, যেভাবেই বলা যাক্ না কেন, ভগবান নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন।'

'উন্মাদ তুমি, বুঝলে! -- হ্যাঃ ...'

দিদিমার ভগবান সারাদিন দিদিমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। এমন কি জন্তুজানোয়ারকেও তাঁর এই ভগবানের কথা বলেন তিনি। আর তাঁর এই ভগবানের কোনো ঝামেলা নেই। যে কেউ — মানুষ, কুকুর, পাখি, মৌমাছি, এমন কি মাঠের ঘাস পর্যন্ত নিজেকে এই ভগবানের হাতে সঁপে দিতে আপত্তি করবে না। এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছুর প্রতিই তাঁর সমান স্নেহ, সমস্ত কিছু তাঁর কাছে সমান আদরের।

শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নীর একটা পোষা হুলো-বেড়াল ছিল। ভারি সুন্দর বেড়ালটা; ছাইরঙা শরীর, সোনালী রঙের চোখদুটো; আর যদিও মিটমিটে শয়তানি ও চুরি করে খাওয়া, দু-ব্যাপারেই বেড়ালটা ছিল ওস্তাদ, তা সত্ত্বেও সবাই ভালোবাসত সেটাকে। একদিন বেড়ালটা একটা স্টার্লিংপাখি ধরেছিল। তাই না দেখে আহত পাখিটাকে বেড়ালটার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দিদিমা ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠেন:

'ওরে বিট্‌কেলে জানোয়ার, তোর প্রাণে কি ভগবানের ভয়ও নেই রে!'

দিদিমার কথা শুনে শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী আর বাড়ির দরওয়ান হাসছিল। দিদিমা ওদের দুজনের ওপরেই চটে গিয়ে চিৎকার করতে থাকেন:

'তোরা ভাবিস কী, জন্তুজানোয়াররা ভগবানের কথা জানে না? ওরে অবিশ্বাসী, শুনে রাখ্, জন্তুজানোয়ারের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে তুচ্ছ, সেও ভগবানের কথা তোদের চেয়ে কিছু কম জানে না।'

মোটা আর ভগ্নোৎসাহ খারাপ ঘোড়াটাকে সাজিয়ে আস্তে আস্তে তিনি বলেন: 'কী রে ভগবানের দাস, এত মন খারাপ কেন? বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস বুঝি? ...'

ঘোড়াটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আর মাথা নাড়ে।

তবুও আমার দাদামশাই দিনের মধ্যে যতোবার ভগবানের নাম মুখে উচ্চারণ করেন, দিদিমা তা করেন না। দিদিমার ভগবানকে আমি বুঝতে পারি, দিদিমার ভগবানকে আমার ভয় করে না, কিন্তু দিদিমার ভগবানের সামনে মিথ্যে কথা বলবার সাহস আমার নেই। তা বলাটা খুবই লজ্জার ব্যাপার মনে হয় আমার কাছে। এই লজ্জার জন্যেই আমি দিদিমার কাছে কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারি না। যে ভগবানের এত দয়া, তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব, আর যতদূর আমার মনে আছে, এ-ধরনের ইচ্ছেও আমার মনে কোনো দিন জাগেনি।

একদিন শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নীর সঙ্গে আমার দাদামশাইয়ের ঝগড়া হয়ে গেল। আমার নিরীহ দিদিমাকেও অজস্র গালি পাড়ল শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী, এমন কি একটা গাজর ছুঁড়ে মারল দিদিমার দিকে।

দিদিমা শুধু শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে দেখছি!' কিন্তু দিদিমার এই হেনস্তা দেখে আমার প্রচণ্ড রাগ হল এবং ঠিক করলাম যে-করে হোক্ এ-ব্যাপারের প্রতিশোধ নিতে হবে।

তারপর থেকে এই চিন্তাটাই আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। এই স্ত্রীলোকটির শরীরটা বিপুল, মাথায় লাল চুল, মোটা চিবুক, চোখ প্রায় নেই বললেই চলে — কি করে যে এই স্ত্রীলোকটিকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে তাই আমি ভাবতে লাগলাম।

পাড়াপড়শীদের মধ্যে যখন ঝগড়াবিবাদ হয় তখন আমি দেখেছি একজন আরেক জনের ওপরে নানাভাবে প্রতিশোধ নেয়। যেমন, বেড়ালের ল্যাজ কেটে ফেলে দেওয়া, বিষ খাইয়ে কুকুর মেরে দেওয়া, মুরগী মেরে ফেলা; কিংবা রাত্রিবেলা চুপিচুপি শত্রুপক্ষের মাটির নিচের ভাঁড়ারে ঢুকে কপি বা শশাভরা পিপেয় কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আসা; কিংবা ক্‌ভাস'এর পাত্রের মুখ খুলে দিয়ে আসা ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার এই ধরনগুলোর একটাও আমার ভালো লাগল না। এর চেয়েও ভয়ংকর এবং এর চেয়েও দুঃসাহসী কিছু একটা উপায় ভাবা দরকার।

অনেক ভেবেচিন্তে যে উপায়টা আমি বার করলাম, তা হচ্ছে এই: একদিন শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী যেই না মাটির নিচের ভাঁড়ার ঘরে নেমেছে, আমি চট্ করে মাথার ওপরকার ঢাকনাটা দিলাম বন্ধ করে। তারপর ঢাকনাটায় তালা লাগিয়ে দিয়ে মহানন্দে কিছুক্ষণ নৃত্য করলাম ঢাকনাটার ওপরে তারপরে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ছাদের ওপরে। দিদিমা রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমি ছুট্তে ছুট্তে গিয়ে দাঁড়ালাম সেখানে। আমার এই উল্লাসের কারণ দিদিমা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেননি। তারপরে ব্যাপারটা ধরতে পেরে ঠাস্ করে চড় লাগালেন কয়েকটা; মানুষের শরীরের যে-জায়গাটা চড় মারবার জন্যে তৈরি হয়েছে সেই জায়গাতেই চড় মারলেন। হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমাকে উঠোনে নিয়ে এসে ছাদে পাঠিয়ে দিলেন চাবিটা খুঁজে আনবার জন্যে। দিদিমার এই চোটপাটের বহর দেখে আমি তো হতভম্ব; একটিও কথা না বলে আমি চাবিটা এনে দিলাম দিদিমার হাতে, তারপর উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম, দিদিমা কি করেন। দেখলাম, দিদিমা বন্দিনীকে মুক্ত করে দিলেন এবং সেই স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন আমার দিকে। দুজনের মুখেই ভারি অমায়িক হাসি।

শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী তার মোটা মোটা হাতের মুঠি পাকিয়ে আমাকে শাসাল: 'আমি তোকে দেখাব!' কিন্তু মুখে একথা বললেও তার চোখশূন্য মুখটাতে সহানুভূতির হাসি ফুটে উঠেছিল, সে-মুখে এতটুকু ঝাঁজ নেই। দিদিমা আমার ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে আমাকে নিয়ে এলেন রান্নাঘরে, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'বল্ হতভাগা, কেন তুই ঢাকনাটা বন্ধ করেছিলি?'

'ও কেন তোমার দিকে গাজর ছুঁড়ে মেরেছিল?'

'ও-ও-ও! তাহলে আমার জন্যেই তুই একাজ করতে গিয়েছিলি বল্। দাঁড়া, আজ তোকে আমি মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি, ডান্পিটে শয়তান! ওই চুল্লির ছাইয়ের মধ্যে যখন তোকে গুঁজে দেব আর সারা গায়ে পিলপিল করে ইঁদুর ছুটোছুটি করবে — তখন কিছুটা বুদ্ধি আসবে! দেখো সকলে, আমার রক্ষক যে কেমন! ফাটবার আগে এই ছোট্ট বুদ্বুদকে দ্যাখো একবার। তোর দাদামশাইকে যদি বলে দিই তাহলে মারতে মারতে তোর পাছার ছালচামড়া তুলে ফেলবে — তা জানিস? যা, এক্ষুণি ঘরে গিয়ে পড়ার বই নিয়ে বোস্!'

সারাদিন দিদিমা আর আমার সঙ্গে কথা বললেন না। সন্ধ্যার সময় উপাসনায় বসার আগে তিনি এসে বসলেন আমার বিছানার

পাশে, তারপর যে কথাগুলো বললেন তা আমি কখনো ভুলব না। কথাগুলো এই:

'সোনা আমার, মানিক আমার, তোকে কতগুলো কথা বলে রাখছি, ভুলিসনে যেন। কক্ষণো বড়োদের কোনো ব্যাপারে থাকবি না। বড়রা উচ্ছন্নে গেছে — নানা প্রলোভন আর খাটুনির ফলেই। কিন্তু তুই এখনো যাসনি, এখনো না। তাই তুই তোর ছেলেমানুষী বুদ্ধি যা ভালো বলে তাই নিয়ে বড় হয়ে ওঠ, যতক্ষণ না ঈশ্বর তোর হৃদয়কে স্পর্শ করেন আর তোর পথ তোকে দেখান, দেখান কোন পথ দিয়ে তোকে এগিয়ে যেতে হবে। ভগবানই বিচার করবেন, ভগবানই শাস্তি দেবেন। তুই আমি কারও দোষগুণ বিচার করতে যাব না, সে-বিচারের ভার ভগবানের ওপর!'

এই বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার ফাঁকে তিনি একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর ডান চোখটা সরু করে বলে চললেন আবার:

'মাঝে মাঝে মনে হয় স্বয়ং প্রভুও বুঝতে পারেন না, দোষটা কার।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, তিনি তো সবই টের পান, নয় কি?'

বিষণ্ন সুরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'তা যদি পেতেন তবে পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঘটে যা আর ঘটত না। প্রভু তো স্বর্গে বসে আছেন, সেখান থেকে নিচের দিকে, পৃথিবীতে, তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি দেখেন, এই পাপী মানুষরা কি করছে। মাঝে মাঝে মানুষের দুঃখে তার বুক ফেটে যায়, অঝোরে তিনি কাঁদতে থাকেন আর বলেন, "হায় আমার সন্তানরা! আমার নিজের সন্তানরা, আমার এত আদরের সন্তানরা! তোদের দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!"'

কথাগুলো বলতে বলতে দিদিমা নিজেও কাঁদলেন। চোখের জল মুছবার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না. আইকনের কাছে গিয়ে উপাসনা করতে শুরু করলেন।

সেদিন থেকে দিদিমার ভগবান আমার আরো আপনজন হয়ে উঠলেন, তাঁকে যেন আমি আরো বেশি করে বুঝতে পারলাম।

আমাকে পড়াতে বসে দাদামশাইও আমাকে বলেন যে ভগবান সবকিছু দেখেন, সবকিছু জানেন, সব জায়গায় আছেন -- মানুষের দুঃখে বিপদে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু দাদামশাইয়ের উপাসনা দিদিমার উপাসনার মতো নয়।

সকালবেলা উঠে বিগ্রহের সামনে যাবার আগে পরিপাটি করে হাতমুখ ধুয়ে আসেন তিনি, পোশাক পরেন, মাথার লাল চুল ও দাড়ি আঁচড়ান, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক করেন গায়ের জামা, ঠিক করেন ওয়েস্টকোটের ফাঁক দিয়ে গুঁজে দেওয়া কালো স্কার্ফটা। এতগুলো কাজের প্রত্যেকটি ঠিক-ঠিক হয়ে যাবার পরে চোরের মতো পা টিপে টিপে এগিয়ে আসেন আইকনের কাছে। প্রতিদিন ঠিক একই জায়গায় দাঁড়ান তিনি, কাঠের নক্শা-বসানো মেঝের এক বিশেষ সন্ধিস্থলে, ঘোড়ার চোখের মতো দেখতে জায়গাটা। হাতদুটো সৈনিকের মতো টান করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, মাথাটা নিচু ঝুঁকে পড়ে, পাতলা ঋজু শরীর — তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে বলতে থাকেন তিনি:

'আমাদের পরম পিতা এবং তাঁর সন্তান এবং দেবাত্মার নামে।'

আর তা শুনে প্রতিবারই মনে হয়েছে, কথাগুলো উচ্চারিত হবার পরে ঘরখানার মধ্যে থমথমে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। এমন কি মাছিগুলোর ভনভনানিতেও যেন কিছুটা সাবধানী ভাব।

এবার তিনি মাথাটা পিছনদিকে ঠেলে দেন, তাঁর সোনালী দাড়ি মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যায়, কুঁচি-কুঁচি ভুরুগুলো খাড়া হয়ে ওঠে — এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে উপাসনা করেন তিনি। ঋজু গলার স্বর, বেশ জোরের সঙ্গে দাবি জানানর ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেন প্রতিটি শব্দ — মনে হয় যেন পড়া মুখস্থ বলছেন।

'মানুষের জানা-অজানার নির্মোক খসিয়ে আসুক সেই পরম বিচারের দিন... শুরু হোক্ মানুষের পাপ-পুণ্যের শেষ বিচার...'

বুকের ওপরে আলগোছে চাপড় মারতে মারতে তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে চলেন:

'হে প্রভু, শুধু তোমার কাছেই আমার পাপ... আমার পাপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকো প্রভু...'

প্রত্যেকটি শব্দের ওপরে জোর দিয়ে তিনি বন্দনা-গীত আবৃত্তি করেন, ডান পা নাচিয়ে নাচিয়ে তাল দেন সঙ্গে সঙ্গে। ভারি পরিপাটি, ভারি পরিচ্ছন্ন, ভারি প্রভুত্বব্যঞ্জক চেহারা; দেবতার প্রতিমূর্তির সামনে টান করে মেলে দিয়েছেন নিজের শরীর, আরো যেন লম্বা হয়ে উঠেছেন, আরো পাতলা, আরো ঋজু।

'হে সর্বপাপহর! আমার অন্তরের সমস্ত পাপ দূর করো, হে স্বর্গের জননী! আমার আত্মার গভীর থেকে কান্না উঠে আসছে, আমাকে করুণা করো!'

গলার স্বরটা বিলাপের মতো হয়ে ওঠে, সবুজ চোখের কোণে অশ্রুর ফোঁটা চক্‌চক্‌ করে:

'হে ঈশ্বর, আমাকে বিচার কোরো আমার কৃতকর্ম দিয়ে নয়, আমার ভক্তি দিয়ে। আমার যতোটুকু শক্তি তার চেয়ে বেশি বোঝা আমার ওপরে চাপিও না প্রভু...'

উত্তেজনা-অস্থির হাতের দ্রুত বিক্ষেপে বারবার ক্রুশচিহ্ন আঁকেন বুকের ওপরে, মাথা নাড়েন ঢুঁ-মারতে-আসা ছাগলের মতো, কথা বলেন সাঁই-সাঁই করে, নিশ্বাস ফেলেন একঘেয়ে একটানা সুরে। পরে বড় হয়ে ইহুদিদের ভজনালয় দেখে বুঝতে পারি দাদামশাই ইহুদিদের মতো উপাসনা করেন।

ইতিমধ্যে অনেকক্ষণ থেকেই টেবিলের ওপরে রাখা সামোভার থেকে বাষ্প উঠছে, বাড়িতে তৈরি পনীর দিয়ে ঠাসা সদ্য-সেঁকা যবের কেকের গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। প্রচন্ড খিদেতে গর্জন শুরু করেছে আমার পেটটা। দিদিমা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার বাজুতে ঠেস্‌ দিয়ে, চোখ মেঝের দিকে নামানো, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন আর ভুরু কোঁচকাচ্ছেন। খুশির সঙ্গে জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে সূর্যের আলো। গাছের পাতায় মুক্তোর মতো চক্‌চক্‌ করছে শিশিরবিন্দু। ভোরের বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে ধনে পাতা, কারাণ্ট আর পেকে আসা আপেলের তাজা গন্ধ। কিন্তু দাদামশাই তখনো পা নাচিয়ে নাচিয়ে একটানা সুরে প্রার্থনা করে চলেছেন:

'আমার কামনার আগুন নিভিয়ে দাও হে প্রভু, আমি অতি অধম, আমি অতি নীচ!'

দাদামশাইয়ের সকাল-সন্ধ্যার উপাসনা-বাণী আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। উপাসনা করবার সময়ে তিনি কোনো ভুল করেন কিনা বা কোনো শব্দ বাদ দিয়ে যান কিনা তা দেখবার তীব্র কৌতূহলে আমি লক্ষ্য করতাম তাঁকে।

দাদামশাইয়ের ভুলভ্রান্তি কদাচিৎ হত। আর যখনই হত, মনের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হবার মতো প্রচন্ড উল্লাসে আমি মেতে উঠতাম।

উপাসনা শেষ হলে দাদামশাই আমার দিকে আর দিদিমার দিকে তাকিয়ে বলেন: 'সুপ্রভাত!'

আমরা মাথা নিচু করি এবং এতক্ষণ অপেক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত টেবিলের চারপাশে বসি গিয়ে নিজের নিজের জায়গায়।

'আজকের উপাসনায় "যথেষ্ট" কথাটি বাদ গেছে।' দাদামশাইয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলি আমি।

'তাই নাকি রে? ঠিক বল্‌ছিস?' সন্দেহভরা গলায় দাদামশাই জিজ্ঞেস করেন।

'ঠিকই বলছি। উপাসনা করবার সময়ে এক জায়গায় তুমি বলো—"হে প্রভু, আমার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ভক্তি যেন আমার থাকে"—সেই জায়গায় "যথেষ্ট" কথাটি বাদ গেছে।'

অপরাধীর মতো চোখ পিটপিট করতে করতে দাদামশাই বলেন, 'হুঁ!'

অবশ্য এই মন্তব্যটুকু করার জন্যে পরে একদিন দাদামশাই আমার ওপর শোধ তুলে নেন কিন্তু আপাতত এই সময়টুকুর জন্যে দাদামশাইয়ের বিব্রত ভাব দেখে আমি আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠি।

একদিন দিদিমা ঠাট্টার সুরে বললেন:

'তুমি রোজই সেই একই কথা বলো, একটুও এদিক ওদিক নেই—তোমার উপাসনা শুনে শুনে ভগবানের নিশ্চয়ই একঘেয়ে লাগে!'

'কী-ই-ই?' দাদামশাই ফুঁসে উঠলেন একেবারে, 'কী বলছ তুমি, খেয়াল আছে?'

'আমি কী বলছি জান? তোমার স্রষ্টার উদ্দেশে তুমি যেসব কথা বলো তা কক্ষণো তোমার প্রাণের কথা নয়।'

রাগে লাল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাদামশাই নিজের চেয়ারে বসে লাফিয়ে উঠলেন, তারপর একটা পিরিচ ছুঁড়ে মারলেন দিদিমার দিকে। কাঁচের ওপরে করাত ঘষলে যেমন শব্দ হয় তেমনি কিচ্‌কিচ্‌ গলায় তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'ডাইনি বুড়ী, দূর হয়ে যা এখান থেকে!'

ঈশ্বরের শক্তিমত্তার কথা যখনই তিনি বলেন তখনই তিনি জোর দেন ঈশ্বরের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার ওপর। একাধিক দৃষ্টান্ত দেন তিনি। একবার একদল পাপী বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। আরেকবার পাপীদের শহর ছাই হয়ে গিয়েছিল আগুনে পুড়ে। পাপের শাস্তি হিসেবে এসেছে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। ঈশ্বর হচ্ছেন উদ্যত তলোয়ারের মতো, দুর্বৃত্তদের মাথার ওপরে উদ্যত চাবুক।

'ঈশ্বরের আইন অমান্য করার পরিণাম অতি ভয়ংকর।' পাতলা পাতলা

বাঁকা আঙ্গুলে টেবিলের ওপরে টোকা দিতে দিতে তিনি আমাকে সতর্ক করে দেন।

ঈশ্বর যে এত নিষ্ঠুর, একথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। আমার কেমন জানি সন্দেহ হতে থাকে, ঈশ্বরের নামে দাদামশাই যা কিছু বলছেন সবই তাঁর বানিয়ে বলা। তাঁর উদ্দেশ্য, এসব কথা শুনে ঈশ্বরকে আমি যতোটা ভয় করি বা না করি, তাঁকে যেন ভয় করে চলি।

আমি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'আমি যাতে তোমার অবাধ্য না হই, সেজন্যেই কি এতসব কথা বলছ?'

দাদামশাইও তেমনি সোজাসুজি জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই। একবার অবাধ্য হয়েই দেখ না, মজাটা পাইয়ে দিই!'

'কিন্তু দিদিমার বেলায়?'

কঠোর স্বরে দাদামশাই বললেন, 'ওই বুড়ী বোক্‌চণ্ডীর কথায় খবরদার, কান দিস্‌নে। তোর দিদিমা আর কোনো দিন শোধরাবে না, সারা জীবনটাই মাথায় ছিট্‌ রয়ে গেল, কোনো কিচ্ছু শিখতে পারল না। আমি তোর দিদিমাকে বলে দেব যেন এইসব গুরুতর বিষয় নিয়ে সে তোর সঙ্গে কথা না বলে। আচ্ছা, এবার আমার একটা প্রশ্নের জবাব দে দেখি: বল্‌ তো পদমর্যাদার দিক থেকে দেবদূতদের কত ভাগে ভাগ করা যায়?'

দাদামশাইয়ের প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা দাদামশাই, "উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন চাকুরেরা" কথাটার মানে কী?'

'সব কথাই তোর জানা চাই — না?' ঘোঁৎঘোঁৎ করে তিনি জবাব দিলেন, তারপর চোখের দৃষ্টি মেঝের দিকে নামিয়ে চিবোবার ভঙ্গিতে নাড়তে লাগলেন ঠোঁটদুটো। একটু পরে কি ভেবে নেহাতই অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি:

'চাকুরেরা সব এমন একদল লোক যারা আইনের কথায় ডুবে থাকে — খুসিমতো আইন গিলে ফেলতে পারে।'

'আইন কাকে বলে?'

'আইন? আইন হচ্ছে, যাকে বলা যায় — কতগুলো রীতিনীতি যা সবাই মেনে চলে।' বৃদ্ধের বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ম চোখদুটো খুশিতে চক্‌চক্‌ করছে; তিনি বলে চললেন, 'মানুষ দল বেঁধে বাস করে এবং নিজেদের মধ্যেই কতগুলি বিষয়ে একমত হয়ে নেয়। সেই সব রীতিনীতি সবাই মেনে চলে। বা বলা যায় কতগুলো নিয়ম। এগুলোকেই সবাই বলে আইন। এই ধর্‌

না কেন, বাচ্চারা যখন একসঙ্গে খেলতে আসে তখন খেলাটা কি-ভাবে চলবে সে-সম্পর্কে তারা নিজেদের মধ্যেই ঠিকঠাক করে নেয়। তারা যা ঠিকঠাক করে তাই হচ্ছে আইন।'

'আর চাকুরেরা?'

'ওরা হচ্ছে একদল খারাপ ছেলে যারা আইন মেনে চলে না।'

'কেন?'

ভুরু কুঁচকিয়ে দাদামশাই বললেন, 'ওসব কথা তুমি বুঝতে পারবে না। মানুষ যাই করুক না কেন, প্রভু আছেন সবার ওপরে। মানুষ হয়তো করতে চায় এক কিন্তু প্রভুর ইচ্ছে অন্য। মানুষের কোনো কাজ সম্পর্কেই নিশ্চিন্ত হয়ে বলা চলে না যে এটা হবেই। প্রভুর ছোট একটি নিশ্বাসের ফুৎকারে মানুষের এই সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে একমুঠি ধুলোর মতো বাতাসে উড়ে যেতে পারে।'

কিন্তু কতগুলি কারণে সরকারী চাকুরেদের সম্পর্কেই আমার কৌতূহলটা ছিল সবচেয়ে বেশি। সুতরাং সেই একই কথা আমি বারবার জিজ্ঞেস করে চললাম:

'জান দাদামশাই, ইয়াকভ-মামা একটা গান গায়, সেই গানের দুটো লাইন হচ্ছে:

দেবদূতেরা পুণ্যবান ঈশ্বরের চাকরিতে
আর চাকুরেরা কিন্তু শয়তানের নোকর।'

দাদামশাই চোখ বুজলেন, দাড়ির গোছা হাতের মুঠিতে নিয়ে চেপে ধরলেন মুখের মধ্যে। তাঁর গালদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমি বুঝতে পারলাম, প্রাণপণে হাসি চাপবার চেষ্টা করছেন দাদামশাই। বললেন:

'তোকে আর ইয়াকভকে, দুটোকেই বস্তার মধ্যে পুরে নদীর জলে ফেলে দিলে ঠিক হয়। ইয়াকভটাও যেমন হয়েছে, আর কোনো গান পায় না গাইবার মতো। আর তুইও হয়েছিস তেমনি ত্যাঁদড়, যে যাই গান গাক্ না কেন, শোনা চাই। এগুলো হচ্ছে হাড়-হাভাতেদের গান, স্বধর্মত্যাগীদের গান—বিশ্রী রসিকতা করা হয়েছে এই গানে!'

আমার মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে কী যেন ভাবলেন দাদামশাই, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ছ্যাঃ, কী সব মানুষ!'

ঈশ্বর সম্পর্কে দাদামশাইয়ের যা ধারণা সেখানে ঈশ্বর রয়েছেন সবার উঁচুতে, মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের ওপরে সর্বপ্রভুত্বময় হিসেবে। দিদিমার মতো দাদামশাইও মনে করেন যে তাঁর সমস্ত কাজেকর্মে প্রভুর হাত আছে। একা প্রভুর হাতই নয়, অসংখ্য সাধুপুরুষেরও হাত। আমার দিদিমা কিন্তু কয়েকজন মাত্র গোণাগুণতি সাধুপুরুষকে মেনে চলেন — নিকোলাই, ইউরি, ফ্রল ও লাভ্রু। এঁদের সকলেরই দয়ামায়া আছে, সকলেই খুব ভালো, গাঁ থেকে গাঁয়ে এবং শহর থেকে শহরে ঘুরে ঘুরে এঁদের সময় কাটে। মানুষকে এঁরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন — দোষেগুণে নিজেরাও হয়ে ওঠেন মানুষের মতোই। অন্য দিকে আমার দাদামশাইয়ের সাধুপুরুষরা সকলেই হচ্ছেন শহীদ। তাঁরা আইকন টান মেরে ফেলে দিয়েছেন, এক পাও পিছু না হটে লড়াই করেছেন সীজারদের সঙ্গে, আর ফলে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাঁদের কিংবা জীবন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে তাঁদের শরীর থেকে।

মাঝে মাঝে চিন্তিত ভাবে দাদামশাই বলেন:

'প্রভু যদি আমাকে একটুকু দয়া করেন, বেশি না হোক, অন্তত পাঁচশো রুবল্ লাভ রেখে এই বাড়িটা বিক্রি করে দিতে পারি — তাহলে শহীদ নিকোলাইয়ের উদ্দেশ্যে আমি একটা বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করব।'

একথা শুনে দিদিমা হাসেন আর আমাকে বলেন:

'তোর দাদামশাইয়ের বুদ্ধি দেখেছিস! এমনভাবে কথা বলে যেন তার এই বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া নিকোলাইয়ের আর কোনো কাজ নেই।'

গির্জার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তারিখ সম্বলিত একটি পাঁজি দাদামশাইয়ের ছিল। বহু বছর সে পাঁজি আমি রেখে দিয়েছিলাম। এই পাঁজির পৃষ্ঠায় দাদামশাইয়ের নিজের হাতে লেখা মন্তব্য ছিল নানা ধরনের। ইয়োহিম ও আন্না এই দিবসদুটির পাশে লাল কালির খাড়া অক্ষরে তিনি এই কথাগুলি লিখে রেখেছিলেন:

'আপনাদের দয়ায় মস্ত দুর্ভাগ্য থেকে বেঁচেছি।'

এই দুর্ভাগ্যটি যে কী, তা আমার মনে আছে। নিজের অপদার্থ ছেলেগুলোকে সাহায্য করবার চেষ্টা দাদামশাই সব সময়েই করতেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি শেষদিকে বন্ধকী কারবার শুরু করে দিলেন; দামী দামী জিনিসপত্র জমা রেখে টাকা ধার দিতেন তিনি। কে যেন পুলিসের কানে খবরটা পেঁছে দিয়েছিল, তারপর একদিন রাত্রে পুলিস আসে আমাদের বাড়ি

তল্লাশী করতে। সারা রাত সে কি দুশ্চিন্তা, তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায় না। দাদামশাই সকাল পর্যন্ত বসে বসে শুধু উপাসনা করেন। তারপর সকালবেলা আমার সামনেই এই কথাগুলো পাঁজির গায়ে লিখে রাখেন।

রাত্রিবেলা খেতে বসার আগে দাদামশাইয়ের সামনে বসে আমাকে প্সাল্টির, স্তোত্রের বই থেকে কিংবা ইয়েফরেম সিরিন'এর লেখা একাণ্ড ধর্মপুস্তকের কিছুটা পড়ে শোনাতে হয়। রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে তিনি আবার উপাসনা করতে শুরু করেন। সন্ধ্যার পরে চারদিক নিস্তব্ধ আর শুধু শোনা যায় একঘেয়ে সুরে তিনি অন্তরের অনুশোচনা প্রকাশ করে চলেছেন:

'হে পরম করুণাময় চিরন্তন রাজন, তুমিই দেবার মালিক আবার তুমিই ফিরিয়ে নাও... প্রলোভন থেকে বাঁচাও... দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করো... আমার অশ্রু আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে নিক...'

দিদিমা প্রায়ই বলেন:

'ইস্, শরীরটা ভারি ক্লান্ত লাগছে রে! মনে হচ্ছে আজ আর ভগবানের নাম নেওয়া হবে না, তার আগেই শুয়ে পড়তে হবে!'

দাদামশাই আমাকে গির্জায় নিয়ে যেতেন। শনিবারের সান্ধ্য উপাসনায় আর রবিবারের দুপুরের অনুষ্ঠানে। গির্জায় গিয়েও আমি বুঝতে পারতাম, কোন্ ঈশ্বরের ভজনা করা হচ্ছে। পাদ্রি পুরোহিতরা ভজনা করেন দাদামশাইয়ের ঈশ্বরকে আর সমবেত প্রার্থনাসঙ্গীতে ভজনা করা হয় দিদিমার ভগবানকে।

অবশ্য আমি এখানে যে ছবি দিলাম তা হচ্ছে ছেলেমানুষি বিচারবুদ্ধিতে আমি দুই ঈশ্বরের মধ্যে যে পার্থক্য টেনেছিলাম তারই খুব স্থূল একটা বর্ণনা। ঈশ্বরের মধ্যেও এই পার্থক্য টেনেছিলাম বলে তখন চিন্তাজগতে বহু ঘাতপ্রতিঘাত আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। দাদামশাইয়ের ঈশ্বরকে আমার ভয় করে এবং এই ঈশ্বরকে আমি মোটেও পছন্দ করি না। তিনি কাউকেই ভালোবাসেন না এবং কড়া নজর রাখেন সবার ওপরে। মানুষের মধ্যে যা কিছু নীচাশ্রয়ী, যা কিছু দুরাচার তাই খুঁজে বার করাতেই যেন তাঁর সমস্ত আগ্রহ নিবদ্ধ। স্পষ্টই বোঝা যায়, মানুষকে বিশ্বাস করেন না তিনি, অপেক্ষা করে আছেন কখন মানুষের মনে অনুশোচনা আসবে. আর মানুষকে শাস্তি দিতে পারলে ভারি খুশি হন।

আমার জীবনের এই দিনগুলিতে আমার মনের অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল প্রধানত ভগবানের চিন্তা। ভগবানই ছিলেন আমার কাছে জীবনের একমাত্র সৌন্দর্য। অন্যত্র শুধু নোংরামি আর হিংস্রতা দেখে দেখে আমি শিউরে উঠতাম, আমার মন ভারী হয়ে উঠত। আর এইসবের মধ্যে ভগবান ছিলেন আমার কাছে উজ্জ্বলতম ও শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ — আমার দিদিমার ভগবান, যিনি সকল মানুষের বন্ধু। আমি ব্যাকুল হয়ে ভাবতাম, কেন দাদামশাই ভগবানের করুণাময় রূপ দেখতে পান না।

আমাকে বাড়ির বাইরে গিয়ে খেলতে দেওয়া হয় না কারণ আমি অল্পেতেই বড়ো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠি। বাইরে খেলতে গিয়ে আমার মনে যে ভাব হয় তাতে আমি একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যাই আর তারপরেই প্রায় সর্বদা একটা মারামারি বা গোলমালের সূত্রপাত করে বসি। বন্ধুবান্ধব বলতে আমার কেউ নেই, পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমার উপর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করত। কেউ যদি আমাকে 'কাশিরিন' বলে ডাকে তাহলেই আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়; পাড়ার ছেলেমেয়েরা জানে একথা আর তাই আমাকে দেখতে পেলেই ওরা ওই নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে থাকে।

'ওই আসছে রে! কাশিরিন কিপ্‌টের নাতি আসছে! দ্যাখ্‌! দ্যাখ্‌!'

'দে না ঘুষি মেরে ফেলে!'

আর তারপরেই মারামারি শুরু হয়ে যায়।

বয়সের তুলনায় আমার গায়ে অস্বাভাবিক জোর, আর মারামারিও করতে পারি খুব। আমার শত্রুরাও স্বীকার করে একথা, সুতরাং কেউ কক্ষণো একা আমার সঙ্গে মারামারি করতে আসে না। ফলে মারামারি শুরু হলেই শত্রুপক্ষ দল বেঁধে এসে আমাকে বেধড়ক মেরে যায় আর প্রায় সর্বদাই আমি বাড়ি ফিরি কাটা নাক, কাটা ঠোঁট ও ছেঁড়া জামাকাপড় নিয়ে।

'হ্যাঁ রে ছোঁড়া, আবার মারামারি করে এসেছিস। দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি! কোথা থেকে শুরু করবো?'

দিদিমা আমার মুখ ধুয়ে দেন। হয় তামার মুদ্রা, নয়তো গাছগাছড়ার রস, না হয় কোনো আরক লাগাতে লাগাতে বলেন:

'হ্যাঁ রে, আমাকে বল্‌ দেখি, কেন তুই এভাবে মারামারি করে আসিস? বাড়িতে তো দিব্যি শান্তশিষ্ট ছেলে, আর রাস্তায় বেরোলেই বুঝি মারমুখী হয়ে উঠিস! ছি, ছি! তোর দাদামশাইকে এবার বলে দেব যেন তোকে আর বাইরে বেরোতে না দেয়!'

আমার মুখ কোথাও ফুলে উঠেছে, কোথাও কেটে গেছে, এসব দাদামশাইয়ের চোখ কখনো এড়ায় না। তবে তাতে তিনি কখনো সত্যিকারের রাগ করেননি, চাপা সুরে শুধু বলেছেন:

'বাঃ, আবার দেখছি মুখের ওপরে কারুকার্য ফলানো হয়েছে! কী আমার বীরপুরুষ। রে! এই তোকে বলে রাখছি, ফের যদি রাস্তায় বেরোবি তো ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেব! কথাটা কানে ঢুকছে তো?'

রাস্তায় যদি হৈচৈ না থাকে, তাহলে আর বাইরে যেতে আমার ইচ্ছে করে না। কিন্তু যেই আমার কানে আসে, পাড়ার ছেলেরা কলকল স্বরে কথা বলতে বলতে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি দাদামশাইয়ের শাসানি ভুলে গিয়ে ছুটে রাস্তায় চলে যাই। পাড়ার ছেলেদের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে আমার মুখ কেটে-ছিঁড়ে-ফুলে ওঠে, তাতে আমি বিশেষ ভ্রুক্ষেপ করি না। কিন্তু ছেলেরা খেলাচ্ছলে যে-সব নিষ্ঠুর আচরণ করে তা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না আমি। প্রতিদিন চোখের সামনে আমাকে এইসব নিষ্ঠুরতা দেখতে হয়, আর যতোই দেখি ততোই রক্ত উঠে আসে আমার মাথায়। ওরা কুকুর আর মোরগের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেয়, বেড়ালের ওপর অত্যাচার করে, ইহুদিদের ছাগলগুলোকে তাড়া দেয়, মাতাল ভিখিরিগুলোর পিছনে লাগে, আর ধর্মভীরু ইগোশাকে ক্ষ্যাপায়, 'ইগোশা, তোর পকেটে রয়েছে মৃত্যু।' এসব আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

এই শেষোক্ত জনের লম্বা, রোগা, নোংরা চেহারা, হাড়-বের-করা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে একটা লম্বা ভেড়ার চামড়ার কোট আর শরীরটা সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে চলবার সময়ে শরীরটা অদ্ভুতভাবে দোলে, চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে মাটির দিকে। কালচে মুখখানায় ছোট ছোট চোখদুটো ভারি বিষণ্ণ — দেখে আমার মধ্যে একটা ভয় ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে। আমার মনে হয়, এই লোকটি নিশ্চয়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছে এবং এ সময়ে তাকে বিরক্ত করা উচিত নয়।

কিন্তু ছেলের দল তার পিছনে পিছনে ছোটে আর তার কুঁজো পিঠটা লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে। প্রথম কিছুক্ষণ সে আপন মনেই পথ চলে, যেন ইটের টুকরোগুলো তার পিঠে লাগলেও সে কিছুই টের পাচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, পিঠটা টান করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, মাথার মোটা ছেঁড়া টুপিটা ঠিক করতে করতে চারদিকে তাকিয়ে দেখে আর এমনভাবে আড়মোড়া ভাঙে যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে।

ছেলের দল চিৎকার করতে থাকে: ইগোশা, তোর পকেটে রয়েছে মৃত্যু! যাওয়া হচ্ছে কোথায় শুনি! দ্যাখ্ তো, তোর পকেটে রয়েছে মৃত্যু!'

পকেটটা সে মুঠো করে চেপে ধরে তারপর নিচু হয়ে একটা পাথর বা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নেয়, নিশ্বাসচাপা স্বরে গালাগালি দিতে দিতে লম্বা হাতের অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে ছুঁড়ে মারে। গালাগালির পুঁজিও তার খুব বেশি নয় — মাত্র তিনটি শব্দ। এদিক থেকে ছেলেদের পুঁজি অনেক বেশি সমৃদ্ধ — কোনো তুলনা হয় না। মাঝে মাঝে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছেলের দলের পিছনে ছোটে, লম্বা কোটটায় পা আট্‌কে আট্‌কে যায় আর হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে যায় একসময়ে। দুটো শুকনো কাঠির মতো নোংরা দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে কোনো রকমে সামলে নেয় নিজেকে। কিন্তু ছেলেরা ইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে ত্যক্তবিরক্ত করে তোলে আর ছেলের দলের মধ্যে যাদের সাহস একটু বেশি তারা সামনে এগিয়ে আসে, তার মাথায় একমুঠো ধুলো ছুঁড়ে ছুটে পালিয়ে যায় আবার।

আমাদের পূর্বতন দক্ষ কারিগর গ্রিগরি ইভানোভিচ মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে যায়; আমার মনে হয়, রাস্তায় যে-সব দৃশ্য দেখা যায় তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য। গ্রিগরি ইভানোভিচ এখন সম্পূর্ণ অন্ধ; রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে দিন কাটে তার। লম্বা, সুদর্শন চেহারা, মুখে একটিও শব্দ নেই, তার হাত ধরে নিয়ে চলে এক ছোট পাকাচুল বুড়ী। এই বুড়ী বাড়ীর জানলার সামনে এসে দাঁড়ায় আর সরু সরু নাকী গলায় বলে:

'এই অন্ধ ভিখিরিকে কিছু সাহায্য করো বাবারা, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন...'

গ্রিগরি ইভানোভিচ একটিও কথা বলে না। তার চশমার কালো কাঁচদুটো সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে বাড়ির দেওয়াল বা জানলার দিকে কিংবা যে কেউ সামনে এসে দাঁড়ায় তার দিকে। ঘন দাড়ির গোছায় রঙের ছোপ-বসে-যাওয়া হাত বুলায় কিন্তু একটিও কথা বলে না — শক্তভাবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে থাকে। আমি প্রায়ই তাকে দেখি কিন্তু সেই শক্তভাবে চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনো দিন একটিও শব্দ শুনতে পাই না। গ্রিগরির এই নিঃশব্দতাই আমার বুকের ওপরে সবচেয়ে বড়ো একটা ভার হয়ে চেপে বসে থাকে। আমি কিছুতেই তার সামনে যাই না — প্রাণপণ চেষ্টা করেও যেতে পারি না। তাকে রাস্তায় দেখতে পেলেই আমি ছুটে বাড়ির ভিতরে চলে আসি আর দিদিমাকে বলি:

'দিদিমা, গ্রিগরি আসছে!'

একটা ব্যথায় দিদিমার মুখের রেখাগুলো টান হয়ে ওঠে আর তিনি বলে ওঠেন: 'আহা রে! যা তো, ছুটে গিয়ে এটা ওকে দিয়ে আয়!'

তাঁর মুখের ওপরেই রেগে রুক্ষভাবে অস্বীকার করি। তখন দিদিমা নিজেই গেটের বাইরে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গ্রিগরির সঙ্গে কথা বলেন। গ্রিগরি মুচকিয়ে হাসে, দাড়ি নাড়ে কিন্তু কথা প্রায় বলে না বললেই চলে।

মাঝে মাঝে দিদিমা গ্রিগরিকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে এসে খাওয়াতে বসেন। একবার গ্রিগরি আমার খোঁজ করেছিল। দিদিমা আমাকে ডেকে পাঠান কিন্তু আমি ছুটে গিয়ে একটা কাঠের বোঝার পিছনে লুকিয়ে থাকি। গ্রিগরির সামনে আমি কিছুতেই যেতে পারি না। গ্রিগরির সামনে লজ্জায় মুখ তুলতে পারি না আমি। আমি জানি, আমার দিদিমারও ঠিক আমার মতোই মনোভাব। মনে আছে, মাত্র একবার দিদিমা আর আমি গ্রিগরির সম্পর্কে কথা বলেছিলাম। দিদিমা গ্রিগরিকে সদর দরজা পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছিলেন। মাথাটা মাটির দিকে নামানো, খুব আস্তে আস্তে পা ফেলছিলেন তিনি। আমি দিদিমার কাছে গিয়ে দিদিমার হাত ধরলাম।

শান্ত স্বরে দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রিগরি এলেই তুই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস কেন বল্ তো? ও তোকে কত ভালোবাসে, ওর মতো দয়ালু লোক হয় নাকি...'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দাদামশাই কেন গ্রিগরির খাওয়াথাকার বন্দোবস্ত করেন না?'

'দাদামশাই?'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দিদিমা। তারপর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে এক অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন:

'আমি তোকে বলে রাখছি — মনে রাখিস আমার কথাগুলো। কাজটা ভালো হচ্ছে না। ভগবানের শাস্তি পেতে হবে এজন্যে। অতি ভয়ংকর হবে সেই শাস্তি!'

দিদিমা ভুল বলেননি। তারপর বছর দশেকও পার হয়নি, দিদিমা তখন চিরশান্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছেন আর আমার এই দাদামশাই বাতিকগ্রস্ত হয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঠিক এমনিভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর এমনি করুণ সুরে জানলায় জানলায় দুটি অন্নের জন্যে হাহাকার করেছেন:

'ভালো মানুষের ছেলেরা, একটুকরো "পিরোগ" খেতে দাও আমাকে — ছোট একটুকরো "পিরোগ"... আর কিছু চাই না বাবারা... হুঃ, কী সব মানুষ!'

'হুঃ, কী সব মানুষ!' এই একটুখানি কথার মধ্যেই আগেকার সেই মানুষটিকে চেনা যায়, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কথাটুকুর মধ্যে মনের সমস্ত জ্বালা ফুটে ওঠে, শুনলে কিছুতেই স্থির থাকা যায় না।

ইগোশা এবং গ্রিগরি ইভানোভিচ ছাড়াও ভরোনিখা নামে এক দুশ্চরিত্রা মেয়ে ছিল। তাকে দেখলেই আমি পথ ছেড়ে পালাতাম। প্রতি রবিবার দেখা যায় তাকে—প্রকাণ্ড শরীর, বিস্রস্ত বেশবাস, মদের নেশায় চুর। তার হাঁটার একটা অদ্ভুত ধরন আছে, মনে হয় সে নড়ছে না বা মাটিতে পা ঠেকাচ্ছে না, ঝড়ো মেঘের মতো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, অশ্লীল গান গেয়ে চলেছে ভাঙা ভাঙা গলায়। তাকে দেখলে রাস্তা থেকে লোক পালিয়ে যায়, গা ঢাকা দেয় দোকানের মধ্যে বা অলিগলিতে বা দেওয়ালের পিছনে। রাস্তাটা যেন ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিয়ে যায় বুড়ী। তার মুখটা নীল, বেলুনের মতো ফুলো ফুলো, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখদুটো এমন ঘোরে যে দেখলেই ভয় করে। মাঝে মাঝে কান্নাভরা গলায় চিৎকার করে ওঠে:

'কোথায়? কোথায় আমার ছেলেমেয়েরা?'

কথাটার অর্থ দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

প্রথমে তিনি বললেন: 'সব কথাই তোর জানতে হবে, না?' পরে তিনি খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলেন। ঘটনাটা হচ্ছে এই: বুড়ীর স্বামীর নাম ভরোনভ। লোকটা সরকারী চাকরি করত। যে পদে চাকরি করত তার চেয়েও উঁচু একটা পদ লাভ করবার জন্য সে আপিসের কর্তার হাতে তার বৌকে তুলে দেয়। আপিসের এই কর্তাটি স্ত্রীলোকটিকে দু'বছরের জন্য নিয়ে যায়। দু'বছর পরে ফিরে এসে স্ত্রীলোকটি দেখে, তার দুটি বাচ্চা — একটি ছেলে ও একটি মেয়ে—মারা গেছে আর তার স্বামী সরকারী তহবিল তছরুপের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করছে। শোকে স্ত্রীলোকটি মদ খেতে শুরু করে এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এখন প্রত্যেক রবিবার ও রাস্তায় বেরোয়, আর সন্ধ্যায় পুলিস এসে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যায় ওকে।

অবশ্য রাস্তায় যতো কিছু ঘটনাই ঘটুক না কেন, একথা ঠিক যে রাস্তার চেয়ে বাড়ির ভিতরটা অনেক ভালো। বিশেষ করে আমার ভালো লাগে সন্ধ্যার খাওয়াদাওয়ার পরে। এই সময়টিতে দাদামশাই বেরিয়ে যান ইয়াকভ-মামার

সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আর দিদিমা জানলার কাছে বসে বসে আমাকে নানা গল্প ও বাবার জীবনের নানা ঘটনার কথা বলতে শুরু করেন।

সেই যে স্টার্লিংপাখিটাকে তিনি বেড়ালের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তার ভাঙা ডানাটাকে কেটে দিয়েছেন, পায়ের দাঁড়ায় অত্যন্ত নিপুণভাবে বেঁধে দিয়েছেন ছোট একটা কাঠি। পাখিটা সুস্থ হয়ে উঠতেই দিদিমা উঠে-পড়ে লেগেছেন, পাখিটাকে কথা বলা শেখাবেন। হয়তো দেখা যায়, পুরো একঘণ্টা ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জানলার সামনে ঝোলানো খাঁচাটার কাছে, যে কথাগুলো তিনি পাখিটাকে শেখাতে চান, সেগুলো অক্লান্তভাবে বারবার বলে চলেছেন।

'আচ্ছা এবার বলো তো দেখি: পাখিকে পরিজ খেতে দাও!'

কথাগুলো শুনে পাখিটা সঙের মতো গোল গোল চোখ পাকিয়ে দিদিমার দিকে তাকায়, খাঁচার পাটাতনের ওপরে ঠকঠক করে কাঠের পা-টা ঠোকে, গলাটা টান করে দেয়, ঈগল পাখির মতো শিস্ দেয়, কাক বা কোকিলের নকল করে, বেড়ালের মতো মিউমিউ বা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ ডাকতে চেষ্টা করে — কিন্তু অনেক কসরৎ করেও মানুষের মতো গলার স্বর কিছুতেই বার করতে পারে না।

দিদিমা মুখখানা ভারিক্কী করে বলেন: 'যথেষ্ট বাঁদরাম হয়েছে। এবার বলো দেখি: পাখিকে পরিজ খেতে দাও!'

আর যদি সেই পালকঢাকা বাঁদরের কিচিরমিচিরের মধ্যে কোনো সময়েও এমন একটি শব্দ পাওয়া যায় যাকে দিদিমার কথার অনুকরণ মনে করা যেতে পারে তাহলে দিদিমা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠে নিজের হাত থেকে যবের তৈরী পরিজ খাওয়াতে শুরু করেন।

'ভাবছিস তোর শয়তানি আমি বুঝতে পারি না? সব তোর শয়তানি, সব তোর চালাকি! ইচ্ছে করলে কী না পারিস তুই?' পাখিটাকে আদরের ধমক দেন দিদিমা।

কিছুদিনের মধ্যে দিদিমা সেই পাখিটাকে সত্যি সত্যিই কথা বলতে শিখিয়েছিলেন। বেশ স্পষ্ট ভাষায় পরিজ খেতে চাইত পাখিটা। দিদিমাকে দেখলেই চিৎকার করে বলত কি যেন, শব্দগুলো অনেকটা যেন শোনাত এই রকম — 'নমস্কার!'

পাখিটা প্রথমে ছিল আমার দাদামশাইয়ের ঘরে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দাদামশাই পাখিটাকে আমাদের ছাদের ঘরে নির্বাসনে পাঠালেন।

এই নির্বাসনদণ্ডের কারণ — পাখিটা দাদামশাইকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছিল। দাদামশাই উপাসনা করেন প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করে; সেই শুনতে শুনতে একদিন স্টার্লিংপাখিটা খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে হলদে ঠোঁটটা বাড়িয়ে বলে ওঠে:

'সত্যি, সত্যি, ই-ই, ই-ই, খু-উ-উ-ব সত্যি-ই-ই!'

পাখিটার এই ধরনের ডাক শুনে দাদামশাই ভয়ানক চটে যান। একদিন উপাসনা করতে করতে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গিয়ে মেঝের ওপরে পা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠলেন:

'এই শয়তানটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে নইলে আমি এটাকে শেষ করে ফেলব!'

এমনি সব ঘটনা। কোনোটা কৌতূহল জাগায়, কোনোটাতে মজা লাগে। এমনি অজস্র ঘটনা ঘটত আমাদের বাড়িতে। তবুও মাঝে মাঝে এক গভীর বিষাদ গ্রাস করত আমাকে। যেন মস্ত একটা বোঝা পিষে ফেলতে চাইছে আমাকে, যেন কালির দোয়াতের মতো একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে আমি বাস করছি, সেখানে কিছু দেখা যায় না, কিছু শোনা যায় না, কিছু অনুভব করা যায় না — এক অন্ধ ও অর্ধস্তিমিত জীবন।

আট

শুঁড়িখানার মালিকের কাছে হঠাৎ দাদামশাই আমাদের বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন। আরেকটা বাড়ি কিনলেন কানাৎনায়া স্ট্রীটে। এই রাস্তাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গোলমাল হৈচৈ নেই, প্রচুর ঘাসে ঢাকা, কাঁচা, বরাবর গিয়ে মিশেছে খোলা মাঠে। দু-পাশে সার দেওয়া ছোট ছোট ঝক্‌ঝকে রং-করা বাড়ি।

পুরনো বাড়ির চেয়ে নতুন বাড়িটা আরো সুন্দর, আরো পরিপাটি, আরো তক্‌তকে। সামনের দিকে গাঢ় ও উষ্ণ লাল রং। এই লাল রঙের পটভূমিতে একতলার তিনটে জানলার নীল খড়খড়ি আর ওপরের ঘরের জানলার ঝিল্‌মিলি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এল্‌ম্‌ ও লাইম-গাছের ডালপালা নেমে এসেছে ছাদের বাঁ দিকটায়। উঠোন আর বাগানের মধ্যে সরু সরু রাস্তা এমন গোলকধাঁধার মতো ছড়িয়ে আছে যে মনে হয় এই স্থানটি বিশেষ করে লুকোচুরি খেলবার জন্যে তৈরি। নাতিবৃহৎ বাগানটি

অতি চমৎকার, ঝোপঝাড় লতাগুল্মের প্রাচুর্যে মুগ্ধ হতে হয়। এক কোণে স্নানঘর, খেলনার মতো ছোট্ট ও পরিচ্ছন্ন। আরেক কোণে প্রচুর আগাছায় ভরা একটা চওড়া গভীর গর্ত। এখানে আগে একটা স্নানঘর ছিল, এখন তার দগ্ধাবশেষটুকু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ দিকের সীমানায় কর্নেল অভসিয়ান্নিকোভের আস্তাবল, ডানদিকে বেৎলেঙ-এর বার বাড়ি। আর বাগানের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে গোশালার কর্ত্রী পেত্রভনার জমি। মেদস্ফীত, লালমুখ পেত্রভনা, সোরগোলে স্বভাব—মস্ত একটা ঘণ্টার মতো মনে হয় তাকে। বাড়িটা ছোট, অন্ধকার ও সাজসজ্জাহীন; পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে মাটির সঙ্গে থেবড়ে আছে মনে হয়। পুরু শ্যাওলায় ঢেকে গেছে বাড়িটা। খোলা মাঠের দিকে দুটো জানলা। গভীর নালা মাঠটাকে চিরে দিয়েছে। দূরের অরণ্যকে এক পোঁচ আবছা নীল রঙের মতো দেখায়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই মাঠে সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে; শরৎকালের রোদে বিদ্যুতের মতো ঝল্‌সে ওঠে তাদের বেয়নেটগুলো।

আমাদের বাড়িতে আর যে-সব লোক থাকে তাদের আমি আগে কোনোদিন দেখিনি। সামনের দিকের কামরাটায় থাকে সস্ত্রীক একজন ফৌজী লোক, জন্মগত পরিচয়ে তাতার। গোলগাল ছোটখাট চেহারার বৌটি সারাদিন হাসে, হৈচৈ করে, আর হাল্‌কা নক্সায় সজ্জিত একটা গীটার বাজায়। চড়া আর সুরেলা একটা মজার গান সে প্রায়ই গায়। গানটা হল:

একটি মেয়েকে ভালোবেসে থেকে
সন্তুষ্ট থাকা যায় না।
বিবেচনা রেখে খুঁজে পেতে দেখে
আনো মেয়ে অন্যজনা।
তবে পার পেতে সন্দ নেই তাতে
মন-মত পুরস্কার
সে প্রিয়া যে তবে নিশ্চিতই হবে
সব রতনের সার!
সে যে স-ব র-ত-নে-র সা-র।

স্বামীটি বলের মতো গোল। ফুলো ফুলো নীল গাল নিয়ে জানলার সামনে বসে থাকে আর পাইপ টানে। বাদামী লালচে রঙের কুৎকুতে চোখদুটো

অনবরত ঘুরপাক খায়। মাঝে মাঝে কাশে আর কাশির সঙ্গে অদ্ভুত একটা শব্দ ওঠে: 'র্-র্-রা-আ-ফ্! র্-র্-রা-আ-ফ্!'

গুদামঘর ও আস্তাবলের ওপরে যে গরম ঘরটি তোলা হয়েছে সেখানে থাকে দু'জন গাড়ি-চালক আর ভালেই নামে জাতে তাতার একজন লম্বা চেহারার বিষণ্ন মেজাজের আর্দালি। গাড়ি-চালকদের একজনকে সবাই ডাকে পিওতর-কাকা বলে। ছোটখাটো বুড়িয়ে-যাওয়া মানুষটি। অপরজন তার বোবা ভাইপো স্তিওপা। চিকন মসৃণ চেহারা স্তিওপার, মুখখানা ঠিক তামার থালার মতো। এরা সবাই আমার অপরিচিত এবং এদের সবার প্রতিই আমি গভীর কৌতূহল বোধ করি।

কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি কৌতূহল এই বাড়ির অন্য এক বাসিন্দা 'বাঃ বেশ' সম্পর্কে। বাড়ির পিছনদিকে রান্নাঘরের পাশের লম্বা ঘরটি সে ভাড়া নেয়। দুটি জানলা ঘরটিতে, একটি বাগানের দিকে, অপরটি উঠোনের দিকে।

বাসিন্দাটি রোগা, কুঁজো। কালো দো-পাট্টা দাড়ি ফ্যাকাশে মুখটাকে আরো ফ্যাকাশে করে তুলেছে। চোখে চশমা। শান্ত, নির্বিরোধী মানুষ কোনো সাতেপাঁচে থাকে না। চা বা খাবার তৈরি হয়ে গেলে তাকে ডাকবার জন্যে কেউ গেলেই তার মুখে একটি অবধারিত জবাব শোনা যায়: 'বাঃ বেশ!'

দিদিমা লোকটির নাম দিয়েছেন 'বাঃ বেশ'; আড়ালে, এমন কি সামনা-সামনিও এই নামে ডাকেন।

'যা তো রে লেক্সেই, "বাঃ বেশ"কে বলে আয় যে চা দেওয়া হয়েছে।' কিংবা, 'একি "বাঃ বেশ", কিছুই খেলেন না যে, আরেকটু তুলে নিন!' এমনি ধরনের কথা দিদিমার মুখে শোনা যায়।

বড়ো বড়ো কাঠের বাক্স আর মোটা ব্যবহারিক বইয়ে তার ঘরটা ঠাসা। এরকমটি আমি এর আগে আর দেখিনি। আর ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে নানা রঙের তরল পদার্থে ভর্তি বোতল, তামার টুকরো, লোহা আর সীসের চাঁই। একটা বাদামী রঙের চামড়ার জ্যাকেট ও ছাইরঙের ছককাটা প্যাণ্ট সে সবসময়ে পরে থাকে। জামা ও প্যাণ্টের সর্বত্র রঙের ছিটে লেগেছে আর উৎকট একটা গন্ধ। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এই ঘরেই কাটায় সে। কখনো সীসে গলাচ্ছে, কখনো তামা ঝালাই করছে, কখনো ক্ষুদে ক্ষুদে নিক্তিতে কি যেন ওজন করছে। মাঝে মাঝে আঙুল পুড়িয়ে ফেলে নিজেই চিৎকার করে ওঠে আবার সেই পোড়া আঙুলে নিজেই ফুঁ দেয়। দেওয়ালে ব্যাখ্যা সম্বলিত

চিত্র ঝুলছে; এক এক সময়ে সেই চিত্রগুলির ওপরে ঝুঁকে পড়ে; চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে কাঁচদুটো মুছে নেয় এবং এতবেশি ঝুঁকে চিত্রগুলো দেখে যে তার চকখড়ির মতো সাদা নাকটা প্রায় ঠেকে যায় চিত্রের সঙ্গে। এক একসময়ে দেখা যায়, ঘরের মাঝখানটিতে বা জানলার পাশে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে; চোখদুটো বোজা, মাথাটা ঊর্ধ্বমুখী; নিস্তব্ধ নিশ্চল মূর্তির মতো একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বহুক্ষণ।

উঠোনের শেষদিকে একটা চালা আছে। এই চালার ছাদের ওপরে উঠে উঠোনের মধ্যে দিয়ে খোলা জানলার ভিতরে আমি লোকটিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। টেবিলের ওপরে অ্যাল্‌কোহল বাতি জ্বলে, তার নীল শিখাটা দেখা যায়। বাতির ওপরে ঝুঁকে রয়েছে সেই লোকটির কালো মূর্তিটা। মাঝে মাঝে একটা ছেঁড়া নোটবইয়ের পৃষ্ঠায় কী যেন লেখে, হিম একটা আভা ঠিকরে ঠিকরে পড়ে তার চশমার কাঁচ থেকে—নীল বরফের এক-একটা টুকরো যেন। আশ্চর্য এক যাদুকরের মতো মনে হয় তাকে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি সেই চালার ওপরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

মাঝে মাঝে জানলার ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো সে এসে দাঁড়ায় জানলার সামনে। হাতদুটো পিছনের দিকে রেখে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে উঠোনের চালাটার দিকে, কিন্তু একটিবারও আমাকে দেখতে পায় বলে মনে হয় না। এতে আমি অপমানিত বোধ করি। কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে একলাফে টেবিলটার কাছে ফিরে যায়, আরো বেশি ঝুঁকে পড়ে, অস্থিরভাবে খাতাকাগজ জিনিসপত্রের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে কি যেন।

লোকটির অনেক টাকাপয়সা থাকলে আর বেশভূষা ফিটফাট হলে হয়তো তাকে দেখে আমার ভয় হতে পারত। কিন্তু লোকটি গরীব। তার চামড়ার জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে যে কলারটা বেরিয়ে থাকে তা নোংরা ও কুঁচকনো, বিচিত্র দাগওলা প্যাণ্টটা তালি মারা, মোজাহীন পায়ে যে জুতোজোড়া সে পরে তার মধ্যে জুতোর গুণ আর বিশেষ কিছু নেই। গরীবদের দেখলে আমার দিদিমার মন গলে যায়, আমার দাদামশাই উপেক্ষা করেন তাদের; এ থেকে একটা শিক্ষা আমার হয়েছে—গরীব লোকেরা কখনো বিপজ্জনক হয় না, তাদের মধ্যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

'বাঃ বেশ'কে আমাদের বাড়ির কেউ পছন্দ করে না। সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করে। ফৌজী লোকটির আমুদে বৌ তার নাম দিয়েছে 'চকখড়ি

নাক'। পিওতর-কাকা বলে, 'রাসায়নিক', 'কুহকী'। দাদামশাই বলেন, 'যাদুকর শয়তান।'

দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমা, উনি কী করেন?'

দিদিমা মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠলেন, 'সে খোঁজে তোর কি দরকার শুনি? সব কথার মধ্যে তোর থাকা চাই, না?'

একদিন আমি আমার সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে তার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'তুমি কী করছ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। আমার উত্তেজনা আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিলাম না।

লোকটি চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে চশমার কাঁচের উপর দিয়ে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের ফোস্কাপড়া ঝল্‌সানো হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে:

'হাত ধরে উঠে এস।'

সে যে আমাকে দরজা দিয়ে না ঢুকে জানলা দিয়ে গলে ভিতরে যেতে বলেছে তাতে তার মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে গেল আমার চোখে। একটা বাক্সের উপরে বসল সে, আমাকে বসাল ঠিক তার সামনেটিতে, আমাকে একবার এপাশে একবার ওপাশে ফিরিয়ে দেখল বহুক্ষণ ধরে, শেষকালে বলল:

'তুমি কোত্থেকে আসছ?'

প্রশ্নটা অদ্ভুত; কারণ দিনের মধ্যে চারবার খাবার টেবিলে আমি তার পাশটিতে বসি।

'আমি এই বাড়ির নাতি।' আমি জবাব দিলাম।

'ও হ্যাঁ, তাইতো।' বলে সে আবার অন্যমনস্কভাবে চুপ করে গিয়ে হাতের একটা আঙ্গুল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

আমার মনে হল, কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা দরকার। বললাম:

'আমি এ-বাড়ির নাতি বটে কিন্তু আমি কাশিরিন নই—আমি হচ্ছি পেশ্‌কভ।'

'পেশ্‌কভ?' কথাটা উচ্চারণ করবার সময়ে জোরটা 'ক'-এর ওপরে না দিয়ে ভুলভাবে দিল 'পে'-এর ওপরে, তারপর বলল, 'বাঃ বেশ।'

তারপর আমাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার উঠে গেল টেবিলটার কাছে।

'ঠিক আছে। চুপটি করে বসে থাকো। গোলমাল কোরো না।'

বসে বসে বহুক্ষণ ধরে লোকটির কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখলাম। একটা তামার টুকরোকে চিমটে দিয়ে ধরে উখো দিয়ে ঘষে ঘষে তামার গুঁড়ো বার করে নিল। বেশ কিছুটা গুঁড়ো জমবার পরে সেই সোনালী ধুলোগুলোকে একজায়গায় জড়ো করে ঢালল একটা পুরু পাত্রের মধ্যে। একটা গামলায় নুনের মতো সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো কি যেন ছিল, তার থেকে খানিকটা নিয়ে মিশিয়ে দিল তামার গুঁড়োর সঙ্গে। তারপর একটা গাঢ় রঙের বোতল থেকে তরল পদার্থ ঢালল পাত্রের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের মধ্যেকার মিশ্রিত পদার্থ টগবগিয়ে উঠল, ধোঁয়া উঠতে লাগল, আর এমন একটা ঝাঁজালো গন্ধ বেরিয়ে এল যে আমি ভয়ানক কাশতে লাগলাম।

'বিশ্রী গন্ধ, না?' ঐন্দ্রজালিক বেশ খানিকটা দেমাকের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'হ্যাঁ!'

'ঠিক আছে ভাইটি! এই তো চাই! খুব ভালো কথা!'

আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না এত দর্পের কারণ কী থাকতে পারে।

ঝাঁজালো গলায় আমি বললাম, 'যা খারাপ তা সব সময়েই খারাপ-- কখনো ভালো হয় না।'

চোখ পিটপিটিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'কী বললে? জেনে রেখো ভাইটি, তোমার কথাটা সব জায়গায় খাটে না। আচ্ছা তুমি হাড়ের খেলা খেলতে ভালোবাস?'

'মানে, ঘুঁটিখেলা?'

'হ্যাঁ, ঘুঁটিখেলা।'

'নিশ্চয়ই ভালোবাসি।'

'আমি তোমাকে চমৎকার এক ঘুঁটি বানিয়ে দেব--কেমন? দেখবে, কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না।'

'তাহলে তো খুব ভালো হয়।'

'তাহলে তোমার ঘুঁটিগুলো নিয়ে এসো তো দেখি।'

ধূমায়মান পাত্রটা হাতে নিয়ে আবার সে আমার কাছে এগিয়ে এল।

'তোমাকে আমি ঘুঁটি বানিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে যে

তুমি আর কক্ষণো এখানে আসবে না। বলো, রাজি আছ?' একচোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল সে।

আমার আত্মসম্মানে ভয়ানক ঘা লাগল। আমিও পাল্‌টা জবাব দিলাম:

'এমনিতেই আমি আর কখনও আসব না।' বলে আমি বাগানে চলে এলাম।

বাগানে এসে দেখলাম, দাদামশাই আপেলগাছের গোড়ায় সার দিচ্ছেন। শরৎকাল। ইতিমধ্যেই গাছের পাতা ঝরতে শুরু করেছে।

গাছের ডাল ছাঁটবার কাঁচিটা আমার হাতে দিয়ে দাদামশাই বললেন, 'নে তো এটা, র‍্যাস্‌বেরির ডালগুলোকে একটু ছেঁটে দে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, "বাঃ বেশ" কী করে?'

দাদামশাই ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলেন, 'ঘরটাকে নষ্ট করছে লোকটা। মেঝেটাকে তো অনেক জায়গায় পুড়িয়েছে, তার ওপরে ওয়াল-পেপারে দাগ ধরিয়ে দিয়েছে, এমন কি ছিঁড়ে ফেলেছে দু-এক জায়গায়। ওকে উঠে যাবার জন্যে বলতে হবে।'

'তাহলেই ঠিক হয়।' আমিও সায় জানিয়ে গাছের ডাল ছাঁটবার কাজে মন দিলাম।

কিন্তু বড়ো তাড়াতাড়ি সায় জানিয়েছিলাম আমি।

বর্ষার দিনে সন্ধ্যায় দাদামশাই বাড়ি না থাকলে দিদিমা রান্নাঘরে ছোটখাটো একটি ভোজসভার ব্যবস্থা করেন। বাড়ির সমস্ত বাসিন্দাকে ডাকেন তিনি। গাড়ি-চালকরা ও আর্দালি বাদ পড়ে না, এমন কি একজন রসিকা বাসিন্দাও থাকে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। প্রাণরসে ভরপুর পেত্রভনাও আসে মাঝে মাঝে আর নিয়মিত অভ্যাগতদের মধ্যে থাকে 'বাঃ বেশ'। উনুনের পাশের কোণটিতে সে চুপচাপ বসে থাকে, একটুও নড়েচড়ে না। বোবা স্তিওপা তাস খেলে তাতার আর্দালি ভালেই'র সঙ্গে। তাস খেলতে খেলতে স্তিওপার ধ্যাব্‌ড়া নাকটায় টোকা দিতে দিতে ভালেই বলে, 'আচ্ছা ঘাগী শয়তান তো তুই!'

পিওতর-কাকা নিয়ে আসে মস্ত একটা সাদা পাঁউরুটি আর বড় একটি কলসীতে ভর্তি ফলের জ্যাম। রুটিটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে তার ওপরে পুরু করে ফলের জ্যাম লাগায়, তারপর হাতের ওপরে রুটির টুকরো নিয়ে অতিথিদের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

'দয়া করে একটুকরো রুটি নিন।' অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা নিচু করে

সাদরে বলে সে। আর যখনই কেউ রুটির টুকরোটা তুলে নেয়, সে নিজের কালচে হাতের তালুটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে। আর যদি দেখে যে কোথাও একফোঁটা জ্যাম লেগে আছে তাহলে তা জিভ দিয়ে চেটে নেয়।

পেত্রভনা নিয়ে আসে চেরিফলের মদ আর সেই রসিকাটি আনে বাদাম ও মিষ্টি। তারপর শুরু হয় ভোজপর্ব। আমার দিদিমা তা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

'বাঃ বেশ' আমাকে ঘুষ দিয়ে তার ঘরে যেতে নিষেধ করার কিছুদিন বাদেই দিদিমা এই ধরনের এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। শরৎকালের পচা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাইরে সোঁ সোঁ বাতাস, গাছগুলো ঝরঝর শব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে আর দেওয়ালের গায়ে আঁচড় দিচ্ছে। রান্নাঘরের ভিতরটা উষ্ণ ও আরামদায়ক। মানুষগুলো ঘন হয়ে বসেছে, সকলেই কেমন যেন বিশেষভাবে শান্ত আর খুসি। দিদিমাও আজ অন্য দিনের মতো নন, তাঁর মুখে আজ গল্পের খই ফুটছে।

দিদিমা বসেছেন উনুনের ধারে, পা রেখেছেন সিঁড়ির একটা ধাপে। শ্রোতাদের দিকে ঝুঁকে তিনি গল্প বলছেন, একটা টিনের বাতির আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে। যখনই দিদিমার জমিয়ে গল্প বলবার মেজাজ আসে তিনি বসবার জন্যে উনুনের এই উঁচু আসনটি বেছে নেন।

জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'উঁচু থেকে নিচের দিকে কথা বলা, এই আর কি! শ্রোতারা যদি তলায় থাকে তাহলে কথা বলতে আমার ভারি সুবিধে হয়!'

দিদিমার পায়ের কাছে একটি ধাপে আমি বসেছিলাম, 'বাঃ বেশ'এর মাথার প্রায় ওপরটিতে। দিদিমা বলছিলেন যোদ্ধা ইভান ও ঋষি মিরনের কৌতূহলোদ্দীপক গল্প। ছন্দোবদ্ধ ভাষার সমৃদ্ধ ধারা কলধ্বনি তুলে বয়ে চলেছিল। গল্পটা হচ্ছে এই:

> গর্দিয়ন নামে এক পাপিষ্ঠ অধিনায়কের বাস ছিল এই পৃথিবীতে। পাপে ভরা ছিল তার আত্মা, পাথরের মতো বিবেক, সত্যকে ঘৃণা করত সে। গর্তের উইপোকার মতো ছিল তার পঙ্কিল জীবন। পৃথিবীতে এত লোক আছে, তাদের মধ্যে একটি লোককে সে সব চেয়ে বেশি ঘৃণা করত: ঋষি মিরন। ঋষি মিরন ছিলেন শান্তি ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক, সত্য ও সুন্দরের পূজারী। একদিন এই গর্দিয়ন ডেকে পাঠাল অনুগত বীর যোদ্ধা ইভানকে। বলল: 'এক্ষুণি যাও তুমি অহঙ্কারী বুড়ো মিরনের কাছে, কেটে ফেলো তার মাথাটা তলোয়ারের এক কোপে। তারপর কাটা

মণ্ডুটাকে পাকা দাড়ি ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসবে আমার কাছে। আমার কুকুরগুলোর ভোজে লাগবে সেটা!'

একান্ত বাধ্য ও অনুগত ইভান সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল ঋষি মিরনের মাথা কাটবার জন্যে। নিজের মনকে সে প্রবোধ দিল এই বলে যে, সে অপরের আদেশ পালন করতে বাধ্য। বোঝা যায় এটা ভগবানের ইচ্ছে।

তারপর ঋষির কাছে এসে তলোয়ারটা নীচে লুকিয়ে রাখে তার পোষাকের তলায়, হাসিমুখে অভিবাদন জানায় বুড়োকে আর বলে. 'কেমন আছ ঠাকুর? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!'

ঋষি মিরনের অজ্ঞাত ছিল না কিছুই—স্মিত হেসে ধীর স্বরে বলেন তিনি: 'কেন তুমি আমাকে প্রতারণা করছ? পরমমঙ্গলময় ঈশ্বরের অজানা থাকে না কিছুই, তোমার পাপ-মতলবের কথাও তিনি জানেন। আমি জানি তুমি কী করতে এসেছ!'

লজ্জা হল ইভানের, লজ্জায় অন্তর ভরে গেল। আবার গর্দিয়নের ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার কথা ভেবে শিউরে উঠল সে। চামড়ার খাপ থেকে টেনে বার করল তলোয়ার — সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র উ'চিয়ে ধরল সাহসের সঙ্গে।

'আমি তোমাকে এমন ভাবে মারতে চেয়েছিলাম যে তলোয়ারটাকে তুমি দেখতেই পাবে না। কিন্তু এখন অন্য কথা। ওরে বুড়ো, নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে শেষবারের মতো প্রার্থনা করে নাও। প্রার্থনা করো সকল মানুষের জন্য। আমার জন্য, তোমার জন্য। তারপর তলোয়ারেব এক ঘায়ে তোমার মস্তক ছিন্ন হবে।'

হাঁটু মুড়ে বসলেন জ্ঞানী বৃদ্ধ। বসলেন এক নবীন ওক্‌গাছের নিচে। ওক্‌গাছ তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ল। স্মিত হেসে বললেন জ্ঞানী বৃদ্ধ: 'ভালো করে ভেবে দেখ ইভান, বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। সব মানুষের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা তাড়াতাড়ি শেষ হবে না। তার চেয়ে বরং অপেক্ষা করে কাজ নেই, এই মুহূর্তেই আমার মস্তক ছিন্ন করা ভালো।'

ঋষির কথা শুনে ইভান তাকিয়ে রইল ভুরু কুঁচকে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। গর্বোদ্ধত স্বরে মূর্খের মতো জবাব দিল: 'যা কথা দিয়েছি তাই হবে। প্রার্থনা করো তুমি। যতোদিন খুশি। যদি একযুগ অপেক্ষা করতে হয় তাহলে তাই সই।'

তারপর ঋষি বসলেন প্রার্থনায়। আস্তে আস্তে এল রাত্রি। রাত্রি পার হয়ে এল সকাল। সকালের পরে আবার সন্ধ্যা। গ্রীষ্ম পার হয়ে বসন্ত। বৎসরের পর বৎসর। তেমনিভাবে ঋষি বসে রইলেন প্রার্থনায়। বসে রইলেন ওক্‌গাছের নিচে। নবীন ওক্‌গাছ আকাশছোঁয়া হল। চারপাশের ওক্‌গাছের বীজ থেকে উৎপন্ন ঝোপঝাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সৃষ্টি করল নিবিড় এক অরণ্য। তবুও তেমনিভাবে বসে রইলেন ঋষি মিরন।

ঋষি মিরনের ছেদহীন প্রার্থনা আজও চলেছে। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করছেন। কামনা করছেন মেরীমাতার কল্যাণ হাস্য। আর ঋষি মিরনের পাশেই তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বীর যোদ্ধা ইভান। তলোয়ারে মরচে পড়েছে। খসে খসে পড়ছে তলোয়ারের খাপ। ধুলো হয়ে উড়ে উড়ে গেছে পরনের পোশাক। গরমে গলে গলে পড়ে শরীর — তবুও গলেনি। পঙ্গপালে কুরে কুরে খেয়েছে তাকে — তবুও খায়নি। জন্তুজানোয়াররাও এড়িয়ে চলে। নেকড়ে ভল্লুকও ধারে কাছে আসে না। ঝড়বৃষ্টি গায়ে লাগে না তার। তুষার স্পর্শ করে না তাকে। স্থির অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। একটু হাত তোলবার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা নেই একটু সরে দাঁড়াবার। দেখো: এই হোক সেই লোকের শাস্তি — যে অপরের পাপপরামর্শে কান দেয়, নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দেয় অপরের ইচ্ছার কাছে। আর সেই প্রাচীন ঋষি এখনো প্রার্থনা করে চলেছেন। প্রার্থনা করছেন আমাদের মতো পাপীদের জন্য। আর নদী যেমন সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় — তেমনি তাঁর প্রার্থনাও ধারাস্রোতের মতো চলেছে ভগবানের কাছে।

গল্পটা শুরু হতেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম, 'বাঃ বেশ' যে জন্যেই হোক ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। হাতদুটো অস্থিরভাবে নাড়তে নাড়তে অদ্ভুত সব ভঙ্গি করছে, চশমাটা বারবার খুলছে আর পরছে কিংবা হয়তো চশমাটা দুলিয়ে দুলিয়ে তাল দিচ্ছে কবিতার সঙ্গে সঙ্গে, মাথা নাড়ছে, চোখ কচলাচ্ছে, কপাল আর গালের ওপর দিয়ে যেন টসটস করে গড়িয়ে পড়া ঘাম মুছে নিচ্ছে। কেউ কাশলে বা মেঝের ওপর পা ঘষলে সঙ্গে সঙ্গে চাপা অধীর স্বরে শব্দ করে উঠছে, 'শ্-শ্-শ্!'

দিদিমার গল্প বলা শেষ হতেই সে সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত নাড়তে নাড়তে আর ঘুরপাক খেতে খেতে বলতে লাগল বিড়বিড় করে:

'ভারি চমৎকার! সত্যিই ভারি চমৎকার! এই গল্পটি লিখে রাখা দরকার, কিছুতেই যেন হারিয়ে না যায়! আর কী যথার্থ ও খাঁটি গল্প ...'

এবার স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল যে সে কাঁদছে। চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা সত্যিই অস্বাভাবিক আর বড়ো মর্মস্পর্শী। অদ্ভুত ভঙ্গিতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘুরপাক খাচ্ছে রান্নাঘরের চারদিকে, বারবার চেষ্টা করছে চশমাটা চোখে পরতে কিন্তু চশমার তারটা কিছুতেই কানের পিছনে আঁটতে পারছে না। পিওতর-কাকা মুচকিয়ে হেসে ফেলল কিন্তু অন্যরা হতভম্ব।

দিদিমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'বেশ তো, বেশ তো, লিখে নিতে চান, লিখে নিন। এতে আর দোষ কী? এ-ধরনের কবিতা আমি আরও অনেক জানি।'

উত্তেজিত স্বরে সে চিৎকার করে উঠল, 'না! না! অন্যগুলোর কথা বলছি না! এইটেই! এই গল্পটা খাঁটি রুশদেশের গল্প!' হঠাৎ সে রান্নাঘরের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে উঁচু স্বরে কথা বলতে আরম্ভ করল। ডানহাতটা ঝাঁকাচ্ছে আর কম্পিত বাঁ হাতে ধরে আছে চশমাটা। উত্তাপ ও আবেগের সঙ্গে কথা বলে চলেছে সে, গলা চড়িয়ে জোর দিচ্ছে কথাগুলোর ওপর, পা ঠুকছে মেঝেতে।

'নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা ভুল।' বারবার বলে চলেছে এই কথাগুলো।

হঠাৎ তার গলাটা বুজে গেল। ঘরের মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সে, তারপর অপরাধীর মতো মুখ করে, মাথা নিচু করে, নিঃসাড়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ঘরের মানুষগুলো হাসল মুখ টিপে আর লাজুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল একজন আরেকজনের দিকে। দিদিমা তাকের অন্ধকারের মধ্যে শরীরটাকে সরিয়ে দিয়ে গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পুরু লাল ঠোঁটদুটোর ওপরে হাত বুলোতে বুলোতে পেত্রভনা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কী? একেবারে রেগে ক্ষেপে গেছে মনে হয়!'

'না, তা নয়। লোকটার ধরন-ধারণই ওই রকম...' জবাব দিল পিওতর-কাকা।

চুল্লির ওপর থেকে নেমে এসে দিদিমা সামোভারে আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।

'ভদ্রলোকেরা এইরকমই হয়— এমনি খামখেয়ালি।' শান্ত স্বরে কথাগুলো বলল পিওতর-কাকা।

'বিয়ে না করে আইবুড়ো থাকলে এই হয়।' বিড়বিড় করে বলল ভালেই।

হেসে উঠল সবাই। পিওতর-কাকা বলল, 'কী-ভাবে কাঁদছিল দেখেছ? রুই-কাৎলা যেখানে ঘাই মারে সেখানে এখন পুঁটিমাছের ফরফরানি আর সহ্য হয় না!'

কারও কথাবার্তাই আর ভালো লাগছে না। একটা বিষণ্ণ অবসাদ সূচের মতো আমার মনের মধ্যে বিঁধছে। 'বাঃ বেশ'কে দেখে আজ আমি খুবই অবাক হয়েছি, লোকটির ওপর আমার করুণা হচ্ছে, তার সেই

জল-ছাপিয়ে-ওঠা চোখদুটোর স্মৃতি কিছুতেই আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না।

সেদিন রাত্রে সে বাইরেই রইল; ফিরে এল পরদিন দুপুরবেলার খাওয়া শেষ হবার পরে। নিজের কৃতকর্মের কথা ভেবে সে খুব লজ্জা পেয়েছে আর মুষড়ে পড়েছে, কিছুতেই যেন আর মাথা তুলতে পারছে না।

ছোট ছেলেরা দোষ করলে পরে যেমন দোষ স্বীকার করে তেমনিভাবে সে এসে আমার দিদিমার কাছে বলল, 'কাল বড়ো গোলমাল করে ফেলেছি, না? আপনি নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছেন?'

'কেন, রাগ করব কেন?'

'আমার কথা শুনে।'

'কই, আপনি তো কাউকে ঠেকা দিয়ে কোনো কথা বলেননি।'

আমার মনে হল, দিদিমা এই লোকটিকে ভয় করে চলেন। দিদিমা লোকটির দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছেন না আর এমন নরম সুরে কথা বলছেন যে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

দিদিমার দিকে আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে সে নিতান্ত সরলভাবেই বলতে লাগল:

'দেখুন, আমি বড়ো একা, বড়ো বেশি একা। এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। সব সময়ে একা একা থাকি আর মাঝে মাঝে এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন ইচ্ছে করে নিজের মনটাকে উজাড় করে ঢেলে দিই। মনটা এমন হয়ে ওঠে যে গাছ-পাথরের সঙ্গেও কথা বলতে পারি তখন...'

লোকটির কাছ থেকে একটু দূরে সরে এসে দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বিয়ে করো না কেন?'

'বিয়ে!' হাত নেড়ে বলল সে, তারপর ভুরু কুঁচকিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দিদিমা লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর একটিপ নস্যি নিয়ে ফিরে তাকালেন আমার দিকে। রুষ্ট স্বরে বললেন:

'আর তোকেও বলে রাখছি, খবরদার ওই লোকটার কাছে ঘুরঘুর করবি না। কে জানে বাপু, কী ধরনের মানুষ।'

কিন্তু এই ঘটনার পরে লোকটির কাছে যাবার জন্যে আমার আগ্রহ আবার জ্বলে উঠল।

সে যখন বলছিল, ‘আমি বড়ো একা, বড়ো বেশি একা’ — তখন তার মুখের ভাবে যে পরিবর্তন এসেছিল তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কথাগুলির মধ্যে এমন কিছু ছিল যার অর্থটা আমি ধরতে পেরেছিলাম এবং যা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। লোকটির কাছে যাবার জন্যে আমি বেরিয়ে এলাম।

তার ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ঘরের মধ্যে কেউ নেই এবং আগাগোড়া ঘরটা অপ্রয়োজনীয় ও অদ্ভুত সব জিনিসে ঠাসা—ঘরের মালিক নিজেও যেমন অপ্রয়োজনীয় ও অদ্ভুত, ঘরের জিনিসগুলোও তাই। সেখান থেকে গেলাম বাগানে। বাগানে গিয়ে দেখলাম, গর্তের ধারে পোড়া গুঁড়ির ওপরে গুটিসুটি হয়ে সে বসে আছে। হাঁটুদুটো মোড়া, কনুই রেখেছে হাঁটুর ওপরে আর ঘাড়ের পিছনে একহাতের সঙ্গে আরেক হাত আট্কানো। গুঁড়িটা ধুলোকাদায় মাখামাখি, গুঁড়ির একটা মাথা আলকুশি সোমরাজ আর ভাঁটের ঝোপ ছাড়িয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এখানে এভাবে বসে থাকাটাও অস্বস্তিকর। কিন্তু তবুও সে বসে আছে। এই দৃশ্য দেখার পর লোকটির প্রতি আমার আগ্রহ আরো বেশি বেড়ে গেল।

পেঁচার মতো অন্ধ দৃষ্টিতে আমার মাথার ওপর দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, ‘কি, আমাকে ডাকতে এসেছ নাকি?’ তার গলার স্বরে একটু যেন রাগের আভাস।

‘না।’

‘তাহলে এখানে কেন?’

‘এমনি।’

চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে সে লাল-কালো ছোপ লাগানো একটা রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে লাগল।

‘আচ্ছা, নেমে এসো।’

নিচে নেমে তার পাশে গিয়ে বসতেই আমাকে সে একবার জোরে জড়িয়ে ধরল।

‘বসো এখানে। তুমিও কথাটি বলবে না, আমিও না। আমরা দু'জনে শুধু চুপচাপ বসে থাকব, কেমন? ঠিক, এইভাবে... তুমি তো ভারি একগুঁয়ে দেখি!’

‘হ্যাঁ, আমি একগুঁয়ে।’

‘বাঃ বেশ।’

বহুক্ষণ নির্বাক হয়ে আমরা সেখানে বসে রইলাম। সলজ্জ, শান্ত সন্ধ্যা; চমৎকার উষ্ণ একটি সন্ধ্যা; বিষণ্ণতার ছাপ চারিদিকে—যখন সবকিছুই রঙীন অথচ চোখের সামনে সব রঙ মুহূর্তে মুহূর্তে পান্ডুর হয়ে আসছে; যখন ফুরিয়ে আসে গ্রীষ্মকালের মাতাল সৌরভ আর রিক্তা পৃথিবীর শ্বাসের সঙ্গে উঠে আসে শুধু স্যাঁৎসেঁতে ঠান্ডার বুকচাপা গন্ধ; যখন বাতাস হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক রকমের স্বচ্ছ; যখন গোলাপী আকাশে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে পড়ে দাঁড়কাকগুলো, মনের মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক চিন্তার উদয় হয়। চারদিক নিথর ও মৌন। এই নিথর মৌনের রাজ্যে কোথায় একটা পাখি ডানা ঝট্‌পট্‌ করছে বা কোথায় একটা গাছের পাতা খসে পড়ছে—এই সামান্য শব্দটুকুই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে এমন একটা শব্দের ঝড় তোলে যে চমকে উঠে চারদিকে তাকাতে হয় এবং পর মুহূর্তেই আবার সেই সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতায় ডুবে যেতে হয় একেবারে।

এই ধরনের একেকটি মুহূর্তে মনের মধ্যে যে-সব চিন্তার উদয় হয় সেগুলো বিশেষ পবিত্র, তার মধ্যে এতটুকু মলিনতা নেই—মাকড়সার জালের মতো এই চিন্তা বড়ো বেশি স্বচ্ছ এবং বড়ো সহজেই ছিঁড়ে যায়। ভাষা দিয়ে এই চিন্তাকে বন্দী করা যায় না। তারা ঝলসে ওঠে আবার উল্কার মতো মিলিয়ে যায়। নিজের সত্তাকে বিষণ্ণতায় ভরে তোলে, নাড়া দেয়, আদর করে, দোলা দেয়—যাতে চিরকালের মতো ছাপ পড়ে তাতে। সেই সব মুহূর্তেই মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে।

আমার সঙ্গীর উষ্ণ গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখলাম আপেল-গাছের কালো ডালপালার আলপনার ভিতর দিয়ে লিনেৎ-পাখী উজ্জ্বল আকাশে উড়ছে, দেখলাম গোল্‌ড্‌ফিঞ্চ পাখীরা রসালো বীজের সন্ধানে শুক্‌নো শালগমে মাথা ঠুকরোচ্ছে, দেখলাম ছেঁড়াছেঁড়া ধূসর মেঘ—কোনগুলো এবড়ো-খেবড়ো, মাঠের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তাদের নীচে কাকগুলো উড়ে চলেছে, কবরখানায় নিজেদের বাসার দিকে। সবকিছুরই মানে আছে—অসাধারণ মানে।

মাঝে মাঝে আমার সঙ্গীটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে আর বলে উঠছে:

'চমৎকার, না ভাইটি? সত্যিই চমৎকার! ইস্‌, মাটি ভিজে গেছে, তোমার ঠান্ডা লাগছে না তো?'

তারপর যখন আকাশ কালো হয়ে গেল আর রাত্রির অন্ধকারে ডুবে গেল সবকিছু, তখন বলল সে:

'বাস্, আর নয়, এবার উঠে পড়ো...'

বাগানের দরজার কাছে এসে থেমে গিয়ে আবার বলল, 'তোমার দিদিমার মতো আশ্চর্য মানুষ আমি আর দেখিনি। কী বিচিত্র এই সংসার!'

কথাগুলো বলে একটু হেসে চোখ বুজল, তারপর খুব চাপা স্বরে আর খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে আবৃত্তি করতে লাগল:

এই হোক্ সেই লোকের শাস্তি — যে অপরের পাপপরামর্শে কান দেয়, নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দেয় অপরের ইচ্ছার কাছে।

'কথাগুলো মনে রেখো ভাইটি!' উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে আমাকে ঠেলে দিল সামনের দিকে।

'তুমি লিখতে পার?'

'না।'

'শিখে নাও। আর যখন লিখতে শিখবে তখন তোমার দিদিমার এই ছড়াগুলো লিখে নিও। একটি বড়ো কাজ করা হবে তাহলে।'

এই ঘটনার পর থেকেই আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যাই। যখনই ইচ্ছে হয়, 'বাঃ বেশ'এর সঙ্গে দেখা করতে যাই আমি। ছেঁড়া কাপড়চোপড়ে ঠাসা একটা বাক্সের ওপরে নির্বিবাদে বসে বসে তার কাজ দেখি। সে সীসে গলায়, তামা গরম করে; লোহার পাতকে নেহাইয়ের ওপর রেখে সুন্দর কারুকার্য-করা হাতলওলা একটা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে নানা আকারের জিনিস তৈরি করে; নানা রকমের উখো আর সিরিশকাগজ দিয়ে ঘষে সেগুলোকে। কত রকমের উখো যে আছে! আর আছে একটা চুলের মতো সরু করাত। তামার নিক্তিতে ওজন করে প্রত্যেকটা জিনিস। পুরু মোটা চীনামাটির পাত্রে অনেক রকমের তরল পদার্থ মেশায়, ঝাঁজালো ধোঁয়ায় ভরে যায় ঘরটা। একটা মোটা বই দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে, বিড়বিড় করে বকে, নিজের লাল ঠোঁটদুটো কামড়ে নীচু কর্কশ গলায় সে গায়:

হায় রে সারন'এর গোলাপ...

'তুমি কী তৈরি করছ?'

'একটা জিনিস তৈরি করছি ভাইটি...'

'কী জিনিস?'

'কী করে তোমাকে বলি! তোমাকে বোঝাবার মতো করে বলতে পারব না মনে হচ্ছে...'

'দাদামশাই বলেন, তুমি নাকি জাল টাকা তৈরি করছ।'

'দাদামশাই? হুঁ!.. একেবারে বাজে কথা। একটা কথা মনে রেখো ভাইটি, টাকা জিনিসটা এমন কিছু নয় যে তার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে।'

'বলছ কি তুমি? টাকা না থাকলে রুটি কিনতে পারবে?'

'ঠিকই বলেছ ভাই, টাকা না থাকলে রুটি কেনা যায় না...'

'কেমন? আচ্ছা মাংস...'

'হাঁ, মাংসও কেনা যায় না।'

প্রশান্ত হাসি হাসল সে; ভারি ভালো লাগল আমার এই হাসিটুকু। বেড়ালছানাকে লোকে যেভাবে আদর করে তেমনিভাবে আমার কানের পিছনে সুড়সুড়ি দিতে দিতে সে আমাকে বলে:

'ভাইটি, তোমার সঙ্গে আমি বাদপ্রতিবাদ করতে পারব না। প্রত্যেকবারেই তুমি আমাকে কোণঠাসা করে ফেলছ। তার চেয়ে বরং কথাবার্তা না বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকা যাক্, কেমন?'

মাঝে মাঝে সে কাজ থামিয়ে জানলার সামনে আমার কাছে এসে চুপটি করে বসে থাকে। দু'জনে বহুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, আপেল গাছ বিবর্ণ হয়ে উঠছে, তার পাতা পড়ছে ঝরে, ঘাসে ঢাকা উঠোনের ও ছাদের ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। 'বাঃ বেশ' কখনো খুব বেশি কথা বলে না কিন্তু যেটুকু বলে যথার্থ কথাই বলে। যদি সে কোনো কিছু আমাকে দেখাতে চায় তাহলেও অধিকাংশ সময়ে কথা না বলে আস্তে ঠেলা দেয় আমার গায়ে এবং চোখ টিপে তাকিয়ে আমার দৃষ্টি জিনিসটির দিকে আকর্ষণ করে।

আমাদের বাড়ির উঠোনটিতে বিশেষ করে দেখবার মতো কিছু আছে বলে আগে আমার কোনো দিন মনে হয়নি। কিন্তু তার পাশে বসে থাকবার সময়ে মাঝে মাঝে আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে আর মাঝে মাঝে কথা বলে সে আমাকে যে-সব জিনিস দেখিয়েছে সেগুলোর মধ্যে যেন একটা বিশেষ তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছি, সেগুলো আমার স্মৃতিতে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে।

হয়তো একটা বেড়াল ছুটে উঠোনটা পার হয়ে যেতে যেতে কোনো খানা-ডোবায় নিজের ছায়াটা দেখতে পেয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর এমনভাবে থাবা উঁচিয়ে ধরে যেন জলের ভিতরকার ছায়াটাকে সে মারতে চাইছে।

'বাঃ বেশ' বলে, 'বেড়ালের ভয়ানক দেমাক আর স্বভাবটাও তেমনি অবিশ্বাসী।'

সোনালী-লাল রঙের মোরগ 'মামাই' উড়ে গিয়ে বসে বেড়ার ওপরে, ডানা ঝট্‌পট্‌ করে, টাল্‌ ঠিক রাখতে না পেরে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয়, রেগে যায়, ঘাড় টান করে ক্রুদ্ধ স্বরে কি যেন বিড়বিড় শুরু করে।

'এই সেনাপতি নিজেকে একজন হোমরাচোমরা মনে করে, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিটা একটু কম।'

উষ্কখুষ্ক চেহারার ভালেই বুড়ো-ঘোড়ার মতো কাদার ভিতর দিয়ে থপ্‌থপ্‌ করে হেঁটে আসে, ফুলো ফুলো চওড়া মুখটা তুলে আড়চোখে আকাশের দিকে তাকায়, শরৎকালের একফালি ফ্যাকাশে রোদ এসে পড়ে ওর বুকের ওপরে আর জ্যাকেটের পেতলের বোতামটা ঝক্‌ঝক্‌ করে ওঠে। ভালেই দাঁড়িয়ে পড়ে আর বাঁকা বাঁকা আঙুল দিয়ে বোতামটা নাড়াচাড়া করে।

'এমন করছে যেন ওটা বোতাম নয়, বুকের ওপরে মেডেল ঝুলিয়েছে।'

কিছুদিনের মধ্যেই 'বাঃ বেশ'এর ওপর আমার টান খুব বেশি রকম বেড়ে গেছে। দুঃখই হোক্‌ বা আনন্দই হোক্‌, যে-কোনো ব্যাপারে তাকে না হলে আমার কিছুতেই চলে না। আর যদিও সে নিজে চুপচাপ থাকে, বেশি কথা বলাটা তার স্বভাব নয় তবু আমায় কথা বলতে কখনো বাধা দেয় না। তার সামনে বসে আমি খুশিমতো বক্‌বক্‌ করে যাই। আমার দাদামশাইয়ের স্বভাব ঠিক উল্টো। কথা বলতে গেলেই এক ধমক দিয়ে তিনি আমাকে থামিয়ে দেন:

'ওহে কথার জাহাজ, বক্‌বকানিটা একটু থামাও তো দেখি!'

আর আমার দিদিমা নিজের চিন্তা নিয়েই এত ব্যতিব্যস্ত যে অপরের কথায় কান দেবার অবসর তাঁর নেই।

কিন্তু 'বাঃ বেশ' আমার কথা সব সময়েই খুব মন দিয়ে শোনে আর মাঝে মাঝে অল্প একটু হেসে বলে:

'ঠিক বলোনি ভাইটি! এটা তুমি বানিয়ে বলছ!'

মন্তব্যগুলো সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঠিক সময়টিতে এবং ঠিক কথাটির ওপরে। এমনভাবে মন্তব্য করে যে মনে হতে পারে, সে আমার হৃদয়ের ও মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে আর কথাগুলো আমার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে আসবার আগেই বুঝতে পারছে, কোন্‌টা মিথ্যা ও অবান্তর। সঙ্গে

সঙ্গে সেই কথাগুলোকে খুন করছে স্নেহকোমল সুরে বলা তিনটি কথার সাহায্যে:

'বানিয়ে বলছ, ভাইটি!'

তার এই আশ্চর্য যাদুকরী ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্যে মাঝে মাঝে আমি ইচ্ছে করে গল্প বানিয়েছি আর এমনভাবে তার কাছে তা বলেছি যেন সেগুলো সত্যি ঘটনা। কিন্তু প্রতিবারেই অবধারিতভাবে দেখা যায়, অল্প কিছুক্ষণ শোনার পরেই সে মাথা নাড়ে আর বলে:

'বানিয়ে বলছ, ভাইটি!'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমি? আমি ঠিক জানতে পারি।'

সেন্নায়া স্কোয়ার থেকে জল আনবার সময় প্রায়ই দিদিমা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। একদিন যাবার পথে আমরা দেখলাম, পাঁচজন শহুরে লোক একজন গাঁয়ের চাষীকে ধরে পিটোচ্ছে। মাটিতে ফেলে দিয়ে একপাল কুকুরের মতো তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে। দিদিমা করলেন কি, বাঁক থেকে খুলে ফেললেন বাল্‌তিদুটো, তারপর সেই বাঁকটাকে লাঠির মতো ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে গেলেন শহুরে লোকগুলোর দিকে। আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তুই চলে যা!'

কিন্তু ভয় পেয়ে আমিও ছুটলাম দিদিমার পিছনে পিছনে। শত্রুদের লক্ষ্য করে আমি ঢিল ও পাথর ছুঁড়তে লাগলাম আর দিদিমা প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁর বাঁক দিয়ে তাদের খোঁচাতে লাগলেন আর তাদের মাথায় পিঠে দুমদাম বাড়ি মারতে লাগলেন। আরও বহু লোক জুটে গেল। মারতে মারতে তাড়িয়ে দেওয়া হল শহুরে লোকগুলোকে। চাষীর মুখটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, দিদিমা তার মুখ ধুইয়ে দিতে লাগলেন। এই ঘটনার কথা ভাবলে আজও আমি কেঁপে উঠি। আমার মনে পড়ে, লোকটা ধুলোমাখা আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরেছিল ছেঁড়া নাকের পাশটা আর সমানে আর্তনাদ করছিল, কাশছিল। ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসছিল তার দুই আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে, দিদিমার মুখ আর বুক ভেসে গিয়েছিল রক্তে, দিদিমাও চিৎকার করছিলেন, তাঁর শরীরটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর্‌থর্ করে কাঁপছিল।

বাড়ি ফিরেই আমি ছুটতে ছুটতে গেলাম আমাদের সেই বাসিন্দাটির কাছে। তার কাছে আগাগোড়া ঘটনাটা বলতে শুরু করলাম। কাজ থামিয়ে

আমার কাছে এসে দাঁড়াল সে। একহাতে মস্ত একটা উঁখো তলোয়ারের মতো উঁচিয়ে ধরে রইল। চোখের চশমার ফাঁক দিয়ে স্থির ও কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, তারপর হঠাৎ আমার কথায় বাধা দিয়ে অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বলল:

'চমৎকার! এই তো চাই! বেশ, বেশ!'

কিন্তু এই ঘটনা আমাকে এত বেশি অভিভূত করেছিল যে আমি তার এই কথাগুলোয় অবাক না হয়ে অনর্গল কথা বলে চললাম। তখন সে আমাকে একহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলতে লাগল:

'বাস্, বাস্, আর নয়! তুমি যে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলে তা বলা হয়ে গেছে, বুঝেছ? এবার থামো!'

আমি চুপ করে গেলাম। আমাকে এভাবে থামিয়ে দেওয়াতে প্রথমে আমার মনে খুবই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পরে ব্যাপারটা ভালো করে ভাবতেই বুঝতে পারলাম এবং বুঝতে পেরে অবাক হলাম যে ঠিক সময়টিতে সে আমাকে থামিয়েছে। সত্যি সত্যিই আমার যা কিছু বলার ছিল, সবই বলা হয়ে গেছে।

সে বলল, 'এসব কথা মনের মধ্যে পুষে রেখো না, ভুলে যেতে চেষ্টা কোরো।'

মাঝে মাঝে আচমকা সে আমাকে এমন সব কথা বলেছে যা আমি সারা জীবনেও ভুলিনি। একবার আমার শত্রু কুল্যশনিকভের কথা তার কাছে আমি বলেছিলাম। কুল্যশনিকভ হচ্ছে নোভায়া স্ট্রীটের আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। ছেলেটির মোটা শরীর, মস্ত মাথা। আমরা দু'জনেই কেউ কেউকে বাগে আনতে পারি না। আমার এই নিদারুণ সমস্যার কথা শুনে 'বাঃ বেশ' বলল:

'এ সব বাজে কথা! এই ধরনের জোরকে সত্যিকারের জোর বলে না! চটপটে হতে পারাটাই হচ্ছে আসল জোর। যতো তাড়াতাড়ি তুমি হাত-পা নাড়তে পারবে ততোই জোর বাড়বে তোমার। বুঝেছ?'

পরের রবিবার কথাটা পরীক্ষা করে দেখলাম। ঘুষিগুলো চালালাম আরো তাড়াতাড়ি। দেখা গেল, কুল্যশনিকভকে কাবু করতে বেশি সময় পেতে হল না। এই ব্যাপারে আমাদের এই বাসিন্দাটির কথায় আমার আরও বেশি আস্থা এসে গেল।

'সব জিনিসকে কিভাবে আয়ত্তে আনতে হয় সেটা জানতে হয় — বুঝেছ? যে কোনো জিনিসকে পুরোপুরি আয়ত্তে নিয়ে আসা খুবই শক্ত।'

কথাগুলোর অর্থ আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু সেগুলো এবং এই ধরনের আরো অনেক কথা আমার মনে আছে। এসব মনে থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, কথাগুলো আপাতবিচারে খুবই সহজ কিন্তু তবুও তার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর দুর্বোধ্যতা থেকেই যায়, যেমন বলা যেতে পারে একটা ঢিল, একটুকরো রুটি, একটা পেয়ালা বা একটা হাতুড়ি — এসব জিনিসকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসা কি শক্ত কাজ?

আমাদের বাড়ির অন্য সবাই কিন্তু দিন দিনই 'বাঃ বেশ'কে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। আমাদের বাড়ির হাসিখুশি তরুণীটির একটি পোষা বেড়াল আছে, ডাকলেই কাছে আসে, কোলে উঠে বসে, কিন্তু এই বেড়ালটিও কিছুতেই তার কোলে আসে না বা হাজার আদর করে ডাকলেও তার ডাকে সাড়া দেয় না। এজন্যে বেড়ালটাকে আমি মারতে ধরতে বাকি রাখিনি, আচ্ছা করে বেড়ালটার কান মলে দিয়েছি, নানাভাবে বেড়ালটাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে এই লোকটিকে ভয় পাবার কিছু নেই—কিন্তু আমার নিজের প্রায় কান্না এসে গেছে তবুও বেড়ালটাকে বোঝাতে পারিনি।

'কি জান ভাইটি, আমার জামাকাপড়ে অ্যাসিডের গন্ধ কিনা তাই বেড়ালটা আমার কাছে আসতে চায় না।' এই বলে সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু আমি জানতাম বাড়ির আর সবাই-ই, আমার দিদিমাও বাদ যান না, অন্য কথা বলে। সবাই তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। আমার মনে হত এটা অন্যায়, আমার কষ্ট হত এতে।

আমার দিদিমা রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'ওই লোকটার কাছে সব সময়ে ঘুরঘুর করিস কেন বল্ তো? বুঝেশুনে চলিস্ বাপু, নইলে তোর মাথাতেও তুকতাক মন্ত্র ঢুকিয়ে দেবে!'

আর আমার লালমুখো বদমেজাজী দাদামশাই যতোবার শুনতেন যে, আমি এই বাসিন্দাটির কাছে গিয়েছি ততোবারই নির্দয়ভাবে বেত মারতেন আমাকে। স্বভাবতই আমি 'বাঃ বেশ'কে কক্ষণো বলতাম না যে, তার কাছে আসতে আমাকে সবাই বারণ করে কিন্তু তার সম্পর্কে অন্যরা কী বলাবলি করে সেকথা আমি তার কাছে গোপন করিনি।

'দিদিমা তোমাকে ভয় করেন। দিদিমা বলেন, তুমি নাকি তুক্‌তাক কি

সব শয়তানী মন্ত্র জান। দাদামশাইয়েরও সেই ধারণা। দাদামশাই বলেন, তুমি নাকি ভগবান মানো না, তুমি খুবই ভীষণ লোক।'

কথাগুলো শুনে সে মাছি তাড়াবার মতো করে মাথাঝাঁকুনি দেয়। তার ফ্যাকাশে মুখে চাপা একটু হাসি ফুটে ওঠে। তাই দেখে আমার বুকের ভিতরটা কুঁকড়ে যায় আর মাথাটা ঘুরতে থাকে।

নীচু স্বরে সে বলে, 'ভাইটি, একথা আমি জানি। আমিও টের পাই। ভারি বিশ্রী ব্যাপার — না? কি বলো?'

'হ্যাঁ।'

'ভারি বিশ্রী, ভাইটি!'

শেষ পর্যন্ত তাকে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

একদিন সকালে প্রাতরাশের পর দেখলাম, নিজের ঘরে মেঝের ওপরে বসে সে একটা বাক্সের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছে আর আপন মনেই গুনগুন করে গাইছে, 'হায় রে সারন'এর গোলাপ!'

'ভাইটি, এবার তাহলে বিদায় দাও। আমি চলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

জবাব দেবার আগে তীব্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে একবার আমার দিকে তাকাল।

'কেন, তুমি কিছু জান না? তোমার মা আসছেন, সেজন্যে এই ঘরটি দরকার।'

'কে বলেছে একথা?'

'তোমার দাদামশাই।'

'দাদামশাই মিথ্যে কথা বলেছেন!'

'বাঃ বেশ' আমাকে টেনে নিয়ে কাছে বসাল। মেঝের ওপরে তার পাশটিতে আমি বসলাম। আব তখন নীচুস্বরে বলল সে:

'রাগ কোরো না ভাইটি! আমি ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা জেনেও তুমি আমার কাছে কিছু বলোনি। সেটা আমার ভালো লাগেনি।'

যে জন্যেই হোক, কথাটা আমাকে ঘা দিল এবং তার জন্যে আমি রেগে উঠলাম।

অল্প একটু হেসে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে সে বলল, 'শোন ভাইটি, তোমার মনে আছে তোমাকে যে একবার আমি আমার কাছে আসতে বারণ করেছিলাম?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় জানালাম।

'তখনই তোমার মনে খুব কষ্ট হয়েছিল, নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'আর আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনি। কিন্তু আমি জানতাম, তোমার সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব হয় তাহলে বাড়ির লোক তোমাকে বকাঝকা করবে।'

এমনভাবে সে কথা বলল যেন সে ছোট, আমার সমবয়স্ক। তার কথা শুনে আমি ভারি খুশি হলাম। আমার মনে হতে লাগল, সে এইমাত্র আমাকে যে-কথাটি বলেছে তা আমি অনেক আগে থেকেই জানতাম।

বললাম, 'আমি একথা অনেক আগেই জানতাম।'

'বেশ। তাহলে ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এই, বুঝলে তো ভাইটি? এই।'

আমার বুকের ভিতরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে লাগল।

'কেউ তোমাকে পছন্দ করে না কেন?'

আমাকে সে জোরে বুকের ওপরে চেপে ধরল আর চোখ মিটমিট করে বলল:

'কেন জান ভাইটি? আমি অন্য কারও মতো নই। আসল কারণটা তা-ই। আমি তাদের মতো নই!'

কী বলব বুঝতে না পেরে আমি তার জামার আস্তিনটা আঁকড়ে টেনে রইলাম।

'রাগ কোরো না ভাইটি।' তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল সে আমার কানে কানে: 'আর কেঁদোও না!'

কিন্তু তার অজান্তেই তার ঝাপসা চশমার কাঁচদুটোর নীচ দিয়ে টস্‌টস করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

অন্য দিনের মতো সেদিনও আমরা বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে সামান্য দু-একটা কথার আদানপ্রদান হল মাত্র।

সেইদিন সন্ধ্যায় প্রত্যেকের কাছে প্রসন্ন মুখে বিদায় নিয়ে এবং আমাকে একবার নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে সে চলে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলাম। শীতে কাদা জমে রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে, গাড়ির চাকা লাফাচ্ছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরেও ঝাঁকুনি লাগছে। যতোক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

এদিকে সে চলে যেতেই আমার দিদিমা নোংরা ঘরটা পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেছেন। আমি করলাম কি, ইচ্ছে করে ঘরের একোণ থেকে ওকোণে ঘোরাঘুরি করে তাঁর কাজে বাধা দিতে লাগলাম।

আমার গায়ে হোঁচট খেয়ে দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন, 'বেরো, বেরো এখান থেকে।'

'ওকে কেন তোমরা এখানে থাকতে দিলে না?'

'তাতে তোর কী?'

'তোমরা সবাই বোকা!' বললাম আমি।

একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে আমাকে সপাং সপাং করে মারতে মারতে দিদিমা চিৎকার করতে লাগলেন, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? বদ্ধ পাগল হয়েছিস নাকি?'

'বদ্ধ পাগল তো সকলেই, তুমি ছাড়া।' সংশোধন করে বললাম আমি কিন্তু দিদিমা তবুও শান্ত হলেন না।

রাত্রিবেলা খেতে বসে দাদামশাই বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে লোকটা চলে গেছে! যতোবার লোকটাকে দেখতাম, আমার বুকে যেন ছুরি বিঁধত। যাক্, এতদিনে রেহাই পাওয়া গেছে।'

রাগে আমি একটা চামচ ভেঙে ফেললাম এবং সেজন্যে যথারীতি শাস্তিও আমাকে পেতে হল।

এই ভাবে শেষ হোলো আমার প্রথম বন্ধুত্ব সেই ধরনের অসংখ্য লোকের সঙ্গে নিজের দেশে যারা পরবাসী — যারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতিনিধি।

নয়

আমার ছেলেবেলাটাকে মৌচাকের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই মৌচাকে জীবন সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধু আহরণ করেছে নানান সাধারণ ও সাদাসিধে মানুষ। আমার চরিত্রের গঠন ও বিকাশে এদের দান তুচ্ছ নয়। এই মধু মাঝে মাঝে নোংরা ও তেতো না হয়েছে তা নয়। কিন্তু যেহেতু সেগুলি জ্ঞান সেহেতু তারা মধু বৈকি।

'বাঃ বেশ' চলে যাবার পরে আমার সঙ্গে পিওতর-কাকার বন্ধুত্ব হল। আমার দাদামশাইয়ের সঙ্গে তার মিল এইদিক থেকে যে দাদামশাইয়ের মতো সেও রোগা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে চেহারার দিক থেকে এবং অন্য

সমস্ত দিক থেকে দাদামশাইয়ের চেয়ে সে খাটো। তাকে দেখে আমার মনে হত, বাচ্চা একটি ছেলে যেন শুধু মজা করবার জন্য বুড়ো মানুষের সাজপোশাক পরেছে। সরু সরু চামড়ার ফিতে পাকিয়ে চুবড়ির মতো তৈরি করা তার মুখখানা একটা খাঁচার মতো দেখতে হয়েছে আর এই খাঁচার ভিতর থেকে ছোট ছোট দুটো পাখির মতো কৌতুকোজ্জ্বল চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে থাকে। কোঁকড়ানো পাকা চুল, ছোট ছোট চক্রে পাক খাওয়া দাড়ি। পাইপ টানবার সময় মুখ থেকে যে ধোঁয়া বেরোয় তার রঙটাও ঠিক তার চুলের মতো আর তার প্রবাদভরা কথাবার্তাও সেই ধোঁয়ার ছোট ছোট চক্রের মতো পাক খায়। কথা বলার ধরনটা খুবই পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি, কথা বলে ভন্‌ভন্‌ স্বরে, মনে হয় কথাগুলোর মধ্যে দরদ ও নম্রতা আছে-- কিন্তু আমার কেমন জানি একটা ধারণা যে, তার কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে।

'আমার মনিব ছিলেন একজন কাউণ্টেস। নাম—তাতিয়ান, পৈতৃকনাম—লেক্সেভনা। ব্যাপারটা শুরু হল এইভাবে। তিনি আমাকে বললেন—তুমি কামারশালায় কাজ শেখ গিয়ে। কিন্তু যেই না আমি কামারশালায় গিয়েছি, তিনি আমাকে ডেকে বললেন—তুমি বাগানের মালীর সঙ্গে কাজ করো গিয়ে। আমার তো কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই, এক জায়গায় হলেই হল। কিন্তু সেই যে কথায় আছে না—যার কাজ তারে সাজে, অন্য হাতে লাঠি বাজে! সুতরাং কিছুদিন পরেই দেখা গেল, আমাকে দিয়ে সুবিধে হচ্ছে না। কাউণ্টেস আমাকে ডেকে বললেন—"পেত্রুশ্‌কা, তার চেয়ে বরং তুমি মাছ ধরার কাজে লেগে যাও!" যেমন বলা তেমনি কাজ। আমিও উঠে-পড়ে লেগে গেলাম। তারপর কাজটা যখন একটু-আধটু রপ্ত হয়ে আসছে, বাস্‌, হয়ে গেল মাছ ধরা! গাড়ি চালাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল শহরে। তারপর থেকেই আমি গাড়ি-চালক। আরও কত কী হতাম কে জানে। কিন্তু কাউণ্টেসের ঝোঁক অন্য কোনো দিকে যাবার আগেই মুক্তি-আইন পাশ হয়ে গেল। তারপর আর কী! আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম, ঘোড়াটা রইলো আমার কাছে আর তখন থেকে কাউণ্টেসের বদলে ঘোড়াটার পিছন-পিছন চলি।'

সেটা বুড়ো হয়ে গেছে, গায়ের রং সাদা, কিন্তু দেখে মনে হয়, এক মাতাল চিত্রকর নানা রঙের তুলি নিয়ে ঘোড়াটার সারা গায়ে ফুটফুট দাগ দিয়েছে। পাগুলো বাঁকা, উল্টোপাল্টা লাগিয়ে দেওয়ার মতো। কিম্ভূতকিমাকার

চেহারা—ছেঁড়া ন্যাকড়ায় সেলাই করা কোনো রকমে একটা ঘোড়ার চেহারা দাঁড় করানো হয়েছে যেন। ছানিপড়া দুটো চোখ সমেত হাড়গিলে মাথাটা কাতরভাবে ঘাড় থেকে ঝুলছে; কয়েকটা শীর্ণ পেশী ও শিথিল চামড়া কোনো রকমে আটকে রেখেছে মাথাটাকে। ঘোড়াটার ওপরে পিওতর-কাকার ভারি শ্রদ্ধা, ঘোড়াটাকে সে ডাকে 'তান্‌কা' বলে আর কক্ষণো তার গায়ে হাত তোলে না।

দাদামশাই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার ঘোড়াটাকে এমন একটা খ্রীষ্টান নাম দিয়েছ কেন বলো তো হে?'

সে জবাব দিয়েছিল, 'না, ভাসিল ভাসিলিচ, না, তোমার কথাটা ঠিক নয়। "তান্‌কা" খ্রীষ্টান নাম নয়—খ্রীষ্টান নাম হচ্ছে "তাতিয়ানা"।'

পিওতর-কাকাও লেখাপড়া জানে এবং তার শাস্ত্রজ্ঞানটা প্রখর। সাধুমহাত্মাদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট এই নিয়ে দাদামশাইয়ের সঙ্গে সব সময়েই তর্কবিতর্ক চলে তার। বাইবেলে যে-সব পাপীদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে দু'জনেই খড়্গহস্ত। দু'জনেই সবচেয়ে বেশি অপবাদ দেয় আবেসালোমকে। আবার মাঝে মাঝে দু'জনের তর্কবিতর্ক হয়ে ওঠে ব্যাকরণগত চুলচেরা বিচার। আমার দাদামশাই বলেন — 'পাপাচারবাদ', 'উচ্ছৃঙখলবাদ', 'মূর্তিপূজাবাদ'। আর পিওতর-কাকা বলে—'পাপাচারিতা', 'উচ্ছৃঙখলচারিতা', 'মূর্তিপূজাচারিতা'।

রাগে মুখখানা লাল টকটকে করে আমার দাদামশাই হুঙকার ছাড়েন, 'তুমি বলছ এক কথা আর আমি বলছি অন্য কথা। তোমার ওই "-চারিতা"র কাণাকড়িও দাম নেই।'

পিওতর-কাকা একটুও বিচলিত হয় না, তেমনিই তার মাথার চারপাশ দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে। টেনে টেনে তিক্ত স্বরে বলে:

'আর তোমার "-বাদ"টা যে আরো উঁচুদরের ব্যাপার তা কিন্তু মোটেই নয়। ভগবানের কাছে সেটা আমার চেয়ে একটুও বেশি ভালো নয়। আবার এমনও হতে পারে, তোমার উপাসনা শুনে প্রভু হয়তো মনে মনে ভাবেন—উপাসনার কথাগুলো জাঁকালো বটে কিন্তু কাণাকড়িও তার দাম নেই!'

সবুজ দুই চোখে আগুন ঝরিয়ে দাদামশাই হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'এই লেক্সেই! তোর এখানে থাকার কি দরকার? যা, বাইরে যা!'

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে পিওতর ভালোবাসে। উঠোন দিয়ে

চলবার সময়ে পায়ের সামনে হাড়ের টুক্‌রো বা কাঠি পড়ে থাকলে পা দিয়ে সরিয়ে দেয় আর বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে :

'যত সব বাজে জিনিস, শুধু বাধার সৃষ্টি করে।' কথা বলে একটু বেশি, যেন হাসিখুশি দিলদরিয়া মানুষ। কিন্তু মাঝে মাঝে চোখদুটো নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে আর মড়ার মতো তাকিয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, কোনো একটা অন্ধকার কোণে সে আপনমনে বসে আছে; তার ভাইপোর মতো সেও তখন বিষণ্ণ ও নির্বাক।

'পিওতর-কাকা, কী হয়েছে তোমার?'

নিস্পৃহ গলায় যতোটা সম্ভব ঝাঁজ এনে সে জবাব দেয়, 'দূর হ!'

আমাদের এই রাস্তার একটা বাড়িতে এক ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁর কপালে আব্, আর একটা অদ্ভুত অভ্যেস আছে ভদ্রলোকের। রবিবার দিন তিনি জানলার কাছে বসে ছর্‌রা বন্দুক ছোঁড়েন; তাঁর লক্ষ্যস্থল হয় রাস্তার কুকুর, বেড়াল, হাঁস-মুরগি, কাক, এমন কি যে-সব পথচারীকে তাঁর পছন্দ হয় না তারাও। একদিন 'বাঃ বেশ'কে লক্ষ্য করে ছর্‌রা ছুঁড়েছিলেন; ছর্‌রা 'বাঃ বেশ'এর চামড়ার জ্যাকেট ফুটো করতে পারেনি, কিন্তু কতগুলি ছর্‌রা এসে পড়েছিল তার পকেটের মধ্যে। আমার মনে আছে, আমাদের বাসিন্দাটিকে পকেট থেকে ছর্‌রা বার করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে দেখেছিলাম। আমার দাদামশাই তাকে নালিশ করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু সে-কথায় কান না দিয়ে সে ছর্‌রা রান্নাঘরের কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু বলে, 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে অত ঝামেলা পুইয়ে লাভ কি!'

আরেকবার এই লক্ষ্যভেদকারী ভদ্রলোকের ছর্‌রা এসে লাগে আমার দাদামশাইয়ের পায়ে। ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে দাদামশাই দোষীর বিরুদ্ধে বিচারকের কাছে নালিশ করেন এবং সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা যায়, ভদ্রলোক উধাও।

রাস্তার দিক থেকে সেই ভদলোকের ছর্‌রা ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেলেই পিওতর-কাকা তাড়াহুড়ো করে গেট দিয়ে বেরিয়ে যায়। মাথায় গলিয়ে নেয় রবিবারের-জন্যে-তোলা মস্ত-কিনারওলা রং-চটা টুপিটা। রাস্তায় বেরিয়ে এসে কোটের ভিতর দিয়ে এমনভাবে হাত গলিয়ে দেয় যে কোটের পিছনদিককার অংশটুকু উঁচু হয়ে থাকে মোরগের লেজের মতো। পেটটা চিতিয়ে দিয়ে ভারিক্কী চালে পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়ায় বন্দুকধারী ভদ্রলোকটির জানলার সামনে। প্রথমবারের পরিক্রমা কার্যকরী না হলে দ্বিতীয়বার, দ্বিতীয়বার না

হলে তৃতীয়বার, এমনি সমানে। ঘটনাটা দেখবার জন্যে আমাদের বাড়ির সবাই ভিড় করে এসে দাঁড়ায় গেটের সামনে, কৃষ্ণমুখ ফৌজী লোকটি ও তার সোনালী-চুল বৌ তাকিয়ে থাকে জানলা দিয়ে। বেৎলেংদের বাড়ির লোকেরাও বেরিয়ে আসে রাস্তায়। শুধু অভসিয়ান্নিকোভদের ছাইরঙা বাড়িটায় জীবনের সাড়া পাওয়া যায় না।

মাঝে মাঝে পিওতর-কাকার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়— এমন একটি শিকারকে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে দেখেও বন্দুকধারী ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই দোনলা বন্দুকটা থেকে ছর্‌রা ছুটে আসে।

'বুম্‌—বুম্‌!'

পিওতর-কাকা পালিয়ে আসে না, তেমনি ভারিক্কী চালে ধীরেসুস্থে পা ফেলে এগিয়ে এসে আমাদের খবর দিয়ে যায়: 'কোটের পিছনদিকটার অংশেতে ছর্‌রা লেগেছে।'

একদিন ছর্‌রা এসে লাগল পিওতর-কাকার কাঁধে আর ঘাড়ে। সূচ দিয়ে ছর্‌রাকে বার করতে করতে দিদিমা বললেন, 'এই বুনো লোকটাকে এভাবে উস্‌কিয়ে তুলে লাভ কী! এমন করলে কোন্‌দিন চোখে ছর্‌রা করে বসবে!'

কথাটায় কিছুমাত্র আমল না দিয়ে পিওতর বলল, 'আকুলিনা ইভানোভনা, আপনিও যেমন! হাতের তাক্‌ বলে কোনো কিছু আছে নাকি ও-লোকটার!'

'তাহলে ওকে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া কেন?'

'প্রশ্রয়? আমি ভদ্রলোককে একটু ক্ষেপাই!'

হাতের ছর্‌রাগুলোর দিকে তাকিয়ে সে আবার বলল, 'এ লোকটা বন্দুক ছোঁড়ায় একেবারে আনাড়ি। তাহলে শুনুন, কাউণ্টেস তাতিয়ান লেক্সেভনার একটা গল্প বলি। এই কাউণ্টেসটি বিয়ের ব্যাপারে কোনো স্থায়ী বন্ধনের মধ্যে কখনো ধরা দিতেন না। যেমন তিনি চাকর বদ্‌লাতেন, তেমনি স্বামী বদ্‌লাতেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন এমনি ধারা অস্থায়ী স্বামিত্বে রয়েছে সেনাবাহিনীর একজন লোক, নাম মামন্‌ৎ ইলিচ। হ্যাঁ, হাতের তাক্‌ ছিল বটে এই লোকটির! বন্দুক নিয়ে কি না করতে পারত! ছর্‌রা সে ছুঁড়তো না, কেবল গুলি। ইগ্‌নাশ্‌কা নামে একটা ভ্যাবামার্কা লোককে দাঁড় করিয়ে দিত দূরে, এই পা চল্লিশেক হবে। তার বেল্টের সঙ্গে একটা বোতল বেঁধে দিত, আর বোতলটা ঝুলত দুই পায়ের মাঝখানে। দুই ঠ্যাঙ যতোটা সম্ভব ফাঁক করে ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো হাসতে

হাসতে দাঁড়িয়ে থাকত ইগ্‌নাশ্‌কা আর সেই বোতল লক্ষ্য করে গ্ৰুলি ছ্ৰুঁড়ত মামনৎ ইলিচ। ব্ৰুম্‌! চুরমার হয়ে যেত বোতলটা। কিন্তু একবার হল কি, একটা ডাঁশপোকা বোধ হয় ইগ্‌নাশ্‌কাকে কামড়িয়েছিল বা যা-হোক একটা কিছ্ৰু হয়েছিল—লোকটি স্থির থাকতে না পেরে সরে গেল একটু, আর যাবে কোথায়, ব্ৰুলেট এসে বে'ধে হাঁটুতে, একেবারে ঠিক গাঁটের হাড়টিতে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার এসে একটুও সব্ৰুর করে না — চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঠ্যাঙটা কেটে বাদ দিয়ে দেয়। ঠিক যেমনটি বললাম তেমনটি ঘটেছে! সেই কাটা ঠ্যাঙটা পরে কবর দেওয়া হয়েছিল...'

'আর ইগ্‌নাশ্‌কার কী হল?'

'তার আবার কী হবে! সেরে উঠেছিল। ভ্যাবাগঙ্গারামের হাত-পা থাকাই বা কি, না-থাকাই বা কি। সবাই তাদের সাহায্য করে। সেই যে কথায় আছে— যার ব্ৰুদ্ধি নেই তার শত্ৰুও নেই।'

এই গল্প দিদিমাকে তেমন নাড়া দিতে পারেনি। এই ধরনের বহ্ৰু গল্প দিদিমার নিজেরও জানা আছে। কিন্তু আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

'বড়লোকরা খ্ৰুশিমতো যে-কোনো লোককে খ্ৰুন করতে পারে ব্ৰুঝি?'

'কেন পারবে না? খ্ৰুশিমতো খ্ৰুন করতে পারে, কেউ আট্‌কাবার নেই। আবার কি জান, বড়মান্ৰুষরা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যেও খ্ৰুনোখ্ৰুনি শ্ৰুর্ৰু করে দেয়। একবার এক অশ্বারোহী সৈনিক দেখা করতে এল তাতিয়ান লেক্সেভনার সঙ্গে। মামনৎ'এর সঙ্গে তার হল ঝগড়া। তখন তারা দ্ৰু'জনেই পিস্তল বাগিয়ে ধরে হেস্তনেস্ত করবার জন্যে পার্কে চলে গেল। প্ৰুকুরের ধারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সৈনিকটি গ্ৰুলি করল মামনৎ'কে। ব্ৰুম্‌! গ্ৰুলিটা গিয়ে সোজা লাগল মামনৎ'এর যকৃতে। তারপর আর কি, মামনৎ'কে কবর দেওয়া হল আর সৈনিকটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ককেশাসে। ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য হয়নি। তাহলেই দেখছ তো? নিজেরাই খ্ৰুনোখ্ৰুনি করত! আর চাষাভুষোদের খ্ৰুন করার কথা যদি বলো তো তাহলে আর লেখাজোখা নেই। যতো জনকে খ্ৰুশি খ্ৰুন করা চলে। বিশেষ করে আজকাল। আজকাল তো আর চাষাভুষোরা ওদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আগেকার দিনে চাষাভুষোরা ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তখন তব্ৰু যা হোক এমন চট করে প্রাণ নিত না।'

দিদিমা বললেন, 'কিন্তু তখনও প্রাণ নিতে তাদের কারুরই বিশেষ আফ্‌সোস দেখা যেত না।'

'তাও ঠিক।' পিওতর-কাকা সায় দিল, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল বটে তবে খুবই শস্তা দামের সম্পত্তি।'

আমার সঙ্গে কথাবার্তায় সে অতি নম্র। আমার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে সে আমার সঙ্গে কথা বলে; এত ভালো ব্যবহার বড়োদের সঙ্গেও সে করে না। কিন্তু তার মধ্যে কি যেন একটা আছে যা আমি কিছুতেই পছন্দ করতে পারি না। তার অতি প্রিয় খাদ্য ফলের জ্যাম যখন সে আমাদের খাওয়াতে আসে, তখন করে কি, অন্যদের রুটিতে যতোটা না পুরু করে জ্যাম মাখে তার চেয়ে অনেক বেশি পুরু করে মাখে আমার রুটিতে। শহরে গেলে সে আমার জন্যে আদা দেওয়া মিষ্টি কেক আর পোস্তর পিঠে নিয়ে আসে। ধীর মস্তিষ্কে এবং যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে আমার সঙ্গে সব সময়ে কথা বলে সে।

'আচ্ছা বলো তো দেখি, বড়ো হয়ে তুমি কি হতে চাও? সৈনিক হবে না কর্মচারী হবে?'

'সৈনিক।'

'সেই ভালো। আজকাল সৈন্য হওয়াটা শক্ত নয়। অবশ্য পাদ্রি হওয়াটাও খুবই সোজা—শুধু চোখ বুজে চিৎকার করে যাওয়া "পরমমঙ্গলময় প্রভু আমাকে বাঁচাও!" বাস্, আর কিচ্ছুটি করতে হবে না। আমার তো মনে হয়, সৈন্য হওয়ার চেয়েও পাদ্রি হওয়াটা সোজা। কিন্তু সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে জেলে হওয়া। কোন কিচ্ছু জানবার দরকার নেই—শুধু একটু অভ্যেস, বাস্!'

তারপর সে ভারি মজা করে দেখাতে শুরু করে, কি-ভাবে মাছ এসে টোপের চারপাশে ঘুরপাক খায়, কি ভাবে টোপ গেলার পর বাস্ বা ব্রীম বা ম্যাকেরেল জাতীয় মাছ হুটোপাটি করে।

সান্ত্বনার সুরে আমাকে বলে, 'তোমার দাদামশাই যদি তোমাকে মারধোর করেন তাহলে তো তুমি একেবারে ক্ষেপে ওঠো, নয় কী? কিন্তু তোমায় বলি শোনো, এসব ব্যাপারে অমন ক্ষেপে উঠবার কোনো কারণ নেই। তোমার দাদামশাই যে তোমাকে মারধোর করেন, সে তোমার মঙ্গলের জন্যেই। আর তোমার দাদামশাইয়ের মারধোর তো কিছুই নয়, নেহাতই একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। তাহলে শোন তোমাকে তাতিয়ান লেক্সেভনার একটা গল্প বলি।

মারধোর করার কথাই যদি ওঠে তাহলে এই হচ্ছে একটি লোক যার তুলনা নেই। মারধোর করার জন্যে ক্রিস্তোফোর নামে তাঁর একজন বিশেষ চাকর ছিল। আর মারধোর করার ব্যাপারে লোকটার এমন পাকা হাত যে আশেপাশের জমিদাররা তাতিয়ান লেক্সেভনার কাছে এই বলে খবর পাঠাত: "তাতিয়ান লেক্সেভনা, অনুগ্রহ করে আপনার ক্রিস্তোফোরকে একবার পাঠিয়ে দেবেন-- দু-এক দফা মারধোরের ব্যাপার আছে।" আর খবর পেলেই কাউণ্টেস পাঠিয়ে দিতেন ক্রিস্তোফোরকে।'

তারপর পিওতর-কাকা ভাবলেশহীন গলায় খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতে শুরু করে। তাঁর বাড়ির থামওলা অলিন্দে লাল আর্মচেয়ার পেতে, ধবধবে সাদা পোশাকের ঝলক তুলে, কাঁধে নীলরঙের স্কার্ফ জড়িয়ে, কাউণ্টেস এসে বসেন। মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে ভূমিদাসদের চাবুক মারে ক্রিস্তোফোর আর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন কাউণ্টেস।

'এই ক্রিস্তোফোর লোকটা এসেছিল র‍্যাজান থেকে। খানিকটা বেদে বা খখল'এর* মতো। আকর্ণবিস্তৃত গোঁফ কিন্তু দাড়ি কামিয়ে ফেলে বলে মুখটা নীলচে দেখায়। কিছুতেই বোঝা যেত না, লোকটি সত্যিই হাবাগোবা ছিল না বাইরের উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্যে লোকের কাছে হাবাগোবা সেজে থাকত। থেকে থেকে রান্নাঘরে এসে একটা পাত্র জলে ভর্তি করে নেয়, তারপর একটা মাছি বা আরশোলা বা গুবরে পোকা জাতীয় যা হোক্ একটা কিছু ধরে একটা সরু কাঠির ডগা দিয়ে ঠেসে চুবিয়ে ধরে জলের মধ্যে। অনেকক্ষণ চুবিয়ে ধরে রেখে দেয় এইভাবে। তার নিজের কলারের মধ্যে হয়তো উকুন আছে সেটাকেই খপ্ করে ধরে কয়েকবার জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরে...'

এ-ধরনের গল্প আমি ভালোভাবেই জানি, আমার দাদামশাই ও দিদিমার কাছ থেকে এ-ধরনের অনেক গল্পই আমি শুনেছি। এইসব গল্পের মধ্যে অমিল যতোটুকুই থাক্, একটা বিষয়ে কিন্তু মিল আছে—এগুলো সবই মানুষের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার গল্প। শুনে শুনে আমার আর ভালো লাগে না।

আমি বলি, 'এসব গল্প নয়, অন্য গল্প বলো।'

গাড়ি-চালকের মুখটা রেখায় রেখায় কুটিল হয়ে ওঠে। একটু পরে মুখের

* তখনকার রাশিয়ায় প্রচলিত ইউক্রেনবাসীদের চলতি নাম। — সম্পাঃ

রেখাগুলি সরতে সরতে জড়ো হয় দুই চোখের চারপাশে। তারপর সায় জানিয়ে সে বলে:

'তোমার দেখছি আর আশ মেটে না। আচ্ছা শোনো তবে অন্য একটা গল্প। আমাদের এক পাচক ছিল...'

'আমাদের মানে কাদের?'

'কাউণ্টেস তাতিয়ান লেক্সেভনার।'

'আচ্ছা তুমি কাউণ্টেসকে তাতিয়ানা না বলে তাতিয়ান বলো কেন? তাতিয়ান তো পুরুষের নাম। কাউণ্টেস তো আর পুরুষ ছিলেন না, নয় কি?'

'সে কথা তো ঠিকই—কাউণ্টেস মহিলাই ছিলেন। কিন্তু মহিলা হলেও কাউণ্টেসের গোঁফ ছিল। ছোট কালো একটুখানি গোঁফ। তাঁর গায়ের রং ছিল কালো, জার্মান বংশে জন্ম—অনেকটা নিগ্রোদের মতোই একটা জাতি। তারপর শোনো কি কাণ্ড হল আমাদের এই পাচককে নিয়ে—সে এক ভারি মজার ঘটনা...'

মজার ঘটনাটা হচ্ছে এই: সেই পাচক একবার এক ধরনের মাংসের পুর-দেওয়া খাবার তৈরি করেছিল। রান্নার দোষে নষ্ট হয়ে যায় খাবারটা। তখন সেই পাচককে শাস্তি হিসেবে সমস্ত খাবার গিলিয়ে দেওয়া হয়। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে লোকটি।

রেগে উঠে আমি বলি, 'এটা কি খুব মজার ঘটনা হল?'

'তবে মজার ঘটনা কাকে বলে শুনি? বলো তুমি, তোমার মুখেই শোনা যাক্।'

'জানি না।'

'তাহলে বক্‌বক্ কোরো না। মুখটি বুজে থাকো।'

আবার সে তার একঘেয়ে গল্পের জাল বুনতে থাকে।

কোনো কোনো রবিবার আমার মামাতো ভাইয়েরা বেড়াতে আসে। দুই ভাইয়ের নামই সাশা। একজন মিখাইল-মামার ছেলে—গোমড়া মুখ আর ঢিলেঢালা গোছের। অপরজন ইয়াকভ-মামার ছেলে—ফিটফাট, সবজান্তা। একদিন আমরা তিনজনে বাইরের বাড়ির ছাদের ওপরে অভিযানে বেরিয়েছি এমন সময় দেখলাম, বেৎলেংদের বাড়ির উঠোনে একটা কাঠের গাদার ওপরে বসে এক ভদ্রলোক কতগুলো কুকুরছানার সঙ্গে খেলা করছেন। পরনে লোমের আস্তরদেওয়া একটা সবুজ রঙের ঝুলকোট কিন্তু মাথার হলুদরঙের

ছোট টাকটুকু অনাবৃত। আমার মামাতো ভাইদের একজন প্রস্তাব করল যে একটা কুকুরছানা চুরি করে আনা যাক্। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভেবেচিন্তে একটা পরিকল্পনা স্থির করলাম। আমার মামাতো ভাইয়েরা রাস্তায় বেরিয়ে বেৎলেংদের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমি গিয়ে লোকটাকে ভয় পাইয়ে দেব। আর যেই সে ভয়ে পালিয়ে যাবে, আমার মামাতো ভাইয়েরা একছুটে উঠোনের মধ্যে এসে একটা কুকুরছানা নিয়ে পালিয়ে আসবে।

'কিন্তু আমি ভয় দেখাব কী করে?'

মামাতো ভাইদের একজন পরামর্শ দিল: 'ওর টাকমাথায় থুতু ফেললেই লোকটা ভয় পেয়ে যাবে।'

টাকমাথায় থুতু ফেলে আসার মধ্যে যে বিশেষ রকমের দোষণীয় কিছু আছে তা আমার মনে হল না। এর চেয়েও বড়ো অপরাধ ঘটতে আমি দেখেছি এবং শুনেছি। সুতরাং আমার ওপরে যে দায়িত্ব দেওয়া হল তা পালন করতে আমি একটুও ইতস্তত করলাম না।

কিন্তু ঘটনাটি ঘটার পরেই একটা প্রচণ্ড রকমের হৈচৈ আর গণ্ডগোল শুরু হল। বেৎলেংদের বাড়ি থেকে এক দঙ্গল মেয়েপুরুষ চড়াও হল আমাদের বাড়িতে। সবার আগে আগে এল একজন সুন্দরপানা তরুণ অফিসার। এবং যেহেতু এই অপকর্মটি ঘটবার সময়ে আমার মামাতো ভাইয়েরা অত্যন্ত নিরীহের মতো রাস্তায় বেড়াচ্ছিল তাদের কোনো দোষ আছে বলে মনে করা হল না। একমাত্র আমিই দাদামশাইয়ের হাতে মার খেলাম। দাদামশাই আমাকে প্রচণ্ড মার মারলেন। বেৎলেংদের বাড়িকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে, মারের প্রচণ্ডতার মধ্যে দিয়ে তাকে লাঘব করবার চেষ্টা করলেন দাদামশাই।

থেঁৎলানো শরীর ও সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা নিয়ে আমি যখন রান্নাঘরে পড়ে আছি তখন পিওতর-কাকা এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। ফিটফাট সাজপোশাক আর বেশ খোসমেজাজ। চাপা স্বরে বলল:

'চমৎকার বুদ্ধি মাথা থেকে বার করেছিলে, হে ছোকরা। ঠিক শিক্ষা হয়েছে। পাজির পা-ঝাড়া! ওদের সবকটার মাথায় থুতু ফেললে ঠিক হয়। আরো ভালো হত যদি ওর গোবরঠাসা মাথাটা লক্ষ্য করে একটা ইট ছুঁড়তে পারতে।'

সবুজ কোট পরা ভদ্রলোকটির গোলগাল, চাঁচাছোলা, ছেলেমানুষি মুখটার কথা আমার মনে পড়ছে। ছোট ছোট হাত দিয়ে হলুদে টাক থেকে

থুতু মুছতে মুছতে ভদ্রলোক সরু সরু গলায় সখেদে দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে উঠেছিলেন — ঠিক কুকুরছানার ডাকের মতো। তাই শুনে আমার মনে ভয়ংকর একটা অনুতাপ এসেছিল আর আমার মামাতো ভাইদের ওপরে এসেছিল ঘৃণা। কিন্তু এখন গাড়ি-চালকের চুবড়ির মতো পাকানো মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সমস্ত ভুলে গেলাম। আমাকে ধরে মারবার সময় আমার দাদামশাইয়ের মুখটা যেমন আতঙ্কজনক ও কুৎসিত হয়ে উঠেছিল, গাড়ি-চালকের মুখটাও অবিকল সেইভাবে কাঁপছে।

পিওতরকে হাত ও পা দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'চলে যাও এখান থেকে!'

হেসে হেসে আর চোখ টিপে তাকিয়ে সে উনুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সেই দিন থেকেই লোকটির সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তিটুকুও আমার আর নেই। তাকে আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করি; আবার সঙ্গে সঙ্গে তার গতিবিধির ওপরেও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখি। কি যেন একটা ঘটবে, এমনি একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা থেকে যায় আমার মনে।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই আরেকটি ঘটনা ঘটল। অনেকদিন থেকেই অভসিয়ান্নিকোভদের নিঃসাড় বাড়িটা সম্পর্কে আমার একটা চাপা কৌতূহল ছিল। কেন জানি আমার মনে হত, এই ছাইরঙা বাড়িটার মধ্যে এক রহস্যভরা রূপকথার জীবনের অস্তিত্ব।

বেৎলেংদের বাড়িতে সব সময়েই হৈচৈ আর সোরগোল। কয়েকটি আকর্ষণীয় চেহারার তরুণী এই বাড়িতে থাকে এবং তরুণীদের সঙ্গলিপ্সু ছাত্র ও অফিসারেরা আসে। তারা সব সময়েই কথা বলে, হাসে, গান গায় আর বাজনা বাজায়। বাড়িটার চেহারার মধ্যেই যেন একটা আনন্দের ছাপ। তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে জানলাগুলোর কাঁচ দেখা যায়, কাঁচের পিছনে ফুলগুলো সবুজ এক অপরূপ দ্যুতিতে জ্বলজ্বল করছে। আমার দাদামশাই এই বাড়িটা পছন্দ করেন না।

'বিধর্মী! নাস্তিক!' এই বাড়ির সমস্ত বাসিন্দার সম্পর্কেই দাদামশাই সাধারণভাবে এই মন্তব্য প্রয়োগ করেন। আর বিশেষ করে মেয়েদের সম্পর্কে ব্যবহার করেন একটি অতি কুৎসিত শব্দ। পিওতর-কাকা মহা উল্লাসের সঙ্গে আর অতি নোংরাভাবে আমাকে এই শব্দটির অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু অভসিয়ান্নিকোভের রূঢ় ও নিঃশব্দ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাদামশাই ভারি তারিফ করেন।

একতলা তবু উঁচু বাড়িটা, পিছনদিকে অনেকখানি লম্বা হয়ে এসে মিশেছে একটা পরিষ্কার ও খোলা উঠোনের সঙ্গে। সবুজ ঘাসে ঢাকা উঠোন, ঠিক মধ্যিখানে একটা কুয়ো। দু-দিকে দুটো থাম তুলে কুয়োর ওপরে ছাদ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়িটা যেন রাস্তার দিক থেকে সরে গেছে; মনে হতে পারে, বাড়িটা আড়ালে থাকতে চায়। সামনের দিকে খিলান দেওয়া তিনটে সরু সরু জানলা, জানলার শার্সির ওপরে সূর্যের আলো পড়ে রামধনু-রঙ হয়েছে। সদর দরজার ডানদিকে একটা গোলাঘর। মূল বাড়ির অনুকরণে গোলাঘরের সামনের দিকেও তিনটে জানলা। কিন্তু জানলাগুলো নকল, ছাই রঙের দেওয়ালের ওপরে ঢালাই করে দেওয়া হয়েছে, ফ্রেম ও শার্সি সাদা রঙ দিয়ে আঁকা। এই নকল জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। মনে হতে থাকে, গোলাঘরটা এই কথাই জোর গলায় ঘোষণা করছে যে এই বাড়ি আড়ালে থাকতে চায়, নিভৃত জীবন যাপন করতে চায় এই বাড়ি। শূন্য আস্তাবল আর প্রকান্ড প্রকান্ড শূন্য গাড়ি-ঘর সমেত সমস্ত সম্পত্তি যেন নিঃশব্দে অপমানিত হয়ে কিংবা শান্ত গর্বে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

মাঝে মাঝে এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠোনে ঘুরে বেড়ান। দাড়ি নেই, সূচের মতো খোঁচা খোঁচা সাদা গোঁফ। আরেকজন বৃদ্ধকেও প্রায়ই দেখা যায় — দুইগালে মোটা জুলপি, বাঁকা নাক। তিনি আস্তাবল থেকে একটা ছাইরঙা ঘোড়া বার করে নিয়ে আসেন। উঠোনে বেরিয়ে সরু-বুক রোগা-পা ঘোড়াটা চারদিকে তাকিয়ে বিনম্র মঠবাসিনীর মতো অনবরত মাথা নোয়ায়। খোঁড়া বৃদ্ধ চটাং করে একটা চড় মারেন ঘোড়াটার গায়ে, শিস দেন, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, তারপর অন্ধকার আস্তাবলের দিকে ফিরিয়ে দেন ঘোড়াটাকে। আমার মনে হয়, বৃদ্ধ এই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চান কিন্তু একটা অশুভ শক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে এখানে আটকে আছেন।

প্রায় প্রতিদিনই দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তিনটি ছোট ছেলে উঠোনে খেলা করে। তিনজনের পরনে একই রকমের ছাইরঙা প্যান্ট, জামা ও টুপি। চেহারার দিক থেকেও ওদের মধ্যে খুব বেশি মিল — তিনজনেরই একই রকম গোলগাল মুখ আর ছাইরঙা চোখ। ওদের মিল এমনি যে, ওদের চিনতে হলে আমি দেখি কে বড়ো আর কে ছোট, মুখ দেখে চেনা যায় না।

বেড়ার গায়ের একটা ফাটল দিয়ে ওদের লক্ষ্য করি। ওদের নজরে না পড়ায় আমি হতাশ হই। ওরা যে-সব খেলা খেলে তা আমার কাছে

নতুন। ঝগড়া নেই, মারামারি নেই, মনের আনন্দে ওরা খেলা করে — দেখে মন খুশি হয়ে ওঠে। যে-ভাবে ওরা সাজপোশাক করে, যে-ভাবে ওরা একে অপরের জন্যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে — বিশেষ করে ছোটজনের জন্য বড়ো দুজন — তা দেখে খুব ভালো লাগে আমার। এই ছোটটির চেহারা নাদুসনুদুস, চলন-বলন দেখলে হাসি পায়। যদি ও পড়ে যায় তাহলে বড়ো দুজন হেসে ওঠে। কাউকে পড়ে যেতে দেখলে লোকে যে-ভাবে হাসে তেমনি ভাবেই ওরা হাসে — ওদের হাসির মধ্যে কোনো হিংস্রতার পরিচয় থাকে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ওকে তুলে ধরে, আগাছার পাতা বা রুমাল দিয়ে ওর হাত-পা মুছিয়ে দেয়।

মেজোজন বলে, 'একেবারে ক্যাবলা!'

ওরা কক্ষণো নিজেদের মধ্যে মারমারি করে না বা একজন আরেকজনকে জব্দ করতে চেষ্টা করে না। তিনজনেই শক্তসমর্থ, চটপটে এবং উৎসাহে ভরা।

একদিন আমি একটা গাছের ওপরে চেপে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে শিস দিলাম। শিসের শব্দ শুনে ওরা থামল তারপর এক জায়গায় জড়ো হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কী যেন আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে। আমার মনে হয়েছিল, ওরা বোধ হয় এবার আমার দিকে ইট ছুঁড়তে শুরু করবে। সুতরাং আমি নিচে নেমে এসে পকেট ভর্তি করে পাথর নিয়ে আবার গাছে উঠলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে ওরা উঠোনের অন্যদিকের কোণে গিয়ে আবার খেলা শুরু করে দিয়েছে এবং দেখে মনে হল, আমার কথা ওদের আর মনে নেই। ব্যাপারটা ভারি দুঃখের কিন্তু কী আর করা যায়, আমি প্রথমে যুদ্ধঘোষণা করতে চাই না। সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় জানলা দিয়ে কে ডেকে উঠল:

'বাড়ি এসো ছেলেরা — দেরি কোরো না!'

ডাক শুনে বাধ্য ছেলের মতো তারা বাড়ির দিকে ফিরল, খুব বেশি তাড়াহুড়ো করল না। ঠিক যেন পোষা হাঁস।

তারপর থেকে প্রায়ই আমি বেড়ার ওপরে গাছে চেপে বসে থাকি। মনে মনে আমার আশা থাকে যে ওরা আমাকে ওদের সঙ্গে খেলতে ডাকবে। কিন্তু একদিনও ওরা ডাকে না। কল্পনায় আমি প্রায়ই ওদের সঙ্গে গিয়ে ওদের খেলায় যোগ দিই, মাঝে মাঝে এমন মেতে উঠি যে সশব্দে হাঁকডাক শুরু করে দিই, হেসে উঠি। শব্দ শুনে ওরা তিনজনেই আমার দিকে তাকায়,

ফিসফাস করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে। তখন লজ্জা পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে আসি।

একদিন ওরা লুকোচুরি খেলতে শুরু করল। মেজো ভাই হল 'চোর'। গোলাঘরের একটা কোণে চোখের ওপরে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, একবারও হাতের ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে চেষ্টা করল না। এবার অন্য দু-ভাইয়ের লুকোবার পালা। গোলাঘরের চালাটা অনেকটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, তারই তলায় একটা স্লেজগাড়ি -- সবচেয়ে বড়ো ভাই গিয়ে লুকোল এই গাড়ির মধ্যে, ওদিকে ছোটটি কুয়োটার চারপাশে ঘুরছে, কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছে না কোথায় লুকোবে।

যে ছেলেটি চোর হয়েছে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গুণছে: 'এক! দুই!..'

ইতিমধ্যে ছোটটি কুয়োর কিনার বেয়ে ওপরে উঠেছে, বাল্‌তি সমেত দড়িটা ঝুলছিল। হাত বাড়িয়ে মুঠো করে ধরল দড়িটা, তারপর এক লাফ দিল শূন্য বাল্‌তিটার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দড়ি সমেত বাল্‌তিটা নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুয়োর ধারের সঙ্গে বাল্‌তির ধাক্কা লেগে লেগে ফাঁপা একটা আওয়াজ হতে লাগল শুধু।

নিঃশব্দে এবং দ্রুত পাক খুলে খুলে দড়িটাকে নিচে নামতে দেখে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। কিন্তু পরিণতির কথা ভেবে নিতে আমার এক মুহূর্তও দেরি হল না। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠোনে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগলাম:

'ও কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে!'

আমি যখন কুয়োর কাছে পেঁছিলাম, সেই একই সময়ে মেজো ভাইও চলে এসেছে। দড়িটা আঁকড়ে ধরল সে আর দড়ির টানে শূন্যে উঠে গেল; হাতটা ছড়ে গেল একেবারে। কিন্তু তখন আমি দাড়টাকে ধরলাম, ইতিমধ্যে বড়ো ভাইও উপস্থিত হয়েছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও দড়ি টেনে টেনে বাল্‌তিটাকে ওঠাতে লাগল।

'দয়া করে আরেকটু আস্তে টান, এত জোরে নয়,' বলল সে।

আমরা সকলে মিলে ছোটটিকে উদ্ধার করলাম। মারাত্মক রকমের ভয় পেয়েছে ছেলেটি। ডানহাতের আঙুল থেকে রক্ত পড়ছে, একটা গাল ছড়ে গেছে বিশ্রীভাবে। কোমর পর্যন্ত জলে ভেজা আর মড়ার মতো ফ্যাকাশে চেহারা। কিন্তু ওপরে উঠে এসে চোখদুটো মেলে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে হেসে বলল:

'আমি কেমন প-ড়ে গি-য়ে-ছি-লাম!'

'একেবারে থুন্‌কো!' এই বলে মেজো ভাইটি তাকে জড়িয়ে ধরে মুখ থেকে রক্ত মুছিয়ে দিল।

'বাড়ি যাই চল্‌। এটা তো আর লুকিয়ে রাখা যাবে না, দেরি করে লাভ কী।' ভুরু কুঁচকিয়ে মন্তব্য করল বড়ো ভাই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়ির লোক শুনে তোমাদের মারবে না?'

ঘাড় নেড়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল, 'কী ভীষণ জোরেই না ছুটে এসেছ!'

এই প্রশংসা শুনে আমি এত অভিভূত হলাম যে তার বাড়িয়ে-ধরা হাতটা ধরবার কথা মনে রইল না। ভালো করে খেয়াল ফিরে আসতে শুনলাম, সে মেজো ভাইকে বলছে, 'চল্‌ বাড়ি যাই। নইলে ওর ঠান্ডা লাগবে। বাড়ি গিয়ে বলব, ও ছুটতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেছে। কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, এসব বলে কোনো লাভ নেই।'

ছোটটি সায় দিল: 'ঠিক কথা। আমরা গিয়ে বলব যে আমি একটা জলভরা গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছি।'

তারপর ওরা তিনজনেই চলে গেল।

সমস্ত ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে ওপরের দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম, যে-ডালটা থেকে আমি লাফিয়ে পড়েছি সেটা তখনো নড়ছে আর হল্‌দে পাতা খসে খসে পড়ছে ডালটা থেকে।

তারপর প্রায় এক সপ্তাহ তিন ভাইকে উঠোনে খেলতে দেখা গেল না। যেদিন প্রথম খেলতে এল, সেদিন তাদের কলরবটা যেন আগের চেয়েও বেশি। বড়ো ভাইটি আমাকে দেখতে পেয়েই বন্ধুভাবে ডাক দিল:

'আমাদের সঙ্গে খেলবে তো চলে এস।'

সকলে গিয়ে স্লেজগাড়িটার ওপরে বসলাম। অনেকক্ষণ ধরে বসে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে নিলাম আমরা।

'সেদিন তোমরা মার খেয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তা খেয়েছিলাম বইকি।' জবাব দিল বড়োজন।

আমার কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না যে এদের মতো ছেলেদেরও আমার মতো মার খেতে হয়। ব্যাপারটা খুবই অন্যায় বলে মনে হতে লাগল আমার।

'আচ্ছা তুমি পাখি ধরো কেন?' জিজ্ঞেস করল ছোটটি।

'পাখি কী চমৎকার গান গায় বল তো! সেজন্যেই ধরি।'

'আর পাখি ধরো না। পাখিরা যদি খুশিমতো উড়ে উড়ে বেড়ায়, তাহলেই তো ভালো।'

'ঠিক আছে। আমি আর কোনো দিন পাখি ধরব না।'

'শুধু আর একটিমাত্র পাখি ধরবে আর সেটা দেবে আমাকে, কেমন?'

'বেশ তো, কোন্ পাখি চাও বলো?'

'যে পাখি খুব ফুর্তিতে থাকে—আমি খাঁচায় রাখব।'

'ঠিক আছে। তোমাকে একটা চৌফিঙ্গপাখি ধরে দেব।'

এবার মেজো ভাই কথা বলল, 'বেলালে খেয়ে ফেলবে। আল বাবা থিক্ লাগ কলবেন।'

'ঠিক কথা।' বড়ো ভাই সায় দিল।

'তোমাদের মা নেই?'

'না।' জবাব দিল বড়ো ভাই কিন্তু মেজো ভাই কথাটাকে শুধরিয়ে বলল, 'মা আছে কিন্তু সে অন্য মা, থিক্ মা নয়--থিক্ মা মলে গেছে।'

আমি বললাম, 'তার মানে তোমাদের সৎ-মা।'

বড়ো ভাই সায় জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

তারপর তিনজনেই অন্যমনস্কভাবে চুপ করে রইল।

সৎ-মা যে কী তা দিদিমার কাছে গল্প শুনে শুনে আমি জানি। সুতরাং তাদের এইভাবে চুপ করে থাকার কারণও আমি বুঝতে পারলাম। মটরশুঁটির তিনটি বিচির মতো গায়ে গা লাগিয়ে তিনজনে বসে রইল। আমার মনে পড়ল সেই ডাইনী সৎ-মার গল্প। আসল মায়ের জায়গা নেবার জন্যে সেই ডাইনী সৎ-মা কত রকম ফন্দিফিকিরই না করেছিল। ছেলে তিনজনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি বললাম:

'কিছু ভেব না। তোমাদের আসল মা আবার ফিরে আসবেন।'

বড়োটি কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তা কী করে হবে? মা তো মরে গেছে। যে মরে যায় সে আর কক্ষনো ফিরে আসে না।'

বলে কী ছেলেটা? যে মরে যায় সে আর কক্ষনো ফিরে আসে না? সঞ্জীবনী জল ছিটিয়ে দিলে মড়া তো মড়া, এমন কি যাদের কুচি-কুচি করে কেটে ফেলা হয়েছে তারাও বেঁচে ওঠে! আর এমন তো কতবারই দেখা গেছে যে একজন লোক মরে গেছে বলে মনে করা হল--কিন্তু পরে দেখা

গেল, সে সত্যি সত্যিই মরেনি; ভগবান তাকে মারতে চাননি, তাকে মেরেছে ডাইনী ও কুহকিনীরা!

দিদিমার কাছে যেসব গল্প শুনেছি সেগুলি মহা উৎসাহে আমি বলতে শুরু করলাম। কিন্তু বড়োটি ঠাট্টার হাসি হেসে বলল:

'ওসব গল্প আমরাও শুনেছি, ও তো রূপকথার গল্প!'

অন্য দু-ভাই চুপ করে বসে আমার গল্প শুনছিল। ছোটটি ভুরু কুঁচকে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে আছে, মেজোটি একটা কনুই রেখেছে হাঁটুর ওপরে, আরেকটা হাত দিয়ে ছোটটির কাঁধ জড়িয়ে ধরে আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। গোলাপী মেঘ নিচু হয়ে বাড়ির ছাদের ওপরে নেমে এসেছে। এমন সময় সাদা গোঁফওলা বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে পাদ্রিদের মতো বাদামী রঙের ঝুলকোট, মাথায় একটা ঝুলঝুলে লোমের টুপি।

আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ছেলেটা কে?'

বড়োটি উঠে দাঁড়িয়ে আমার দাদামশাইয়ের বাড়ির দিকে মাথা নেড়ে বলল, 'ওই বাড়ির ছেলে।'

'ওকে কে এখানে আসতে বলেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে সেই তিনটে ছেলে স্লেজগাড়িটা থেকে নেমে নিঃশব্দে বাড়ির দিকে চলে গেল। ওদের দিকে তাকিয়ে আমার আরেকবার মনে হল. ছেলেগুলো ঠিক পোষা হাঁসের মতো।

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার ঘাড় শক্তভাবে চেপে ধরে গেটের সামনে নিয়ে এলেন। আতঙ্কে আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে এমন তাড়াতাড়ি হিড়হিড় করে ঠেলে নিয়ে এলেন যে কান্না আসবার আগেই দেখলাম আমি একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমার দিকে আঙুল তুলে শাসিয়ে তিনি বললেন:

'খবরদার বলছি এ-বাড়িতে আর আসবে না!'

আমিও ক্রুদ্ধ স্বরে পাল্টা জবাব দিলাম, 'বুড়ো শয়তান, তোমার মুখ দেখবার জন্যে আমি এ-বাড়িতে আসিনি।'

লম্বা হাত বাড়িয়ে তিনি আবার আমাকে ধরে ফেললেন। আর রাস্তার ধার দিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে যেতে মাথার ওপরে হাতুড়িপেটার মতো একই প্রশ্ন করতে লাগলেন:

'তোমার দাদামশাই বাড়িতে আছেন?'

আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে দাদামশাই বাড়িতে ছিলেন। সেই ভয়ানক বুড়োর সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, মাথাটা পিছনে হেলিয়ে, তাঁর দাড়িটা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভদ্রলোকের গোল ভাঁটার মতো অনুজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন:

'এই ছেলেটার মা এখানে নেই। আমি নিজে সবসময়ে কাজে ব্যস্ত থাকি। কেউ নেই যে ছেলেটার দিকে একটু নজর রাখে। কর্ণেল, আপনি এবারকার মতো অপরাধ মার্জনা করুন।'

কথাটা শুনে সারা বাড়ি কাঁপিয়ে কর্ণেল গলা খাঁকারি দিলেন। তার পরেই কাঠের থামের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন গট্ গট্ করে পা ফেলে। খানিকক্ষণ পরে পিওতর-কাকার গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল আমাকে।

ঘোড়ার লাগামটা খুলতে খুলতে গাড়ি-চালক জিজ্ঞেস করল, 'কী হে ছোকরা, আবারও দেখছি একচোট হয়েছে। তা এবার মার খাওয়া হল কী জন্যে?'

আগাগোড়া ঘটনাটা যখন তাকে বললাম, একেবারে ফুঁসে উঠল সে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল:

'ওদের মতো ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে গিয়েছিলে কেন শুনি? ওরা সব বড়লোকের বাচ্চা। দেখ তো, ওদের জন্যে তোমার কি দুর্ভোগটা হল? যাক্ গিয়ে, এরপর থেকে ছেলেগুলোর ওপরে আচ্ছা করে এর শোধ তুলো।'

এমনি বিড়বিড় করল সে অনেকক্ষণ। সদ্য ঘা-খাওয়া শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে প্রথম দিকে আমার ভালো লাগছিল তার কথাগুলো। কিন্তু কথাগুলো বলতে বলতে তার চুবড়ির মতো মুখটা এমন বিশ্রীভাবে কাঁপছে যে আমার মনে পড়ে যায়, ওই ছেলে তিনজনকেও এজন্য মার খেতে হবে আর ওরা তো আমার কাছে কোনো দোষ করেনি।

আমি বললাম, 'ওরা কোনো দোষ করেনি। ওদের ওপরে শোধ তুলতে যাব কেন? আর তুমি যা বলছ তার একবর্ণও সত্যি নয়।'

আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে একটা হুঙ্কার ছাড়ল:

'বেরিয়ে যা বলছি আমার গাড়ি থেকে।'

একলাফে গাড়ি থেকে নেমে আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'বোকা কোথাকার!'

'কী, আমাকে বোকা বলা? আমাকে মিথ্যেবাদী বলা? আমি তোকে মজা

দেখাব...' এই বলে সে আমার পিছনে উঠোনময় ধাওয়া করে বেড়াল, কিন্তু কিছুতেই আমাকে ধরতে পারল না।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দিদিমা এসে অলিন্দে দাঁড়ালেন। আমি ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। সেও এসে আমার নামে নালিশ করতে শুরু করল:

'এই বাঁদরটার জন্যে আমার একটুও শান্তি নেই। আমাকে যা-তা বলে। আমি ওর চেয়ে পাঁচগুণ বয়সে বড়ো অথচ আমাকে সব চেয়ে নোংরা গালাগালি দিতেও কসুর করে না...'

লোকে যখন আমার মুখের উপর মিথ্যে কথা বলে তখন আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে যাই। এখনও এই কথাগুলো শুনে কী বলব বুঝতে না পেরে আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু আমার দিদিমা দৃঢ়স্বরে বললেন:

'দেখ পিওতর, কথাগুলো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? ও তোমাকে নোংরা গালাগালি দেয়নি।'

দাদামশাই হলে গাড়ি-চালকের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে বসতেন।

সেইদিন থেকে গাড়ি-চালকের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দাঁড়ায় এক নিঃশব্দ ও হিংস্র বৈরিতা। সে তক্কে তক্কে থাকে, সুযোগ পেলেই হাতের লাগাম দিয়ে ধাঁই করে আমাকে এক ঘা লাগিয়ে এমন ভাব করে যেন হঠাৎ লেগে গেছে। খাঁচার মধ্যে আমি যে-সব পাখি ধরে রাখি সেগুলো সে ছেড়ে দেয়। একদিন পাখিগুলোর দিকে বেড়াল লেলিয়ে দিল। আর আমার দাদামশাইয়ের কাছে গিয়ে আমার নামে নানা নালিশ করে। যা নয় তাই বলে আমার নামে সাতখানা করে লাগায়। দেখেশুনে আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায় যে ওই লোকটাও আসলে বুড়োর সাজপোশাক পরা আমারই মতো ছেলেমানুষ। আমিও ছেড়ে কথা বলি না। যে লাপ্তিজোড়া আছে সেটার প্যাঁচ খুলে সুতো আল্‌গা করে এমন অবস্থায় রেখে দিই যে পায়ে দিলেই ছিঁড়তে শুরু করে। একদিন তার টুপির মধ্যে মরিচ ছড়িয়ে রেখেছিলাম। টুপিটা মাথায় দেবার পর পুরো একটি ঘণ্টা সে শুধু হেঁচেছিল। মোট কথা, আমার ক্ষমতায় যতোদূর কুলোয় আমি করে যাই, তার ঢিলের উত্তরে পাটকেল ছুঁড়তে কসুর করি না। রবিবার হলেই সে সারাটি দিন আমার পিছনে গোয়েন্দার মতো লেগে থাকে। সেই বড়োলোকের তিনটি ছেলের সঙ্গে গুপ্ত যোগাযোগ রাখতে গিয়ে বহুবার তার কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। আর যতোবার সে আমাকে ধরতে পেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা জানিয়ে এসেছে আমার দাদামশাইয়ের কাছে।

সেই ছেলে তিনটির সঙ্গে মেলামেশা আমি বন্ধ করিনি। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিন দিনই আমার বেশি ভালো লাগছে। দাদামশাইয়ের বাড়ির আর অভসিয়ান্নিকোভের বাড়ির মাঝখানে যে আঁকাবাঁকা বেড়া আছে সেই বেড়ার একটা কোণ গাছপালায় অন্ধকার হয়ে থাকে। এল্‌ম্‌ ও লাইম গাছ এবং এল্‌ডারবেরির ঘন ঝোপ। এই ঝোপের পিছনদিকে বেড়াটা কেটে আমি একটা ফাঁক করে নিয়েছি। এই ফাঁকের কাছে তিন ভাই এসে আমার সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলে। কখনো আসে একা একা, কখনো জোড়ায় জোড়ায়। কর্ণেল হঠাৎ এসে না পড়ে সেজন্যে একজন সর্বদা পাহারায় থাকে।

ওরা আমাকে ওদের নিজেদের জীবনের কথা বলে। ভারি একঘেয়ে জীবন ওদের, শুনতে শুনতে মন খারাপ হয়ে যায় আমার। নানা বিষয়ে কথা বলি আমরা। পাখির কথা, নানা ছেলেমানুষি ঝোঁকের কথা, কিন্তু ওরা কখনো আমাকে ওদের বাপ বা সৎ-মার কথা বলেনি, অন্ততঃ যতোদূর আমার মনে আছে। অধিকাংশ দিনই ওরা শুধু আমার কাছে গল্প শুনতে চায় এবং আমিও দিদিমার কাছ থেকে শোনা সমস্ত গল্প খুঁটিয়ে বলতে শুরু করি। গল্পের কোনো অংশই বাদ দিই না। যদি গল্পের কোনো অংশ ভুলে যাই তাহলে ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলে ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে আসি। দিদিমা খুশি হয়েই গল্পের ভুলে যাওয়া অংশটুকু আমাকে বলে দেন।

আমার দিদিমার কথা ওদের কাছে প্রায়ই বলি। একদিন বড়োজন আমার কথা শুনতে শুনতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল·

'সব দিদিমাই খুব ভালো হয়। আমাদেরও এক সময়ে ভারি চমৎকার এক দিদিমা ছিল...'

এই ছেলেটির কথা বলার ধরনই এই রকম। 'এক সময়ে ছিল,' 'এতকাল ধরে যেমনটি হয়ে আসছে,' 'কোনো এক সময়ে,' ইত্যাদি ধরনের কথাগুলো সে এত বেশিবার বলে আর বলবার সময়ে তার গলার স্বরটা এত বেশি ভারি হয়ে ওঠে যে মনে হতে পারে, তার বয়স মাত্র এগারো নয়, একশো বছর পার হয়ে গেছে। আমার মনে আছে, ছেলেটির হাততালুদুটো ছিল রোগা, সরু লম্বা হাতের আঙ্গুল। তার শরীরটাও ছিল রোগাটে আর পল্‌কা। চোখদুটি লাজুক, গির্জার উপাসনা-বেদীর বাতির মতো পরিষ্কার। তার দুই ভাইকেও আমার খুব ভাল লাগে। ওদের ওপরে দরদে আমার মনটা ভরে যায় আর ভারি ইচ্ছে করে ওদের জন্যে চমৎকার একটা কিছু করি। কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে বড়োজনকে।

ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি এমন মেতে উঠি যে পিওতর-কাকা এলেও টের পাই না। পিওতর-কাকা আমাদের সকলকে চম্‌কে দিয়ে টানা টানা স্বরে চিৎকার করে ওঠে:

'আ-বা-র!'

আমি দেখছিলাম পিওতর-কাকা আজকাল প্রায়ই বড়ো মনমরা হয়ে পড়ে। কাজ থেকে ফিরবার সময় তার মেজাজটা কি রকম আছে তা জানবার একটা উপায়ও আমি বার করেছিলাম। সাধারণত সে সদরের গেটটা খোলে ধীরেসুস্থে। সুতরাং কব্‌জাটায় অনেকক্ষণ ধরে একটানা কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ হয়। কিন্তু গাড়িওলার মেজাজ যদি ভালো না থাকে তাহলে কব্‌জাটা আচমকা যেন তীক্ষ্ন স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে।

তার বোবা ভাইপো গেছে দেশের বাড়িতে বিয়ে করবার জন্যে। একাই আছে পিওতর। আস্তাবলের ওপরে নিচু ছাদওলা তার ঘরটি, একটিমাত্র ছোট জানলা, আর ঘরের মধ্যে আলকাতরা, পুরনো চামড়া, তামাক আর ঘামের গন্ধ। এই গন্ধটার জন্যেই আমি তার ঘরে কিছুতেই যেতে পারি না। আজকাল আবার সে সারারাত বাতি জ্বালিয়ে ঘুমোয়; দাদামশাই ভারি অসন্তুষ্ট হন তাতে।

'ওহে পিওতর, তোমার যা কান্ডকারখানা দেখছি, কোন্‌দিন ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

অন্য কোন দিকে তাকিয়ে সে জবাব দেয়, 'না, সে ভয় নেই। রাত্রিবেলা একপাত্র জলের মধ্যে আমি বাতিটাকে বসিয়ে রাখি।'

আজকাল সে তার চোখদুটো অনবরত অন্য দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে। দিদিমার ভোজসভায় সে আর আসে না বা আমাদের আর ফলের জ্যামও খাওয়ায় না। তার মুখখানা আরো শুকিয়ে গেছে, মুখের রেখাগুলো আরো গভীর হয়েছে আর হাঁটাচলার সময়ে সে রোগীর মতো টল্‌তে থাকে।

একদিন রাত্রিবেলা খুব বেশি বরফ পড়েছিল, সকালবেলা দাদামশাই ও আমি বেল্‌চা দিয়ে সেই বরফ সরাচ্ছিলাম, এমন সময়ে সদরের গেট সশব্দে খুলে গেল আর খোলা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল একজন পুলিসের লোক। পিঠ ঠেস্‌ দিয়ে গেটটা বন্ধ করে সে দাঁড়াল। মোটা ধ্যাব্‌ড়া আঙুলটা নেড়ে ডাকল দাদামশাইকে। দাদামশাই কাছে এগিয়ে গেলে পুলিসের লোকটি নিচু হয়ে নিজের মস্ত নাকটা দাদামশাইয়ের মুখের মধ্যে প্রায় ঢুকিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে কি যেন বলল। শুনে দাদামশাই একেবারে আঁতকে উঠে বললেন, 'এখানে? কখন? আমি যদি তা মনে করতে পারতাম...'

তারপরেই হাস্যকরভাবে এক লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর! এ যে বিশ্বাস করা যায় না!..'

'শ্-শ্-শ্,' পুলিসের লোকটি দাদামশাইকে রূঢ়ভাবে বলল।

দাদামশাই এদিক ওদিক তাকাল। তাঁর চোখ পড়ল আমার দিকে।

'বেল্‌চাদুটোকে নিয়ে বাড়ি চলে যা!'

বাড়ির দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি দু'জনকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। আস্তাবলের ওপরে গাড়ি-চালকের ঘরে গিয়ে ঢুকল দু'জনে। পুলিসের লোকটি ডান হাত থেকে দস্তানাটা খুলে নিয়ে বাঁ হাতের ওপরে দস্তানাটা দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি মারতে লাগল।

'লোকটা ঠিক টের পেয়েছে! ঘোড়া-টোড়া ফেলেই পালিয়ে গেছে এখান থেকে।'

রান্নাঘরে দিদিমার কাছে আমি ছুটে গেলাম। যা দেখেছি এবং শুনেছি, সবই বললাম দিদিমার কাছে। দিদিমা রুটি তৈরি করবার জন্যে আটা মাখছিলেন, সারা মুখে আটা লেগেছিল, সেই অবস্থাতেই মাথা নাড়তে লাগলেন, তারপর আমার বলা শেষ হলে শান্ত স্বরে বললেন তিনি:

'নিশ্চয়ই কোথাও কিছু চুরি-টুরি করে এসেছে। যা, বাইরে গিয়ে খেলা কর গিয়ে। সব ব্যাপারে তোর থাকার দরকার কি?'

আমি আবার ছুটে গিয়ে উঠোনে দাঁড়ালাম। দেখলাম, দাদামশাই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মাথায় টুপি নেই, চোখদুটো আকাশের দিকে তোলা আর বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছেন তিনি। মুখটা রাগে ফুলে ফুলে উঠছে আর একটা পা ঝাঁকি দিয়ে কেঁপে উঠছে।

আমাকে দেখেই মাটিতে পা ঠুকে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফের এসেছিস? বললাম না বাড়ির ভিতরে যেতে?'

আমি আবার রান্নাঘরে এলাম। পিছনে পিছনে দাদামশাইও এলেন।

'গিন্নি, একটু শুনে যাও।' দিদিমাকে বললেন তিনি।

দু'জনে পাশের ঘরে গেলেন। অনেকক্ষণ ফিস্‌ফাস্ কথা হল দু'জনের মধ্যে। ফিরে আসার পর দিদিমার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আমি বুঝতে পারলাম, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমা, কী হয়েছে? তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন?'

নীচুস্বরে দিদিমা বললেন, 'তুই চুপ করে থাক্ তো।'

তারপর সারা দিন বাড়ির আবহাওয়াটা সন্ত্রস্ত ও থম্‌থমে হয়ে রইল। দাদামশাই ও দিদিমা থেকে থেকে চম্‌কে উঠে তাকাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে যা একটু কথাবার্তা হল তা খুবই দুর্বোধ্য আর সংক্ষিপ্ত। এতে আতঙ্কের ভাবটা আরো ঘন হয়ে উঠল।

গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে দাদামশাই দিদিমাকে হুকুম দিলেন, 'গিন্নী, আইকনের সবকটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও।'

আহারপর্ব শেষ হল অতি দ্রুত যদিও কারও খিদে নেই। মনে হতে লাগল, কারও জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে। দাদামশাই বারবার ক্লান্তভাবে গাল ফোলাতে লাগলেন, বারবার গলা পরিষ্কার করলেন আর বিড়বিড় করে বললেন:

'শয়তান একবার ভর করলে তার আর নিস্তার নেই। এই ধরো না এই লোকটির কথা। দেখে তো মনে হয় দয়ালু আর দেবতায় ভক্তি আছে, কক্ষনো কোনো অধর্মের কাজ করে না — কিন্তু দেখো এই লোকটা কী কাণ্ডই না করেছে!'

দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

শীতকালের রুপোলি দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, এই দিনটির যেন আর শেষ নেই। আর যতোই সময় যেতে লাগল, ততোই বাড়ির আবহাওয়াটা হয়ে উঠল আরো বেশি অস্বস্তিকর ও আরো বেশি রুদ্ধশ্বাস।

সন্ধ্যার দিকে এল আরেকজন পুলিসের লোক। এই লোকটির শরীরটা মোটা, মাথাটা লাল। রান্নাঘরের একটা বেঞ্চিতে বসে নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে ঢুলতে লাগল সে।

দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল কি করে?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পুলিসের লোকটি ঘোঁৎঘোঁৎ করে জবাব দিল, 'এতো সহজ কথা। পুলিসের কাছে কোনো কথাই চাপা থাকে না।'

মনে আছে, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পুরনো একটা মুদ্রা মুখের মধ্যে পুরে গরম করতে চেষ্টা করছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তুষারঢাকা জানলার শার্সির ওপরে বিজয়ী সেণ্ট জর্জের একটা ছাপ তোলা।

হঠাৎ সদরের দিক থেকে প্রচণ্ড একটা হুটোপাটির শব্দ শোনা গেল। দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। চৌকাঠের ওপরে পেত্রভনা দাঁড়িয়ে। চিৎকার করে বলল সে:

'দেখতে আসুন, আপনাদের বাগানের পিছন দিকে কী কাণ্ড হয়েছে!'

তারপর পুলিসের লোকটির দিকে নজর পড়ল। সে আবার সদরের দিকে ফিরে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু পুলিসের লোকটি তার স্কার্ট ধরে তাকে আট্‌কে ফেলেছে। সন্ত্রস্ত স্বরে সেও সমানে চেঁচিয়ে উঠল:

'দাঁড়াও! তুমি কে? বাইরে কী কাণ্ড হয়েছে?'

চৌকাঠে হুমড়ি খেয়ে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদতে শুরু করে দিল পেত্রভনা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে আর ঢোঁক গিলতে গিলতে বলল সে:

'আমি দুধ দুইবার জন্যে বাইরে এসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, কাশিরিনদের উঠোনে একজোড়া বুটজুতোর মতো কি একটা জিনিস।'

দাদামশাই ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মিথ্যে কথা বলবার আর জায়গা পাস্‌ না মাগী! আমাদের উঠোনে কি আছে বা না-আছে তা তুই দেখবি কি করে? উঠোনের বেড়া যথেষ্ট উঁচু আর তাতে একটিও ফুটো নেই। ওপার থেকে দেখবি কি করে? সব মিথ্যে কথা! আমাদের বাগানে কোনো কাণ্ড ঘটেনি!'

একটা হাত দাদামশাইয়ের দিকে বাড়িয়ে আর একহাতে মাথা চেপে ধরে পেত্রভনা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে লাগল:

'শোন বাপু! ও সত্যিই বলছে যে আমি মিথ্যে কথা বলছি। হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম একটা পায়েচলা দাগ বেড়া পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে আর এক জায়গায় বরফ একেবারে পায়ে মাড়ানো হয়ে গেছে। তখন আমি বেড়া বেয়ে ওপরে উঠে উঁকি মেরে দেখলাম। সেই লোকটা ওখানে পড়ে আছে...'

'কে-এ-এ?'

টানা-টানা আর ভয়ার্ত একটা চিৎকার উঠল। তারপরেই রান্নাঘরের সবকটি লোক পাগলের মতো ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে ছুটল উঠোনের দিকে। সেখানে বরফঢাকা গর্তের মধ্যে পিওতর-কাকা পড়ে আছে। একটা পোড়া খুঁটিতে পিঠটা ঠেস্‌ দেওয়া, মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপরে। আর ঠিক ডান কানের নিচেই গভীর একটা হাঁ-করা ক্ষত। মনে হয় লাল একটা মুখ। ধারে ধারে নীল্‌চে অংশটুকু দাঁতের মতো বেরিয়ে আছে। ভয়ে আমি চোখ বুজেছিলাম। চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, পিওতর-কাকার ঘোড়ার লাগামের ছুরিটা তার কোলের ওপরে পড়ে আছে; পাশেই ডানহাতটা, ডানহাতের আঙুলগুলো কাল্‌চে হয়ে বেঁকে গেছে। বাঁ হাতটা বরফের মধ্যে গোঁজা। পাতলা শরীরটার চাপে খানিকটা বরফ গলে গেছে, পেঁজা তুলোর মতো সাদা বরফের মধ্যে বসে গেছে শরীরটা। এতে আরো

বেশি ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছে তাকে। ডানদিকে বরফের ওপরে লালরঙের ছোপ পড়েছে; বিশেষ একটা আকার নিয়েছে লালরঙের ছোপটুকু, পাখির মতো মনে হয়। বাঁ দিকে কোনো দাগ পড়েনি, মসৃণ বরফ ঝক্‌ঝক্‌ করছে। মাথাটা অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে নেমে এসে ঠেকে গেছে বুকের সঙ্গে, কোঁকড়ানো দাড়ি ঠেলে উঠেছে ওপরের দিকে। দাড়ির ঠিক নিচেই ঝুলছে মস্ত একটা পেতলের ক্রুশ। রক্তের ধারা শুকিয়ে জমাট বেঁধে ক্রুশটাকে ফ্রেমের মতো ঘিরে রয়েছে। চারদিকে এলোমেলো কলরব, আমার মাথাটা ঘুরছে। তারস্বরে একটানা চিৎকার করে চলেছে পেত্রভনা; পুলিসের লোকটা চিৎকার করে ভালেইকে সেখান থেকে চলে যেতে বলছে; আমার দাদামশাই চিৎকার করছেন, 'খবরদার, পায়ের দাগগুলো যেন নষ্ট না হয়!'

হঠাৎ তিনি ভুরু কুঁচকিয়ে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিলেন।

'মিথ্যে আপনি অত চেঁচামেচি করছেন,' উঁচু গলায় কর্তৃত্বের সুরে তিনি পুলিসের লোককে বললেন, 'এ হচ্ছে ঈশ্বরের লীলা, ঈশ্বরের বিচার। আপনারা যতোই হম্বিতম্বি করুন না কেন — এখানে সবই নিষ্ফল!'

আর তখনই সব চুপ করে গেল। মৃতের দিকে তাকিয়ে সবাই বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে।

পেত্রভনার বাড়ির দিক থেকে বেড়া ডিঙিয়ে অনেকে এসেছে এপারে। ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসেছে উঠোনের ওপর দিয়ে। পড়ে গেছে বারবার, বিড়বিড় করেছে আপন মনে—কিন্তু কোনো রকম হৈচৈ না করে। অবশেষে আমার দাদামশাই চারদিকে তাকিয়ে হতাশার সুরে চীৎকার করে উঠলেন, 'পড়শীরা, কী করছ তোমরা! তোমাদের পায়ের চাপে আমার ফলের গাছগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের কি চক্ষুলজ্জা বলেও কিছু নেই?'

আমার হাত ধরে দিদিমা বাড়ির ভিতরে চলে এলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কী করেছিল দিদিমা?'

কান্না চেপে তিনি জবাব দিলেন, 'তা তো দেখলিই এতক্ষণ ধরে।'

সেদিন সারাটা সন্ধ্যে এবং তারপরেও অনেক রাত পর্যন্ত অজানা অচেনা সব লোক যাতায়াত আর হৈচৈ করতে লাগল আমাদের বাড়ির রান্নাঘরে ও তার পাশের ঘরে। হুকুমের স্বরে চলল পুলিসের হাঁকডাক। পাদরির মতো দেখতে একটা লোক খাতায় কী সব লিখতে লিখতে হাঁসের মতো প্যাঁক্‌ প্যাঁক্‌ করে অনবরত শুধু বলতে লাগল:

'কী করে? কী করে?'

প্রত্যেককে চা দিলেন দিদিমা। চায়ের টেবিলে বসেছিল একজন গোলগাল চেহারার লোক। গোঁফওলা মুখটিতে বসন্তের দাগ। তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় সে বলল :

'ওর আসল নাম কেউ জানে না। শুধু এটুকু জানা গেছে, ওর দেশ এলাথমা। আর ওই যে বোবা-কালা লোকটি ছিল, সে আসলে বোবাও নয়, কালাও নয়। সে সবকিছুই স্বীকার করেছে। আরো একজন তাদের সঙ্গে ছিল। সেও স্বীকার করেছে সব কথা। বহুদিন থেকেই এই দলটি একটা কাজে হাত পাকিয়েছিল -- তা হচ্ছে গির্জার সম্পত্তি লুট করা...'

পেত্রভনা দরদর করে ঘামছিল, দীর্ঘনিঃশ্বেস ফেলে সে বলে উঠল, 'কী কান্ড মাগো!'

তাকের ওপরে শুয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি দেখছিলাম লোকগুলোকে। মনে হতে লাগল, তারা যেন একদল বেঁটে, মোটা আর কুৎসিত চেহারার লোক...

দশ

এক শনিবার খুব ভোরে বুলফিঞ্চ পাখী ধরবার জন্যে আমি গেলাম পেত্রভনার বাগানে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও একটি পাখিও আমার ফাঁদে ধরা দিল না। বুকে লাল রঙের ছিটে দেওয়া পাখিগুলো: আর কী দেমাক তাদের। রুপোলী বরফের ওপরে ভারিক্কী চালে বেড়িয়ে চলে। কিংবা উড়ে যায় ঝোপের মধ্যে, সেখানে তুষারঢাকা গাছের ডালে চিক্‌চিকে নীল্‌চে বরফের গুঁড়োর মধ্যে উজ্জ্বল একটা ফুলের মতো দুলতে থাকে আপন মনে। দৃশ্যটা এত সুন্দর যে পাখি ফাঁদে না পড়ার হতাশা আমার মনে আসতে পারে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে আমি যে একজন খুব একাগ্র শিকারী তাও নয়। কোনো ঘটনার ফলাফলটা যাই হোক্ না কেন, তার রূপায়ণের প্রক্রিয়াই আমার মনে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে পাখিদের জীবনযাত্রা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে আর তাদের নিয়ে চিন্তা করতে।

শীতের দিনের ঘনীভূত নিস্তব্ধতায় বরফঢাকা মাঠের ধারে একা-একা বসে পাখির কিচির-মিচির শোনা — এর চেয়ে আনন্দ আর কী আছে! অনেক

দূর দিয়ে চলে যায় একটা ত্রয়কা, টিং টিং করে বাজে তার ঘণ্টা — ঠিক যেন রুশদেশের শীতকালের বিষণ্ণ লার্কপাখী।

তারপর ঠাণ্ডায় আমার হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরে গেল, আর যখন অনুভব করলাম আমার কানগুলো জমে আসছে, তখন ফাঁদ আর খাঁচা তুলে নিয়ে বেড়া টপকে আমি চলে এলাম বাড়ির দিকে। আমাদের বাড়ির গেটটা খোলা আর প্রকাণ্ড চেহারার একজন চাষী তিন-ঘোড়ার এক মস্ত ঢাকা স্লেজগাড়িকে গেট দিয়ে রাস্তায় বার করে নিচ্ছে। কুণ্ডলি পাকিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে ঘোড়াগুলোর গা থেকে, মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে লোকটি। আমার হৃৎপিণ্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন থমকে পড়ল।

'এই গাড়িতে কে এসেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার দিকে ফিরে হাতের তলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল লোকটি, তারপর লাফিয়ে চালকের আসনে উঠে বলল:

'পাদ্রিমশাই এসেছেন!'

পাদ্রিমশাই এসেছেন কি আসেননি — তা নিয়ে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল না। তিনি যদি এসে থাকেন তবে খুব সম্ভব তিনি কোনো ভাড়াটের বাড়িতে এসেছেন।

'হট্! হট্! চল্ রে আমার মাণিকরা!' ঘোড়াগুলোর গায়ে চাবুকের বাড়ি মেরে লোকটি চিৎকার করে উঠল। একলাফে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াগুলো, টিং টিং শব্দ উঠল বাতাসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটা চলে যেতে দেখলাম, তারপর গেটটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকতেই শুনতে পেলাম পাশের ঘর থেকে আমার মা'র গভীর গলার স্বর ভেসে আসছে।

'বেশ তো, তোমরা কী করতে চাও তাহলে? আমার মাথা কাটবে—না কি?'

হাতের খাঁচা আর ফাঁদ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি ছুটলাম পাশের ঘরের দিকে। গায়ের কোট খুলবারও তর সইল না। কিন্তু হঠাৎ দাদামশাই আমাকে আটকালেন। তিনি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, ঢোঁক গিলে একটা যন্ত্রণা চাপতে চেষ্টা করলেন যেন, তারপর মুখ দিয়ে জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে বললেন:

'আচ্ছা যাও!'

দরজার কাছে এসে আমি অন্ধের মতো হাতড়াতে লাগলাম। উত্তেজনা ও

ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে আমার আঙ্গুলগুলো কাঁপছিল, কিছুতেই দরজায় তালা লাগানর আংটাটা খুঁজতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে আমি চৌকাঠের ওপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

মা বলল, 'এই তো, এসেছিস এতক্ষণে! আরে বাব্বাঃ, কত বড়ো হয়ে গিয়েছিস! কী রে, চিনতে পারছিস না আমাকে? আচ্ছা তোমাদের কী কাণ্ড বলো তো! জামাকাপড়ের কী অবস্থা! আরে, কানদুটো যে দেখছি ঠাণ্ডায় জমে গেছে! মা, শীগগির যাও তো, আমাকে একটু হাঁসের চর্বি এনে দাও!'

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার ওপর ঝুকে পড়ে আর ঠিক একটা বলের মতো আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মা আমার গা থেকে জামাকাপড় খুলে ফেলতে লাগল। দীর্ঘ উন্নত গড়ন আমার মা'র; তুলতুলে আর নরম লালরঙের একটা পোশাক রয়েছে গায়ে, পুরুষের জামার মতো চওড়া; বড়ো বড়ো কালো বোতাম কাঁধ থেকে একেবারে নিচে পর্যন্ত কোণাকুণি নেমে এসেছে। এ-ধরনের পোশাক আমি আগে আর কোনো দিন দেখিনি।

মা'র মুখটা যেন আরো ছোট হয়ে গেছে, আরো ফ্যাকাশে, চোখগুলো হয়েছে আরো বড়ো বড়ো, আরো গভীর, চুলগুলো আরো সোনালী। লাল ঠোঁটদুটো বিরক্তির সঙ্গে বেঁকিয়ে, আমার গা থেকে খুলে নেওয়া জামাকাপড়গুলো চৌকাঠে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে, মা ধমকের সুরে বলে উঠল:

'কি রে, কথা বলছিস্‌নে কেন? আমাকে দেখে খুশি হস্‌নি? ইস্‌, কী ময়লা জামা বাবা!'

তারপর আমার কানে হাঁসের চর্বি ঘষতে লাগল মা। ভারি ব্যথা লাগছিল, কিন্তু মা'র গা থেকে স্নিগ্ধ আর চমৎকার একটা গন্ধ নাকে আসতেই সমস্ত ব্যথা আমি ভুলে গেলাম। মা'র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি, উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিলাম না। মা'র কথার ফাঁকে ফাঁকে কানে আসছিল দিদিমার কথা। অনুচ্চ বিষণ্ন স্বরে দিদিমা বলে চলেছেন:

'ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গেছে, এমন কি দাদামশাইকে পর্যন্ত ওর ভয়ডর নেই। ভারিয়া রে, ভারিয়া...'

'মা, তুমি আর ঘ্যানঘ্যান কোরো না বাপু। সব ঠিক হয়ে যাবে!'

মা'র সঙ্গে এই পরিবেশটা খাপ খাচ্ছে না। মা এসে দাঁড়াতেই চারদিকের সর্বাকিছু মনে হচ্ছে পুরনো করুণ আর ময়লা। এমন কি আমি নিজেও যেন দাদামশাইয়ের মতো বুড়ো হয়ে গেছি।

দুই হাঁটুর মধ্যে আমাকে শক্তভাবে চেপে ধরে ভারি ভারি উষ্ণ হাত দিয়ে আমার চুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে আমার মা বলল:

'তোর চুলগুলো কাটতে হবে দেখছি। আর এবার তোকে স্কুলে ভর্তি করে দেব। আর দেরি করা উচিত নয়। কি রে, লেখাপড়া শিখবি তো?'

'লেখাপড়া তো আমি শিখেছি।'

'আরো কিছু শিখতে হবে। ইস্, কী গাঁট্টাগোঁট্টা হয়েছিস রে তুই!' আমাকে আদর করতে করতে খুশিভরা প্রাণোচ্ছল হাসি হাসল মা।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন দাদামশাই। মুখখানা থম্থমে আর রেখাকুটিল, চোখদুটো রক্তবর্ণ। দাদামশাইকে ঢুকতে দেখে একটা ঠেলা দিয়ে আমাকে সরিয়ে মা উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে বাবা, আমি কী করব? চলে যাব এখান থেকে?'

দাদামশাই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে নখ দিয়ে বরফ আঁচড়াতে লাগলেন। একটি কথাও বললেন না। আবহাওয়াটা উৎকণ্ঠায় টান হয়ে রইল। আমার মনে হতে লাগল, আমার দুই চোখ আর দুই কান বাড়তে বাড়তে সারা অবয়ব জুড়ে বসেছে। চিৎকার করার আবেগে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে বুকটা।

'লেক্সেই, তুই যা তো বাইরে।' নিস্তেজ গলায় বললেন দাদামশাই।

'কেন? ও কেন বাইরে যাবে?' আমাকে আবার নিজের দিকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল মা।

'খবরদার বল্ছি তুই বাইরে যাবি না!'

মা উঠে দাঁড়াল, তারপর সূর্যাস্তের লাল মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে ঘরের অপর প্রান্তে গিয়ে দাদামশাইয়ের পিছনে দাঁড়াল।

'বাবা, আমার কথাটা শোন...'

'চুপ!' তার দিকে ফিরে চেরা গলায় দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন।

'আমার সঙ্গে অমন ধমক দিয়ে কথা বলা চলবে না বলে রাখছি!' নীচু স্বরে বলল মা।

'ভারভারা!' ডিভান ছেড়ে দাঁড়িয়ে শাসানির ভঙ্গিতে আঙ্গুল নাড়তে নাড়তে দিদিমা বলে উঠলেন।

দাদামশাই একটা চেয়ারে বসে পড়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন আপন মনে:

'কী হল ব্যাপারটা, এ্যাঁ? দাঁড়াও, ভাবতে দাও আমাকে... আমি একটু ভেবে নিই... কোথা দিয়ে কি যে হচ্ছে...'

তারপরেই আহত পশুর মতো হঠাৎ প্রচন্ড একটা হুঙ্কার ছাড়লেন:

'আমাদের সকলের মুখে কালি দিয়েছিস তুই ভারভারা!'

'তুই যা তো এখান থেকে।' দিদিমা আমাকে বললেন। মনের মধ্যে একটা বিষণ্ণ ভার নিয়ে রান্নাঘরে চলে এলাম আমি। উঠে বসলাম চুল্লির ওপরে; সেখান থেকে পাশের ঘরের কথাবার্তা শোনা যায়। শোনা গেল, একেকবার সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠছে, আবার একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার মতো সবাই হঠাৎ চুপ করে যাচ্ছে। যতোদূর বোঝা গেল, আমার মা'র একটি বাচ্চা হয়েছে এবং বাচ্চাটিকে মা অন্য একজনের কাছে দিয়ে এসেছে—এই নিয়েই কথাবার্তা। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না, দাদামশাইয়ের মত না নিয়েই মা'র বাচ্চা হয়েছে সেজন্যে দাদামশাইয়ের রাগ, না দাদামশাইয়ের কাছে বাচ্চাটিকে মা নিয়ে আসেনি সেজন্যে দাদামশাইয়ের রাগ।

তারপর একসময়ে দাদামশাই এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে। মুখচোখ লাল হয়ে রয়েছে, এলোমেলো চেহারা, ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছেন। দাদামশাইয়ের পিছনে পিছনে এলেন দিদিমা, ব্লাউজের কোণ দিয়ে চোখের জলে ভেসে যাওয়া গাল মুছছেন। একটা বেঞ্চির ওপরে ধপ্ করে বসে পড়ে দু-হাত দিয়ে বেঞ্চির ধারটা আঁকড়ে ধরে রইলেন দাদামশাই; মুখখানা কুঁকড়ে রয়েছে, ছাইরঙের ঠোঁটটা কামড়াচ্ছেন। দাদামশাইয়ের পায়ের কাছে জানু মুড়ে বসে পড়লেন দিদিমা।

'এবারকার মতো তুমি ওকে ক্ষমা করো! যীশু খৃষ্টের দোহাই, একবারটি মুখ তুলে চাও! এর চেয়ে অনেক বেশি শক্ত আর মজবুত নৌকোও তো ভরাডুবি হচ্ছে! বড়োমানুষদের ঘরে কিংবা বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের বাড়িতে এসব ঘটনা কি ঘটে না? আকছার ঘটে। একবার তাকিয়ে দেখো কী সুন্দর মেয়ে সে! এবারকার মতো তোমার মেয়েকে ক্ষমা করো... দোষ কার নেই?..'

শরীরটা এলিয়ে দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন দাদামশাই, দিদিমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন:

'তা তো বটেই... ঠিক কথাই বলেছ... সত্যিই তো! তোমার আর কি,

তুমি তো হাত বাড়িয়েই বসে আছ, তোমার কাছে সবারই সব দোষ মাপ হয়ে যায়... হুঃ, কী সব মানুষ!'

তারপর দিদিমার দিকে ঝুঁকে দিদিমার কাঁধটা আঁকড়ে ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন।

'শুধু মানুষ তো নয়, ঈশ্বরও আছেন,' চাপা স্বরে বলতে লাগলেন তিনি, 'ঈশ্বরের ক্ষমা পাবার কি হবে? তিনি এত সহজে সবকিছু ক্ষমা করেন না। এই দেখ না, আমরা তো কবরের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, আর তো এই শেষ কয়েকটা দিন — কিন্তু এখনো শাস্তির ভোগ চলছে। শান্তি নেই, আনন্দ নেই, আশা-ভরসা করবার মতো কেউ নেই। ভিখিরির মতো মরতে হবে আমাদের -- দেখে নিও, আমার এই কথা মিথ্যে হবে না — ভিখিরির মতো মরতে হবে আমাদের!'

দাদামশাইয়ের হাত নিজের হাতে নিয়ে তার পাশটিতে বসলেন দিদিমা, সান্ত্বনার হাসি হেসে বললেন:

'তাতে আর কী হয়েছে? ভিখিরি হওয়া যদি কপালে থাকে তো ভিখিরিই হব। ভয়ের কী আছে? তোমার কিচ্ছুটি করতে হবে না, চুপটি করে বাড়িতে বসে থেকো — আমিই ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দোরে দোরে ঘুরব। সবাই ভিক্ষে দেবে আমাকে — না খেয়ে থাকতে হবে না আমাদের। আমি যতোদিন আছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এসব কথা ভেবে মাথা গরম কোরো না!'

দাদামশাইয়ের মুখে হঠাৎ বেঁকা এক হাসি ফুটল। হঠাৎ ছাগলের মতো মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরে জোরে চেপে ধরলেন দিদিমাকে। দিদিমার হাতের মধ্যে ছোট এতটুকু দেখাতে লাগল তাঁকে। এলোমেলো উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি বলতে লাগলেন:

'তুমি সেই বোকাই রয়ে গেলে গো! নেহাতই বোকা! আবার তুমিই আমার একমাত্র ভরসা! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই! কিন্তু তোমার তো আর কোনো দিন বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না। যেটুকু আছে তা খুইয়ে বসতেও তোমার আপত্তি নেই! একবার ভাব তো, এই ছেলেমেয়েদের জন্যে কত কীই না করেছি আমরা! কত পাপ পর্যন্ত করেছি আমি! আর এই শেষ বয়সে কিছুই রইলো না, এতোটুকু টুকরোও না...'

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমার দু-গাল বেয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল, চুল্লি থেকে লাফিয়ে নেমে আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম আমি — কাঁদতে লাগলাম

এই আনন্দে যে আমার মা এসেছে, আমার দাদামশাই ও দিদিমা এমন অভাবিতপূর্ব মাধুর্য ও কোমলতায় একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদের দুঃখের ভাগ দিয়েছেন আমাকে, কারণ দুজনেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আদর করতে লাগলেন, চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেন।

'এই যে বিচ্ছু, শয়তান, তুইও আছিস এখানে!' আমার কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগলেন আমার দাদামশাই, 'এখন আর কী, তোর মা এসে গেছে, এখন কি আর আমার কাছে কোনো দরকারে আসবি? তোর এই বুড়ো শয়তান দাদামশাইকে কি আর মনে থাকবে? কী রে, ঠিক বলিনি? আর দেখিস, ওই করুণাময়ী দিদিমার কথাও ভুলে যাবি! এই দিদিমা কেবল জানে আদর দিয়ে তোর পরকাল ঝরঝরে করতে। হুঁঃ, কী সব মানুষ!'

আমাদের দু'জনকেই ঠেলে সরিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন:

'সবাই আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে — সবাই এখান থেকে চলে যেতে চায়... হাঁ করে দেখছ কি, ডেকে আন না মেয়েটাকে... তাড়াতাড়ি যাও!'

দিদিমা রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেলেন আর দাদামশাই মাথা নিচু করে কোণের দিকে গিয়ে বলেন:

'পরম করুণাময় হে ঈশ্বর, দেখতে পাচ্ছ কি, আমার কী অবস্থা হয়েছে?'

তারপর নিজের বুকের উপর সশব্দে এক ঘা বসালেন। এ-ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি। শুধু এখনকার কথা নয়, দাদামশাই সাধারণত যে-ভাবে ঈশ্বরের কাছে কথা বলেন তা আমার মোটেই ভালো লাগে না। ভারি একটা দম্ভের ভাব থাকে তাঁর মধ্যে।

আমার মা ঘরে ঢুকল; তার লাল পোশাকের খুশিভরা ঝলক উঠল ঘরের মধ্যে। টেবিলের পাশে বেঞ্চটাতে একপাশে দাদামশাই ও একপাশে দিদিমাকে নিয়ে বসল মা, জামার আস্তিন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল দু-জনের কাঁধ। খুব নরম সুরে আর প্রত্যেকটি কথার ওপরে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে কথা বলল মা, দাদামশাই ও দিদিমা নির্বাক হয়ে মা'র কথা শুনলেন। মা'র পাশে দু'জনকেই এত ছোট দেখাচ্ছে যে মনে হতে লাগল আমার মা-ই হচ্ছে দাদামশাই ও দিদিমার মা আর ওঁরা দুজন তার ছেলেমেয়ে।

উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে আমি তাকের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় দাদামশাই ও দিদিমা তাঁদের সেরা পোশাক পরে

গির্জার সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিলেন। সর্দার কারিগরের পোশাকে আর রেকুনের লোমের তৈরি কোট গায়ে দিয়ে দাদামশাইয়ের চেহারার শোভা বেড়ে গিয়েছিল। একগাল হাসি নিয়ে দাদামশাইয়ের দিকে চোখ টিপে আর মা-র গায়ে কনুইয়ের একটা গুঁতো দিয়ে দিদিমা বললেন:

'দেখ্ রে, তাকিয়ে দেখ্, তোর বাবা কেমন পরিপাটি ছাগলটি সেজে বসে আছে।'

মা হো হো করে হেসে উঠল।

তারপর যখন ঘরের মধ্যে মা ও আমি ছাড়া আর কেউ রইলাম না তখন মা পা দুটো মুড়ে ডিভানের ওপরে বসে পাশের জায়গাটা হাত দিয়ে দেখিয়ে বসতে বলল আমাকে।

'আয় বোস্ এখানে। তারপর, কেমন আছিস বললি না তো? ভালো নয়, না?'

'কেমন আছি আমি? সে-কথা আমি জানি না।'

'তোর দাদামশাই কি তোকে মারে?'

'না, আজকাল আর তেমন নয়।'

'সত্যি? আচ্ছা, যা তোর মনে আসে আমাকে বলে যা।'

দাদামশাইয়ের কথা বলবার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি বলতে শুরু করলাম আমাদের সেই বাসিন্দাটির কথা। বললাম, কী চমৎকার লোক ছিল সে, আমরা এখন যে-ঘরে বসে আছি সেই ঘরেই থাকত; কেউ তাকে পছন্দ করত না, শেষ পর্যন্ত দাদামশাই তাকে উঠিয়ে দেন। মা'কে দেখে মনে হল, এই লোকটির গল্প মা'র ভালো লাগেনি। মা বলল:

'আচ্ছা, এবার অন্য কিছু বল্ শুনি।'

তখন আমি তাকে সেই তিনটি ছোট ছেলের কথা বললাম; আর বললাম, কর্ণেল আমাকে কী-ভাবে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল।

শুনে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মা বলল, 'চামার, একেবারে চামার!'

তারপরেই আবার চুপ করে গেল মা। চোখদুটো কুঁচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মা, দাদামশাই তোমার ওপর এত রেগে গেছেন কেন?'

'আমারই দোষ।'

'তুমি যদি বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে তাহলে আর এমন হ'ত না...'

আমার কথা শুনে মা চমকে উঠল। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই হো হো করে হেসে উঠে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিল আবার।

'তবে রে পাজি ছেলে! এসব কথা কক্ষণো বল্‌বিনে, বুঝেছিস্‌? একটি কথাও নয় — মুখটি বুজে থাকবি! এমন কি এসব চিন্তাও যেন আর কখনো মাথায় না আসে!'

শান্ত ও কঠোর স্বরে আরো অনেক কথা বলে গেল মা। সেগুলোর একবর্ণও আমি বুঝতে পারলাম না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চিবুকে আঙুলের টোকা দিতে দিতে আর পুরু ভুরুদুটো নাচাতে নাচাতে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

টেবিলের ওপরে একটা মোমবাতি জ্বলছে। গলে গলে পড়ছে মোম। একটা আয়না থেকে ঠিকরে আসছে মোমবাতির আলো। লম্বা লম্বা বিশ্রী ছায়া পড়েছে মেঝের ওপরে। কোণের আইকনের সামনে জ্বলছে একটা প্রদীপ। চাঁদের আলোয় রুপোলী হয়ে উঠেছে তুষার ঢাকা জানলাগুলো। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মা, যেন শূন্য দেওয়াল ও সিলিং-এর মধ্যে কী একটা খুঁজছে।

'তুই শুতে যাবি কখন?'

'আরেকটু পরে।'

'তাই তো, আমার মনেই ছিল না বিকেলবেলা খানিকক্ষণ তুই ঘুমিয়েছিস।' নিজেকে মনে করিয়ে দেবার মতো করে মা বলল।

'তুমি কি এখান থেকে চলে যাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কোথায় যাব,' অবাক হয়ে মা জবাব দিল। তারপর এগিয়ে এসে আমার মুখটা তুলে ধরে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সেই স্থিরদৃষ্টির সামনে আমি কিছুতেই চোখের জল চেপে রাখতে পারলাম না।

'কাঁদছিস কেন?'

'আমার ঘাড়ে ব্যথা লাগছে।'

কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি ব্যথা লাগছে আমার বুকের মধ্যে। আমি বুঝতে পারলাম, মা'র পক্ষে এ-বাড়িতে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়; একদিন না একদিন তাকে যেতেই হবে...

মেঝের ওপর পাতা কার্পেটটা পা দিয়ে নাড়তে নাড়তে মা বলল, 'বড়ো

হলে তুই ঠিক তোর বাবার মতোই দেখতে হবি। তোর দিদিমা নিশ্চয়ই তোর কাছে তোর বাবার গল্প করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোর দিদিমা মাক্সিমকে খুব ভালোবাসত। তেমনি সেও খুব ভালোবাসত তোর দিদিমাকে...'

'আমি জানি।'

মোমবাতিটার দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মা সেটাকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল।

'এই ভালো হয়েছে।' বলল মা।

মোমবাতির আলোটুকু না থাকাতে ঘরের ভিতরটা যেন আরো স্নিগ্ধ ও আরো পরিষ্কার দেখাতে লাগল। মেঝের ওপরে সেই লম্বা লম্বা বিশ্রী ছায়াগুলো আর নেই, তার বদলে নীল চাঁদের আলোয় ঘরটা ভরে গেছে। জানলার শার্সিগুলোতে চিক্‌চিক্‌ করছে একটা রুপোলী আভা।

'আচ্ছা মা, এখানে আসবার আগে তুমি কোথায় ছিলে?'

একাধিক শহরের নাম করল আমার মা। যেন বহুদিন আগের ভুলে যাওয়া কোনো ঘটনার কথা মনে করছে এমনিভাবে বলল শহরগুলির নাম। আর সর্বক্ষণ ঘরের মধ্যে বাজপাখির মতো পাক খেতে লাগল।

'এই পোশাকটা তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'এটা আমি নিজে তৈরি করেছি। আমার নিজের সবকিছু আমি নিজেই করি।'

মা যে অন্য সকলের মতো নয়, সবার থেকে এত বেশি আলাদা, এতে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু মা এত কম কথা বলছে দেখে আমার কষ্ট হতে লাগল। আমি যদি প্রশ্ন না করি তাহলে মা একটিও কথা বলে না।

তারপর মা আবার এসে ডিভানে আমার পাশটিতে বসল। দু'জনে দু'জনকে জোরে আঁকড়ে ধরে নিঃশব্দে আমরা বসে রইলাম। একসময়ে দাদামশাই ও দিদিমা সারা গা থেকে মোম আর ধূপের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে গম্ভীর সমাহিত মুখে বাড়ি ফিরে এলেন।

সাড়ম্বরে রাত্রের আহারপর্ব শেষ হল থমথমে আবহাওয়ায়। আমরা কথা বললাম খুবই কম, যেটুকু বললাম তা এত সতর্কভাবে যেন কারও খুব পাতলা ঘুম ভেঙে যাবার আশঙ্কা আছে।

একটুও সময় নষ্ট না করে আমাকে 'পার্থিব' শিক্ষায় শিক্ষিত করে

তোলার কাজে মা উঠেপড়ে লাগল। 'মাতৃভাষায় প্রথম পাঠ' নামে একটা বই কিনে দিল আমাকে। কিছুদিনের মধ্যেই পার্থিব ভাষার বর্ণমালা শিখে ফেললাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মা আমাকে কবিতা মুখস্থ করাতে চাইল। আর তা করতে গিয়েই আমাদের দু'জনের পক্ষে একটা মর্মান্তিক অবস্থার সূত্রপাত হয়।

আমাকে প্রথম যে কবিতাটি মুখস্থ করতে হয়েছিল তা হচ্ছে এই:

পথখানি আঁকাবাঁকা নিঃসীম শূন্যে মিলায়,
ঘরবাড়ি খামারের পাশ দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়,
কোদাল কিম্বা গাঁইতি এ পথ তো করেনি সৃজন,
হাজারো পায়ের ছাপ এ পথেরে করে রূপায়ণ।

কবিতাটি আবৃত্তি করবার সময়ে আমার সব সময়েই কতগুলো ভুল হত। আঁকাবাঁকা না বলে বলতাম ছাঁকাছাঁকা, কোদালকে বলতাম কোটাল, পায়ের-কে বলতাম ভায়ের।

মা আমাকে শুদ্ধ করে দিত, 'আচ্ছা, তুই একবার ভেবে দ্যাখ্ তো, রাজপথ কখনো ছাঁকাছাঁকা হয়? রাজপথকে ছাঁকাছাঁকা বললে লোকে বোক বলবে যে! ছাঁকাছাঁকা নয়! বল্ আঁকাবাঁকা, ভুলিসনে যেন।'

কথাটা আমিও বুঝতাম। কিন্তু তবুও আবৃত্তি করবার সময়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসত 'ছাঁকাছাঁকা', আর ভয়ে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হত।

শেষকালে রেগে গিয়ে মা একদিন বলে বসল যে আমার মাথায় কিছু নেই আর আমি ভীষণ একগুঁয়ে। নিজের নামে এই অপবাদ শুনে ভয়ানক লাগল আমার মনে এবং আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম যাতে এই গোলমেলে লাইনগুলোকে ঠিকঠিক মনে রাখতে পারি। মনে মনে যখন আবৃত্তি করি তখন আমার একটিও ভুল হয় না, কিন্তু চেঁচিয়ে বলতে গেলেই অবধারিতভাবে শব্দগুলো গুলিয়ে ফেলি। শেষকালে এই কুহকী লাইনগুলো আমার দু-চোখের বিষ হয়ে উঠল। তারপর থেকে আমি ইচ্ছে করে শব্দের সঙ্গে শব্দের মিল দিয়ে দিয়ে লাইনগুলোকে বিকৃত করতে লাগলাম। আর লাইনগুলো যতোই কিম্ভূতকিমাকার অর্থহীন হয়ে উঠতে লাগল ততোই আনন্দ হতে লাগল আমার।

কিন্তু এই আনন্দ আমার কাছে শেল হয়ে উঠেছিল। একদিন মা'র কাছে পড়া দিচ্ছিলাম, কোথাও একটিও ভুল করিনি, এমন সময়ে মা আমাকে

কবিতাটা আবৃত্তি করতে বলল। তখন নিজের আপ্রাণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মুখ থেকে যে কবিতাটা বেরিয়ে এল তা হচ্ছে এই:

রাজপথ, গাছপথ, রথ নথ ঘর্ঘর
শাবল ধর্, মাদল ধর্, বাদল বাকল মর্মর...

ব্যাপারটা যে কী ঘটছে তা আমি বুঝতে পারলাম খুবই দেরিতে। টেবিলের ওপর দু-হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল মা, তারপর প্রত্যেকটি কথার ওপর জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'এটা তুমি কোত্থেকে শিখেছ?'

আমার তো এদিকে হৃৎকম্প শুরু হয়েছে, বললাম, 'জানি না।'

'তবুও বলো আমাকে!'

'এই এমনি বললাম।'

'কী এমনি বললে?'

'এই একটু মজা করবার জন্যে।'

'যাও, কোণে গিয়ে দাঁড়াও।'

'কী জন্যে?'

'কোণে যাও বলছি!' মা প্রচণ্ড একটা ধমক দিল।

'কোন্ কোণে?'

এবার আর মা কোনো জবাব দিল না। কিন্তু এমন একটা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যে আমার আর জ্ঞানবুদ্ধি বলতে কিছু রইল না। আমি কি করতে চলেছি বা মা আমাকে কি করতে বলছে, এসব চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল একেবারে। আইকনের নীচের কোণে রয়েছে একটা গোল টেবিল; টেবিলের ওপরে ফুলদানিতে মিষ্টিগন্ধওলা কতকগুলো শুকনো ফুল আর ঘাস। আরেকটা কোণে রয়েছে একটা গালিচাঢাকা ট্রাঙ্ক। তৃতীয় কোণে বিছানা আর চতুর্থ কোণে দরজা।

'মা, তুমি আমাকে কি করতে বলছ তা আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না।' ব্যাপারটা বুঝতে পারার জন্যে মরিয়া হয়ে আমি বললাম।

মা একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে নিঃশব্দে কপাল আর গাল ঘষতে লাগল।

'তোমার দাদামশাই কি কোনো দিন তোমাকে কোণে দাঁড় করিয়ে রাখেনি?'

'কবে?'

'যবেই হোক্, দাঁড় করিয়েছে কিনা?' টেবিলের ওপরে দু-বার ঘুষি মেরে অধৈর্যের সঙ্গে মা চেঁচিয়ে উঠল।

'কই, আমার তো মনে পড়ছে না।'

'কোণে দাঁড়িয়ে থাকা যে একটা শাস্তি তাও তুমি জান না?'

'না। কেন, এটা শাস্তি কেন?'

'পোড়া কপাল আমার!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলল, 'আচ্ছা, এদিকে আয় দেখি।'

মা'র কাছে এসে আমি বললাম, 'তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ কেন মা?'

'একটা কবিতা ঠিক করে বলতে পারিস না? কেন তুই ইচ্ছে করে বারবার গুলিয়ে ফেলিস!'

আমি মাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম যে চোখ বুজে মনে মনে বললে আমি কবিতাটি যেমন লেখা আছে বলতে পারি কিন্তু চেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করলেই অন্য নানারকম শব্দ এসে পড়ে।

'ঠিক বলছিস তো? বানিয়ে বলছিস না?'

আমি বললাম বানিয়ে বলছি না। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা চিন্তা এল: ঠিক কথা বললাম তো? তারপর হঠাৎ আরেকবার একটু সময় নিয়ে চেষ্টা করতেই কবিতাটি আমার মুখ থেকে নির্ভুলভাবে বেরিয়ে এল। শুনে আমি নিজেই অবাক ও অভিভূত হলাম।

নিজেই বুঝতে পারলাম, আমার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, কানদুটো জ্বলছে। মা'র সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জায় আমি মরে যেতে লাগলাম। চোখের জলে ঝাপ্সা দৃষ্টি দিয়েই দেখতে পেলাম, আমার মা'র মুখটা হতাশায় কালো হয়ে গেছে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তাকিয়ে আছে ভুরু নামিয়ে।

'এবার কি হল?' অদ্ভুত স্বরে মা জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, তুমি সত্যি সত্যিই বানিয়ে বলছিলে!'

'কী জানি। আমি অনিচ্ছায়...'

মাথা নিচু করে মা বলল, 'তোর সঙ্গে পেরে ওঠা যার-তার কর্ম নয়! আচ্ছা, যা তুই।'

তারপর দিনের পর দিন মা আমাকে আরো অনেক কবিতা মুখস্থ করাল। কিন্তু কবিতাগুলোকে কিছুতেই মনের মধ্যে গেঁথে নিতে পারি না।

কবিতার লাইনগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে এবং নতুন নতুন শব্দ বানিয়ে লাইনগুলোকে বিকৃত করে তোলার বদ ইচ্ছেটা ভয়ানকভাবে আমাকে পেয়ে বসে। এজন্যে আমাকে একটুও ভাবনাচিন্তা করতে হয় না, বিদ্‌কুটে শব্দগুলো আপনা থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আমার মন জুড়ে বসে। এই শব্দগুলো এসে কবিতার আসল শব্দগুলোকে হটিয়ে দেয়। প্রায়ই এমন হয় যে কবিতার গোটা একেকটা লাইন মন থেকে মুছে যায় একেবারে, হাজার চেষ্টা করেও তা আর মনে করতে পারি না। মনে আছে, একবার একটি কবিতা — প্রিন্স ভিয়াজেম্‌স্কির লেখা — আমার শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল। কবিতাটি হচ্ছে এই:

পাখী-ডাকা ভোর থেকে, রাতের গভীরে,
বুড়ো-বুড়ি, বিধবা আর অনাথার দল
এক মুঠি অন্ন লাগি ফেলে অশ্রুজল।

এই কবিতার তৃতীয় লাইনটি আমার কিছুতেই মনে থাকে না, আবৃত্তি করবার সময়ে সব সময়েই বাদ দিয়ে যাই। লাইনটি হচ্ছে এই:

হাত পেতে ভিখ্‌ মাগে অসহায় সুরে

শেষ পর্যন্ত মা আমার ওপরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে দাদামশাইয়ের কাছে গিয়ে আমার এই এলোমেলো স্মৃতিশক্তির কথা বলল।

দাদামশাই বললেন, 'ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে, এই আর কি! ওর স্মৃতিশক্তিতে কোনো গোলমাল নেই। প্রার্থনাগুলো আমার যতোটা না মনে থাকে তার চেয়েও ওর অনেক বেশি মনে থাকে। ওর স্মৃতিশক্তিটা হচ্ছে ঠিক একটা পাথরের মতো — একবার কোনো একটা জিনিস দাগ কাটলে চিরকাল থেকে যায়। ওকে একবার উত্তম-মধ্যম দেওয়া দরকার।'

দিদিমাও এই মতের সঙ্গে সায় দিলেন।

'রূপকথার গল্প আর গান তো ও কখনো ভোলে না। আর গান ও কবিতা তো একই জিনিস।'

এসবই সত্যি কথা। আমি অনুভব করলাম যে আমারই দোষ। কিন্তু যেই আবার কবিতা মুখস্থ করতে যাই অমনি নানা নতুন শব্দ আরশোলার মতো গুটিগুটি এসে ভিড় করে সারি দিয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের সদরে রাত্রি আর দিন
খোঁড়া কানা ভিখিরি অতি দীনহীন।
ভিখ্ মাগে বারবার বোবা কান্না কাঁদে
ভিখ্ নিয়ে চলে যায় পেত্রভ্নার ফাঁদে।
পেত্রভনার গোয়ালেতে বহু গোরুগাই
পয়সা দিয়ে নগদ দামে কিনে নেয় সে তাই।
তাবপর চলে মদ, চলে হুটোপুটি —
মদের নেশায় তারা করে লুটোপুটি।

রাত্রিবেলা দিদিমার পাশটিতে শুয়ে শুয়ে আমি তাঁর কাছে আমার বইয়ের পড়া আর আমার বানানো কবিতাগুলো বলে যাই। মাঝে মাঝে তিনি হেসে ওঠেন কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তিনি আমাকে তিরস্কার করে বলেন·

'এই দ্যাখ্, ইচ্ছে করলে তুই কী না পারিস! কিন্তু এভাবে ভিখিরিদের নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করে কবিতা বানানোটা ঠিক নয়। যীশু খ্রীষ্টও ভিখিরি ছিলেন। সাধুমহাত্মারা সকলেই তাই।'

আমি নিজের মনে কবিতা আবৃত্তি করে জবাব দিই:

ভিখিরিকে আমি
দু-চোখে দেখতে পারি না:
তেমনি পারি না দু-চোখে দেখতে
দাদামশাইকে।
তাই ভগবানেব কাছে বলি
আমার আর ক্ষমতা কী
বলে দাও আমাকে
কী করলে পরে
আমার ভাগ্যকে আর দাদামশাইয়ের বেতকে
দেখাতে পারি অপক্ক কদলী।

দিদিমা বলে ওঠেন, 'তোর জিভ খসে পড়বে যে পাজি ছেলে! তোর দাদামশাই শুনলে আর আস্ত রাখবে না।'

'শুনুক গে!'

তারপর একসময়ে হয়তো আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে দিদিমা বলেন, 'হ্যাঁ রে, তোর মা'কে তুই এত জ্বালাতন করিস কেন রে? এমনিতেই

তোর মা'র জ্বলুনি-পুড়ুনির শেষ নেই—তার ওপরে তোকে নিয়ে যদি এতটা ভুগতে হয় তাহলে কি করে বাঁচবে বল্‌ তো!'

'কেন, জ্বলুনি-পুড়ুনি কেন?'

'চুপ কর্‌ হতভাগা ছোঁড়া! সব ব্যাপার নিয়ে তোর মাথা না ঘামালেও চলবে!'

'আমি জানি দাদামশাইয়ের জন্যেই...'

'ফের কথা বল্‌ছিস!'

ভারি বিশ্রী লাগতে লাগল আমার। এত বিশ্রী যে প্রায় একটা হতাশা এসে পড়ে। তবু জানি না কেন, আমার এই মনোভাব মা'র চোখ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই। তখন আমি আরো দুর্বিনীত ও আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠি। আমার মা'র আমাকে লেখাপড়া শেখানোর বহরটা যেমন বেড়ে যায় তেমনি লেখাপড়া ব্যাপারটাও আরো শক্ত হয়ে ওঠে। অঙ্কটা নিয়ে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয় না, কিন্তু হাতের লেখা শেখাটা আমার পক্ষে একটা অসহ্য ব্যাপার, আর ব্যাকরণ আমি বুঝতে পারি না। আমি টের পাই, আমার দাদামশাইয়ের এই বাড়িতে মা'র জীবনটা একেবারেই সুখের নয় এবং এই চিন্তাটা অন্য সবকিছুকে চাপা দিয়ে আমার মনের ওপর একটা ভার হয়ে চেপে বসে থাকে। যতো দিন যায় মা ততোই মনমরা হয়ে ওঠে। সবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, বাগানের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানলায় বসে থাকে, আর দিন-দিন কেমন যেন শুকিয়ে যায়। এখানে আসার পরে কিছুদিন পর্যন্ত আমার মা ছিল প্রাণের আনন্দে ভরপুর আর সদাচঞ্চল। কিন্তু এখন তার চোখের চারদিকে কালো দাগ পড়েছে, চেহারার দিকে আর আগেকার মতো নজর নেই, চুল না আঁচড়ে একটা বোতামছেঁড়া দুমড়ানো মুচড়ানো ব্লাউজ পরে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। মা'কে এমন বিশ্রী চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে ভারি খারাপ লাগে আমার। মা থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে, মা হবে এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ।

আমাকে পড়াতে বসে মা অন্যমনস্ক হয়ে দেওয়ালের দিকে বা জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন করে ক্লান্ত স্বরে আর আমি যে জবাব দিই তা শুনতে ভুলে যায়। আর মা'র মেজাজটা ভারি তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে, কারণে অকারণে আমাকে ধমক দেয়। এটাও আমাকে আঘাত দিত: মা হবে অন্যদের চেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণা, রূপকথার গল্পের মায়েদের মতো।

মাঝে মাঝে আমি মাকে বলতাম:

'মা, তোমার কি আমাদের সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে না?'

'নিজের চরকায় তেল দে।' ধমকের সুরে মা বলত।

আমি আরও টের পেলাম, দাদামশাই এমন একটা কিছু করতে চলেছেন যা আমার দিদিমাকে ও মা'কে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। প্রায়ই দেখি, দাদামশাই মা'র ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেন আর তারপর শোনা যায় রাখাল-ছেলে নিকানোরের বিরক্তিকর কাঠের বাঁশিটার কিচকিচানির মতো দাদামশাইয়ের ফোঁসানি। একদিন তো আমার মা এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে বাড়ির সব জায়গা থেকে শোনা গেল সেই কথাগুলো:

'না, কক্ষণো না, না, না, না!'

তারপরেই ঠাস্ করে কপাটের আওয়াজ ও দাদামশাইয়ের হুঙ্কার।

ঘটনাটা ঘটেছিল সন্ধ্যেবেলা। দিদিমা রান্নাঘরে বসে দাদামশাইয়ের জন্যে একটা শার্ট সেলাই করছিলেন। সেলাই করতে করতে আপন মনে বিড়বিড় করে বলছিলেন কি যেন। ঠাস্ করে কপাটের শব্দ হতেই দিদিমা কান পেতে শুনলেন, আর তারপর বললেন:

'হা ভগবান! মেয়েটা ভাড়াটেদের ঘরে গেল!'

হঠাৎ দাদামশাই রান্নাঘরে ছুটে এসে দিদিমার মাথায় ঘা কতক লাগিয়ে দিলেন। তারপর নিজের ব্যথা-পাওয়া হাতটায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন দাঁতে দাঁত চেপে:

'বুড়ী ডাইনী! তোর পেটে কথা থাকে না কেন?'

মাথার টুপি ঠিক করতে করতে শান্ত স্বরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'জেনে রাখ, তুমিও একটি আস্ত বোকা! ভাব কি আমাকে? তোমার ভয়ে মুখ বুজে থাকব? এই তোমাকে বলে রাখছি, তোমার মতলব যেটুকু আমি টের পাব তা ওর কাছে গোপন রাখব না...'

একথা শুনে দাদামশাই দিদিমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দিদিমার মাথায় সমানে ঘুষি মারতে লাগলেন। দিদিমা বাধা দিলেন না, শুধু বলতে লাগলেন:

'মারো, মারো, বোকা বুড়ো যতো খুশি মারো।'

আমি বসেছিলাম তাকের ওপরে। সেখান থেকে দাদামশাইকে লক্ষ্য করে বালিশ, কম্বল আর জুতো ছুঁড়তে লাগলাম। কিন্তু দাদামশাই রাগে আমার দিকে দৃকপাত করলেন না। দিদিমা পড়ে গেলেন মেঝের ওপরে আর দিদিমার মাথায় সমানে লাথি মারতে লাগলেন দাদামশাই। শেষকালে টাল্ সামলাতে

না পেরে জলের একটা পাত্র উল্‌টে দিয়ে নিজেই পড়ে গেলেন চিৎপটাং হয়ে; লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বুনো দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে মুখ থেকে থুতু ছিটিয়ে ফুঁসতে লাগলেন। তারপরেই রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে গেলেন ওপরে নিজের ঘরে। যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে উঠে বেঞ্চটার ওপরে বসলেন দিদিমা; মাথার চুলের জট্ ছাড়াতে লাগলেন। তাক থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এলাম আমি।

রাগের সঙ্গে দিদিমা বললেন, 'নে খুব হয়েছে! এবার এই বালিশ আর অন্য সব জিনিস তুলে ঠিক জায়গায় রেখে দে। বালিশ ছুঁড়ে ছুঁড়ে খুব বীরত্ব দেখানো হয়েছে! আচ্ছা তুই কেন সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসিস? আর এই বুড়ো শয়তানটাও হয়েছে তেমনি। যখন তখন মাথা গরম করে বসে!'

হঠাৎ দিদিমার মুখ থেকে ছোট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। ভুরু কুঁচকে আমাকে কাছে ডেকে তিনি বললেন, 'দ্যাখ্ তো, এ-জায়গাটা ব্যথা করছে কেন?'

দিদিমার মাথার ভারি চুলের গোছা সরাতেই আমার চোখে পড়ল, একটা চুলের কাঁটা দিদিমার মাথার চামড়ায় ঢুকে গেছে। কাঁটাটাকে আমি টেনে তুললাম। তখন চোখে পড়ল, আরেকটি কাঁটাও তেমনিভাবে ঢুকে আছে। আমার হাতের আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেল।

বললাম, 'আমি বরং মা'কে ডেকে আনি। আমার ভয় করছে।'

হাতটাকে ঝাঁকিয়ে দিদিমা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'কী বললি—"মা'কে ডেকে আনি।" ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এটা সে দেখতে বা শুনতে পায়নি! আর তুই কিনা তাকে ডেকে আনতে চাইছিস! যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে!'

লেস্ বোনার দক্ষ আঙুল দিয়ে মাথার সেই রাশি রাশি কালো চুলের গোছার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে দিদিমা খুঁজতে লাগলেন আর কোথায় কোথায় চুলের কাঁটা মাথার চামড়ার মধ্যে বসে গেছে। আমার সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে হাত চালিয়ে আমি আরো দুটো চুলের কাঁটা টেনে তুললাম।

'ব্যথা লাগে?'

'এমন কিছু নয়। দেখিস না, কাল আচ্ছা করে গরম জলে স্নান করব আর সমস্ত ব্যথা চলে যাবে।' তারপর আদরের সুরে তিনি আমাকে বলতে

লাগলেন, 'সোনা আমার, মাণিক আমার, তোর মা'কে গিয়ে আবার বলিসনে যেন যে দাদামশাই আমাকে মেরেছে। এমনিতেই দু'জনে দু'জনের ওপরে রেগে আছে—বুঝলি না? বলবি না তো, কেমন?'

'না, বলব না।'

'বাঃ, এই তো চাই! ভুলে যাসনে যেন! আচ্ছা এবার এদিকটা একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া যাক্। দ্যাখ্ তো, আমার মুখে কোনো চিহ্ন আছে কিনা? নেই? খুব ভালো। বাস্, আর কোনো গোলমাল নেই। একেবারে ডেজি ফুলের মতো নিষ্কলঙ্ক।'

বলেই তিনি মেঝে মুছতে শুরু করলেন। গভীর আবেগের সঙ্গে আমি বললাম:

'দিদিমা তুমি ঠিক ঋষির মতো। তোমাকে মারে, তোমার ওপর অত্যাচার করে—কিন্তু তুমি নির্বিকার, কক্ষণো শোধ তুলতে চেষ্টা করো না!'

'দূর! দূর! বাজে বকিসনে! আমি হলাম গিয়ে ঋষি! আচ্ছা লোককে ঋষি বানিয়েছিস যা হোক্!'

বিড়বিড় করে বকতে বকতে দিদিমা উবু হয়ে ঘর মুছতে লাগলেন। আর দরজার কাছে সিঁড়িতে বসে আমি জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম, যে করে হোক্ দাদামশাইয়ের কৃতকর্মের শোধ তুলতে হবে।

আমার সামনেই দিদিমাকে এভাবে মারপিট করা দাদামশাইয়ের এই প্রথম। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেও আমি যেন দেখতে পেলাম, তাঁর লাল মুখটা চোখের সামনে ভেসে আছে আর তাঁর মাথার লাল চুলগুলো উড়ছে। প্রচণ্ড রাগে আমার বুকের ভিতরটা জ্বলছিল আর কি করলে যে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হয় সেটা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

দু-দিন পরে ওপরের তলায় দাদামশাইয়ের ঘরে ঢুকে দেখলাম, একটা খোলা সিন্দুকের সামনে মেঝের ওপরে বসে দাদামশাই কতকগুলো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। পাশেই একটা চেয়ারে পড়ে আছে তাঁর অতি প্রিয় সাধু-মহাত্মাদের চিত্রসম্বলিত পাঁজিটা। পুরু মোটা ছাইরঙা কাগজ, বারো মাসের জন্যে বারোটি। প্রত্যেকটি কাগজে মাসের দিনগুলোর জন্যে চৌকো চৌকো ঘর কাটা; আর এই ঘরগুলোতে সাধু-মহাত্মাদের ছবি। এই পাঁজিটাকে দাদামশাই মূল্যবান সম্পত্তি বলে মনে করেন। ক্বচিৎ কখনো যদি আমার ওপরে বিশেষ রকমের খুশি হবার কোনো কারণ ঘটে একমাত্র তাহলেই তিনি আমাকে এই পাঁজিটা দেখতে দেন। পাঁজির সেই ছোট ছোট বুড়োটে

ছবিগুলো দেখে আমার ভারি ভালো লাগে আর তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত একটা আবেগ আসে আমার মনে। এই সাধু-মহাত্মাদের কয়েকজনের জীবনীও আমি জানি; যেমন, কিরিক ও উলিতা, শহীদ ভারভারা, পানতেলেইমোন্ এবং আরো অনেকে। বিশেষ করে ঈশ্বরানুগত আলেক্সেইয়ের করুণ জীবনী আমাকে বিচলিত করে; আমার দিদিমা তাঁর সম্পর্কে চমৎকার চমৎকার সব ছড়া বলেন আর তা শুনে গভীর আবেগে আমি অভিভূত হই। পাঁজির কয়েকশো সাধু-মহাত্মার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গভীর একটা সান্ত্বনা আসে মনের মধ্যে; এই উপলব্ধি হয় যে পৃথিবীতে কোনো কালেই শহীদের অভাব হয়নি।

কিন্তু সেদিন আমি স্থির করলাম যে এই পাঁজিটাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলব। ঈগলপাখির শীলমোহর দেওয়া একটা নীল কাগজ ভালো করে পড়বার জন্যে দাদামশাই জানলার কাছে উঠে যেতেই আমি এক থাবায় পাঁজির কতকগুলো পাতা মুঠো করে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে চলে এলাম। তারপর দিদিমার টেবিল থেকে কাঁচিটা তুলে নিয়ে সটান চলে এলাম চুল্লির ওপরে এবং সাধু-মহাত্মাদের মাথাগুলো কাটতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু একটি সারির সবকটি মাথা কাটবার পরেই ছবিগুলোকে দেখে আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। তখন মাথা না কেটে আমি শুধু দাগ বরাবর কাঁচি চালিয়ে যেতে লাগলাম অর্থাৎ কাগজগুলোকে কাটলাম চৌকো চৌকো ঘরের দাগ বরাবর। কিন্তু প্রথম সারি শেষ করে দ্বিতীয় সারিতে কাঁচি চালাবার আগেই আমার দাদামশাইয়ের মূর্তি ভেসে উঠল দরজার সামনে।

'কার হুকুমে এই পাঁজিটা নিয়ে এসেছ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

হঠাৎ তাকের ওপরে ছড়ানো চৌকো চৌকো কাগজের টুক্‌রোগুলোর দিকে নজর পড়ল তাঁর। হাতের মুঠিতে কাগজগুলোকে তুলে নিলেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন টুক্‌রোগুলোর দিকে; একমুঠি শেষ হলে, আরেক মুঠি। আর তারপর যখন বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কী ঘটেছে তখন তাঁর মুখটা হাঁ হয়ে গেল, দাড়ি কাঁপতে লাগল, এত জোরে নিশ্বাস ফেললেন যে উড়তে লাগল কাগজের টুক্‌রোগুলো।

'এ কী করেছিস তুই?' শেষ পর্যন্ত তাঁর গলা দিয়ে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। কথাটা বলেই তিনি আমার পা ধরে এক হ্যাঁচ্‌কা টান মারলেন। শূন্যে ডিগ্‌বাজি খেয়ে আমি পড়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু দিদিমা ধরে ফেললেন আমাকে।

'তোকে আমি খুন করব!' চেরা গলায় চিৎকার করতে করতে আমার ও দিদিমার দু'জনের মাথাতেই সমানে ঘুষি চালাতে লাগলেন দাদামশাই।

হঠাৎ আমার মা এসে হাজির হল। দেখলাম, আমি একটা কোণে দাঁড়িয়ে আছি আর মা রয়েছে ঠিক আমার সামনেটিতে।

দাদামশাইয়ের ঘুষিগুলোকে হাত দিয়ে ঠেকিয়ে মা চেঁচিয়ে উঠল, 'এসব কী পাগলামি হচ্ছে! মাথাটা একটু ঠান্ডা করো!'

জানলার পাশে বেঞ্চটিতে ধপ্ করে বসে পড়ে দাদামশাই কান্নার সুরে বলে উঠলেন, 'আমার সর্বনাশ হয়েছে! সবাই আমার শত্রু! বাড়িশুদ্ধ সবাই!'

মা'র চাপা গলার স্বর শোনা গেল, 'এমন হৈচৈ কান্ড বাধিয়ে তুলতে তোমার লজ্জা করে না!'

দাদামশাই একটা হুঙ্কার ছেড়ে লাথি ছুঁড়লেন। চোখদুটো শক্তভাবে বোজা, আর মুখের দাড়ি অতি অদ্ভুত ভঙ্গিতে সিলিং-এর দিকে উঁচিয়ে আছে। আমার মনে হতে লাগল, মা'র সামনে এমন একটা হৈচৈ কান্ড বাধিয়ে তোলবার জন্যে দাদামশাই বোধ হয় সত্যিই লজ্জিত আর সেজন্যেই চোখ বুজে আছেন।

পাঁজির কাগজগুলোকে হাত দিয়ে সমান করতে করতে মা বলল, 'এই টুকরোগুলো ক্যালিকোর ওপরে আঠা দিয়ে সেঁটে দেব'খন। তখন দেখো, পাঁজিটা আরো অনেক সুন্দর দেখাবে, আরো অনেক মজবুত হবে। এই দেখ না, কাগজগুলো তো এমনিতেই পুরানো হয়ে খসে খসে পড়ছে।'

পড়তে বসে আমি যদি কোনো একটা জিনিস না বুঝতে পারি তাহলে মা যেমনভাবে আমাকে সেটা বুঝিয়ে দেয় ঠিক তেমনিভাবেই এখন কথা বলছে মা। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন দাদামশাই, বেশ ভারিক্কী চালে জামা ও কোট সমান করে নিয়ে গলাটা কেশে পরিষ্কার করে বললেন:

'আচ্ছা বেশ, কিন্তু কাগজগুলো যেন আজকের মধ্যেই সাঁটা হয়। পাঁজির বাকি কাগজগুলো আমি এনে দিচ্ছি।'

দরজা দিয়ে বাইরে যেতে যেতে হঠাৎ চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'তবু ছেলেটাকে একবার আচ্ছা করে পিটুনি দেওয়া দরকার!' বলে বিকৃত আঙুল তুলে ধরলেন আমার দিকে।

'হ্যাঁ, তাই দরকার।' সায় দিল মা তারপর আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, তোর কি কান্ডজ্ঞান নেই?'

'আমি ইচ্ছে করেই একাজ করেছি। আর দাদামশাই যদি আবার কোনো

দিন দিদিমাকে মারে তাহলে আমি দাদামশাইয়ের দাড়ি কেটে ফেলব!'

দিদিমা গা থেকে ছেঁড়া ব্লাউজটা খুলে ফেলবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমার কথা শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে থু থু করে মনের বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'এই তোর কারও কাছে না বলা! এই তোর কথা রাখা! তোর জিভ ফুলে ঢোল হয়ে উঠুক, ওই জিভ নেড়ে কাউকে যেন আর কোনো দিন কোনো কথা না বলতে হয়!'

দিদিমার দিকে একবার তাকিয়ে মা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কবে মেরেছে রে?'

'হ্যাঁ রে ভারভারা, তুইও কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিস? ওকে জিজ্ঞেস করছিস এসব কথা? এতসব জেনে তোর কী দরকার বাপু!' ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন দিদিমা।

আবেগের সঙ্গে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মা বলে উঠল, 'মা আমার, মা-মণি আমার!'

'থাক্, থাক্, খুব হয়েছে! মা-মণি না আরো কিছু! ছাড়্, আমি যাই...'

দুজনে দুজনের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর দূরে সরে বসল। ওদিকে বাইরের ঘর থেকে দাদামশাইয়ের পায়চারির শব্দ ভেসে আসছে।

এখানে আসার প্রথম কয়েক দিন থেকেই ফৌজী লোকটির হাসি-খুশি বৌয়ের সঙ্গে মা'র খুব ভাব। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় মা এই বৌটির ঘরে যায়। বেৎলেংদের বাড়ির লোকেরাও সেখানে আসে — সুন্দর সুন্দর চেহারার তরুণী আর জোয়ান চেহারার অফিসার। আমার দাদামশাই এ-ব্যাপারটা খুব পছন্দ করেন না। প্রায়ই রাত্রিবেলা খেতে বসে হাতের চামচটা সেই বিশেষ ঘরের দিকে উঁচিয়ে নাড়তে নাড়তে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন:

'আবার সেই খাওয়াদাওয়া আর ফুর্তি শুরু হয়েছে. বাস, আজ রাত্রে ঘুমের দফা শেষ। চুলোয় যাক।'

কিছুদিন না যেতেই তিনি সমস্ত ভাড়াটেকে উঠে যেতে বললেন। ভাড়াটেরা চলে যেতেই দু-গাড়ি বোঝাই আজেবাজে আসবাব নিয়ে এলেন কোত্থেকে যেন। শূন্য কামরাগুলোতে আসবাব বোঝাই করে বড় তালা লাগিয়ে দিলেন দরজায়।

'দরকার নেই আমার এমন ভাড়াটে দিয়ে। এবার থেকে আমি নিজেই লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করব।'

তারপর থেকে প্রতি রবিবার এই নিমন্ত্রিতজনের আবির্ভাব হতে লাগল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন হচ্ছেন দিদিমার বোন মাত্রিওনা ইভানোভনা। এই হৈ-চৈ-করা ধোবানীর নাকটি প্রকান্ড, ডোরাকাটা সিল্কের পোশাক পরেন, সোনালী রঙের টুপি জড়ান মাথায়। তাঁর সঙ্গে আসে তাঁর দুই ছেলে। একজনের নাম ভাসিলি, নক্শা আঁকার কাজ করে, পরনে ছাইরঙা পোশাক আর লম্বা চুল — হাসিখুশি খোশমেজাজী ধরনের মানুষ। অপরজন ভিক্টর, ঘোড়ার মতো মাথা, বসন্তের দাগওলা লম্বাটে মুখ। সদরে ঢুকে যখন সে পায়ের জুতো থেকে রবারের ওভারশু খোলে তখনই শোনা যায় ক্লাউনের মতো পিন্‌পিনে গলায় সে একটা সুর ভাঁজছে:

'আন্দ্রেই-বাবা, আন্দ্রেই-বাবা...'

শুনে আমি অবাক ও আতঙ্কিত হই।

ইয়াকভ-মামা তার গীটার নিয়ে আসে। আর একজনও আসে তার সঙ্গে। ঘড়ি মেরামতের ব্যবসা লোকটির, টাক-মাথা, একচোখ কাণা। ভারি চুপচাপ লোকটি, পরনে লম্বা কালো কোটটার জন্যে তাকে মনে হয় যেন মঠের সন্ন্যাসী। ঘরের এক কোণে তার বাঁধা জায়গা; পরিষ্কার ভাবে কামানো চেরা চিবুকের ভর একটা আঙ্গুলের ওপর দিয়ে মাথাটা একদিকে কাত করে হাসিমুখে বসে থাকে সে। তার রংটা কালো, একচোখের তীব্র ও ধারালো দৃষ্টিতে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কথাবার্তা বলে খুবই কম আর একটি কথাই অনবরত তার মুখে শোনা যায়:

'সব ঠিক হয়ে যাবে — ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই...'

প্রথম দিন তাকে দেখে হঠাৎ আমার অনেক দিন আগেকার (তখনো আমরা নোভায়া স্ট্রীট থেকে উঠে আসিনি) একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একদিন শুনলাম রাস্তার দিকে ড্রাম বাজছে। সেই বাজনার মধ্যে যেন একটা অশুভ বার্তা প্রচ্ছন্ন ছিল। বাইরে এসে দেখলাম, প্রকান্ড একটা কালো গাড়ি ঘিরে একদল সৈন্য ও লোকজনের ভীড় চলেছে। কয়েদীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জেলখানা থেকে ময়দানে। গাড়ির ভিতরে বেঞ্চির ওপরে গোল টুপি মাথায় একটি লোক বসেছিল। দু-হাত ও পায়ে শেকলে বাঁধা, আর শরীরের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে সেই শেকল ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠছে। কালো একটা বোর্ড ঝুলছে তার গলা থেকে, বোর্ডটার ওপরে গোটা গোটা সাদা অক্ষরে কী যেন লেখা। লোকটির মাথা বুকের ওপরে এমনভাবে ঝুলে পড়েছে যেন সে পড়বার চেষ্টা করছে এই লেখাগুলো। ঘড়িওলাটির সঙ্গে আমার পরিচয়

কাঁরিয়ে দিয়ে মা যখন বলল, 'আমার ছেলে,' তখন শ‍ুনে পিঠের দিকে হাত ঢেকে ভয়ে আমি দ‍ু-পা পিছিয়ে এলাম।

একটা আতঙ্কজনক ভঙ্গিতে ম‍ুখের হাঁ-টা ডান কান পর্যন্ত প্রসারিত করে লোকটি বলল, 'ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।' তারপর আমার কোমরের বেল্ট ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে দক্ষ জহ‍ুরীর মতো পাকা হাতে আমাকে ঘ‍ুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

'নাঃ ঠিক আছে! ডাঁটো ছেলে!' তারিফের স‍ুরে এই মন্তব্য করে ছেড়ে দিল আমাকে।

আমি গিয়ে বসলাম একটা চামড়ার আর্মচেয়ারে। চেয়ারটা এত প্রকাণ্ড যে তার মধ্যে অনায়াসে ঘ‍ুমিয়ে থাকা যায়। দাদামশাই সব সময়েই জাঁক করে বলেন যে এটা নাকি প্রিন্স গ্র‍ুজিন্স্কির চেয়ার। কোণের সেই চেয়ারটাতে বসে বসে আমি দেখতে লাগলাম, একটুখানি ফুর্তি করবার জন্যে বড়োদের কী পরিমাণ চেষ্টাই না করতে হয়, আর সেই ঘড়িওলার অদ্ভুত ও সন্দিগ্ধ ম‍ুখের ভাব ম‍ুহ‍ূর্তে ম‍ুহ‍ূর্তে কি ভাবে বদ্‌লে যাচ্ছে। ম‍ুখটা তার তেলতেলে; থলথলে একটা জিনিস যেন গলে গলে পড়ছে। যখন সে হাসে তার প‍ুর‍ু ঠোঁটদ‍ুটো ডানদিকে সরে যায় আর ঝোলের মধ্যে মাংসের টুক্‌রোর মতো ছোট নাকটা টলটল করতে থাকে। কুলোর মতো প্রকাণ্ড কানদ‍ুটোও অদ্ভুতভাবে নড়ে। কখনো ওপরে ওঠে একচক্ষ‍ু ভুর‍ুটা উঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, কখনো পিছনে চলে আসে চোয়ালের হাড়ের দিকে। আমার মনে হতে লাগল, ইচ্ছে হলে ঠিক দ‍ুটো হাতের মতো এই কানদ‍ুটোকেও সে নাকের ওপর দিয়ে ভাঁজ করে রাখতে পারে। মাঝে মাঝে ম‍ুষলের মতো গোল গাঢ়রঙের জিভটা বার করে চক্রাকারে ঘ‍ুরিয়ে নিয়ে তেলতেলে প‍ুর‍ু ঠোঁটদ‍ুটো ভিজিয়ে নেয়। দেখেশ‍ুনে আমার যতোটা না মজা লাগতে লাগল তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম। এবং কিছ‍ুতেই লোকটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলাম না।

অতিথিরা রম্‌-সহযোগে চা খেল। পোড়া পেঁয়াজের মতো গন্ধ বেরোচ্ছিল পানীয়টা থেকে। দিদিমা বাড়িতে যে-সব মদ তৈরি করেছেন তাও খেল অতিথিরা। তার কোনোটা সোনালী, কোনোটা সব‍ুজ, আবার কোনোটা আলকাতরার মতো কালো। আহার্যের মধ্যে ছিল রসানো 'ভারেনেৎস্‌', মধ‍ু আর পোস্তদানা দিয়ে তৈরি কেক্‌। অতিথিরা ফুলতে লাগল, ঘামতে লাগল আর আমার দিদিমার স‍ুখ্যাতি করে চলল। তারপর এক পেট খেয়ে, ম‍ুখ

লাল করে প্রফুল্ল হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ইয়াকভ-মামাকে গান গেয়ে শোনাতে বলল অলসভাবে।

গীটারের ওপরে ঝুঁকে পড়ল ইয়াকভ-মামা, তারপর গীটারের টুং-টাং শব্দ তুলে বিরক্তিকর গলায় গাইতে শুরু করে দিল:

কী পরিপূর্ণ জীবন ছিলো হায়রে
অকারণ গোলমাল উন্মত্ততা তায়রে।
কাজান মেয়েকে সবাই আমরা দেখেছিলাম
সবাইকার সব কথাই তাকে বলেছিলাম।

আমার মনে হল ভারি বিষণ্ণ গান এটি। দিদিমা বললেন, 'অন্য একটা গান গাও ইয়াকভ। একটা সত্যিকারের গান। মত্রিয়া, তোর মনে আছে কত সব গান আমরা শুনতাম?'

ধোবানী বেশ ভারিক্কী চালে পোশাকের খসখসানি তুলে বললেন, 'বোন, সে-সব গান আর নেই। আজকাল গানের ধারাই পাল্‌টে গেছে।'

ইয়াকভ-মামা আধবোজা চোখে দিদিমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন দিদিমা অনেক দূরের কোনো মানুষ। কিন্তু তার গান থামেনি। গীটারের বিষণ্ণ টুং-টাং আর সেই বিশ্রী গানটা সমানে চলেছে।

দাদামশাই ঘড়িওলার সঙ্গে কী যেন আলাপ করছেন আর মাঝে মাঝে হাত নেড়ে দেখাচ্ছেন কী যেন। ঘড়িওলা ভুরু তুলে আমার মা'র দিকে তাকাচ্ছে আর একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে তার তল্‌তলে মুখের ওপর।

অন্যদিনের মতোই মা বসেছে সের্গেয়েভদের পাশে, চাপা ভারিক্কী গলায় কথা বলছে ভাসিলির সঙ্গে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাসিলি বলছে, 'হুঁম্‌! কথাটা ঠিকই বটে তবে ভেবে দেখতে হবে।'

ভরা-পেটের পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে ভিক্টর, মেঝের ওপরে পা ঘষছে আর হঠাৎ সরু সরু গলায় গান গাইতে শুরু করে দিল:

'আন্দ্রেই-বাবা, আন্দ্রেই-বাবা...'

এই গান শুনে সবাই কথা থামিয়ে অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে।

ব্যাপারটা গর্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বললেন ওর মা: 'এটা হচ্ছে থ্যাটরের গান। আজকাল থ্যাটরে এই রকমের গানই গাওয়া হয় কিনা!'

অসহ্য ক্লান্তির জন্যে স্মরণীয় এই ধরনের দুটি কি তিনটি সন্ধ্যা পার হতেই এক রবিবার দুপুরবেলা ঘড়িওলা এসে হাজির। রবিবারের পূর্বাহ্নকালীন উপাসনা তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। মা'র ঘরে আমি বসে আছি। পুঁতির কাজ করা পুরানো একটা এম্‌ব্রয়ডারি থেকে মা সুতো খুলছিল আর সে-কাজে তাকে আমি সাহায্য করছিলাম। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল আর খোলা দরজার ফাঁকে দিদিমার মুখটা একবার ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল আবার। আর সেই সময়টুকুর মধ্যেই উচ্চস্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করে তিনি বলে গেলেন:

'ভারিয়া, সে এসেছে!'

শুনে মা যেমনি বসেছিল তেমনি বসে রইল, তার মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন এল না। কিছুক্ষণ পরে দরজাটা আবার খুলে গেল আর খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাদামশাই গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন:

'ভারভারা, এক্ষুণি তৈরি হয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো!'

তাঁর মুখের দিকে না তাকিয়ে এবং তেমনি ভাবে বসে থেকেই মা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'এসোই না বলছি! ঈশ্বর তোমার সহায় হবেন! এই নিয়ে এখন আর তর্ক জুড়ে দিও না। সব দিক দিয়েই ভালো এই লোকটি, কাজেকর্মে চৌকস, আর লেক্সেইও সত্যিকারের বাপ পাবে...'

অস্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়ে দাদামশাই কথা বলছেন। কথা বলতে বলতে হাতদুটো আস্তে আস্তে বুলোচ্ছেন উরুর ওপরে। কনুই এমনভাবে কাঁপছে যে মনে হয়, হাতদুটো বারবার থাবা বাড়িয়ে আসতে চাইছে কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে সে ইচ্ছাকে সংযত করেছেন।

শান্ত স্বরে মা বলল, 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, এ হবার নয়।'

দু-হাত অন্ধের মতো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দুম্‌ দুম্‌ করে পা ফেলে দাদামশাই এগিয়ে এলেন মা'র দিকে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠলেন:

'আসবি তো আয়! নইলে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাব!'

'টানতে টানতে নিয়ে যাবে?' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মা বলল। তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে, হিংস্র দৃষ্টিতে কুটিল হয়ে উঠেছে চোখদুটো। ফর্‌ ফর্‌ করে টেনে গা থেকে স্কার্ট আর ব্লাউজ খুলে ফেলল মা; শুধু একটা

পেটিকোট ছাড়া আর কিছু পরনে নেই — এমনি অবস্থায় দাদামশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলল:

'এসো এবার! টানতে টানতে নিয়ে যাও আমাকে!'

দাঁত কড়মড় করে ঘুষি পাকিয়ে দাদামশাই বললেন, 'ভালো হচ্ছে না ভারভারা, শীগ্‌গির জামাকাপড় পরে নে!'

দাদামশাইকে ঠেলে সরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মা, চিৎকার করে বলল:

'কই, আসছ না যে? চলো।'

দাদামশাই ফুঁসে উঠলেন, 'তোর সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না!'

'আমি ভয় পাই না। কই, চলো!'

মা দরজা খুলল। মা'র পেটিকোটের একটা প্রান্ত চেপে ধরে দাদামশাই হাঁটু মুড়ে বসে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে উঠলেন:

'ভারভারা, ওরে শয়তানী! তোর সর্বনাশ হবে বলে দিচ্ছি! আমার মুখে এভাবে চুনকালি দিস্‌নে! গিন্নি! গিন্নি!'

দিদিমা আগেই এসে মা'র পথ আটকিয়েছিলেন। মুরগীর মতো মাকে তাড়া দিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে আনতে বিড়বিড় করে বললেন:

'তোর কি বুদ্ধিলোপ হয়েছে, ভারভারা! হতভাগী, লজ্জাশরম বলেও কি কিছু নেই!'

মা'কে ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে এনে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিলেন দিদিমা। তারপর ফিরে দাঁড়ালেন দাদামশাইয়ের দিকে। একহাতে মেঝে থেকে টেনে তুললেন দাদামশাইকে, অপর হাত শাসানির ভঙ্গিতে তাঁর সামনে নাড়তে লাগলেন।

'বুড়ো শয়তান! ভীমরতি ধরেছে!'

দাদামশাইকে ধরে ডিভানের ওপরে বসিয়ে দিলেন দিদিমা। ন্যাকড়ার পুতুলের মতো ঝুলঝুল করতে লাগল দাদামশাইয়ের মাথাটা, মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

মা'র দিকে তাকিয়ে দিদিমা ধমক দিলেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি। জামাকাপড় পর না!'

স্কার্ট আর ব্লাউজ কুড়িয়ে নিতে নিতে মা বলল, 'আমি কিন্তু ওই লোকের কাছে যাব না তা আগে থেকেই বলে রাখছি।'

আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে দিদিমা বললেন, 'যা তো, একটা পাত্র করে খানিকটা জল নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি যা!'

চাপা স্বরে দিদিমা কথা বলছেন। শান্ত ও আদেশব্যঞ্জক গলার স্বর। এক ছুটে আমি বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। সেখান থেকে শুনতে পেলাম, সামনের দিককার ঘরে কে যেন আস্তে আস্তে পায়চারি করছে।

শুনতে পেলাম মা বলছে, 'আমি কালই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব!'

স্বপ্নচালিতের মতো রান্নাঘরে গিয়ে জানলার কাছে বসলাম আমি।

দাদামশাইয়ের হাঁকডাক চিৎকার শোনা যাচ্ছে। দিদিমা ফিস্‌ফিস্ করে কী যেন বলে চলেছেন। একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল। তারপরেই চারিদিক নিস্তব্ধ আর থম্‌থমে। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমাকে কী জন্যে পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাত্রে জল নিয়ে আমি বাইরের ঘরে এলাম। এবার দেখা গেল, বাড়ির সামনের দিক থেকে ঘড়িওলা বেরিয়ে আসছে, ফারের টুপিটায় টোকা দিতে দিতে কাতরাচ্ছে ভাঙা গলায়। ঘড়িওলার পিছনে পিছনে আসছেন আমার দিদিমা। হাতদুটো পেটের ওপরে আড়াআড়ি করে রেখে মাথা নুইয়ে শান্ত স্বরে তিনি বলছেন:

'ব্যাপারটা আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন তো! কাউকে তো আর জোরজবরদস্তি করে অপরকে ভালো লাগানো যায় না!'

হোঁচট খেতে খেতে ঘড়িওলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠোনে চলে গেল। দিদিমা সেই জায়গায় দাঁড়িয়েই বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন। তাঁর সারা শরীরটা কাঁপছিল। তিনি হাসছিলেন না কাঁদছিলেন তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না।

দিদিমার দিকে ছুটে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?'

এক ঝটকায় জলের পাত্রটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, খানিকটা জল চল্‌কে ফেলে আমার পা ভিজিয়ে দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন:

'জল আনতে কোন্ রাজ্যে গিয়েছিলি তুই? দরজা বন্ধ করে দে!'

দিদিমা আমার মা'র ঘরে ফিরে গেলেন, আমি আবার এলাম রান্নাঘরে। মা'র ঘর থেকে গোঙানি, দীর্ঘনিশ্বাস আর অস্ফুট কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসতে লাগল; যেন ঘরের লোকগুলো কোনো সাধ্যাতীত ভারি জিনিস ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

দিনটি ভারি চমৎকার। শীতকালের রোদ দীর্ঘ রেখায় জানলাদুটির তুষারঢাকা শার্সির ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। টেবিলে বৈকালিক

আহার্য সাজানো। সীসার মেশাল দেওয়া টিনের তৈরি ডিশ আর কাঁচের পাত্র ঝক্‌ঝক্‌ করছে। কাঁচের পাত্রগুলোতে রয়েছে সোনালীরঙের 'ক্‌ভাস' পানীয় আর দাদামশাইয়ের নিজের হাতে তৈরি মেঠো ফুলের সুগন্ধিযুক্ত সবুজরঙের ভদ্‌কা। জানলার শার্সিতে এক জায়গায় তুষার গলে গিয়েছিল, সেই ফাঁক দিয়ে আমি দেখলাম, বাড়ির ছাদগুলোতে চোখঝলসানো বরফ জমেছে, চক্‌চকে রুপোলী টোপর মাথায় বেড়ার খুঁটি ও পাখির বাসাটি। জানলার খিলান থেকে ঝোলানো খাঁচার মধ্যে রয়েছে আমার ধরা সব পাখি; প্রচুর সূর্যের আলো এসে পড়েছে খাঁচাগুলোর ওপর। মনের আনন্দে কিচিমিচির করছে চেফিঞ্চ্‌ পাখিগুলো, বুল্‌ফিঞ্চের দল হুটোপাটি লাগিয়েছে, গান গাইছে গোল্‌ড্‌ফিঞ্চ্‌রা। কিন্তু এই রুপোলী দিনের সুর ও উজ্জ্বলতা আমাকে কোনো আনন্দই দিতে পারছে না। একটা না-চাওয়া দিন। সব কিছুই না-চাওয়া। ইচ্ছে হচ্ছে, খাঁচা খুলে পাখিগুলোকে মুক্ত করে দিই। হয়তো দিতামও। খাঁচাগুলোকে নামাতে যাচ্ছি এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন দিদিমা। উরুতে চাপড় দিতে দিতে আর চিৎকার করতে করতে দিদিমা ছুটলেন চুল্লির দিকে।

'মরণও হয় না তোমাদের! হায়, হায়, আমার কি বুড়ো বয়সে বুদ্ধি নাশ হল গো!'

বলতে বলতে চুল্লির ভিতর থেকে 'পিরোগ' টেনে বার করলেন তিনি। ওপরের পোড়া ছালটায় দু-তিনবার টোকা দিয়ে মুষড়ে পড়লেন একেবারে।

'ইস্‌, একেবারে শুকিয়ে গেছে! তোদের জ্বালায় কি ধীরেসুস্থে কিছু করবার জো আছে! রাক্ষুসে গুষ্টি, তোদের ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাক্‌ না, ভাসিয়ে নিয়ে যাক্‌ না বন্যায়! অমন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছিস কেন রে প্যাঁচা-মুখো! ভাঙা কল্‌সীর টুকরোর মতো তোদের সবকটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তবে আমার শান্তি!'

দিদিমা কাঁদতে শুরু করে দিলেন। উল্‌টেপাল্‌টে দেখছেন 'পিরোগ'-টাকে, পোড়া ছালটার ওপরে টোকা দিচ্ছেন, চোখের জলের বড়ো বড়ো ফোঁটায় ভিজিয়ে দিচ্ছেন খাদ্যবস্তুটিকে।

আমার মা ও দাদামশাই এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে। নষ্ট-হয়ে-যাওয়া 'পিরোগ'টা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দিদিমা। টেবিলের ডিশগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল।

'দেখ, জিনিসটার কী হাল্ হয়েছে! তোমাদের দোষেই তো হল এটা! উচ্ছন্নে যাও তোমরা!'

আমার মা'র মেজাজ এতক্ষণে শান্ত হয়েছে, মনটাও প্রফুল্ল। দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে মিষ্টি কথায় শান্ত করতে চেষ্টা করল। দাদামশাইকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তিনি খুব দমে গেছেন। চোখের ওপরে রোদ এসে পড়েছিল; ফোলা ফোলা চোখ পিটপিট করে, গলায় ন্যাপ্‌কিন জড়িয়ে বিড়বিড় করে বললেন তিনি:

'যাক গে, যা হবার হয়েছে! ভাল 'পিরোগ'ও তো আমরা আগে খেয়েছি। প্রভুর ধরনই এমনি! তাঁর স্বভাবটা হচ্ছে একটু কৃপণ—কয়েক বছরেরটা শোধ দেন একটি মুহূর্তে। আবার সুদের ধার ধারেন না! বোসো ভারিয়া... যা হবার হয়ে গেছে!'

দাদামশাই এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন তিনি কোনো একটা ব্যাপারে অভিভূত হয়েছেন। খেতে বসে সারাক্ষণ তিনি ঈশ্বরের কথা বললেন, বললেন অধার্মিক আহাব'এর কথা; আর বাপ হলে কত কিছু যে সহ্য করতে হয় ও কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় সে কথা। দিদিমা রেগে গিয়ে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'হয়েছে বাপু হয়েছে! এবারে বক্‌বক্ না করে খাওয়ার দিকে মন দাও তো!'

মা হাসছে, চক্‌চক্ করছে তার পরিষ্কার চোখদুটো।

আমাকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে মা জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, একটু আগে খুব ভয় পেয়েছিলি তো?'

আমি তখন যে খুব ভয় পেয়েছিলাম তা নয়। কিন্তু এখন আমার কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে। কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কী হয়েছে আমার।

রবিবারে যেমন হয়, তেমনি অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু খাওয়া হল। বিশ্বাস করা শক্ত যে আধ ঘণ্টা আগে এই লোকগুলো নিজেদের মধ্যে এত চোটপাট করছিল, প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল। মাত্র আধ ঘণ্টা আগেই এত কান্নাকাটি, রাগারাগি আর ফোঁসফোঁসানি — কিন্তু এখন আর কিচ্ছু নেই। আমি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এ-ধরনের ঘটনা এদের কাছে বিশেষ গুরুতর ঘটনা আর এর জন্যে এদের বিশেষ কোনো চেষ্টা করতে হয়। এদের স্বভাবই এই রকম—এই হয়তো ভয়ানক কান্নাকাটি, চোটপাট আবার পরের মুহূর্তেই কিছু নেই। কতবার যে এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে, দেখে দেখে আমি অভ্যস্ত

হয়ে উঠেছি। প্রথম দিকে এ-ধরনের ঘটনা আমার মনে দাগ কাটত, এখন আর কাটে না।

অনেক কাল পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, রুশদেশের তখনকার জীবনে এইটেই ছিল স্বাভাবিক। সেই জীবনে একদিকে ছিল চরম দারিদ্র্য, অন্যদিকে এতটুকু বৈচিত্র্যের অভাব—সুতরাং তারা এ-জীবনকে ভুলে থাকতে চাইত দুঃখের মধ্যে, শিশুর মতো পুতুলখেলার অভিনয় করে। নিজেদের দুর্ভাগ্য নিয়ে নিজেদের মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জা ছিল না।

জীবনে যদি কোন কিছু বৈচিত্র্য না থাকে তাহলে দুঃখকেও আশীর্বাদের মতো মনে হয়; ঘরে আগুন লাগলেও তা উপভোগের দৃশ্য হয়ে ওঠে; আঁচিল হচ্ছে ভাবলেশহীন মুখের শোভা...

এগার

এই ঘটনার পর থেকে আমার মা'র প্রতাপ বেড়ে গেল এবং আমার মা-ই হয়ে উঠল বাড়ির সর্বেসর্বা। দাদামশাই অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ ও নির্বিরোধী হয়ে গেলেন।

দাদামশাই বাড়ি থেকে এখন বিশেষ আর বেরোন না। ওপরের ঘরটিতে একা একা বসে তিনি একটি রহস্যজনক বই পড়েন। বইটির নাম 'আমার বাবার লেখা থেকে'। বইটি তিনি রাখেন সিন্দুকের মধ্যে তালাচাবি বন্ধ করে। বহুবার আমি দেখেছি, বইটি বার করার আগে তিনি ভালো করে হাত ধুয়ে নেন। বইটি ছোট এবং মোটা পাটকিলে রঙের চামড়া দিয়ে বাঁধানো। বইয়ের নীল্‌চে রঙের পরিচয়পত্রে অস্পষ্ট কালিতে এই কথাগুলো লেখা আছে:

'আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত পরমপূজনীয় ভাসিলি কাশিরিনকে'।

লেখাটির নিচে যে নামটি স্বাক্ষর করা আছে তা ভারি অদ্ভুত। স্বাক্ষরের শেষে যেন উড়ন্ত পাখির ছবি এঁকে খানিকটা অলংকরণ করা হয়েছে। দাদামশাই বইটাকে হাতে নিয়ে অতি সাবধানে চামড়ার বাঁধাই এক ভারি আবরণ খুলে চোখে আঁটেন রুপোর ফ্রেমের চশমা আর এই লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বহুক্ষণ ধরে নাকটা কোঁচকান চশমাটা ঠিক করে নেবার জন্যে। এই বইটির কথা আমি তাঁকে একাধিকবার জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু প্রত্যেকবারেই তিনি তদ্‌গতভাবে সেই একই জবাব দিয়েছেন:

'এখনো তোর জানবার সময় হয়নি। একটু সবুর কর—মরবার সময় আমি তোকে এই বইটা দিয়ে যাব। আর সেই সঙ্গে রেকুনের লোমের তৈরি আমার কোটটাও।'

মা'র সঙ্গে কথাবার্তা আজকাল তিনি কমিয়ে দিতে শুরু করেছেন। যেটুকু বলেন তাও অনেক নম্রভাবে। আবার মা যখন কোনো কিছু বলে তখন তিনি মন দিয়ে শোনেন আর অদ্ভুত সব ভঙ্গিতে পিওতর-কাকার মতো চোখ পিটপিট করে মা'র কথার জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করে বলেন:

'আচ্ছা, যা খুশি করো।'

তাঁর ট্রাঙ্কগুলো ভর্তি রয়েছে নানা রকমের দামী আর আশ্চর্য সব পোশাকে। সিল্কের সার্ট, সাটিনের জ্যাকেট, রেশমী রুপোখচিত সারাফান, কিকা ও কোকোশ্‌নিক*, উজ্জ্বল রঙের রুমাল ও স্কার্ফ, মর্দোভীয় হার এবং বিচিত্রবর্ণের পাথর ও পুঁতি। জিনিসগুলো তিনি মা'র ঘরে নিয়ে এসে টেবিল ও চেয়ারের ওপরে বিছিয়ে দিলেন। এই সূক্ষ্ম কারুকার্য করা জিনিসগুলোকে মা যখন প্রশংসা করতে লাগল, দাদামশাই বললেন:

'আজকাল লোকে কি আর এমন সাজপোশাক করে। আমাদের সময়ে সাজপোশাকের যেমন ঘটা ছিল তেমনি খুব দামী আর চমৎকার পোশাকও লোকে পরত। তবে সাজপোশাকের যতোই চটক থাকুক, মানুষগুলোর জীবন আরো অনেক সাদাসিধে ছিল। অনেক বেশি মিলেমিশে থাকতে পারত। সে-সব দিন আর ফিরে আসবে না! এগুলো তোর কাছেই রইল, খুশিমতো পরিস...'

একদিন মা কিছুক্ষণের জন্যে পাশের ঘরে উঠে গেল, তার পর ফিরে এল সোনালী কাজকরা গাঢ় নীল রঙের সারাফান আর মুক্তো-খচিত কিকা পরে। দাদামশাইয়ের সামনে এসে নীচু করে মাথা নুইয়ে বলল:

'মান্যবরের কি এই পোশাক পছন্দ হয়?'

দাদামশাইয়ের খুশি আর ধরে না: চোখেমুখে খুশি ফেটে পড়ছে। স্বপ্নচালিতের মতো মা'র চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে হাত-পা নেড়ে বিড়বিড় করে বলে চলেছেন:

'ওরে ভারভারা, তোর যদি অনেক টাকা থাকতো আর কাছাকাছি যদি থাকতো সজ্জন মানুষ।'

* সারাফান—লম্বা আস্তিনশূন্য পোশাক। কিকা ও কোকোশ্‌নিক—বিশেষ মস্তকাবরণ। — সম্পাঃ

বাড়ির সামনের দিককার ঘরদুটি মা নিজের থাকার জন্যে বেছে নিয়েছে। প্রায়ই অতিথি-আপ্যায়ন করে মা। অভ্যাগতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাদের দেখা যায় তারা হচ্ছে মাক্সিমোভ ভ্রাতৃ-যুগল। একজন পিওতর—প্রকান্ড শরীর ও সুন্দর চেহারার একজন অফিসার, মস্ত সোনালী দাড়ি আর নীল চোখ। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের টাকে থুতু ফেলবার জন্যে এই লোকটির সামনেই সেবার দাদামশাই আমাকে মেরেছিলেন। অপরজন ইয়েভগেনি; ফ্যাকাশে লম্বা চেহারা, সরু সরু লম্বা ঠ্যাঙ, ছুঁচলো আর ছোট কালো দাড়ি, চোখদুটো কুলের মতো; সোনালী বোতাম আর সরু সরু দুই কাঁধে সোনালী প্রতীক-চিহ্ন লাগানো সবুজরঙের পোশাক পরে থাকে সব সময়ে। মাথায় লম্বা লম্বা কোঁকড়ানো চুল; চুলগুলো উঁচু কপালটার ওপরে এসে পড়ে; মাথাটা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো সরিয়ে নেওয়া এবং মাতব্বরী চালে হাসা একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে তার। ভাঙা ভাঙা নীচু গলায় সব সময়েই কোনো একটি বিষয়ে মত প্রকাশ করে চলেছে, আর যাই বলুক না কেন, বক্তব্য শুরু করে অবধারিতভাবে এই কথাগুলো বলে:

'আমি যে-ভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছি তা হচ্ছে...'

আধ-বোজা চোখে মা এই লোকটির কথা শোনে আর কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রায় হেসে উঠে বলে:

'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয় আপনি এখনো একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন...'

'ঠিক কথা—একেবারে ছেলেমানুষ!' অফিসারটি হাঁটুতে চাপড় মেরে মা'র কথায় সায় জানায়।

বড়োদিনের ছুটিগুলো হৈ-হল্লা আমোদপ্রমোদের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় মা ও তার বন্ধুরা বাহারওলা সাজপোশাক পরে বেড়াতে যেত। দলেয় মধ্যে মা'র পোশাকই হত সবচেয়ে সুন্দর।

উচ্চস্বরে কথা বলতে বলতে এই দলটি গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই মনে হত, আমাদের বাড়িটা যেন মাটির অন্ধকারে ডুবে গেছে, চারদিকে থমথমে বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা আর কোথাও এতটুকু প্রাণের চিহ্ন নেই। বুড়ো হাঁসের মতো নিঃশব্দ সঞ্চারে ঘর থেকে ঘর ঘুরে বেড়িয়ে ঝাড়ামোছা করতেন দিদিমা আর টালির চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে পিঠ গরম করতে করতে দাদামশাই আপনমনে বিড়বিড় করে বলতেন:

'থাকুক... যে-ভাবে খুশি থাকুক ও... দেখিয়ে দেবে কী হবে...'

বড়োদিনের ছুটির পর আমাকে আর মিখাইল-মামার ছেলে সাশাকে স্কুলে ভর্তি করে দিল মা। সাশার বাবা আরেকবার বিয়ে করেছে এবং সাশার সৎ-মা প্রথম দিন থেকেই সাশাকে একেবারে দেখতে পারে না। ছেলেটাকে তার সৎ-মা এমন মার মারত যে দাদামশাইকে বলে-কয়ে দিদিমা ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। মাসখানেক আমরা দুজনে একসঙ্গে স্কুলে যাই। এই একমাস স্কুলে গিয়ে যেটুকু শিক্ষা আমার হয়েছে তার মধ্যে একটা জিনিস আমার মনে আছে। তা হচ্ছে এই: আমাকে যদি আমার নাম জিজ্ঞেস করা হয় আর আমি যদি জবাব দিই — 'পেশ্‌কভ' — তাহলে জবাবটা ঠিক হবে না। বলতে হবে — 'আমার নাম পেশ্‌কভ'। আর মাস্টারমশাইকে একথাও কিছুতেই বলা চলবে না — 'আমার ওপর অমন চোটপাট করিস না ভাই। আমি তোকে ভয় করিনে...'

স্কুলকে আমি প্রথম দিন থেকেই অপছন্দ করি। ওদিকে আমার মামাতো ভাই ঠিক উলটো। তার কিন্তু গোড়া থেকেই স্কুল ভালো লেগেছে, আর বন্ধুত্বও হয়েছে অনেকের সঙ্গে। কিন্তু একদিন হল কি, ক্লাশের পড়ার সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চিৎকার করে ওঠে — 'না, কক্ষণো না!' তারপর জেগে উঠে মাস্টারমশাইয়ের অনুমতি নিয়ে ক্লাশ ছেড়ে চলে যায়। এই ব্যাপারটা নিয়ে অন্য ছেলেরা তার পিছনে লেগে লেগে তাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে তোলে।

পরদিন সেন্নায়া স্কোয়ারের সামনে নালাটার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বলল:

'তুই একাই যা, আমি আজ আর স্কুলে যাব না। আমি বরং একটু টহল দিয়ে আসি।'

নিচু হয়ে বরফের মধ্যে বইগুলোকে চাপা দিয়ে সে চলে গেল। জানুয়ারি মাসের উজ্জ্বল দিন, ঝকঝকে সূর্যের আলোয় সারা পৃথিবী হাসছে। মামাতো-ভাইকে আমার হিংসে হতে লাগল। কিন্তু মা'র কথা ভেবে নিজের ইচ্ছাকে চাপা দিয়ে স্কুলে গেলাম। সাশা যে বইগুলোকে বরফ চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিল সেগুলো চুরি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল এবং তাই হল। সুতরাং পরদিনও সে স্কুলে গেল না — বই-খাতা খুইয়ে বসে সেদিন আর স্কুলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তৃতীয় দিন সাশার এই স্কুল-পালানোর ব্যাপারটা দাদামশাই টের পেয়ে গেলেন।

আমাদের দুজনকেই ডাকা হল বিচারসভায়। আমাদের জেরা করবার

জন্যে রান্নাঘরের টেবিলের পিছনে সারি দিয়ে বসলেন দাদামশাই, দিদিমা ও মা। দাদামশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে সাশা যে-সব মজার মজার জবাব দিয়েছিল তা এখনো আমার মনে আছে।

'ব্যাপারটা কি যে তুমি বাড়ি থেকে রওনা হয়ে স্কুলে আর পেঁছতে পারলে না?'

ভীরু দুই চোখ তুলে সোজাসুজি দাদামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সাশা জবাব দিল, 'স্কুলের রাস্তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

'ভুলে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। কত আঁতিপাঁতি খুঁজলাম...'

'তা লেক্সেইয়ের সঙ্গে সঙ্গে গেলেই তো পারতে। লেক্সেই তো আর ভোলেনি।'

'সেই যে কোথায় হারিয়ে গেল তা বুঝতে পারলাম না।'

'লেক্সেই হারিয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'কী করে হারাল?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সাশা বলল, 'আমি যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিলাম না—সে কী ভয়ানক তুষারঝড় উঠেছিল!'

তুষারঝড়ের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল কারণ সেটা ছিল রোদ-ঝক্ঝকে পরিষ্কার দিন। সাশা নিজেও একটু মুচ্কি হাসল। দাদামশাই দাঁত বার করে উপহাসের স্বরে বললেন:

'তা, তুমি তো লেক্সেইয়ের হাত বা কোমরের বেল্ট শক্তভাবে চেপে ধরতে পারতে?'

'আমি তো চেপে ধরেছিলাম। কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল।'

ধীরে ধীরে হতাশভাবে কথার পিঠে কথা বলে যাচ্ছে সে। এই নিষ্ফল ও এলোমেলো মিথ্যে কথা শুনে আমি নিজেও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম এবং সাশার এই গোঁয়ার্তুমির অর্থ বুঝে উঠতে পারলাম না।

সেদিন আমরা দু'জনেই মার খেলাম। দমকলের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে রাখা হল আমাদের দু'জনকে স্কুলে পেঁছে দিয়ে আসবার জন্যে। লোকটার একটা হাত মুচড়ে ভেঙে গেছে। বিশেষ করে তাকে সাশার ওপরে নজর রাখতে বলা হল; সাশা যেন কিছুতেই জ্ঞানের পথ থেকে বিচ্যুত

না হয়। কিন্তু এসব ব্যবস্থা ব্যর্থ হল। পরদিন স্কুলে যাবার পথে স্কোয়ারের সামনে নালাটার কাছাকাছি আসতেই আমার মামাতো-ভাই করল কি, পায়ের জুতোজোড়া খুলে নিয়ে একপাটি ছুঁড়ে ফেলল ডানদিকে, আর একপাটি বাঁদিকে। তারপর মোজা পায়ে চোঁচা ছুট্ দিল স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে। কাণ্ড দেখে সেই বুড়ো লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর জুতোজোড়া খুঁজেপেতে কুড়িয়ে নিয়ে এল। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে স্কুলের দিকে আর না গিয়ে আমাকে নিয়ে সোজা ফিরে এল বাড়িতে।

তারপর সারাদিন ধরে দাদামশাই, দিদিমা ও মা সারা শহরে পলাতক আসামীকে খুঁজে বেড়ালেন। সন্ধ্যার দিকে মঠের কাছে চিরকোভের শুঁড়িখানায় পাওয়া গেল তাকে: সেখানে সে ক্রেতাদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচছিল। এবার সে একেবারে মুখ বুজে রইল এবং ব্যাপার-স্যাপার দেখে সবাই এমন থ' হয়ে গিয়েছিল যে তাকে উত্তম-মধ্যম দেবার কথাও কারও মনে হয় না। তাকে আমার পাশে শুয়ে ছাদে লাথি ছুঁড়তে ছুঁড়তে শান্ত স্বরে সে বলল:

'আমার সৎ-মা আমাকে ভালোবাসে না, আমার বাবা আমাকে ভালোবাসে না, আমার ঠাকুর্দা আমাকে ভালোবাসে না। যারা আমাকে ভালোবাসে না তাদের সঙ্গে আমি কেন থাকতে যাব? ঠাকুমার কাছ থেকে আমি জেনে নেব কোথায় গেলে ডাকাতদলের দেখা পাওয়া যায়, তারপর বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যাব তাদের কাছে। তখন আমার কথা ভেবে তোদের কষ্ট হবে দেখিস! আচ্ছা চল্ না দু'জনে একসঙ্গে যাই—যাবি?'

কিন্তু আমার পক্ষে তার সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সে-সময়ে আমার জীবনের অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল—তা হচ্ছে, মস্ত এক সোনালী দাড়িওলা অফিসার হওয়া, কিন্তু তার জন্যে পড়াশুনো করা দরকার। মামাতো-ভাইকে আমার পরিকল্পনাব কথা বলতেই সে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে আমার কথায় সায় জানাল:

'আচ্ছা ঠিক আছে। তুই হবি অফিসার আর আমি হব ডাকাতদলের সর্দার। তারপর তুই আসবি আমাকে ধরতে। তারপর হয় তুই মরবি, না হয় আমি মরব। কিংবা, হয় তুই ধরা পড়বি, না হয় আমি ধরা পড়ব। আমি কিন্তু কিছুতেই তোকে খুন করব না।'

'আমিও তোকে খুন করব না।'

এইভাবে মতের মিল হবার পর আমাদের আলোচনা শেষ হল।

দিদিমা ঘরে ঢুকলেন; চুল্লির ওপরের তাকে আমাদের বিছানায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে কথা বলতে লাগলেন আমাদের সঙ্গে।

'কুটুর কুটুর মাণিকরা আমার! বাপমায়ের আদর-ছাড়া দস্যি ছেলেরা আমার!..'

আমাদের জন্যে গভীর দরদে ভরা দিদিমার মন। সেই মন নিয়েই তিনি সাশার সৎ-মাকে নিন্দে করতে লাগলেন; এক শুঁড়িখানার মালিকের মেয়ে মোটা নাদেজ্‌দা-মামী হচ্ছে সাশার সৎ-মা। সাশার সৎ-মাকে নিন্দে করতে গিয়ে তিনি পৃথিবীর সমস্ত সৎ-মা ও সৎ-বাপকেই নিন্দে করতে শুরু করলেন এবং এই প্রসঙ্গে কথায় কথায় বললেন জ্ঞানী-ঋষি আয়োনের গল্প। আয়োন তখন ছেলেমানুষ, কিন্তু তখনই তিনি নিজের সৎ-মার ওপরে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের দণ্ড নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। আয়োনের বাপ ছিল সাদা হ্রদের জেলে; আর তার ছিল এক দজ্জাল বৌ। তাকে টেনে এনেছিল সর্বনাশের পথে।

একদিন তাকে ছলাকলায় ভুলিয়ে খাওয়াল মদ — মদের নেশায় বেহুঁশ করে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াল।

ওক্‌কাঠের তৈরি এক ডিঙ্গির মধ্যে — কফিনের মতো সরু আর অন্ধকার এক ডিঙ্গির মধ্যে — তুলে নিল অচেতন শরীরটাকে। মেপ্‌লকাঠের দাঁড় টেনে নৌকো বেয়ে চলল নিজেই। চলল যেখানে জল ফুঁসছে আর অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে এক লজ্জাহীনার দুষ্কৃতির প্রতীক্ষায়।

ডিঙ্গি থেকে ঝুঁকে পড়ে, ডিঙ্গিকে টলিয়ে দিয়ে, নড়িয়ে দিয়ে, উল্‌টিয়ে দিল একেবারে। কেউ সাক্ষী রইল না। হ্রদের অতল গভীরে ভারি পাথরের মতো তলিয়ে গেল তার স্বামী।

তারপর জল সাঁতরে ফিরে এল সর্বনাশী। মাটিতে আছড়ে পড়ে, বুক চাপড়ে, মৃত স্বামীর নাম স্মরণ করে, শুরু করল মড়া-কান্না। যে স্বামীকে সে নিজেই খুন করেছে তারই জন্যে মায়াকান্না!

গাঁয়ের লোকেরা সবাই তার দুঃখে দুঃখপ্রকাশ করল। তার বিধবার বেশ দেখে, তার চরম দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে, চোখের জল ফেলল একই সঙ্গে। এত অল্প বয়সেই যে মেয়েকে বিধবা হতে হল, এক আশাভরসাহীন অন্ধকার জীবন যার ভবিতব্য — তাকে সান্ত্বনা দিল এই বলে যে, ঈশ্বরের বিধান অমোঘ ও দুর্লঙ্ঘ্য, মানুষের জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন।

কিন্তু সেই দলের মধ্যে একজন মাত্র ছিল — তার সতীনের ছেলে আয়োনুশ্‌কা -- যে তার সৎ-মার মায়াকান্নাকে বিশ্বাস করেনি। সৎ-মার বুকের ওপরে হাত রেখে ধীর স্বরে বলতে লাগল তাকে:

তোমাকে বিশ্বাস করি না, কুচক্রী নারী তুমি, রাত্রিচর সুখোন্মত্ত পাখি, বিশ্বাসঘাতিনী। তোমার ওই অজস্র মায়াকান্না টলাতে পারবে না আমাকে। বাইরে তোমার যতোই কান্না থাকুক, বুকের ভিতরটা আনন্দে উছলে উছলে উঠছে। এসো তবে ঈশ্বরের বিচার প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের দণ্ড আসুক নেমে। যে কেউ একজন একটা ধারালো ছুরি আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিক্। যদি আমি অপরাধী হই ছুরি বিঁধবে আমার বুকে। যদি তুমি অপরাধী হও ছুরি বিঁধবে তোমার বুকে।

একথা শুনে সৎ-মা ধীরে মুখ ফেরাল। ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। জ্বলে উঠেছে তার চোখদুটি। ঘৃণা ঝরে পড়ছে তার মুখ থেকে। দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। শ্লেষ ও প্রতিহিংসায় তীব্র হয়ে উঠল গলার স্বর। বলল:

নির্বোধ না হলে এমন কথা কেউ বলে? শয়তানীর গর্ভে জন্ম তোমার — মায়ের গর্ভপাত। যে কথা মুখে আনাও পাপ — তাই বলে চলেছ তুমি। যে কথা মিথ্যে — তাই উগরে চলেছ। বলো কোন্ পাপ-চক্রান্ত করেছ তুমি?

যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল সেখানে — তারা শুনল এসব কথা।

শুনল যে ব্যাপারটা অমঙ্গলে ভরা।

নিঃশব্দে তাকাল পরস্পরের দিকে। বুকের ভিতরটা ভারি হয়ে উঠল সকলের। ফিসফিস করে আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে।

তারপর ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল একজন বুড়ো জেলে। প্রণাম করল সকলকে। অভিবাদন জানাল চেনা-পরিচিত জনকে। কথা বলল প্রত্যয়-নিষ্ঠ স্বরে:

এখানে সৎ মানুষ যারা আছে তাদের বলছি শোনো। সেই ধারালো ছুরি এনে দাও আমার কাছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো — ছুরিটা নিয়ে আমি ছুঁড়ব আকাশের দিকে। তারপর নেমে আসুক ছুরি পাপীর বুকে। খুন করুক তাকে।

এল ছুরি। বুড়ো জেলের হাতে তুলে দিল সবাই। একমাথা পাকা চুল ঝাঁকিয়ে ছুরিটাকে ছুঁড়ল সে আকাশের দিকে। ঘন নীল আকাশে পাখির মতো মিলিয়ে গেল ছুরিটা।

তারপর নিঃসীম গাঢ় নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষা করল তারা। অপেক্ষা করল — কখন ঘন নীল আকাশ থেকে ছুরিটা নেমে আসে। টুপি খুলে ফেলল মাথা থেকে, দাঁড়িয়ে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে।

নিঃশব্দে নামল রাত্রি।

হ্রদের ওপারে ফুটে উঠল ঊষার রক্তিমাভা।

তখন সৎ-মার উল্লাস দেখে কে! আহ্লাদে ডগমগ সে।

এমন সময় নীল আকাশ চিরে বাবুইপাখির মতো সহসা নেমে এল সেই ছুরি। তীরের মতো গিয়ে বিঁধল সৎ-মার বুকে।

তখন সেই ধার্মিক লোকেরা বসল হাঁটু মুড়ে। প্রাণের ভক্তি উজাড় করে প্রার্থনা করতে লাগল। জয় হোক্ ঈশ্বরের ন্যায়-বিধান!

তারপর সেই বৃদ্ধ এল আয়োনুশ্‌কার কাছে। নিয়ে গেল তাকে এক আশ্রমে।

অনেক দূরে কেরজেনেৎস নদীর ধারে সেই আশ্রম — অনেক দূরে যেখানে আছে রূপকথার শহর কিতেজ...*

পরদিন সকালে আমার যখন ঘুম ভাঙল তখন আমার সর্বাঙ্গে লাল লাল গুটি বেরিয়েছে। এটা ছিল বসন্তরোগের আক্রমণের সূচনা। বাড়ির পিছন দিকে চিলেকোঠার একটা ঘরে আমার জন্যে স্থান নির্দিষ্ট হল। বহুদিন আমাকে থাকতে হল সেই ঘরে। চোখ বন্ধ, হাতপায়ে চওড়া চওড়া ব্যান্ডেজ বাঁধা — এই অবস্থায় ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিন কাটল আমার। একদিন এক দুঃস্বপ্ন দেখে প্রায় মরতে বসেছিলাম আর কি। বাইরের লোকের মধ্যে শুধু দিদিমাই আসতেন, চামচ দিয়ে শিশুর মতো খাইয়ে দিতেন আমাকে। অজস্র গল্প রূপকথা বলতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় একটা কান্ড ঘটল; তখন আমি অনেকটা সেরে উঠেছি, আমার হাতপায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে—শুধু দুই হাতে দস্তানা পরিয়ে রাখা হয়েছে যাতে আমি মুখ চুলকোতে না পারি। সেদিন নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাবার পরেও দিদিমা এলেন না। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার মনে হতে লাগল, চিলেকোঠা থেকে নামবার সিঁড়ির মুখেই ধুলোভর্তি জায়গাটায় দিদিমা মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। দুই হাত দু-দিকে ছড়ানো আর ঘাড়ের কাছে প্রকাণ্ড একটা হাঁ-করা ক্ষতচিহ্ন—পিওতর-কাকার বেলায় যেমনটি দেখেছিলাম। আর ধুলো ও নোংরা কোণ থেকে প্রকান্ড একটা বেড়াল গুটি গুটি বেরিয়ে এসে মস্ত সবুজ চোখদুটো পাকিয়ে, লোভীর মতো কটকট করে তাকিয়ে আছে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পা ও কাঁধের গুঁতোয় দু-দিকে শার্সি দেওয়া জানলার কাঁচ আমি গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙে ফেললাম। বাইরের দিকে জানলার ঠিক নিচেই বরফ জমেছিল, ছিট্‌কে তারই মধ্যে এসে পড়লাম আমি। সেদিন সন্ধ্যায় আমার মা অতিথি-আপ্যায়নের কাজে ব্যস্ত ছিল, সেই সোরগোলে কেউ কাঁচভাঙার শব্দ শুনতে পেল না। এইভাবে সকলের অলক্ষ্যে বেশ কিছুক্ষণ আমি পড়ে রইলাম সেই বরফের মধ্যে। আমার হাড় ভাঙেনি, শুধু কাঁধের হাড় সরে গিয়েছিল আর সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল

* তামবোভ প্রদেশের বরিসগ্লেবস্ক জেলায় কলুপানোভকা গ্রামে থাকবার সময়ে *আমি এই গল্পটিরই রূপান্তর শুনেছি। রূপান্তরিত গল্পে ছেলে সৎ-মায়ের কুৎসা করছে আর ছুরিটা এসে খুন করছে ছেলেকে। — গোর্কি*

ভাঙা কাঁচে। কিন্তু আমার পা সাময়িকভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। তিনমাস আমি হাঁটতে পারিনি। নিজের ঘরটিতে চুপচাপ শুয়ে থেকে শুনতাম—বাড়ির মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র কলরব চলেছে, ঠাস-ঠাস শব্দে দরজা বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে, মানুষজন অনবরত যাতায়াত করছে।

ছাদের ওপর দিয়ে তুষারঝড় বয়ে যেত, গোঁ গোঁ শব্দে বাতাস আছড়ে পড়ত চিলেকোঠার ছাদে। চিমনির মধ্যে ভীত মড়াকান্নার মতো বাতাসের শোঁসানি, আগুনের চিম্‌নির খড়খড়িতে হত বাতাসের খট্‌ খট্‌ আওয়াজ। আর শুনতাম, দিনের বেলায় কাকের কা-কা ডাক, নিস্তব্ধ রাত্রিতে দূরের মাঠে নেকড়ের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার।

এই বিচিত্র ঐকতানের মধ্যে আমার আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ করল। তারপরেই কুণ্ঠিতপদে, নিঃশব্দসঞ্চারে এবং ক্রমবর্ধমান প্রগল্‌ভতার সঙ্গে এল বসন্ত। ঝল্‌মলে চোখ মেলে তাকাল আমার ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে। শুরু হল বেড়ালের চিৎকার আর ডাকাডাকি। দেওয়ালের ওপার থেকে ভেসে আসতে লাগল বসন্তদিনের নানা শব্দ: তুষারকণাগুলো সহসা গলে গিয়ে মাটিতে খসে খসে পড়ে, ছাদের ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে বরফ, আর ঘণ্টা বাজতে থাকে এমন একটা ভরাট আওয়াজ তুলে যা শীতকালে কখনো শোনা যায় না।

দিদিমা আসেন আমাকে দেখতে। আজকাল দিদিমার মুখ থেকে যখন-তখন ভদ্‌কার গন্ধ বেরোয় এবং সেই গন্ধের উগ্রতাও ক্রমশ বাড়ে। এমন কি, শেষ দিকে আমার ঘরে আসবার সময় তিনি প্রকাণ্ড একটা সাদা চায়ের পাত্রও নিয়ে আসতে শুরু করেছেন। পাত্রটাকে তিনি আমার বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখেন এবং আমাকে চোখ টিপে বলেন:

'সোনা আমার, মাণিক আমার, তোর ওই পিশাচ দাদামশাইকে যেন বলে দিস্‌নে!'

'দিদিমা, তুমি এত মদ খাও কেন?'

'চুপ, চুপ! বড়ো হলে তুই নিজেই বুঝতে পারবি, কেন খাই।'

তারপরেই তিনি চায়ের পাত্রের নলটা মুখে ঢুকিয়ে এক ঢোঁক গিলে নেন, জামার আস্তিন দিয়ে মুখ মোছেন, এবং প্রাণখোলা হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন:

'মাণিক আমার, সোনা আমার, বলো শুনি কাল তোমাকে কোন্‌ কথাটা বলছিলাম!'

'আমার বাবার কথা।'

'কোন্ পর্যন্ত বলেছিলাম?'

কোন্ পর্যন্ত বলা হয়েছে বলতেই গানের সুরের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মুখ থেকে কথা বেরিয়ে আসে।

একদিন ভারি ক্লান্ত ও মনমরা হয়ে এবং মদ না খেয়েই দিদিমা আমার ঘরে এসেছিলেন; সেদিন নিজের থেকেই বলতে শুরু করেছিলেন বাবার কথা।

'শোন্ দাদু, কাল রাত্রে তোর বাবাকে স্বপ্নে দেখেছি। হেজেলগাছের একটা ডাল হাতে নিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে তোর বাবা যেন হেঁটে যাচ্ছিল। জিভটাকে ঝুলিয়ে হ্যা-হ্যা করতে করতে একটা কুকুর ছুটছিল তার পিছনে। জানিস্ দাদু, আজকাল কেন জানি মাক্সিম সাভাতেয়েভিচকে আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখি — মনে হয় ওর আত্মা শান্তি পায়নি, এই আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে...'

তারপরেই পর-পর কয়েক সন্ধ্যা ধরে দিদিমা আমার কাছে বাবার গল্প করেছেন। দিদিমার মুখে শোনা অন্য সব গল্পের মতোই বাবার গল্পও সমান কৌতূহলোদ্দীপক। আমার বাবা ছিলেন এক সৈনিকের ছেলে। আমার ঠাকুর্দা সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করে পরে অফিসার হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের অপরাধে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। সাইবেরিয়ায় আমার বাবার জন্ম হয়। বাবার ছেলেবেলাটা ছিল খুবই কষ্টের এবং বাচ্চা বয়সেই তিনি বারকয়েক বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। একবার এমনি পালিয়ে যাবার পরে আমার ঠাকুর্দা শিকারী কুকুর নিয়ে ঠিক খরগোশ-খোঁজার মতো আমার বাবাকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। আরেকবার এমনি পালিয়ে যাবার পরে বাবাকে ধরে এনে ঠাকুর্দা এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগলেন যে পাড়াপড়শীরা এসে বাবাকে উদ্ধার করে এবং লুকিয়ে রেখে দেয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ছোটদের মারপিট করাটা সবকালেই ছিল, না দিদিমা?'

দিদিমা সহজভাবেই জবাব দিলেন, 'ছিল বৈকি।'

বাবার খুব ছোট বয়সে তার মা মারা গেছেন আর বাবার যখন নয় বছর বয়স তখন তার বাপ মারা যান। বাবার ধর্মবাপ পোষ্যপুত্র নেন বাবাকে। বাবার ধর্মবাপ ছিলেন ছুতোরমিস্ত্রী এবং বাবাকে তিনি পের্ম শহরের ছুতোরমিস্ত্রী-দলে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু আমার বাবা পালিয়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে। প্রথমে কিছুদিন তাঁর জীবিকা ছিল অন্ধদের হাত ধরে রাস্তায়-বাজারে পথ

দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া। তারপর ষোল বছর বয়সে তিনি এলেন নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদে। সেখানে কলচিনের স্টীমবোটে ছুতোরমিস্ত্রীর একটি কাজ পেলেন তিনি। বছর কুড়ি যখন তাঁর বয়স তখন তিনি নিজেই একজন পাকা ছুতোরমিস্ত্রী এবং কামরার আভ্যন্তরিক সাজসজ্জা-অভিজ্ঞ। যে কারখানায় তিনি কাজ করতেন সেটি ছিল কোভালিহা স্ট্রীটের আমার দাদামশাইয়ের বাড়ির ঠিক পাশেই।

দিদিমা হাসতে হাসতে বললেন, 'বেড়াটা ছিল খুবই নিচু আর এমন লোক আছে যারা বেড়ার আড়াল মানে না। ব্যাপার হল কী জানিস, একদিন ভারিয়া আর আমি বাগানে ঘুরে ঘুরে র‍্যাস্‌প্‌বেরি ফল তুলছি এমন সময় হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই ধুপ্‌ করে এক লাফ দিয়ে তোর বাবা বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে আমাদের বাগানের মধ্যে হাজির। আমি তো হতভম্ব! ওমা, মানুষটা দেখি আপেলগাছের ফাঁক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের দিকেই আসে! লম্বাচওড়া দৈত্যের মতো চেহারা, পরনে সাদা শার্ট ও ভেল্‌ভেটের ট্রাউজার। তবু খালি পা, খালি মাথা। চামড়ার একটা ফিতে দিয়ে মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মানুষটা কেন এসেছিল জানিস? তোর মা'কে বিয়ে করবার কথা বলতে! আগেও কয়েকবার ওকে জানলার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি। যতোবার চোখ পড়েছে, মনে মনে ভেবেছি—বাঃ, ভারি চমৎকার লোকটি কিন্তু! তারপর মানুষটা যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন বলি—বাপুহে, সোজা রাস্তায় না গিয়ে এমন বাঁকা রাস্তা ধরেছ কেন? — শুনে সে আমার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে বলে—"আকুলিনা ইভানোভনা, আমি তোমার পায়েই নিজেকে সঁপে দিচ্ছি। একবারটি মুখ তুলে তাকাও। একবার তাকিয়ে দেখো আমার দিকে আর ভারিয়ার দিকে। যীশু খ্রীষ্টের দোহাই, আমাদের দু'জনের যাতে বিয়ে হয় সেই ব্যবস্থা করো তুমি!" বোঝ্‌ একবার ব্যাপারটা। কথা বলব কি, থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওদিকে তাকিয়ে দেখি—মাগো মা, তোর মা হতচ্ছাড়ী একটা আপেলগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ইঙ্গিতে মানুষটাকে কি যেন বলছে। দু-চোখ টলটল করছে জলে আর মুখটা ঠিক র‍্যাস্‌পবেরি ফলের মতো টকটকে লাল। আমি বলি -- তোমাদের দু'জনেরই এখনো খুব কাঁচা বুদ্ধি — তাই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারনি। কিন্তু এ-ধরনের কিছু করার চেয়ে শুকিয়ে মরে যাওয়া ভালো। আর ভারভারা, তোকেও বলিহারি যাই, তুইও কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে খুইয়েছিস? আর শোনো

বাপু, তোমাকেও বলি, তুমি যে কত বড়ো গর্হিত কাজ করেছ তা বুঝতে পারছ না। তুমি কি তার সমান মর্যাদার লোক? — যে সময়ের কথা বলছি তখন তোর দাদামশাই রীতিমতো পয়সাওলা লোক। তখনো ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়নি, চার-চারটে বাড়ি ও অগাধ টাকাপয়সার মালিক সে এবং একজন গণ্যমান্য লোক। এই ঘটনার কিছুদিন আগেই সবাই মিলে তোর দাদামশাইকে জরি ও ফিতের কাজ করা টুপি আর উনিফর্ম উপহার দিয়েছিল। তোর দাদামশাই একটানা ন-বছর কারিগরদের প্রধান কর্মকর্তা থেকেছেন কিনা তাই। সে-সব কী দিনই গেছে—তোর দাদামশাইয়ের অহঙ্কার কি তখন! এই অবস্থায় আমি আর কী করি বল্? যেটুকু আমার না বললে চলে না তাই বলি ওদের। ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করছিল। আর ওরা দু'জনে এত মুষড়ে পড়েছিল যে ভারি করুণা হচ্ছিল ওদের দেখে। আমার কথা শুনে তোর বাবা দাঁড়িয়ে বলে — "ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে আমি যতোদূর জানি, তিনি কিছুতেই নিজের ইচ্ছায় তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। সুতরাং এই অবস্থায় ভারিয়াকে চুরি করে নিয়ে আমার পালিয়ে যেতেই হবে। আর পালিয়ে যাবার ব্যাপারেই আমরা দু'জনে তোমার সাহায্য চাই।" শোন্ একবার কথাটা! আমার নিজের মেয়েকে আমি চুরি করে পালিয়ে যেতে সাহায্য করব! মানুষটাকে আমি ভাগিয়ে দিতে চাইলাম—এমন কি হাত নাড়িয়ে শাসালাম — তবু সে সরে যায় না, বলে — "ইচ্ছা হয় তো তুমি ঢিল তুলে নিয়ে আমার গায়ে ছুঁড়ে মারতে পারো— কিন্তু এ-ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতেই হবে। তোমার সাহায্য না নিয়ে আমি এখান থেকে কিছুতেই নড়ব না।" এমন সময়ে ভারভারা এগিয়ে আসে, মানুষটার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে —"শোনো মা, আমরা অনেক দিন থেকেই স্বামী-স্ত্রী হয়ে আছি। বলতে গেলে গত মে মাস থেকে। এখন শুধু আমাদের বিয়েটা হওয়া দরকার।" কথাগুলো শুনে আমার একেবারে বসে পড়বার মতো অবস্থা। কী কাণ্ড, মাগো!'

হাসির দমকে দিদিমার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল। তারপর একটিপ নস্যি নিয়ে, চোখ থেকে জল মুছে, আরামের নিশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন:

'তুই এখনো খুবই ছোট, দু'জনে স্বামী-স্ত্রী হওয়া আর দু'জনের বিয়ে হওয়া—এ-দুটোর মধ্যে যে কি তফাৎ তা তুই এখনো বুঝতে পারবিনে। কিন্তু কোনো মেয়ের বিয়ে হবার আগেই যদি বাচ্চা হয় তবে তার চেয়ে কলঙ্ক আর

কিছু নেই। আমার এই কথাটা বড়ো হয়েও মনে রাখিস কিন্তু। কক্ষণো কোনো মেয়েকে লোভ দেখিয়ে এ-ধরনের বিপদের মধ্যে ফেলিসনে যেন। কোনো মেয়েকে এই ধরনের বিপদের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যাওয়া আর আইনের চোখে বাচ্চাকে জারজ হতে দেওয়া — এর চেয়ে বড়ো পাপ আর কিছু নেই। তাহলে আমার কথাটা মনে থাকবে তো? মনে রাখিস কিন্তু! স্ত্রীলোককে সব সময়ে দরদ ও প্রীতির চোখে দেখবি, স্ত্রীলোককে ভালোবাসবি সমস্ত মন দিয়ে, শুধু খানিকটা আমোদ করবার জন্যে নয়। আমার এই কথাগুলো ফেল্‌না মনে করিসনে যেন।'

কথাগুলো বলে দিদিমা কিছুক্ষণের জন্যে নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে চুপ করে রইলেন, তারপর এক সময়ে গা ঝাড়া দিয়ে এগিয়ে চললেন গল্পের সূত্র ধরে।

'শোন্‌ তারপর। আমি তো ব্যাপারটার কোনো কূলকিনারাই পেলাম না। মাক্সিমের মাথায় একটা চাটি মারলাম, ভারভারার চুলের ঝুঁটি ধরে টানলাম। কিন্তু ওসব করে তখন আর লাভ কি? তোর বাবাই বলে—"আমাদের মারধোর করে তো কোনো ফল হবে না।" তোর মাও তার প্রতিধ্বনি করে—"তার চেয়ে কিছু একটা উপায় ভাবা দরকার। মারধোরের সময় তো অনেক পড়ে আছে।" তখন আমি বলি—তা, টাকাপয়সা কিছু আছে তো? সে বলে—"ছিল। কিন্তু ভারিয়ার জন্যে একটা আংটি কিনে সব খরচ হয়ে গেছে।" তাহলে কি তোমার তিন রুব্‌লই ছিল? সে বলে—"তিন রুব্‌ল নয়। প্রায় একশো।" যে সময়ের কথা বলছি তখন জিনিসপত্রের দাম শস্তা, টাকাটাই ছিল মাগ্‌গি। তোর মা ও বাবার মুখের দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম। দু'জনেই একেবারে ছেলেমানুষ! দু'জনেই একেবারে বোকা! তোর মা বলে—"আংটিটা আমি মেঝের পাটাতনের তলায় রেখে দিয়েছি যাতে তোমার চোখে না পড়ে। আংটিটা বিক্রি করলেই তো টাকা আসে।" এমনি সব কথা। একেবারে ছেলেমানুষ—তাই মনে হচ্ছে না তোর? যাই হোক্‌, তিনজনে মিলে ঠিক করলাম যে সেই সপ্তাহের মধ্যেই বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে আর আমিই গিয়ে পাদ্‌রির সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিকঠাক করে আসব। কথাবার্তা হল বটে কিন্তু দু-চোখ ফেটে কান্না আসছিল আমার। তোর দাদামশাইয়ের ভয়ে বুকের ভিতরটা কাঁপছিল আর ধুকপুক করছিল। আর ভারভারারও ভয়ংকর অবস্থা। যাই হোক্‌, সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করলাম আমরা।

কিন্তু তোর বাবার একজন শত্রু ছিল—তোর দাদামশাইয়ের কারখানার এক সর্দার কারিগর। ভীষণ হিংসুটে লোকটা। অনেকদিন থেকেই লোকটা আমাদের ওপর চোখ রেখে সমস্ত ব্যাপারটাই টের পেয়েছিল। তারপর বিয়ের দিন তো এল। বুঝতেই পারছিস, আমার একমাত্র মেয়ে, সুতরাং আমার কাছে সবচেয়ে ভালো পোশাক যা কিছু ছিল তাই দিয়ে তাকে সাজালাম, তারপর হাত ধরে গেটের বাইরে নিয়ে এলাম তাকে। বাইরে রাস্তায় একটা ত্রয়কা অপেক্ষা করছিল; ভারভারা গিয়ে গাড়িতে ওঠে, মাক্সিম শিস দেয়—আর তারপরেই দু'জনকেই নিয়ে গাড়ি চলল। চোখের জল চাপতে চাপতে আমি তো বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই কার সঙ্গে দেখা হল জানিস? সেই শয়তানটার সঙ্গে। আমার কাছে এসে সে বলে — "আমার মনে কোনো বদ মতলবও নেই বা আমি কারও সুখের কাঁটাও হতে চাই না। আকুলিনা ইভানোভনা, আমার দাবি খুবই সামান্য, মাত্র পঞ্চাশটা রুব্‌ল আমাকে দিতে হবে। তাহলেই আমি আর কোনো বাদ সাধব না।" আমার হাতে তখন একটি টাকাও ছিল না। টাকার জন্যে আমার যেমন আকাংক্ষাও নেই, তেমনি টাকা হাতে থাকলেও জমিয়ে রাখতে পছন্দ করিনে। সুতরাং তার কথার জবাবে বোকার মতো আমি বলে বসি—আমার হাতে কিচ্ছু নেই, কাজেই তোমাকে আমি একটি পয়সাও দিতে পারব না। সে বলে—"তাহলে তুমি আমাকে কথা দাও যে পরে দেবে, তাহলেই হবে।" আমি বলি—কথা দেওয়া? কথা দিলেই বা কি, টাকা আসবে কোত্থেকে? সে বলে—"বড়োলোক স্বামীর পুঁজি থেকে পঞ্চাশটা রুব্‌ল সরিয়ে নেওয়া কি খুবই শক্ত কাজ?" আমি কী বোকা, আমার দরকার ছিল তার সঙ্গে কথা বলা, তাকে সেখানে থামানো, আর আমি তার বদলে তার মুখে থুথু ফেলে বাড়ি এসেছিলাম। কিন্তু আমার আগেই সে গিয়ে ঢুকল বাড়ির মধ্যে। তারপরেই সে কী হৈচৈ আর সোরগোল!'

দিদিমা চোখ বুজে রইলেন। অস্পষ্ট একটু হাসি তাঁর মুখের ওপরে খেলা করতে লাগল।

'সে দৃশ্য কল্পনা করে আজও আমার বুক কেঁপে ওঠে। সে যে কী এক এলোপাতাড়ি কাণ্ড! পাগলা বুনো জানোয়ারের মতো হুঙ্কার দিয়ে ওঠে তোর দাদামশাই। তার পক্ষে এ আঘাত সহ্য করা সত্যিই খুব কষ্টের ব্যাপার ছিল। কতদিন ভারভারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জাঁক করে বলেছে যে মস্ত এক উঁচু ঘরে মস্ত বড়োলোকের সঙ্গে ভারভারার বিয়ে দেবে। শেষকালে এই

কিনা সেই উঁচু ঘর, এই সেই বড়োলোক! তবে কি জানিস, যে যাই ভাবুক না কেন, পুণ্যময়ী মেরীমাতা যার সঙ্গে যার জোট বেঁধে রেখেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু হবার উপায় নেই, তারপর তোর দাদামশাই উঠোনময় দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল—যেন সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে। ডাকাডাকি করে জড়ো করল সবাইকে। ইয়াকভ, মিখাইল, কোচ্‌মান ক্লিম, আর সেই সারামুখে ফুটফুট দাগওলা সর্দারকারিগর লোকটা—সবাই এল তৈরি হয়ে। দেখলাম, দাদামশাইয়ের হাতে রয়েছে একটা লাঠি আর ভারি ওজন ঝোলানো চামড়ার ফিতে। মিখাইলের হাতে বন্দুক! আমাদের ঘোড়াগুলো ছিল খুবই ভালো আর তেজী, আমাদের গাড়িটাও ছিল খুব হাল্‌কা ধরনের। মনে মনে আমি ভাবি—ওরা নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবে। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে যায়; ভারভারার ভার রয়েছে যে দেবদূতের ওপর তাঁরই দয়াতে এই বুদ্ধি এসেছিল। আমি করলাম কি, একটা ছুরি নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম কেটে দিয়ে এলাম। আমার ধারণা ছিল, এইভাবে লাগাম কেটে দিলে জোয়াল চলতে চলতে ছিঁড়ে যাবে আর গাড়ি অচল হয়ে যাবে। আর শেষ পর্যন্ত হলও তাই। গাড়ির জোয়াল আল্‌গা হয়ে খসে পড়ল এবং এই দুর্ঘটনায় প্রায় মরতে বসেছিল তোর দাদামশাই, মিখাইল ও ক্লিম। কাজে কাজেই রাস্তায় তাদের অনেকটা দেরি হয়ে গেল। আর ভগবানের অশেষ দয়া, তাঁরা যখন শেষ পর্যন্ত গির্জায় পেঁাছল তার আগেই মাক্সিম ও ভারিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে।

আমাদের বাড়ির লোকরা অত সহজে ছাড়বে কেন। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাক্সিমের ওপর। কিন্তু মাক্সিমও কম যায় না, লম্বাচওড়া চেহারা তার, গায়ের জোরে খুব কম লোকেই তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে। মিখাইলকে সে ধাপের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়; পড়ে গিয়ে একটা হাত জখম হয় তার। আর ক্লিম তো একটা ঘুষি খেয়েই চিৎপটাং। ব্যাপার দেখে তোর দাদামশাই, ইয়াকভ আর সেই সর্দার-কারিগর ভয়েই আর কাছে এগোয় না।

কিন্তু মাক্সিম রাগলেও মাথা গরম করে না। রাগকে সে ঘেন্না করে। তোর দাদামশাইকে সে বলে—"তোমার হাতের ওই লাঠিটা রেখে দাও। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাকে যেটুকু দিয়েছেন তাই আমি নিয়েছি। এখন কোনো মানুষের সাধ্য নেই ঈশ্বরের এই দানকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। তোমার কাছ থেকেও আমি শুধু এইটুকুই চাইছি!" তারপর আমাদের বাড়ির লোকরা ফিরে আসে। গাড়িতে বসে তোর দাদামশাই চিৎকার করে বলে—"ভারভারা, জন্মের মতো বিদায় দিলাম

তোকে। তুই আর আমার মেয়ে বলে পরিচয় দিস্‌নে। আমি আর তোর মুখদর্শন করতে চাই না! তুই মরিস, বাঁচিস, আমার আর কিছু এসে যায় না তাতে!" বাড়ি ফিরে এসে তোর দাদামশাই আমাকে খুব একচোট গালাগালি দিল আর মারল কিন্তু আমি মাঝে মাঝে উঁ-আঁ করা ছাড়া মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করলাম। আমি জানতাম প্রথম চোটটা কেটে গেলেই সব শান্ত হয়ে যাবে এবং যা হবার তা হবেই। তারপর তোর দাদামশাই আমাকে শাসিয়ে রাখে—"শোনো, আকুলিনা, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার মেয়ের সঙ্গে এ-বাড়ির সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে গেছে একথাটি যেন কক্ষণো ভুলে যেও না। মনে করবে, তোমার কোনো মেয়ে নেই — এখানেও নেই, অন্য কোথাও নেই। বুঝেছ তো?" আমি তবু মনে মনে বলি—তোমার ওই লালচুলওলা মাথা নেড়ে যতোই বলো না কেন বাপু, আমি চিনি—রাগ পড়ে গেলে এসব কথা আর কিছু মনে থাকবে না।'

রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি দিদিমার গল্প শুনছিলাম। দিদিমার গল্পের কোনো কোনো অংশ শুনে আমি অবাক হয়েছি। আমার মা'র বিয়ে সম্পর্কে দাদামশাইয়ের মুখে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বর্ণনা শুনেছি আমি। দাদামশাই বলেছেন যে তিনি মা'র এই বিয়ের বিরোধী ছিলেন এবং বিয়ের পরে মা'কে আর নিজের বাড়িতে ঢুকতে দেননি। কিন্তু দাদামশাইয়ের বর্ণনা অনুসারে, মা'র বিয়ে এভাবে গোপনে হয়নি এবং বিয়েতে দাদামশাই নিজেও উপস্থিত ছিলেন। দিদিমাকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, মা'র বিয়ে সম্পর্কে দু'জনের দু-ধরনের বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টা সত্যি, কিন্তু আমার কেমন বাধো-বাধো ঠেকল। তাছাড়া দিদিমার বর্ণনাটাই আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে কারণ দিদিমার গল্পটাই অনেক বেশি চমকপ্রদ। দিদিমা গল্প বলেন দুলে দুলে যেন নৌকায় ভেসে; গল্পের যে-সব অংশ করুণ বা ভয়ঙ্কর সেই সব জায়গা বলবার সময় তাঁর শরীরের এই দুলুনি আরো বেড়ে যায়। একটা হাতে কি যেন তুলে ধরেছেন। চোখ বুজে থাকেন সব সময়েই, ঘন ভুরু দুটো কাঁপতে থাকে আর তাঁর গালে ফুটে ওঠে নিবিড় এক হাসির রেখা। জগতের সবকিছুর প্রতি তাঁর এক অন্ধ ক্ষমা আছে যা দেখে আমি প্রায়ই অভিভূত হই—কিন্তু একেক সময়ে ইচ্ছে হয়, দিদিমা যেন প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠেন।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। প্রথম সপ্তাহ দুয়েক আমি কোনো খোঁজখবরই পেলাম না, ভারিয়া আর মাক্সিম কোথায় আছে। তারপর ওরা বাচ্চা একটা

ছেলেকে দিয়ে আমাকে খবর পাঠাল। পরের শনিবার আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম যেন গির্জার সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগ দিতে চলেছি। কিন্তু তার বদলে সোজা গিয়ে হাজির হলাম ওদের বাড়িতে। অনেক দূরে চলে গেছে ওরা। সুয়েতিনস্কি স্ট্রীটের এক বাড়ির একটা অংশে থাকে। কারখানার কুলিমজুর এবং নানা ধরনের লোক রয়েছে এই বাড়িতে। নোংরা বাড়ি আর হৈ-হট্টগোল লেগেই আছে। কিন্তু ওদের দু'জনের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—দুটি বেড়ালছানার মতো মনের খুশিতে ঘড়ঘড় আওয়াজ করে একসঙ্গে খেলা করছে। আমি ওদের জন্যে কয়েকটা জিনিস এনেছিলাম—চা, চিনি, কিছু ফসলদানা, জ্যাম্, শুকনো ব্যাঙের ছাতা, আর কিছু টাকাপয়সা। টাকাপয়সা ঠিক কত তা আমার মনে নেই, তোর দাদামশাইয়ের থলে থেকে যা পেরেছি চুরি করে এনেছি। নিজের জন্যে যদি না হয় তাহলে আর চুরি করতে দোষ কি! কিন্তু তোর বাবা তো এসব জিনিস কিছুতেই নিতে চায় না, ক্ষুব্ধস্বরে বলে—"আমরা কি ভিখিরি নাকি?" ভারিয়াও স্বামীর সুরে সুর মেলায়—"মা, আপনি আবার এতসব জিনিস আনতে গেছেন কেন?" কিন্তু এসব বললে কি হবে, জিনিসগুলো আমি ঠিকই দিয়ে এসেছিলাম। মাক্সিমকে আমি বলি—হ্যাঁ রে বোকা, ভগবান সাক্ষী করে তুই আমাকে মা বলে মেনে নিয়েছিস না? আর এই বোকা মেয়েটা! তোকে বলি, তুই আমার পেটের মেয়ে নোস্? নিজেদের মা'কে অপমান করলে তোদের ভালো হবে—এ-শিক্ষা তোদের কোত্থেকে হয়েছে? পৃথিবীর মা'কে অপমান করলে স্বর্গের মা চোখের জল ফেলেন যে! আমার কথা শুনে মাক্সিম করে কী, দু-হাতে আমাকে জাপ্‌টে ধরে ঘরের মধ্যে নাচানাচি শুরু করে দেয়, এমন কি খানিকক্ষণ নাচে আমার সঙ্গে। ভাল্লুকের মতো জোর লোকটার গায়ে। আর ভারিয়ার তো যেন মাটিতে পা পড়ে না। স্বামীর দেমাকে ময়ূরের মতো পেখম তুলে হেঁটে বেড়ায়। তারপর এমন ভারিক্কী চালে নিজের "সংসারের" কথা বলতে শুরু করে যেন সত্যিকারের গিন্নী সে—শুনতে শুনতে আমার তো পেটে খিল ধরবার মতো অবস্থা! ওদিকে চায়ের সঙ্গে যে "ভাত্রুশ্‌কা"গুলি খেলাম, তা চিবোতে হলে মানুষ তো কোন্ ছার নেকড়ের দাঁতও ভেঙে যায়! আর ঘরেতৈরি পনির বলে যে-জিনিসটা দেওয়া হল তা ঠিক যেন বালি আর কাঁকরের মণ্ডা!

এইভাবেই কাটল অনেক দিন। তুই তখন মায়ের পেটে কিন্তু তবুও তোর দাদামশাই টুঁ শব্দটি করেন না। ভারি একগুঁয়ে এই বুড়ো পিশাচ! বুড়ো

টের পেত, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। কিন্তু এমন ভাব করত যেন কিছু জানে না। বাড়িতে ভারভারার নাম পর্যন্ত মুখে আনতে পারত না কেউ। কেউ মুখে আনতও না, আমিও না। কিন্তু আমি জানতাম, হাজার হলেও বাপের হৃদয় তো — একদিন না একদিন টলবেই। এবং টললও শেষ পর্যন্ত। একদিন রাত্রে প্রচণ্ড তুষারঝড় হচ্ছে, একপাল ভালুকের মতো জানলাগুলোকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চাইছে বাতাস, গোঁ গোঁ আর্তনাদ করছে চিমনিগুলো, নরকের শয়তানগুলো যেন নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর ওপরে—তোর দাদামশাই আর আমি পাশাপাশি শুয়ে আছি, কারও চোখে ঘুম নেই, হঠাৎ আমি বলে ফেলি — "কী ভয়ংকর রাত গো! গরীব মানুষগুলোর আজ বড়ো হেনস্তা। বিশেষ করে যাদের মনে শান্তি নেই, তাদের আরো কষ্ট!" আমার কথা শুনে তোর দাদামশাই আচমকা জিজ্ঞেস করে বসে — "ওরা কেমন আছে?" আমি বলি — ভালোই আছে। তোর দাদামশাই বলে — "চট্ করে যে জবাব দিলে, কাদের কথা জিজ্ঞেস করছি বলো তো?" আমাদের মেয়ে ভারভারা আর জামাই মাক্সিমের কথা। "কী করে বুঝলে যে ওদের কথাই জিজ্ঞেস করছি?" আমি বলি — হয়েছে গো, হয়েছে! আর কথা ঘুরোতে হবে না! এসব ভড়ং করে লাভ কি — এতে কারও কি শান্তি হচ্ছে? গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে তোর দাদামশাই বলে — "ও রে, শয়তানের দল! হুঁঃ, কী সব মানুষ!" তারপরে জিজ্ঞেস করে — "তা সেই গবেট্টার খবর কী? ওটা একেবারেই গবেট — না?" গবেট কাকে বলছে বুঝলি তো? তোর বাবাকে। আমি বলি — আসল গবেট কারা জান? যারা নিজেরা খেটে খায় না, অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকে। তোমার দুই ছেলে ইয়াকভ আর মিখাইলের কথা ভেবে দেখ তো! গবেট যদি বলতে হয় তো ওদেরই বলা উচিত। এ-বাড়িতে খেটে পয়সা আনছে কে? তুমি। আর ওরা কুটোটি নেড়েও তোমাকে সাহায্য করে না! আমার কথা শুনে তোর দাদামশাই যা মুখে আসে তাই বলে আমাকে গালাগালি করতে শুরু করে। বলে, আমি বোকা, আমি কুঁদুলে, আমি ডাইনী, আরো কত কি তা আমার মনে নেই। আমি একটিও কথা বলি না। তোর দাদামশাই বলে — "তোমাকেও বলিহারি! লোকটা কোত্থেকে এল, কী ধরনের লোক — কিছু জানা নেই, শোনা নেই, তবুও তার পেছনে কি করে তোমার সায় থাকে বুঝি না!" তবুও আমি চুপ করে থাকি। শেষকালে মনের সমস্ত ঝাল ঝেড়ে তোর দাদামশাই যখন শান্ত হয়, তখন আমি বলি — তুমি তো একবার গেলেও পার। নিজের চোখেই

দেখে আসতে পার, দু'জনে কেমন চমৎকারটি আছে। তোর দাদামশাই বলে — "বটে! ওদের অহঙ্কার তো কম নয় যে আমি যাব ওদের কাছে! কেন, ওরা আসতে পারে না?" বাস্, যেই না একথাটি বলা আমি তো একেবারে আনন্দে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করে দিই। আর তোর দাদামশাই আমার চুলের বিনুনিটা খুলতে শুরু করে — আমার চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে ভারি ভালোবাসত তোর দাদামশাই। আমার কান্না দেখে বলে — "হয়েছে গো হয়েছে! তুমি কি ভাব, আমার বুকটা পাথর দিয়ে তৈরি?" তখন তোর দাদামশাইয়ের মনটা খুবই ভালো ছিল রে। পরে এক সময়ে তার মাথায় ঢুকল যে তার মতো চালাক-চতুর আর কেউ নেই। তখন থেকেই তার মনটা ছোট হয়ে গেছে আর বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পেয়েছে।

তারপর আর কি, দু'জনে, অর্থাৎ তোর মা আর বাবা, একদিন এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। সেদিনটি ছিল "সর্বপাপক্ষয় রবিবার"। মস্ত মানুষ দু'জনেই — কী পরিচ্ছন্ন, কী শ্রীমন্ত! তোর দাদামশাইয়ের পাশে মাক্সিম যখন দাঁড়ায়, তোর দাদামশাই তার কাঁধের নিচে পড়ে থাকে। মাক্সিম বলে — "ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, মনে করো না আমি তোমার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক নেবার জন্যে এসেছি। সেই উদ্দেশ্যই আমার নেই। আমি এসেছি আমার সহধর্মিণীর পিতাকে শ্রদ্ধা জানাতে।" একথা শুনে তোর দাদামশাই খুব খুশি; হাসতে হাসতে বলে — "বটে! তোমার বজ্জাতিটা তো কম নয় দেখছি! ওসব চলবে না এখন! আর ওসব বাইরে বাইরে থাকাও নয়, আমার সঙ্গে এ বাড়িতে এসে থাকতে হবে।" ভুরু কুঁচকে মাক্সিম বলে — "ভারিয়া যা ঠিক করবে তাই হবে। আমার এ-বিষয়ে বলার কিছু নেই — ভারিয়ার ইচ্ছাই সব।" তখন শুরু হয়ে যায় তর্কাতর্কি — কিছুতেই দু'জনকে থামানো যায় না। আর তোর বাপও তেমনি, যতোই আমি চোখ টিপি, যতোই আমি টেবিলের নিচ দিয়ে পা দিয়ে ওর পা চেপে ধরি — সে গোঁ ধরে নিজের কথাই বলে চলে! তার চোখদুটো ছিল ভারি সুন্দর — পরিষ্কার আর খুসিতে ভরা দুটি চোখ; ঘন ভুরু। মাঝে মাঝে দু-চোখের ওপরে ভুরুদুটো টেনে নামিয়ে যখন তাকায়, তখন মুখটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। শুধু আমার কথাই শোনে তখন, আর কারও সাধ্য নেই সে-অবস্থায় তার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে। আমার নিজের পেটের ছেলেদের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসতাম ওকে। ও নিজেও সেকথা জানত আর আমাকেও তেমনি ভালোবাসত। দস্যুটা করত কী, আমাকে জড়িয়ে ধরে পাঁজাকোলা করে তুলে

নিত আর সেই অবস্থাতেই ঘরময় ঘুরত আর বলত — "তুমি হচ্ছ আমার সত্যিকারের মা — মাটি-মায়ের মতোই তুমি আমার মা! ভারভারাকে যতোটা না ভালোবাসি তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি তোমাকে!" দুষ্টুমিতে তোর মাও তখন কিছু কম যেত না। একথা শুনে মাক্সিমের দিকে ছুটে এসে সে রাগ দেখাত — "বটে! বটে! তোমার সাহস তো কম নয় হে কপি-কর্ণ, শালগমের ছা!" আর তারপরেই শুরু হত ঘরের মধ্যে একজনের পিছনে আরেকজনের ধাওয়া আর তিনজনের ছুটোছুটি। কী সব দিনই গেছে তখন, সোনা আমার, মাণিক আমার! আর নাচতে জানত বটে মাক্সিম! অমন নাচ আর কাউকে নাচতে দেখিনি। গানই বা জানত কত! কী চমৎকার সব গান — অন্ধ ভিখিরিদের কাছে শেখা কিনা, অন্ধ ভিখিরিরা যেমন গান গাইতে পারে তেমন আর কেউ পারে না।

তারপর, কী বলছিলাম। দু'জনে উঠে এল আমাদের বাড়ির বাগানের দিককার অংশে। সেখানেই একদিন ঠিক দুপুরবেলা তোর জন্ম হয়। দুপুরবেলা তোর বাবা খেতে আসে বাড়িতে। বাড়িতে এসে ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে তোর অভ্যর্থনা শুনে আহ্লাদে সে যে কী করবে ঠিক করতে পারে না। একেবারে অস্থির কান্ড! তোর মাও রেহাই পায় না। তোর মা'কে নিয়ে এমন রাখ্-রাখ্ ঢাক্-ঢাক্ শুরু করে দেয় যে মনে হতে থাকে, এ-জগতে বাচ্চা বিয়োবার মতো শক্ত কাজ আর কিছু নেই! তারপর আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হয় তোর দাদামশাইয়ের কাছে এবং তোর দাদামশাইকে বলে যে তার আরেকটি নাতি হয়েছে। কান্ড দেখে তোর দাদামশাইও না হেসে থাকতে পারে না, বলে — "তুমি তো আচ্ছা শয়তান হে মাক্সিম!"

কিন্তু তোর মামারা ওকে দেখতে পারত না। কারণ কী জানিস? ও মদ খায় না, ওর সঙ্গে কথায় কেউ এঁটে উঠতে পারে না, আর কত রকমের ফন্দিফিকির যে ওর মাথায় ঘোরে তার হদিস কেউ পায় না। এই ফন্দিফিকিরই ওর কাল হয়েছিল! একবার "লেণ্ট" উপবাসের সময় প্রচন্ড এক ঝোড়ো বাতাস উঠেছিল। হঠাৎ শোনা যায়, এক কানে-তালা-লাগানো অমানুষিক শিস্ দেওয়ার শব্দ উঠছে — গোটা বাড়িটা যেন কেঁপে ওঠে। সকলের সে কী ভয় আর আতঙ্ক! বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে বসেছিল। তোর দাদামশাই তো ছুটোছুটি লাগিয়ে দিলেন, আর্তস্বরে চিৎকার করে বললেন যে আইকনের নিচে সমস্ত আলো যেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আর সবাই যেন

প্রার্থনায় বসে। কিছুক্ষণ পরে, যেমন হঠাৎ শব্দটা উঠেছিল তেমনি হঠাৎ সব একেবারে চুপচাপ হয়ে যায়। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। এতে আগের চেয়েও আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল সকলে। তবে তোর ইয়াকভ-মামা কিন্তু ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল। সে বলল — "নিশ্চয়ই মাক্সিমের কাণ্ড এটা!" কথাটা মিথ্যে হয়নি। পরে মাক্সিমই আমাদের বলেছে, সেদিন সে চিলেকোঠার জানলায় এমনভাবে কতগুলো বোতল সাজিয়ে রেখেছিল যে বাতাসের ধাক্কায় বোতলগুলি থেকে শিস দেওয়ার মতো শব্দ হতে থাকে। শুনে তোর দাদামশাই মাক্সিমকে সাবধান করে দিয়ে বলে — "আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি মাক্সিম, বুঝেশুনে চলতে চেষ্টা কোরো, নইলে কোন্‌দিন এই ফন্দিফিকির করতে গিয়েই আবার না তোমাকে সাইবেরিয়ায় চালান হতে হয়!"

একবার এমন শীত পড়ল যে স্তেপ্‌অঞ্চল থেকে নেকড়েগুলো পর্যন্ত পালিয়ে আসে। তারপর থেকে এই নেকড়েগুলোর জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠে সবাই! কখনো কুকুর পাওয়া যায় না, কখনো ঘোড়া ভয় পায়, একবার দেখা যায় একজন মাতাল পাহারাওলার আধ-খাওয়া মরা শরীরটা পড়ে আছে। তোর বাবা করত কি, পায়ে স্কি এ'টে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যেত রাত্রিবেলা। কখনো খালি হাতে ফিরত না — দু-একটা নেকড়েকে শিকার করে আনত। নেকড়েগুলোর ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে ভিতরটা অন্য জিনিস দিয়ে ঠেসে কাঁচ বসিয়ে দিত দু-চোখে। দেখে বোঝাই যেত না যে সেগুলো জ্যান্ত নেকড়ে নয়। একদিন রাত্রে তোর মিখাইল-মামা পায়খানায় গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফিরে আসে। তখন তার এমন অবস্থা যে কথা বলবার ক্ষমতা নেই — চোখদুটো কপালে উঠেছে, মাথার চুল খাড়া হয়ে রয়েছে, নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে প্যাণ্টে জড়াজড়ি হয়ে ধপাস্‌ করে পড়ে যায় আর হাঁপাতে হাঁপাতে কোনো রকমে বলে -- "নেকড়ে!" শুনে যে যা হাতের সামনে পায় তুলে নিয়ে ছুটে যায় বাইরের দিকে। গিয়ে দেখে, মিখাইলের কথাই সত্যি; একটি সিন্দুক থেকে নেকড়ের মাথাটা বেরিয়ে আছে। মাথাটাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয় ও লাঠির বাড়ি মারা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু না; মাথাটা নড়েচড়ে না, যেমনি ছিল তেমনি থাকে। তখন সকলে পা টিপে টিপে এগিয়ে উঁকি দিয়ে দ্যাখে। আর তখন বোঝা যায়, আসলে ওটা নেকড়েই নয়, শুধু একটা চামড়া; মাথার ভিতরটায় অন্য জিনিস ঠেসে দেওয়া হয়েছে আর সামনের ঠ্যাঙদুটোয়

পেরেক ঠুকে আট্‌কে দেওয়া হয়েছে সিন্দুকের সঙ্গে! এবারে এই কাণ্ডের জন্যে তোর দাদামশাই মাক্সিমের ওপরে মারাত্মক রকমের ক্ষেপে গেল। অমন চণ্ডালে রাগ আমি আর দেখিনি! কিছুদিন পরে মাক্সিমের এই সমস্ত ফন্দিফিকিরের দোসর হয় ইয়াকভ। হয়তো মাক্সিম একটা কার্ডবোর্ড কেটে মানুষের মাথা তৈরি করেছে, তার মধ্যে চোখ-নাক-মুখ এঁকে দিয়েছে রং দিয়ে, খানিকটা চটের ফেঁসো লাগিয়ে তৈরি হয়েছে চুল — তারপর দু'জনে মিলে বেরিয়ে এই কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটিকে লোকের বাড়ির জানলায় এঁটে দিয়ে আসে। স্বাভাবিকভাবেই পাড়াপড়শীরা ভয় পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে। মাঝে মাঝে দু'জনে চাদর মুড়ি দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। একবার তো এই মূর্তি দেখে একজন পাদ্‌রি ভীষণ ভয় পেয়ে যায় এবং ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে হাজির হয় একজন পাহারাওলার কাছে। পাহারাওলা আরো ভয় পেয়ে প্রাণপণে "বাঁচাও, বাঁচাও!" বলে চিৎকার করতে থাকে। দিনের পর দিন এমনি চলে, ফন্দিফিকিরের আর শেষ নেই। নিজেদের গোঁ ধরে চলে। লোকের পিছনে এভাবে না লাগতে আমি কতবার বলেছি, ভারিয়া বলেছে — কিন্তু কারও কথায় তারা কান দেয় না। বারণ করতে গেলে মাক্সিম হো-হো করে হাসে আর বলে, লোকে যখন না ভেবে না চিন্তে নিতান্তই একটা হাস্যকর কারণে বেসামাল হয়ে পড়ে তখন নাকি তার খুব মজা লাগে। তারপর কী করে তার সঙ্গে কথা বলা যায়, এ্যাঁ?

কিন্তু মানুষকে নাকাল করবার এই স্বভাবের জন্যেই সে নিজেও প্রায় মরতে বসেছিল। তোর মিখাইল-মামার স্বভাবটা ঠিক তার বাপের মতো — তেমনি ছোট মন আর মনের মধ্যে তেমনি একটা আক্রোশ পুষে রাখে। এই মিখাইল মনে মনে ঠিক করল, যে করে হোক্ তোর বাবাকে এই পৃথিবী থেকে সরাতে হবে। শীতের শুরুতে একদিন কোথায় যেন বেড়াতে গেল ওরা। ওরা ছিল চারজন — মাক্সিম, তোর দুই মামা আর একজন পাদ্‌রি (একজন কোচ্‌মানকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অপরাধে এই পাদ্‌রিটি পরে পদচ্যুত হয়)। ইয়াম্স্কায়া স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ওরা যায় দ্যুকভ পুকুরের দিকে — ভাব দেখায় যেন ওখানে তারা স্লাইডিং করতে যাচ্ছে। তোর বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু দ্যুকভ পুকুরে পেঁছেই ওরা করে কি, তোর বাবাকে ধাক্কা দিয়ে বরফের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে পুকুরে ফেলে দেয়। এ ঘটনাটা তোকে বোধ হয় আগেও একদিন বলেছি...'

'মামারা এত বদ কেন?'

একটিপ নস্যি নিয়ে শান্ত স্বরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'ওরা বদ নয়, বোকা। একেবারেই বোকা। মিশ্‌কা শুধু বোকা নয়, ধূর্তও; ইয়াকভটার তো এখনো জ্ঞানগম্মি কিচ্ছু হয়নি... হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওকে তো ওরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়; আর ও যতোবার ভেসে উঠে হাত দিয়ে বরফের কিনারটা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে, ওরা পায়ের বুট দিয়ে ঠুকে ঠুকে ওর আঙুলগুলোকে থেঁতলে দিতে চায়। ওর কপাল ভালো বলতে হবে যে ও ছিল স্বাভাবিক অবস্থায় আর তোর মামারা ছিল মাতাল। কোনো রকমে ও গর্তের মাঝখানটিতে ভেসে থাকে আর জল থেকে নাকটা উঁচু করে নিশ্বাস নেয়। তোর মামারা ওর মাথা লক্ষ্য করে বরফ ছুঁড়তে থাকে, কিন্তু যতোই ছুঁড়ুক, ওকে ঘায়েল করতে পারেনি। তোর মামাদের যখন ধারণা হল যে আর ওদের চেষ্টা করতে হবে না, এমনিতেই ও জলে ডুবে মরবে — তখন ওরা চলে গেল। তার পর দু-হাতে ভর দিয়ে যা হোক্ করে ও জল থেকে বেরিয়ে আসে এবং সোজা ছুটে যায় পুলিসের কাছে। দেখেছিস তো, পুলিসের সদরদপ্তর স্কোয়ারটার ঠিক পাশেই। থানার সার্জেণ্ট ওকে এবং আমাদের বাড়ির সকলকেই জানত। কি করে ব্যাপারটা ঘটেছে জানতে চাইল সার্জেণ্ট।'

বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে কৃতজ্ঞতাভরা স্বরে দিদিমা বলতে লাগলেন:

'মাক্সিম সাভাতেয়েভিচের আত্মাকে ভগবান শান্তি দিন! খাঁটি মানুষ ছিল ও! খাঁটি পথে থাকার পুরস্কার সে পাবেই! পুলিসের কাছে গিয়ে সে আসল ঘটনা একেবারেই ফাঁস করেনি। বলে যে, দোষটা নাকি তার নিজের, মদ খেয়ে বেহুঁশ অবস্থায় ছিল, আচমকা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। সার্জেণ্ট তার কথা বিশ্বাস করেনি, বলে যে সে মিথ্যে কথা বলছে, মাক্সিম যে মদ খায় না তা সে জানে। পুলিসের লোকরা তার সারা গা ভদ্‌কা দিয়ে ডলে দেয়, শুক্‌নো পোশাক পরিয়ে তার ওপরে চাপিয়ে দেয় একটা গরম ভেড়ার চামড়ার কোট, তারপর নিয়ে আসে বাড়িতে। সার্জেণ্ট ও আরো দু'জন লোক আসে তার সঙ্গে। ইয়াকভ ও মিখাইল তখনো বাড়ি ফেরেনি, নিজেদের বাবা মা'র মর্যাদা বাড়াতে অন্য কোথাও মদ গিলতে গিয়েছিল। মাক্সিমকে দেখে তোর মা আর আমি তো একেবারেই চিনতে পারি না; সারা শরীর লাল হয়ে গেছে, হাতের আঙুলগুলো থেঁৎলানো — রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, রগের কাছে সাদা সাদা বরফের মতো কি লেগে আছে যেন কিন্তু সেগুলো কিছুতেই গলে পড়ছে না; পরে বোঝা যায় যে ওগুলো হচ্ছে তার মাথার সাদা-হয়ে-যাওয়া চুল।

ভারভারা আর্ত স্বরে চিৎকার করে ওঠে — "মাক্সিম, কী হাল করেছে ওরা তোমার?" ওদিকে সেই সার্জেণ্ট সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে আর হাজার রকম প্রশ্ন করছে। আমার কেমন যেন মনে হতে থাকে, ব্যাপারটা বড়ো গোলমেলে। তখন সার্জেণ্টের কাছে ভারভারাকে পাঠিয়ে মাক্সিমের কাছে এসে আসল ঘটনাটা জেনে নিতে চেষ্টা করি। ফিস্‌ফিস্ করে মাক্সিম বলে — "আগে মিখাইল আর ইয়াকভকে খুঁজে বার করো গিয়ে। ওদের বোলো, ওরা যেন পুলিসের কাছে বলে যে ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে — ওরা গেছে পোক্রভকার দিকে, আর আমি প্রিয়াদিলনি গলির দিকে। ওদের ভালো করে বলে দিও যেন পুলিসের কাছে এই কথাগুলো ঠিকঠাক বলে, নইলে ভারি বিশ্রী পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে।" তখন আমি তোর দাদামশাইয়ের কাছে যাই। বলি — তুমি গিয়ে সার্জেণ্টের সঙ্গে কথা বলো, আমি গেটের কাছে ছেলেদের অপেক্ষায় থাক্‌ছি। তারপর তার কাছে দুর্ঘটনা ও বিপদের কথা খুলে বললাম। শুনে তোর দাদামশাই তো কেঁপেই অস্থির, পোশাক পরতে পরতে বিড়বিড় করতে থাকে — "আমি জানতাম! এমনটি যে ঘটবে তা আমি জানতাম!" অবশ্য তোর দাদামশাইয়ের এই কথাটা ঠিক নয় — কিছুই জানত না সে! তারপর আমার সুপুত্তুররা তো বাড়ি ফিরল। আচ্ছা করে দুজনের কান মলে দিলাম। মিশ্‌কার মদের নেশা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। কিন্তু ইয়াকভের পেটে বোধ হয় একটু বেশি পড়েছে, সে আবোল-তাবোল বকতে থাকে — "আমি কিছু জানি না! এটা মিশ্‌কার কাণ্ড — ও-ই তো গোদা!" যাই হোক্, সার্জেণ্টকে তো কোনো রকমে শান্ত করা হল, লোকটা এমনিতে খারাপ ছিল না। যাবার সময়ে সে বলে যায় — "তবে আপনারা খেয়াল রাখবেন। যদি আপনাদের বাড়িতে কোনো গণ্ডগোল হয় তো অপরাধীকে আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে বার করব!" সার্জেণ্ট চলে যেতে তোর দাদামশাই মাক্সিমের কাছে গিয়ে বলে — "তোমাকে আর কী বলব বাবাজী! আমি ভালো করেই জানি, তুমি না হয়ে আর কেউ হলে আজ অন্য ব্যাপার দাঁড়িয়ে যেত। আর ভারভারা, তোকেও ধন্যবাদ, এমন একজন সৎ লোককে আমাদের বাড়িতে আনার জন্যে।" সে-সময়ে তোর দাদামশাই ইচ্ছে করলে খুব চমৎকার কথা বলতে পারত। অবশ্য এখন আর সে-লোক নেই, এখন মানুষটার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে আর বুকের ভিতরটাকে কুলুপ এঁটে রেখেছে। ঘরের মধ্যে তখন আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। মাক্সিম কাঁদতে শুরু করে; রোগীর মতো

যেন প্রলাপ বকে—"ওরা কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল? আমি ওদের কাছে কি অপরাধ করেছি? মাগো, কেন ওরা একাজ করতে গেল?" ও আমাকে সবসময়েই ডাকত "মাগো" বলে, ঠিক যেমনভাবে শিশুরা তাদের মা'কে ডাকে; কক্ষণো শুধু "মা" বলত না। আর ওর স্বভাবের মধ্যেও এমন অনেক কিছুই ছিল যা শুধু শিশুদের মধ্যেই থাকে। "কেন? মাগো, কেন?" ও জিজ্ঞেস করে। আমি আর কি করতে পারি? নিরুত্তর হয়ে বসে থাকি আর ওর সঙ্গে সঙ্গেও কাঁদি। তবে ওরাও তো আমার ছেলে, ওদের জন্যেও আমার দুঃখ হতে লাগল। তোর মা করে কি, পট্‌পট্‌ করে ব্লাউজের বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেলে এমন এলোমেলো চেহারা করে বসে থাকে যে মনে হতে পারে যে সে এইমাত্র কারও সঙ্গে লড়াই করে এসেছে, হুঙ্কার দিয়ে বলে সে—"চলো মাক্সিম, আমরা এখান থেকে চলে যাই! আমার ভাইরা আমাদের শত্রু—ওদের দেখলেই ভয় করে! চলো, চলে যাই এখান থেকে!" মেয়েটাকে একটা ধমক দিই—তুমি আর আগুনে খড় গুঁজবার চেষ্টা কোরো না, এমনিতেই বাড়িতে যথেষ্ট ধোঁয়া হয়েছে! এমন সময় তোর দাদামশাই সেই দুটো নির্বোধকে পাঠিয়ে দেয় মাক্সিমের কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে। মেয়েটা করে কি, মিশ্‌কার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে বলে, "এই নাও তোমার ক্ষমা চাওয়া!" আর তোর বাবা বারবার সেই একই প্রশ্ন করে চলে—"তোমরা কি করে একাজ করতে পারলে ভাই? তোমরা তো আরেকটু হলে আমাকে সারা জীবনের মতো পঙ্গু করে ফেলতে? আমার আঙুলগুলোই যদি না থাকত তাহলে আর আমি কাজ করে খেতাম কি করে?" যাই হোক্‌, কোনো রকমে ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলা হল। তারপর সাত সপ্তাহ কি তারও বেশি শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিল তোর বাবা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমাকে খালি বলত—"মাগো, চলো যাই আমরা অন্য কোনো শহরে। আমার এখানে ভালো লাগে না, বিষণ্ণ জীবন তোমাদের।" তারপরে শীঘ্রই তাকে আস্ত্রাখানে পাঠানো হয়। আস্ত্রাখানে জারের যাবার কথা ছিল, সেই উপলক্ষে বিজয়-তোরণ তৈরি করবার ভার পড়ে তোর বাবার ওপরে। বসন্তকালে প্রথম যে স্টীমবোট ছাড়ে তাতেই তারা চলে যায়। আমার মনে হতে লাগল, আমার বুকের আধখানা কে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। মাক্সিমেরও ভারি কষ্ট হয়েছিল, বারবার আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলে। কিন্তু খুশি হয়েছিল ভারভারা, এত খুশি হয়েছিল যে লুকোবার চেষ্টাও করেনি বেহায়া পাষাণী! এই ভাবে তারা চলে গেল... বাস...'

একঢোঁক ভদ্‌কা গিলে, একটিপ নস্যি নিয়ে, জানলার বাইরে তাকিয়ে স্মৃতি-মন্থন করতে করতে দিদিমা বললেন:

'তোর বাবার সঙ্গে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আমরা ছিলাম অভিন্ন আত্মা...'

মাঝে মাঝে দিদিমার গল্প বলার মধ্যে দাদামশাই এসে ঘরে ঢোকেন, পাখির মতো মুখটা তুলে গন্ধ শোঁকেন বাতাসে, সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাকান দিদিমার দিকে, খানিকক্ষণ গল্প শোনেন দিদিমার, তারপর বিড়বিড় করে বলেন:

'মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা, আগাগোড়া বানানো...'

একদিন দাদামশাই আচমকা জিজ্ঞেস করে বসলেন:

'লেক্সেই, তোর দিদিমা কি এখানে এসে মদ খায়?'

'না।'

'তুই মিথ্যে কথা বলছিস—তোর চোখ দেখেই বুঝতে পারছি, তুই মিথ্যে কথা বলছিস...' অবিশ্বাসের ভাব নিয়েই চলে গেলেন দাদামশাই। তাঁর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে চোখ মটকে একটি প্রবাদবাক্য বললেন দিদিমা:

'জলে দিলে নাড়া, মাছে খায় তাড়া!'

একদিন দাদামশাই এসে দাঁড়ালেন ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে। মেঝের থেকে একটিবারের জন্যেও চোখ না তুলে বললেন:

'গিন্নী...'

'উঁ?'

'ব্যাপারটা দেখছ তো?'

'দেখছি।'

'কী মনে হয় তোমার?'

'কপালের লেখা, বুঝলে গো, কপালের লেখা। মনে আছে অভিজাত ভদ্রলোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে?'

'আছে বৈকি।'

'মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলেছিলে।'

'তবু তার কিছুই অবশিষ্ট যে নেই, সে এখন গরীব।'

'যাক্ গিয়ে, মেয়ের ব্যাপার মেয়ে নিজেই বুঝুক।'

দাদামশাই চলে গেলেন। আমার মনে হতে লাগল, একটা কিছু দুর্বিপাক ঘটতে চলেছে। দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম:

'তোমরা কি বিষয়ে কথা বলছিলে?'

আমার পায়ে মালিশ করতে করতে দিদিমা মনের ঝাল প্রকাশ করতে লাগলেন, 'সব কথা তোর জানা চাই—না? এইটুকু বয়সেই যদি সবকথা জেনে বসে থাকিস তাহলে বড়ো হলে আর জানবার কিছুই বাকি থাকবে না।' বলে তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে হেসে উঠলেন।

'হায় রে লেক্সেই, তোর দাদামশাইয়ের আজ কী অবস্থা! ভগবানের চোখে কতটুকু সে? একটা ধুলোকণার মতো! কাউকে কিছু বলিসনে লেক্সেই, কিন্তু তুই শুনে রাখ, তোর দাদামশাইয়ের আর নিজের বলতে কিছু নেই—শেষ কপর্দক পর্যন্ত হারিয়েছে। এক ভদ্রলোককে মোটা রকমের টাকা ধার দিয়েছিল, বেশ কয়েক হাজার হবে। সেই ভদ্রলোক ফতুর হয়ে গেছে...'

নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে বহুক্ষণ তিনি চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গিয়ে সারা মুখটা জুড়ে বসল একটা থম্‌থমে বিষণ্ণতা।

'কী ভাবছ দিদিমা?'

'ভাবছি তোকে কোন্ গল্পটা বলব।' হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে তিনি বললেন, 'আচ্ছা শোন্ তাহলে ইয়েভস্তিগনেই-এর গল্পটাই বলি কেমন? গল্পটা হচ্ছে এই:

এক যে ছিল বুড়ো ডীকন — ইয়েভস্তিগনেই নাম
মনে মনে ভাবত সে যে, প্রকাণ্ড তার দাম।
অগ্নিসম উজ্জ্বলতা তার কোথায় তুলনা
জার পুরোহিত সবার চেয়েও অধিক মহিমা।
দোকানদার বা ব্যবসায়ী — এরা তো কোন্ ছার
আর কেউ নাই তাহার মতো কী অপরূপ বাহার।
দেমাক-ঠাসা ময়ূর কিংবা বোকা মুরগীর মতো
বকম বকম চলাফেরা চাউনি পেঁচার মতো।
পাড়াপড়শী সবার তরে আছে অনুক্ষণ
বড়ো বড়ো বুলি ঠাসা বাছা অনুশাসন।
সকাল থেকে রাত অবধি বিরাম বিশ্রাম নাই
সবার কান ঝালাপালা সবাই খোঁজে ঠাঁই!
এ পৃথিবীর কোনো কিছুই নয়কো মনমতো
সবখানেতেই দোষত্রুটি আপদ জঞ্জাল যতো।

তাকিয়ে দেখেন ছাদের দিকে — ছাদটা নিচু অতি
হাঁকিয়ে চলেন ঘোড়ার গাড়ি — গাড়ির নেইকো গতি।
কামড় বসান আপেলফলে—একটুও নয় মিঠে
বসেন এসে বাইরে রোদে — পান না স্বস্তি মোটে।
যতোই দেখেন দুনিয়াটাকে ততোই বলেন তিনি:

চোখ ঘুরিয়ে গাল ফুলিয়ে গল্প বলতে লাগলেন দিদিমা, তাঁর মুখে ফুটে উঠল একটা চেষ্টাকৃত অদ্ভুত বোকামির ছাপ, সুর করে করে তিনি বলে চললেন:

দুনিয়া গড়ার ফন্দিফিকির ভালোমতোই জানি।
সৃষ্টিকর্তা হতাম যদি দেখিয়ে দিতাম ক্ষণে
এই পৃথিবী হত ভালো হাজার হাজার গুণে।
কিন্তু আমার নেইকো সময় নেইকো কোনো সায়
হাজার কাজের মানুষ আমি হাজার রকম দায়।

এক মুহূর্ত থেমে চাপা স্বরে বলে চললেন আবার:

হঠাৎ একদিন শয়তানেরা এসে হাজির হয়
বলে তাকে: 'এ পৃথিবীর কোনো কিছুই পছন্দ তো নয়?
চলো তবে সবাই মিলে নরকে বাস করি
কী চমৎকার আগুন সেথায় আহা মরি মরি।'
এই না শুনে ডীকনমশাই যেই না উঠে দাঁড়ায়
জোড়া শয়তান চাপে পিঠে ঘাড়টি ধরে হায়।
বাদবাকিরা কামড়ে ছিঁড়ে আঁকড়ে ধরে তাকে
ডীকনমশাই নাকাল ভারি মুখটি বুজে থাকে।
শয়তানেরা ঠেলা মারে -- পড়েন গিয়ে শেষে
ফুঁসছে যেথায় আগুন সেথায় প্রচণ্ড আক্রোশে।
'এবার বলুন ডীকনমশাই ভালো লাগছে কিনা?'
ডীকনমশাই ভাজা-ভাজা চক্ষু রক্তপানা।
তবুও তাঁর ভারিক্কী চাল বজায় রাখেন তিনি
ঠোঁট বাঁকিয়ে ঝাঁজ ফুটিয়ে বলেন, 'জানি জানি,
নরক দেশের আগুনটা তো চোখধাঁধানো বটে
কিন্তু বড়ো বেশি ধোঁয়া ভালো নয়কো মোটে।'

ঘুমজড়ানো গভীর টানা সুরে গল্পটা শেষ করলেন তিনি, তারপর মুখের ভাব বদলে আমার দিকে ফিরে বললেন:

'ইয়েভস্তিগনেই শেষ পর্যন্ত হার মানেনি। লোকটার এই একটা মস্ত গুণ ছিল—নিজের গোঁ বজায় রাখতে পারত সব সময়ে—ঠিক তোর দাদামশাইয়ের মতো! নে, এবার রাত হয়েছে, ঘুমো...'

আমার মা ক্বচিৎ আমাকে দেখবার জন্যে ওপরে আসত। এলেও বেশিক্ষণ থাকত না, দু-একটা কথা বলেই চলে যেত তাড়াতাড়ি। মা দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে, আরো ভালো ভালো পোশাক পরে—কিন্তু দিদিমার মতো মা'র মুখেচোখেও একটা কেমন নতুন ভাব, কী যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে মা। ব্যাপারটা কী হতে পারে, আমি অনুমান করতে চেষ্টা করলাম।

দিদিমা আমাকে গল্প বলেন কিন্তু আমার আর তাতে আগ্রহ নেই। অস্পষ্ট একটা আতঙ্ক দিনের পর দিন আমার মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে—এমন কি দিদিমা যখন বাবার গল্প বলতে শুরু করেন তখনো এই আতঙ্কের ভাব আমার মন থেকে দূর হয় না।

একদিন আমি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার বাবার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না কেন?'

চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে দিদিমা জবাব দিলেন, 'তা আমি কী করে জানব? ওসব হচ্ছে স্বর্গের ব্যাপার—ঈশ্বরের রাজ্য। আমাদের মতো মানুষের পক্ষে ওসব বোঝা সম্ভব নয়...'

মাঝে মাঝে রাত্রে যখন ঘুম আসে না, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি গাঢ় নীল আকাশে তারার মিছিল চলেছে। কল্পনায় নানা করুণ গল্প ভেসে ওঠে, আর প্রত্যেকটি গল্পেরই নায়ক আমার বাবা। তিনি চলেছেন একা একা, তাঁর হাতে লাঠি, আর একটা লোমশ কুকুর চলেছে তাঁর পিছনে...

বার

বিকেল বেলা একদিন অল্প একটু ঘুমিয়েছিলাম। সন্ধ্যার সময়ে ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম, আমার পাদুটোতেও সাড়া জেগেছে। বিছানার ধার দিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম পাদুটোকে; তখন আবার পাদুটোকে অসাড় ও অবশ মনে হতে লাগল। তবে যাই হোক্, একটা উপকার হয় এ-ব্যাপারে; আমার পাদুটো যে আস্ত আছে এবং আবার আমি হাঁটা-চলা করতে পারব—এই বিশ্বাসটুকু ফিরে আসে আমার মনে। এই অভিজ্ঞতা আমার মনে এমন একটা তীব্র আনন্দ সঞ্চারিত করে যে আমি চিৎকার করে উঠি এবং মেঝের ওপরে পায়ে

ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। অবশ্য চেষ্টাটা সফল হয় না; আমি পড়ে যাই। কিন্তু তবুও হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাই দরজার দিকে; সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামি আর ভাবি—আমাকে দেখে নিচের সবাই কি-ভাবেই না আঁতকে উঠবে।

এখন আর আমার মনে নেই, সে-অবস্থায় কী করে আমি মা'র ঘরে পেঁীছেছিলাম। দেখলাম, আমি দিদিমার কোলে শুয়ে আছি আর আমার চারদিকে অপরিচিত সব লোকের ভিড়। সবুজ রোগা এক বুড়ীও ছিল সেই ভিড়ের মধ্যে।

ঘরের অন্য সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে বুড়ী বলল, 'ওকে র‍্যাস্‌পবেরি জ্যাম দিয়ে একটু চা খেতে দাও আর কম্বল দিয়ে মুড়ে দাও ভালো করে...'

বুড়ীর আপাদমস্তক সবুজ। পোশাক সবুজ, টুপি সবুজ, মুখ সবুজ, বাঁ চোখের নিচের আঁচিল সবুজ, এমন কি আঁচিলের মাঝখান থেকে যে একগাছি চুল বেরিয়ে এসেছে তাও সবুজ ঘাসের মতো। তলার ঠোঁটটাকে নিচের দিকে নামিয়ে আর ওপরের ঠোঁটটা উঁচু দিকে তুলে, সবুজ দাঁতের পাটি বার করে এবং আঙ্গুল খোলা লেসের কালো দস্তানাপরা হাত দিয়ে চোখদুটোকে আড়াল করে বুড়ী তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমতা আমতা করে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে, দিদিমা?'

জবাব দিলেন দাদামশাই, অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন, 'ইনি তোমার আরেকজন ঠাকুমা হতে চলেছেন।'

আমার মা মুচকে হেসে ইয়েভগেনি মাক্সিমোভকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল:

'আর এই হবে তোর বাবা।'

আরও কি সব কথা মা তাড়াতাড়ি বলে গেল কিন্তু আমার মাথায় একবর্ণও ঢুকল না। চোখদুটো কুঁচকে মাক্সিমোভ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছে:

'আমি তোমাকে এক বাক্স রং কিনে দেব খোকা।'

ঘরের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল আলো। কোণের একটা টেবিলের ওপর রুপোর ঝাড়বাতি জ্বলছে; প্রত্যেকটি ঝাড়ে পাঁচটি করে মোমবাতি। ঝাড়বাতিগুলোর ঠিক মাঝখানে দাদামশাইয়ের প্রিয় আইকন: 'ওগো মা, কেঁদো না!' মোমবাতির আলোয় আইকনের মুক্তাখচিত ফ্রেম ঝল্‌সে উঠছে, গলে গলে পড়ছে; সোনালী মুকুটে বসানো গাঢ় লাল পাথরগুলি উঠছে ঝিকমিকিয়ে। জানলার

বাইরের অন্ধকার থেকে কতগুলো অস্পষ্ট মুখ শার্সির ওপরে নাক চেপে পিটপিট করে তাকিয়ে আছে ঘরের মধ্যে। আমার চারদিকে দুলে উঠেছে সমস্ত কিছু। সেই সবুজ স্ত্রীলোকটি ঝুঁকে পড়েছে আমার ওপরে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে আমার কানের পিছনদিক পরীক্ষা করে বিড়বিড় করে বলছে:

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...'

আমাকে কোলে নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে দিদিমা বললেন, 'মূর্ছা গেছে।'

আমি কিন্তু মূর্ছা যাইনি, শুধু চোখ বন্ধ করে ছিলাম। আমায় নিয়ে যখন দিদিমা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন, আমি বললাম:

'তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। বাস, আর একটিও কথা নয়।'

'ঠকের দল...'

আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দিদিমা নিজেই বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদিতে শুরু করলেন। আর বারবার বলতে লাগলেন আমাকে:

'ওরে, এবার কেঁদে নে, প্রাণ ভরে কেঁদে নে!'

কিন্তু কাঁদবার ইচ্ছে আমার ছিল না। ওপরের এই ঘরটা ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। আমার শরীরটা কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা নড়ছে আর কিচ-কিচ শব্দ করে উঠছে। সেই সবুজ স্ত্রীলোকটি যেন দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে; কিছুতেই মিলিয়ে যায় না। আমি ভান করলাম যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। দিদিমা আমাকে একা রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

তার পরের কয়েকটা দিন কাটল একটা নিরুৎসাহ একঘেয়েমির মধ্যে দিয়ে। বিয়ের কথা ঘোষণা করেই আমার মা চলে গেছে। বাড়ির মধ্যে বুক-চাপা নিস্তব্ধতা নেমে এল।

একদিন সকালে একটা বাটালি হাতে নিয়ে দাদামশাই হাজির। শীত-জানলার পুটিং তিনি বাটালি দিয়ে কেটে কেটে তুলে ফেলতে লাগলেন। তারপরেই দিদিমা এলেন এক বালতি জল আর খানিকটা ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে।

নীচু গলায় দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর গো?'

'কিসের খবর?'

'তুমি কি খুশি হয়েছ?'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দিদিমা আমাকে যে-জবাব দিয়েছিলেন, এবারে দাদামশাইকেও সেই একই জবাব দিলেন:

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। বাস, আর একটিও কথা নয়।'

এই সরল কথাগুলোর এখন একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। মস্ত আর অপ্রিয় একটা ঘটনা গোপন করে রাখতে চাইছে কথাগুলো। এমন একটা ঘটনা যা সবাইকে মেনে নিতে হচ্ছে কিন্তু মুখে যা উল্লেখ করা যায় না।

শীত-জানলার কপাটটা সাবধানে খুলে নিয়ে দাদামশাই সেটা নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। দিদিমা গিয়ে দাঁড়ালেন উন্মুক্ত জানলার সামনে। বাইরে বাগান থেকে স্টার্লিং আর চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। ভিজে মাটির মাথা-ঝিমঝিম-করা গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। চুল্লির নীলাভ টালিগুলো ঔদাসীন্যে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে — সেদিকে তাকিয়ে আমার শরীরটা শিরশির করে উঠল। সাবধানে বিছানা থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

'এখন আর খালি পায়ে হাঁটাচলা করিসনে বাপু,' দিদিমা আমাকে সাবধান করে দিলেন।

'আমি একটু বাগানে যাচ্ছি।'

'আরেকটু পরে যাস। এখনো মাটি ভিজে রয়েছে।'

দিদিমার কথা মেনে চলবার ইচ্ছে আমার ছিল না। বড়োদের সান্নিধ্য এখন আর আমার ভালো লাগছে না।

ফ্যাকাশে সবুজ রঙের কচি কচি ঘাসের ডগা ইতিমধ্যেই মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলেছে। আপেল গাছগুলো ছেয়ে গেছে নবমঞ্জরীতে। পেত্রভনার বাড়ির ছাদে সবুজ শ্যাওলার চমৎকার কার্পেট বিছানো। চারদিকে পাখির মেলা। বরফ-গলা মাটির গন্ধে আমার নেশা ধরে গেল। বরফের তাড়নায় নুয়ে-পড়া বাদামী রঙের আগাছায় চিহ্নিত হয়ে আছে কালো গর্তটার কিনারা। এখানেই পিওতর-কাকা নিজের গলায় ছুরি বসিয়েছিল। সারা বাগানের মধ্যে এই আগাছাগুলোকেই সবচেয়ে বিশ্রী দেখতে। এই আগাছাগুলো বা আগুনে-পোড়া এই নিঃসঙ্গ খুঁটিগুলো চারদিকের বসন্ত-আবহাওয়ায় একেবারেই বেমানান। এক কথায়, সারা বাগানের মধ্যে এই গর্তটাই গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেবার মতো একটা বেখাপ্পা ব্যাপার হয়ে উঠেছে। আমার কেমন একটা রোখ চেপে গেল যে এক্ষুণি গিয়ে আগাছাগুলোকে উপড়ে ফেলি, ইট আর আগুনে পোড়া খুঁটিগুলোকে সরিয়ে দিই ওখান থেকে, যতো জঞ্জাল জড়ো

হয়ে আছে সব ঝেঁটিয়ে ফেলে পরিষ্কার করে ফেলি জায়গাটা, তারপর নিজের জন্যে একটা কুঞ্জ রচনা করি ওখানে—যেটা হবে বড়োদের নাগালের বাইরে আমার নিভৃত গ্রীষ্মযাপনের স্থান। সঙ্গে সঙ্গে আমি কাজে লেগে গেলাম। এতে আমার খানিকটা উপকারও হল। কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমাদের বাড়ির সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো ভুলে গেলাম আমি। ঠিক যে ভুলে গেলাম তা নয়, ক্ষতটা রয়েই গেল, কিন্তু তার যন্ত্রণাটা কমে এল আস্তে আস্তে।

আমার দিদিমা ও মা জিজ্ঞেস করেন, 'অমন মনমরা হয়ে থাকিস কেন রে?' এ-প্রশ্নের কী জবাব দেব ভেবে পাই না। বাড়ির কারও ওপর আমার রাগ নেই, কিন্তু বাড়ির কোনো ব্যাপারই আমার আর ভালো লাগে না, সব কিছু যেন আমার পর হয়ে উঠল। সেই সবুজ স্ত্রীলোকটি প্রায়ই আসে আমাদের বাড়িতে; কখনো বিকেলের খাবার সময়ে, কখনো চায়ের সময়ে, কখনো রাত্রের খাবার সময়ে। এসে বসে থাকে পুরনো বেড়ার জীর্ণ খুঁটির মতো। তার চোখদুটো যেন অদৃশ্য সুতো দিয়ে মুখের সঙ্গে সেলাই করা; হাড়-বের-করা গর্তের মধ্যে চোখদুটো অতি অনায়াসে ঘুরপাক খায়; সমস্ত কিছু দেখে, সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। ঐশ্বরিক বিষয়ে কথা বলবার সময় ছাদের দিকে চোখদুটো নিবদ্ধ হয়, আর পার্থিব বিষয়ে কথা বলবার সময় মেঝের দিকে। তার ভুরুদুটোকে দেখে মনে হয়, কোনো একটা দুর্জ্ঞেয় পদ্ধতিতে ভুষির প্রলেপ দিয়ে তৈরি। চওড়া চওড়া দাঁতগুলো যা কিছু সে মুখের মধ্যে পোরে তা নিঃশব্দে গুঁড়িয়ে ফেলে। খাবার সময়ে কাঁটাটা ধরে অদ্ভুত তির্যক ভঙ্গিতে, হাতের ছোট আঙুল উঁচিয়ে থাকে। কানের সামনে গোল গোল বলের মতো হাড় চরকির মতো ঘোরে আর কানদুটো নড়তে থাকে। মুখের চামড়া হলদে আর কুঁচকনো আর এত বেশি মাজাঘষা যে গা ঘিনঘিন করে। আর এই চামড়ার ওপরে আঁচিলের সবুজ চুলগাছা নড়াচড়া করে বেড়ায়। মা ও ছেলে দু'জনেই এত মাজাঘষা যে ওদের কাছে ঘেঁষতে আমার ভয় করে। আমাদের দেখাসাক্ষাতের প্রথম কয়েকদিন বুড়ী বারকয়েক চেষ্টা করেছিল, ধুনো আর ধোবিখানার সাবানের গন্ধওলা তার শুকনো হাতটায় যেন আমি চুমু খাই। কিন্তু যতোবারই এই উপলক্ষ উপস্থিত হয়েছে, আমি পালিয়ে গেছি।

বুড়ী তার ছেলেকে বারবার বলে, 'বুঝলি তো ইয়েভগেনি, ছেলেটাকে ভালোমতো শিখিয়ে পড়িয়ে একটু সভ্যভব্য করা দরকার।'

একথা শুনে ইয়েভগেনি বাধ্য ছেলের মতো ভ্রূ কুঁচকে মাথা নোয়ায় কিন্তু একটিও কথা বলে না। বুড়ীর এই সবুজ উপস্থিতির সামনে সবাই ভ্রূ কোঁচকায়।

এই বুড়ীকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। বুড়ীর ছেলেকেও না। আমার এই বিদ্বেষ এত বেশি প্রগাঢ় যে এজন্যে আমাকে বহু প্রহার সহ্য করতে হয়েছে।

একদিন আমরা একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম। বুড়ী হঠাৎ চোখ ভয়ানকভাবে পাকিয়ে বলে উঠল:

'বাছা আলিওশা, অমন গপ্‌গপ করে রাক্ষসের মতো গিলছ কেন? খাবার গলায় আটকে যাবে যে।'

আমি করলাম কী, খাবারের টুকরোটা মুখ থেকে বার করে নিয়ে কাঁটায় বিঁধিয়ে বাড়িয়ে ধরলাম তার দিকে।

'খাবারের ওপর আপনার এতই যদি লোভ তো এই নিন।' বললাম আমি।

মা আমাকে এক ঝট্‌কায় টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপরে লজ্জাকরভাবে আমাকে বন্ধ করে রাখা হল ছাদের ঘরে।

কিছুক্ষণ পরেই দিদিমা উঠে এলেন ওপরের ঘরে। তারপরেই মুখে হাত চাপা দিয়ে তাঁর সে কী হো-হো হাসি।

'আরে, বাবাঃ, কোথায় যাব রে আমি! তোর মাথায় এত দুষ্টু বুদ্ধিও খেলে!'

দিদিমার মুখে হাত চাপা দেবার ভঙ্গিটুকু আমার ভালো লাগল না। দিদিমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমি ছাতে উঠে এলাম এবং সেখানে চিম্‌নির পিছনটিতে বসে রইলাম বহুক্ষণ। হ্যাঁ, আমার ভয়ানক ইচ্ছে করে, ওদের সবাইকেই মুখের ওপরে যা-তা বলি, ওদের সবাইকেই খানিকটা নাকানি-চোবানি খাওয়াই। এই ইচ্ছেকে আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারি না! চেপে রাখাটা আমার পক্ষে ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাকে এই শক্ত ব্যাপারটাই আয়ত্ত করতে হয়েছিল।

একদিন আমি করলাম কী, আমার ভাবী সৎ-বাপ আর ভাবী ঠাকুমা যে চেয়ারদুটিতে বসে, তার ওপরে চেরি-আঠা মাখিয়ে রেখে দিলাম। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনেই শক্তভাবে এঁটে গেল চেয়ারের সঙ্গে—সে এক ভারি মজার ব্যাপার। সেজন্যে দাদামশাই তো আমাকে ধরে আচ্ছা করে পিট্‌টি দিলেন। এসব হয়ে যাবার পরে মা উঠে এল আমার

ছাদের ঘরে। আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে শক্তভাবে চেপে ধরে বলল:

'হ্যাঁ রে, তুই এত দুষ্টুমি করিস কেন বল্ তো? তোর এই দুষ্টুমির জন্যে আমাকে যে কতখানি ভুগতে হয় তা যদি তুই জানতিস!'

মা'র দু-চোখ ভরে উজ্জ্বল জল টলটল করছে। গালের ওপরে আমার মাথাটা চেপে ধরেছে মা। মা'র মারের চেয়েও এতে বেশি কষ্ট হত। মা'র কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, মা যদি না কাঁদে তাহলে আর আমি কক্ষণো মাক্সিমভদের পিছনে লাগব না।

আমাকে নীচু গলায় মা বলল, 'এই তো চাই। আর কক্ষণো দুষ্টুমি করিসনে। এই দ্যাখ্ না, শীগ্গিরই আমাদের বিয়ে হবে, বিয়ের পরে আমরা যাব মস্কোতে। মস্কো থেকে ফিরে এলে তুইও থাকবি আমাদের সঙ্গে। ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ খুব ভালো লোক — যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি মনটাও নরম। দেখিস তুই, ওকে তোরও ভালো লাগবে। তোকে আমরা হাইস্কুলে ভর্তি করে দেব। তারপর তুইও হবি ওর মতো ছাত্র। তা হলে পর তুই ইচ্ছে করলে ডাক্তারও হতে পারিস বা অন্য যা খুশি হতে পারিস। লেখাপড়া যে শেখে তার কি আর কিছু অসাধ্য থাকে! যা এবার একছুটে বাইরে গিয়ে একটু খেলা কর গিয়ে...'

আমার মনে হতে লাগল, এই 'তারপর' বা 'তা হলে পর' ইত্যাদি কথাগুলো সিঁড়ির ধাপের মতো পর পর নেমে গেছে আর সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি ক্রমশ মা'র কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে এক অন্ধকার নিঃসঙ্গতায় চলে যাচ্ছি। আমার জন্যে ভবিষ্যতের যে চিত্র মা এঁকেছে তাতে আমি কিছুমাত্র উল্লসিত হইনি। ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে বলি:

'মা, তুমি বিয়ে কোরো না। আমি নিজেই কাজ করে তোমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেব।'

কিন্তু কথাটা আমি বলতে পারিনি। মা যখনই আমার সঙ্গে কথা বলে তখন আমার মনটা আবেগে একেবারে গলে যায় আর মা'র জন্যে মস্ত কিছু একটা করতে ইচ্ছে করে—কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে কোনো দিনই মা'র কাছে বলতে পারিনি।

এদিকে বাগানে আমার পরিকল্পনামতো কাজ এগিয়ে চলেছে। আগাছাগুলোকে টেনে তুলেছি আর গোড়া থেকে কেটে দিয়েছি। ইটের গাঁথুনি তুলেছি, গর্তের ঢালু কিনারের চারদিক থেকে ইট সাজিয়ে দিলাম,

সেগুলি দিয়ে তৈরি করেছি বেশ চওড়া একটি আসন যাতে শুয়ে থাকাও চলতে পারে। নানা রঙের কাঁচ আর ডিশের ভাঙা টুক্‌রো যোগাড় করে চমৎকারভাবে বসিয়ে দিয়েছি ইটের ফাঁকে ফাঁকে গাঁথুনির মধ্যে। সূর্যের আলো এসে যখন পড়ে তখন এই কাঁচ আর ডিশের টুক্‌রোগুলো গির্জার উপাসনা-বেদির মতো চক্‌চক্‌ করে আর ঝল্‌সে ওঠে।

মনোযোগের সঙ্গে আমার কাজ পর্যবেক্ষণ করতে করতে একদিন আমার দাদামশাই বললেন, 'বাঃ, মাথা খাটিয়ে চমৎকার জিনিসটা করেছিস তো! তবে কি জানিস, আগাছাগুলোর শেকড় মাটির মধ্যে রয়ে গেছে, ওগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আচ্ছা, ওজন্যে তোকে ভাবতে হবে না। তুই একটা কাজ কর তো, আমাকে একটা কোদাল এনে দে, আমি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে শেকড়গুলো বার করে দিচ্ছি।'

কোদাল আনতেই তিনি প্রথমে থুথু দিয়ে হাত ভিজিয়ে নিলেন, তারপর হুঁম হুঁম শব্দ করতে করতে গভীরভাবে খুঁড়তে শুরু করে দিলেন জমিটা।

'এবার আগাছার শেকড়গুলোকে ফেলে দে। দেখিস তুই, তোর জন্যে আমি এখানে সূর্যমুখী আর হলিহক্‌'এর চারা লাগিয়ে দেব। তাহলে কী সুন্দর যে হবে জায়গাটা—সত্যিই ভারি সুন্দর...'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি কোদালে ঠেস দিয়ে নিশ্চল ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ক্ষুদে ক্ষুদে, কুকুরের মতো বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর চোখদুটো থেকে দর দর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

'কী হল দাদামশাই?'

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মুখটা মুছে নিয়ে তিনি তাকালেন আমার দিকে।

'হুঃ, এর মধ্যেই শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে গেছে। আরে বাবাঃ, পোকাগুলো কি-রকম কিলবিল করছে দেখছিস!'

আবার খুঁড়তে শুরু করলেন তিনি। হঠাৎ বলে উঠলেন:

'এসব করে কিছু লাভ নেই। মিথ্যে এসব করা, ভাই। শীঘ্রই এই বাড়িটা আমাকে বিক্রি করে ফেলতে হবে। হয়তো সামনের শরৎকালের মধ্যেই। তোর মা'র বিয়ের যৌতুক দিতে হবে তো — সেজন্যে টাকা দরকার। বুঝলি কিনা, আর যে-ভাবেই থাকুক না কেন, অন্তত তোর মা'র যেন কোন কালে থাকাখাওয়ার কষ্ট না হয়...'

কোদালটা ছ্‌ুড়ে ফেলে দিয়ে হাতটা একবার ঝাঁকিয়ে তিনি চলে গেলেন স্নানঘরের পিছনে; বাগানের ওই কোণটিতে কতকগ্‌ুলো লালনক্ষেত্র তৈরি করেছেন তিনি। আমি নিজেই খ্‌ুড়তে শ্‌ুর্‌ু করলাম এবং আচমকা কোদালটা লেগে গিয়ে আমার পায়ের ব্‌ুড়ো আঙ্গ্‌ুলটায় বড় আঘাত দিল।

এই আঘাতের ফলে মা'র বিয়েতে আমি আর যোগ দিতে প্যারিনি। কোনোমতে গেট পর্যন্ত হে'টে এসে দ্‌ূর থেকেই মা'র যাওয়া দেখেছি। মাক্সিমভের হাতটা ধরে আছে আর মাথা নিচু করে পথ চলছে মা। পাথরবসানো ফুটপাথের ফাটল দিয়ে কচি কচি ঘাসের ডগা মাথা তুলেছে; সেই ঘাসের ডগাগ্‌ুলোকে সতর্কভাবে বাঁচিয়ে সাবধানে পা ফেলছে মা— যেন পেরেক-বসানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে তাকে।

কোনো রকম ধ্‌ুমধাম না করে বিয়ে হয়ে গেল। অন্‌ুষ্ঠানের শেষে যে চায়ের আসর বসল সেখানেও কোনো রকম হৈচৈ হল না। চা-খাওয়া হয়ে যেতেই কালবিলম্ব না করে মা নিজের ঘরে গিয়ে বাক্সপে'টরা গ্‌ুছোবার কাজে লেগে গেল। আমার সৎ-বাপ বসল এসে আমার পাশে, বলল:

'মনে আছে তো, তোমাকে বলেছিলাম, এক বাক্স রং উপহার দেব। কিন্তু এখানকার বাজারে ভালো রং কিনতে পাওয়া যায় না। আমার নিজের রঙের বাক্সটাও দেওয়া চলে না। মস্কো থেকে তোমাকে আমি রঙের বাক্স পাঠিয়ে দেব।'

'রঙের বাক্স নিয়ে কী করব আমি?'

'কেন, ছবি আঁকতে তোমার ভালো লাগে না?'

'আমি ছবি আঁকতে জানি না।'

'তাহলে তোমার জন্যে আমি অন্য কিছ্‌ু পাঠাব।'

এই সময়ে আমার মা ঘরে ঢুকে আমাকে বলল:

'আমরা শীগ্‌গিরই ফিরে আসব। তোমার বারা পড়াশ্‌ুনো শেষ করে পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই ফিরে আসব আমরা।'

দ্‌ু'জনে আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে যেন আমি আর ছোটটি নই। এতে ভারি ভালো লাগছে আমার। কিন্তু যে-লোকের দাড়ি গজিয়ে গেছে সে এখনো পড়াশ্‌ুনা করছে শ্‌ুনে আমার খ্‌ুব অবাক লাগল।

'আপনি কী পড়েন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জরিপবিদ্যা।'

'জরিপবিদ্যা' জিনিসটা কী, জিজ্ঞেস করতেও আলস্য লাগছে আমার।

বাড়ির আবহাওয়াটা ভারি হয়ে রয়েছে একটা থম্‌থমে নিস্তব্ধতায়; লোমশ কিছুর খসখসানি যেন। উৎকণ্ঠ হয়ে আমি রাত্রির জন্যে প্রতীক্ষা করছি; আরো তাড়াতাড়ি রাত্রি নেমে আসুক। চুল্লির দিকে পিছন ফিরে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাদামশাই আধ বোজা চোখে তাকিয়ে আছেন জানলার বাইরের দিকে। সবুজ বুড়ীটা ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে আর বিড়বিড় করতে করতে মা'কে বাক্সপেঁটরা বাঁধতে সাহায্য করছে। দিদিমা দুপুর থেকেই মদে বেসামাল; তিনি যাতে বিসদৃশ কিছু কাণ্ড করে পরিবারের নাম না ডুবিয়ে বসেন, সেজন্যে তাঁকে ছাদের ঘরে আটকে রাখা হয়েছে।

পরদিন সকালবেলা মা চলে গেল। যাবার আগে আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সে আমাকে অনায়াসে তুলে নিল মাটি থেকে এবং বুকের ওপরে চেপে ধরে স্থির অপরিচিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। আমাকে চুমু খায়, বলে, 'এবার যাই, কেমন?'

'ওকে বলে যা যেন আমার অবাধ্য না হয়।' তখনও গোলাপী আকাশের দিকে তাকিয়ে নিরুৎসুক গলায় দাদামশাই বললেন।

'শুনছিস তো, দাদামশাইয়ের কথা মেনে চলবি।' আমার মাথার ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে মা আমাকে উপদেশ দিল। আমি আশা করছিলাম, মা হয়তো আমাকে অন্য কিছু বলবে। মা'র কথায় এভাবে বাধা দেওয়াতে আমি দাদামশাইয়ের ওপরে রেগে গেলাম।

দু'জনে গিয়ে গাড়ীতে চেপে বসল। গাড়ীতে উঠবার সময় কিসে যেন আটকে গেল মা'র পরনের স্কার্ট। বেশ খানিকক্ষণ মা'র সময় লাগল স্কার্টটাকে খুলতে; হিমসিম খেয়ে রেগে উঠল মা।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি? দ্যাখ্‌ না গিয়ে স্কার্টটা কোথায় লেগেছে!' দাদামশাই আমাকে বললেন কিন্তু আমার নিজের মনের বিষণ্ণ ভার আমাকে তখন এমনভাবে গ্রাস করেছে যে কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

মাক্সিমভের পরনে আঁটসাঁট নীল ট্রাউজার। ট্রাউজার-মোড়া পা দুটোকে সতর্কভাবে গুটিয়ে নিয়ে বসল সে। তার হাতে কতকগুলো পুঁটলি দিলেন দিদিমা। পুঁটলিগুলোকে সে হাঁটুর ওপরে পরপর সাজিয়ে নিয়ে চিবুক দিয়ে চেপে ধরে রইল।

'বাস, বাস, অনেক হয়েছে!' ফ্যাকাশে কপালটা আতঙ্কে কুঁচকে আমতা-আমতা করে বলল সে।

অপর একটি গাড়ীতে উঠেছে সেই সবুজ বুড়ীটা আর তার বড়ো ছেলে। বুড়ী বসে আছে ঠিক মোমের পুতুলের মতো টান হয়ে আর তার বড়ো ছেলে তলোয়ারের বাঁটটা দিয়ে দাড়ি ঘষছে আর অনবরত হাই তুলছে।

'তাহলে আপনাকে যুদ্ধেই যেতে হবে, না কী বলুন?' দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন।

'নিশ্চয়।'

'খুব ভালো কথা। ওই তুর্কীগুলোকে একটু ধোলাই দেওয়া দরকার।'

তারা রওনা হয়ে গেল। বারবার পিছন ফিরে তাকিয়ে মা রুমাল নাড়ছে। বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন দিদিমা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনবরত চোখের জল মুছছেন দাদামশাইও।

'ভালো হবে না... এই বিয়ের ফল কক্ষণো ভালো হবে না...' বিড়বিড় করে বললেন দাদামশাই।

একটা টুলের ওপরে বসে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ীদুটো লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। একসময়ে রাস্তার একটা বাঁক ঘুরে গাড়ীদুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরেও একটা কপাট সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল যেন... এতটুকু ফাঁক রইল না... নিশ্ছিদ্র...

তখনো ভালো করে সকাল হয়নি। রাস্তা জনশূন্য, বাড়ির জানলাগুলো খড়খড়ি-আঁটা। এমন শূন্যতা এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি। দূরের কোথা থেকে যেন এক রাখালের বাঁশির টানা-টানা বিলাপ ভেসে আসছে।

আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে যেতে দাদামশাই বললেন, 'আয় রে, চা-টা খাবি আয়। মনে হচ্ছে, আমার কাছে পড়ে থাকাটাই তোর কপালের লেখা। পাথরের ওপরে দেশলাইয়ের কাঠির মতো আমার ওপর লেগে থাকবি।' ,

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমরা দু'জনে নিঃশব্দে বাগানের কাজ করে চলি। দাদামশাই মাটি খোঁড়েন, র‍্যাস্‌প্‌বেরির ঝোপ ছেঁটে দেন, আপেলগাছের ছালের ওপর থেকে ঘষে ঘষে শ্যাওলা ওঠান, শুঁয়োপোকাগুলোকে থেঁতলে মেরে ফেলেন — আর আমি লেগে থাকি আমার নিভৃত কুঞ্জটিকে আরো পরিপাটি করে তোলার কাজে। আগুনে পোড়া খুঁটিকে কেটে ফেলে দিয়ে দাদামশাই বাঁশ পুঁতে দিয়েছেন; আমি আমার পাখির খাঁচাগুলোকে সেই বাঁশে ঝুলিয়ে রেখেছি। শুক্‌নো ঘাসপাতার চাঁচ বুনে

বুনে রোদ আর শিশির থেকে আড়াল করেছি আমার এই কুঞ্জটিকে। স্থানটি অতি চমৎকার হয়ে উঠেছে।

আমার দাদামশাই বলেন, 'তুই যে নিজেরটা নিজেই করে নিতে শিখছিস এটা সত্যিই খুব ভালো কথা।'

জীবন সম্পর্কে দাদামশাইয়ের মতামতের আমি যথেষ্ট মূল্য দিয়ে চলি। বসবার যে জায়গাটুকু আমি ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিয়েছি সেখানে এসে মাঝে মাঝে তিনি বসেন। কথা বলেন ধীরে ধীরে, কোনো রকম তাড়াহুড়ো না করে — যেন রীতিমতো চেষ্টা করে করে প্রত্যেকটি শব্দ মুখের ভিতর থেকে টেনে বার করতে হচ্ছে।

'এখন থেকে তোর মা'র সঙ্গে তোর আর কোনো সম্পর্ক রইল না! তুই একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে গেলি। এবার তোর মা'র আরো ছেলেপুলে হবে। তোর চেয়ে তাদের ওপরেই তোর মা'র টানটা হবে বেশি। আর তোর দিদিমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস, সব সময়েই মদে বেহুঁশ হয়ে থাকে।'

কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ চুপ করে যান, অনেকক্ষণ আর কোনো কথা বলেন না। মনে হয় যেন কান পেতে কোনো কিছু শুনছেন। তারপর আবার একসময়ে তাঁর মুখ থেকে গুরুভার শব্দগুলো একটি করে বেরিয়ে আসতে থাকে।

'তোর দিদিমার এভাবে মদে বেহুঁশ হয়ে থাকা — এই নিয়ে দু-বার এই ব্যাপারটা হল। প্রথমবার এমনি হয়েছিল যখন মিখাইলকে পল্টনে ডেকে পাঠায়। এই বোকা বুড়ীর কথায় পড়ে সেবার আমি ছেলেটার জন্যে রিক্রুট সার্টিফিকেট কিনে আনি। এখন মনে হচ্ছে, ছেলেটা যদি পল্টনে যেত তাহলে হয়তো ভালোই হত ওর পক্ষে। এমনটি হয়তো ও থাকত না। হুঃ, কী সব মানুষ! আমি আর ক'দিন! শীঘ্র মরব! তার মানে আর কেউ থাকবে না — একেবারে অনাথ হবি। বুঝলি তো? তোকে একাই পাড়ি দিতে হবে সংসারে। দ্যাখ, একটা কথা বলি। নিজের হুকুম তামিল করে চলতে শিখিস কিন্তু কক্ষণো অপর কেউ যেন তোকে দিয়ে হুকুম তামিল করিয়ে নিতে না পারে। লোকের সঙ্গে ব্যবহার করবি ধীরস্থির ভাবে কিন্তু নিজে যে-পথে চলবি ঠিক করেছিস তা থেকে সরে দাঁড়াবি না। সবার কথা শুনবি কিন্তু নিজের বিবেচনায় যা সবচেয়ে ভালো মনে হবে তাই করবি...'

বর্ষার দিনগুলো বাদ দিয়ে সারাটা গ্রীষ্ম আমি বাগানেই কাটিয়ে দিই। এমন কি, গরম হলে রাত্রিবেলা বাগানেই ঘুমোই। দিদিমা আমাকে একটুকরো

ফেল্‌ট্‌'এর কাপড় দিয়েছেন, তাই হয় আমার বিছানা। দিদিমা নিজেও মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে রাত্রি কাটান; একরাশ খড় নিয়ে এসে আমার বিছানার পাশটিতে পেতে শুয়ে পড়েন। শুয়ে শুয়ে গল্প বলেন আমাকে। তাঁর নিজেরই অন্য দু-একটা মন্তব্যে মাঝে-মাঝে সেই গল্পে ছেদ পড়ে। মন্তব্যগুলো এই ধরনের:

'দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌, একটা তারা খসে পড়ছে! ও হল মাটি-মায়ের কথা মনে-পড়া উৎকণ্ঠিত একজনের আত্মা। এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন ভালো মানুষের জন্ম হল।'

কিংবা·

'ওই দ্যাখ্‌ রে, একটা নতুন তারা উঠেছে! কী অসীম ঐশ্বর্য! ভাব তো দেখি একবার — কত দূরে রয়েছে এই আকাশ... ভগবানের উত্তরীয় মুক্তোবসানো এই আকাশ!'

দাদামশাই বিড়বিড় করে বলেন: 'সাধে কি আর বোকা বলে! মরবার পথ হয়েছে! কোমরে গেঁটে বাত ধরবে যে — আর নইলে চোরের দল এসে গলা কাটবে!..'

এমনি চলে — সূর্য ডোবে, আগুনের নদী বন্যার মতো বয়ে যায় সারা আকাশ দিয়ে। আর সেই আগুন যখন নিভতে থাকে তখন বাগানের সবুজ ভেলভেটের ওপরে সোনালী-লাল ছাইয়ের গুঁড়ো ঝরে ঝরে পড়ে। স্পষ্ট বোঝা যায়, বিশ্ব-চরাচর আঁধার হয়ে যাচ্ছে আর প্রদোষের উষ্ণতায় অবগাহন করে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। রৌদ্র-পরিতৃপ্ত গাছের পাতাগুলি ডালের ওপরে মুদে আসে, ঘাসের ডগাগুলি মাটিতে মাথা নুইয়ে দেয়। চারদিকে বিপুলতর ঐশ্বর্য ও কমনীয়তা; গানের সুরের মতো নরম একটা সুগন্ধ চারদিক থেকে নিঃসৃত হয়। আর বাজনার সুর ভেসে আসে দূর-মাঠের সৈন্যদের তাঁবু থেকে। মা'র ভালোবাসার মতো জোরালো আর তাজা একটা অনুভূতি জেগে ওঠে রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে; নিঃশব্দতা তার উষ্ণ আর তুলতুলে ছোঁয়া দিয়ে শান্ত করে তোলে মনকে। সারাদিনে যা কিছু ধুলো আর জঞ্জাল জমে, যা কিছু ভুলে যাওয়া উচিত — সমস্ত গ্লানি কেটে যায়। আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে শুয়ে থাকতে কী ভালোই না লাগে তখন। একটি একটি করে তারা ফুটে ওঠে আকাশের গায়ে: আর প্রত্যেকটি তারা আকাশের গভীরতাকে নতুন করে উদ্ঘাটিত করে। সেই দূরপ্রসারী গভীরতা মানুষকে আল্‌তোভাবে মাটি থেকে তুলে ধরে — তখন কিছুতেই বোঝা যায় না, পৃথিবীটা কুঁকড়ে

কু'কড়ে ছোট হয়ে মানুষটার সমান হয়ে গেছে, না, মানুষটা এক আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় ফুলেফেঁপে বড়ো হতে হতে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। তারপর নিঃশব্দতা আরো বেড়ে চলে, অন্ধকার আরো গাঢ় হয়, সর্বত্র ছোট ছোট ঝঙ্কার তুলে অদৃশ্য তারগুলি কাঁপতে থাকে। একটা ঘুমন্ত পাখি গান গেয়ে ওঠে, একটা শজারু খস্‌খস্‌ শব্দে ছুটে চলে যায়, একটা মানুষের গলার স্বর ভেসে আসে — আর এই প্রত্যেকটি ঝঙ্কারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক একটা রূপ আছে, এই বিশিষ্টরূপের জন্যেই এই শব্দগুলোকে দিনের বেলার বিভিন্ন শব্দ থেকে আলাদা করে চেনা যায়; আর প্রত্যেকটি ঝঙ্কারের নিজস্ব এই রূপ স্পর্শকাতর নিঃশব্দতার পটভূমিকায় আরো চমৎকারভাবে রেখায়িত হয়ে ওঠে।

দিনের মৃত্যু হচ্ছে। ঝরে পড়ছে দিনের শেষ পাতাগুলি — একর্ডিয়নের সুর, স্ত্রী-কণ্ঠের হাসি, পাথরবাঁধানো রাস্তায় তলোয়ারের আঘাতের খট্‌খট্‌ শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক।

আর মাঝে মাঝে হঠাৎ বাইরের রাস্তা বা খোলা মাঠের দিক থেকে মাতলামির সোরগোল ও ছুটে-চলার ধুপ্‌ধাপ শোনা যায়। এই শব্দগুলি এতবেশি নিত্যনৈমিত্তিক যে মনোযোগ আকর্ষণ করে না।

দিদিমা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতের ওপরে মাথা দিয়ে চোখ খোলা রেখে শুয়ে থাকেন। নিজের আবেগেই বলে চলেন পুরনো দিনের অনেক কথা। সে-সব কথা আমি শুনছি কি শুনছি না, সেদিকে দিদিমার বিশেষ ভ্রূক্ষেপ থাকে বলে মনে হয় না। আর কাহিনী নির্বাচনে তাঁর এমন একটা দক্ষতা আছে যা প্রতিটি রাত্রিকেই বিশেষ সৌন্দর্য ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে।

দিদিমার কথার সুর আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ঘুম ভাঙে যখন মুখের ওপরে রৌদ্র এসে পড়ে আর কানের কাছে পাখিরা গান গায়। রৌদ্রের উত্তাপে সকালবেলার বাতাস আড়মোড়া ভাঙে, আপেল গাছের পাতাগুলি গা-ঝাড়া দিয়ে শিশির ঝরিয়ে দেয়, সবুজ ঘাসগুলো এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে কাঁচের মতো স্বচ্ছ মনে হয়, ঘাসের উপর থমকে থাকে পাতলা কুয়াশা। সূর্যের রশ্মি সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে আর লাইলাক-রঙা আকাশ নীল হয়ে ওঠে একটু একটু করে। চোখের দৃষ্টির বাইরে আকাশের অনেক উঁচু থেকে ভেসে আসে লার্কপাখির গান। নবজাত দিনের সমস্ত শব্দ আর বর্ণ শিশিরবিন্দুর মতো চুঁইয়ে চুঁইয়ে আমার আত্মার গভীরে প্রবেশ করে আর

এক অনির্বচনীয় শান্ত আনন্দে ভরে যায় আমার অন্তর। ইচ্ছে জাগে, দিনের কর্মতৎপরতার মধ্যে নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিই, মনের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ না রেখে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকি।

আমার সারা জীবনের মধ্যে এই সময়টিতেই আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশান্তি ও অনুধ্যান এসেছিল। এই গ্রীষ্মকালটিতে আমার নিজের শক্তি সম্পর্কে একটা চেতনা জেগে উঠেছিল আমার মধ্যে। সে-সময়ে লোকজনকে আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করি। অভসিয়ান্নিকোভদের বাড়ির ছেলেদের ডাকাডাকি ও চিৎকার কানে আসে, তবুও ওদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে ইচ্ছে করে না। আবার মামাতো-ভাইরা যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন খুশি তো হই-ই না, বরং প্রতি মুহূর্তে ভয় হতে থাকে, ওরা আমার বাগানটিকে না নষ্ট করে ফেলে। এই বাগানটাই হচ্ছে আমার নিজের হাতে তৈরি জিনিসের প্রথম নিদর্শন।

দাদামশাইয়ের বচন শুনতেও আমার আর ভালো লাগে না। বচনগুলি ক্রমাগতই বেশি কাটা-কাটা ও নালিশে ভরা হয়ে উঠেছে। দিদিমার সঙ্গে প্রায়ই তাঁর ঝগড়া লেগে যায় আর দিদিমাকে তখন তিনি বাড়ি থেকে বের করে দিতেন। আর যখনই এ-ধরনের ব্যাপার হয়, দিদিমা গিয়ে ওঠেন ইয়াকভ-মামা কিংবা মিখাইল-মামার বাড়িতে। একেকবার এমন হয় যে কিছুদিন তিনি আর বাড়িই ফেরেন না। বাধ্য হয়ে দাদামশাইকেই নিজের হাতে রান্না করতে হয়। রান্না করতে গিয়ে চিৎকার আর গালিগালাজ করে, আঙুল পুড়িয়ে. কাপ-ডিশ ভেঙে এক তুমুল কাণ্ড শুরু করে দেন এবং দিনের পর দিন আরো বেশি কৃপণ হয়ে ওঠেন।

মাঝে মাঝে বাগানের মধ্যে আমার কুঞ্জটিতে এসে হাজির হন। বেশ আয়েসের সঙ্গে ঘাসের চাপড়ার ওপরে বসে নিঃশব্দে বহুক্ষণ তাকিয়ে দেখেন আমাকে। তারপরে একসময়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন:

'কী রে, মুখে কথা নেই কেন?'

'জানি না।'

তারপরেই শুরু হয় তাঁর উপদেশ-বর্ষণ:

'আমাদের আর কতটুকু দাম রে! কেউ আমাদের কোনো কিছু শেখাতে আসবে না — সব আমাদের নিজেদের শিখে নিতে হবে। এত বই লেখা হয়েছে, এত স্কুল তৈরি হয়েছে — কিন্তু সে-সব অপরের জন্যে, আমাদের জন্যে নয়। নিজেদেরটা নিজেদেরই করে নিতে হবে আমাদের...'

বলতে বলতে নিজের চিন্তাতেই ডুবে গিয়ে চুপ করে যান, নিস্পন্দ ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর দিকে তাকাতে ভয় করে সে-সময়ে।

সেই বছর শরৎকালেই দাদামশাই বাড়ি বিক্রি করে দিলেন। বাড়িটা বিক্রি করার আগে একদিন সকালবেলা চায়ের টেবিলে বসে বিষণ্ণ ও দৃঢ় স্বরে দিদিমার কাছে ঘোষণা করলেন খবরটা:

'গিন্নী, তোমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা এতদিন ধরে আমিই করে এসেছি। কিন্তু আমার পক্ষে আর তা সম্ভব নয়। এবার থেকে তোমার নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে।'

খবরটা শুনে দিদিমা কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না মনে হল, যেন অনেক দিন থেকেই তিনি ঠিক এই কথাগুলোই দাদামশাইয়ের মুখ থেকে শুনবেন বলে আশা করছিলেন। ধীরে-সুস্থে নস্যির কৌটা বার করে ছিদ্রবহুল নাকের মধ্যে নস্যি ঠেসে জবাব দিলেন তিনি:

'তা কী আর করা যাবে। যেমন অবস্থা, তেমনি ব্যবস্থা — এছাড়া আর উপায় কি!'

একটা বন্ধ গলির মধ্যে পুরনো এক বাড়ির মাটির নীচের দুটি অন্ধকার ঘর ভাড়া নিলেন দাদামশাই। বাড়ি ছেড়ে উঠে যাবার আগে দিদিমা করলেন কি, লম্বা ফিতে লাগানো বাকলের তৈরি একটা জুতো নিয়ে গুঁজে দিলেন চুল্লির নীচে। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে বাড়ির উপদেবতাকে ডাকতে লাগলেন:

'হে বাড়ির উপদেবতা, তোমাকে ডাকছি, তুমি বেরিয়ে এসো। তোমার জন্যে বাহন এনেছি — চেপে বসো বাহনটিতে। তারপর আমাদের সৌভাগ্যকে বহন করে নিয়ে চলো আমাদের নতুন বাড়িতে।'

দাদামশাই গিয়েছিলেন বাইরের উঠোনে। সেখান থেকে জানলা দিয়ে তাকিয়ে বললেন:

'আবার ওইসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড শুরু হয়েছে! ধর্মকর্ম আর কিছু রইল না দেখছি! খবরদার বলছি থাম! আমার মুখে কালি লাগাতে তোমাকে দেব না!'

'আমি তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে বাধা দিও না গো। বাধা দিলে অকল্যাণ হবে! কিছুতেই তা তুমি ঠেকাতে পারবে না!' দিদিমা সাবধান করে দিতে চাইলেন। কিন্তু দাদামশাই ততোক্ষণে রাগে অগ্নিশর্মা — দিদিমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিলেন তিনি।

তারপর তিনদিন ধরে চলল বাড়ির পুরানো আসবাব বেচাকেনা — পুরানো মালের আড়ৎদার একদল তাতারের কাছে দাদামশাই বিক্রি করলেন

আসবাবগুলোকে। প্রচণ্ড হাঁকডাক আর গালাগালি করে দরাদরি করলেন। জানলায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলেন দিদিমা; কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন, কখনো মৃদু স্বরে বলছেন—'ভাঙুক, সব জিনিস ভাঙুক! বাড়ি উজাড় করে নিয়ে যাক্ সব!..'

আমার খেলার জায়গা সেই কুঞ্জটিকে ছেড়ে যেতে হবে বলে আমারও কান্না পাচ্ছে।

আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে দুটো গাড়ি এল। মালপত্র ও টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা যে গাড়িটাতে আমি চেপে বসলাম, সেটা রাস্তায় চলতে চলতে এমন ঝাঁকুনি দিতে লাগল যেন আমাকে ছিট্‌কে ফেলে দিতে চাইছে।

এই ঘটনার দু-বছর পরে আমার মা মারা যায় এবং এই দুটি বছরের প্রতিটি মুহূর্তে এই অনুভূতিই আমাকে তাড়া করে ফিরেছে—সব সময়ে মনে হত, কিসের যেন একটা ঝাঁকুনি অনবরত ছিট্‌কে ফেলে দিতে চাইছে আমাকে।

নীচের তলার ঘরদুটোতে উঠে আসার কিছুদিন পরেই মা এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। মা'র শরীরটা রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আচম্‌কা একটা বিস্ময়েই যেন জ্বলজ্বল করছে বড়ো বড়ো চোখদুটো। সবকিছুকে এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মা যেন তার নিজের বাপ-মাকে এবং তার নিজের ছেলেকে এই প্রথম দেখছে। একটি কথাও না বলে মা শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ওদিকে আমার সৎ-বাপ অনবরত ঘরের এমাথা-ওমাথা পায়চারি করছে, চাপা স্বরে শিস্ দিচ্ছে, গলা খাঁকারি দিচ্ছে, পিঠমোড়া করে হাত রেখে আঙুল কচ্‌লাচ্ছে।

'আরে বাবাঃ, কত বড়োটি হয়ে গেছিস রে!' দুই হাতের উত্তপ্ত তালুর মধ্যে আমার মুখখানাকে নিয়ে বলল আমার মা। মা'র পরনে বাদামী রঙের বিশ্রী একটা ঢিলেঢালা পোশাক—পেটের কাছটায় উঁচু হয়ে ঢোল হয়ে আছে।

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সৎ-বাপ বলল, 'নমস্কার খোকা, কেমন আছ?'

ঘরের বাতাসটা শুঁকে নিয়ে বলল আবার:

'বড়ো স্যাঁৎসেঁতে ঘরটা।'

ভারি শ্রান্ত আর এলোমেলো দেখাচ্ছে দু'জনকেই; যেন, দু'জনকে অনবরত শুধু ছুটতে হয়েছে এবং আপাতত দু'জনেরই যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার তা হচ্ছে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম।

চুপচাপ চা খেলাম আমরা। আবহাওয়াটা যেন থমকে রয়েছে। জানলার শার্সির ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আর দাদামশাই তাকিয়ে আছেন সেদিকে।

'তাহলে তুমি বলছ যে ঘরে আগুন লেগে তোমরা সর্বস্বান্ত হয়েছ?'

'একেবারে সর্বস্বান্ত,' দৃঢ় স্বরে বলল আমার সৎ-বাপ, 'আরেকটু হলে আমরাও আটকা পড়তাম, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হত না।'

'হুঁ, আগুন তো আর ছেলেখেলা নয়।'

দিদিমার দিকে ঝুঁকে পড়ে দিদিমার কানে কানে কি যেন বলল আমার মা। শুনতে শুনতে, উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মতো করে দিদিমা চোখদুটো কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। আবহাওয়াটা আরো বেশি থমকে রইল।

হঠাৎ দাদামশাই বিষভরা গলায় শান্ত স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, লোকে বলাবলি করে, ওসব আগুন-টাগুন কিছু নয়, তাস-খেলায় তুমি সর্বস্বান্ত হয়েছ।'

ঘরের মধ্যে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা নেমে এল; শুধু জানলার শার্সিতে বৃষ্টি পড়ার রিমঝিম শব্দ আর সামোভারে জল ফুটবার শোঁ শোঁ আওয়াজ।

'বাবা...' অনেকক্ষণ পরে কথা বলল আমার মা।

'বাবা!' দাদামশাই হিংস্র একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'এবার? এবার কী হবে? তখন আমি বলিনি যে ত্রিশ বছরের মেয়ের পক্ষে কুড়ি বছরের ছোকরাকে বিয়ে করার মতো পাগলামি আর কিছু নেই? কেমন, এবার শিক্ষা হয়েছে তো? আর এই যে তুমি এখানে, চমৎকার নমুনা — নয় কী? তোকে ভদ্রঘরের বৌ করেছে, না? এখন কেমন লাগছে বেটি?'

একথার পর চারজনে একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। সবচেয়ে বেশি চিৎকার করল আমার সৎ-বাপ। ঘর থেকে বেরিয়ে সদরের দিকে চলে এলাম আমি এবং একটা কাঠের স্তূপের ওপরে হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। যাকে আমি দেখছি, সে কক্ষণো আমার মা হতে পারে না — আমার মা ছিল একেবারে আলাদা ধরনের মানুষ। ঘরে থাকার সময়েই এই ধারণা খানিকটা আমার মধ্যে এসেছিল কিন্তু এখন বাইরের এই অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে পুরানো দিনের মা'কে আমি খুব স্পষ্টভাবে মনে করতে পারলাম।

তারপরের ঘটনাগুলি আমি ভুলে গেছি। শুধু এটুকু মনে আছে,

সর্মোভো'র* একটা নতুন বাড়িতে আমাকে উঠে আসতে হয়েছিল। কাঠের বাড়ি, দেওয়ালগুলোতে কাগজ আঁটা নেই। পাট গুঁজে রাখা হয়েছে ফাটলগুলোতে — অসংখ্য আরশোলার বাস সেখানে। রাস্তার দিকের ঘরদুটিতে থাকে আমার মা ও আমার সৎ-বাপ আর দিদিমা ও আমি থাকি রান্নাঘরে। রান্নাঘরটিতে একটিমাত্র জানলা; জানলাটা খুললে একটা ছাদ দেখা যায়। তার পিছনে আকাশের পটভূমিকায় কালো ছবির মতো ফুটে আছে কারখানার কালো কালো চিম্‌নি। চিম্‌নিগুলো থেকে পাক খেয়ে খেয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া ওঠে আর শীতকালের বাতাসে সেই ধোঁয়া সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। সেই চিম্‌নির ধোঁয়ার তেল-চিটচিটে গন্ধে আমাদের শীতল ঘরগুলো সব সময়ে ভরে থাকে। ভোর না হতেই কারখানার বাঁশি নেকড়ের মতো হুঙ্কার ছাড়ে:

'উ-উ-ওয়া! উ-উ-ওয়া!'

একটা বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে জানলার ওপর দিকের শার্সি দিয়ে তাকিয়ে দেখলে কারখানার আলোকোজ্জ্বল গেট দেখতে পাওয়া যায়; গেটটা বুড়ো ভিখিরির দন্তহীন মুখের মতো হাঁ করে আছে আর ক্ষুদে মানুষগুলোকে পালে পালে গিলছে। দুপুরবেলা আবার কারখানার বাঁশি বেজে ওঠে। তখন কারখানার গেট আরেকবার তাদের কালো কালো ঠোঁটগুলো ফাঁক করে দেয় আর বেরিয়ে পড়ে একটি অতল গহ্বর। সেই গহ্বর থেকে জীর্ণ ও অবসন্ন অবস্থায় উগরে উগরে বার করে দেয় সেই ক্ষুদে ক্ষুদে মানুষগুলোকে; কালো একটা স্রোতের মতো রাস্তা থেকে রাস্তায় প্রবাহিত হয়ে চলে সেই মানুষের দল। তুষারতাড়িত বাতাস রুক্ষ সাদা হাতের মতো তাদের ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ঘরের মধ্যে। আকাশ প্রায় দেখাই যায় না। সারি সারি ছাদ ও বরফের পাড়ের ওপরে নিচু হয়ে ঝুলে থাকে আরেকটা ধূসর ও সমতল ছাদ যা কল্পনাশক্তিকে ব্যাহত করে এবং নিরানন্দ একঘেয়েমিতে দৃষ্টি অন্ধ করে দেয়।

সন্ধ্যার সময়ে কারখানার ওপরে আকাশে আবছা একটা লাল আভা থমকে থাকে। আলোর রেখা পড়ে চিম্‌নির কিনারগুলোতে আর তা দেখে মনে হয় — চিম্‌নিগুলো মাটি থেকে আকাশে উঠছে না, আকাশের পাণ্ডুর মেঘ থেকে

* নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ'এর শিল্প-অঞ্চল। এই অঞ্চলেই জাহাজ-তৈরির কারখানা ও অন্যান্য কারখানা ছিল। — সম্পাঃ

নেমে আসছে নিচের দিকে; আগুন গিলে খাচ্ছে আর পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ঢেঁকুর তুলছে আর হুঙ্কার ছাড়ছে। দিনের পর দিন এই একই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অসহ্য একটা যন্ত্রণা হয় আর মনের মধ্যে একটা হিংস্রতার জ্বালা অনুভব করতে থাকি। গৃহস্থালির সব কাজই করেন দিদিমা। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাঁর ফুরসৎ নেই — রান্না করেন, ঘর মোছেন, কাঠ কাটেন, জল তোলেন। সারাদিনের পর সন্ধ্যের দিকে আর চুপ করে থাকতে পারেন না, কাৎরাতে থাকেন ক্লান্তিতে। মাঝে মাঝে রান্না হয়ে যাবার পরে তিনি একটা তুলো-ঠাসা খাটো জ্যাকেট পরে স্কার্টটা তুলে ধরে বেরিয়ে পড়েন শহরের দিকে। বলেন:

'যাই একটু দেখে আসি বুড়ো কেমন দিন কাটাচ্ছে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব দিদিমা!'

'পাগল হয়েছিস নাকি! ঠাণ্ডায় জমে যাবি একেবারে! কী রকম হাওয়া দেখছিস তো!'

বরফে চাপা পড়ে রাস্তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। তার ওপর দিয়েই পুরো সাত ভার্স্ট* পথ হেঁটে তিনি শহরে যান।

আমার মা অন্তঃসত্ত্বা; শরীরটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আর ফুলে উঠেছে। লম্বা পাড় বসানো একটা ছাইরঙা ছেঁড়া শাল গায়ে দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে মা বসে থাকে। এই শালটাকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। এই শালটা মুড়ি দিয়ে বসলে মা'র দীর্ঘাঙ্গ সুন্দর চেহারাটা কেমন বিকৃত হয়ে যায়। শালের পাড়টা ঝুলঝুল করছে, দেখে আমার গা জ্বালা করে, এই পাড়টা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে; এই কারখানা, এই গোটা অঞ্চলটাই আমার দু-চোখের বিষ হয়ে উঠেছে। একটা পুরনো ছেঁড়া ফেল্টের জুতো পায়ে দিয়ে মা বেড়ায়, কাশে, আর কাশতে গিয়ে মস্ত পেটটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। মা'র ধূসর-নীল চোখদুটোতে একটা কঠোর ও শুষ্ক ক্রোধের আগুন ঝিলিক দিয়ে যায়। কিংবা ফাঁকা দেওয়ালের দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে মা, মনে হয় যেন দেওয়ালের সঙ্গে তার চোখের দৃষ্টি এঁটে গেছে। মাঝে মাঝে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে, হয়তো পুরো একটি ঘণ্টা কেটে যায় তবুও খেয়াল হয় না। রাস্তাটা যেন একটা চোয়ালের মতো; এই চোয়ালের কতগুলো দাঁত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কালো আর বিশ্রী হয়ে গেছে, বাকিগুলো

* দেড় ভার্স্ট এক মাইলের কাছাকাছি। — সম্পাঃ

খসে পড়েছে একেবারে; আর এই খসে-পড়া দাঁতের জায়গায় লাগানো হয়েছে চোয়ালের তুলনায় বেমানান রকমের বড়ো থ্যাব্‌ড়া থ্যাব্‌ড়া নতুন দাঁত।

'এমন জায়গায় আমরা থাকি কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'চুপ, চুপ, একথা বলিসনে।' মা জবাব দেয়।

আজকাল মা আমার সঙ্গে খুবই কম কথাবার্তা বলে। যেটুকু বলে তাও হচ্ছে শুধু ফাইফরমাশ। যেমন:

'এটা নিয়ে আয় তো, ওটা নিয়ে যা তো, যা তো একবার চট্‌ করে দোকানে...'

বাইরে খেলাধুলো করতে যাওয়া আমার প্রায় একেবারেই বারণ; মা আমাকে সহজে ছাড়তে চায় না। বাইরে গেলেই আমি সঙ্গীদের হাতে প্রচণ্ড রকমের মার খেয়ে ফিরে আসি -- মারামারি করে আমি যা আনন্দ পাই এমন আর কোনো কিছুতে নয়, আমার সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই কাজেই লেগে থাকি। মা আমাকে বেল্ট দিয়ে প্রহার করে কিন্তু যতোই শাস্তি পাই ততোই এ-ব্যাপারে আমি একরোখা হয়ে উঠি। ফল হয় এই যে, পরের বার মারামারি করবার সময় আমার গোঁয়ার্তুমিটা আরো বেশি বেড়ে যায় আর বাড়ি ফিরে এলে মা আমাকে আরো বেশি শাস্তি দেয়। একবার তো মা'কে আমি সাবধান করে দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিই যে মা যদি আমাকে মারপিট করা বন্ধ না করে তাহলে মা'র হাত কামড়ে দিয়ে আমি বাইরে মাঠে গিয়ে পড়ে থাকব আর ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মরে যাব। আঁতকে উঠে মা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে আর ক্লান্তিতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে:

'আস্ত একটা জানোয়ার হয়েছিস তুই!'

মানুষের মনের যে জীবন্ত আর রামধনুর মতো উচ্ছল অনুভূতির নাম ভালোবাসা, তা আস্তে আস্তে আমার মন থেকে মুছে যেতে থাকে। আর সে জায়গায় দেখা দেয় সবার বিরুদ্ধে ও সবকিছুর বিরুদ্ধে আক্রোশের নীল ঝলক, ধিকি ধিকি অসন্তোষ, আর এই একঘেয়ে ও বীভৎস রকমের অর্থহীনতায় আমি একেবারেই একা — এমনি একটা ধারণা।

আমার সৎ-বাপ আমাকে কড়া শাসনে রাখে আর আমার মা'র সঙ্গে প্রায় কথাই বলে না। এই লোকটি সব সময়েই শিস দেয় আর কাশে আর একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁকা-বাঁকা দাঁতগুলো খোঁটে। প্রায়ই ঝগড়া করে আমার মা'র সঙ্গে আর এই ঝগড়াটা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। মাকে এমন

নীরস ও অনাত্মীয় স্বরে ডাকে যা আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি না। ঝগড়ার সময়ে রান্নাঘরের দিকের দরজাটা সে বন্ধ করে দেয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে তার কথাগুলি আমি শুনি, এটা তার ইচ্ছে নয়। কিন্তু সেই গম্ভীর ও রূঢ় গলার স্বর শোনবার জন্যে আমি ওৎ পেতে থাকি।

একদিন শুনলাম, মেঝেতে পা ঠুকতে ঠুকতে সে চিৎকার করে বলছে:

'কুত্তী কোথাকার, তোর ওই জয়ঢাক পেটটার জন্যে আমি লোকজনকে বাড়িতে ডাকতে পারি না!'

শুনে আমি একেবারে থ' হয়ে গেলাম। রাগে আমার সর্বাঙ্গ রি-রি করতে লাগল। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে মাথাটা ছাদের সঙ্গে এমন জোরে ঠুকে গেল যে দাঁত বসে গেল আমার জিভে।

প্রতি শনিবার দলে দলে মজুর আসে আমার সৎ-বাপের কাছে। কোম্পানির দোকান থেকে খাদ্যবস্তু কেনবার জন্যে মজুরদের বরাদ্দ কুপন আছে; কুপনগুলি তারা বিক্রি করে যায়। কারখানা থেকে এই কুপনগুলি দেওয়া হয় মজুরির বদলে আর আমার সৎ-বাপ সেগুলি কেনে আধাআধি দরে। মজুরদের সঙ্গে সে দেখা করে রান্নাঘরে টেবিলের সামনে বসে, মুখে বেশ একটা ভারিক্কী ভাব ফুটিয়ে তোলে আর প্রতিটি কুপন হাতে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভুরু কুঁচকিয়ে থাকে।

'দেড় রুবল।'

'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, যীশু খ্রীষ্টের দোহাই...'

'দেড় রুবল।'

এই বিপর্যস্ত ও অন্ধকার জীবন খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মা'র যখন আঁতুড়ঘরে যাবার সময় হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দাদামশাইয়ের বাড়িতে। দাদামশাই তখন কুনাভিনো অঞ্চলে পেশচানায়া স্ট্রীটে একটা দোতলা বাড়িতে থাকেন। বাড়িটার অদূরে নাপোলনায়া গির্জার সমাধিস্থান। দাদামশাইয়ের ঘরটি ছোট আর এই ছোট ঘরটিতে একটি বৃহৎ রুশ চুল্লি। উঠোনের দিকে দুটি জানলা।

'এই যে, এসে গেছিস!' আমাকে দেখে দাদামশাই একটু যেন শব্দ করেই হেসে উঠলেন, 'কথায় আছে না, মা'র চেয়ে বড়ো আপন নেই — কিন্তু তোর বেলায় দেখছি কথাটা খাটছে না। এই বুড়ো-শয়তান দাদামশাইটাই কিনা হয়ে উঠল তোর সবচেয়ে আপন জন! হুঃ, কী সব মানুষ!'

এই বাড়িটার সঙ্গে সবে আমি খানিকটা পরিচয় করে নিয়েছি এমন সময়

বাচ্চা কোলে নিয়ে আমার মা ও দিদিমা এসে হাজির। মজুরদের ঠকাবার অপরাধে কারখানার চাকরিটি খুইয়েছে আমার সৎ-বাপ। কিন্তু বন্ধুবান্ধবকে ধরাধরি করে সঙ্গে সঙ্গে রেলস্টেশনের ক্যাশিয়ারের চাকরি পেয়ে গেছে।

তারপর বেশ কিছুটা ফাঁকা সময় কেটে যাবার পরে আবার আমাকে পাঠানো হল মা'র সঙ্গে থাকবার জন্যে। এবারে পাথরে তৈরি একটা বাড়ির মাটির তলার ঘর। সঙ্গে সঙ্গে মা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিল আর প্রথম দিন থেকেই আমি স্কুলকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখলাম।

স্কুলে হাজির হবার সময়ে আমার সাজপোশাকটা ছিল এইরকম: পায়ে মা'র একজোড়া জুতো; পরনে দিদিমার ব্লাউজের কাপড় কেটে তৈরি কোট, হলদে শার্ট আর লম্বা ট্রাউজার। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আমার পিছনে লাগতে শুরু করে দিল আর গায়ের হলদে শার্টটার জন্যে সবাই ঠাট্টা করে আমার নাম রাখল — 'রুইতনের টেক্কা'। ছেলেদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হল না। কিন্তু স্কুলের পাদরি ও শিক্ষকমশাই গোড়া থেকেই আমাকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখলেন।

শিক্ষকমশাইটির টাকমাথা ও হলদে মুখ। মাঝে মাঝে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। নাকের ফুটোদুটোয় তুলো গুঁজে দিয়ে তিনি ক্লাশঘরে ঢোকেন, ডেস্কের সামনে নিজের জায়গাটিতে বসে নাকি নাকি সুরে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন আমাদের। আর মাঝে মাঝে হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে নাক থেকে তুলো টেনে বার করেন আর মাথা ঝাঁকিয়ে সেটাকে পরীক্ষা করতে শুরু করেন। তাঁর মুখটা থ্যাবড়া আর কট্‌কটে। মুখের রঙটা তামার মতো, চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে সবুজ একটা আস্তরণ পড়েছে মনে হয়। কিন্তু তাঁর মুখের যে জিনিস দেখে সবচেয়ে বেশি গা ঘিন ঘিন করে তা হচ্ছে তাঁর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো। সারা মুখমণ্ডলের সঙ্গে এই চোখদুটোর যেন এতটুকু সঙ্গতি নেই। আর এই চোখদুটো সারাক্ষণ আমার মুখের ওপরে এ'টে আছে। তখন আমার এমন একটা অবস্থা হয় যে ইচ্ছে হতে থাকে, হাত দিয়ে আমার মুখটা মুছে নিই।

প্রথম কয়েকদিন আমি বসেছিলাম সামনের বেঞ্চিতে, শিক্ষকমশাইয়ের একেবারে নাকের নিচে। ক্রমশ সেটা অসহ্য হয়ে ওঠে। আমার মনে হতে থাকে, শিক্ষকমশাই যেন আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পান না, এবং নাকি নাকি সুরে আমাকেই শুধু বলে চলেছেন:

'পেস্কো-ও-ভ, শার্ট বদলে আসবে! পেস্কো-ও-ভ, মেঝের ওপরে পা ঘোষো না! পেস্কো-ও-ভ, তোমার জুতো থেকে আবার মেঝের ওপরে কাদার দাগ লেগেছে!'

আমিও ছেড়ে কথা বলি না। মাথা থেকে অতি মারাত্মক রকমের সব কৌশল আবিষ্কার করে তাঁকে নাস্তানাবুদ করে তুলি। একদিন করলাম কী, একটা আধ-পচা তরমুজ যোগাড় করে সেটাকে আধখানা করে ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর একটা কপিকল দিয়ে সেটাকে ঝুলিয়ে দিলাম অন্ধকার বাইরের ঘরের দিকের দরজাটার ওপরে। দরজাটা খুললেই তরমুজের টুক্‌রোটা শূন্যে উঠে যায় কিন্তু শিক্ষকমশাই যেই না দরজাটা বন্ধ করলেন অমনি তরমুজের টুক্‌রোটা নেমে এসে টুপির মতো থপ্‌ করে বসে গেল তাঁর টাকমাথার ওপরে। এই ঘটনার পরে স্কুলের রাত্রিবেলার পাহারাদার শিক্ষকমশাইয়ের চিঠি নিয়ে আমাকে বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে গেল। অপকর্মটির জন্যে একচোট পিটুনি খেতে হল আমাকে।

আরেকবার তাঁর ডেস্কের ড্রয়ারে নস্যির গুঁড়ো ছড়িয়ে রেখেছিলাম। ফলে হাঁচতে হাঁচতে তাঁর এমন অবস্থাই হল যে বাধ্য হয়ে তিনি ক্লাশ ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি নিজে আর আসতেই পারলেন না, সে-জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এক জামাইকে। এই জামাইটি হচ্ছে একজন অফিসার। সে ক্লাশ নিতে এসে আমাদের দিয়ে সারাক্ষণ শুধু দুটি গান গাওয়াল। একটি হচ্ছে, 'ভগবান জারকে দীর্ঘজীবী করুন!' অপরটি, 'স্বাধীনতা, আমার প্রিয় স্বাধীনতা!' কেউ বেসুরো গেয়ে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে তার মাথায় রুল দিয়ে টোকা মারে। টোকা মারার ভঙ্গিটা ভারি মজার; বেজায় শব্দ হয় কিন্তু একটুও ব্যথা লাগে না।

ধর্মপুস্তক যিনি পড়ান তিনি একজন তরুণ বয়সী পাদ্‌রি, মাথায় ফুলো ফুলো ঘন চুল এবং তাঁর চেহারাটা সুন্দর। তিনি আমাকে অপছন্দ করেন কারণ 'বাইবেলের গল্প' বইটা আমার নেই আর তাঁর কথা বলার ভঙ্গি আমি নকল করি।

ক্লাশঘরে ঢুকেই তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞেস করা:

'পেশ্‌কভ, তুমি বই এনেছ কি আননি? হ্যাঁ, বই।'

'না, আনিনি। হ্যাঁ।'

'"হ্যাঁ" মানে?'

'না।'

'যাও, এক্ষুণি বাড়ি চলে যাও! হ্যাঁ, বাড়ি। কারণ তোমার মতো ছেলেকে পড়াবার ইচ্ছে আমার নেই। হ্যাঁ, বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।'

বাড়ি ফিরে যেতে আমার আপত্তি নেই। তাহলে আমি স্কুল-ছুটির সময় না হওয়া পর্যন্ত এই অঞ্চলের নোংরা রাস্তাগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারি এবং চারপাশের বিচিত্র কোলাহলপূর্ণ জীবনকে লক্ষ্য করতে পারি।

পাদরিমশাইয়ের মুখটি সুকুমার, যিশু খ্রীষ্টের মুখের মতো। মেয়েলি চোখদুটো থেকে স্নেহ ঝরে পড়ছে। ছোট ছোট হাত; বই বা রুল বা কলম বা অন্য যা-কিছুর ওপরে সেই হাতের ছোঁয়া পড়ে, মনে হয় যেন আদর করছেন। মনে হয়, প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনি ভালোবাসেন, প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনি জীবন্ত বলে মনে করেন — যেন অসতর্কভাবে নাড়াচাড়া করলে এই জিনিসগুলোর ব্যথা লাগবে। তবে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ওপরে তাঁর স্নেহটা এর চেয়ে কমই — তা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা তাঁকে ভালোবাসে।

স্কুলে সাধারণত আমি মোটামুটি ভালোই নম্বর পেয়েছিলাম কিন্তু তবুও আমাকে জানিয়ে দেওয়া হল যে আমার বেয়াদবির জন্যে আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। খবরটা শুনে আমি বিচলিত হলাম। ব্যাপারটা যদি তাই ঘটে তবে নিঃসন্দেহে এই ব্যাপারের ফলাফল আমার পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠবে। আমার মা'র মেজাজটা দিনের পর দিন তিরিক্ষি হয়ে উঠছে এবং আজকাল প্রায়ই সে আমাকে মারধোর করে।

কিন্তু এই চরম বিপদ থেকে আমি উদ্ধার পেয়ে গেলাম। বিশপ ক্রিসান্‌ফ* আমাদের স্কুল পরিদর্শনে এলেন; একেবারেই হঠাৎ-আসা, আগে থেকে কোনো রকম ঠিক ছিল না। যতোদূর আমার মনে আছে বিশপ ক্রিসান্‌ফের পিঠে কুঁজ ছিল।

মানুষটি ছোট, পরনে ফুরফুরে কালো পোশাক; তিনি যখন ক্লাশঘরে ঢুকে ডেস্কের সামনে আসন গ্রহণ করলেন তখন খুশি ও অন্তরঙ্গতার একটা অপরিচিত হাওয়ায় ক্লাশঘরটা যেন ভরে গেল।

* বিশপ ক্রিসান্‌ফ — বিখ্যাত তিনখণ্ডে-সমাপ্ত 'প্রাচীন পৃথিবীর ধর্ম' পুস্তকের গ্রন্থকার এবং 'মিশরীয় দেহান্তরবাদ' ও 'নারী ও বিবাহ' প্রবন্ধদ্বয়ের লেখক। শেষোক্ত প্রবন্ধটি আমাকে তরুণ বয়সে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। প্রবন্ধটির শিরোনামা হয়তো আমি ভুল লিখে থাকতে পারি — প্রবন্ধটি অষ্টম দশকে একটি ধর্ম-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। — গোর্কি

জামার মস্ত মস্ত আস্তিনের ভিতর থেকে হাতদুটো বার করে তিনি বললেন, 'বাবারা, এস একটু গল্পগুজব করা যাক্।'

নাম ধরে ধরে তিনি এক-একজনকে ডেস্কের সামনে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। আমার পালা এল তালিকার একেবারে শেষ দিকে।

'তোমার বয়স কত?' জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, 'সত্যি? বাব্‌বাঃ, এইটুকু বয়সেই কী প্রকাণ্ড শরীর হয়েছে তোমার! অনেক রোদজল গায়ের ওপর দিয়ে গেছে নিশ্চয়ই?'

রোগা রোগা হাত, আঙুলের নখগুলো লম্বা আর ছুঁচলো। একটা হাত রাখলেন টেবিলের ওপরে, আরেক হাতে ধরলেন মুখের অল্প কয়েক গোছা দাড়ি। দরদভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি:

'আচ্ছা, ধর্মপুস্তকের যেসব গল্প তোমার ভালো লাগে তার একটা বলো তো শুনি।'

যখন আমি তাঁকে বললাম যে পাঠ্য ধর্মপুস্তকের বইটি আমার নেই, সুতরাং কোনো গল্পই আমি পড়তে পারিনি — তিনি তাঁর টুপি ঠিকঠাক করে বসে বললেন:

'বই না থাকলে তো চলবে না। এসব তো তোমাকে শিখতেই হবে — বুঝেছ তো? বইয়ের গল্পগুলোর কথা থাক্। আচ্ছা, অন্যের মুখে শুনে-টুনেও তো কিছু জানা থাকতে পারে — এই কোনো একটা গল্প বা যা-হোক্ কিছু — তাই একটা বল তো শুনি। তুমি প্সাল্টির পড়েছ? বেশ, বেশ! উপাসনা করতে শিখেছ? বাঃ, কে বলে তুমি কিচ্ছু জান না? আচ্ছা, কোনো সাধু-মহাপুরুষের জীবনী জানা আছে? কি বললে, ছড়ায় বলে যেতে পার? কী কাণ্ড, তুমি যে দেখছি একেবারে পণ্ডিত লোক হয়ে উঠেছ!'

এমন সময়ে আমাদের স্কুলের পাদ্‌রিমশাই এসে হাজির। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে আর জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন। বিশপ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, তারপরেই তিনি আমার নামে বলতে লাগলেন বিশপের কাছে।

'একটু সবুর করুন!' হাত উঠিয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে বিশপ বললেন, তারপর আবার ফিরে তাকালেন আমার দিকে, 'আচ্ছা, তুমি আমাদের "ঈশ্বরানুগৃহীত আলেক্সেই"এর গল্পটা একটু শোনাও তো দেখি...'

একটা লাইন ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা মনে করবার জন্যে একটু থামতেই তিনি বললেন, 'ভারি চমৎকার ছড়া, না বাবা? মনে হচ্ছে, এ গল্পটা ছাড়াও

আরো কিছু কিছু গল্প তোমার জানা আছে। আচ্ছা, রাজা ডেভিডের গল্পটা জানো? বেশ, বেশ। ভারি খুশি হলাম তোমার কথা শুনে!'

আমি বুঝতে পারছিলাম, এই গল্পগুলি শুনতে তাঁর খুবই ভালো লাগছে এবং ছড়া তিনি খুবই ভালোবাসেন। অনেকক্ষণ ধরে আমি বলে চললাম। আমাকে বাধা না দিয়ে চুপ করে শুনে গেলেন তিনি, শেষকালে বললেন:

'তোমার কি প্সাল্টির থেকে বর্ণপরিচয় হয়েছে? কে তোমাকে পড়িয়েছিলেন? ভালো-মানুষ দাদামশাই? ভালো নয়? খারাপ-মানুষ দাদামশাই! ছি, ছি, এমন কথা বলতে নেই! আর তুমি কি খুব দুষ্টুমি কর?'

আমি লজ্জা পেলাম কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলাম। শিক্ষকমশাই আর পাদ্রিমশাই ফলাও করে আমার অপরাধের বর্ণনা দিতে শুরু করলেন। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বিশপ শুনলেন তাঁদের কথা।

শেষকালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'শুনছ তো, তোমার সম্পর্কে ওঁরা কী বলছেন? এদিকে এস!'

একটা হাত রাখলেন আমার মাথার ওপরে, তাঁর হাতে সাইপ্রেসের গন্ধ। বললেন:

'তুমি এত দুষ্টুমি করো কেন?'

'স্কুল আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না? শোন বাবা, তোমার একথা শুনে বুঝতে পারছি, তোমার মধ্যে কোথাও একটা কিছু গলদ আছে। স্কুল যদি তোমার ভালো না লাগে তাহলে বলতে হবে যে তুমি খারাপ ছেলে। কিন্তু তোমার পরীক্ষার নম্বর দেখে বুঝতে পারছি যে তুমি খারাপ ছেলে নও। নিশ্চয়ই কোথাও একটা কিছু গলদ আছে।'

আলখাল্লার ভিতর থেকে ছোট একটা বই বার করে তিনি লিখলেন, 'পেশ্কভ, আলেক্সেই'। আর বলতে লাগলেন, 'তোমার ওই দুষ্টুমি যদি বন্ধ করতে পার বাবা, তবেই তোমার মঙ্গল। একটু-আধটু দুষ্টুমি করলে কোনো ক্ষতি নেই, ওতে লোকে কিছু মনে করে না। কিন্তু দুষ্টুমির মাত্রাটা বড়ো বেশি হয়ে গেলে সবার পক্ষেই তা অসহ্য। ঠিক বলিনি বাবারা?'

'ঠিক বলেছেন!' কলকণ্ঠে ও সমস্বরে জবাব এল।

'আচ্ছা এবার তোমাদের কথা বলো তো শুনি। তোমরা সবাই খুব লক্ষ্মী ছেলে — না?'

'না, না, মোটেই নই।' ছেলেরা হাসতে লাগল।

বিশপ আমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর এমন একটা অবাক-হওয়া সুরে কথা বলতে লাগলেন যে শিক্ষকমশাই ও পাদ্রিমশাই পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারলেন না।

'শোন তোমাদের বলি — তোমাদের মতো বয়সে আমিও খুব দুষ্টু ছিলাম! কেন আমাদের ও-রকম হয় জানো?'

ছেলেরা হাসছে। তিনি তাদের প্রশ্ন করছেন; প্রশ্নগুলি এমন চালাকির সঙ্গে করছেন যে ছেলেরা নিজেদের কথার জালে নিজেরাই আটকা পড়ে যাচ্ছে। ভারি একটা ফুর্তির আবহাওয়া এসে গেছে ক্লাশঘরের মধ্যে, ফুর্তিটা ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে। শেষকালে একসময়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন:

'তোমাদের মতো দুষ্টু ছেলেদের ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করে না! কিন্তু আমার যাবার সময় হয়ে গেছে, এবার রওনা হতে হবে।'

চওড়া আস্তিনটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাত তুলে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন ক্লাশের উদ্দেশে:

'বেঁচে থাক বাবারা। ভালো কাজে মন দাও। জগৎ-পিতা আর তাঁর সন্তানের নামে, পরম আত্মার নামে, তোমাদের এই আশীর্বাদই করি। বিদায়।'

'বিদায়, প্রভু! তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসবেন!' ছেলেরা চেঁচিয়ে বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি জবাব দিলেন, 'আসব, নিশ্চয়ই আসব। তোমাদের জন্যে বই নিয়ে আসব আমি।' তারপর শিক্ষকমশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'আজ ওদের ছুটি দিয়ে দিন।'

আমাকে নিয়ে সদরের কাছে এসে থামিয়ে চাপা স্বরে তিনি বললেন, 'বাবা, আমাকে কথা দিতে হবে যে আর কক্ষণো এমন দুষ্টুমি করবে না। কথা দিচ্ছ তো বাবা? কেন যে তুমি এমন দুষ্টুমি করো তা আমিও বুঝি — কিন্তু বাবা, একটু রয়ে-সয়ে। আচ্ছা চলি এবার, কেমন?'

কথাগুলো শুনে আমি খুবই বিচলিত হলাম। অদ্ভুত একটা আবেগ বুকের মধ্যে ফুলেফেঁপে উঠছে। অবস্থা এমন হল যে, আমার শিক্ষকমশাই যখন আমাকে ক্লাশের পরে আটকে রেখে উপদেশ দিতে শুরু করলেন এবং

বললেন যে এবার থেকে আমাকে ভেড়ার মতো বাধ্য হয়ে চলতে হবে—তখনো আমি স্বেচ্ছায় ও স-মনোযোগে তাঁর কথা শুনলাম।

কোটটা পরতে পরতে সস্নেহে পাদ্‌রিমশাই বললেন, 'এখন থেকে আমার ক্লাশে তোমাকে থাকতে হবে। হ্যাঁ, থাকতে হবে। আর চুপটি করে বসে থাকতে হবে। হ্যাঁ, চুপটি করে।'

স্কুলের গোলমাল মিটে গেল। কিন্তু বাড়িতে একটা ভারি বিশ্রী কাণ্ড করে বসলাম। একটা রুব্‌ল চুরি করলাম মা'র তহবিল থেকে। ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত নয়। একদিন সন্ধ্যার সময় মা যেন কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল এবং বাচ্চাটিকে আগলে আমি ছিলাম বাড়িতে। চুপ করে বসে থেকে থেকে যখন ভালো লাগছিল না তখন যা-হোক একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে আমার সৎ-বাপের একটা বই টেনে নিয়েছিলাম। বইটার নাম, 'চিকিৎসকের স্মারকলিপি'। লেখক জ্যেষ্ঠ ডুমা। বইটা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে পাতার ভাঁজে একটা এক-রুবল ও একটা দশ-রুব্‌লের নোট পেলাম। বইটার একবর্ণও আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু বইটা বন্ধ করে রেখে দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার মাথায় একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল। রুবল্‌টা যদি আমি নিয়ে নিই তাহলে সেটা দিয়ে শুধু যে 'বাইবেলের গল্প' বইটাই কেনা চলে তা নয়, 'রবিনসন ক্রুসো' বইটাও কেনা চলে। রবিনসন ক্রুসো নামে যে একটা বই আছে, এ-খবরটা আমি অল্প কিছুকাল হল পেয়েছি। এক শীতের দিনে টিফিনের সময় আমি ছেলেদের কাছে রূপকথার গল্প বলছিলাম, হঠাৎ একটি ছেলে ঠোঁট উল্‌টিয়ে বলে উঠল, 'এসব রূপকথার গল্প একেবারে বাজে! গল্পের মতো গল্প হচ্ছে, রবিনসন ক্রুসো—সত্যিকারের গল্প।'

ছেলেদের দলে আরো কয়েকজন ছিল যারা রবিনসন ক্রুসো পড়েছে। সকলেই বইটার সুখ্যাতি করল। দিদিমার গল্পকে এভাবে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দেখে আমি খুবই আঘাত পেলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যে-করে হোক্ রবিনসন ক্রুসো বইটা যোগাড় করব এবং বইটা পড়ে নিয়ে দেখিয়ে দেব যে দিদিমার গল্পের চেয়ে বইটা কিছুতেই ভালো হতে পারে না!

পরদিন আমি যখন স্কুলে এলাম তখন আমার সঙ্গে ছিল 'বাইবেলের গল্প', এণ্ডারসনের রূপকথার দুটি জীর্ণ খণ্ড, তিন পাউণ্ড সাদা রুটি আর এক পাউণ্ড সসেজ। ভ্লাদিমির গির্জা পেরিয়ে রাস্তার মোড়ে যে অন্ধকার ছোট বইয়ের দোকানটা আছে সেখানেই 'রবিনসন ক্রুসো' বইটাও

পেয়েছি। বইটা খুবই পাতলা, হলদে মলাট, মলাট উলটিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় বইয়ের নাম ও এক দাড়িওলা লোকের ছবি। লোকটির মাথায় ফারের টুপি আর কাঁধে বাঘের ছাল। এই ছবিটা আমায় মোটেই আকর্ষণ করতে পারেনি। বরঞ্চ রূপকথার বইয়ের পুরনো আর ছেঁড়া বাঁধাইটুকু পর্যন্ত আমার কাছে মনোমুগ্ধকর

টিফিনের সময়ে অনেকক্ষণ ছুটি। সেই সময়ে ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গে ভাগ করে আমি রুটি আর সসেজ খেলাম, তারপর সকলে মিলে 'বুলবুল' নামে গল্পটা পড়তে শুরু করলাম। ভারি চমৎকার গল্পটি, একেবারে প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়।

'চীনদেশে সব মানুষই চীনা, এমন কি সম্রাটও চীনা।' আমার এখনো মনে আছে, এই লাইনটির সহজ সরসতা ও উচ্ছল সুর এবং তা ছাড়াও আশ্চর্যরকমের ভালো আরো কিছু আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

'বুলবুল' গল্পটা স্কুলে শেষ পর্যন্ত পড়বার সময় পাইনি। বাড়ি ফিরে আসতেই এক কান্ড। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিম ভাজছিল, আমাকে দেখেই মুখ তুলে থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল:

'তুই একটা রুবল নিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।•এই যে বই কিনেছি...'

সঙ্গে সঙ্গে লাঠি দিয়ে মা আমাকে দমাদম পিটোতে শুরু করল। রূপকথার বইগুলো ছিনিয়ে নিল আমার হাত থেকে এবং এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখল যাতে আমি আর কোনো দিনই বইগুলো খুঁজে না পাই। পিটুনি দেওয়ার চাইতেও এই শাস্তিটাই আমার কাছে অসহ্যরকমের যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়েছিল।

তারপর কয়েকদিন আমি আর স্কুলে যাইনি। ইতিমধ্যে আমার সৎ-বাপ আমার এই কীর্তির কথা কারখানার লোকদের কাছে বলেছে, আবার কারখানার লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করেছে এই নিয়ে, তারপর ছেলেদের মুখে মুখে স্কুলেও ছড়িয়ে পড়েছে এই গল্প। আমি যতোদুর বুঝতে পারি এইভাবেই গড়িয়েছিল ব্যাপারটা। তারপর আমি যেদিন আবার প্রথম স্কুলে গেলাম, সবাই আমাকে অভ্যর্থনা জানাল নতুন একটা ডাকনামে ডেকে: চোর! নামটি সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট—কিন্তু অসঙ্গত। রুবলটা যে আমি নিয়েছি এ-ব্যাপারটা গোপন করবার কোনো চেষ্টা আমি করিনি, ব্যাপারটা তাদের আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু

কেউ আমার কথা বিশ্বাস করল না। তাই বাড়ি ফিরে এসে আমি মা'কে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম যে স্কুলে আমি আর কোনো দিন যাব না।

আমার মা আবার অন্তঃসত্ত্বা। জানলার ধারে বসে খাওয়াচ্ছিল আমার ভাই সাশাকে। পাশুটে মুখটা ফিরিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত আর ক্লিষ্ট দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, মুখটা হাঁ হয়ে গেল মাছের মতো।

'তুই মিথ্যে কথা বলছিস,' মৃদুস্বরে বলল মা, 'তোর রুব্‌ল নেবার কথা অন্য লোক শুনবে কি করে?'

'যাও তুমি, জিজ্ঞেস করে দেখ গিয়ে।'

'নিশ্চয় তুই নিজেই তাদের বলেছিস। সত্যি কথা বল্ তো—বলেছিস কিনা? খবরদার যা-তা বলবিনে—কাল আমি স্কুলে গিয়ে নিজেই খোঁজ করে আসব, কে একথা বলেছে।'

আমি ছাত্রটির নাম করলাম। শুনে মা'র মুখটা কেমন মুষড়ে গেল আর চোখের জলে ভিজে গেল।

রান্নাঘরে চুল্লির পিছনদিকে পুরানো কাঠের বাক্স সাজিয়ে আমার জন্যে বিছানা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলাম, পাশের ঘরে আমার মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে:

'হায় প্রভু! হায় প্রভু!..'

তেলচিট্‌চিটে গরম ছেঁড়া কম্বলগুলোর গন্ধ অসহ্য মনে হতে লাগল। বিছানা ছেড়ে বাইরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'কোথায় যাচ্ছিস রে? আয়, আমার কাছে আয়?' মা ডাকল আমাকে।

তারপর মেঝের ওপরে পাশাপাশি বসে রইলাম দু'জনে। সাশা শুয়ে আছে মা'র কোলে আর মার জামার বোতাম ধরে টানাটানি করছে। মাঝে মাঝে আপন মনেই মাথা নাড়ে আর বলে, 'বুবম।' মানে, বোতাম।

মা'র গা ঘেঁষে আমি বসে রইলাম। একটা হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল মা। বলল:

'জানিস তো, আমরা খুবই গরীব। আমাদের কাছে প্রত্যেকটি কোপেক... প্রত্যেকটি কোপেক...'

উষ্ণ হাত দিয়ে মা আমাকে জোরে চেপে ধরেছে। যে কথাগুলো সে বলতে চাইছে তা আর কিছুতেই শেষ করতে পারছে না।

'চামার, একেবারে চামার!' হঠাৎ কথাগুলো বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। ঠিক এই কথাগুলো মা'র মুখে আগে আরেকবার আমি শুনেছি।

'মার,' মা'র কথাটাকে নকল করতে চেষ্টা করছে সাশা।

ভারি অদ্ভুত হয়েছে এই বাচ্চাটা। ল্যাকপেকে চেহারা আর প্রকান্ড একটা মাথা। চোখদুটো আশ্চর্যরকমের নীল, আর হাসি-হাসি চোখে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যে মনে হয় যে কিছু একটা ঘটবে বলে সে আশা করছে। অস্বাভাবিক অল্প বয়সেই সে কথা বলতে শুরু করেছে। কক্ষণো কাঁদে না, আনন্দের একটা তুরীয় অবস্থায় বাস করছে যেন। সে এত দুর্বল যে হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতাটুকুও তার প্রায় নেই। কিন্তু আমাকে যখনই দেখে ভারি খুশি হয়। ক্ষুদে ক্ষুদে হাতদুটো বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে আর নরম-নরম ছোট-ছোট আঙুলে আমার কান নিয়ে খেলা করে। আর ওর আঙুলগুলোতে সব সময়েই কেন জানি ভায়োলেট ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। এই বাচ্চাটি আচমকা মারা গিয়েছিল, কোনো রকম অসুখ পর্যন্ত করেনি। সকালবেলাতেও নিজের চাপা আনন্দে নিজেই মশগুল হয়ে ছিল, আর সন্ধ্যেবেলায় যখন গির্জার সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা বাজছে তখন কবর দেবার জন্যে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। ব্যাপারটা ঘটেছিল ওর পরের ভাই নিকোলাইয়ের জন্মের ঠিক পরেই।

স্কুলে গিয়ে সকলের ভুল ধারণা কাটিয়ে দিয়ে আসবে বলে মা যে কথা দিয়েছিল তা রেখেছে। তারপর থেকে আবার আমি নিয়মিত লেখাপড়া করছি। কিন্তু আবার এমন একটা ঘটনা ঘটে যার ফলে আবার আমাকে দাদামশাইয়ের কাছে চলে যেতে হয়। ঘটনাটি এই:

একদিন চায়ের সময়ে আমি উঠোন থেকে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় শুনতে পেলাম, আমার মা ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করছে:

'ইয়েভগেনি, ইয়েভগেনি, তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি যেও না!'

আমার সৎ-বাপ জবাব দিল, 'বাজে বোকো না!'

'কিন্তু আমি জানি তুমি ওই মেয়েটির কাছেই যাও।'

'বেশ করি যাই—তাতে কী হয়েছে?'

দুজনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কাশির দমকের ফাঁকে ফাঁকে মা বলল:

'কী নীচ আর অপদার্থ চামার হয়েছ তুমি!'

তারপরেই শুনলাম, আমার সৎ-বাপ আমার মা'কে মারছে। ছুটে ঘরের ভিতরে ঢুকলাম আমি। দেখলাম, আমার মা হাঁটু মুড়ে বসে আছে, পিঠ আর কনুই দিয়ে একটা চেয়ার শক্তভাবে চেপে ধরে আটকে রেখেছে নিজেকে, মাথাটা হেলে পড়েছে পিছনদিকে, অস্বাভাবিক চক্‌চক্ করছে চোখদুটো—আর মা'র ঠিক সামনেটিতে ফিটফাট নতুন পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে আমার সৎ-বাপ, লম্বা পা তুলেছে মাকে লাথি মারবার জন্যে। রুপোর বাঁট লাগানো একটা ছুরি তুলে নিলাম টেবিলের ওপর থেকে—আমার বাবার যে-সমস্ত জিনিস মা'র কাছে ছিল তার মধ্যে এই ছুরিটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারপরে আমার সৎ-বাপের শরীরের পাশের দিকটা লক্ষ্য করে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুরি বসালাম।

আমার সৎ-বাপের কপাল বলতে হবে, আমার মা ঠিক সময়টিতে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। ছুরিটা তার কোট ফুঁড়ে গায়ের চামড়া ছুঁয়ে গেছে মাত্র। কাৎরে উঠে একপাশটা চেপে ধরে সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর্ত চিৎকার করে আমার মা শক্তমুঠোয় আমাকে ঠেসে ধরল মেঝের ওপরে। উঠোন থেকে ফিরে এসে আমার সৎ-বাপ মা'র কবল থেকে মুক্ত করল আমাকে।

আর এতসব কাণ্ডের পরেও আমার সৎ-বাপ সেদিন সন্ধ্যার পরে বেরিয়েছিল। চুল্লির পিছনদিকে যেখানে আমি শুয়েছিলাম, সেখানে মা এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আলতোভাবে আমাকে বুকের ওপরে চেপে ধরে চুমু খেয়ে বলল:

'কিছু মনে করিসনে, আমারই দোষ। কিন্তু তোর কি মাথা খারাপ হয়েছিল? ছুরি নিয়ে তেড়ে এসেছিলি!'

আমি যে-জবাব দিয়েছিলাম তার অর্থ সম্পর্কে আমার মনে কোনো রকম অস্পষ্টতা ছিল না। মা'কে জানিয়ে দিলাম যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার সৎ-বাপকে খুন করব এবং তারপরে নিজেও খুন হব। আরেকটু হলে করে বসতামও—অন্তত একবার চেষ্টা তো করতাম। এখনো পর্যন্ত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই কলুষিত পাটাকে। উজ্জ্বল রঙের ফেটি লাগানো ট্রাউজার পরা সেই পাটা বাতাসে দুলছে আর একটি স্ত্রীলোকের বুক লক্ষ্য করে নেমে আসছে।

মাঝে মাঝে যখন এই বর্বরোচিত রুশ জীবনের ঘৃণিত অস্তিত্বের কথা ভাবি তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এ-সব কথা নতুন করে বলার কোনো

সার্থকতা আছে কিনা। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে কথাগুলো সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতেই হবে। কারণ এ হচ্ছে সেই সময়কার এক অতি ভয়ঙ্কর ও বাস্তব সত্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত এর মূল উৎপাটিত হয়নি। এ হচ্ছে এমন এক সত্য যা পুরোপুরি উদ্ঘাটিত করতে হবে এবং আমাদের এই লজ্জাকর ও বীভৎস জীবন থেকে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে—যেন মানুষের স্মৃতিতে আর মানুষের আত্মায় এর চিহ্নমাত্র না থাকে।

তাছাড়া, এই সমস্ত বীভৎসতাকে বর্ণনা করবার কাজে আমাকে যে হাত দিতে হয়েছে, তার পিছনে আরও বাস্তব কারণ আছে। এই বীভৎসতা দেখে শিউরে উঠতে হয়, এমনিতে অতি চমৎকার মানুষকেও এই বীভৎসতা বিকৃতচরিত্র করে তোলে—কিন্তু তবুও রুশজাতির এখনো এমন তারুণ্য ও সুস্থ প্রাণশক্তি আছে যে এই বীভৎসতাকে সে একেবারে মুছে দিতে পারে এবং সম্পূর্ণভাবে তা মুছে দেবেও।

আমাদের জীবনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় শুধু এইজন্যে নয় যে এই জীবনের একদিকে আছে পশুসুলভ প্রচণ্ড একটা নোংরামি যা দিনের পর দিন পাহাড়প্রমাণ হয়ে উঠেছে; আশ্চর্য হতে হয় এইজন্যেও যে এই জীবনের অন্তরালে এক সুস্থ সৃজনশীল শক্তিও দেদীপ্যমান। সৎশক্তির প্রভাব বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস জাগে যে একদিন না একদিন আমাদের দেশের মানুষ এক পূর্ণ প্রস্ফুটিত জীবনের সৌন্দর্যে ও উজ্জ্বল মানবিকতায় অধিষ্ঠিত হবে।

তের

আবার সেই দাদামশাইয়ের সঙ্গে থাকা।

'কী রে হতচ্ছাড়া, এসেছিস!' টেবিলের ওপরে অস্থিরভাবে আঙুলের টোকা দিতে দিতে দাদামশাই আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন, 'আমি কিন্তু তোকে আর খাওয়াব না বলে রাখছি। এবার তোর ভার তোর দিদিমাকেই নিতে হবে।'

দিদিমা বললেন, 'সে আমি ব্যবস্থা করব'খন। এ আর এমন কি শক্ত কাজ!'

'আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে,' দাদামশাই হুঙ্কার ছাড়লেন, আর তৎক্ষণাৎ

শান্ত হয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন আমার কাছে, 'জানিস তো, আমাদের এখন সব আলাদা আলাদা—যার যার, তার তার।'

জানলার কাছে বসে বসে দিদিমা লেস বোনেন। তাঁর হাতের শলাকা আনন্দের সুরে টুংটাং শব্দে বেজে ওঠে, নিচে পেতলের পিন বসানো ছোট্ট বালিশটা বসন্তকালের রোদে সোনালী সজারুর মতো ঝক্‌ঝক্ করে। আর চেহারার দিক থেকেও দিদিমা এতটুকু বদ্‌লাননি, মনে হয় যেন ব্রোঞ্জের গড়া মূর্তি। কিন্তু দাদামশাই আরো রোগা হয়ে গেছেন, তাঁর গায়ের চামড়ায় আরো বেশি ভাঁজ পড়েছে, মাথার লাল চুল পাতলা হয়েছে আরো। তাঁর চালচলনের মধ্যে যে একটা প্রশান্ত আড়ম্বর ছিল তা আর নেই, তার বদলে মেজাজটা উগ্র আর খিটখিটে হয়ে গেছে, কিছু না কিছু নিয়ে সব সময়েই তোলপাড় করছেন। সবুজ চোখদুটো দিয়ে সবকিছুই দেখেন সন্দেহের দৃষ্টিতে।

দিদিমা ও দাদামশাইয়ের মধ্যে কি-ভাবে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়েছে সেকথা হাসতে হাসতে দিদিমা বললেন আমাকে। থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি জিনিসগুলো দিদিমাকে দিয়ে দাদামশাই বলেছেন, 'এগুলি সব তোমার। বাস্, এই শেষ। এছাড়া আর কিছু চাইতে এস না আমার কাছে।'

একথা বলে দিদিমার সমস্ত পুরানো পোশাক এবং সম্পত্তি বলতে যা কিছু ছিল, তার মধ্যে শেয়াল-কোটটা, তিনি নিয়েছেন। সাতশো রুব্‌লে বিক্রি করেছেন জিনিসগুলো। তারপর এই সাতশো রুব্‌ল সুদে ধার দিয়েছেন নিজের ধর্মপুত্রকে; এই ধর্মপুত্রটি একজন দীক্ষিত ইহুদি, ফলের ব্যবসা আছে তার। নির্লজ্জ রকমের লোভী হয়ে উঠেছেন দাদামশাই, এত বেশি লোভ যে সেটা তাঁর প্রায় অসুখে দাঁড়িয়ে গেছে। পুরনো দিনের পরিচিত লোকজনের কাছে যাতায়াত শুরু করেছেন। এরা কেউ বা ধনী ব্যবসায়ী, কেউ বা কারিগর—সকলেই তাঁর পুরনো দিনের সহকর্মী। এদের কাছে গিয়ে তিনি বলেন যে ছেলেরা তাঁর সর্বনাশ করেছে এবং এই বলে টাকা চান। পুরনো দিনের খাতিরে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে এবং দরাজ হাতে টাকা দেয়। বাড়ি ফিরে এসে মোটা মোটা নোটের তাড়া দিদিমার নাকের নিচে নাড়তে নাড়তে ছোটো ছেলের মতো আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলতে থাকেন:

'দেখে নাও, ভালো করে দেখে নাও! দেবে তোমাকে কেউ এতগুলি টাকা? এর দশভাগের একভাগ টাকাও কেউ তোমাকে দেয় তো কি বলেছি!'

এই টাকাটা আমার দাদামশাই দু'জন নতুন পরিচিত লোককে সুদে ধার দিলেন। একজনকে সবাই ডাকে 'চাবুক' বলে; পশুর লোমের ব্যবসা করে লোকটি, লম্বা চেহারা, মাথায় টাক। অপরজন হচ্ছে তার বোন; একটি দোকান চালায় সে; লাল গাল, কালো চোখ, ঝোলাগুড়ের মতো মিষ্টি ও টইটম্বুর চেহারা।

বাড়ির মধ্যে সব ব্যাপারেই ভাগাভাগি। একদিন হয়তো দিদিমা তাঁর নিজের টাকা দিয়ে খাবার কিনে এনে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন, আবার পরের দিন রুটি ও খাবার কিনে আনেন দাদামশাই। যেদিন দাদামশাইয়ের পালা সেদিন খাওয়াদাওয়াটা যাচ্ছেতাই হয়। দিদিমা কিনে আনেন সরেস মাংস আর দাদামশাই কেনেন কলিজা ও নাড়িভুঁড়ি। চা আর চিনির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা তবে চা ভেজানো হয় একই পাত্রে। প্রতিবার চা ভেজানোর পরে দাদামশাই আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন:

'দাঁড়াও, দেখি, কতটা চা ভিজিয়েছ?'

তারপর চায়ের পাতাগুলো হাতের ওপর নিয়ে খুব সাবধানে একটি একটি করে গুণতে থাকেন।

'তোমার চায়ের পাতাগুলো সরু সরু আর আমার গুলো মোটা মোটা। আমার চয়ে ভালো লিকার হয়—কাজেই তোমার চায়ের ভাগটা আমার চেয়েও বেশি হওয়া দরকার।'

তারপর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, তাঁর নিজের পাত্রের চা দিদিমার পাত্রের চায়ের মতোই ঠিক সমান কড়া হচ্ছে কিনা এবং দিদিমা নিজের কাপে যতোবার চা ঢালছেন তাঁর কাপেও ঠিক ততোবার চা ঢালছেন কিনা।

শেষবার চা ঢালবার সময় দিদিমা জিজ্ঞেস করেন, 'শেষবারের মতো আরেক কাপ হবে নাকি?'

চায়ের পাত্রের ভিতরটা দেখে নিয়ে দাদামশাই সায় জানান, 'আচ্ছা বেশ, শেষবারের মতো আরেক কাপ হোক না!'

এমন কি আইকনের প্রদীপে যে তেলটুকু খরচ হয় তাও দু'জনে পালা করে কিনে আনেন। আর এ সব ঘটে পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে ঘর করার পরে!

প্রতিটি ব্যাপারে দাদামশাইয়ের এইসব খুঁতখুঁতানি দেখে আমি মজাও পাই আবার বিরক্তও হই। দিদিমা কিন্তু শুধু মজাই পান। দিদিমা আমাকে বলেন:

'এসব কথা মনে রাখিসনে! এতে আর কী হয়েছে? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো বাতিক হয়েছে—এই আর কি। চার কুড়ি বয়স হয়ে গেছে—ব্যাপারটা একবার ভাব তো দেখি! এই বয়সে অমন একটু-আধটু বাতিক হয়েই থাকে—ওটুকু সহ্য করে নিতেই হয়, এতে কারুরই কিছু যায় আসে না। আর তোর আর আমার কথা যদি ধরিস—আমাদের দু'জনের জন্যে তো ভাবনা নেই, যে করে হোক দু-মুঠো জুটিয়ে নিতে পারব!'

আমিও রোজগার করতে শুরু করি। প্রতি রবিবার ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ি একটা থলে নিয়ে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি; হাড়ের টুক্‌রো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, পেরেক ও কাগজ কুড়োই। আধ মণ ছেঁড়া ন্যাকড়া বা কাগজ বা ধাতুর বদলে আবর্জনার কারবারী আমাদের কুড়ি কোপেক দেয়, আর আধ মণ হাড়ের টুক্‌রোর জন্যে আট বা দশ কোপেক। আবর্জনা কুড়োবার কাজটা সারা সপ্তাহ ধরেই চালিয়ে যাই আমি; রবিবার ছাড়া অন্যান্য দিনগুলোতে বেরোই স্কুল ছুটির পরে। প্রত্যেক শনিবারে আমার রোজগার হয় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কোপেক (কপাল খুলে গেলে কোনো সপ্তাহে এর চেয়ে বেশিও হয়)। রোজগারের পয়সা দিদিমার হাতে এনে দিলেই দিদিমা পয়সাগুলোকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের স্কার্টের পকেটে রেখে দেন, চোখ নিচু করে থাকেন ও আমার সুখ্যাতি করেন:

'সোনা আমার, মাণিক আমার, কী বলে যে তোকে আশীর্বাদ করব! দেখছিস তো, তোকে আর আমাকে কোনো দিন উপোস করতে হবে না! আমরা তো সব পারি?'

একদিন আমার চোখে পড়ে গেল, আমার রোজগারের পয়সার পাঁচ-কোপেক হাতে নিয়ে দিদিমা নিঃশব্দে কাঁদছেন। তাঁর তুলতুলে নাকের ডগা থেকে একফোঁটা আলো-ঠিকরনো চোখের জল ঝুলে রয়েছে।

আমি কিন্তু টের পেয়ে গেলাম যে রাস্তার আবর্জনা কুড়িয়ে যতোটুকু না লাভ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয় কাঠগোলাগুদাম থেকে কাঠ চুরি করতে পারলে। লাকড়ি-গুদাম আছে ওকা নদীর ধারে আর বালুচর নামে একটা দ্বীপে। এই দ্বীপে বছরে একবার মেলা বসে, সেখানে ধাতু কেনাবেচা হয়। কাজ চলা গোছের অস্থায়ী ঘর তৈরি হয় এই উদ্দেশ্যে। মেলা শেষ হয়ে গেলে ঘরগুলো খুলে ফেলে কাঠ আর তক্তা সাজিয়ে রাখা হয় থাক্ দিয়ে। বসন্তকালে নদীর জল বেড়ে ওঠা না পর্যন্ত এই কাঠগুলো বালুচর দ্বীপেই থাকে। ভালোমতো একটা তক্তা এনে দিতে পারলে গৃহস্থদের কাছে

দাম পাওয়া যায় দশ কোপেক। সারা দিনের মধ্যে এই রকম দ্-তিনটে তক্তা আমরা চুরি করতে পারি। অবশ্য এক বিষয়ে নজর রাখা দরকার। যে-সব দিনে কুয়াশা হয় বা বৃষ্টি পড়ে, যখন পাহারাদাররা গিয়ে ঢোকে ঘরের মধ্যে, সেই দিনগুলোতেই অভিযান চালাতে হয়।

অভিযান হয় সদলে; সবার ওপরে সবার টান আছে—ছেলে-ছোকরাদের এমনি একটি দল। এই দলে আছে মর্দোভীয় ভিখিরি-মায়ের দশ বছরের ছেলে শান্তশিষ্ট সান্‌কা ভিয়াখির*—নরম প্রকৃতির ছেলে সে, কখনো কারও অনিষ্ট করে না; আছে গৃহহীন কস্ত্রমা—চামড়াসার চেহারা, খোঁচা খোঁচা চুল, প্রকাণ্ড কালো চোখ, পরে, যখন তার বয়স তেরো বছর, সে-সময়ে এক জোড়া পায়রা চুরি করার অপরাধে তাকে পাঠানো হয়েছিল এক শিশু-শোধনাগারে; সেখানে গলায় দড়ি দিয়ে সে আত্মহত্যা করে; আছে তাতার ছেলে খাবি—বারো বছর বয়স, অসাধারণ শারীরিক শক্তি এবং উদার ও সরল স্বভাবের মিশ্রণ ঘটেছে তার মধ্যে; আরো আছে খ্যাঁদানাক ইয়াজ—আট বছর বয়স, এক কবরখননকারী ও কবরখানার পাহারাদারের ছেলে, মাছের মতো নির্বাক; অসুখে ভুগছে ছেলেটি। এছাড়া আমাদের দলে আরেকজন যে আছে সে হচ্ছে আমাদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো। নাম গ্রিশ্‌কা চুরকা। তার মা বিধবা, সেলাইয়ের কাজ করে। এই ছেলেটি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ঘুষোঘুষিতে রীতিমতো ওস্তাদ। আমরা সবাই একই রাস্তায় থাকি।

আমাদের এই অঞ্চলে চুরিকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। যারা ক্ষুদে ক্ষুদে ব্যবসাদার, আধপেটা খেয়ে যাদের দিন কাটে, তাদের অধিকাংশেরই অন্নসংস্থানের প্রায় একমাত্র উপায় হচ্ছে এটি। দেড় মাস ধরে বছরে একবার যে মেলা হয় তার আয় সারা বছরের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বহু সম্ভ্রান্ত গৃহস্থঘর 'নদীপথে বাড়তি আয়' করে। অর্থাৎ, নদীর স্রোতে ভেসে-যাওয়া কাঠের গুঁড়ি বা তক্তা ধরে, অল্পস্বল্প মালপত্র নিয়ে পাড়ি দেয়। তার অধিকাংশ সময়েই তাদের নজর থাকে চুরি করার দিকে; ভল্‌গা আর ওকা নদীর ধারে ধারে 'অন্ধিসন্ধি খুঁজে খুঁজে' বেড়ায়, জাহাজঘাটায় বা বজরায় বা নদীর পাড়ে যা কিছু হাতিয়ে নিতে পারে তাই আত্মসাৎ করে। কে কত বেশি জিনিস

* রুশ ভাষায় ভিয়াখির বলতে বোঝায় পায়রার একটা বিশেষ রূপ। — সম্পাঃ

হাতিয়ে নিতে পেরেছে তাই নিয়ে রবিবারে বড়োরা নিজেদের মধ্যে বড়াই করে আর ছোটরা তা শোনে ও শেখে।

বসন্তকালে যখন মেলার তোড়জোড় চলে তখন কর্মব্যস্ত কারিগর ও শ্রমজীবীরা সারা দিনের কাজের শেষে মদে চুর হয়ে দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। আর ঠিক সেই সময়ে শুরু হয় এই অঞ্চলের বাচ্চাদের পকেটকাটা-ব্যবসার মরশুম। এই বিশেষ ব্যবসাটির মধ্যে যে কোনো কিছু অবৈধ ব্যাপার আছে তা একেবারেই মনে করা হয় না এবং বড়োদের চোখের ওপরেই নির্ভয়ে এই ব্যবসাটি চালানো হয়।

ছুতোর মিস্ত্রীর হাতুড়ি, ফিটার মিস্ত্রীর চিম্‌টে, গাড়ির ধুরোর বল্টু—সবই তারা চুরি করে। কিন্তু আমাদের দলটি এসব চুরির দিকে যায় না।

'আমি ভাই, চুরির ব্যাপারে নেই—মা শুনলে রাগ করবে,' চুরকা একদিন বলে।

'আমিও নেই। আমার ভয় করে,' খাবি বলে।

কস্ত্রমা পারতপক্ষে চোরের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে আর 'চোর' শব্দটা সে উচ্চারণ করে অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে। যদি সে দেখে, কোনো ছেলে কোনো মাতালের পকেট মারছে তাহলে সে সেই ছেলের পিছনে তাড়া করে যায় আর তাকে পাকড়াও করতে পারলে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। বিষণ্ণ মুখ, বড় বড় চোখ, এই ছেলেটির হাবভাব চালচলন সব সময়েই বড়োদের মতো। পথ চলে খালাসীদের মতো হেলেদুলে, চেষ্টা করে গলার স্বরকে গুরুগম্ভীর ও বাজখাঁই করে তুলতে। সব মিলিয়ে তার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যেজন্যে তাকে অস্বাভাবিক বুড়োটে বলে মনে হয়। আর ভিয়াখিরের স্থির ধারণা যে চুরি করাটা পাপ।

কিন্তু বালুচর থেকে খুঁটি বা তক্তা পাচার করে আনাটাকে আমরা একেবারে অন্য ধরনের কাজ বলে মনে করি। একাজে আমাদের কারও ভয় নেই এবং এমন একটা কৌশল আমরা উদ্ভাবন করি যে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে যাবার পরে কিংবা কুয়াশার দিনে ভিয়াখির আর ইয়াজ সকলের চোখের ওপর দিয়েই গিয়ে হাজির হয় বালুচর দ্বীপে। পায়ের নিচে এবড়োখেবড়ো গলা বরফ, তার ওপর দিয়েই প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে শুরু করে। ওদের দু'জনের চেষ্টা থাকে, পাহারাওলাদের নজর যেন ওদের দু'জনের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইতিমধ্যে আমরা চারজনে গা ঢাকা দিয়ে নানা দিক থেকে গুটিগুটি এগিয়ে আসি। ওদিকে পাহারাওয়ালা ভিয়াখির

আর ইয়াজের ওপরেই নজর রাখতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়ে তক্তাগুলোকে বাছাই করি। তারপর আমাদের সঙ্গী দু'জন নানা ছলছুতোয় পাহারাওলাদের নাকাল করে পালিয়ে চলে যায় আর আমরাও ফিরতি পথ ধরি। আমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে থাকে একটা করে দড়ি; দড়িটার একপ্রান্তে থাকে বড় একটা বাঁকানো পেরেক; এই পেরেকটাকে আট্‌কে দেওয়া হয় তক্তার সঙ্গে, যাতে বরফ ও তুষারের ওপর দিয়ে তক্তাটাকে টেনে নেওয়া চলে। ক্বচিৎ আমরা পাহারাওলাদের নজরে পড়েছি, আর যদি নজরেও পড়ি তাহলেও পাহারাওলারা আমাদের ধরতে পারে না। তক্তাগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে লভ্যাংশ ছয়টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকের ভাগে পড়ে পাঁচ কিংবা সাত কোপেক।

একদিন পেট পুরে খাওয়ার পক্ষে এই যথেষ্ট। কিন্তু মা'কে ভদ্‌কার টাকা ভিয়াখির যদি না দিয়ে যায় তাহলে তার মা তাকে ধরে মারে। কস্ত্রমার অনেক দিনের শখ, সে পায়রা পুষবে এবং এই স্বপ্নকে চরিতার্থ করবার জন্যে সে টাকা জমায়। চুরকার মা রোগে ভুগছে সুতরাং চুরকার প্রতিটি পয়সার দরকার হয় মা'র চিকিৎসার জন্যে। খাবিও টাকা জমায়, কারণ যে-শহর থেকে সে এখানে এসেছে সেখানেই ফিরে যেতে চায় আবার। খাবির এক মামা তাকে নিয়ে এসেছিল সেই শহর থেকে কিন্তু নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদে আসার অল্প কিছুদিন পরেই তার মামা জলে ডুবে মারা যায়। শহরটির নাম খাবি ভুলে গেছে; তার শুধু এটুকু মনে আছে যে শহরটি হচ্ছে ভল্‌গার কাছে কামা নদীর ধারে।

কেন জানি আমাদের মনে হয়, খাবির কল্পনাজগতের এই শহরটি খুবই একটা মজার ব্যাপার। এই শহরের কথা তুলে আমরা ট্যারাচোখ তাতার ছেলেটিকে অনবরত ক্ষেপাই:

আছে এক শহর অতি অপরূপ
খোঁজ করে করে হন্যে।
দেখ যদি পাও এখানে ওখানে
কিংবা আকাশে শূন্যে।

এই ছড়া শুনে প্রথম প্রথম খাবি আমাদের ওপর রেগে যেত। কিন্তু একদিন ভিয়াখির তাকে বলে:

'হয়েছে বাপু, হয়েছে। বন্ধুবান্ধবরা অমন বলেই থাকে, তাই বলে রাগ করতে হয় নাকি?'

মিষ্টি স্বরে কথাগুলি বলে; আমরা যে ওর নাম 'পায়রা' রেখেছি তা মিথ্যে নয়।

তাতার ছেলেটি লজ্জা পায়। তারপর থেকে আমরা পিছনে লাগলেও ও আর গায়ে মাখে না, এমন কি কামা নদীর ধারের শহরটি সম্পর্কে এই ছড়া নিজেই সুর করে করে বলতে শুরু করে।

কিন্তু তবুও তক্তা চুরি করার চেয়ে রাস্তার টুকিটাকি কুড়নোটাই আমরা বেশি পছন্দ করি। আর বিশেষ করে বসন্তকালে তো কথাই নেই; তখন একাজে খুবই মজা। বরফ গলে যায় আর বৃষ্টির জল ধুয়ে দিয়ে যায় শূন্য মেলার মাঠ। সে-সময়ে মেলার মাঠ থেকে কখনো শূন্য হাতে ফিরতে হয় না; আবর্জনার স্তূপে খুঁজলেই পেরেক বা ধাতুর টুকরো পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে তামা ও রুপোর মুদ্রাও হাতে এসেছে। কিন্তু পাহারাওলারা দেখলেই তাড়া করে এবং আমাদের থলেগুলোকে কেড়ে নেয়। পাহারাওলাদের ঠেকাবার জন্যে হয় আমাদের দু-কোপেক করে ঘুষ দিতে হয়, নইলে ধরতে হয় হাতে-পায়ে। মোট কথা, পয়সা উপায় করাটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না কিন্তু এই পয়সা উপায় করার মধ্যে দিয়েই আমাদের মধ্যে সেরা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে ঝগড়াও হয়েছে কিন্তু কখনো মারামারি করেছি বলে মনে পড়ে না।

আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মিটমাট করে দেয় ভিয়াখির। উত্তেজনার যতো কারণই থাকুক না কেন, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলতে পারে ও এবং ওর কথা শুনে আমরা শান্ত হই। কথাগুলো খুবই সহজ ও সাধারণ কিন্তু এমনই যে আমরা অবাক হই এবং নিজেদের ব্যবহারে নিজেরাই লজ্জা পাই। এমন কি কথাগুলো বলে ভিয়াখির নিজেও অবাক হয়ে যায়। ইয়াজকে নীচুস্তরের ফন্দিফিকির করতে দেখেও ও কোনো দিন রাগ করেনি বা আতঙ্কিত হয়নি। এসব ও ভ্রূক্ষেপই করে না; বলে, এসব হচ্ছে মূর্খতা, এসবের কোনো অর্থ হয় না—আর এই বলে শান্তভাবে উড়িয়ে দেয়

ও প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, বল্ তো কেন তুই এসব কাজ করিস?' আর ওর প্রশ্ন শুনে সকলেই স্পষ্ট বুঝতে পারে যে সত্যি সত্যিই এসব কাজের কোনো অর্থ হয় না।

নিজের মা'র সম্পর্কে কিছু বলতে হলে, মা'কে বলে 'আমার মর্দোভীয়নী'। আমাদের কারও কিন্তু কোনো দিন মনে হয়নি যে এই কথাগুলোর মধ্যে কোনো মজা আছে।

গোল দুই সোনালী চোখের ঝিলিক তুলে হাসতে হাসতে সে বলে, 'গত রাত্রে আমার মর্দোভীয়নী একেবারে চুর হয়ে বাড়ি ফেরে। তারপরে সদরের সিঁড়ির ওপরেই থেবড়ে বসে গান জুড়ে দেয়। গান গেয়েই চলে, থামেই না আর—এমনি বেহায়া! ধাড়ী মুরগীর মতো!'

গুরুগম্ভীর চুরকা জিজ্ঞেস করে, 'কী গান গাইছিল রে?'

মা'র গাওয়া গানটা ভিয়াখির গেয়ে শোনায়; সরু সরু চড়া গলা, আর গানের সঙ্গে সঙ্গে চাপড় মারে হাঁটুতে। গানটা হচ্ছে এই:

ঠক্ ঠক্ ঠক্!
রাখাল টোকা দিচ্ছে শার্সিতে
ঘরে আমি রইতে নারি কোনো মতে!
সুর্য্যি ডোবে পশ্চিমে — রাখাল বাজায় বাঁশি
অতি মধুর সুরের লহর, অতি মধুর হাসি।
থমকে শোনে লোক।
ঠক্ ঠক্ ঠক্!

এমনি ধরনের অজস্র মজাদার গান জানে ও। আর গাইতেও পারে চমৎকার ভাবে।

তারপর সে বলে চলে, 'তারপর কী হল শোন্। ওখানে, ওই সদরের চৌকাঠে সে ঘুমিয়ে পড়ে। আর খোলা দরজা দিয়ে সে কি হি-হি ঠান্ডা হাওয়া। জামাকাপড় ফুঁড়ে আমার সর্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। আর সেই বিরাট বপু দরজা থেকে সরিয়েও আনতে পারি না। সকাল হলে তাকে বলি, আচ্ছা কেন বলো তো তুমি এতবেশি মদ খাও? সে জবাব দেয়, আর ক'টা দিন একটু মুখ বুজে সহ্য করে যা, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না রে!'

'ঠিকই তো, বেশিদিন আর বাঁচবে না। তোর মা'র সারা শরীরটা কি-রকম ফুলে উঠেছে দেখেছিস তো?' অভিভূত স্বরে চুরকা সায় জানায়।

'মা মরে গেলে তোর মন খারাপ হবে না রে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

আমার প্রশ্ন শুনে ভিয়াখির একটু যেন অবাক হয়ে জবাব দেয়, 'হবে বৈকি। নিশ্চয়ই হবে। সে যে ভালো মেয়ে।'

আমরা সবাই জানি, ভিয়াখিরের মা ওকে প্রায়ই ধরে মারে। তবুও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মানুষ হিসেবে সে ভালো। আর তাই, কোনো দিন আমাদের লাভের বখরা নগণ্য হলে চুরকা বলে:

'ভিয়াখিরের মা'কে ভদ্‌কা কিনে দেবার জন্যে সবাই একটা একটা কোপেক দিয়ে দাও। নইলে ভিয়াখিরকে ওর মা মারবে।'

দলের মধ্যে চুরকা ও আমি ছাড়া আর কেউ লিখতে পড়তে জানে না। এজন্যে ভিয়াখির হিংসে করে আমাদের।

ইঁদুরের মতো ছুঁচলো কান টেনে ধরে মিহি সুরে সে বলে, 'আমার এই মর্দোভীয়নী যেদিন মারা যাবে, সেদিন আমিও গিয়ে স্কুলে ভর্তি হব। মাস্টারমশাইয়ের পায়ে মাথা কুটে রাজি করাব তাঁকে। তারপর লেখাপড়া শেষ হয়ে গেলে আর্চবিশপের বাগান তদারক করার কাজ নেব আমি। চাই কি, আর্চবিশপের বাগান না হয়ে জারের বাগানও হতে পারে।'

সেই বছরই বসন্তকালে ভিয়াখিরের মর্দোভীয়নীটি কাঠের স্তূপে চাপা পড়ে গেল। তার সঙ্গে ছিল এক বোতল ভদ্‌কা। গির্জার নতুন বাড়ি তুলবার জন্যে এক বুড়ো চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিল, সেও চাপা পড়ল একই সঙ্গে। স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে।

ভিয়াখিরকে বলে গুরুগম্ভীর চুরকা: 'তুই আয়, আমাদের সঙ্গে থাকবি। আমার মা তোকে অক্ষর চিনিয়ে দেবে।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই দোকানগুলির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ভিয়াখির পড়তে লাগল:

'মুদিরদো কান।' লেখাটা পড়তে পেরে গর্বের সঙ্গে মাথা তুলে তাকাল সে।

চুরকা শুধরে দিল, 'দূর গাধা! মুদিরদো কান নয়, মুদির দোকান।'

'জানি বাবা জানি। তবে কি জানিস, কাব্য গুলিয়ে যায়।'

'কাব্য নয়, বাক্য!'

'অক্ষরগুলো নেচে নেচে বেড়ায়। অক্ষরগুলোকে কেউ একজন পড়বে—এতেই অক্ষরগুলোর খুশি যেন আর ধরে না।'

গাছ এবং ঘাসকে ও ভালোবাসে। ওর ভালোবাসার বহর দেখে আমরা অবাক হই, আবার মজাও পাই।

আমাদের এই অঞ্চলে বালু-জমি। গাছগাছড়া প্রায় নেই বললেই চলে। গাছগাছড়া বলতে উঠোনের এখানে-ওখানে দু-একটা সরু সরু উইলো,

কুঁকড়নো এল্‌ডারবেরির ঝোপ বা বেড়ার আড়ালে অলক্ষ্যে কিছু শুকনো ঘাস। আমাদের মধ্যে কেউ যদি এই ঘাসের ওপর বসে তাহলেই ভিয়াখির রেগে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক দেয়:

'ঘাসগুলোর দফারফা করছ কেন? বালির ওপরে বসতে পার না? ঘাসের ওপর বসা আর বালির ওপর বসা—একই কথা।'

ও যদি হাজির থাকে তাহলে গাছগাছড়ায় হাত দেবার সাহস হয় না আমাদের। এল্‌ডারবেরির ঝোপে ফুল ফুটে থাকে, তার একটা শীষ, বা ওকা নদীর ধার থেকে উইলো গাছের একটা ডাল—কোনো কিছুই ভাঙি না।

অবাক হয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ও বলে, 'আচ্ছা, এভাবে শয়তানি করে যে জিনিসপত্র নষ্ট করিস—এতে কী লাভ হয় বল্‌ তো?'

ওকে অবাক হতে দেখে আমরা লজ্জা পাই।

প্রতি শনিবার আমাদের একটা খেলা আছে। এই খেলার তোড়জোড় চলে সারা সপ্তাহ ধরে—তোড়জোড় মানে, রাস্তা থেকে ফেলে-দেওয়া গাছের ছালের চটিজুতো কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখা। শনিবার সন্ধ্যার সময় যখন সাইবেরিয়ার জাহাজঘাট থেকে তাতার খালাসীরা ফিরে যায় তখন আমরা রাস্তার মোড়ে কোনো একটা আড়ালে লুকিয়ে থেকে তাদের দিকে চটিজুতোগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি। প্রথমে ওরা রেগে যায় ও আমাদের পিছনে তাড়া করে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেরাই খেলায় মেতে ওঠে। তখন ওরাও আসন্ন লড়াইয়ের কথা ভেবে গাছের ছালের চটিজুতো দিয়ে নিজেদের অস্ত্রাগার ভরিয়ে তোলে। আমরা কোথায় অস্ত্র লুকিয়ে রাখি সেটা ওবা লক্ষ্য করে আর মাঝে মাঝে আমাদের অস্ত্রাগার থেকে চুরি করতে আসে।

আমরা প্রতিবাদ করি, 'এভাবে খেলা হয় না।'

ওরা তখন চুরি-করা জিনিসগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। তারপর চলে লড়াই। সাধারণত ওরা দাঁড়িয়ে থাকে খোলা জায়গায় আর আমরা তারস্বরে চিৎকার করতে করতে ওদের চারপাশে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াই ও হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি। ওরাও তারস্বরে চিৎকার করে। আর যখনই একটা চটিজুতো খুব ভালোভাবে তাক্‌ করে ছুঁড়ে মারা হয় আর সেই জুতোয় পা আটকে গিয়ে আমাদের কেউ বালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে—অমনি ওরা হো-হো করে গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠে।

অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত মাঝেমাঝে খেলা চলে। ক্ষুদে ব্যবসাদাররা কোণে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখে আমাদের কাণ্ডকারখানা। মুখে অবশ্য ভর্ৎসনা

করে আমাদের—না করলে ভালো দেখায় না তাই। কিন্তু জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি চলে সমানে; ছাইরঙা, ধুলোমাখা পাখির মতো শূন্যে উড়তে থাকে জুতোগুলো। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো মারাত্মক রকমের আঘাত পায়। কিন্তু লড়াইয়ের আনন্দে কোনো আঘাত বা যন্ত্রণা আমরা গায়ে মাখি না।

তাতাররাও আমাদের মতোই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। লড়াই শেষ হয়ে গেলে মাঝে মাঝে আমরা ওদের সঙ্গে ওদের বাড়িতে যাই। ওরা আমাদের খেতে দেয় ঘোড়ার মাংস আর শাকসব্জির একটা অদ্ভুত রান্না। ঘন চা ও পিঠে দেয় খাওয়ার পরে। এই লোকগুলোর চেহারা প্রকাণ্ড, গায়ের জোরে একজন আরেকজনকে ছাড়িয়ে যায় মনে হয়—ভারি ভালো লাগে ওদের। ওদের স্বভাবের মধ্যে কি একটা আছে যাতে মনে হয় ওরা শিশুর মতো সরল ও সাদাসিধে। আমি বিশেষ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম এই দেখে যে ওরা কক্ষণো রাগারাগি করে না আর প্রত্যেকের ওপরেই প্রত্যেকের ভারি দরদ।

প্রাণ খুলে হাসে ওরা, সে-হাসি আর থামতেই চায় না। একজন ছিল (এই লোকটি হচ্ছে কাসিমভ'এর চাষী, নাকটা ভাঙা, রূপকথার বীরের মতো গায়ের জোর; একবার সে একটা দশমণি গির্জার-ঘণ্টা বজরা থেকে তুলে নিয়ে পাড় ভেঙে ডাঙায় উঠেছিল)—সে হাসতে শুরু করলে গাঁক গাঁক করে হুংকার ছাড়ে আর চিৎকার করে বলে:

'উ-উ! উ-উ! মুখের কথা—আকাশের চিড়িয়া! কথা শুনলে তো চিড়িয়া ধরা পড়ল! আর শুধু সোনার মুদ্রাই হোলো আসল কথা!'

একদিন ভিয়াখিরকে হাতের তালুর ওপরে বসিয়ে একেবারে শূন্যে তুলে ধরল।

'আকাশে থাকার সোয়াদটা বুঝে নাও!' বলল সে।

বাদলার দিনে আমরা জড়ো হই ইয়াজের বাড়িতে। গোরস্থানের মধ্যে ছোট একটি বাড়িতে ইয়াজ তার বাবাকে নিয়ে থাকে। ইয়াজের বাবার বাঁকা তোবড়ানো শরীর, লম্বা লম্বা হাত, মাথায় ও মুখে খোঁচা খোঁচা নোংরা চুল। তার মাথাটাকে দেখে মনে হয়, বোঁটার মতো লিকলিকে ঘাড়ের ওপরে যেন একটা শুকনো শালগম। খোশমেজাজে হল্‌দে হল্‌দে চোখদুটোকে সরু করে বিড়বিড় করে সে বলে চলে: 'কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই! হুঃ হুঃ!'

আমরা খানিকটা চা, চিনি, রুটি আর ইয়াজের বাবার জন্যে অল্পকিছু ভদ্‌কা কিনে নিয়ে যাই।

চুরকা হুকুম দেয়, 'ওরে পাজী চাষী, সামোভারে আগুন দাও তো দেখি!'

শুনে পাজী চাষী হাসে ও হুকুম-মতো কাজ করে। জল ফুটে উঠতে উঠতে আমরা নিজেদের ব্যাপারগুলো একটু আলোচনা করে নিই। সেও আমাদের পরামর্শ দেয়:

'নজর রেখো বাবারা—পরশুদিন ব্রুসভ্‌দের বাড়িতে শ্রাদ্ধের খাওয়া আছে। অনেক হাড় পড়ে থাকবে কিন্তু!'

সবজান্তা চুরকা বলে, 'ব্রুসভদের বাড়িতে যে মেয়েলোকটা রান্না করে, সে একটা হাড়ও পড়ে থাকতে দেয় না। সব নিজে নেয়।'

জানলা দিয়ে বাইরের কবরখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভিয়াখির বলে, 'শীঘ্রই আবার জঙ্গলে ঢোকা যাবে।'

ইয়াজ খুব কমই কথা বলে। বিষণ্ণ চোখদুটো তুলে ও শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আমাদের দিকে। ছাইগাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে কতগুলো পুতুল পেয়েছে ও; সেগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখায় আমাদের। পুতুল বলতে একটা কাঠের সেপাই, একটা ঠ্যাঙ-ভাঙা ঘোড়া, কয়েকটা বোতাম আর কয়েক টুক্‌রো পেতল।

ওর বাবা টেবিলের ওপরে পেয়ালা সাজিয়ে দেয়, সামোভার নিয়ে আসে। পেয়ালাগুলো কিম্ভূতকিমাকার, কোনোটার সঙ্গে কোনোটা মেলে না। কস্ত্রমা চা ঢালে। বুড়ো ভদ্‌কা খেয়ে নিয়ে সোজা গিয়ে ওঠে চুল্লির ওপরে আর সেখান থেকে লিকলিকে ঘাড় নিচু করে প্যাঁচার মতো চোখে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে আর বিড়বিড় করে বলে:

'উচ্ছন্নে যা! উচ্ছন্নে যা! তোরা কি মানুষ নাকি? হুঃ! তোরা হচ্ছিস একদল চোর! কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই!'

'আমরা চোর নই।' ভিয়াখির বলে।

'ক্ষুদে চোর আর কি।'

ইয়াজের বাবার বকবকানি শুনে যখন আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠি, চুরকা ধমক দিয়ে ওঠে:

'চুপ করো বলছি, পাজী চাষী!'

ইয়াজের বাবা বসে বসে ফিরিস্তি দিল, এই অঞ্চলের কতজন লোকের

অসুখ করেছে; তারপর জল্পনা-কল্পনা করে, এদের মধ্যে কে আগে মরবে, তার কথা শুনতে ভিয়াখির, চুরকা ও আমার অসহ্য লাগে। ইয়াজের বাবাকে দেখে মনে হয়, কে আগে মরবে ভাবতে পেরেই যেন সে খুশিতে ঠোঁট চাটছে। তার মধ্যে একটুকু মায়াদয়া দেখা যায় না। আর যখন সে বুঝতে পারে যে এসব কথা শুনতে আমরা বিরক্তি বোধ করছি, তখন ইচ্ছে করে করে আরো আমাদের পিছনে লাগে।

'হুঃ, হুঃ, বাবারা, ক্ষুদে মহারাজদের মনে অমনি ভয় ঢুকে গেছে! এই আমি বলে রাখছি, শুনে রাখ্, ওই যে মোটা হোঁৎকা লোকটা আছে, ও শীগ্‌গিরই পটল তুলবে। তারপর পচে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ও ব্যাটার অনেক দিন লাগবে!'

আমরা তাকে থামিয়ে দিই কিন্তু কিছুতেই তার মুখ বন্ধ করতে পারি না।

'আর দেখে নিস, তোদের পালাও শীগ্‌গিরই আসছে! ছাইগাদার ময়লা ঘেঁটে ঘেঁটে খাবার জোটাস—তোদের পরমায়ু খুব বেশি বলে মনে করিস নাকি তোরা!'

ভিয়াখির বলে, 'বেশ, বেশ, মরবই তো। ভালোই হবে, মরলে পরে আমরা সবাই দেবদূত হয়ে যাব।'

'তোরা হবি দেবদূত? তোরা!' থ' হয়ে তাকিয়ে থাকে ইয়াজের বাবা, তারপরেই হাসিতে ফেটে পড়ে আর আবার মরা মানুষের বিশ্রী বিশ্রী গল্প বলে উত্ত্যক্ত করে তোলে আমাদের।

কিন্তু মাঝে মাঝে গুনগুনে চাপা গলায় অদ্ভুত সব কথা বলতে শুরু করে সে:

'ওরে শোন, শোন। পরশুদিন একজন মহিলাকে কবর দিতে এনেছিল। মহিলাটির সে এক অদ্ভুত ইতিহাস। খোঁজ করে করে আমি সব জানতে পেরেছি। ভাবিস কি তোরা?..'

প্রায়ই সে মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করে। মেয়েদের সম্পর্কে সর্বদাই কথা বলে অতি নোংরাভাবে। কিন্তু তার গল্পগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যাকুলতার সুর ও প্রশ্ন থেকে যায় যাতে মনে হতে পারে, সে যেন ভেবেচিন্তে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করতে পারে তার জন্যে আমাদের সাহায্য সে চাইছে। মন দিয়ে আমরা শুনি। থেমে থেমে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার জন্যে মাঝে মাঝে কথা বন্ধ করে সে বলে চলে। কিন্তু যা-ই বলুক

না কেন, তার কথাগুলো আমাদের স্মৃতিতে একটা অস্বস্তিকর ছাপ ও কাঁটা-বেঁধার মতো জ্বালা সৃষ্টি করে।

'মেয়েটিকে ওরা জিজ্ঞেস করে, "কে আগুন লাগিয়েছিল?" মেয়েটি বলে, "আমি আগুন লাগিয়েছিলাম!" "বললেই হল আর কি, সেদিন রাত্রে তুমি তো হাসপাতালে ছিলে!" মেয়েটি আবার বলে, "আমি আগুন লাগিয়েছিলাম" এই একই কথা বলে চলে। কেন বলেছিল কে জানে! কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই! হুঁ, হুঁ!..'

এই বৈচিত্র্যহীন ও বিষাদমাখা কবরখানায় মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে যতোজন লোককে সে কবর দিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জীবন-কাহিনী সে জানে। যখন সে কথা বলে তখন মনে হয় যেন আশেপাশের সমস্ত বাড়ির অন্দরমহলের দরজা আমাদের সামনে সে খুলে ধরেছে। সেই খোলা দরজা দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকেছি আর দেখছি বাড়ির বাসিন্দারা কি-ভাবে দিন কাটায়। মনে হচ্ছে যেন কাজটা হেলাফেলার নয়, এর মধ্যে গুরুগম্ভীর ব্যাপার কিছু আছে। তাকে দেখে মনে হয়, শুধু কথা বলেই সে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জানলার বাইরে যেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে অমনি চুরকা উঠে দাঁড়ায় আর বলে:

'আমি বাড়ি যাচ্ছি — নইলে মা আমার ভয় পাবে। তোরা কেউ উঠবি নাকি?'

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠি। ইয়াজ আমাদের সঙ্গে সদর পর্যন্ত আসে, গেটটা বন্ধ করে দেয়, বাখারির ওপরে চোয়াড়ে কালো মুখটা চেপে ধরে চাপাস্বরে বিদায় জানায় আমাদের।

আমরাও বিদায় জানাই। ওকে এই কবরখানার মধ্যে ফেলে রেখে যেতে সর্বদা অস্বস্তি লাগে আমাদের। একদিন কস্ত্রমা ফিরে আসতে আসতে মুখ ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বলল:

'কোন্ দিন না সকালে উঠে শুনতে হয় যে ও মরে গেছে।'

চুরকা প্রায়ই বেশ জোর দিয়ে বলে যে আমাদের মধ্যে ইয়াজের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। কিন্তু ভিয়াখির একথা স্বীকার করে না।

'আমাদের অবস্থা তো খারাপ নয়। খারাপ কেন হতে যাবে?' সমান জোর দিয়ে ও বলে।

ভিয়াখিরের কথায় আমি সায় দিই। বাইরের এই মুক্ত জীবন আমার খুবই ভালো লাগে। আর আমার সঙ্গীদেরও আমি পছন্দ করি। ওদের সঙ্গ

পেয়ে আমার মন এক মস্ত নতুন অনুভূতিতে ভরে গেছে। মনের মধ্যে সব সময়ে ইচ্ছা জাগে, ওদের সাহায্য ও উপকার করি। আর এই ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে আমাকে।

এদিকে স্কুলে আবার আমি বিভ্রাটে পড়েছি। স্কুলের ছেলেরা আমাকে বাউণ্ডুলে ও আবর্জনা-কুড়ুনে বলে ডাকতে শুরু করেছে। একদিন ঝগড়া হয়ে যাবার পরে ওরা মাস্টারমশাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করে যে আমার গায়ে নাকি ভয়ানক জঞ্জালের গন্ধ এবং আমার পাশে কিছুতেই বসে থাকা যায় না। মনে আছে, একথা শুনে আমার খুবই কষ্ট হয় এবং এ ঘটনার পর আবার স্কুলে যেতে খুবই খারাপ লাগে। ছেলেদের এই নালিশটা ছিল মনগড়া; এটা ওদের কুচুটেপনা ছাড়া কিছু নয়। রোজ সকালে আমি খুব ভালো করে স্নান করি; আর যে জামাকাপড় পরে আমি রাস্তার আবর্জনা কুড়োই, তা পরে কক্ষণো স্কুলে যাই না।

অবশেষে আমি তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। ভালো ভাবে লেখাপড়া করার পুরস্কার হিসেবে আমাকে দেওয়া হল একটা সুকৃতিজ্ঞাপক সার্টিফিকেট, একটা বাইবেল, একখণ্ড ক্রিলভের উপকথা আর 'ফাতা মরগানা' এই দুর্বোধ্য নামের কাগজের মলাট দেওয়া একটা বই। উপহারগুলো নিয়ে বাড়ি এলাম। উপহারগুলো দেখে দাদামশাইয়ের খুবই আনন্দ হল এবং তিনি খুবই অভিভূত হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে বইগুলোকে সযত্নে রাখা দরকার এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি বইগুলোকে নিজের সিন্দুকের মধ্যে রেখে দেবেন। এদিকে গত কয়েক দিন ধরে দিদিমা অসুস্থ, তাঁর হাতে একটিও পয়সা নেই। দাদামশাই বিড়বিড় করে মনের ঝাল প্রকাশ করছেন:

'তোরাই আমার সর্বনাশ করবি দেখছি — তোদের খাইয়ে খাইয়েই ফতুর হতে হবে আমাকে...'

এই ব্যাপার দেখে আমি এক বইয়ের দোকানে গিয়ে বইগুলোকে পঞ্চান্ন কোপেকে বিক্রি করে ফেললাম। টাকাটা এনে দিলাম দিদিমার হাতে। সুকৃতিজ্ঞাপক সার্টিফিকেটটার ওপরে হিজিবিজি লিখে নষ্ট করে ফেললাম সেটা। তারপর সার্টিফিকেটটা দিলাম দাদামশাইয়ের হাতে। হিজিবিজি লেখাগুলো দাদামশাইয়ের চোখে পড়ল না। তিনি সেটা সযত্নে তুলে রাখলেন।

স্কুলের শেষে আমি আবার রাস্তার জীবনে ফিরে যাই। বসন্ত এসে গেছে; এখন এই রাস্তার জীবনে আগের চেয়েও অনেক বেশি যাদু রয়েছে।

এখন আমরা আরও বেশি পয়সা উপায় করি। রবিবার পুরো দল আমরা বেরিয়ে পড়ি মাঠে কিংবা জঙ্গলে, ফিরে আসি সন্ধ্যা পার করে, মধুর ক্লান্তিতে সারা শরীরটা ভেঙে পড়ে, আর দলের প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকের টান আরো অনেকখানি বেড়ে যায় যেন।

কিন্তু এই জীবনের স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয়নি। আমার সৎ-বাপ আবার চাকরি খুইয়ে বসে এবং কোথায় যেন চলে যায়। আমার মা ও ছোট ভাই নিকোলাই এসে ওঠে দাদামশাইয়ের বাড়িতে। এদিকে দিদিমা চলে গেছেন এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে, সেখানে তিনি যীশু খ্রীষ্টের শয্যাবরণীর ওপরে সুচের কাজ করছেন এবং সেখানেই থাকেন তিনি। সুতরাং ছোট ভাইকে দেখাশোনার ভার পড়ল আমার ওপরে।

আমার মা কথা বলে না, তার শরীরটা রক্তহীন হয়ে গেছে, এমন কি একটা পা নাড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত তার নেই। ছোট ভাইয়ের পায়ের গোড়ালিতে বিষাক্ত ঘা; বাচ্চাটা এত দুর্বল যে কাঁদতে পর্যন্ত পারে না। খিদে পেলে ভয়ানকভাবে গোঙায়, আর পেট ভরা থাকলে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে আর ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে — বেড়ালের মতো ঘড় ঘড় আওয়াজ হয় গলা থেকে।

একদিন দাদামশাই বাচ্চাটাকে খুব ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, 'ওর এখন যেটুকু দরকার তা হচ্ছে ভালো খাওয়া। কিন্তু তোদের এতগুলি লোককে খাওয়াবার সামর্থ্য কই আমার বল্?'

শ্বাস টেনে টেনে ভাঙা ভাঙা গলায় মা বলল, 'ওর জন্যে আর কতটুকু বা দরকার।'

'এর জন্যে একটুখানি — ওর জন্যে একটুখানি — সব মিলিয়ে অনেকখানি...'

বিরক্তির সঙ্গে হাতটাকে ঝাঁকিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালেন:

'নিকোলাইয়ের গায়ে একটু রোদ-হাওয়া লাগা দরকার। ওকে নিয়ে বাইরে বালির ওপর শুইয়ে দে...'

কয়েক বস্তা শুক্নো আর পরিষ্কার বালি নিয়ে এলাম আমি। জানলার নিচে যেখানে রোদ এসে পড়ে, সেখানে ঢেলে দিলাম। তারপর দাদামশাই যেমনটি বলেছেন সেইভাবে ছোট ভাইকে ঘাড় পর্যন্ত ডুবিয়ে দিলাম বালির মধ্যে। বাচ্চাটাকে দেখে মনে হল এভাবে থাকতে ওর ভালো লাগছে। একইভাবে বসে থাকে; আরামে চোখ বুজে আসে আর টেরিয়ে তাকায়

আমার দিকে। কী আশ্চর্য চোখ ওর! মনে হয়, নীল মণিকে ঘিরে আরো ফিকে সাদা নীল একটা চক্র দিয়েই শুধু বুঝি ওর চোখদুটো তৈরি।

ভাইটি আমার খুবই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল। মনে হয়, আমার চিন্তাগুলোও ও বুঝতে পারে। জানলার নিচে ওর পাশটিতে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ শুয়ে থাকি। জানলা দিয়ে ভেসে আসে দাদামশাইয়ের কিচকিচে গলার স্বর:

'মরতে তো বোকারাও পারে। তুমি যদি জানতে কী করে বাঁচতে হয়...'

শোনা যায় মা'র কাশি; অনেকক্ষণ ধরে চলে সেই কাশি...

নিকোলাই তার ক্ষুদে ক্ষুদে হাতদুটো বালির ভিতর থেকে টেনে বার করে আনে; ফ্যাকাশে মাথাটা নাড়তে নাড়তে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ওর মাথায় পাত্‌লা রুপোলি চুল, মুখটা বুড়োটে ও গুরুগম্ভীর।

যদি কোনো বেড়াল বা মুরগী কাছে আসে তাহলে নিকোলাই নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে আর তারপর এক সময়ে আমার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে মুচ্‌কি হাসে। ওর এই হাসি দেখে আমি অস্বস্তি বোধ করি। ওর পাশে চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে বলে আমার ভারি বিশ্রী লাগছে — এটা কি ভাইটি টের পায়? ও কি বুঝতে পারে যে আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখান থেকে উঠে চলে যাই এবং রাস্তায় গিয়ে আমার দলবলের সঙ্গে জুটি?

উঠোনটা ছোট আর যতো আবর্জনায় ভর্তি। সদর থেকে উঠোনের পিছনদিককার স্নানঘর পর্যন্ত এলোমেলো কাঠের গুদাম ও চালা জড়াজড়ি করে রয়েছে। চালার ওপরে স্তূপ করা রয়েছে তক্তা, কাঠের গুঁড়ি, ভিজে চ্যালাকাঠ আর ভাঙা নৌকোর টুক্‌রো। বসন্তকালে যখন বরফ গলতে শুরু করে আর নদী ফেঁপে ওঠে সেই সময়ে ওকা নদী থেকে সংগৃহীত সামগ্রী এগুলো। নদীর জলে জবজবে ভিজে কাঠ ছড়ানো রয়েছে সারাটা উঠোনে। কাঠগুলো যখন রোদে শুকোতে শুরু করে তখন একটা পচা গন্ধ বেরোয়।

আমাদের বাড়ির একেবারে পাশেই একটা কসাইখানা। প্রায় রোজই ভোরে শোনা যায় বাছুর আর ভেড়ার আর্ত চিৎকার। আর রক্তের গন্ধ এত ঝাঁজালো হয়ে ওঠে যে আমার মনে হয়, ধুলোভরা বাতাসে সূক্ষ্ম একটা জালের মতো রক্ত ঝুলে আছে।

দুই শিঙের মাঝখানে খাঁড়ার ঘা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারগুলোর চিৎকার শোনা যায়। 'আর নিকোলাই তখন ভুরু কুঁচকে ঠোঁট ফুলোয়। দেখে

মনে হয় যেন জানোয়ারের ডাক ও নকল করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর মুখ থেকে 'ফু' 'ফু' শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরোয় না।

দুপুর হলে দাদামশাই জানলা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে ডাক দেন:

'খাবার তৈরি!'

তিনি নিজেই বাচ্চাকে কোলের ওপরে তুলে নিয়ে খাওয়ান। রুটি আর আলু নিজে চিবিয়ে নিয়ে গুঁজে দেন বাচ্চার ক্ষুদে ক্ষুদে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। বাচ্চার সারা মুখে আর ছুঁচলো ছোট চিবুকে রুটি আর আলু মাখামাখি হয়ে যায়। এইভাবে অল্প একটু খাওয়ানো হয়ে গেলেই তিনি বাচ্চার গায়ের জামাটা তুলে ফুলো ফুলো পেটের ওপরে টোকা দিতে দিতে বলেন:

'কে জানে বাপু পেট ভরেছে কিনা। নাকি, আরেকটু লাগবে?'

'দেখতে পাচ্ছেন না ও হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে রুটিটা ধরতে চাইছে?' অন্ধকার কোণ থেকে বিছানায় শুয়ে শুয়েই মা বলে ওঠে।

'তাহলেই হয়েছে! বাচ্চাদের আর কতটুকু বোধ আছে যে পেট ভরে গেছে কিনা বুঝতে পারবে?'

একথা বলার পরে তিনি আবার মুখ থেকে একটা দলা বার করে বাচ্চার মুখে দিয়ে দেন। এই ধরনের খাওয়ানো দেখে আমি লজ্জায় মরে যাই। আমার গলার কাছটায় কী যেন উঠে এসে শ্বাসরোধ করে, ভেতরে বমি পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে।

অবশেষে দাদামশাই বলেন, 'বাস, হয়ে গেছে। এবার ওকে ওর মা'র কাছে নিয়ে যা।'

নিকোলাইকে কোলে তুলে নিয়ে আসার পরেও ও গোঙাতে গোঙাতে খাবার টেবিলের দিকে হাত বাড়াতে থাকে। মা বিছানায় উঠে লম্বা অস্থিসার হাতদুটো বাড়িয়ে দেয় বাচ্চাকে নেবার জন্যে। মা এত রোগা হয়ে গেছে যে তাকে দেখে মনে হয় যেন ডালপাতা ছাঁটা পাইনগাছ।

আজকাল মা কথা প্রায় বলেই না। কখনো-সখনো দু-একটা কথা যা বলে, সেগুলো তার সারা বুকের মধ্যে হাঁপানি তুলে বুকটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসে। সারাটি দিন পড়ে আছে ঘরের কোণে। আর এই অবস্থায় নিঃশব্দে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। আমি বুঝতে পারি, মা'র মৃত্যু আসন্ন। আর দাদামশাইয়ের কথা শুনে এ-বিষয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়। দাদামশাই আজকাল বড়ো বেশি আর বড়ো ঘন ঘন মৃত্যুর কথা বলেন;

বিশেষ করে বলেন সন্ধ্যার সময়ে যখন বাইরে পচা গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

ঘরের কোণে আইকনের প্রায় নিচে দাদামশাইয়ের বিছানা। জানলা ও আইকনের দিকে মাথা দিয়ে শোয়া অভ্যেস তাঁর আর রোজই ঘুমিয়ে পড়ার আগে বিড়বিড় করে বলেন:

'আর কি, মরবার সময় তো হয়েছে। এবার সৃষ্টিকর্তার কাছে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব? কী কৈফিয়ৎ দেব তাঁর কাছে? খেটে খেটে সারাটা জীবন পাত করেছি—কাজ ছাড়া একটি দিনও কাটাইনি। কিন্তু কী লাভ হয়েছে তাতে? নিজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছি!'

চুল্লি আর জানলার মাঝখানে মেঝের ওপরে আমি ঘুমোই। জায়গাটা আমার পক্ষে বড়ো ছোট। বাধ্য হয়ে আমার পা-দুটোকে চালিয়ে দিতে হয় চুল্লির ফোকরের মধ্যে। সেখানে আরশোলাগুলো আমার পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই বিশেষ জায়গাটা থেকে অন্য একটা দিকে লক্ষ্য রাখার সুবিধা আছে। রান্না করতে গিয়ে দাদামশাই অনবরত জানলার শার্সিগুলো ভেঙে ফেলেন; যে শলাকা বা বাঁশ দিয়ে তিনি পাত্রগুলো নামিয়ে নেন তারই উল্‌টো দিকের ঘা লেগে শার্সিগুলো ভেঙে যায়। আমি দেখি আর একটা কুচুটে আনন্দে খুশি হই। বাঁশের মাথাটা কেটে ফেল্‌লেই আর কোনো গোলমাল থাকে না; এই সামান্য বুদ্ধিটুকু দাদামশাইয়ের মতো বুদ্ধিমান লোকের মাথায় কেন যে আসে না — এটা আমার কাছে একটা অদ্ভুত ও উদ্ভট ব্যাপার বলে মনে হয়।

একদিন হল কী, চুল্লির ওপরে কি যেন ফুটছিল, এমন সময় বাঁশটা ধরে তিনি এমন এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিলেন যে চুল্লির ওপরে বসানো মাটির পাত্রটা উল্‌টে গিয়ে ভেঙে গেল, দুটো শার্সি আর শার্সির ফ্রেম চুরমার হয়ে গেল একেবারে। এত বড়ো একটা দুর্বিপাক দাদামশাই সহ্য করতে পারলেন না, মেঝের ওপরে বসে পড়ে কেঁদে ফেললেন আর বিলাপ করতে লাগলেন, 'হায় প্রভু! হায় প্রভু!'

পরে তিনি বেরিয়ে যেতেই আমি রুটি কাটার ছুরিটা নিয়ে বাঁশের মাথার খানিকটা অংশ থুড়ে থুড়ে বাদ দিয়ে দিলাম।

ফিরে এসে আমার কীর্তি দেখেই একেবারে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি: 'বেআক্কেল! নরকের কীট! করাত দিয়ে কাটতে পারলি না? শুনতে পাচ্ছিস তো? করাত, করাত, করাত! তাহলে বাড়তি টুকরোটা দিয়ে বেলুন তৈরি করে

বিক্রি করা যেত বাজারে। যতো শয়তানের ঝাড় এসে জুটেছে আমার কপালে!'

কথাগুলো বলে সদরের দিকে ছুটে গেলেন দাদামশাই। আর তখন মা আমাকে বলল, 'কেন তুই সব ব্যাপারে সর্দারি করতে যাস? নিজেরটা নিয়ে নিজে থাকবি।'

আগস্ট মাসের এক রবিবারের দুপুরে মা'র মৃত্যু হয়। তার কিছুদিন আগে আমার সৎ-বাপ বাইরে থেকে ফিরে এসেছে এবং একটা চাকরি পেয়েছে। থাকে স্টেশনের পাশে একটা ছোট পরিষ্কার বাড়ীতে। দিদিমা ও নিকোলাই আগেই চলে গেছে সেখানে। আর কয়েক দিনের মধ্যে মা'কেও নিয়ে যাবার কথা।

মৃত্যুর দিন সকালবেলা মা আমাকে বলল, 'যা তো রে, ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচকে এক্ষুণি একবার আসতে বল।' ক্ষীণ গলার স্বর, কিন্তু সচরাচর যেমন থাকে তার চেয়ে স্পষ্ট ও হাল্কা।

বিছানায় মা উঠে বসল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এলিয়ে দিল শরীর। তারপর বলে উঠল, 'দেরি করিসনে — ছুটে যা!'

মনে হচ্ছিল, মা হাসছে। একটা নতুন আলো ঝিকমিক করছে তার চোখে। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে শুনলাম, আমার সৎ-বাপ গির্জার উপাসনায় যোগ দিতে গেছে। সেখানে থেকে দিদিমা আমাকে দোকানে পাঠালেন নস্যি কিনে আনবার জন্যে। দোকানে নস্যি ছিল না এবং ইহুদী দোকানদার মহিলা আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নস্যি তৈরি করে দিল।

শেষকালে আবার যখন আমি দাদামশাইয়েব বাড়িতে ফিরে এলাম তখন চোখে পড়ল, মা টেবিলের কাছে বসে আছে। পরনে ফিকে নীল রঙের পরিষ্কার পোশাক, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো। ঠিক সেই আগেকার দিনের মতো গর্বোদ্ধত চেহারা।

'শরীরটা ভালো লাগছে — না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। কেন জানি না আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।

'এদিকে আয়,' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মা বলল, 'এতক্ষণ কোথায় টো-টো করে ঘুরছিলি?'

আমি জবাব দেবার সময় পেলাম না। তার আগেই মা আমার চুলের মুঠি ধরেছে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে করাতের মতো একটা লম্বা ছুরি তুলে নিয়ে ছুরিটার চ্যাপ্টা ফলা দিয়ে মারতে লাগল আমাকে। মারতে মারতে শেষ পর্যন্ত ছুরিটা পড়ে গেল মা'র হাত থেকে।

'তুলে আন! দে এখানে!'

ছুরিটা তুলে আমি টেবিলের ওপরে রাখলাম। মা আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। আমি গিয়ে বসলাম চুল্লির ধারে, সেখান থেকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইলাম মা'র দিকে।

চেয়ার থেকে উঠে মা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কোণের বিছানার দিকে, তারপর বিছানায় শুয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগল। তার হাতের নড়াচড়াটা এলোমেলো, দু-বার হাতটা এলিয়ে পড়ল বালিশের ওপরে... রুমালটা দলা পাকিয়ে গেল হাতের আঙুলের মধ্যে।

'জল...'

পাত্র থেকে পেয়ালাভর্তি জল নিয়ে আমি সামনে ধরলাম। অতি কষ্টে মাথাটা তুলে একঢোঁক জল খেল মা তারপর ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল আমাকে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকাল কোণের আইকনের দিকে, তারপর আমার দিকে; ঠোঁটদুটো নড়তে লাগল — যেন হাসছে; তারপর তার চোখের পাতা আস্তে আস্তে নেমে এল চোখের ওপর। দু-হাতের কনুই শরীরের দু-দিকে শক্তভাবে এঁটে রয়েছে; হাতদুটো ধীরে ধীরে চলেছে বুকের ওপরে, গলার কাছে। অলক্ষ্যে একটা ছায়া নেমে এল মুখের ওপরে। এবার মুখের হলদে চামড়া টান হয়ে রয়েছে, নাকটা ধারালো। মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল, কিন্তু নিশ্বাস বেরিয়ে এল না।

পেয়ালাটা হাতে নিয়ে আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম যেন অনন্তকাল ধরে। আমার দৃষ্টির সামনে মা'র মুখটা শক্ত ও পাঁশুটে হয়ে গেল।

দাদামশাই ঘরে ঢুকলেন।

'মা মরে গেছে,' আমি বললাম।

'মিথ্যে কথা বলে তোর কী লাভ হচ্ছে?' বললেন তিনি বিছানার দিকে তাকিয়ে।

তারপর তিনি চুল্লির কাছে গিয়ে কড়াই ও বাঁশের ঘটাং ঘটাং শব্দ করে 'পিরোগ' তুলে আনতে লাগলেন চুল্লির ভিতর থেকে। আমি জানি আমার মা মরে গেছে, সুতরাং আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম দাদামশাইয়ের দিকে। দাদামশাই নিজের থেকেই ব্যাপারটা টের পেয়ে নিক।

আমার সৎ-বাপ ঘরে ঢুকল। পরনে লিনেনের কোট, মাথায় সাদা ক্যাপ। একটিও কথা না বলে সে একটি চেয়ার তুলে মা'র বিছানার কাছে নিয়ে গেল।

তারপরেই হঠাৎ চেয়ারটা খসে পড়ল তার হাত থেকে, পেতলের শিঙার মতো আওয়াজ তুলে বলে উঠল সে, 'আরে! মরে গেছে যে!'

দাদামশাই অন্ধের মতো টলতে টলতে এগিয়ে এলেন বিছানার কাছে; তাঁর হাতের মুঠোয় বাঁশটা ধরা আছে, আর চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে।

মা'র কবর যখন শুকনো বালি দিয়ে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে, তখন দিদিমা অন্য সব কবরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অন্ধের মতো হোঁচট খেলেন একটা ক্রুশের ওপরে, মুখে চোট লেগে কেটে গেল। ইয়াজের বাবা দিদিমাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। সেখানে দিদিমা যখন ক্ষতস্থানটা ধুয়ে নিচ্ছিলেন তখন ইয়াজের বাবা আমার কাছে এসে চাপা স্বরে আমাকে সান্ত্বনার কথা শোনাতে চেষ্টা করল:

'কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই! কী ব্যাপার হে তোমার? এসব ব্যাপারকে কক্ষণো মনে ঠাঁই দিতে নেই। ঠিক বলিনি ঠানদি? গরীব ধনী সবাই আসতে হবে এ-ঠাঁই। ঠিক বলিনি ঠানদি?'

জানলা দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ফিরে এল যখন, তার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর ভিয়াখিরকে নিয়ে এসেছে টানতে টানতে।

'দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে কী আছে,' একটা ভাঙা জুতোর-নাল বাড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ বলল, 'কী চমৎকার জিনিস বলো তো! ভিয়াখির আর আমি তোমাকে এটা উপহার দিচ্ছি। এটা যে কোনো একজন কসাকের জুতো থেকে খসে পড়েছে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই! ভিয়াখিরের কাছ থেকে এটা আমি কিনে নেব ভাবছিলাম — দু কোপেক দামও দিতে চেয়েছিলাম ওকে...'

দাঁতে দাঁত ঘষে ভিয়াখির বলল, 'মিথ্যে কথা বলছ কেন?' এদিকে ইয়াজের বাবা চোখদুটো পিটপিট করতে করতে আমার সামনে লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে।

'ভিয়াখির কেমন চীজ দেখছ তো? আচ্ছা, আচ্ছা, শোনো, আমি নয়, ও নিজেই এটা তোমাকে উপহার দিচ্ছে...'

ক্ষতস্থান ধোয়া হয়ে গেলে দিদিমা নিজের নীল ও ফুলে-ওঠা মুখে একটা রুমাল জড়ালেন তারপর আমাকে ডাকলেন বাড়ি যাবার জন্যে। কিন্তু আমি বাড়ি যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। আমি জানতাম, বাড়িতে এখন

শেষকৃত্যের খাওয়াদাওয়া উপলক্ষে মদ্যপান চলবে এবং হয়তো একচোট ঝগড়াও হয়ে যাবে। গির্জা থেকে তখনো আমরা বেরিয়ে আসিনি, শুনেছিলাম মিখাইল-মামা ইয়াকভ-মামাকে বলছে:

'আজ বেশ খানিকটা মদ-টদ টানা যাবে রে! কী বলিস!'

ভিয়াখির আমাকে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করছে। সেই জুতোর নালটা গলায় ঝুলিয়েছে ও, আর চেষ্টা করছে তাতে জিভ ঠেকাতে। ইয়াজের বাবা হাসছে, ইচ্ছে করে বেশি বেশি করে হাসছে, তা বোঝা যায়। আর সমানে চিৎকার করে চলেছে:

'দেখ, দেখ, ওর কাণ্ড দেখ!' কিন্তু যখন দেখল যে এত করার পরেও আমি কিছুমাত্র কৌতুক বোধ করছি না তখন সে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে বলল:

'বাড়াবাড়ি ভালো নয়! অমন মুষড়ে পোড়ো না। সবাইকেই মরতে হবে। এমন কি পাখিদেরও মরতে হয়। শোনো—যদি চাও তো আমি তোমার মা'র কবরের ওপরে ঘাসের চাপড়া বসিয়ে দিতে পারি। তাহলে বেশ হবে, না? চলো না এখনই মাঠে চলে যাই। তুমি যাবে, ভিয়াখির যাবে, আমি যাব — আমার ইয়াজও যাবে। আমরা সবাই মিলে ঘাসের চাপড়া কেটে নিয়ে আসব, তারপর কবরের ওপরে সুন্দরভাবে বসিয়ে দেব। আর তখন কবরটি দেখে মনে হবে যে এর জুড়ি আর নেই!'

এই পরিকল্পনা আমার ভালো লাগল। তারপর আমরা সকলে মিলে মাঠে গেলাম।

আমার মা'র শেষকৃত্য হবার কয়েকদিন পরে দাদামশাই আমাকে বললেন:

'শোনো লেক্সেই, তোমাকে এভাবে মেডেলের মতো গলায় ঝুলিয়ে রাখব, তা তো আর চলতে পারে না। এখানে আর তোমার জায়গা হবে না। এবার তোমার দুনিয়ার ঘাটে বেরুবার সময় হয়েছে...'

তাই আমি দুনিয়ায় বেরিয়ে পড়লাম।

১৯১৩—১৯১৪

আমার ছেলেবেলা

অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

কলকাতা · বোম্বে · দিল্লী · হায়দ্রাবাদ

প্রকাশক : এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৫৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : শিবব্রত রায়

মুদ্রাকর : শ্রীশিবনাথ পাল প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন কলিকাতা ৪

এক

ছোট ঘুপ্সি ঘর। জানলার ঠিক নিচেই মেঝের উপরে আগাগোড়া সাদা পোশাক পরিয়ে আমার বাবাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। অস্বাভাবিক লম্বা দেখাচ্ছে তাঁকে। খোলা পায়ের পাতা, পায়ের আঙ্গুলগুলো অদ্ভুত রকমের ফাঁক-ফাঁক হয়ে রয়েছে। বুকের উপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখা দুটি নিশ্চল শান্ত হাত — কিন্তু এই কোমল হাতের আঙ্গুলগুলো পায়ের আঙ্গুলের মতই বিকৃত। হাসি-হাসি চোখদুটো ঢেকে দেওয়া হয়েছে দুটি গাঢ় রঙের তামার মুদ্রার চাকতি দিয়ে। দরদভরা মুখখানা হয়ে উঠেছে সীসের মত বিবর্ণ। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুসংবদ্ধ দাঁতের আভাস। আর সেদিকে তাকিয়ে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি।

বাবার পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে আছে আমার মা, পরনে একটা লালরঙের স্কার্ট। বসে বসে কালো একটা চিরুনি দিয়ে বাবার নরম চুলগুলো আঁচড়ে দিচ্ছে: এই কালো চিরুনিটাই আমার হাতে তরমুজের খোসা কাটবার করাত হয়েছিল। মা বসে আছে আর ভাঙা গম্ভীর গলায় বিড়বিড় করে বলছে কি যেন। আর চোখদুটো ফুলো ফুলো, কান্নায় গলে পড়ছে মনে হয়।

আমার একটা হাত ধরে আছেন দিদিমা। দিদিমার চেহারাটা গোলগাল, মস্ত মাথা, প্রকাণ্ড চোখ, মজার থ্যাবড়া নাক। তাঁর সর্বাঙ্গ কোমল, হাবভাব গম্ভীর — কী যেন এক যাদু তাঁকে ঘিরে আছে। তিনিও কাঁদছেন, কিন্তু অদ্ভুত তাঁর কান্না — আমার মা'র কান্নার সঙ্গে সেই কান্না চমৎকার পোঁ ধরেছে যেন। তিনি কাঁপছেন আর অনবরত আমাকে ঠেলছেন বাবার দিকে। কিন্তু আমি তাঁকে আকড়ে ধরে আছি, তাঁর স্কার্টের পিছনে লুকচ্ছি। আমার ভয় হচ্ছে, আমি অস্বস্তি বোধ করছি।

ইতিপূর্বে আর কোনো দিন আমি বড়দের কাঁদতে দেখিনি। দিদিমা আমাকে অনবরত বলে চলেছেন, 'যাও বাছা, বাবাকে একবার দেখে এসো, আর এই তো শেষ দেখা! সময় না হতেই তোমার বাবা মারা গেছে...' কিন্তু দিদিমার এই কথাগুলোর অর্থও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি নিজে সবেমাত্র খুব শক্ত একটা অসুখ থেকে উঠেছি। স্পষ্ট মনে আছে, অসুখের সময় বাবা আমার কাছে আসতেন এবং নানারকম খেলার ভিতর দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। তারপর হঠাৎ তাঁর আসা বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই জায়গায় আসতে লাগলেন এই বিচিত্র স্ত্রীলোকটি, আমার দিদিমা।

দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'দিদিমা, কোথা থেকে হেঁটে এলে তুমি?'

দিদিমা জবাব দিলেন, 'আমি আসছি সেই উঁচু দেশ, নিজ্‌নি* থেকে। হেঁটে আসিনি, জাহাজে চেপে এসেছি। আরে ওঁচা, জলের উপর দিয়ে কি হাঁটা যায়?'

কথাগুলো আমার কাছে ভারি এলোমেলো মনে হয়েছিল। আমাদের বাড়ির উঁচুতলায় থাকে একদল দাড়িওয়ালা পারসী। পরনে তাদের নানা রঙের জামাকাপড় আর নিচুতলার কুঠরিতে থাকে হলুদরঙা বুড়ো কালমিক, ভেড়ার চামড়ার কারবারি। ওপর থেকে নিচে আসতে হলে রেলিংএর পিছনে গা বেয়ে বেয়ে নামা যায়, কিংবা পা হড়কে গেলে ডিগবাজি খেতে খেতে। এসব কথা আমি খুব ভালো করে জানি। এই তো সোজা কথা, কিন্তু এখানে আবার জল আসে কোত্থেকে? বুড়ী ঠিক কথা বলেননি, আগাগোড়া একেবারেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন।

'তুমি আমাকে ওঁচা ছেলে বললে কেন?'

হাসতে হাসতে তিনি জবাব দিলেন, 'কারণ তুই যে বড় চেঁচাস।'

তাঁর কথা বলার ধরণটা ভারি মিষ্টি, ভারি সরস, কথাগুলো যেন খুশিতে ভরা। সেই প্রথম দিন থেকেই আমাদের দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এই ঘরের মধ্যে আমার আর ভালো লাগছে না। দিদিমা যদি আমার হাত ধরে আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যান তাহলে বেঁচে যাই।

মা'র অবস্থা দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। মা'র এই কান্না আর আর্ত চিৎকার আমার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। মা'র এমন অবস্থা আমি আর কোনো দিন দেখিনি। এমনিতে মা খুব কড়া মেজাজের লোক, বাড়তি কথা বলে না। ফিটফাট পরিষ্কার ও মাদীঘোড়ার

* 'নিজ্‌নি' হচ্ছে নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদের সংক্ষিপ্ত নাম, এই শব্দের বাংলা অর্থ নিম্নদেশ। — সম্পাঃ

মত মস্ত। শরীরের বাঁধুনি আছে এবং হাত দুটি দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। কিন্তু এখন আমার মা বিশ্রীরকম ফুলে উঠেছে, কেমন যেন এলোমেলো। পরনে ছেঁড়া জামা, আলুলায়িত চুল। এমনিতে আমার মা'র ফিকে চুলগুলো মাথার উপরে ভারি সুন্দর মনোরম ভঙ্গিতে চুড়ো করে বাঁধা থাকে, কিন্তু এখন সেই চুল অনাবৃত কাঁধ আর চোখের উপর দিয়ে খসে পড়েছে; আমার বাবার ঘুমন্ত মুখের উপরে দুলছে চুলের একটা গুচ্ছ। বেশ কিছুক্ষণ হল আমি এই ঘরের মধ্যে আছি কিন্তু আমার মা একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পায়নি — সারাক্ষণ শুধুই আর্তনাদ করে কেঁদেছে আর বাবার মাথার চুল আঁচড়ে দিয়েছে।

একজন পুলিস ও জনকয়েক কালো রঙের চাষী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বিরক্তির সঙ্গে পুলিসটি বলল, 'নাও, হয়েছে।'

জানলায় একটা কাল রঙের পর্দা টাঙানো হয়েছিল, দমকা বাতাসে পর্দাটা নৌকোর পালের মত ফুলে উঠেছে। মনে আছে, বাবার সঙ্গে একবার আমি একটা পালতোলা নৌকোয় চেপে বেড়াতে গিয়েছিলাম আর হঠাৎ মেঘ-গর্জন শোনা গিয়েছিল। বাবা আমাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'বোকা ছেলে, ভয় পাবার কী আছে, ও কিছু নয়!'

হঠাৎ মা'র শরীরটা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল। চিত হয়ে মেঝেয় আছড়ে পড়ল; তার চুলগুলো লুটোপুটি খাচ্ছে, ফ্যাকাশে মুখটা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি অন্ধ। তার দাঁত কপাটি লেগেছে -- ঠিক বাবার দাঁতের মতো।

যন্ত্রণাকাতর বিকৃত স্বরে মা বলল, 'দরজা বন্ধ করে দাও — আলেক্সেই'কে বাইরে যেতে বলো!'

দরজার দিকে ছুটে এগিয়ে যেতে যেতে দিদিমা আমাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। চিৎকার করে বললেন:

'ভয় পেয়ো না, ভালো মানুষের ছেলেরা! যিশু খ্রীষ্টের দোহাই, তোমরা এখান থেকে চলে যাও, ওকে ছুঁয়ো না। ওর কলেরা টলেরা কিছু হয়নি, গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়েছে। দয়া করো, বাবারা!'

অন্ধকার কোণের দিকে একটা ট্রাঙ্কের পিছনে আমি গা-ঢাকা দিয়েছিলাম। সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার মা যন্ত্রণায় মেঝের উপর গড়াগড়ি

দিতে দিতে গোঙাচ্ছে আর দাঁতে দাঁত চেপে ধরছে। এদিকে দিদিমা মা'র চার দিকে হামা দেন, কোমল ও সানন্দস্বরে বলেন:

'জগৎপিতা ও তাঁর সন্তানের নামে বলছি! আরেকটু সহ্য করতে চেষ্টা করো, ভারিয়া*! হে পরমকরুণাময়ী জগৎমাতা, হে সর্বজীবরক্ষিকা...'

আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম। আমার বাবাকে যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে তারই চারপাশে মেঝের ওপরে ওঁরা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছেন, গোঙানি আর চিৎকার করছেন; মাঝে মাঝে বাবার গা স্পর্শ করেছেন, কিন্তু বাবা স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছেন, মনে হচ্ছে ওঁদের কান্ডকারখানা দেখে হাসছেন যেন। অনেকক্ষণ ধরে চলে এই ব্যাপার। আমার মা কয়েকবার দু-পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু প্রত্যেকবারেই টলে পড়ে যায়। প্রকান্ড একটা কালো বলের মতো দিদিমা বারকয়েক ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি করেন এবং তারপর এক সময়ে হঠাৎ অন্ধকার থেকে শিশুর কান্না শোনা যায়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দিদিমা বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ছেলে হয়েছে গো!'

দিদিমা একটা মোমবাতি জ্বাললেন।

আমি বোধ হয় ঘরের সেই কোণেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কারণ আর কিছু আমার মনে নেই।

তারপরেই আমার স্মৃতিতে যে-ঘটনা অম্লান হয়ে আছে তা হচ্ছে এই: বর্ষার দিন, সমাধিস্থানের এক জনবিরল অংশ এবং একটা পিচ্ছিল মাটির ঢিবির উপরে আমি দাঁড়িয়ে। একটা গর্তের মধ্যে আমার বাবার কফিন নামানো হয়েছে আর সেদিকে তাকিয়ে আছি আমি। গর্তের তলায় জল জমেছে, ব্যাঙ লাফালাফি করছে — দুটো ব্যাঙ কফিনের হলদে ডালাটার উপরে লাফিয়ে উঠেছে।

সেই কবরের পাশে লোক বলতে আমরা কয়েকজন মাত্র। ভিজে জবুজবু পুলিস, কোদাল হাতে দুজন রুক্ষ মেজাজী চাষা, আমার দিদিমা ও আমি। ঝিরঝিরে ইল্‌শে-গুঁড়ি বৃষ্টিতে আমরা সকলেই ভিজে গেছি।

'নে, এবার মাটি ফেল্‌।' বলে প্রহরীটি চলে গেল।

চাদরের খুঁটে মুখ চাপা দিয়ে দিদিমা কাঁদতে লাগলেন। লোক দুটি ঝুঁকে পড়ে কোদালভর্তি মাটি ফেলল। ঝপাং করে মাটি পড়তেই ছিট্‌কে

* ভারিয়া হচ্ছে ভারভারার সংক্ষিপ্ত নাম। — সম্পাঃ

এল গর্তের জল, ব্যাঙগুলো গর্তের গায়ে লাফালাফি করতে লাগল কিন্তু তাল তাল মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

আমার কাঁধে হাত দিয়ে দিদিমা বললেন, 'আয় রে, আলিওশা*।' কিন্তু আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না, দিদিমার হাত থেকে আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম।

'হায় প্রভু!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন। এমন সুরে কথাগুলো বললেন যে সন্দেহ থেকে গেল তাঁর অভিযোগটা কার বিরুদ্ধে, আমার না প্রভুর? বহুক্ষণ তিনি সেখানে মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন; এমন কি কবরের গর্তটা পুরোপুরি ভরাট হয়ে যাবার পরেও দাঁড়িয়ে রইলেন।

লোক দুটি কোদালের উল্টো দিক দিয়ে ঠুকে ঠুকে কবরের ওপরকার মাটি সমান করে দিল। বাতাস বইছে, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে বৃষ্টি। দিদিমা আমার হাত ধরে দূরের গির্জার দিকে আমাকে নিয়ে চললেন। গির্জার চারদিকে অনেকগুলো কবর, কবরের ওপরকার কালো ক্রুশচিহ্নগুলো ঝাপ্সা হয়ে গেছে।

সমাধিস্থান থেকে বেরিয়ে আসার পর দিদিমা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তুই কাঁদছিস না কেন? একটুখানি কেঁদে নে।'

আমি বললাম, 'আমার কান্না পাচ্ছে না দিদিমা।'

শান্তস্বরে তিনি জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, যদি কান্না না পায় তো কাঁদিস নে।'

দিদিমা যে আমাকে কাঁদতে বললেন এটা খুবই অবাক হবার মতো কথা। আমি সচরাচর কাঁদি না, শারীরিক কোনো যন্ত্রণায় তো নয়ই। মনের দিক থেকে কোনো রূঢ় আঘাত পেলেই আমার কান্না আসে। আমাকে কাঁদতে দেখলে আমার বাবা হো-হো করে হেসে উঠতেন কিন্তু মা ধমক দিত:

'চুপ কর বলছি।'

পরে আমরা গাড়িতে চেপে ফিরে এলাম। চওড়া কাদা-প্যাচপেচে রাস্তা, দু-পাশে গাঢ় লাল বাড়ি।

'ব্যাঙগুলো কি বেরিয়ে আসতে পারবে না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, পারবে না। ভগবান ওদের মঙ্গল করুন!' দিদিমা জবাব দিলেন।

* আলিওশা হচ্ছে আলেক্সেইয়ের সংক্ষিপ্ত নাম। — সম্পাঃ

মা কিংবা বাবার মুখে কখনো এত ঘন ঘন এবং এমন আপনজনের মত ভগবানের উল্লেখ শুনিনি।

কিছুদিন পরে আমার মা, দিদিমা আর আমি একটা জাহাজের ছোট কেবিনে চেপে পাড়ি দিলাম। আমার ছোট ভাই মাক্সিম মারা গেছে এবং কোণের একটা টেবিলের ওপরে লাল ফিতে বাঁধা সাদা কাপড় জড়ানো অবস্থায় রাখা হয়েছে তাকে।

আমি বসে আছি আমাদের বাক্সপেঁটরা-পোঁটলাপুঁটুলির ওপরে। আমার সামনে একটা উদ্গত গোল জানলা, ঠিক ঘোড়ার চোখের মতো দেখতে। বাইরের দিকে আমার দৃষ্টি। জানলার কাঁচের ঠিক নিচ দিয়েই ফেনাতোলা ঘন কালো জল ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে একেবারে জানলার কাঁচের উপরেই ঝাপ্টা দিয়ে যায় আর চমকে উঠে। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি মেঝের উপরে লাফিয়ে পড়ি।

আমার দিদিমা নরম দুটি হাত দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে আবার সেই পোঁটলার উপরে বসিয়ে দিয়ে বলেন, 'ভয় পাসনে যেন।'

ধূসর ভিজে কুয়াশা জলের উপরে জমে আছে। মাঝে মাঝে যেই দূরের এক টুকরো কালো জমি কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে আবার তা মিলিয়ে যায়। আমাদের চারপাশে সবকিছু কাঁপছে। শুধু আমার মা দাঁড়িয়ে আছে স্থির ও অবিচল, চোখদুটো শক্ত করে বোজা, মাথার পিছনে হাত দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখটা কালো, থমথমে আর অন্ধ। মা একটিও কথা বলছে না আর কেমন জানি মনে হচ্ছে মা একেবারে বদলে গেছে, সেই পুরনো মানুষ আর নেই। এমন কি মা যে পোশাক পরে আছে তাও আমার কাছে নতুন ঠেকছে।

বার বার দিদিমা খুব নরম গলায় বলছেন, 'ভারিয়া, লক্ষ্মীটি, একটু কিছু মুখে দে।'

কিন্তু আমার মা নির্বাক ও নিশ্চল।

দিদিমা আমার সঙ্গে কথা বলছেন ফিস্‌ফিস্ করে; মা'র সঙ্গে কথা বলবার সময় আরেকটু উচ্চকণ্ঠে, কিন্তু যেন খুবই ভয়ে ভয়ে এবং খুবই সাবধানে। তাও ক্বচিৎ কখনো। আমার মনে হচ্ছে, দিদিমা আমার মা'কে ভয় করেন। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি এবং এই কারণেই দিদিমার ওপর আমার টান আরো বেড়ে যায়।

আচমকা আমার মা উঁচু কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল, 'সারাতভ। কোথায় গেল সেই নাবিক?'

'সারাতভ', 'নাবিক'... মা'র এই কথাগুলোও কেমন যেন অদ্ভুত অপরিচিত মনে হতে লাগল আমার কাছে।

ঘরে ঢুকল একজন বিশালস্কন্ধ পক্ককেশ লোক, পরনে নীল পোশাক, হাতে ছোট একটা বাক্স। দিদিমা তার হাত থেকে বাক্সটা নিলেন এবং আমার ছোট ভাইয়ের দেহকে সেই বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর প্রসারিত দুই হাতের ওপরে বাক্সটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। কিন্তু দিদিমা এত মোটা যে একপাশ না হয়ে তাঁর পক্ষে সেই দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কি করবেন বুঝতে না পেরে হাস্যকরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।

'মা যে কী!' বলে মা ধৈর্য হারিয়ে দিদিমার হাত থেকে কফিনটা কেড়ে নিল। তারপর দুজনেই বেরিয়ে চলে গেল। আমি সেই নীল পোশাক পরা লোকটির সঙ্গে কেবিনে রয়ে গেলাম।

লোকটি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'তাহলে কি, তোমার ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেল?'

'তুমি কে?'

'আমি একজন নাবিক।'

'আর সারাতভ কে?'

'সারাতভ একটা শহরের নাম। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওই হচ্ছে সারাতভ।'

কুয়াশার মালা জড়ানো অন্ধকার উঁচুনিচু জমি জানলার বাইরে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে পাঁউরুটি থেকে কেটে নেওয়া মস্ত একটা টুকরোর মতো মনে হচ্ছিল আমার।

'দিদিমা কোথায় গেল?'

'নাতিকে কবর দিতে।'

'ওকে কি মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

আমার বাবাকে কবর দেবার সময় কি-ভাবে কতগুলো জ্যান্ত ব্যাঙ মাটিতে চাপা পড়েছিল — সে-কথা আমি নাবিকটিকে বললাম। শুনে লোকটি

আমাকে দু-হাতে তুলে নিল এবং বুকের উপরে শক্ত করে চেপে ধরে চুমু খেল।

'ভাই, তুমি এখনো কিছু বুঝতে পারনি! ব্যাঙের জন্যে অত দরদ দেখাবার দরকার নেই — ব্যাঙের দল চুলোয় যাক্! তোমার মা'র জন্যে দরদ দেখাও, তাঁর অবস্থা দেখতে পাচ্ছ তো? শোক পেয়ে পেয়ে কী হয়ে গেছেন!'

হঠাৎ ওপরের দিক থেকে প্রচণ্ড একটা সোরগোল এবং তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এল। আমি জানতাম শব্দটা স্টীমবোটের, সুতরাং আমি ভয় পেলাম না। কিন্তু নাবিকটি তাড়াতাড়ি আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল 'আমাকে যেতে হবে' বলতে বলতে।

আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল, বেরিয়ে যাই। কেবিনের বাইরে এলাম। অন্ধকার সরু চলা পথটায় একজন লোকও নেই। দেখতে পাচ্ছিলাম, পিতলমোড়া সিঁড়িটা ঝক্‌ঝক্ করছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পোঁটলাপুঁটলি হাতে নিয়ে দলে দলে লোক চলেছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, সবাই জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার মানে আমাকেও যেতে হবে।

কিন্তু যখন আমি জাহাজ থেকে নামবার পাটাতনের কাছে ভিড়ের মধ্যে ডেকের উপরে গিয়ে দাঁড়ালাম, সবাই আমাকে ধমক দিতে শুরু করল:

'তুমি কোত্থেকে এলে? কার সঙ্গে এলে?'

'আমি জানি না।'

অনেকক্ষণ ধরে তারা আমাকে নিয়ে ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি করল। শেষকালে সেই পাকাচুল নাবিকটি এসে হাজির। সে বলল, 'ও এসেছে আস্ত্রাখান থেকে, একা একাই কেবিন থেকে বাইরে চলে এসেছে...'

আমাকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড়ে কেবিনে ফিরে এল সে, সেখানে পোঁটলার উপরে আমাকে বসিয়ে তর্জনী তুলে বলল, 'খবরদার!'

এই বলে শাসিয়ে সে চলে গেল।

উপরের হৈচৈ-সোরগোল আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছে। থেকে গেছে স্টীমারের ঝাঁকুনি আর জলের শব্দ। কেবিনের জানলাটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে একটা ভিজে দেওয়াল; ফলে কেবিনের ভিতরটা গুমোট আর অন্ধকার। আমার মনে হতে লাগল, পোঁটলাগুলো যেন ফুলেফেঁপে আমাকে পিষে ফেলতে চাইছে। তাই আমার অস্বস্তি হতে লাগল। এই জনমানবহীন

স্টীমারে আমাকে একেবারে ফেলে রেখে যদি সবাই চলে গিয়ে থাকে, তাহলে কী হবে?

আমি দরজার কাছে গেলাম। দরজাটা শক্তভাবে বন্ধ করা, দরজা খোলবার পিতলের হাতল আমি কিছুতেই ঘোরাতে পারলাম না। একটা দুধের বোতল নিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘা মারলাম হাতলটার উপরে। বোতলটা চুরমার হয়ে গিয়ে আমার পা ও জুতোর উপরে দুধ গড়িয়ে পড়ল।

কোনো দিক দিয়ে কিছু করতে না পেরে আমি মনমরা হয়ে পোঁটলা-গুলোর উপরে শুয়ে রইলাম এবং কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম, স্টীমারটা আবার কাঁপছে, শোনা যাচ্ছে জলের শব্দ, কেবিনের জানলাটা সূর্যের মত ঝল্‌সে উঠেছে। দিদিমা আমার পাশে বসে চুল আঁচড়াচ্ছেন আর কপাল কুঁচকে নিজের মনে মনেই বিড়বিড় করে কী বলছেন যেন। দিদিমার মাথায় গোছা গোছা নীলাভ কালো চুল দেখে অবাক হতে হয়। সেই চুলের গোছা তাঁর কাঁধ বুক আর হাঁটুর উপর দিয়ে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ছে। একহাতে তিনি সেই চুলের গোছাকে মেঝের উপর থেকে তুলে শক্ত করে ধরে আছেন এবং অপর হাতে একটা মোটা কাঠের চিরুনি দিয়ে গোছা গোছা চুলের জট্ ছাড়াতে চেষ্টা করছেন। তাঁর মুখ কুঁচকে উঠেছে, রাগে জ্বলছে কালো চোখদুটো, আর গোছা গোছা চুলের মাঝখানে ছোট আর হাস্যকর দেখাচ্ছে মুখখানাকে।

দিদিমাকে দেখে মনে হচ্ছিল আজ তাঁর মেজাজ ভালো নেই। কিন্তু তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর চুলগুলো এত লম্বা কেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গলার স্বরটা নরম হয়ে এল। তখন আগের দিনের মতোই দরদভরা সুরে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

'চুলের কথা বলছিস, এটা খুব সম্ভব ভগবানের দেওয়া একটা শাস্তি। ভগবান বলেছেন — এই নে, তোকে একমাথা চুল দিলাম, এই আপদ সামলাতে সামলাতেই তোর দিন কাটুক! অল্প বয়সে এই চুল নিয়েই আমার দেমাক ছিল কত! আর এখন এটা হয়েছে আমার দু-চোখের বিষ। কিন্তু দাদু, এবার ঘুমোও তো। এখনো ভালো করে সূর্য ওঠেনি — এত তাড়াতাড়ি উঠতে হবে না।'

'আমি আর ঘুমোব না দিদিমা।'

'বেশ, ইচ্ছে যদি না হয় তো ঘুমিও না।' বেণী বাঁধতে বাঁধতে তিনি সায় জানালেন। একটা খাটিয়ার উপরে আমার মা তীরের মত টান হয়ে

চিত হয়ে শুয়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কাল দুধের বোতলটা ভাঙলি কী করে রে? চেঁচাসনে বাপু, যা বলবি নীচু স্বরে বল।'

তাঁর কথা বলার বিশেষ একটা ভঙ্গি ছিল। গানের সুরের মত কথাগুলো — ফুলের মত সুস্পষ্ট ও মনোরম। একবার শুনে সহজেই আমি মনে রাখতে পারি। তিনি যখন হাসেন তখন তাঁর চেরির মত কালো চোখের মণি বড়ো হয়ে যায় আর একটা বর্ণনাতীত দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাসলে দেখা যায় দৃঢ়সংবদ্ধ সাদা দাঁতের সারি। ময়লা রঙের গালদুটিতে অসংখ্য বলিরেখা ফুটে ওঠা সত্ত্বেও সারা মুখটায় তারুণ্য ও আলো ফুটে ওঠে যেন। মুখের একমাত্র খুঁৎ হচ্ছে সেই মাংসল নাকটি; এই বড় বড় দুটো নাসারন্ধ্র ও লাল নাসাগ্র। রুপোর গুটি লাগানো কালো একটি কৌটো থেকে তিনি নস্যি নেন। বহিরাবয়বে তিনি ফর্সা নন, কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে অন্তরের এক অনির্বাণ আলোর উষ্ণ ও উদ্দীপ্ত শিখায় তিনি উজ্জ্বল। শরীরটা এত নুয়ে পড়েছে যে তাঁকে প্রায় কুঁজো বলে মনে হয়। কিন্তু মস্ত একটা বেড়ালের মতো অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর চলাফেরায় এবং পুশি বেড়ালের মতোই তুলতুলে তিনি।

আমার মনে হয়েছিল, আমার জীবনে তাঁর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আমি এক অন্ধকার সুপ্তিতে অবলুপ্ত ছিলাম। কিন্তু তিনি এসে আমাকে জাগিয়ে দিলেন এবং আমার হাত ধরে নিয়ে এলেন এক আলোর রাজ্যে। আমার সমগ্র পরিবেশকে অখণ্ড ও একক একটি সূত্রে গ্রথিত করে এক বিচিত্রবর্ণ জরিতে রূপান্তরিত করলেন। প্রথম দিনটি থেকেই তিনি হলেন আমার সারা জীবনের বন্ধু, আমার সবচেয়ে নিকট ও আপনার জন। জীবনের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমাকেও সমৃদ্ধ করেছে এবং কঠোর ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি জুগিয়েছে আমার মধ্যে।

চল্লিশ বছর আগে স্টীমার চলত আস্তে আস্তে। নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ পৌঁছতে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগল। সৌন্দর্যস্নাত সেই প্রথম কয়েকটি দিনের কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে।

আবহাওয়াটা চমৎকার, আর সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমি দিদিমার সঙ্গে ডেকের উপরে থাকি। উজ্জ্বল আকাশের নিচ দিয়ে, শরৎকালের স্বর্ণময়

রেশমি কারুকার্য-খচিত ভল্‌গার দুই তীরের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলি আমরা। বাদামী রঙের স্টীমারটার সঙ্গে একটা বজ্‌রা বাঁধা; স্রোতের বিরুদ্ধে জল কেটে কেটে, নীলাভ ধূসর জলে চাকার ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ তুলে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে স্টীমারটা। ধূসর রঙের বজ্‌রাকে দেখায় জলের পোকার মতো। অলক্ষ্যে সূর্য ভল্‌গা নদীর ওপরে সাঁতার দিয়ে ভেসে যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রূপান্তর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুনের আবির্ভাব। সবুজ পাহাড়গুলো যেন মাটির বহুমূল্য পোশাকের ভাঁজ। দূরে দূরে শহর ও গ্রাম পার হয়ে যায়; তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় সেগুলো বুঝি মিষ্টি পাঁউরুটির টুকরো দিয়ে তৈরি। শরৎকালের গাছের সোনালী পাতা ভাসে জলের ওপরে।

'দেখ্‌, দেখ্‌, কী সুন্দর!' আমার দিদিমা বলে চলেন; আর উদ্ভাসিত মুখে, খুশিভরা বড়ো বড়ো চোখে ডেকের একদিক থেকে আরেক দিকে ঘুরে বেড়ান।

মাঝে মাঝে তীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার উপস্থিতি একেবারে ভুলে যান। তখন তাঁর অন্য চেহারা। দুই হাত বুকের ওপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখা, ঠোঁটদুটো হাসিতে সম্প্রসারিত, চোখভরা জল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি আর তখন আমি তাঁর গাঢ়রঙের ফুলকাটা স্কার্ট ধরে টান দিই।

'এ্যাঁ,' বলে তিনি চমকে সজাগ হয়ে ওঠেন, তারপর বলেন, 'ও তুই! কী মনে হচ্ছিল জানিস? আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি।'

'তুমি কাঁদছ কেন দিদিমা?'

'বাছা আমার, সোনা আমার, কেন কাঁদছি জানিস? ভালো লাগছে বলে কাঁদছি, শরীরে জোর নেই বলে কাঁদছি,' হাসতে হাসতে তিনি বলেন, 'বুড়ো হয়ে গেছি দাদু, তিন কুড়ি বয়স হয়ে গেছে...'

তারপর তিনি একটিপ্‌ নস্যি নিয়ে আমাকে অদ্ভুত সব গল্প বলতে শুরু করেন; সাধুদের গল্প, জন্তুজানোয়ারের গল্প, দয়ালু ডাকাত আর অশুভ শক্তির গল্প।

আমার মুখের কাছে মুখ এনে রহস্যভরা শান্ত গলায় তিনি গল্প বলেন, তাকিয়ে থাকেন আমার চোখের দিকে। তাঁর চোখের মণিদুটো বড়ো হয়ে ওঠে — আর তাঁকে দেখে মনে হয়, তিনি আমার মধ্যে শক্তিপ্রবাহ সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন, যাতে আমি অবলম্বন পাই। তিনি যেন কথা বলেন না, গান গেয়ে ওঠেন। আর যতোই কথা বলেন ততোই তাঁর বলার ভঙ্গির

মধ্যে আরও বেশি ছন্দ আসে। তাঁর কথা শুনে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর তাই একটা গল্প শেষ হলেই আমি বলে উঠি:

'আরো বলো দিদিমা!'

'তাহলে শোন্ তারপর কী হল। উনুনের মধ্যে যে দানোটা থাকত সে তো বসে আছে উনুনের নিচে; থাবায় চিলতে ভিদেছে। বসে বসে দুলছে আর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলছে—ছোট ইঁদুর, ছোট ইঁদুর! হায় হায়, আর তো আমি বাঁচব না, ছোট ইঁদুর!'

তিনি নিজেই নিজের পা-টা আঁকড়ে ধরে দুলতে শুরু করেন, তাঁর চোখমুখ কুঁচকে ওঠে — মনে হয়, না-বাঁচতে পারার কষ্টটা তাঁকেই ভোগ করতে হচ্ছে।

ভালোমানুষ গোঁফদাড়িওলা নাবিকরা চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গল্প শুনতে শুনতে হেসে ওঠে, বাহবা দেয়, একটা গল্প শেষ হলে আরেকটা শুনতে চায়।

'থেমো না ঠানদি, আরো বলো!'

আর তারপর বলে:

'ঠানদি, আমাদের সঙ্গে রাত্রের খাওয়া খেতে চলো!'

রাত্রিবেলা খাবার সময় তারা দিদিমাকে ভদ্‌কা খেতে দেয় আর আমাকে দেয় ফুটি আর তরমুজ। ব্যাপারটা চুপি চুপি সারতে হয়, কারণ স্টীমারের ওপরে ফল খাওয়া নিষিদ্ধ। কেউ যাতে ফল না খায় সে-বিষয়ে খবরদারি করবার জন্যে একজন লোক আছে। যদি সে কাউকে ফলসমেত হাতে-হাতে ধরতে পারে তাহলে ফল ছিনিয়ে নিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। লোকটির সাজপোশাক পুলিসের মতো, জামায় পিতলের বোতাম, সব সময়ে মাতাল অবস্থায় থাকে। তার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকে সবাই।

আমার মা ক্বচিৎ কখনো ডেক্'এ আসত। পারতপক্ষে মা আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। মা সব সময় গম্ভীর, তার চেহারা আজো আমার মনে আছে — দীর্ঘ সুন্দর গড়ন, থমথমে গম্ভীর মুখ, আর মাথায় সোনালী চুলের গুচ্ছ। মনে হত তার সমস্ত শক্তি ও কাঠিন্য যেন কুয়াশা বা স্বচ্ছ মেঘের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই। এত বছর পরেও দেখতে পাচ্ছি তার ধূসর চোখের সেই অনাত্মীয় চাউনি। ঠিক আমার দিদিমার মতোই বড়ো বড়ো চোখ আমার মা'র।

একদিন মা কঠোর স্বরে দিদিমাকে বলে, 'মা, তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে লোকে হাসাহাসি করে।'

অত্যন্ত সহজ ভাবে কথাটা নিয়ে দিদিমা জবাব দেন, 'লোকের যদি ইচ্ছে হয় তো হাসুক না বাপু। ভালো কথাই তো, যতো হাসতে পারবে ততোই ভালো।'

আমার মনে আছে, নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ চোখের সামনে ভেসে উঠতেই ছেলেমানুষের মতো দিদিমার সে কী আনন্দ!

'দেখ্‌, দেখ্‌, কী চমৎকার!' বলে তিনি আমার হাতটা আঁকড়ে ধরে রেলিং'এর দিকে আমায় ঠেলে দিলেন, 'দেখেছিস তো, এই হচ্ছে নিজ্‌নি! কি সুন্দর! ভগবানের শহর আমার! গির্জার চুড়োগুলোকে দেখ্‌— ঠিক যেন উড়ছে!'

তারপর তিনি আমার মা'র দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, 'ভারিয়া! তুই তো এতদিনে বোধ হয় সব ভুলেই গেছিস। দু চোখ ভরে দেখে নে!'

মা বিষণ্ণ ভাবে হাসল।

সেই সুন্দর শহরের সামনে এসে স্টীমারের গতি বন্ধ হল, নদীর মাঝখানে থামল স্টীমারটা। চারদিকে নৌকো আর জাহাজের ভিড়, আকাশ ছেয়ে শ'য়ে শ'য়ে মাস্তুল উঠেছে। লোকবোঝাই মস্ত একটা নৌকো এসে আমাদের স্টীমারের নামিয়ে দেওয়া সিঁড়ির পাটাতনের গায়ে লাগল। তারপর সেই সিঁড়ি দিয়ে একে একে লোক উঠে এল স্টীমারের ডেক্‌'এ। সেই দলের সবচেয়ে আগে এলেন লম্বা কালো জামা গায়ে রোগামত একজন বৃদ্ধ। তাঁর চোখদুটো সবুজ, বঁড়শির মত নাক, সোনার মতো টকটকে দাড়ি।

'বাবা!' বলে চেঁচিয়ে ডেকে উঠেই আমার মা বৃদ্ধের দু-হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছোট ছোট লাল দুটি হাতের মধ্যে মা'র মাথাটা তুলে ধরে গালের উপরে মৃদু চাপড় দিতে দিতে চাপা উত্তেজিত স্বরে বৃদ্ধ বললেন, 'ফিরে এলি পাগলী! আহা-রে!'

চাকার মতো ঘুরপাক খেতে খেতে দিদিমা সবাইকে জড়িয়ে ধরছেন আর চুমু খাচ্ছেন।

'আয়, আয়, এগিয়ে আয়,' বলে আমাকে সেই ভিড়ের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে তোর মামা মিখাইল, এই হচ্ছে ইয়াকভ, আর এই হচ্ছে

তোর মামী নাতালিয়া। আর এই যে বাচ্চাদের দেখছিস, এরা সব তোর মামাতো ভাইবোন—এই দুজনেরই নাম সাশা, আর এর নাম কাতেরিনা। দেখছিস তো কতো লোক— সবাই আমাদের জাত!'

আমার দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন. 'তুমি কেমন আছ গিন্নী?'

তারপর তাঁরা পরস্পরকে তিনবার চুমু খেলেন।

আমি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমাকে এক হ্যাঁচ্‌কা টানে টেনে নিয়ে মাথার ওপর একটা হাত রেখে দাদামশাই বললেন, 'তারপর তুই কে, তোর নাম কী?'

'আমি এসেছি আস্ত্রাখান থেকে, কেবিনে থাকি...'

'কী বলে ও?' মা'র দিকে ফিরে তাকিয়ে দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই আমাকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'ঠিক বাপের মতো গালের হাড়গুলো হয়েছে।' মন্তব্য করলেন চলতে চলতে।

'নৌকোয় নামো,' বললেন তিনি।

তীরে পেঁছে একটা পাথর-বাঁধানো পথ ধরে আমরা ওপরে উঠে এলাম। দু-দিকে উঁচু বাঁধ, মাঝে পায়ে-দলা হল্‌দে ঘাসে ঢাকা পথ।

সবচেয়ে আগে চলেছেন আমার দাদামশাই আর আমার মা। লম্বায় দাদামশাই আমার মা'র কাঁধের কাছাকাছি, ছোট পদক্ষেপে খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে তিনি চলছেন। দাদামশাইয়ের দিকে উঁচু থেকে মা তাকাচ্ছে আর মনে হচ্ছে যেন উড়ে চলেছে। তাদের দুজনের পিছনে চলেছে আমার দুজন মামা—একজন হচ্ছে মিখাইল, খাড়া খাড়া কালো চুল আর দাদামশাইয়ের মতোই রোগা শরীর, অপরজন ইয়াকভ, কোঁকড়ানো সোনালী চুল। তারপরেই রঙচঙে পোশাক পরিহিতা কয়েকজন মোটা স্ত্রীলোক, সঙ্গে গুটি ছয়েক ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েরা সকলেই আমার চেয়ে বড়ো আর সকলেই ভারি চুপ্‌চাপ। আমি চলেছি আমার দিদিমা আর ছোট নাতালিয়া-মামীর সঙ্গে। নাতালিয়া ফ্যাকাশে চেহারা, নীল চোখ আর মস্ত পেট। খানিকক্ষণ পর পরেই নাতালিয়া-মামীর হাঁপ ধরে যায়, দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে ফিসফিস করে বলে, 'উঃ, আর চলতে পারছি না।'

রেগে উঠে আমার দিদিমা বিড়বিড় করে বলেন, 'তোমাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছে তারা? কী বোকা গুষ্টি!'

এদের কাউকেই আমার ভালো লাগছে না; না বয়স্কদের, না বাচ্চাদের। নিজেকে একেবারে বাইরের লোক বলে মনে হচ্ছে। এমন কি আমার

দিদিমাও যেন এখানে এসে ম্লান হয়ে গেছেন এবং দূরে সরে গেছেন।

বিশেষ করে দাদামশাইকে আমার একেবারেই পছন্দ নয়। প্রথম থেকেই মনে মনে বুঝতে পারছি, তিনি আমার শত্রু হবেন। তিনি আমার মধ্যে একটা সন্দিগ্ধ ভাব জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর প্রতি আমি বিশেষ নজর রাখছি।

উঁচু পথটার শেষ মাথায় এসে পেঁছলাম আমরা। একেবারে এই শেষ মাথায় ডানদিকের বাঁধের গা ঘেঁষে একটা নিচু একতলা বাড়ি। এখান থেকেই শহরের রাস্তা শুরু। বাড়িটার কেমন ময়লা ময়লা গোলাপী র জানলাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর বাড়ির ছাদটা নিচু হয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জানলাগুলোর ওপরে। বাইরে থেকে দেখে বাড়িটাকে বেশ বড়োই মনে হয়েছিল আমার, কিন্তু ভিতরে ঘরগুলো ছোট ছোট ও অন্ধকার। আর সর্বত্র লোক গিজগিজ করছে; বিরক্তিকর একদল লোক অনবরত ব্যস্ত হয়ে চলেছে এঘরে-ওঘরে। স্টীমারে যাত্রীরা ওঠা-নামা করার সময়ে যেমন অবস্থা হয়, অনেকটা তাই। ফিকিরসন্ধানী চড়ুইপাখির মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বাচ্চাগুলো। আর বাড়ির সর্বত্র কেমন একটা ঝাঁঝালো অপরিচিত গন্ধ।

তারপর বাইরে উঠোনে এসে দেখলাম, সেখানকার অবস্থাও কোনো দিক দিয়েই উন্নত নয়। ঘন রং গোলা জলভর্তি বড় বড় গামলা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তাতে কাপড় আর মস্ত মস্ত কাপড় টাঙানো হয়েছে শুকোবার জন্যে। এক কোণের একটা নিচু চালাঘর থেকে দেখা যাচ্ছে আগুনের আভা; কাঠের উনুন জ্বলছে, চিড়বিড় শব্দে সিদ্ধ হচ্ছে কি যেন। আর শোনা যাচ্ছে একজন অদৃশ্য মানুষের উচ্চকণ্ঠ চিৎকারে কতগুলো অদ্ভুত শব্দ:

'চন্দন ম্যাজেন্টা সালফিউরিক এসিড .'

দুই

তারপর থেকেই এক দুঃ, ঘটনাবহুল ও অবর্ণনীয় রকমের আশ্চর্য জীবনের শুরু। এক বিষাদগম্ভীর গল্পের মতো এই জীবনের কথা আমার মনে পড়ে; একজন দয়াবান প্রতিভাধর ব্যক্তি, যিনি এত বেশি বাস্তবানুগ যে এতটুকু বিচ্যুতিও সহ্য করেন না --- তাঁর মুখেই যেন শোনা এই গল্প।

আজ যখন অতীতের কথা ভাবি তখন মাঝে মাঝে বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে যে সত্যিই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল কারণ দিদিমা যাদের বলেছেন 'বোকা গুষ্টি' তাদের জীবনটা ছিল খুবই অন্ধকার আর ভয়ঙ্কর হিংস্র। আজো ইচ্ছে হয়, ঘটনাগুলোকে মুছে ফেলে দিই, জোর করে ভাবি যে ঘটনাগুলো সত্যি নয়।

কিন্তু ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বা না-লাগার ওপরে সত্যি নির্ভর করে না; আর তাছাড়া এই কাহিনী আমার নিজের সম্পর্কে নয়। সে-সময়ে রাশিয়ার সাধারণ মানুষরা যে শ্বাসরোধী ও আতঙ্কজনক পরিবেশে বাস করত এবং এখনো করে — তারই চিত্র এই কাহিনী।

আমার দাদামশাইয়ের বাড়িটা ছিল পরস্পর বিদ্বেষের বাষ্পে ঠাসা। কেউ কাউকে পছন্দ করত না। বয়স্কদের হাড়েমজ্জায় এই বিদ্বেষের বিষ ঢুকেছিল, এমন কি ছোটরাও এর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচতে পারেনি। পরে দিদিমার মুখে গল্প শুনে আমি জেনেছি — আমার মা এমন এক সময়ে এই বাড়িতে হাজির হয়েছিল যখন মামারা উভয়ই দাবি তুলেছে, দাদামশাই তাঁর বিষয়সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিক। আমার মা'র ফিরে আসাটা অপ্রত্যাশিত এবং এই ব্যাপারে এই দাবিটা আরো জোরালো হয়ে ওঠে। মামাদের ভয় হল যে মা হয়তো এবার তার বিয়ের যৌতুক দাবি করে বসবে। মা বিয়ে করেছিল 'নিজের পছন্দমত', মা'র বিয়েতে দাদামশাইয়ের মত ছিল না — তাই তিনি কোনো যৌতুক দেননি। মামারা মনে করেছিল যে এই যৌতুকও তাদের মধ্যেই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। অনেকদিন ধরেই মামাদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছে, কে বা শহরে থেকে কারখানা খুলবে, কে বা যাবে ওকা নদীর অপর তীরে কুনাভিনো বসতিতে।

আমরা আসার কিছুদিনের মধ্যেই একদিন রান্নাঘরে খেতে বসে শুরু হয়ে যায় ঝগড়া। মামারা দুজনেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর টেবিলের ওপরে ঝুঁকে কুকুরের মত তেড়েফুঁড়ে আর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে দাদামশাইয়ের মুখের ওপরেই যা-তা চীৎকার করতে লাগল। রাগে লাল হয়ে ওঠেন দাদামশাই, তারপর টেবিলের ওপর চামচ ঠুকে মোরগের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন:

'রাস্তায় রাস্তায় তোদের ভিক্ষে করাব!'

যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে দিদিমা বলেন, 'কর্তা, দিয়ে দাও ওদের সব। যা আছে দিয়ে দাও। কী দরকার এত অশান্তির!'

'থামো গো, সায়-দিউনী!' আগুন-ঝরা চোখে দাদামশাই হুংকার দিয়ে ওঠেন। এই ছোট মানুষটিও এমন কান-ফাটানো চিৎকার করতে পারেন — অবাক কান্ডই বলতে হবে!

আমার মা উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীর পায়ে জানলার কাছে গিয়ে ঘরের মানুষগুলোর দিকে পিঠ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ মিখাইল-মামা তার ভাইয়ের মুখে প্রচন্ড একটা ঘুষি মারে। ঘুষি খেয়ে ভাইটি গাঁ গাঁ করে জাপটি ধরে মিখাইল-মামাকে। তারপরেই শুরু হয় মেঝের ওপরে গড়াগড়ি, গালাগালি, ঘোঁৎ ঘোঁৎ চিৎকার আর হাঁপানি।

বাচ্চারা কান্না জুড়ে দিয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা নাতালিয়া-মামী জুড়েছে বিলাপ, মা তাকে দু-হাতে ধরে বাইরে কোথায় নিয়ে যায়। বসন্তের দাগওলা হাসিখুশি ইয়েভগেনিয়া-ধাই ছেলেমেয়েদের তাড়া দিয়ে বার করে দেয় রান্নাঘর থেকে, চেয়ারগুলি পড়ে যায়। তরুণ বিশালস্কন্ধ শিক্ষানবীশ ৎসিগানক মিখাইল-মামার পিঠে বসে তাকে চেপে ধরে আর গ্রিগরি ইভানোভিচ ধীরেসুস্থে একটা তোয়ালে দিয়ে মামাকে পিঠমোড়া করে বাঁধে। গ্রিগরি ইভানোভিচের মাথায় টাক, মুখে দাড়ি, চোখে কালো চশমা। সে হচ্ছে একজন ওস্তাদ কারিগর।

আমার মামা পাতলা পাতলা কালো দাড়িসমেত চিবুকটা মেঝের উপর ঘষতে ঘষতে গলা ফাটিয়ে প্রচন্ড চিৎকার জুড়ে দেয়।

'কী লোক সব! এরা নাকি আবার এক মায়ের পেটের ভাই। ছিঃ, কী সব লোক!' টেবিলের চারপাশে ঘুরপাক খেতে খেতে আমার দাদামশাই করুণ স্বরে চিৎকার করতে থাকেন।

কথা কাটাকাটি শুরু হতেই আমি ভয়ে চুল্লির ওপরে গিয়ে উঠেছিলাম। সেখান থেকে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে দেখি, আমার দিদিমা ইয়াকভ-মামার মার-খাওয়া মুখ থেকে রক্ত ধুয়ে দিচ্ছেন। ইয়াকভ-মামা কাঁদছে আর দাপাচ্ছে আর দিদিমা ভারী গলায় বলছেন:

'তোদের বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে রে জংলী গুষ্টি!'

আর গায়ের ছেঁড়া জামাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে দাদামশাই দিদিমার দিকে তেড়ে আসছেন আর চিৎকার করছেন:

'ডাইনী বুড়ী, দ্যাখ্, তুই কী অসভ্য জংলীদের পেটে ধরেছিলি!'

ইয়াকভ-মামা বেরিয়ে যাবার পর দিদিমা জড়োসড়ো হয়ে এক কোণে গিয়ে বসে ভীষণ আর্তনাদ করতে থাকেন:

'হে পুণ্যময়ী জগৎমাতা! আমার এই ছেলেগুলোকে একটু সুবুদ্ধি দিও!'

টেবিলের উপরে জিনিসপত্রগুলো ছত্রাকার হয়ে উল্‌টে-পাল্‌টে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে দাদামশাই বলেন, 'গিন্নী, তোমার এই ছেলেগুলোর দিকে নজর রেখো। বিশ্বাস নেই, হয়তো ভারভারাকে খুন করেই ফেলবে...'

'ভগবান জানেন তুমি কী বলছো! আচ্ছা, এবার তোমার গায়ের শার্টটা খুলে দাও তো, সেলাই করে দিই।'

দাদামশাইয়ের মুখটা দু-হাতে ধরে দিদিমা তার কপালে চুমু খান। দিদিমার তুলনায় দাদামশাই মানুষটি ছোটখাটো — দিদিমার কাঁধের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকেন তিনি।

'গিন্নী, মনে হচ্ছে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়াই ভালো।'

'তাই ভালো, কর্তা।'

বহুক্ষণ তাঁরা কথা বলেন। প্রথম দিকে কারও কথাবার্তার মধ্যে উষ্মা ছিল না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দাদামশাই ফুঁসে ওঠেন। লড়াই শুরু করার আগে মোরগ যেমন মাটি আঁচড়ায় তেমনিভাবে মেঝেয় পা ঘষে তিনি দিদিমার দিকে আঙ্গুল তুলে শাসাতে শাসাতে বলতে থাকেন, 'তোমাকে ভালো করেই চিনি। ওদের চিন্তাতে তুমি পাগল -- আমাদের কথা ভাববে কেন?' তীক্ষ্ণ চাপা গলায় দাদামশাই চিৎকার করতে থাকেন, 'ওই যে তোমার মিখাইল — ওটার মুখে এক, মনে এক! ইয়াকভটা হচ্ছে একটা আসল শয়তান! ওদের হাতে পড়লে দুদিনে ফুটফাট করে উড়িয়ে দেবে সব!'

হঠাৎ আমি একটা কান্ড করে বসি। অসাবধানে নড়তে গিয়ে আমার কাঁধের ধাক্কায় একটা ইস্ত্রি পড়ে যায়। প্রচন্ড শব্দে চুল্লির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে ইস্ত্রিটা। কাপ-ডিশের তলানি ফেলবার জন্যে একটা বড় গামলা ছিল — ইস্ত্রিটা গিয়ে পড়ে তার মধ্যে। চম্‌কে লাফিয়ে উঠে আমার দাদামশাই এক হ্যাঁচ্‌কা টানে আমাকে টেনে নিয়ে আসেন, তারপর মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যেন এই তিনি প্রথম আমাকে দেখছেন!

'তোকে ওই চুল্লির ওপরে কে উঠিয়ে দিয়ে গেল? তোর মা?'

'আমি নিজেই উঠেছি।'

'মিথ্যে কথা বলছিস।'

'না, মিথ্যে কথা বলছি না। ভয় পেয়ে আমি নিজেই চুল্লির ওপরে উঠেছি।'

আমাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে কপালে ধাঁই করে একটা চাটি মেরে বলেন:

'ঠিক বাপের স্বভাব পেয়েছে! বেরিয়ে যা এখান থেকে!'

আমিও তাই চাই। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পেরে খুশিই হই আমি।

বেশ বুঝতে পারতাম দাদামশাইয়ের ধারালো সবুজ চোখের দৃষ্টি সব সময়ে আমাকে অনুসরণ করছে, তাই আমি তাঁকে ভয় করে চলতাম। মনে আছে, সেই কুৎকুতে চোখের দৃষ্টিকে সব সময়ে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতাম আমি। আমাব মনে হত, তিনি নীচ প্রকৃতির লোক; লোকের আঁতে ঘা দিয়ে এবং লোকে যা পছন্দ করে না সেইভাবে সবার সঙ্গে কথা বলেন তিনি, লোককে রাগিয়ে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আনন্দ পান।

'হুঃ, তোমরাই-ই!' কথাটা তিনি প্রায়ই বলতেন এবং বলতে ভালোবাসতেন। 'ই' বলবার সময় অনেকক্ষণ ধরে টেনে টেনে উচ্চারণ করা 'ই' শব্দটুকু শুনে আমার শরীরটা শির-শির করে উঠত আর ভারি একা মনে হত নিজেকে।

সন্ধ্যার চা খাবার সময়টা ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারখানা খালি করে বেরিয়ে আসতেন আমার দাদামশাই, আমার মামারা আর কারিগররা। ক্লান্ত পায়ে সবাই এসে ঢুকত রান্নাঘরে। এ্যাসিড-ঝল্‌সানো চন্দনের রঙমাখা হাত আর ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা উল্‌টানো চুল — অন্যরকম হয়ে যেত চেহারাগুলো। রান্নাঘরের কোণে রাখা সাধুসন্তদের কালো কালো আইকনের মতো মনে হত মানুষগুলোকে। আর ঠিক সেই বিপজ্জনক মুহূর্তে আমার দাদামশাই আমার সামনাসামনি বসে কথা বলতেন। আমার সঙ্গে যতো বেশি কথা বলতেন, অন্য নাতিনাতনিদের সঙ্গে তা বলতেন না; আর আমার ওপর ঈর্ষা হত তাদের। আমার দাদামশাইয়ের চেহারার মধ্যে বেশ একটা পারিপাট্য ছিল, পাথর কুঁদে গড়া অত্যন্ত মসৃণ মূর্তির মতো।

তিনি যে রেশমকাটা সাটিন ফতুয়া গায়ে দিতেন তা ছিল পুরনো ও জীর্ণ, সুতির কামিজ কুঁচকনো, হাঁটুর কাছে তালিমারা প্যাণ্ট; ওদিকে তাঁর ছেলেরা কোট গায়ে দিত, গলায় রেশমি রুমাল -- তবুও মনে হত ছেলেদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং তাঁর সাজপোশাকটাও অনেক ভালো।

আমরা পেঁছবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিলেন: কি-ভাবে উপাসনা করতে হয় তা শেখা। বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড়ো এবং তারা ইতিমধ্যেই লিখতে পড়তে শিখেছে। আমাদের বাড়ির জানলা দিয়ে তাকালে একটা সোনালী চুড়ো দেখা যায়। গির্জাটার নাম উস্পেনস্কি ক্যাথেড্রাল। এই ক্যাথেড্রালের পুরুত এ-বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

আমাকে শিখিয়েছিল আমার মামী নাতালিয়া। শান্ত ভীরু স্বভাব, মুখখানা ঠিক ছেলেমানুষের মতো, আর তার চোখদুটো এত স্বচ্ছ যে সেই চোখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে একেবারে তার মাথার পিছনদিকটা পর্যন্ত দেখে নেওয়া যায় যেন।

চুপ করে বসে নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগত আমার। মামীমা অস্বস্তি বোধ করত, চোখ কুঁচকিয়ে মাথা বেঁকিয়ে কথা বলত চাপা ফিস্‌ফিসানির মতো স্বরে।

'লক্ষ্মীটি, আমি যা বলছি বলো — "আমাদের পিতা যিনি হন..."'

'"যিনি হন" মানে কী?'

'চুপ, প্রশ্ন কোরো না।' চকিতে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মামীমা জবাব দিত, 'প্রশ্ন করলে কথাগুলো আরো গুলিয়ে ফেলবে। আমি যেমনটি বলছি, তেমনটি বলে যাও — "আমাদের পিতা..." কই, চুপ করে আছ যে?'

প্রশ্ন করলে কথাগুলো আরো গুলিয়ে ফেলব কেন, আমি তা কিছুতেই বুঝতে পারি না। আমার মনে হয়, 'যিনি হন' কথাগুলোর অন্য কিছু একটা গুপ্ত অর্থ আছে। আমি ইচ্ছা করে সঠিক কথাগুলো না বলে উল্‌টো-পাল্‌টা বলতে শুরু করি:

'"যিনি জন", "বিনি ধন"...'

মামীমার সাদা ধবধবে মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হত, যেন মামীমা আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। ধৈর্য না হারিয়ে আমার ভুল ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করত।

'না, তা নয়, আমি কী বলছি শোন — "যিনি হন..."'

কিন্তু আমার কাছে মামীমা এবং মামীমার মুখের কথা দুটোকেই জটিল বলে মনে হত। আমি রেগে উঠতাম আর তাই উপাসনার কথাগুলো আমার পক্ষে মনে রাখা আরো শক্ত হত।

একদিন দাদামশাই আমার সারা দিনের কাজের হিসেব নিতে বসলেন:

'এই যে লেক্সেই, আজ সারাটি দিন কী করেছ শুনি? শুধু খেলা হয়েছে — না? হুঁঃ, কপালটা যে-রকম ফুলে উঠেছে তা থেকেই বুঝতে পারছি। ওহে বাপু, খেলতে গিয়ে কপাল ফুলিয়ে আসাটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, সবাই পারে — কিন্তু লেখাপড়ার কদ্দুর? "আমাদের পিতা" উপাসনাটা শিখেছ?'

মামীমা ফিসফিস করে বলল, 'ওর মুখস্থ হতে একটু সময় লাগে।'

মুচকে হেসে আমার দাদামশাই লাল লাল ভুরুদুটো তুলে বললেন:

'তাই যদি হয় তো ওকে একটু উত্তম-মধ্যম দিতে হয়।'

'কিরে, তোর বাবার হাতে মাঝে মাঝে প্রহারেণ হত?' আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

দাদামশাই কী বলছেন বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে রইলাম।

আমার মা জবাব দিল, 'না, মাক্সিম কক্ষণো ছেলের গায়ে হাত তুলত না। আমাকেও বারণ করত।'

'কেন?'

'মাক্সিম বলত, মারধোর করে কাউকে কোনো কিছু শেখানো যায় না।'

ফুঁসে উঠে দাদামশাই স্পষ্টভাবে বললেন, 'মাক্সিমের আত্মা যেন শান্তি পায়। কিন্তু তবুও বলি, লোকটার কোনো বিষয়েই বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে ছিল না।'

দাদামশাইয়ের কথাগুলোতে আমি যে দুঃখিত হলাম, তা তিনি বুঝতে পারলেন।

'থাক্, আর ঠোঁট বাঁকাতে হবে না। বরং বুঝেশুনে চলতে চেষ্টা কোরো! দেখ না, আঙুঠির জন্যে সাশকাকে এই শনিবার কেমন ধোলাই হয়।' কথাগুলো বলে তিনি নিজের মাথার লাল ও রুপোলি চুলগুলোকে হাত দিয়ে মসৃণ করতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ধোলাই মানে কী?'

সবাই হেসে উঠল। আমার দাদামশাই জবাব দিলেন, 'সবুর করো, নিজেই দেখতে পাবে এর মানে কী।'

ঘরের এক কোণে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আমি ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। ধোলাই দিতে হলে কাপড়চোপড়কে আলাদা আলাদা বাছাই করে ভাঁটিতে দিতে হয়। কিন্তু উত্তম-মধ্যম দেওয়া আর প্রহার দেওয়া বোধ হয় একই ব্যাপার। আচ্ছা, লোকে তো প্রহার দেয় কুকুর ঘোড়া আর বেড়ালকে। আস্ত্রাখানে পুলিস পারসিকদের ধরে প্রহার দেয়—এটা আমার নিজের চোখে দেখা। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের প্রহার দিতে আমি কাউকে দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, মামাদের অবশ্য মাঝে মাঝে দেখেছি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কপালে বা মাথার পিছনদিকে দু-একটা চাঁটি মারতে -- কিন্তু যারা চাঁটি খায় তারা এতে বিশেষ কিছু মনে করে না। শুধু ব্যথার জায়গায় দু-একবার হাত বুলিয়েই ভুলে যায় ব্যাপারটা। মাঝে মাঝে আমি ওদের জিজ্ঞেস করি, ওরা ব্যথা পেয়েছে কিনা।

বুক ফুলিয়ে ওরা জবাব দেয়, 'উঁহু, কিচ্ছু ব্যথা লাগেনি।'

আঙুঠির বিখ্যাত ঘটনাটি আমি জানতাম। চা-পানের পর রাত্রের খাওয়া পর্যন্ত সময়টুকুতে আমার মামারা ও কারিগর সেলাই নিয়ে বসে। রঙ ছোপানো কাপড়ের টুকরোগুলো পর-পর জোড়া দিয়ে কার্ডবোর্ডের চাক্‌তি লাগিয়ে রাখে। সেদিন আধা-অন্ধ গ্রিগরিকে নিয়ে খানিকটা তামাসা করবার জন্যে মিখাইল-মামা একটা কান্ড করেছিল। ন-বছরের ভাইপোকে বলে, গ্রিগরির আঙুঠিটা মোমবাতির ওপরে ধরে গরম করতে। সেই কথা শুনে সাশা একজোড়া চিমটে দিয়ে আঙুঠিটাকে মোমবাতির শিখার ওপরে ধরে থাকে। তারপর যখন আঙুঠিটা তেতে লাল হয়ে ওঠে তখন সেটাকে গ্রিগরির পাশে রেখে দিয়ে লুকিয়ে থাকে চুল্লির পিছনে। ঠিক সেই সময়ে আমার দাদামশাই সেখানে আসেন এবং কাজ করবার জন্যে বসে গরম আঙুঠিটা তুলে নেন।

আমার মনে আছে, কিসের এত গন্ডগোল জানবার জন্যে আমি ছুটে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম। দেখলাম, আমার দাদামশাই হাস্যকরভাবে দাপাদাপি করছেন আর পোড়া আঙ্গুলগুলো দিয়ে কান চেপে ধরে চিৎকার করছেন:

'কোন বেল্লিকের কান্ড এটা?'

মিখাইল-মামা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আঙুঠিটা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে আর ফুঁ দিচ্ছে; গ্রিগরির কোন দিকে খেয়াল নেই, আপন মনে সেলাই করে চলেছে — লম্বা লম্বা ছায়া এসে পড়েছে তার মাথার মস্ত টাকের ওপরে। ইয়াকভ-মামা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এল, তারপর হাসি চাপবার জন্যে লুকিয়ে

রইল চুল্লির পিছনে। আমার দিদিমা পুলটিস দেবার জন্যে কাঁচা আলু বাটতে শুরু করলেন।

'ইয়াকভের ছেলে সাশকার কাণ্ড এটা,' হঠাৎ বলে উঠল মিখাইল-মামা।

'মিথ্যে কথা,' উনুনের পিছনে থেকে লাফিয়ে এসে বলল ইয়াকভ।

ওদিকে ঘরের এক কোণ থেকে ইয়াকভের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে:

'না বাবা, মিথ্যে বলছে! জেঠা নিজেই তো আমাকে আঙুঠিটা গরম করতে বলল!'

তারপর শুরু হয়ে গেল মামাদের মধ্যে ঝগড়া। আর সেই ঝগড়া শুনে আমার দাদামশাই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। আর একটি কথাও বললেন না, আঙুলে পুলটিস লাগিয়ে বেরিয়ে এলেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

সকলে মিখাইল-মামাকেই দোষ দিতে লাগল। সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনে প্রশ্ন জাগল, মিখাইল-মামাকে এবার ধোলাই এবং প্রহার দেওয়া হবে কিনা। চা-পানের সময়ে প্রশ্নটা আমি জিজ্ঞেস করে বসলাম।

'তাই দেওয়াই তো উচিত।' আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন আমার দাদামশাই।

'শোনো ভারভারা, তোমার ওই কুকুরছানার মতো ছেলেকে যদি না সামলাও তাহলে ওর মুণ্ডুটা আমি ছিঁড়ে ফেলব।'

আমার মা জবাব দিল, 'ওর গায়ে একবার হাত তুলেই দেখ না!'

সকলে চুপ করে রইল।

আমার মা'র এই একটা ক্ষমতা আছে। ছোট দু-একটা কথাকে এমন প্রচণ্ড শক্তিতে ছুঁড়ে মারতে পারে যে অন্যরা পিছু হটে যায়।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, সবাই মা'কে ভয় করে চলে। এমন কি মা'র সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার দাদামশাইয়েরও গলার সুর বদলে যায়। অন্যদের সঙ্গে যে-ভাবে তিনি কথা বলেন, তার চেয়েও অনেক শান্তভাবে বলেন মা'র সঙ্গে। এতে আমি খুশি হতাম।

'আমার মা'র মতো ক্ষমতা আর কারও নেই।' মামাতো ভাইদের কাছে জাঁক করে বলতাম আমি।

আমার মামাতো ভাইরাও কথাটা অস্বীকার করত না।

কিন্তু তার পরের শনিবারের ঘটনায় আমার মা'র সম্পর্কে আমার সমস্ত ধারণা টলে উঠল।

শনিবারের আগেই আমিও একটা কাণ্ড করে বসলাম এবং নিজেই পড়ে গেলাম গণ্ডগোলের মধ্যে।

বড়রা যে-ভাবে কাপড়ের রং বদলায় তা দেখে আমি খুবই অবাক হতাম। হয়তো একটা হল্‌দে কাপড়ের টুকরো নিয়ে কালো জলে ডোবায় আর সঙ্গে সঙ্গে কাপড়টা হয়ে ওঠে গাঢ় নীল — এই হচ্ছে 'বনজ নীল'। কিংবা হয়তো একটা ছাইরঙা কাপড় নিয়ে লাল্‌চে জলে ছুপিয়ে নেয় আর কাপড়টা হয়ে ওঠে টক্‌টকে লাল — এই হচ্ছে 'তুঁতে লাল'। কাজগুলো খুবই সহজ কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয় কিছুই বোঝা যায় না।

মনে মনে আমার খুবই ইচ্ছে ছিল, কাপড় রং করাটা একবার নিজে পরখ করে দেখি। ইয়াকভের ছেলে সাশার কাছে আমি মনের এই ইচ্ছা প্রকাশ করে বললাম। ছেলেটি বিনয়ী, গম্ভীর প্রকৃতির আর সব সময়ে বড়দের পিছনে ঘুর-ঘুর করে এবং বড়দের সব কাজে সাহায্য করতে চায়। ওর এই বুদ্ধি ও বাধ্য স্বভাবের জন্যে এক দাদামশাই বাদে আর সবাই প্রশাংসা করে ওকে।

'দূর দূর, একেবারে তোষামুদে!' ছেলেটির দিকে অপছন্দের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাদামশাই বলেন।

ইয়াকভের ছেলে সাশার গায়ের রং কালো, হাড়-জিরজিরে শরীর, চোখদুটো কাঁকড়ার মত ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চাপা স্বরে তড়বড়িয়ে কথা বলে, অর্ধেক কথা মুখ দিয়ে বেরোয় আর অর্ধেক বেরোয় না, আর কথা বলতে বলতে এমনভাবে চোরের মত এদিক-ওদিক তাকায় যেন ছুটে পালিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দেবার মতলব আঁটছে। এমনিতে তার কটা চোখদুটো অনড় কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠলে মনে হয়, তার চোখের মণিদুটো পর্যন্ত কাঁপছে।

ওকে আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে মিখাইলের ছেলে সাশাকে অনেক বেশি ভালো লাগে — যদিও এই সাশার মধ্যে লক্ষণীয় কিছু নেই এবং একটু যেন হাবাগোবা ধরনের। সাশার স্বভাব শান্তশিষ্ট, মায়ের মতই দুটি বিষণ্ণ চোখ ও ভুবনজয়ী হাসি। ওর দাঁতগুলি ভারি বিশ্রী; মুখ থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর দুই সারি দাঁত গজিয়েছে উপরের মাড়িতে। এই দাঁতের পিছনেই সর্বক্ষণ লেগে থাকে ও, মুখের মধ্যে আঙুল পুরে অনবরত শুধু চেষ্টা করে পিছনের দাঁতগুলোকে টেনেটুনে আল্‌গা করে তুলে ফেলা যায় কিনা। কেউ যদি আঙুল দিয়ে ওর দাঁতগুলোকে পরখ

করতে চায়, তাহলেও ওর কোনো উচ্চবাচ্য নেই, বাধ্য ছেলের মত হাঁ করে। শুধু এইটুকু ছাড়া ওর মধ্যে আর কোনো বিশেষত্ব আমি খুঁজে পাইনি। বাড়ির মধ্যে মানুষ গিজ্‌গিজ করছে কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যেও ও যেন একা, ওকে দেখতে পাওয়া যায় কোনো একটা অন্ধকার কোণে হয়তো আপন মনে বসে আছে কিংবা জানলার ধারে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে সারাটা সন্ধ্যা। ওর পাশে বসলে বক্‌বক্‌ করতে হয় না, খুশিমত চুপচাপ থাকা যায়। জানলার ধারে ওর পাশটি ঘেঁষে বসে একটি কথাও না বলে পুরো এক ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া চলে। শুধু চেয়ে থাকা যায় — উস্পেনস্কি ক্যাথেড্রালের চারপাশে দাঁড়কাকগুলো চক্রাকারে উড়ছে আর সূর্যাস্তের লাল আভার পটভূমিতে ক্যাথেড্রালের সোনালী চূড়াগুলো উৎকীর্ণ লিপির মত অপরূপ হয়ে উঠেছে। পাখিগুলো অনেক উপরে উঠে যায়, আবার নিচে নেমে আসে, তারপর সহসা একসময়ে ম্লানায়মান আকাশে কালো একটি জাল বিস্তার করে অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে; পিছনে পড়ে থাকে এক সীমাহীন শূন্যতা। এই ধরনের দৃশ্যের দিকে চেয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে না; আনন্দে ও বিষণ্ণতায় বুকটা টনটন করে ওঠে।

এদিকে ইয়াকভ মামার ছেলে সাশার স্বভাবটা ঠিক উল্‌টো। বড়োদের মতো যে কোনো বিষয়ে যতক্ষণ খুশি চটকদার কথা বলতে পারে ও। কাপড়চোপড়ে রং করার বিদ্যে আয়ত্ত করবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব এ কথা জানতে পেরে ও আমাকে পরামর্শ দিতে এল। ও বলে যে ছুটির দিনে পাতবার জন্যে যে টেবিল-ঢাকনাটি দেরাজে আছে সেটিকে বার করে নিয়ে আমি গাঢ় নীল রঙে চুবিয়ে নিতে পারি।

'আমার তো মনে হয়, সাদা কাপড়ে সব রং যেমন ফোটে, এমন আর কোনো কিছুতে নয়। আমার এই কথাটি জেনে রাখ।' খুব ভারিক্কী চালে বলে ও।

সেই মস্ত টেবিল-ঢাকনাটা আমি টেনে বার করলাম, তারপর ছুটে গেলাম উঠোনে। গামলাতে গাঢ় নীল রং তৈরি করা ছিল, সেই গামলাতে সবেমাত্র ঢাকনাটার একটা প্রান্ত চুবিয়েছি এমন সময় ৎসিগানক একেবারে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আমার হাত থেকে টেবিল-ঢাকনাটা কেড়ে নিয়ে প্রকাণ্ড থাবার মতো দুই হাত দিয়ে নিঙড়াতে শুরু করল। আমার মামাতো ভাই অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাণ্ড দেখছিল, তার দিকে তাকিয়ে ৎসিগানক চেঁচিয়ে বলল:

'যাও তো, ছুটে গিয়ে ঠাকুমাকে ডেকে নিয়ে এস!'

তারপর উষ্কখুষ্ক চুলের কাল মাথাটা আমার দিকে ফিরিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল:

'দেখ না, কেমন মজাটা টের পাবে।'

আমার দিদিমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন, তারপর চোখের সামনে এই কান্ড দেখে তাকিয়ে রইলেন হাঁ করে। এমন কি আমাকে হাস্যকরভাবে ধমক দিতে গিয়ে তাঁর চোখ দিয়ে দু-এক ফোঁটা জল পর্যন্ত বেরিয়ে এল। তাঁর নিজস্ব অদ্ভুত ঢঙে তিনি আমাকে ধমক দিলেন:

'ওরে, বাঁধাকপির মতো কানওলা পাজিছোঁড়া, তোকে মেরে গুঁড়ো করে ছুঁড়ে ফেলা উচিত।'

তারপর তিনি ৎসিগানককে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন:

'ভানিয়া, ঠাকুরদার কানে ওঠাসনে যেন! আমি কাউকে টের পেতে দেব না, তাহলে আর কোনো গোলমাল হবে না...'

'আমার সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। বরং আপনি সাশাকে সাবধান করে দিন, ও যেন এ নিয়ে ফিস্‌ফাস না করে।' পরনের চিত্রবিচিত্র এপ্রনে হাত মুছতে মুছতে উদ্বিগ্ন স্বরে ভানিয়া জবাব দিল।

'ওর হাতে কিছু পয়সা দিলেই ওর মুখ বন্ধ করা যাবে।' আমার হাত ধরে বাড়ির ভিতরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে দিদিমা বললেন।

শনিবার, সন্ধ্যা প্রার্থনা-সভার আগে, কে যেন আমাকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম, ঘরের ভিতরটা অন্ধকার ও চুপচাপ। মনে আছে, বাইরের দিকের এবং এই ঘর থেকে অন্যান্য ঘরে যাতায়াতের দরজাগুলো শক্ত করে আঁটা ছিল। জানলার বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ও কুয়াশাম্লান শারদ সন্ধ্যা। চুল্লির কালো মুখটার সামনে একটা বেঞ্চিতে অস্বাভাবিক রকমের ক্রুদ্ধ মুখে ৎসিগানক বসে আছে। আমার দাদামশাই দাঁড়িয়ে আছেন এক কোণের একটা গামলার কাছে, বার্চগাছের ডাল দিয়ে তৈরি লম্বা লম্বা বেতগুলোকে জল থেকে টেনে টেনে তুলছেন, বেতগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করছেন আর তীক্ষ্ন শিস তুলে শপ্‌ শপ্‌ বেতের বাড়ি মারছেন হাওয়ায়। আমার দিদিমা ঘরের অন্ধকারে কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন যেন এবং জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে নস্যি নিতে নিতে বিড়বিড় করে বলছেন:

'পাষন্ড, এই কাজেই তোমার আনন্দ...'

রান্নাঘরের মাঝখানটিতে একটি চেয়ারে বসে আছে ইয়াকভের ছেলে সাশা। দুই হাতের মুঠি দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে বুড়ো ভিখিরির মত করুণ সুরে টেনে টেনে বলে চলেছে:

'যীশু খ্রীষ্টের দোহাই, আমি এবারকার মতো মাপ চাইছি...'

মিখাইল-মামার ছেলে সাশা ও তার বোন খুঁটির মতো টান হয়ে চেয়ারের পিছনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

'আগে তোমার উপযুক্ত শাস্তি হোক, তারপরে মাপ করব।' একটা লম্বা ভিজে বেত মুঠোর মধ্যে টানতে টানতে দাদামশাই জবাব দেন। 'আচ্ছা বেশ, এবার প্যাণ্ট খোল।'

শান্তভাবে তিনি কথা বলেন। রান্নাঘরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার, ধোঁয়ায় কালো সিলিং -- আর ঘরের মধ্যে এমন এক স্তব্ধতা যা ভোলা যায় না। আমার দাদামশাইয়ের কথা, নড়বড়ে আর কিচ্‌কিচ্‌-শব্দ-হওয়া চেয়ারের ওপরে ছেলেটির নড়াচড়া, আমার দিদিমার এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভর দিয়ে দাঁড়ানো -- কোনো কিছুতেই ঘরের এই স্তব্ধতা ভঙ্গ হয় না।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় সাশা। প্যাণ্টটা খুলে হাঁটু পর্যন্ত নামায়, তারপর ঝুঁকে পড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় বেঞ্চির দিকে। ওর এই অবস্থা দেখে গা শির্‌শির্‌ করে ওঠে। আমারও হাঁটুদুটো কাঁপছে। কিন্তু তারপরের দৃশ্য আরো ভয়াবহ। অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো সাশা উপুড় হয়ে বেঞ্চির ওপরে শুয়ে পড়ে আর ভানিয়া একটা লম্বা তোয়ালে ওর বগলের তলা দিয়ে নিয়ে ঘাড়ের ওপরে বাঁধে শক্ত ভাবে। তারপর হেলে ওর পায়ের কব্‌জিদুটো চেপে ধরে থাকে।

'লেক্সেই!' আমার দাদামশাই ডাকেন, 'সামনে এগিয়ে এস। কী হে, কথা কানে ঢুকছে না বুঝি? ধোলাই কাকে বলে জানতে চেয়েছিলে, এবার তা চোখের সামনে দেখতে পাবে। ভালো করে তাকিয়ে দেখ। এক!...'

অনুচ্চে হাত তুলে তিনি সাশার খোলা গায়ের ওপরে বেতের বাড়ি মারেন। ছেলেটি আর্তনাদ করে ওঠে।

দাদামশাই বলেন, 'বাড়াবাড়ি কোরো না। ওতে তোমার কিচ্ছু ব্যথা লাগেনি! তবে এবারে ব্যথা লাগবে!'

সপাং করে তিনি বেত চালান; সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চামড়া চাকা চাকা হয়ে ফুলে লাল দাগ হয়ে ওঠে। আর আমার মামাতো ভাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়।

'কেমন লাগছে?' গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার মতো আমার দাদামশাইয়ের হাতটা একবার ওপরে ওঠে, একবার নিচে নামে, আর তিনি প্রশ্ন করে চলেন, 'মিষ্টি লাগছে না বুঝি? এইবার বোঝ আঙুঠিতে হাত দিলে কী হয়!'

যতোবার তিনি হাত ওঠান, আমার মনে হয়, আমার বুকের মধ্যে থেকে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে ঠেলে উঠে আসে; আর যতোবার তিনি হাত নামান, আমার মনে হয়, আমিও পড়ে যাচ্ছি।

ভাঙা-ভাঙা চেরা গলায় সাশা চিৎকার করে চলেছে। কান পেতে শোনা যায় না।

'আর কক্ষণো এমন কাজ করব না-আ... টেবিল-ঢাকনার কথাটা আমি কি বলিনি... আমিই তো বলেছি...'

'আরেকজনের নামে লাগালেই তো আর নিজের দোষ কাটে না।' শান্তস্বরে দাদামশাই বলে চললেন — 'লাগানিভাঙানিরাই প্রথম মার খায়। আচ্ছা, এবারে টেবিল-ঢাকনাকে ধরা যাক্।'

আমার দিদিমা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যান।

'খবরদার বলছি! যতো বড় পাষণ্ডই তুমি হও না, কিছুতেই তোমাকে লেক্সেইয়ের গায়ে হাত তুলতে দেব না!'

দিদিমা দরজার ওপরে লাথি মারতে থাকেন আর চিৎকার করেন, 'ভারিয়া! ভারভারা!'

দাদামশাই ছুটে আসেন, ধাক্কা দিয়ে দিদিমাকে ফেলে দেন, তারপর আমাকে সাপটিয়ে ধরে বেঞ্চির দিকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চলেন। আমি তাঁর হাতের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে দিই, তাঁর লাল দাড়িটা ধরে টানি, তাঁর আঙ্গুল কামড়ে দিই। তিনি গাঁ গাঁ করে চিৎকার করে ওঠেন এবং আমাকে চেপে ধরে শেষ পর্যন্ত এনে ফেলেন বেঞ্চির ওপরে। আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যাই। মনে আছে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দাদামশাই তখন চিৎকার করছেন:

'বাঁধ্ শক্ত করে! খুন করব!'

আর মনে আছে আমার মা'র সাদা ফ্যাকাশে মুখখানি আর বড়ো বড়ো চোখদুটো। বেঞ্চির পাশে মা অনবরত ছুটোছুটি করছে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে:

'বাবা, এবার থাম... ছেড়ে দাও ওকে!'

শেষ পর্যন্ত আমি জ্ঞান হারাবার পর দাদামশাই থেমেছিলেন। তারপরে কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম আমি, ছোট একটি ঘরে মস্ত চওড়া আর উষ্ণ একটি বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে দিনরাত শুয়ে থাকতাম। ঘরটিতে একটিমাত্র জানলা, আর আইকনগুলির কাছে ছোট একটি লাল আলো সারা দিন সারা রাত ধরে জ্বলত।

আমার অসুখের কয়েক দিন আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। মনে হয়, এই সময়েই আমি হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠেছিলাম এবং নতুন একটি গুণ অর্জন করেছিলাম — সেই দিন থেকে শুরু করে, সব মানুষকে আপন বলে মনে করতে লাগলাম। যেন আমার বুকের ওপর থেকে একটা চামড়ার আবরণ খসে গেছে এবং আমি নিজের ও অপরের আঘাত সম্পর্কে অসহ্য রকমের অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠেছি।

প্রথম কথা, আমার মা ও দিদিমার মধ্যে যে কথা কাটাকাটি হয় তা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে উঠি। এই ছোট ঘরটির মধ্যে আমার দিদিমা তাঁর প্রকাণ্ড কালো শরীরটি নিয়ে আমার মা'র ওপরে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, টানতে টানতে মাকে নিয়ে গেলেন আইকনগুলির কাছে, তারপর ফোঁস ফোঁস করে বললেন:

'ওকে তুই ছিনিয়ে আনতে পারলি না কেন? এ্যাঁ?'

'আমার ভয় করছিল।'

'এত বড়ো হয়েও তোর ভয় করে! ছি, ছি, ভারভারা! আমি বুড়ী হয়েছি কিন্তু আমি ভয় পাইনি! ছি, ছি!'

'থাম মা, এ সব আমার বড্ড খারাপ লাগে!'

'ওর জন্যে তোর এতটুকু ভালোবাসা বা দরদ নেই। আহা, বাপ-মরা অনাথ ছেলে!'

যন্ত্রণাভরা গলায় মা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি নিজেও তো একজন অনাথা — বাকি জীবনে আমার আর কী আছে!'

ঘরের কোণে ট্রাঙ্কের ওপরে বসে তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ কাঁদেন।

আমার মা বলে, 'আলেক্সেই যদি না থাকত তাহলে আমি এখানে থাকতাম না — অনেক দূরে অন্য কোথাও চলে যেতাম! এই নরকে আমি আর থাকতে পারি না, এই জায়গা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে, মা! এখানে থাকবার মতো মনের জোর আমার নেই!'

আমার দিদিমা ফিসফিস করে বলেন, 'আহা-রে, বাছা আমার, প্রাণ আমার!'

এতদিনে আমি জানতে পারি, আমার মাকে আর যাই হোক্ শক্তিমতী বলা চলে না। অন্য সকলের মতো মাও দাদামশাইকে ভয় করে চলে। এখানকার জীবন মা'র কাছে অসহ্য তবুও আমার জন্যেই মাকে থাকতে হচ্ছে এখানে। কথাটা ভাবতেই আমার মন অতি বিষণ্ণ হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আমার মা কোথায় যেন নিখোঁজ হয়ে যায়।

একদিন আমার দাদামশাই এলেন আমাকে দেখতে। এমন হঠাৎ এলেন যে মনে হল যেন তিনি ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন। বিছানার ধারটিতে বসে বরফের মতো ঠাণ্ডা আঙ্গুল দিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বললেন:

'কেমন আছ হে ছোক্‌রা... কথা বলো না বাপু — মনের মধ্যে রাগ পুষে রেখ না। কী হে?'

ইচ্ছা হচ্ছিল, লাথি মেরে ফেলে দিই; কিন্তু যন্ত্রণায় হাত-পা নাড়বার ক্ষমতা ছিল না। তাঁর চুল যেন আগের চেয়েও লাল, অস্বস্তির সঙ্গে তিনি অনবরত মাথা নেড়ে চলেছেন, তাঁর উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি দেওয়ালের ওপর কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। পকেট থেকে তিনি বার করলেন মিষ্টি রুটির তৈরি একটা ছাগল, চিনির তৈরি দুটি ঢোল, একটা আপেল ও কিছু কিসমিস; জিনিসগুলো বালিশের ওপরে আমার নাকের পাশে রেখে বললেন:

'দেখ দাদু, তোমার জন্যে আমি কত উপহার এনেছি।'

নিচু হয়ে তিনি আমার কপালের ওপরে চুমু খেলেন। তারপর কপালের ওপরে হাত বুলোতে বুলোতে কথা বলতে লাগলেন; তাঁর ছোট খস্‌খসে হাতটায়, বিশেষ করে তাঁর হাতের পাখির মতো বাঁকানো নখগুলোতে ঝক্‌ঝকে হলুদ রঙের ছোপ পড়েছে।

'দাদু, সেবারে তোমার যতোটুকু পাওনা ছিল, তার চেয়ে খানিকটা বেশি দেওয়া হয়ে গেছে। কথাটা কী জান, তুমি আমাকে এমন আঁচড়-কামড় দিয়েছ যে আমি ক্ষেপে গিয়েছিলাম। আর সেজন্যেই একেবারে মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। তবে এই বাড়তি মাত্রাটুকু তোমার পক্ষে এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। এটা তোমার হিসেবে আগামী বারের জন্যে জমা রইল। একটা কথা মনে রেখ ভাই। বাড়ির লোকেরা যদি তোমাকে মারে তাতে দোষের কিছু

নেই। সেটা ভালো শিক্ষা! কিন্তু খবরদার, বাইরের লোককে তোমার গায়ে হাত তুলতে দিও না। আপনার জন হলে কিছু আসে যায় না, কিন্তু বাইরের লোক কিছুতেই নয়। তুই কি মনে করিস, ছেলেবেলায় আমার কপালে কিছু জোটেনি? আলিওশা, অতি বড়ো দুঃস্বপ্নেও তুই কল্পনা করতে পারবি না আমায় কি মার খেতে হয়েছে! এক-একদিন এমন মার খেতাম যে স্বয়ং ভগবানও হয়তো তা দেখে স্থির থাকতে পারতেন না। আর এত মার খাওয়ার ফল কি কিছুই হয়নি? তাকিয়ে দেখ তো আমার দিকে — আমি ছিলাম ভিখারিমায়ের ছেলে, বাপ-মরা অনাথ — আর আজ আমি কারিগরদের প্রধান কর্মকর্তা, আমার হুকুমে কত লোক চলে।'

রোগা মজবুত শরীরটা নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি তাঁর ছেলেবেলার গল্প বলতে শুরু করলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একটির পর একটি শক্ত-শক্ত কথা জুড়ে গল্প বললেন তিনি।

তাঁর সবুজ চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, খাড়া হয়ে উঠেছে তাঁর সোনালী চুল, তাঁর কথাগুলো তীরের মতো এসে লাগছে আমার মুখের ওপরে।

'তুই এখানে এলি জাহাজে চেপে। বাষ্প সেই জাহাজকে চালিয়ে এনেছে। বাষ্প তোকে পৌঁছে দিয়ে গেল এখানে। কিন্তু ছেলেবেলায় আমি আমার নিজের গায়ের জোরে ভল্‌গার ওপর দিয়ে বজ্‌রা টেনে নিয়ে যেতাম, পাঞ্জা লড়তাম ভল্‌গার সঙ্গে। জলের ওপরে বজ্‌রা, আমি ডাঙ্গায় — খালি পায়ে তীক্ষ্ম পাথর আর ঢিবি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলা। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে চলার বিরাম নেই। সারাটি দিন মাথার ওপরে সূর্য জ্বলে, আর শেষকালে মনে হয় মাথাটা যেন লোহার একটা পাত্র আর সেই পাত্রের মধ্যে কী একটা তরল পদার্থ টগ্‌বগ করে ফুটছে। চুলের কাঁটার মতো সারাটা শরীর বেঁকে যায়, মট্‌মট করে শব্দ হয় হাড়ের মধ্যে — আর শুধু চলা আর চলা। দর্‌দর করে ঘাম ঝরে চোখের ওপরে তবুও অন্ধের মতো শুধু পথ চলা, বুকের মধ্যে দপ্‌দপ করে, যন্ত্রণায় ঠোঁট বেঁকে যায় — তবুও কোনো নালিশ না জানিয়ে মুখটি বুজে পথ চলা। এই ছিল আমাদের অবস্থা আলিওশা! আর এইভাবে চলতে চলতে একসময়ে দড়ি খসে পড়ে কাঁধ থেকে, মুখ থুবড়ে আশ্রয় নিতে হয় মাটিতে... কিন্তু তবুও ভালো লাগে তখন, — কারণ, শরীরের শেষ বিন্দু শক্তি পর্যন্ত ক্ষয় হয়েছে। আর শুয়েই আছি যতক্ষণ না জ্ঞান হারাই কিংবা মারা যাই — তখন মনে হয় ঐ দুটির মধ্যে

বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। ঈশ্বরের জগতে, পরম মঙ্গলময় যীশু খ্রীষ্টের জগতে এইভাবেই বেঁচে থাকতাম আমরা!.. এইভাবেই তিন-তিন বার আমি ভল্‌গা নদী লম্বালম্বি পাড়ি দিয়েছি — সিম্বিরস্ক থেকে রিবিনস্ক'এ, সারাতভ থেকে এখানে, আস্ত্রাখান থেকে মাকারিয়েভের বাজারে। এইভাবে হাজার হাজার মাইল পথ পার হতে হয়েছে! তারপর, তিন বছর এইভাবে চলার পর, আমার পদোন্নতি হল, বজ্‌রাটার মোড়ল হলাম। মালিক বুঝতে পেরেছিল যে অন্য সকলের চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি!'

আমার মনে হতে লাগল যেন আমার চোখের সামনে তিনি এক টুকরো মেঘের মতো বাড়তে বাড়তে মস্ত হয়ে উঠেছেন। ছোটখাটো রোগা বুড়ো লোকটি যেন হয়ে উঠেছেন রূপকথার বীরের মতো শক্তিশালী — মস্ত এক নদীর বিপুল স্রোতের বিরুদ্ধে মস্ত এক ছাইরঙা বজ্‌রাকে টেনে নিয়ে চলেছেন তিনি।

মাঝে মাঝে বিছানা থেকে এক লাফে নিচে নামেন। হাত-পা নেড়ে নিজেই দেখিয়ে দেন বুর্লাকরা* কি-ভাবে দড়ি কাঁধে নিয়ে পথ চলে আর কি-ভাবে জল ছেঁচে ফেলে বাইরে। মোটা-মোটা গলায় অপরিচিত সুরে গান গেয়ে ওঠেন; তারপরেই আবার তরুণোচিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফিয়ে উঠে আসেন বিছানার ওপরে। ভারি চমৎকার মানুষটি — কথা বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে এবং ক্রমেই তাঁর কথার মধ্যে প্রত্যয়ের ভাবটুকু বেশি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

'তবে কি জানিস আলিওশা, সেই জীবনের অন্য একটা দিকও ছিল। গ্রীষ্মের কোনো কোনো সন্ধ্যায় আমরা জিগুলিতে বিশ্রাম করতাম, সামনে থাকত সবুজ পাহাড় আর এখানে আগুন জ্বালতাম আমরা। সে-সব কী দিনই গেছে, আলিওশা! ওদিকে হয়তো পরিজ্ ফুটছে, এমন সময় একজন হতভাগ্য বুর্লাক্ মনকে হালকা করবার জন্যে দরদভরা গান গেয়ে উঠত। অন্য সবাই যারা থাকতাম তারাও গলা মেলাতাম সেই গানের সঙ্গে। আহা, কী সব গান! সেই গান শুনে সারা গা শির্‌শিরিয়ে উঠত। এমন কি মনে হত ভল্‌গা নদীও সেই গানের তালে তালে গতিময়ী হয়ে উঠছে, ঘোড়ার মতো টগ্‌বগিয়ে উঠে বেরিয়ে যেতে চাইছে আকাশ ফুঁড়ে! ঝড়ের

* যারা ডাঙায় হেঁটে বড়ো বড়ো মালবাহী বজ্‌রা টেনে নিয়ে যায়। — সম্পাঃ

মুখে ধুলোর মতো আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। গানে আমরা এমন মত্ত হতাম যে অগ্নিকুণ্ডের ওপরে চাপানো পরিজের কথা কারও মনে থাকত না—শেষকালে পরিজ্ পাত্র উপচে পড়তো। রান্নার তদারকে যে থাকত তার মাথায় চাটি মেরে তখন আমরা বলতাম—গান-টান যতো খুশি কর বাপু কিন্তু নিজের কাজটিতে যেন ভুল না হয়।'

তাঁকে ডাকবার জন্যে মাঝে মাঝে লোক আসছে। যতোবার লোক আসে আমি আব্দার ধরি: 'দাদামশাই, আরেকটি গল্প বলো, এখন যেও না।'

তিনি হাসেন, তারপর হাত নেড়ে বলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা। ওরে, ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলে দে।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে গল্প বলে চলেন তিনি। তারপর সস্নেহে বিদায় নিয়ে উঠে যান। আমি বুঝতে পারি, দাদামশাই নীচ প্রকৃতিরও নন, ভয়ঙ্কর কিছুও নন। ভাবতেও কষ্ট হয় যে এই একই লোক আমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছেন। কিন্তু ঘটনাটা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

দাদামশাই আমাকে দেখে যাওয়ার পর থেকেই আমার কাছে অন্য সকলের আসা অবারিত হয়ে গেল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কেউ না কেউ আমার বিছানার পাশে বসে থাকে, নানা মজার কথা বলে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে আমাকে। তবে এটুকু আমার মনে আছে, চেষ্টা করলেই যে আমাকে ভুলিয়ে রাখা যেত তা নয়। সবচেয়ে বেশি আসতেন আমার দিদিমা, অন্য কেউ তাঁর মতো এত ঘনঘন আসত না। দিদিমা আমার সঙ্গে শুতেন পর্যন্ত। কিন্তু এই সময়ে আর একজন আমার মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছিল। তার নাম ৎসিগানক। গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, চওড়া কাঁধ, মস্ত মাথা আর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। পরনে আগাগোড়া উৎসবের পোশাক—সোনালী সিল্কের কামিজ, মখমলের ট্রাউজার আর মশ্মশে বুটজুতো। চলবার সময় গোড়ালির কাছে জুতোর চামড়ায় একর্ডিয়নের মতো ভাঁজ পড়ে। মাথার চুল চক্চক্ করছে, ঘন ভুরুর নিচে তের্ছা চোখের দৃষ্টি কৌতুকে উদ্ভাসিত, ঠোঁটের ওপরে তরুণ বয়সের গোঁফের উদ্ভিন্ন কালো রেখা—আর সেই কালো রেখার নিচে ঝক্ঝকে সাদা দাঁত। পরনের কামিজ থেকে নরম আলো ফুটে বেরুচ্ছে,—আইকনের লাল আলো প্রতিফলিত হয়ে আসছে কামিজ থেকে।

কামিজের আস্তিন তুলে সে দেখায়; দেখা গেল তার অনাবৃত হাতের ওপরে অনেকগুলো লাল রেখা জালের মতো ফুটে রয়েছে। বলে, 'দেখছিস

তো কেমন ফুলে আছে। এর চেয়েও খারাপ অবস্থা ছিল, এখন অনেকগুলো প্রায় সেরে গেছে।'

তারপর বলে চলে, 'দেখলাম, রাগে তোর দাদামশাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, হয়তো মারতে মারতে মেরেই ফেলত তোকে। তখন বেতের নিচে আমি হাত পেতে দিলাম। ভেবেছিলাম, বেতটা ভেঙে যাবে। তাহলে আরেকটা বেত নিয়ে আসতে যেটুকু সময় লাগত তার মধ্যেই তোর দিদিমা বা মা তোকে ছিনিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু ভাবলে কি হবে, বেতটা ছিল মজবুত; জল খাওয়ানো হয়েছিল বেতটাকে। তবে যাই বল্ না কেন, কয়েকটা বেতের ঘা থেকে তোকে আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি কিন্তু। গুণে দেখতে পারিস কতগুলি। আমি বাবা বড্ড চালাক, হ্যাঁ!'

আলতোভাবে সে হেসে ওঠে। ভারি সুন্দর তার হাসিটুকু। নিজের ফুলো ফুলো হাতটার দিকে তাকিয়ে আবার সে বলে:

'তোর অবস্থা দেখে ভারি কষ্ট হচ্ছিল আমার। দম আটকে আসছিল। তখনই বুঝেছিলাম যে তোকে ভুগতে হবে, কিন্তু তোর দাদামশাইয়ের হুঁশ হয়নি, সপাং সপাং করে সমানে চালিয়ে গেলেন...'

কথা বলতে বলতে ঘোড়ার মতো চিঁহি-চিঁহি শব্দ করে ওঠে, মাথা দুলিয়ে সে দাদামশাইয়ের উদ্দেশ্যে কি যেন বলতে লাগল আর সেই মুহূর্তে সে আমার অত্যন্ত আপনার লোক হয়ে উঠল। শিশুর মতো সরল সে।

আমি বললাম যে আমি তাকে খুবই ভালোবাসি। আমার কথা শুনে তেমনি অনুপম সারল্যের সঙ্গে সে জবাব দেয়, 'আমিও তোকে ভালোবাসি। এই ধর্ না, এই যে ইচ্ছে করে তোর জন্যে যন্ত্রণা ভোগ করছি, তা কেন, তোকে ভালোবাসি বলেই তো! ভাবছিস, তুই না হয়ে আর কেউ হলে আমি একাজ করতাম? ফুঃ! বয়ে গেছে আমার!'

তারপর দরজার দিকে বারবার সাবধানী দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে আমাকে সে তালিম দিতে শুরু করে। বলে, 'শোন্, তোকে একটা কথা বলে রাখি। এর পরের বার আবার যখন তোকে পিটুনি দেবে তখন একটা জিনিস খেয়াল রাখবি। কক্ষণো শরীর খিঁচিয়ে শক্ত করে রাখবি না। ওতে দ্বিগুণ ব্যথা লাগে। শরীরটাকে একেবারে আল্‌গা করে ছেড়ে রাখবি, যেন জেলির মতো তুলতুলে হয়ে থাকে! আর খবরদার, দম বন্ধ করে থাকিসনে যেন। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস টানবি আর ছাড়বি। আর পুরো দমে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকবি। আমার এই কথাগুলো মনে রাখিস।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে কি আবার মারবে নাকি রে?'

ৎসিগানক শান্তভাবে জবাব দেয়, 'ভাবছিস কী তুই? আলবৎ মারবে! শুধু একবারই নয়, এবার থেকে মাঝে মাঝে তোর কপালে এটি আছে ধরে রাখ্।'

'ইস, কী জন্যে?'

'তোর দাদামশাই যেমন করে হোক বের করবে অপরাধ।'

দারুণ একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে তারপর আবার সে আমাকে তালিম দিতে শুরু করে:

'দ্যাখ্, বেতের বাড়িটা কি-ভাবে পড়ছে খেয়াল রাখবি। যদি দেখিস সোজাসুজি ঘা পড়ছে, সপাং করে ওপর থেকে নিচে, তাহলে আর নড়াচড়ার দরকার নেই, শরীরটাকে আল্তোভাবে ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকবি। আর যদি দেখিস, বেতের ঘা দিয়ে হ্যাঁচ্কা টানে শরীরের ছালচামড়া উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, তাহলে মানুষটার দিকে এগিয়ে যাবি। বুঝতে পারছিস তো, তার মানে বেত যেদিকে চলছে সেদিকে যাবি। তাহলে আর বেতের ঘাগুলো তেমন মারাত্মক হতে পারবে না।'

কালো তেরছা চোখের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ টেপে, তারপর বলে, 'মারধোরের কথা যদি বলিস তো এ-বিষয়ে পুলিসের চেয়েও আমি বেশি জানি। মার খেয়ে খেয়ে আমার চামড়া এমন রুক্ষ হয়েছে যে তা দিয়ে একজোড়া দস্তানা তৈরি করে ফেলা যায়।'

ৎসিগানকের হাসিখুশি মুখটার দিকে তাকিয়ে দিদিমার মুখে শোনা গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। রাজকুমার ইভান এবং বোকা ইভানুশ্কার গল্পগুলি।

তিন

ভালো হয়ে ওঠার পর আমি টের পেলাম, আমাদের বাড়িতে ৎসিগানকের একটু বিশেষ খাতির। আমার দাদামশাই নিজের ছেলেদের ওপরে যতো বেশি চোটপাট করেন, ৎসিগানকের ওপরে ততোটা নয়। এবং ৎসিগানকের আড়ালে যখনই ৎসিগানকের কথা ওঠে, দাদামশাই চোখ দুটো পিটপিট করে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন:

'দ্যাখ্ তো ভানিয়া*! হতভাগাটার মত অমন কাজের হাত থাকা

* ভানিয়া হচ্ছে ইভানের সংক্ষিপ্ত নাম। — সম্পাঃ

চাট্টিখানি কথা নয়। এই আমি বলছি, তোরা দেখে নিস, এই যে ছেলেটা আমাদের বাড়িতে বড়ো হয়ে উঠছে, এ মস্ত বড় হবে।'

আমার মামারাও ৎসিগানকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখে এবং কক্ষণো ঠাট্টাতামাসা করে তার পিছনে লাগে না। কারিগর গ্রিগরির সঙ্গে যা করে ৎসিগানকের সঙ্গে তা করে না। গ্রিগরিকে নিয়ে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তাদের কিছু একটা মারাত্মক ধরনের রসিকতা লেগেই আছে। হয়তো সে যে কাঁচিটা ব্যবহার করে সেটাকে তাতিয়ে রেখে দেয়; কিংবা গ্রিগরি যে চেয়ারটায় বসে তাতে পেরেক ফুটিয়ে রাখে; কিংবা হয়তো গ্রিগরি সেলাই করবার জন্যে যে কাপড়ের স্তূপ রেখেছে তাতে নানা রঙের কাপড় মিশিয়ে রাখে আর আধকানা গ্রিগরি সেই কাপড়ের টুকরোগুলোকেই সেলাই করে করে জোড়া লাগায় এবং তারপরে প্রচণ্ড বকুনি খায় দাদামশাইয়ের কাছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে গ্রিগরি রান্নাঘরের একটা বেঞ্চির ওপরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে আমার মামারা গ্রিগরির মুখখানাকে ম্যাজেণ্টা রং দিয়ে চিত্রবিচিত্র করে তোলে। রঙমাখা মুখখানা কিম্ভূতকিমাকার আর বীভৎস হয়ে ওঠে। একমুখ ভর্তি পাকা দাড়ি, মাঝখানে চশমার কালো কালো দুটো কাচ — আর দুই কাচের ফাঁক দিয়ে লম্বা লাল নাকটা জিভের মতো ঝুলে রয়েছে। এই চেহারা নিয়েই গ্রিগরি বহুক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ায়।

মামাদের মাথায় এই ধরনের নিত্য নতুন ঠাট্টাতামাসা দেখা দেয়; তার যেন শেষ নেই। কিন্তু গ্রিগরি মুখে কোনো প্রতিবাদ জানায় না, শুধু আপন মনে বিড়বিড় করে আর কোনো কাজ শুরু করবার আগেই সাবধান হয়ে নেয়; যেমন কাঁচি, ইস্ত্রি, চিমটে বা আঙুঠি হাত দিয়ে ধরবার আগে প্রচুর থুতু দিয়ে ভিজিয়ে নেয় আঙ্গুলগুলো। ক্রমে এটা তার একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। এমন কি খাবার টেবিলে বসেও কাঁটা-চামচ ধরবার আগে থুতু দিয়ে আঙ্গুল ভেজায় আর এই কাণ্ড দেখে ভারি মজা পায় ছেলেমেয়েরা। কোনো ব্যাপারে ঘা খেলে গ্রিগরির প্রকাণ্ড মুখের চামড়া কুঁচকে ওঠে। সেই কোঁচকানি পর-পর ঢেউয়ের মতো চলে যায় মুখের ওপর দিয়ে, অদ্ভুতভাবে উঠে আসে কপালে, ভুরুদুটোকে তুলে ধরে, তারপর টাকের মধ্যে দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

গ্রিগরিকে নিয়ে মামাদের এই ঠাট্টাতামাসা দাদামশাই কী চোখে দেখেন

আমি জানি না কিন্তু আমার দিদিমা শাসানির ভঙ্গীতে মামাদের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে চিৎকার করতে থাকেন:

'লজ্জা করে না তোদের — পাষণ্ড, পিশাচ!..'

কিন্তু ৎসিগানকের আড়ালে তার সম্পর্কে আমার মামারা যা-তা বলে। তখন তারা ৎসিগানককে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না। নানাভাবে খেলো করে তাকে; খুঁৎ ধরে কাজে, চোর, আল্‌সে এইসব বলে গালাগালি দেয়।

দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মামারা এ-রকম কেন করে।

সর্বদাই দিদিমা যে-রকম স্পষ্ট করে এবং সাগ্রহে কথা বলে থাকেন সে-ভাবে বলেছিলেন, 'বুঝতে পারিসনে, ওরা প্রত্যেকেই মতলব ভেঁজে রেখেছে যে নিজের নিজের কারখানা খুলবে। প্রত্যেকেই চায়, ভানিয়া তার কারখানাতেই কাজ করুক। তাই বজ্জাতগুলো করে কি, একজন আরেকজনের কাছে গিয়ে ভানিয়ার নিন্দে করে। কিন্তু দু'জনেই ভয় পায় ভানিয়া হয়তো তাদের সঙ্গে যাবার চেয়ে তোর দাদামশাইয়ের কাছেই থাকতে চাইবে। তারা মিথ্যে করে লাগায়, নানা ছল চাতুরী করে। আবার তোর দাদামশাইও তো আর ঘাস খায় না — হয়তো দেখবি, এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়, সে ভানিয়াকে নিয়ে বাড়-বাড়তি আরেকটা কারখানাই খুলে বসেছে। তা যদি হয় তো তোর মামারাই আচ্ছা প্যাঁচে পড়বে কিন্তু। বুঝলি?'

নিঃশব্দে তিনি হাসতে থাকেন।

'আর এও বলি, এসব তোদের কী কাণ্ডকারখানা বাপু! ভগবান যে ভগবান, তিনিও বোধ হয় তোদের ব্যাপার দেখে হাসছেন। ভাবছিস, তোর দাদামশাই বুঝি ওদের এসব চালাকি ধরতে পারে না? খুব পারে। তাই তো মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এমন ক্ষেপিয়ে তোলে ওদের। হয়তো বলে বসবে, "ওরে শোন্, ইভানকে একটা রিক্রুট্ সার্টিফিকেট কিনে দেব ভাবছি। তাহলে আর ওকে পল্টনে ডাকতে পারবে না। ওকে ছাড়া কাজ চলবে না, একথা তো ঠিক।" তাই না শুনে তোর মামারা তো একেবারে খাপ্পা। এতে ওদের কারও মত নেই, সার্টিফিকেট কিনতে খরচ তো আর কম নয় — পয়সাটা ওরা খুব চিনেছে।'

সেই স্টীমারে কয়েকদিন যেমন কেটেছিল, আবার আমি তেমনি দিদিমার সঙ্গেই থাকছি। আর রোজ সন্ধ্যায় ঘুমোতে যাবার আগে তিনি আমাকে রূপকথার গল্প কিংবা নিজের জীবনের গল্প বলেন। তাঁর নিজের জীবনের

গল্পও রূপকথার মতোই চমৎকার। মাঝে মাঝে তোলেন সংসারের কথা; দাদামশাইয়ের সম্পত্তি হয়তো ভাগ করে দিতে হতে পারে কিংবা দাদামশাই হয়তো নিজের জন্যে নতুন একটা বাড়ি বানাতে পারেন, এমনি সব সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কথা। নির্বিকার ভাবে কথাগুলি তিনি বলে যান, গলার স্বরে বিদ্রূপ ফুটে ওঠে। তখন কিছুতেই মনে হয় না যে দাদামশাইয়ের পরে তিনিই এ-বাড়ির সবচেয়ে জাঁদরেল লোক। এমনভাবে কথা বলেন যেন তিনি এ-বাড়ির লোকই নন।

দিদিমার কাছেই শুনি যে ৎসিগানক কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। বসন্তের শুরুতে এক বাদলা রাতে আমাদের বাড়ির ফটকের পাশে বেঞ্চিতে পাওয়া গিয়েছিল তাকে।

কী যেন ভাবতে ভাবতে রহস্যভরা সুরে তিনি বললেন, 'শুধু একটা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ফেলে গিয়েছিল ওকে। ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিল একেবারে, চিৎকারটুকু করবার মতো ক্ষমতাও প্রায় ছিল না।'

'আচ্ছা দিদিমা, লোকে বাড়ির বাচ্চাদের এভাবে ফেলে যায় কেন?'

'মায়ের কপাল আর কি, হয়তো এমনই অবস্থা যে বাচ্চাকে একটু দুধ বা অন্য কিছু খাওয়াবার ক্ষমতাটুকুও নেই। তখন আর উপায় কি বল্? এই অবস্থায় মা কি করে, আশেপাশে খুঁজে দেখে কোন্ বাড়িতে সদ্য একটি বাচ্চা মারা গেছে। সেই বাড়ির সামনেই তখন বাচ্চাকে ফেলে আসে।'

দিদিমা চুল আঁচড়াতে লাগলেন, কিছুক্ষণ আর কোনো কথা বললেন না।

তারপর ছাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে চললেন, 'কি জানিস আলিওশা, এসবের মূলে রয়েছে অভাব-অনটন। এমন লোক আছে, যারা এত গরীব যে মুখের কথায় তাদের অবস্থা বোঝানো যায় না! আর যে-মেয়ের বিয়ে হয়নি তার যদি বাচ্চা হয় তবে সেটাকে সবাই খুব একটা লজ্জার কথা মনে করে! তোর দাদামশাইয়ের ইচ্ছে ছিল ভানিয়াকে নিয়ে থানায় জমা দিয়ে আসে, কিন্তু আমার ইচ্ছেটা ছিল অন্যরকম। তোর দাদামশাইকে আমি বললাম, কী দরকার বাপু বাচ্চাটাকে থানায় দিয়ে! আমাদের তো অনেকগুলি বাচ্চা মারা গেছে, তার বদলে ভগবান দয়া করে এই একটিকে পাঠিয়েছেন, এটিকে আমরাই মানুষ করি। কম তো নয়, একটি একটি করে আঠারোটি বাচ্চাকে আমি পেটে ধরেছি। যদি সবকটি বেঁচে থাকত তবে পুরো একটি রাস্তা লাগত তাদের থাকার জন্যে। আঠারো — আঠারোটা

বাড়ি! ব্যাপার কি হয়েছিল জানিস, চোদ্দ বছর বয়স হবার আগেই আমার বিয়ে হয়ে যায় আর পনেরো না হতেই প্রথম বাচ্চা হয়। তবে আমার পেটের বাচ্চাদের ওপর ভগবানের বিশেষ একটু দয়া আছে বলতে হবে — একটি একটি করে তিনি বাচ্চাগুলোকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছেন। কষ্ট হত খুব, আবার আনন্দও পেতাম।'

বিছানার ধারটিতে বসে রইলেন তিনি। পরনে শুধু রাত পোশাক। আগাগোড়া কালো মাথার চুলে ঢাকা শরীর। মস্ত লোমশ একটি মূর্তি। তাঁকে দেখে ভল্লুকীর মতো মনে হচ্ছিল; কিছুদিন আগে একজন দাড়িওলা চাষী সের্গাচ'এর জঙ্গল থেকে ধরা একটি ভল্লুকীকে আমাদের উঠোনে নিয়ে এসেছিল, অনেকটা সেই রকম।

তুষারের মতো সাদা বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে, থর থর করে হাসতে হাসতে, আপন মনে তিনি বলে চললেন, 'বাচ্চাদের মধ্যে সেরাগুলোকেই ভগবান টেনে নিয়েছেন আর ওঁচাগুলো পড়ে আছে। ভানিয়াকে পেয়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল — তোদের মতো ছোট বাচ্চাগুলোকে দেখলে আমি আর স্থির থাকতে পারিনে রে! তখন থেকেই আমি মানুষ করতে লাগলাম ভানিয়াকে, গির্জায় নামকরণ করালাম ওর। আর এখন দেখছিস তো কত বড়ো আর কী চমৎকার হয়েছে ছেলেটি। প্রথম প্রথম আমি ওকে ডাকতাম গুবরে পোকা বলে। হুবহু অমনি একটা শব্দ করত মুখ দিয়ে, গুটি গুটি হামাগুড়ি দিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াত আর গুবরে পোকার মত গুন্ গুন্ শব্দ করত। আলিওশা, বড়ো সরল আর সাদাসিধে ছেলেটি — ওকে একটু ভালোবাসতে চেষ্টা করিস।'

ইভানকে আমি সত্যিই ভালোবাসতাম। আবার ওকে যতোই দেখতাম ততোই অবাক হতাম।

প্রত্যেক শনিবার দাদামশাইয়ের দুটি বাঁধা কাজ ছিল; প্রথম, সপ্তাহের মধ্যে যে-সব ছেলেমেয়ে কোনো না কোনো দোষ করেছে তাদের প্রহার দেওয়া; দ্বিতীয়, সন্ধ্যাবেলার প্রার্থনা-সভায় যোগ দেওয়া। আর দাদামশাই বেরিয়ে যাবার পরেই রান্নাঘরে মজার মজার কাণ্ডকারখানা শুরু হত; ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। উনুনের পিছন থেকে কয়েকটা কালো কালো আরসোলা ধরে আনত ৎসিগানক, তৈরি হত সুতোর লাগাম আর কাগজের স্লেজগাড়ি — আর তারপর সেই আরসোলা-টানা স্লেজগাড়ি ছুটত ঝক্‌ঝকে হলুদ রঙ লাগানো পরিষ্কার টেবিলের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত। ছোট

একটা কাঠি দিয়ে আরসোলাগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে উত্তেজিত স্বরে চিৎকার করে উঠত ৎসিগানক, 'এই যে, পাদ্রিমশাইকে নিয়ে আসার জন্যে গাড়ি চলেছে!'

তারপর সে আর-একটা আরসোলার পিঠে এক টুকরো কাগজ এ'টে দিত আর আরসোলাটাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেত গাড়িটার পিছনে পিছনে; সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা:

'তারা ঝোলাটা ভুলে ফেলে গিয়েছে কিনা, তাই মঠের সন্ন্যাসী চলেছে ঝোলাটা পে'ীছে দেবার জন্যে।'

তারপর আর-একটা আরসোলার ঠ্যাঙ বে'ধে ছেড়ে দিত; মাথা দিয়ে গ‍ুঁতিয়ে টাল খেতে খেতে এগিয়ে যেত আরসোলাটা। উল্লাসে হাততালি দিয়ে ভানিয়া বলে উঠত, 'এই যে পুরুত শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে সান্ধ্য উপাসনায় চলেছেন!'

কতগুলো কায়দা-দুরস্ত ই'দুর ছিল ভানিয়ার। ই'দুরের খেলা দেখাত সে। ই'দুরগুলোকে পিছনের দু-পায়ে দাঁড় করাত ও হাঁটাত, তাদের লম্বা লেজগুলো ঝুল-ঝুল করে দুলত পিছনের দিকে আর কালো মটরের মতো গোল-গোল চোখগুলো পিট্‌পিট করত অদ্ভুতভাবে। ই'দুরগুলোকে ভারি আদরযত্ন করত সে, কামিজের ভিতরে নিয়ে ঘুরে বেড়াত সর্বত্র। চিনি খাওয়াত নিজের মুখ থেকে, চুমু খেত আর বেশ জোরের সঙ্গে বলত:

'জানিস তো, ই'দুর বড্ড বুদ্ধিমান জন্তু, ভারি এদের মায়া মমতা। বাস্তুভূতের সঙ্গে এদের খুব ভাব। আর ই'দুরকে যারা খাওয়ায় আর আদর করে বাস্তুভূত তাদের কোনো অনিষ্ট করে না।'

তাস আর পয়সার ম্যাজিক দেখাতে পারত ৎসিগানক। বাচ্চাদের দলে তারই হাঁকডাক ছিল সবচেয়ে বেশি। আসলে তার সঙ্গে অন্যদের চোখে পড়বার মতো কোনো তফাৎ ছিল না। একদিন তাস খেলায় পরপর কয়েকবার তাকে 'গাধা' হতে হল। ভয়ানক চটে গেল সে, হাতের তাস ফেলে ঠোঁট ফুলিয়ে উঠে গেল খেলা থেকে। পরে সে আমার কাছে নালিশ জানাতে আসে, নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে, ভাঙা গলায় বলে:

'সব ওদের কারসাজি। একজন আরেকজনকে চোখ টিপছে আর টেবিলের তলা দিয়ে তাস চালাচালি করছে। একে তুই খেলা বলিস? অমন হাতের কারসাজি আমিও করতে পারি!'

ৎসিগানকের বয়স উনিশ বছর, আমাদের মতো চারজনকে এক করলে যা হয়, তেমনি প্রকাণ্ড শরীর।

ছুটির দিনগুলোর সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়লে ৎসিগানককে বিশেষভাবে মনে পড়ে, তাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। আমার দাদামশাই ও মিখাইল-মামা ছুটির দিনের সন্ধ্যায় দেখাসাক্ষাতের পালা সারতে যান। আর তখন একমাথা কোঁকড়া উস্কখুস্ক চুল নিয়ে ইয়াকভ-মামা এসে বসে; হাতে থাকে একটা গীটার। দিদিমা জলখাবারের বন্দোবস্ত করেন। প্রচুর খাবার আসে, কাঁচের গায়ে আশ্চর্য কৌশলে লাল ফুলের গুচ্ছের নকশা কাটা একটা সবুজ পাত্র থেকে ভদ্‌কা ঢালা হয়। ছুটির দিনের পোশাক পরে ৎসিগানক লাট্টুর মতো চর্‌কি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। শরীরটা একপাশে হেলিয়ে নিঃশব্দে এসে ঢোকে গ্রিগরি, চশমার কালো কাঁচদুটো জ্বলজ্বল করে। আসে আমাদের ধাই ইয়েভগেনিয়া; লাল মুখে বসন্তের দাগ, জালার মতো মোটা, ছোট ছোট ধূর্ত চোখ আর নীচু গলার স্বর। মাঝে মাঝে আসেন উস্পেনস্কি ক্যাথেড্রালের পুরুত, সারা শরীরে যাঁর অজস্র লোম। এ-ছাড়াও আরো কয়েকজন আসে যাদের চেহারাগুলো আমার স্পষ্ট মনে নেই; রোগা-রোগা কালো কালো একদল মানুষ, ছায়া-ছায়া আবছা কতকগুলো রেখামূর্তি।

প্রচুর পানাহার করে সবাই আর ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। বাচ্চারাও তাদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না, তাদের জন্যে আসে ছোট একগ্লাশ মিষ্টি মদ। তারপর আস্তে আস্তে জমে ওঠে একটা অদ্ভুত উৎসব-মত্ততা।

ইয়াকভ-মামা খুব দরদের সঙ্গে সুর বাঁধে গীটারে; সুর বাঁধা হয়ে গেলে বলে, 'এবার তাহলে আমি শুরু করছি।' যতোবার এই ধরনের অনুষ্ঠান হয়, ইয়াকভ-মামা বরাবর এই একই কথা বলে।

তারপর মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো ঝাঁকানি দিয়ে সরিয়ে ঝুঁকে পড়ে গীটারের ওপরে, হাঁসের মতো গলা বাড়ায়, গোলগাল নিশ্চিন্ত মুখটাতে ফুটে ওঠে স্বপ্নাচ্ছন্নতা, একটা তেল্‌তেলে পর্দায় উচ্ছল চোখদুটো ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে। খুব আল্‌তোভাবে আঙ্গুল চালায় তারের ওপর দিয়ে জেগে ওঠে সুর, আর সেই সুর শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

সেই সুর মুখের কথাকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেয়। মনে হয় যেন স্রোতস্বিনীর ধারা অনেক দূর থেকে দেওয়াল আর মেঝের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। বুকের ভিতরটা ভারী হয়ে ওঠে আর অশান্ত হয়ে ওঠে। কেমন যেন দুঃখ হয়;

দুঃখ হয় নিজের কথা এবং আর সকলের কথা ভেবে। বড়দের যেন বয়স কমে যায়, স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকে সবাই। থমথম করে স্তব্ধতা।

মিখাইলের ছেলে সাশা যেন বিশেষ উৎকর্ণ হয়ে সেই সুর শোনে। চোখের দৃষ্টি আঠার মতো লেগে থাকে গীটারের ওপরে, মুখটা হাঁ-করা, ঠোঁটের কোণ থেকে লাল গড়ায় — আর বাজনাটার দিকে সমস্ত শরীর নিয়ে ঝুঁকে পড়ে। মাঝে মাঝে এতবেশি তন্ময় হয়ে যায় যে চেয়ার থেকে পড়ে যায় মাটিতে। কিন্তু মাটিতে পড়ে যাবার পরেও নড়ে-চড়ে না, দুই পা আর দুই হাতে ভর দিয়ে তেমনি স্থির নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

সেই সুর মুগ্ধ করে সবাইকে। নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে সবাই। শুধু শোনা যায় সামোভারের একটানা ও অভ্যস্ত গুঞ্জন। ছোট ছোট দু'টি জানলা, জানলার বাইরে অন্ধকার শারদ রাত্রি। মাঝে মাঝে কেউ হয়তো এসে খুব আল্‌তোভাবে জানলার শার্সিতে টোকা দেয়। টেবিলের ওপরে দু'টি মোমবাতি জ্বলে কেঁপে ওঠে বর্শাফলকের মতো ঋজু হল্‌দে শিখা।

একটু একটু করে ইয়াকভ-মামা একটা গভীর আচ্ছন্নভাবের মধ্যে ডুবে যায়; দাঁতে দাঁত চেপে ধরে; মনে হয়, ইয়াকভ-মামা গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ছে। ঘুম নেই শুধু তার হাতের, হাতদুটোর মধ্যে অন্য এক প্রাণ আছে যেন।

ডান হাতের বাঁকানো আঙ্গুলগুলো গীটারের কালো ফাঁকের উপরে অলক্ষ্যে কাঁপছে। যেন ডানা-ঝাপ্‌টানো পাখি তার বাঁ হাতটা অদৃশ্যভাবে দ্রুত উঠা-নামা করছে তারের ঘাটে ঘাটে।

মদ খাওয়া হলে প্রায় রোজই সে একই গান গায়। তার যেন শেষ নেই; বিদকুটে গলার স্বর — চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা হিস্‌হিস শব্দের মতো।

ইয়াকভ গান গায়:

হত যদি ইয়াকভ এক কুকুর ছানা
ঘেউ ঘেউ চিৎকারে পড়শীদের ঘুম
ছুট্‌ত কোথায় নেইকো জানা —
হায় হায় হায় প্রভু দয়াময়!
এ একঘেয়েমির জীবন সওয়া দায়!
এক মঠবাসিনী রাস্তা চলে কদমে কদমে,
কাক এসে এক কা-কা ডাকে পায়ের কাছে নেমে,
এ একঘেয়েমির জীবন সওয়া দায়!

ঝিঁ ঝিঁ পোকা ঝিঁ ঝিঁ ডাকে চুল্লির আড়ালে,
ব্যাঙ ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে আঁধারে জাঙ্গালে,
এ একঘেয়েমির জীবন সওয়া দায়!
এক ভিখিরী দড়ির পরে প্যাণ্ট শুকোতে দেয়,
পথ-চলা আর এক ভিখিরী চুরি করে নেয়,
এ একঘেয়েমির জীবন সওয়া দায়!
এ নীরস জীবন সওয়া দায়, হে প্রভু দয়াময়!

এ গানটা আমি সহ্য করতে পারি না। গাইতে গাইতে মামা যখন ভিখিরীর কথায় আসে, আমি একেবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি। কিছুতেই সেই কান্না থামে না।

অন্যদের মতো ৎসিগানকও তন্ময় হয়ে গান শোনে। গান শুনতে শুনতে মাথার গোছা গোছা চুলের মধ্যে আঙুল চালায়, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে আর বেদনার্ত স্বরে মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে:

'ইস্, আমার যদি এমন গলা থাকত! কত গানই না তবে গাইতাম!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিদিমা বলেন, 'ওরে, তুই এবার একটু থাম্, ইয়াকভ! বুকের ভিতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে! ভানিয়া, তুই বরং তোর নাচটা একটু দেখা!'

দিদিমার অনুরোধ সবসময়ে যে মেনে চলা হয় তা নয়। তবে হঠাৎ এক-একসময়ে গান গাইতে গাইতে গায়কের ভাবান্তর ঘটে। তারগুলি ক্ষণকালের জন্যে চেপে ধরে অকস্মাৎ হাতটা মুঠি করে তুলে ধরে, সারা শরীরে প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করে যেন নিঃশব্দে একটা কিছু অদৃশ্য বস্তু মেঝের ওপরে ছুঁড়ে ফেলছে। আর বুনো ষাঁড়ের মতো চেঁচায়:

'অসহ্য এই বিষণ্ণতা! ভানিয়া, উঠে পড়ো!'

ভানিয়া উঠে দাঁড়িয়ে গা-হাত-পা ঝাড়ে, পরনের হলদে জামাটা সমান করে নেয়, তারপর, পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ায় ঘরের মাঝখানে। তার হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে বুঝি পিচ্ছিল কাঁচের ওপর দিয়ে আসছে।

'ইয়াকভ ভাসিলিয়েভিচ, আরেকটু জোরে।' সলজ্জ ও বিব্রত ভঙ্গিতে একটুখানি হেসে খুব নরম সুরে অনুরোধ জানায় সে।

সহসা উদ্বেল সুর-মূর্ছনায় ফেটে পড়ে গীটারটা, শুরু হয় মেঝের ওপরে পায়ের গোড়ালির ঠোকাঠুকি। তাকের ওপরে আর টেবিলের ওপরে ডিশগুলো ঠক্-ঠক্ শব্দে নড়ে ওঠে। আর ঘরের মাঝখানে ঘুরপাক খায়

ৎসিগানক। পাখির মতো ঝাপ্‌টা দিয়ে দিয়ে ওঠে শরীরটা, হাতদুটো ডানার মতো আন্দোলিত হয়, পা-দুটো এত দ্রুত নড়াচড়া করে যে চোখ দিয়ে সেই গতিভঙ্গিকে অনুসরণ করা চলে না। নাচতে নাচতে অদ্ভুত আর দুর্বোধ্য একটা শব্দ বার করে মুখ দিয়ে, পাছায় ভর দিয়ে মেঝেতে বসে, তারপর সোনালী একটা লাট্টুর মতো চর্‌কিপাক খায়। পরনের সিল্‌কের জামাটা ঢেউয়ের মতো কাঁপতে থাকে আর শিখার মতো ঝল্‌সে ওঠে — তখন মনে হয় যেন সেই ঝল্‌মলে পোশাকের আলো ছিট্‌কে এসে ঘরের চারিদিক আলোকিত করে তুলছে।

ৎসিগানক নেচেই চলে, কিছুতেই যেন ওর ক্লান্তি নেই। একেবারে আত্মহারা হয়ে যায়। মনে হয়, দরজাটা খোলা পেলে সে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়বে রাস্তায়, নাচতে নাচতে পেরিয়ে যাবে শহর, চলে যাবে দূর কোনো অজানা দেশে...

মেঝের ওপরে পা ঠুকে তাল দিতে দিতে ইয়াকভ-মামা চেঁচিয়ে ওঠে, 'সাবাস!' কানে তালা লাগানো শিস্‌ দেয় আর চেরা গলায় গান গেয়ে ওঠে:

যদি জুতো জোড়া রাস্তার মাঝে নাইকো যেতো ছিঁড়ে,
তবে আজই আমি পালিয়ে যেতাম বউকে আমার ছেড়ে!

টেবিলের চারপাশে বসে থাকা লোকগুলোর মধ্যেও এই মেজাজের ছোঁয়াচ লাগে। মাঝে মাঝে আর্তনাদের মতো এক-একটা চিৎকার বেরিয়ে আসে মুখ থেকে — যেন আগুনে ছেঁকা লেগেছে। দাড়িওয়ালা কারিগর বসে বসে টাক মাথায় আঙুলের টোকা দেয় আর কি যেন বিড়বিড় করে। মনে আছে, একদিন এমনি বসে থাকতে থাকতে গ্রিগরি ঝুঁকে পড়েছিল আমার দিকে। আমার কাঁধের ওপরে তার নরম দাড়ির ছোঁয়া লাগছিল আর বড়োরা যেমনভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলে তেমনিভাবে আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিল:

'লেক্সেই মাক্সিমীচ! তোমার বাবা এখানে থাকলে কী ভালোই না হত! অন্য রং ধরিয়ে দিতে পারত সবার মনে! ভারি আমুদে লোক ছিল হে! বাবাকে তোমার মনে আছে?'

'না।'

'সত্যি? জানো তো! তোমার বাবা আর তোমার দিদিমা... তাই তো, আচ্ছা একটু সবুর করো!'

ঋষিমূর্তির মতো লম্বা কৃশ শরীরটা নিয়ে গ্রিগরি উঠে দাঁড়াল।

দিদিমাকে প্রণাম জানিয়ে বলল অস্বাভাবিক গভীর স্বরে: 'আকুলিনা ইভানোভনা, আপনি যদি আমাদের একটু নাচ দেখান তো ভারি খুশি হই। মাক্সিম সাভাতেয়েভিচের সঙ্গে আপনি যেমন নাচতেন তেমনি আজও আপনাকে একটু নাচ দেখাতে অনুরোধ করছি।'

'তুমি কি পাগল হলে নাকি গ্রিগরি ইভানোভিচ? বলছ কি তুমি? কী লজ্জার কথা গো!' বলে হেসে উঠে দিদিমা আরো জড়োসড়ো হয়ে বসলেন — 'আমাকে নাচতে বলছ তুমি? আমি যদি এই বয়সে নাচতে শুরু করি লোকে হাসাহাসি করবে...'

কিন্তু ততোক্ষণে সবাই দিদিমাকে ধরে বসেছে, নাচতেই হবে। সকলের পীড়াপীড়ির মধ্যেই দিদিমা হঠাৎ একসময়ে তরুণী মেয়ের মতো উঠে দাঁড়ালেন। পরনের স্কার্টটা ঠিক করে নিয়ে, শিরদাঁড়া টান করে, ভারী মাথাটা পিছন দিকে ঝাঁকিয়ে নাচের ভঙ্গিতে মেঝের ওপর দিয়ে চলতে চলতে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'হাসুক, যে যতো খুশি হাসুক! কোথায় রে ইয়াকভ, সুর তোল্!'

ইয়াকভ-মামা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি। আধ-বোজা চোখে, পা ফাঁক করে বসে ধীর লয়ে সুর তুলল। একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল ৎসিগানক, তারপর লাফিয়ে উঠে এসে দিদিমার চারপাশে পাক দিতে দিতে শুরু করল লম্ফঝম্ফ। দিদিমা নিঃশব্দ সঞ্চারে মেঝের ওপরটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছেন, যেন ভেসে বেড়াচ্ছেন বাতাসে; লীলায়িত হাতের ভঙ্গি, উচ্চকিত ভুরু আর কালো চোখের দূরচারী দৃষ্টি। দিদিমাকে দেখে আমার কেন জানি হাসি পেয়ে গেল, হাসি চাপতে গিয়ে গলা দিয়ে একটা চাপা শব্দ করে ফেললাম। কিন্তু আর কেউ তাতে যোগ দিল না; গ্রিগরি তর্জনী তুলে আমাকে ধমক দিল, বয়স্করা রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

হাসতে হাসতে গ্রিগরি হাঁক দিল, 'সরে এস ইভান!' বাধ্য ছেলের মতো ৎসিগানক একপাশে সরে এসে চৌকাঠে বসে পড়ল। আর তখন চমৎকার ভরাট গলায় গান ধরল ইয়েভগেনিয়া-ধাই; গান গাইতে গাইতে তার গলার কণ্ঠমণিটা উঁচু হয়ে উঠেছে। গানটা এই:

একটি দিনের নেই অবসর কাজের বোঝা ফেলি,
নিথর বসে তরুণী চলে লেসের মালা বুনি,
বিবশ হল শুকিয়ে আসা হাতের আঙুলগুলি,
লালিমা কোথায় ফ্যাকাশে মুখখানি।

দিদিমাকে দেখে মনে হচ্ছে, এটা তাঁর নাচ নয়, ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে তিনি একটি গল্প বলে চলেছেন। এই তো অতি ধীর গতি, কী যেন একটা চিন্তা প্রকাশ পায়। শরীরটা এদিক-ওদিক দোলে। উত্তোলিত বাহুভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় চোখের দৃষ্টি। পায়ে পায়ে পথ খুঁজে দ্বিধা ভরে নড়েন। মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে যান থম্‌কে। মুখটা কাঁপে আর ভুরু কুঁচকে থমথমে হয়ে ওঠে। আবার একেক সময়ে একটা দরদী ও অন্তরঙ্গ হাসিতে ঝল্‌মলিয়ে ওঠে সমস্ত অঙ্গ। সরে দাঁড়ান একপাশে, যেন কোনো একজনের জন্যে পথ করে দিচ্ছেন। মাথা নিচু করে উৎকর্ণ হয়ে শোনেন কি যেন, একটা খুশির হাসিতে ধীরে ধীরে সারা মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তারপর এক সময়ে সহসা প্রচণ্ড উল্লাসে নেচে ওঠেন, একটা উদ্দাম ঘূর্ণিপাকে শরীরটা যেন আগের চেয়েও লম্বা ও ঋজু হয়ে ওঠে। উজ্জীবিত তারুণ্যের এই মুহূর্তটিতে তিনি এত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন যে কিছুতেই অন্য দিকে চোখ ফেরানো যায় না।

এদিকে সারাক্ষণ ইয়েভগেনিয়া-ধাই ফুঁ দেওয়ার মতো গেয়ে চলেছে:

রবিবারের উপাসনার পরে সময় থেকে
নাচল সে ভোরের আলো উঠল যখন ফুটে;
হায়গো পলক ফেলার আগেই সোমবার এল হেঁকে—
হৈচৈ আর ছুটির দিনটা কেমনে গেল কেটে।

নাচ শেষ হয়ে গেলে দিদিমা সামোভারের পাশে নিজের জায়গাটিতে এসে বসলেন। সবাই তাঁর নাচের প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু তিনি সকলের কথার প্রতিবাদ করলেন:

'থাক্, থাক্, হয়েছে! সত্যিকারের নাচ কাকে বলে তোমরা তা দেখনি।' মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো ঠিক করতে করতে তিনি বলে চললেন, 'তাহলে শোন তোমাদের একটি মেয়ের কথা বলি। আমি তখন থাকতাম বালাখ্‌নাতে, সেখানকারই মেয়ে। তার নাম কি, কোন্ বাড়ির মেয়ে সে, তা আমার মনে নেই। কিন্তু সে কেমন নাচে! হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হত। কিছুতেই চোখ ফেরানো যেত না—জল এসে যেত কারো কারো চোখে। শুধু চোখের দেখা, তাতেই মনে হত মন ভরে গেছে—এর চেয়ে বড়ো আনন্দ আর কিছুতে নেই। কী হিংসে করতাম মেয়েটাকে আমি পাপিনী!'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই খুব ভারিক্কি চালে বলল, 'নাচিয়ে আর গাইয়েরাই তো পৃথিবীর সেরা মানুষ।' তারপর রাজা ডেভিড সম্পর্কে একটা গান গাইতে শুরু করে দিল। ওদিকে ইয়াকভ-মামা ৎসিগানকের গলা জড়িয়ে ধরে বলছে, 'তোমার উচিত নাচ করা সরাইখানায়। তাহলে দেখবে, তোমার নাচ দেখবার জন্যে সবাই ভিড় করে আসবে।'

ৎসিগানক নালিশ জানায়, 'আমি গান গাইতে চাই। ভগবান যদি আমাকে গান গাইবার গলা দিতেন তাহলে সারা দিন সারা রাত শুধু গানই গাইতাম। দশটি বছর শুধু গানই গাইতাম আমি। গাইয়ে হবার জন্যে যদি আমাকে মঠের বাবাজী হয়েও থাকতে হয় তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

সবাই ভদ্‌কা খাচ্ছে, বিশেষ করে গ্রিগরি। দিদিমা গ্রিগরিকে গ্লাসের পর গ্লাস মদ ঢেলে দিচ্ছেন আর বার বার সাবধান করছেন, 'দেখো বাবা, বেশি খেও না যেন, একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে।'

গ্রিগরি গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, 'হলে হব—তাতে আর কি। দুনিয়াটাকে যথেষ্ট দেখে নিয়েছি, আর দেখার দরকার নেই।'

মদ খেয়ে গ্রিগরির নেশা হয় না। তবে আরো বেশি কথা বলতে শুরু করে। ভদ্‌কা টানছে আর অনবরত আমার সঙ্গে কথা বলে চলেছে—বলছে আমার বাবার কথা।

'বড়ো দরাজ দিল ছিল হে! আর আমার ছিল প্রাণের বন্ধু মাক্সিম সাভাতেয়েভিচ!'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দিদিমাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, 'আহা অনাথ বাছা রে!'

এসব কথা আমি সাগ্রহে শুনি আর উত্তেজনায় দম বন্ধ করে টান হয়ে বসে থাকি। একটা শান্ত বিষণ্ণতায় আবহাওয়া নিরন্ধ্র ও ভারী হয়ে ওঠে। বিষণ্ণতা ও আনন্দ একই সঙ্গে বাসা বাঁধে মানুষের মনে; একটি থেকে অপরটিকে কিছুতেই আলাদা করা যায় না। আর কখন যে একটির জায়গায় অপরটি এসে জুড়ে বসে তার হদিশ পাওয়া যায় না।

একদিন ইয়াকভ-মামার মদের নেশাটা তখনো ভালো করে চাপেনি, হঠাৎ সে গায়ের জামাটা ফালা ফালা করে ছিঁড়তে শুরু করে, মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আর সাদাটে গোঁফ ধরে টান দেয়, নাকে আর ঝুলে-পড়া ঠোঁটে খাম্‌চি কাটে—আর জলভরা চোখে কঁকিয়ে ওঠে:

'কেন? কেন এমন হয়?'

নিজের গালে, কপালে, বুকে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে:

'আমি একটা হতভাগা, কাপুরুষ, আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না... নরকেও স্থান হবে না আমার!'

'আহ-হা, ঠিক কথা, ঠিক তাই!' ভারী গলায় সায় দেয় গ্রিগরি।

আমার দিদিমা বলেন, 'ইয়াকভ, এবার একটু থাম্ বাছা তুই! ভগবান জানেন আমাদের কী শেখাতে হবে।' বলতে বলতে ছেলের হাতটা চেপে ধরেন; মদের নেশায় তাঁর অবস্থাও ঠিক স্বাভাবিক নেই।

মদ খেতে পেলে দিদিমার রূপ আরও খুলে যায়। হাসি-হাসি কালো চোখদুটো থেকে উষ্ণ আলোর ধারা ঝরে পড়ে সবার ওপরে, রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে দুই গালে, রুমাল নেড়ে নেড়ে হাওয়া খান আর জড়ানো গলায় সুর করে করে বলতে থাকেন:

'প্রভু, মঙ্গলময়, তোমার জগতে সবই কেমন চমৎকার! সবই কী ভালো!'

প্রাণের অন্তস্তল থেকে কথাটা বেরিয়ে আসে। আর এই হচ্ছে তাঁর সমস্ত জীবনের মূলমন্ত্র।

আমার বেপরোয়া প্রকৃতির মামাটিকে কাঁদতে ও হা-হুতাশ করতে দেখে সত্যিই অবাক হই। একদিন দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়াকভ-মামা এভাবে কাঁদে কেন আর কেনই বা এভাবে কপাল চাপড়ায়।

আমার প্রশ্ন শুনে যে সুরে দিদিমা জবাব দিলেন সেটা ঠিক তাঁর স্বাভাবিক সুর নয়; যেন তিনি একটু বিরক্ত হয়েছেন এমনি অনিচ্ছুক ভাবে বললেন, 'সব কথাই তোর জানা চাই দেখছি! কোনো সবুর সয় না— এসব ব্যাপারে নাক গলাবার ঢের সময় পড়ে আছে!'

একথা শুনে আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। কারখানায় গিয়ে ইভানকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। কিন্তু সেও জবাব দিতে চায় না, কারিগরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে শুধু নিঃশব্দে হাসে, আর আমাকে ঠেলে কারখানা থেকে বার করে দেয়।

বলে, 'বাস্, আর একটি কথাও নয়! এক্ষুণি যদি বেরিয়ে না যাও তো ধরে রঙের গামলায় চুবিয়ে দেব। তখন দেখবে, সারা গায়ে কেমন রঙদার সবুজ ফুটে বেরোয়।'

কারিগর একটা নিচু থ্যাবড়া উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে গামলা তৈরি করা হয়েছে উনুনটার ওপরে। মস্ত একটা কালো লাঠি দিয়ে

সে একটি গামলার ভিতরটা নাড়াচাড়া করছিল। মাঝে মাঝে সেই লাঠি তুলে ধরে আর তাকিয়ে থাকে তার থেকে ঝরে পড়া রঙিন জলের দিকে। উনুনে গন্‌গনে আঁচ — আর তার আভা এসে পড়েছে কারিগরের চামড়ার এপ্রনে; পাদ্রীদের আলখাল্লার মতো চিত্রবিচিত্র সেই এপ্রন। গামলাগুলিতে রঙগোলা জল চিড়বিড় শব্দে বুদ্‌বুদ তুলে ফুটছে আর একটা ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। সেই গন্ধ দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বাইরের শীতার্ত উঠোনে।

লাল-লাল টস্‌টসে দুটি চোখ তুলে চশমার ফাঁক দিয়ে কারিগর তাকাল আমার দিকে, তারপর ইভানের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'চোখ নেই নাকি? দেখছ না উনুনে কাঠ দিতে হবে?'

কাঠ আনবার জন্যে ৎসিগানক ছুটে বেরিয়ে গেল। আর তখন লাল চন্দন-রঙের একটা বস্তার উপরে বসে গ্রিগরি ডাকল আমাকে।

'এদিকে শুনে যাও তো হে।' বলল সে।

আমাকে কোলের ওপরে বসাল; তার সিল্‌কের মতো ফুরফুরে আর নরম দাড়ির ছোঁয়া লাগছে আমার গালে। তারপর আমি তার মুখে যে-কথাগুলো শুনলাম তা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

'তোমার মামা পিটোতে পিটোতে তার বৌকে মেরে ফেলেছে। আর এখন তার বিবেক কোনো শান্তি পায় না। সব কথাই তোমার জেনে রাখা ভালো, বুঝেছ? আর হ্যাঁ, একটু চোখ খোলা রেখে চলাফেরা কোরো বাপু, নইলে কপালে দুঃখ আছে।'

দিদিমার মতো গ্রিগরির সঙ্গেও সহজেই কথা বলা যায় কিন্তু তার কথাগুলো শুনে গা শির-শির করে ওঠে। কালো চশমার ফাঁক দিয়ে যখন তাকায় সে, তখন মনে হয় যেন শরীরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

তেমনি শান্ত নির্বিকার গলায় সে বলে চলল, 'কেমন করে পিটোতে পিটোতে বৌটাকে মেরেই ফেলল? ব্যাপারটা হত এই রকম — বৌয়ের সঙ্গে শুতে গিয়ে করত কি, বৌকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে জড়াতো — তারপর কিল, চড়, ঘুষি, লাথি। এমনি চলত রাতের পর রাত। শেষ পর্যন্ত মরেই গেল বৌটা। জিজ্ঞেস করো, এত মারপিট কেন বাপু? তা সে নিজেই বলতে পারত না।'

এক বোঝা কাঠ নিয়ে ঢুকল ইভান, তারপর আগুনের সামনে বসে

হাত গরম করতে লাগল। কিন্তু গ্রিগরি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আগের কথার জের টেনেই বলে যেতে লাগল:

'কেন মারপিট করত জান? হয়ত মনে মনে বুঝত যে বৌয়ের সঙ্গে ও টেক্কা দিতে পারবে না, তাই বৌয়ের ওপর ওর ছিল হিংসে। একটা কথা কি জান দাদু, কাশিরিন্‌রা কোনো ভালো কিছু সহ্য করতে পারে না। ভালো কিছু দেখলেই ওদের হিংসে। কিন্তু সেই ভালোটুকু দেখে যে নিজেরা শিখতে পারবে তা নয়, তাই সেই ভালোটুকুর যাতে কোনো চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে সেই ব্যবস্থা করবে। তোমার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমার বাবার এ-বাড়িতে থাকতে কী হাল হয়েছিল। দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলে সবই জানতে পারবে। দিদিমা তোমার কাছে কিছু ঢাকবেন না। তোমার দিদিমা হচ্ছেন সত্যিকার খাঁটি মানুষ, ছলচাতুরী তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না, ছলচাতুরী বুঝতেও চান না। ঋষিতুল্য মানুষ তিনি। অবশ্য মাঝে মাঝে মদ খান বটে, নস্যি নিতেও ভালোবাসেন — তা হোক্। তুমি দাদু কক্ষণো তোমার দিদিমার কাছছাড়াটি হয়ো না যেন...'

গ্রিগরি আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। বিমূঢ় ও আতঙ্কিত হয়ে আমি উঠোনে চলে এলাম। অলিন্দে যাবার আগেই ভানিয়া এসে আমার নাগাল ধরল এবং আমার মাথার ওপর হাত রেখে কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'ওকে তুমি ভয় কোরো না যেন — ভারি ভালো লোকটি। সোজাসুজি চোখ তুলে ওর চোখের দিকে তাকাবে — এইটুকুই ও চায়, এমনি ধরনের লোককেই ও পছন্দ করে।'

সমস্ত কিছু বড়ো অদ্ভুতভাবে উল্‌টেপাল্‌টে যাচ্ছে। অন্য কোনো ধরনের জীবনের সঙ্গে আমার এতদিন পরিচয় ছিল না। তবুও অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ে, আমার বাবা ও মা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবন কাটিয়েছেন। তাঁদের কথাবার্তা ও আমোদপ্রমোদের ধরন ছিল অন্য রকম। দুজনে পাশাপাশি বসেছেন, পাশাপাশি চলেছেন — তার মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল না। সন্ধ্যার সময়ে জানলার ধারে বসে দুজনে প্রাণখুলে হাসতেন আর মনের আনন্দে গান গাইতেন। সেই গান আর হাসি শুনে জানলার নিচে লোক জড়ো হয়ে যেত। আমার মনে আছে, জানলার নিচে দাঁড়িয়ে যারা মাথা উঁচু করে তাকিয়ে থাকত তাদের দেখে কেন জানি অদ্ভুত একটা ধারণা আসত আমার মনে। মনে হত যেন খাওয়াদাওয়ার পরে কার এঁটো বাসনপত্র। আর এখানে ঠিক উল্‌টো ব্যাপার। এখানে মানুষ কদাচিৎ হাসে; আর যদিও বা হাসে, তা

অতি রহস্যময়, তার অর্থ বোঝা সর্বদা যায় না। সারাক্ষণ গালিগালাজ, হুমকি, শাসানি, ফিসফাস। বাচ্চারা চুপচাপ থাকে, তাদের দিকে কারও নজর নেই। আর বৃষ্টির সময়ে ধুলোর মতো তাদেরও মারতে মারতে মিশিয়ে ফেলা হয় মাটির সঙ্গে। এই বাড়ির সঙ্গে আমি কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না। চারদিককার এই জীবন হাজারটা সুচের মতো অনবরত আমাকে বিঁধছে। আমি সবকিছুকে সন্দেহের চোখে দেখছি আর চোখ-কান খাড়া করে সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি সবকিছু।

ইভানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেড়ে চলল। সূর্যোদয় থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত আমার দিদিমা সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং সারাটি দিন আমার কাটে ৎসিগানকের পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করে। যখনই আমার দাদামশাই আমাকে উত্তম-মধ্যম দিতে শুরু করেন তখনই রীতিমত ৎসিগানক নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে চলে এবং পরদিন নিজের ফুলে-ওঠা আঙ্গুলগুলো আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে নালিশ জানায়, 'দূর দূর! তোমাকে আর কোনোদিন আমি বাঁচাতে চেষ্টা করব না। দেখ তো, আমার কী অবস্থা হয়েছে! এই কিন্তু শেষবার বলে রাখলাম। পরের বার থেকে যা কপালে আছে তোমাকেই ভুগতে হবে!'

কিন্তু দেখা যায়, পরের বারেও আমার প্রাপ্য শাস্তি সে অনর্থক হাত পেতে নিচ্ছে।

'কী, বলেছিলে না যে তুমি আর এর মধ্যে নেই?'

'কথা আর কাজ তো এক জিনিস নয় — কখন যে আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি নিজেই টের পাইনি!'

কিছুদিনের মধ্যেই ৎসিগানক সম্পর্কে আরও কিছু খবর আমি জানতে পারলাম। শুনে ওর প্রতি আমার আগ্রহ ও আনুগত্য আরও বেড়ে গেল।

প্রতি শুক্রবার ৎসিগানক বাজারে যায় সপ্তাহের খাবার কিনে আনবার জন্যে। কটা-লালরঙের ঘোড়া শারাপকে জুড়ে দেওয়া হয় চওড়া স্লেজগাড়িটার সঙ্গে (শারাপটা অত্যন্ত ধূর্ত ও বেয়াড়া জাতের ঘোড়া, মিষ্টি খুবই পছন্দ করে — আমার দিদিমার ভারি আদরের)। মস্ত একটা টুপি মাথায় দেয় ৎসিগানক, খাটো ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরে, কোমরে শক্ত করে আঁটে সবুজ রঙের উড়ুনী। কোনো কোনো বার বাজারে গিয়ে অনেক দেরি হয় ফিরতে। আর তখন ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করে সবাই, বারবার জানলার

কাছে যায়, তুষারঢাকা জানলার শার্সিতে ভাপ দিয়ে একটু সাফ করে নেয় আর তাকিয়ে দেখে রাস্তার দিকে।

'কী, আসছে?'

'দেখতে পাচ্ছি না তো।'

দুশ্চিন্তাটা আমার দিদিমারই সবচেয়ে বেশি। স্বামী আর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'পোড়া কপাল আমার! তোমাদের জন্যেই এই ভালো মানুষটা আর ভালো ঘোড়াটা মরবে! নির্লজ্জ বেহায়ার দল! তোমাদের কি বিবেক বলেও কিছু নেই? কেন রে বাপু, নিজেদের যা আছে তা নিয়েই খুশি থাকলেই হয়! বোকা গুষ্টি! হ্যাংলার দল! দেখ না, এজন্যে ভগবানের কী শাস্তি তোমাদের পেতে হয়!'

দাদামশাই চোখ কুঁচকিয়ে বিড়বিড় করে বলেন:

'আচ্ছা, আচ্ছা, আর পাঠাব না... এই শেষবার...'

কোনো কোনো বার দুপুর গড়িয়ে যাবার পরে ৎসিগানক ফিরে আসে। উঠোনে গাড়ি ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন আমার দাদামশাই ও মামারা। পিছনে পিছনে আসেন দিদিমা। ফোঁস ফোঁস করে নস্যি টানেন আর ভল্লুকের মতো এগিয়ে আসেন। যে জন্যেই হোক্, এই সময়টিতে তাঁর মধ্যে কেমন যেন একটু এলোমেলো ভাব দেখা যায়। বাচ্চারা ছুট্তে ছুট্তে বেরিয়ে আসে আর তারপরে শুরু হয় মহা উল্লাসে স্লেজগাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামান। জিনিসপত্রে ঠাসা গাড়িটা; আস্ত আস্ত শুয়োরছানা, মাছ আর ছোটবড়ো নানা আকারের মাংসের টুকরো।

ছোট কুতকুতে চোখ দিয়ে স্লেজগাড়িটাকে ভালো করে দেখে নিয়ে দাদামশাই জিজ্ঞেস করেন, 'কী হে, যা যা আনতে বলেছিলাম এনেছ তো সব?'

আনন্দে উঠোনের চারদিকে লাফাতে লাফাতে ইভান জবাব দেয়, 'সব এনেছি, একটি জিনিসও বাদ পড়েনি।' হাতদুটোকে গরম করবার জন্যে দস্তানা না খুলেই হাতে হাত ঘষে সশব্দে।

দাদামশাই কড়া স্বরে ধমক দিয়ে ওঠেন, 'দস্তানা শুদ্ধ হাত ওভাবে ঘষাঘষি কোরো না -- দস্তানা কিনতে পয়সা লাগে। খুচরা কিছু ফেরৎ এনেছ?'

'না।'

আমার দাদামশাই স্লেজগাড়িটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখেন আর বিড়বিড় করে বলেন:

'কী হে, মনে হচ্ছে একেবারে বাজার উজাড় করে জিনিসপত্র এনেছ?

তাই তো, এত কেনাকাটার সবই কি আর বিনে পয়সায় হয়েছে? তোমায় বলে রাখছি বাপ্‌, আর যেন এমনটি না হয়।'

মুখটাকে বিকৃত করে তিনি তাড়াতাড়ি চলে যান।

তারপর মামারা স্লেজগাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়ায়। আহ্লাদে আটখানা হয়ে মুরগী, মাছ, মেটে, বাছুরের ঠ্যাঙ আর বড়ো বড়ো মাংসের টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর কোনটার কত ওজন হতে পারে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলে।

'বাঃ, চমৎকার বাছাই করেছ কিন্তু — বেশ, বেশ!' তারিফ করার ভঙ্গিতে চিৎকার করে আর শিস দেয়।

বিশেষ করে আমার মামা মিখাইল একেবারে গদ্‌গদ হয়ে ওঠে। স্লেজগাড়িটার চারপাশে এমন লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে যেন তার পায়ে স্প্রিং লাগানো আছে। কাঠঠোক্‌রার মতো নাক উঁচু করে শুঁকে শুঁকে দেখে, ঠোঁট চাটে, আবেশে মুদে আসে তার চঞ্চল চোখদুটো। লোকটির শুকনো চেহারা তার বাপের মতো, তবে লম্বায় বেশি আর পোড়া কাঠের মতো কালো।

'বুড়ো কত দিয়েছিল বাজার করতে?'

'পাঁচ রুবল।'

'আর এখানে যা জিনিস আছে তার দাম অন্তত পনেরো রুবল। কত খরচ হয়েছে তোমার?'

'চার রুবল দশ কোপেক।'

'তার মানে নব্বই কোপেক্‌ ফেরৎ নিয়ে এসেছ — নয় কি? শুনছ তো ইয়াকভ? এও একটা পয়সা আয়ের রাস্তা।'

ইয়াকভ-মামা আল্‌তোভাবে হাসে। শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকে আর শীতল ঝাপ্‌সা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্‌পিট করে।

'তবে আর কী ভানিয়া, আমাদের এক গেলাশ করে খাইয়ে দাও হে!' টেনে টেনে বলে সে।

দিদিমা ঘোড়ার লাগাম খুলে দিয়েছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন: 'লক্ষ্মী সোনা আমার, বাছা আমার! ওহো, বুঝেছি, একটু খেলা করতে ইচ্ছে হচ্ছে? তাতে আর কী হয়েছে — যাও, যাও, একটু খেলা করে এসো... একটু-আধটু খেলা করলে কোনো দোষ নেই, ওতে ভগবান রাগ করেন না...'

তখন সেই প্রকাণ্ড শারাপ ঘোড়া তার কেশর দুলিয়ে সাদা সাদা দাঁত বার করে দিদিমার ঘাড়ের ওপর আঁচড় দিতে থাকে। টেনে খুলে ফেলে দিদিমার মাথার সিল্‌কের রুমাল। খুশিভরা চোখে তাকিয়ে থাকে দিদিমার চোখের দিকে। আর মৃদু হ্রেষা তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের পাতা থেকে তুষারের কণাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে।

'এক টুকরো রুটি খেতে চাও বুঝি যাদুমণি?' দিদিমা জিজ্ঞেস করেন আর তারপর চমৎকার ভাবে নুন মাখিয়ে মস্ত একটা রুটির টুকরো গুঁজে দেন ঘোড়ার দাঁতের ফাঁকে। ঘোড়াটা রুটি চিবোয় আর ওর মুখের তলায় এপ্রনটা মেলে ধরে তিনি তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন।

বাচ্চা ঘোড়ার মতোই তড়বড়িয়ে লাফাতে লাফাতে এসে ৎসিগানক বলে, 'ঠাক্‌মা, কী সুন্দর ঘোড়াটা — না? আর কী বুদ্ধিমান!'

'যা, যা, সরে যা এখান থেকে, খবরদার, এখানে ঘুরঘুর করবি না!' মাটিতে সজোরে পা ফেলে দিদিমা চিৎকার করে ওঠেন, 'তোকে বলেছি না যে হাটের দিনগুলোতে তোকে পছন্দ করি না!'

পরে দিদিমা আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন। ৎসিগানক বাজারে গিয়ে যতোটা না কেনাকাটি করে তার চেয়ে বেশি করে চুরি।

রুষ্ট স্বরে তিনি বললেন, 'এই ধর্‌, তোর দাদামশাই যদি ওকে পাঁচ রুবলের নোট দেয় তাহলে ও করে কি, তিন রুবল খরচ করে আর দশ রুবল দামের জিনিস চুরি করে আনে। হতচ্ছাড়াটার যেন চুরি করতে ভালো লাগে। প্রথমবার হয়তো এমনি করেছিল — হাতসাফাইটা ঠিকমতো লেগে যায়... ফিরে আসার পরে সবার কী নাচানাচি আর সে কী গুণকীর্তন... তারপর থেকে এটা ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর তোর দাদামশাইয়ের ব্যাপারটা কি জানিস, সারা জীবনটা এমন অভাব-অনটনের মধ্যে কাটিয়েছে যে এখন এই বুড়ো বয়সে হাত দিয়ে কিছুতেই পয়সা গলতে চায় না। ছেলেমেয়েদের চেয়েও পয়সার ওপরে টান বেশি। কাজেই, পয়সা খরচ করতে হয় না অথচ জিনিস আসে এতে তোর দাদামশাই ভারি খুশি। আর মিখাইল ও ইয়াকভের কথা যদি বলিস...'

হাত নেড়ে দুজনকেই তিনি বাতিল করে দেন, তারপর নস্যির কৌটোর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলে চলেন:

'আলিওশা, এ যেন এক অন্ধ বুড়ীর হাতে বোনা একটা ফিতে — আগাগোড়া জট্ পাকিয়ে গেছে, আসল নক্‌শাটা কিছুতেই চেনা যায় না।

তবু জানো, একবার যদি ভানিয়া চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে মারতে মারতে ওকে খুন করে ফেলবে...'

আবার কিছুক্ষণের জন্যে দিদিমা চুপ করে থাকেন, তারপর আবার যখন তিনি কথা বলেন তখন তাঁর গলার স্বর অত্যন্ত নরম ও মৃদু শোনায়:

'ভাব দির্কিন আলিওশা, নীতিকথা তো অনেক কিছু আছে কিন্তু নীতিবোধের বেলা সব ফাঁকা...'

পরের দিন আমি ৎসিগানকের হাতেপায়ে ধরে তাকে চুরি করতে বারণ করলাম। 'যদি ধরা পড়ো তো মারতে মারতে তোমাকে খুন করে ফেলবে...'

'ইস্, আমাকে ধরতে পারলে তো — আমি ঠিক পালিয়ে যাব... আমি তো চালাক আর আমার ঘোড়াও যথেষ্ট জোরে ছুট্তে পারে।' বলে ও হেসে উঠল; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসিটাকে গ্রাস করল একটা গম্ভীর বিমর্ষ ভাব, বলল, 'তুমি কি ভাবছ আমি জানি না, আমি জানি, চুরি করাটা অন্যায়, বিপজ্জনক। তবু আমি চুরি করি শুধু এতেই আমি খুশি। ভাবছ, চুরি করে যা দু-একটা পয়সা আমার হাতে আসে তা আমি জমাই — কক্ষণো না। এই যে তোমার মামারা আছে, তারাই সপ্তাহখানেকের মধ্যে সব পয়সা উড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমার তাতে বয়েই গেছে — ওরা যতো পারে নিক। খাবার ভাবনা আমার নেই।'

হঠাৎ সে আমাকে দু-হাতে তুলে নিয়ে অল্প একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল:

'তোমার শরীরটা রোগা আর হাল্কা বটে কিন্তু হাড়গুলো শক্ত আছে। দেখবে, বড়ো হলে তাগ্ড়া জোয়ান চেহারা হবে তোমার। আমি একটা কথা বলছি শোন, গীটার বাজাতে শেখো — ইয়াকভ-মামাকে বলো তোমাকে শেখাতে — ঠাট্টা নয়! অবশ্য আরেকটু বড়োসড়ো না হলে সুবিধে হয় না, তুমি একেবারেই বাচ্চা! কিন্তু বাচ্চা হলেও সত্যিকার মেজাজ তোমার আছে! আচ্ছা, তোমার ঐ দাদামশাই লোকটিকে তুমি পছন্দ করো না? কী বলো?'

'জানি না।'

'এক ঠাক্মা ছাড়া এই কাশিরিনদের মধ্যে একটা লোকও ভালো নেই। লোকগুলোকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না — শয়তানের ঝাড় সবকটা!'

'আর আমি?'

'তুমি তো আর কাশিরিন নও। তুমি হচ্ছ পেশ্‌কভ। পেশ্‌কভরা হচ্ছে একেবারে আলাদা একটা পরিবার, আলাদা একটা বংশ।'

হঠাৎ সে আমাকে দু-হাতে চেপে ধরে প্রায় কান্নার মতো ফুঁপিয়ে উঠল:

'হা ঈশ্বর, আমার যদি গান গাইবার ক্ষমতা থাকত! তাহলে গান গেয়ে লোকের মন গলিয়ে দিতে পারতাম! আচ্ছা ভাই, চলি। এবার কাজ শুরু করতে হবে।'

আমাকে সে মেঝের ওপরে নামিয়ে দিল। তারপর একমুঠো ছোট পেরেক মুখে পুরে লেগে গেল কাজে। মস্ত একটা চৌকো তক্তার ওপরে ভিজে কালো একটা কাপড়ের টুকরো পেরেক ঠুকে ঠুকে লাগিয়ে চলল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ৎসিগানক মারা যায়।

ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে: গেটের কাছে উঠোনের বেড়ার গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে মস্ত এক ওক্‌কাঠের ক্রুশ রাখা ছিল। ক্রুশের তলার দিকটা থামের মতো ভারী ও মোটা। অনেক দিন ধরে পড়ে ছিল ওটা। আমার মনে আছে, আমি যখন প্রথম এ-বাড়িতে আসি তখন থেকেই এই ক্রুশটা দেখছি। তখন অবশ্য নতুন অবস্থায় ছিল, গায়ের হল্‌দে রঙ চটে যায়নি — আর এখন সারা শরৎকালের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে রঙটা কাল্‌চে হয়ে গেছে আর রোদজলে পোক্ত করা ওক্‌কাঠের ঝাঁঝালো একটা গন্ধ ছাড়ছে আমাদের ময়লা, নানা হাবিজাবি জিনিসে ঠাসা উঠোনটায় — তর মধ্যে ক্রুশটা ভারি অসুবিধের সৃষ্টি করত।

ক্রুশটা কিনে এনেছিল ইয়াকভ-মামা, বৌয়ের কবরের ওপরে বসাবার জন্যে। প্রতিজ্ঞা করেছিল বৌয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে নিজেই এই ক্রুশটা সমাধিস্থানে বয়ে নিয়ে যাবে।

শীতকালের শুরুতে এক শনিবারে পড়ল এই মৃত্যুবার্ষিকী। দিনটা ঠাণ্ডা, ঝোড়ো বাতাস বইছে, বাড়ির ছাদের ওপর থেকে বরফের টুকরো উড়ে উড়ে আসছে বাতাসে। মৃতের জন্য উপাসনায় যোগ দিতে আমার দিদিমা ও দাদামশাই তিনজন নাতিনাতনীকে নিয়ে গাড়িতে চেপে আগেই চলে গেলেন সমাধিস্থানের দিকে। অন্যেরা এসে দাঁড়াল উঠোনে। আমি যেন কী একটা দোষ করেছিলাম। তার শাস্তি হিসেবে আমাকে বাড়িতে আটক থাকতে হল।

আমার মামারা সবাই একই ধরনের কালো কোট পরেছে। দুজনে মিলে ধরাধরি করে ক্রুশটার একটা হাতল চাপিয়ে দিল ইয়াকভের ঘাড়ে, অন্য

হাতলটা মিখাইলের ঘাড়ে। গ্রিগরি এবং আর একজন অপরিচিত লোক অতি কষ্টে ক্রুশের থামের মতো তলাটা তুলে চাপিয়ে দিল ৎসিগানকের চওড়া কাঁধের ওপরে। ভারী জিনিসটা কাঁধে নিয়ে ৎসিগানক একবার টলে উঠল, তারপর দুটো পা ফাঁক করে কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে।

'কী হে, পারবে তো?' জিজ্ঞেস করল গ্রিগরি।

'কী জানি, বুঝতে পারছি না। ভয়ানক ভারী।'

মিখাইল-মামা ক্রুদ্ধস্বরে চে'চিয়ে উঠল, 'ফটক খোল্ না চোখ-কানা হতভাগা!'

ইয়াকভ-মামা বলল, 'কী লজ্জার কথা ভানিয়া তুমি বলছ — ভারী! অথচ আমরা তো দুজনেই তোমার তুলনায় রোগাপট্‌কা — আমরা তো নিয়ে চলেছি।'

কিন্তু গ্রিগরি ফটক খুলে দিয়ে ইভানের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় ধমক দিল: 'খবরদার বলছি! বেশি গায়ের জোর ফলাতে যেও না। ভগবান তোমাদের সহায় হোন!'

'ওরে টেকো বুড়ো শয়তান!' রাস্তা থেকে চে'চিয়ে উঠল মিখাইল-মামা।

উঠোনে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা সবাই হেসে উঠল আর জোরে জোরে কথা বলতে লাগল। ক্রুশটা যে এতদিনে নড়ানো গেছে এতে যেন সবাই খুশি।

আমার হাত ধরে আমাকে কারখানার ভিতরে নিয়ে এল গ্রিগরি। বলল, 'তোমার দাদামশাই হয়তো আজ আর তোমাকে মারবে না — মনে হচ্ছে আজকে তার মেজাজটা খুবই ভালো আছে।'

এক রাশি পশম জড়ো করা ছিল, তার ওপরে আমাকে বসিয়ে দিয়ে সযত্নে আমার সারা গায়ে পশম জড়িয়ে সে কথা বলতে লাগল। গামলা থেকে ফুটন্ত রঙের ধোঁয়া উঠছে আর সেই ধোঁয়া শুঁকতে শুঁকতে চিন্তাভারগ্রস্ত সুরে পুরনো দিনের কথা বলছে সে:

'জান দাদু, তোমার দাদামশাইকে আমি সাঁইত্রিশ বছর ধরে চিনি। এই ব্যবসা যখন শুরু হয় তখনো আমি ছিলাম আর এখন এই ব্যবসার শেষ অবস্থা — এখনো আমি আছি। সেকালে আমরা দুজনে ছিলাম সত্যিকার বন্ধু — একসঙ্গে ব্যবসা করতাম, একসঙ্গে ব্যবসার কথা ভাবতাম। ভারি চালাক-চতুর লোক তোমার এই দাদামশাই। দেখছ তো, সে এখানকার কর্তা

হয়ে বসেছে — আমার সাধ্য কি তার সঙ্গে টেক্কা দিই। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে কে টেক্কা দেবে বলো? ভগবানের কাছে মানুষ তো শিশু — তিনি যদি শুধু একটু হাসেন, তাহলেও সেই হাসির সামনে পৃথিবীর সেরা বুদ্ধিমান লোক বোকার মতো দাঁড়িয়ে চোখ পিট্‌পিট করবে। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার তোমার কিচ্ছু জানা নেই — কিন্তু আমার মনে হয়, সব কথা তোমার জেনে রাখাই ভালো। বাপ-মরা ছেলেকে জীবনে অনেক ঝক্কি পোয়াতে হয় কিনা। তোমার বাবা মাক্সিম সাভাতেয়েভিচ ছিল সত্যিকার খাঁটি মানুষ; সবকিছু সে বুঝত। আর এইজন্যেই তোমার দাদামশাই তাকে পছন্দ করত না, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি...'

দরদী কথাগুলো শুনতে আমার ভারি ভালো লাগছিল — এইভাবে চুপ করে বসে থাকা আর এই ধরনের কথা শোনা, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা — উনুনের ওপরে লাল্‌চে সোনালী আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে, গামলাগুলো থেকে দুধালো সাদা মেঘের মতো উঠছে বাষ্প আর ঢালু ছাদের তক্তার গায়ে আটকে গিয়ে জমে জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। তক্তার ফাঁকগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফিতের মতো টুকরো টুকরো নীল আকাশ। বাতাস শান্ত হয়েছে, ঝক্‌ঝক করছে সূর্যের আলো, উঠোনের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন ঘষা কাঁচের টুক্‌রো ছড়ানো রয়েছে চারদিকে। রাস্তা থেকে শোনা যায় বরফকে ভেঙে গুঁড়িয়ে স্লেজগাড়ি টেনে নিয়ে যাবার শব্দ। চারদিকের বাড়ির চিম্‌নি থেকে নীল ধোঁয়া উঠছে পাক খেয়ে খেয়ে। বরফের ওপরে হাল্‌কা ছায়া পড়ে, দ্রুত সরে তারা — তারাও যেন বলছে তাদের গল্প।

ঢ্যাঙা রোগা চেহারা গ্রিগরির। লম্বা দাড়ি, প্রকাণ্ড কান। মাথায় টুপি নেই, খোলা মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গামলায় ফুটন্ত রঙ মেশাচ্ছে। দেখে মনে হয়, এক পরদুঃখকাতর যাদুকর দাঁড়িয়ে আছে সামনে আর আমাকে নানা উপদেশ দিচ্ছে:

'সোজাসুজি তাকাবে মানুষের চোখের দিকে। তাহলে দেখো, কুকুর তাড়া করলে সেও পালাবে ল্যাজ গুটিয়ে...'

তার চশমার পুরু কাঁচদুটো নাকের ওপর চেপে বসেছে, ফলে দিদিমার নাকের মতো তার নাকও নীল হয়ে উঠেছে।

'কী হল?' হঠাৎ থেমে গিয়ে সে বলল। এক মুহূর্ত শুনল কান পেতে, তারপর পা দিয়ে বন্ধ করে দিল চুল্লির দরজা আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট্‌ল উঠোনের দিকে। পিছন পিছন আমিও ছুটলাম।

রান্নাঘরের মেঝের মাঝে বরাবর ৎসিগানক চিত হয়ে পড়ে আছে। জানলা দিয়ে গলে দ্যুটো চওড়া আলোর ধারা এসেছে ঘরের মধ্যে — একটা পড়েছে তার মাথায় আর ব্যকে, আরেকটা পায়ে। অদ্ভুত একটা আলো বিচ্ছ্যরিত হচ্ছে তার কপাল থেকে, উৎক্ষিপ্ত ভুর্য, বাঁকা চোখদ্যুটো তাকিয়ে আছে ঝুলকালিমাখা ছাদের দিকে। কালো ঠোঁটদ্যুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে আর লাল্‌চে ফেনা বেরিয়ে আসছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে রক্ত, রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে তার কাঁধের ওপর দিয়ে মেঝে পর্যন্ত আর প্রচুর রক্ত ধারা বেরিয়ে আসছে তার শরীরের তলা থেকে। দ্যুম্‌ড়ে বেঁকে আছে পা দ্যুটো; তার পরনের ঢিলে প্যাণ্ট লেপ্‌টে রয়েছে মেঝের সঙ্গে, বোঝা যায় প্যাণ্টটা ভিজে সপ্‌সপে। ঘরের মেঝে বালি দিয়ে ঘষে ঘষে এমন পরিষ্কার করা হয়েছিল যে এখন চক্‌চক করছে স্যর্যের আলোয়। রক্তের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে; স্যর্যের আলোর সীমানাটুকু পার হবার সময় ঝলসে উঠে, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

ৎসিগানকের শরীরটা স্থির, অনড়। শ্যধ্য নড়ছে তার প্রসারিত হাতের আঙ্গ্যলগ্যলো। মেঝেটাকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে সেই আঙ্গ্যলগ্যলো — রঙের ছোপ-লাগা নখগ্যলোর ওপরে স্যর্যের আলো পড়ে চক্‌চক করছে।

ইয়েভগেনিয়া-ধাই ইভানের পাশে হাঁটু ম্যড়ে বসে তার হাতে একটা মোমবাতি দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ইভান মোমবাতিটাকে ধরতে পারছে না। মোমবাতিটা তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে রক্তে নিভে গেল তার শিখা। ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার তুলে নিল মোমবাতিটা, ভালো করে রক্ত ম্যছে নিয়ে আবার চেষ্টা করল ইভানের অস্থির আঙ্গ্যলগ্যলোর ম্যঠোয় ধরিয়ে দিতে। চাপা উত্তেজনার একটা ঢেউ রান্নাঘরের ভিতরে ফ্যঁসে উঠছে যেন। এই ঢেউ প্রচণ্ড একটা ঝাপ্‌টার মতো আমাকে দরজার চৌকাঠ থেকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল কিন্তু আমি দরজার বাজ্য শক্ত ম্যঠোয় চেপে ধরে রইলাম।

'ম্যখ থ্যবড়ে পড়ে গেছে।' মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেমন যেন নিষ্প্রাণ গলায় ইয়াকভ-মামা বলল। তার ম্যখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ভাঁজ পড়েছে ম্যখের চারদিকে। নিষ্প্রাণ চোখদ্যুটো অনবরত পিট্‌পিট করছে।

'ও পড়ে গেল আর ক্রুশটা পড়ল ওর পিঠের ওপরে — একেবারে পিষে ফেলেছে। আমরা যদি সময়মত ক্রুশ ছেড়ে দিয়ে সরে না দাঁড়াতাম তাহলে আমাদেরও পিষে ফেলত।'

ভাঙা-ভাঙা গলায় গ্রিগরি বলে উঠল, 'ওকে পিষে মারবার জন্যে তোমরা ইচ্ছে করে এ কাজ করেছ!'

'বললেই হল আর কি! আমরা কী করে...'

'হ্যাঁ, তোমরা!'

রক্ত গড়াচ্ছে। দরজার কাছে ইতিমধ্যেই একটা পুকুর হয়ে গেছে রক্তের। টক্‌টকে লাল রঙটা কাল্‌চে হয়ে গেছে আর ফুলে ফুলে উঠছে যেন। ৎসিগানক তেমনিভাবে পড়ে আছে, ঘুমের ঘোরে থাকার মতো ঘড়ঘড় শব্দ বেরচ্ছে গলা থেকে আর মুখ থেকে লাল্‌চে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। শরীরটা গলে যাচ্ছে একটু একটু করে, চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, মেঝের সঙ্গে মিলিয়ে যাবার মতো এক হয়ে যাচ্ছে।

চাপা স্বরে ইয়াকভ-মামা বলল, 'বাবাকে ডেকে আনবার জন্যে মিখাইল ঘোড়ায় চেপে গির্জায় গেছে। আর আমি একটা দ্রশ্‌কিতে ওকে চাপিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে এসেছি... বাবাঃ, ক্রুশের তলার দিকটা নিলেই হয়েছিল আর কি... তাহলে এতক্ষণে আমারও ওই অবস্থা হত...'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার মোমবাতিটা নিয়ে ৎসিগানকের হাতের মধ্যে দিল। ফোঁটা ফোঁটা মোম আর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল ৎসিগানকের হাতের তালুতে।

কর্কশ রুক্ষ স্বরে গ্রিগরি চেঁচিয়ে উঠল, 'মোমবাতিটা মাথার কাছে মেঝের ওপর রাখ না — বোকা কোথাকার!'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে!'

'মাথা থেকে টুপিটা খুলে নাও!'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই টুপিটা টেনে খুলে ফেলল। ইভানের মাথাটা একটা ফাঁপা আওয়াজ তুলে ঠক্‌ করে ঠেকল মেঝের সঙ্গে। এবার মাথাটা একপাশে হেলে গেছে আর গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। সারা মুখ দিয়ে নয়, মুখের একটা কোণ থেকে। শংকায় ভরা দীর্ঘ কাল ধরে এইভাবে রক্ত বেরিয়ে এল। প্রথম দিকে প্রতি মুহূর্তে আমি আশা করছিলাম, এই বুঝি ৎসিগানক খানিকটা বিশ্রামের পরেই উঠে বসবে, তারপর বিরক্তির সঙ্গে থুথু ফেলে স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলে উঠবে:

'ফুঃ! কী বিশ্রী গরম!'

রবিবারে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার পরে ঘুম ভাঙলে ঠিক এই কথাগুলোই শোনা যেত তার মুখে। কিন্তু আজ উঠে বসা দূরে থাকুক ক্রমশ যেন গলে

গলে যাচ্ছে সে। সূর্য আরো নিচে নেমে গেছে। আর সূর্যের আলোর ফলকদুটি ছোট হতে হতে এখন জানলার কপাটে একটুখানি লেগে আছে মাত্র। কালো হয়ে গেছে ৎসিগানকের মুখ আর হাতদুটো, হাতের আঙ্গুল এখন আর নড়ছে না, মুখ থেকে এতক্ষণ যে ফেনা বেরিয়ে আসছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে। তিনটে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মাথার তিনদিকে, সেই সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার মাথার একরাশ নীল্চে কালো চুল, নাকের সরু ডগা আর রক্তমাখা দাঁত। তার কালো-হয়ে-আসা গালদুটির ওপরে সেই আলোর টুক্রো টুক্রো ছোপ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ইয়েভগেনিয়া-ধাই তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদতে লাগল।

'সোনা আমার, মাণিক আমার! তোর হাসি মুখ দেখে সব দুঃখ ভুলে যেতাম রে!' গুমরে গুমরে বলল সে।

ঘরের ভিতরটা যেমন ঠান্ডা তেমনি ভয়ানক। আমি গুড়ি মেরে টেবিলের তলায় লুকিয়ে রইলাম। তার পরেই ভারী ভারী পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন দাদামশাই; পরনে লোমের কোট। দাদামশাইয়ের পিছনে লোমওলা কলার লাগানো লম্বা কোট গায়ে দিদিমা। তাঁদের পিছনে পিছনে এল মিখাইল-মামা, বাড়ির বাচ্চারা এবং আরো অনেক অপরিচিত লোক।

দাদামশাই গায়ের কোটটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠলেন:

'হারামজাদার দল! এমন ছেলেটাকে মেরে ফেললি! বছর পাঁচেক পরে সোনা দিয়ে ওজন করলেও যে ওর দাম দেওয়া যেত না!'

মেঝের উপরে জামা-কাপড়ে আমার সামনের দিকটা আড়াল হয়ে গিয়েছিল, ইভানকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। গুড়ি মেরে আরো ভালো জায়গায় যেতে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম একেবারে আমার দাদামশাইয়ের সামনে। লাথি মেরে আমাকে একপাশে সরিয়ে দিলেন তিনি, তারপর ক্ষুদে লাল হাতের মুঠি মামাদের দিকে শাসানির ভঙ্গিতে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তোরা মানুষ নস, নেকড়ের দল!'

একটা বেঞ্চির ওপরে ধপ্ করে বসে পড়লেন। দু-হাতে আঁকড়ে ধরলেন বেঞ্চিটা। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ইনিয়ে-বিনিয়ে, ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন:

'জানি... ওকে যে তোরা দু-চোখে দেখতে পারতিস না তা আমি জানি... কী বোকা ছেলে তুই, ভানিয়া!.. আমাদের কপাল ভেঙেছে... এখন

আর কিচ্ছু করবার নেই... কিচ্ছুটি নয়... ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে, লাগাম পচে গেছে... ভগবান আমাদের কী অবস্থাই করেছেন গিন্নী গত কয়েক বছর ধরেই... কথা বলছ না যে তুমি?'

দিদিমা ঘরে ঢুকেই ইভানের পাশে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছিলেন। হাত স্পর্শ করে দেখছিলেন ইভানের মুখে, মাথায়, বুকে; নিশ্বাস ফেলছিলেন চোখের ওপরে, হাতদুটো তুলে নিয়ে ঘষছিলেন নিজের হাতে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন মোমবাতিগুলো। এবার তিনি ভারী পায়ে উঠে দাঁড়ালেন — প্রকাণ্ড কালো একটি মূর্তি, পরনের কালো পোশাক জ্বলজ্বল করছে, কালো চোখ ঘুরপাক খেতে খেতে ফুঁসে উঠছে। চাপা স্বরে বললেন:

'দূর হ, দূর হ সব হারামজাদারা!'

শুধু দাদামশাই ঘরের মধ্যে রইলেন, আর সবাই সরে এল।

বিনা সমারোহে, বিনা সোরগোলে সমাধিস্থ করা হল ৎসিগানককে।

চার

মোটা একটা কম্বল আষ্টেপৃষ্ঠে কয়েক পাক জড়িয়ে চওড়া একটা বিছানায় আমি শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে শুনছি, দিদিমা প্রার্থনা করছেন। হাঁটু মুড়ে বসেছেন তিনি, একহাতে বুক চেপে ধরেছেন, অপর হাতে মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছেন।

জানলার বাইরে ভীষণ শীত। জানলার শার্সির ওপরে বরফ জমে জমে বিচিত্র নক্‌শা তৈরি হয়েছে — সেই নক্‌শার ভিতর দিয়ে সবুজ চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে ঘরের মধ্যে। সেই অদ্ভুত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সদয় মুখখানি, উদ্‌গত নাক আর কালো চোখ। দিদিমার চুলগুলো রেশমি রুমাল দিয়ে বাঁধা আর সেটি ঠিক ধাতুর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। পরনের কালো পোশাক কাঁধের কাছ থেকে ঢেউ তুলে ভাঁজের পর ভাঁজে নেমে এসেছে আর স্তূপ হয়ে রয়েছে মেঝের ওপরে।

প্রার্থনা শেষ হলে তিনি পোশাক বদলাতেন, কোণের একটা ট্রাঙ্কের ওপরে সযত্নে ভাঁজ করে রাখতেন পোশাকগুলো, তারপর এসে দাঁড়াতেন বিছানার কাছে। গভীর ঘুমের ভান করে আমি পড়ে থাকতাম।

নরম সুরে তিনি বলতেন, 'ওরে মিট্‌মিটে ক্ষুদে শয়তান, ভাবছিস মট্‌কা মেরে পড়ে থাকলেই আমি বিশ্বাস করব যে তুই ঘুমিয়েছিস! তুমি তো

ঘুমোওনি সোনামণি, যাদু আমার! এবার দেখি, কম্বলের একটা দিক ছেড়ে দাও তো।'

এর পরে কী ঘটবে তা আমি জানতাম। তাই কিছুতেই আর হাসি চাপতে পারতাম না। দিদিমা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'এই তো ধরা পড়ে গেছিস! বুড়ী দিদিমার সঙ্গে খেলা হচ্ছে — না?'

কম্বলের একটা প্রান্ত তিনি চেপে ধরলেন। তারপর এমন কৌশলে এমন একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিলেন যে ঘুরপাক খেতে খেতে শাঁ করে শূন্যে উঠে গেলাম, আবার তেমনি ঘুরপাক খেতে খেতে ধুপ্‌ করে এসে পড়লাম নরম বিছানার ওপরে। দিদিমা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

'কী গো ক্ষুদে বিচ্ছু! হল কী? কুটুস্‌ করে মশা কামড়ে দিয়ে গেছে বুঝি?'

মাঝে মাঝে তিনি এত বেশিক্ষণ প্রার্থনা করেন যে আমি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ি এবং কখন তিনি শুতে আসেন টের পাই না।

যেদিন কোনো গোলমাল বা ঝগড়া-মারামারি হয়, বিশেষ করে সেই দিনেই দিদিমার প্রার্থনাও চলে অনেকক্ষণ ধরে। আর প্রার্থনা করতে বসে ভগবানের কাছে দিদিমা সংসারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা যে-ভাবে বলে যান তা শুনতেও ভারি মজা লাগে। মস্ত পাহাড়ের মতো শরীরটি নিয়ে তিনি তো বসেন প্রার্থনা করতে, প্রথমদিকে তাঁর উচ্চারণটা হয় দ্রুত ও দুর্বোধ্য, শেষদিকে তা হয়ে ওঠে গভীর বিক্ষোভের প্রকাশ।

'প্রভু, তুমি তো নিজেও জানো যে সব লোকই নিজের অবস্থা ভালো করতে চায়। এতে আর অন্যায় কী আছে বলো? এই ধরো মিখাইলের কথা। ছেলেদের মধ্যে ও-ই তো সবচেয়ে বড়ো, তাই ওর একটু স্থিতি হওয়া দরকার; কাজেই ওকেই থাকতে দেওয়া উচিত শহরে। এখন ওকে যদি নদীর ওপারে নতুন জায়গায় গিয়ে থাকতে বলা হয় — সেটা কি অন্যায় নয়? বলো তুমি? ওই নতুন জায়গাটা কেমন হবে তা কেউ জানে না, কেউ গিয়ে এর আগে থেকে দেখেওনি। কিন্তু তবুও কর্তার ইচ্ছে, ইয়াকভ এ-বাড়িতে থাকুক। ইয়াকভকেই তার বেশি পছন্দ। আচ্ছা, বাপ হয়ে এক ছেলেকে বেশি ভালোবাসা, আরেক ছেলেকে কম ভালোবাসা — এটা কি ঠিক কাজ? কিন্তু বুড়ো কর্তা তো একগুঁয়ে মানুষ। প্রভু, কর্তার মাথায় তুমি দু-এক ফোঁটা বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিও — কর্তা যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে।'

বড়ো বড়ো জ্বলজ্বলে চোখ মেলে তিনি তাকিয়ে থাকেন কালো কালো আইকনগুলোর দিকে, তারপর আবার তাঁর ভগবানকে উপদেশ দিয়ে চলেন:

'প্রভু, কর্তাকে তুমি বরং খুব একটা ভালো স্বপ্ন দিও। স্বপ্ন দেখে যেন বুঝতে পারে, কি ভাবে নিজের ছেলেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করতে হয়।'

বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এ'কে নিচু হয়ে প্রণাম করেন্। এত নিচু হন যে তাঁর মোটা ভুরুটা ঠেকে যায় গালিচায়। তারপর আবার সোজা হয়ে বসে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে বলতে থাকেন:

'আচ্ছা, ভারভারাকে যদি দু-এক ফোঁটা আনন্দ দাও তাহলে কি কোনো ক্ষতি হয়? বলো তো প্রভু, ভারভারা কি এমন কোনো অপরাধ করেছে যে তোমার কৃপা থেকে বঞ্চিত হবে? ওর কপালটাই বা সবার চেয়ে মন্দ হবে কেন? দেখো তো প্রভু, শক্তসমর্থ শরীর, অল্প বয়স, আর এই মেয়ে এত দুঃখ ভোগ করবে — এমন কথা কে কবে শুনেছে বলো? তারপর প্রভু, গ্রিগরির কথাও তোমাকে একটু মনে করিয়ে দিই — ওর চোখদুটির কথা ভুলো না যেন — চোখদুটির অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। ও যদি অন্ধ হয়ে যায় তাহলে ওর গতি কি হবে বলো? দোরে দোরে ভিক্ষে করতে হবে যে! সেটা কি ভালো? যে নাকি সারা জীবন ধরে বুড়োকর্তার এই ব্যবসায়ে শরীরপাত করল — তার কি এমনটি হওয়া উচিত?.. কিন্তু বুড়ো ওকে একটি কাণাকড়িও সাহায্য করবে না... আহ্-হা প্রভু, প্রভু!..'

বহুক্ষণ তিনি নির্বাক হয়ে থাকেন, মাথাটা বুকের ওপর নেমে আসে, হাতদুটো ঝুলতে থাকে — মনে হয় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

'আর কী বলব?' আত্মগতভাবে ভুরুদুটো কু'চকে অবশেষে তিনি আবার বলতে থাকেন, 'তোমার ওপর যাদের বিশ্বাস অটুট আছে, তাদের সবাইকে কৃপা কোরো। আর আমার দোষ নিও না প্রভু, আমাকে, বোকা বুড়ীকে ক্ষমা কোরো... তোমাকে আর কি বলব প্রভু, তুমি তো ভালো করেই জান আমি যে পাপ করি তা এই বোকা মনের জন্যেই, অসৎ অন্তঃকরণের জন্যে নয়।'

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলেন:

'প্রভু, প্রভু আমার, তোমার তো অজানা কিছুই নেই! হে পরম পিতা, তুমি তো সবই বোঝ!' শেষ কথাগুলো বলবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে ভালোবাসা ও আত্মতৃপ্তির সুর ফুটে ওঠে।

দিদিমার এই একান্ত আপন ও একান্ত নিকট ভগবানকে আমার ভারি পছন্দ হয়। প্রায়ই আমি বলি:

'আমাকে ভগবানের কথা বলো দিদিমা।'

ভগবানের কথা বলবার একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে দিদিমার, কখনো তার ব্যতিক্রম হয় না। সোজা হয়ে বসেন, চোখ বুজে খুব নরম সুরে কথা বলতে থাকেন, অদ্ভুতভাবে টেনে টেনে উচ্চারণ করেন শব্দগুলো। হঠাৎ উঠে তিনি রুমাল জড়ান মাথায় আর তারপর আবার বসে আপন মনে কল্পনার জাল বুনে চলেন। শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তিনি বলেন:

'শোন্ তবে। চারদিকে স্বর্গের উদ্যান, মাঝখানে একটা পাহাড়, আর সেই পাহাড়ের ওপরে রুপোলী লিন্ডেনগাছের তলায় নীলকান্তমণির সিংহাসনে বসে আছেন প্রভু। সেই গাছগুলিতে সারা বছর ধরে ফল ফলে — জানিস তো স্বর্গে শীত-গ্রীষ্ম বলে কিছু নেই। বছরের প্রথম দিনটি থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত সেখানে ফুল ফোটে। স্বর্গের সাধুরা সেই ফুল দেখে খুশি হন। আর প্রভু সর্বক্ষণই কত কত দেবদূতদের পাঠাচ্ছেন — তুষারকণার মতো ঘন — কিংবা এক ঝাঁক মৌমাছির মতো — কিংবা এক ঝাঁক শাদা পায়রার মতো যারা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসে আবার স্বর্গে ফিরে যায় — ফিরে গিয়ে প্রভুর কাছে আমাদের কথা বলে। জানিস তো, আমাদের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা দেবদূত আছে—তোর আছে, আমার আছে, তোর দাদামশাইয়ের আছে — সবার প্রতিই প্রভুর সমান ভাব। যেমন ধর্, তোর কথা বলবার জন্যে যে দেবদূত আছে সে গিয়ে প্রভুর কাছে বলল, "লেক্সেই তার দাদামশাইকে জিভ বার করে দেখিয়েছে।" এই শুনে প্রভু আদেশ দিলেন, "তাহলে দাদামশাই লেক্সেইকে ধরে আচ্ছা করে মার দিক।" এই নিয়মই সব ব্যাপারে চলে আসছে — যেমন কর্ম তেমনি ফল। কেউ বা দুঃখ পায়, কেউ বা আনন্দ। আর সে কী মধুর দৃশ্য ভাব্ তো দেখি, দেবদূতরা ডানা কাঁপিয়ে প্রভুর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আনন্দে গাইছে: "প্রভুর গুণ গাই! জয় হোক্ হে প্রভু!" সেই গান শুনে প্রভু হাসেন আর সেই হাসি যেন বলে: বেশ তো গান গেয়ে যদি তোমরা আনন্দ পাও বাছারা তবে গাও।'

দিদিমাও হাসছেন, মাথা দুলিয়ে, যেন তিনি নিজেই এ সব দেখেছেন।

'আচ্ছা দিদিমা, তুমি কি এ সব নিজের চোখে দেখেছ?'

আত্মগত সুরে দিদিমা জবাব দেন: 'না, দেখিনি, তবে আমি জানি।'

দিদিমা যখন প্রভুর কথা এবং স্বর্গ ও দেবদূতের কথা বলতে শুরু করেন, তখন তিনি যেন অনেক ছোট হয়ে যান, ভারি একটা কোমলতা আসে তাঁর মধ্যে, বয়সের ছাপগুলি মুছে যায় তাঁর মুখ থেকে, আর ভিজে চোখদুটি থেকে ভারি উষ্ণ ও অন্তরঙ্গ একটি আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তাঁর মাথার চিকন রেশমের মতো বেণীটা আমার গলায় জড়াতে জড়াতে চুপটি করে বসে আমি দিদিমার মুখের বিরতিহীন গল্প শুনে চলি এবং শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যাই। যতো শুনি কিছুতেই যেন আর আশ মেটে না।

'আমাদের মতো এই মরজগতের জীবরা প্রভুর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না — তাকালে তাদের চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। শুধু সাধুপুরুষরাই প্রভুর দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারে। কিন্তু দেবদূতদের আমি দেখেছি। মনে যদি কোনো পাপ বা গ্লানি না থাকে তাহলে দেবদূতদের দেখা যায়। একবার মনে আছে, গির্জায় ভোরের উপাসনা হচ্ছে আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি — এমন সময় আমি দুজন দেবদূতকে দেখতে পেলাম। ঠিক যেন সাদা কুয়াশার মতো — দৃষ্টিকে আটকায় না। আলো দিয়ে গড়া তাদের শরীর, ডানা নেমে এসেছে মেঝে পর্যন্ত, ঝল্‌মলে লেস বা সূক্ষ্ম কাপড় যেন বাতাসে উড়ছে। দেবদূতরা বেদীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে বুড়ো পাদরি ইলিয়াকে সাহায্য করছে। পাদরি যখন প্রার্থনা করবার জন্যে শীর্ণ হাত দুখানি তুল্‌ছেন — অমনি তারা আসে সেখানে, কনুইয়ের কাছে ধরে পাদরির হাত দু-খানি তুলে ধরে থাকে। পাদরি খুবই বুড়ো হয়েছেন, চোখে একেবারেই দেখতে পান না — চলতে ফিরতে যেখানে-সেখানে ধাক্কা খান। কিছুদিন পরেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। দেবদূত দুজনকে দেখে আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে আনন্দে আমার মূর্ছা যাবার উপক্রম, বুকের ভিতরটা এমন টন্‌টন করে ওঠে যে মনে হচ্ছিল বুকটা যেন ফেটে যাবে। চোখ দিয়ে ধারাস্রোতের মতো জল গড়াচ্ছিল। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আনন্দ যে প্রভুর স্বর্গে — আর আলিওশা, সোনা আমার, মানিক আমার, কী আনন্দ যে এই পৃথিবীতে. সবকিছু কতো ভালো, কতো সুন্দর!'

'দিদিমা, আমাদের এই বাড়িতেও সবকিছু ভালো?'

বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিদিমা জবাব দেন, 'হ্যাঁ বাবা, এই বাড়িতেও। পুণ্যময়ী মেরীমাতার জয় হোক্।'

দিদিমার এই কথাগুলো আমার কেমন গোলমেলে লাগে। আমাদের এই বাড়িতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে ক্রমশই বেশি চিড় ধরছে — এই বাড়িতেও সবকিছু ভালো একথা বিশ্বাস করা শক্ত।

আমার মনে আছে, মিখাইল-মামার ঘরের খোলা দরজার সামনে দিয়ে যেতে যেতে একবার আমি নাতালিয়া-মামীকে এক লহমার জন্যে দেখেছিলাম। নাতালিয়া-মামীর পরনে আগাগোড়া সাদা পোশাক, বুকের ওপরে দুই হাত চেপে ধরে নাতালিয়া-মামী ঘরের চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে আর মর্মান্তিক ও চাপা স্বরে চিৎকার করে চলেছে: 'ভগবান, আমাকে তুমি তোমার ওখানে নিয়ে যাও ... এ-বাড়ি থেকে মুক্তি দাও আমাকে ...'

ভগবানের কাছে নাতালিয়া-মামীর এই প্রার্থনা আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেনি। তেমনি দুর্বোধ্য ঠেকেনি গ্রিগরির কতগুলো কথা যখন সে বিড়বিড় করে বলেছে:

'যেদিন একেবারে অন্ধ হয়ে যাব সেদিন বেরোব ভিক্ষে করতে ... এখানকার এই জীবনের চেয়ে ভিক্ষে করাও ঢের ভালো!'

আমার ভারি ইচ্ছে করত, গ্রিগরি একটু তাড়াতাড়ি অন্ধ হয়ে যাক্। তাহলে গ্রিগরি যখন ভিক্ষে করতে বেরোবে, আমি তার হাত ধরে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাব — ভিক্ষে করতে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব দুজনে। আমার এই পরিকল্পনার কথা গ্রিগরির কাছে বলেছিলাম। শুনে দাড়ির আড়ালে মুচকে হেসে গ্রিগরি বলেছিল:

'ঠিক আছে দাদু, আমরা দুজনেই যাব একসঙ্গে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সমস্ত লোককে শুনিয়ে আমি চিৎকার করে বলব: '"রঙের কারখানার মালিক ভাসিলি কাশিরিনের নাতিকে, তার মেয়ের ছেলেকে নিয়ে আমি চলেছি। ভিক্ষে দাও গো তোমরা!" ভারি মজা হবে, না?'

মাঝে মাঝে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, নাতালিয়া-মামীর ঠোঁটদুটো ফুলে উঠেছে আর তার হলদেটে মুখের উপর কালশিটের দাগ।

'মামা কি মামীমাকে মারধোর করে?' দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'করে বৈকি। তবে লুকিয়ে। মিখাইলটা একটা জানোয়ার! তোর দাদামশাই এসব পছন্দ করে না, তাই হতভাগা রাত্রিবেলা বৌকে ধরে মারে। মিখাইলটা জানোয়ার আর ওর বৌটা হয়েছে এমনি মিন্‌মিনে।'

তারপর নিজের কথায় মত্ত হয়ে নিজেই বলে চলেন:

'তাও তো আজকাল আর তেমন মারধোর নেই — আগেকার কালে যা ছিল! আজকাল আর কি আছে — দাঁতে বা কানে দু-একটা ঘুষি বা দু-এক মিনিট বেণী ধরে টানা। কিন্তু সেকালে এমন দু-এক মিনিটের ব্যাপারই ছিল না। মারধোর চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা! মনে আছে, একবার তোর দাদামশাই আমাকে সারাদিন ধরে মেরেছিল। সেটা ছিল ইস্টার-সপ্তাহের প্রথম দিন। দুপুরের উপাসনার সময় থেকে মারতে শুরু করেছিল, আর থামল সূর্য ডুবে যাবার পরে। এক-একবার মারে — একটু বিশ্রাম নেয় — আবার শুরু করে। ঘোড়ার চাবুক বা হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়েই মারে।'

'কী দোষ করেছিলে তুমি?'

'তা এখন আমার মনে নেই। একবার তো মারতে মারতে একেবারে আধ-মরা করে ফেলেছিল — তারপর পাঁচ দিন ধরে কিচ্ছু খেতে দেয়নি। কি-ভাবে যে বেঁচেছিলাম, তা আর তোকে কি বলব। কিংবা ধর্ না, সেই সেবারের কথা...'

এসব কথা শুনে আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি, মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়। চেহারার দিক থেকে দাদামশাইয়ের চেয়ে আমার দিদিমা অন্তত দ্বিগুণ। সুতরাং দাদামশাই কি করে যে দিদিমাকে মারপিট করতে পারতেন — তা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

'আচ্ছা দিদিমা, তোমার চেয়ে দাদামশাইয়ের গায়ের জোর কি এত বেশি?'

'গায়ের জোর বেশি নয়, কিন্তু বয়সে বড়ো। তাছাড়া, আমার স্বামী। ভগবান তো এই স্বামীর ওপরেই আমার ভার সঁপে দিয়েছেন। স্বামীকে মেনে চলতে হবে, এ তো ভগবানেরই আদেশ রে।'

দিদিমা যখন দেবতা ও সাধুদের আইকনগুলোকে ঝাড়পোঁছ করতে শুরু করেন তখন বসে বসে তাঁর হাতের কাজ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। আমাদের বাড়ির এই আইকনগুলোর নানারকমের বহু অলঙ্কার আছে। আইকনগুলোর গায়ে বসানো আছে রুপোর চুম্কি, বহুমূল্য পাথর ও মণিমুক্তো। তাঁর নিপুণ আঙুল দিয়ে দিদিমা আইকনগুলোকে নাড়া-চাড়া করেন। এক-একটা আইকন হাতে নেন আর বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে তাতে চুমু খেয়ে হেসে আপন মনে বলেন: 'কী মিষ্টি মুখ! কী সুন্দর মূর্তি!'

'ইস্, কী ধুলোকালিই না পড়েছে! পরম মঙ্গলময়ী মেরীমাতা, হে শক্তি-রূপিণী, হে আনন্দদায়িনী! আলিওশা, সোনা আমার, মানিক আমার,

দ্যাখ্, দ্যাখ্, কী সুন্দর আইকন! এত ছোট ছোট মূর্তিগুলি — কিন্তু তবুও প্রত্যেকেই আলাদা-আলাদা দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে তাকিয়ে দ্যাখ্, এটার নাম—"বারোটি পুণ্য দিন"—ফিওদরোভস্কির পুণ্যময়ী মাতা দাঁড়িয়ে আছেন মাঝখানে—দয়া ও কারুণ্যের কি অপরূপ চিত্র! আর এই আইকনটির নাম—"ওগো মা, আমার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদো না..."'

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার বোকা মামাতো বোন কাতেরিনা যেমন অখন্ড মনোযোগের সঙ্গে তার পুতুল নিয়ে খেলা করে, আমার দিদিমাও ঠিক তাই করেন সাধুসন্তদের আইকনগুলো নিয়ে।

মাঝে মাঝে দিদিমা শয়তানদেরও দেখেন; শয়তানরা থাকে কখনো বা একা, কখনো বা দল বেঁধে।

'তাহলে শোন কী হয়েছিল। এক রাতে লেন্ৎ'এ। রুদল্ফ্'এর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি—চাঁদের আলোয় চারদিক ঝক্ঝক করছে—এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, ছাদের ওপরে চিমনির কাছে কালো অন্ধকার মতো কি যেন একটা জিনিস ঠ্যাঙ ফাঁক করে বসে আছে। কালো কুৎকুতে মস্ত চেহারা জিনিসটার, দুটো শিং ঢুকিয়ে দিয়েছে চিম্নির মধ্যে। ফোঁস ফোঁস করে নাক টানছে আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শব্দ করছে। ছাদের ওপরে আছড়ে আছড়ে পড়ছে লেজটা। আমি তার দিকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বলে উঠলাম, "যীশু খ্রীষ্টের পুনরভ্যুত্থান হোক, আর নিপাত যাক তাঁর শত্রুরা।" সঙ্গে সঙ্গেই সেটা আর্ত চিৎকার করে উঠল আর ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ে উঠোনের মধ্যে, অদৃশ্য হয়ে গেল! মনে হয়, রুদলফরা উপোসের দিনে খাবার জন্যে কী যেন নিষিদ্ধ রান্না করছিল—এই রান্নার গন্ধেই ওটা এসেছে, লোলুপ নয়নে...'

শয়তান ডিগ্‌বাজি খেয়ে উঠোনের মধ্যে পড়ছে ভাবতেই আমার হাসি পায়। দিদিমাও সঙ্গে সঙ্গে হাসেন।

'বাচ্চারা যেমন দুষ্টুমি করতে ভালোবাসে, এই শয়তানগুলোও তাই। একদিন রাত্রে কাজ শেষ করতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় মাঝরাত্রে আমি স্নানের ঘরে কতগুলি জামাকাপড় ধুয়ে নিচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ চুল্লির দোরটা ঠাস্ করে খুলে গেল আর পিলপিল করে বেরিয়ে এল শয়তানের দল। কোনোটা লাল, কোনোটা সবুজ, কোনোটা কালো—কোনোটা ছোট, কোনোটা আরো ছোট— যেন এক ঝাঁক আরশোলা। আমি দরজার দিকে ছুটে যেতে চাইলাম কিন্তু শয়তানগুলো কিছুতেই যেতে দিল না। তখন আমার সে কী অবস্থা! আমার নড়বার-চড়বার উপায় নেই — আর হাজার-

হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি শয়তান আমাকে ঘিরে আছে। সারা স্নানের ঘরটা জুড়ে আছে তারা — পায়ের তলায় রয়েছে, পায়ের ওপরে রয়েছে — আঁচড়িয়ে, কামড়িয়ে, হুল ফুটিয়ে এমন একটা অবস্থা করে তোলে যে হাত তুলে ক্রুশচিহ্ন এঁকে শয়তানগুলোকে ভাগিয়ে দেব — সেই অবস্থাও আমার আর থাকে না। বেড়ালছানার মতো শয়তানগুলোর সারা গায়ে লোম, তেমনি তুলতুলে আর উষ্ণ ছোঁয়া। পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘুরপাক খায়, ডিগবাজি দিয়ে লাফিয়ে পড়ে, ইঁদুরের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁত বার করে, ছোট ছোট সবুজ চোখে পিট্‌পিট করে তাকায়, মাথার শিং গজাবার জায়গায় এইটুকু এইটুকু মুণ্ড — সেই মুণ্ড সমেত মাথা ঝাঁকিয়ে গুঁতো মারে, শুয়োরের ছানার মতো লেজগুলোকে পাকায়... সে যে কী অবস্থা আমার সে এক ভগবানই জানেন! প্রায় জ্ঞান হারাই আর কি। তারপর যখন আবার পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখলাম, মোমবাতিটা পুড়ে-পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে গেছে, কাপড়কাচার জল একেবারে ঠাণ্ডা, কাপড়কাচার আরক মেঝের ওপর ছিটিয়ে পড়েছে। মনে মনে ভাবলাম, চুলোয় যা তোরা, চুলোয় যা, মর্‌ মর্‌, নরকের কীট!'

আমি চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করি। চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে। ছাইরঙা পাথরের তৈরি চুল্লিটার মুখ খুলে গেছে আর হুড়মুড় করে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা রঙের ক্ষুদে-শয়তান বেরিয়ে আসছে, সারা গায়ে লোম। স্নানের ঘরটা ভর্তি হয়ে গেছে এই ক্ষুদে-শয়তানদের ভিড়ে আর হাওয়ার ঝাপ্‌টা লাগছে মোমবাতির শিখায়, লাল লাল জিভ বার করছে তারা। দৃশ্যটা যেমনি মজার তেমনি আতঙ্কজনক। দিদিমা নিঃশব্দে মাথা নাড়তে থাকেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার কতগুলি নতুন চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে ঝল্‌সে ওঠে এবং তিনি বলতে থাকেন:

'শয়তানে পাওয়া লোককেও আমি দেখেছি। এই ঘটনাও ঘটে রাত্রিবেলা, সময়টা ছিল শীতকাল আর একটা তুষার-ঝড় প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে। দ্যুকভ নালা আমি পার হচ্ছি। সেখানে পুকুরের ওপর জমে-থাকা বরফের একটা ফাঁক দিয়ে ইয়াকভ ও মিখাইলো তোর বাপকে ঠেলে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। সে কথা তোকে আরেকদিন বলেছি। সেদিনও সেই একই জায়গায় আমি চলেছি। রাস্তা ধরে নিচে নেমে নালাটার একেবারে নিচে এসে দাঁড়িয়েছি — এমন সময় সে কী প্রচণ্ড শিস আর আর্ত চিৎকার, সে আর কী বলব! চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি তিনটে কালো ঘোড়া একটা

গাড়ি টেনে আনছে; প্রচণ্ড গতিতে নেমে আসছে আমার দিকেই। গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে আসছে একটা গোলগাল শয়তান, মাথায় ছুঁচলো লাল টুপি, চালকের আসনে দাঁড়িয়ে উঠে দু-হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে আছে। ঘোড়াগুলোকে সে চালাচ্ছে লাগাম দিয়ে নয়, শেকল দিয়ে। লোকে পেরতে পারে না, অথচ তারা ঘোড়া নিয়ে নালা পেরিয়ে সোজা ছোটাল পুকুরের দিকে, পিছনে উড়তে লাগল বরফের মেঘ। গাড়ির মধ্যে যারা ছিল, সেগুলোও শয়তান; শিস দিচ্ছে, চিৎকার করছে, টুপি নাড়ছে। এইভাবে সাত-সাতটা ত্রয়কা আমার পাশ দিয়ে দমকলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। ঘোড়াগুলো সব কুচকুচে কালো, আর তারা সবাই মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো ছেলে। এই লোকগুলোর ওপরেই তো শয়তান ভর করে। শয়তানরা ঠিক খুঁজে খুঁজে বার করে এই লোকগুলোকে, এই লোকগুলোকে তাড়িয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায় হুল্লোড় করবার জন্যে। আমার মনে হচ্ছিল, শয়তানের বিয়ে হচ্ছে আর সেই দৃশ্য আমি চোখের সামনে দেখছি...'

এমন একটা সরল ও প্রত্যয়ের সুরে দিদিমা কথা বলেন যে তাঁর কথা কিছুতেই অবিশ্বাস করা চলে না।

আরো অনেক গল্প দিদিমা বলেন আর সেই গল্পগুলির মধ্যে সেরা ছিল ওই কবিতা যাতে বলা হয়েছে কি করে মেরীমাতা হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন পৃথিবীর যন্ত্রণাকাতর পথ দিয়ে, কি ভাবে তিনি 'ডাকাত-রাজকুমারী' ইয়েনগালিচেভা'কে অনুরোধ জানালেন রুশদেশে লুটপাট ও ডাকাতি বন্ধ করতে; আর ঈশ্বরানুগত আলেক্সেইয়ের সম্পর্কে কবিতা, বীরযোদ্ধা ইভানের গল্প, জ্ঞানপরী ভাসিলিসা, ছাগল-পুরোহিত ও ঈশ্বরানুগৃহীত লোকটির কাহিনী, মার্ফা-পসাদ্‌নিৎসা, ডাকাত-সর্দারণী উস্তা-মেয়ে, মিশর-পাপী মারিয়া, ডাকাত-মায়ের শোকের রূপকথা। কত গল্প, রূপকথা আর ছড়া যে দিদিমা জানেন তার কোনো সংখ্যা নেই — সে এক অফুরন্ত ভাণ্ডার।

কোনো মানুষকেই তিনি ভয় করেন না। এমন কি দাদামশাইকে নয়, শয়তানকে নয়, অন্য কোনো অশুভ শক্তিকেও নয়। কিন্তু আরশোলা দেখলে তাঁর মরণ-আতঙ্ক। অনেক দূরেও যদি থাকেন তবু চোখে না দেখেও আরশোলার উপস্থিতি টের পান তিনি। মাঝে মাঝে এমন হয় যে মাঝ-রাত্রে আমাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে চাপা স্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন:

'আলিওশা, লক্ষ্মীটি, একবার উঠে দ্যাখ্‌ তো — ঘরের মধ্যে একটা

আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্মী বাবা, যীশু খ্রীষ্টের দিব্যি আরশোলাটা মেরে ফ্যাল্।'

আধো-ঘুমে উঠে আমি মোমবাতি জ্বালাই এবং হামাগুড়ি দিতে দিতে শত্রুর সন্ধানে ঘরের চারদিকে ঘোরাফেরা করি। কিন্তু প্রত্যেকবারেই যে আমার প্রচেষ্টা সফল হয় তা নয়।

'কোথায় দিদিমা, আরশোলা তো নেই।' আমি হয়তো বলি।

দিদিমা ততোক্ষণে কম্বলের মধ্যে মাথা শুদ্ধ গুঁজে দিয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে আছেন। আমার কথা শুনে কোনো রকমে মুখ দিয়ে কতগুলি শব্দ বার করেন মাত্র।

'ওরে, আমি বলছি আছে। দ্যাখ্ বাবা, ভালো করে খুঁজে দ্যাখ্। লক্ষ্মী বাবা আমার! আমি বলছি, আছে, নিশ্চয়ই আছে।'

আর শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে তাঁর কথাই ঠিক। সাধারণত আরশোলাটা খুঁজে পাওয়া যেত হয় বিছানার কাছাকাছি নয় তো তার অনেক দূরে।

'কী রে, মেরেছিস তো? এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কাজ। ভগবান তোর ভালো করবেন!' বলে তিনি মাথার ওপর থেকে লেপ সরিয়ে নেন, তাঁর সারা মুখে খুশির হাসি ফুটে ওঠে।

কিন্তু আরশোলাটা যখন কিছুতেই খুঁজে পেতাম না—তখন সে রাতের মতো তাঁর ঘুমের দফা শেষ। বেশ টের পাই, রাত্রিবেলা বিছানায় হয়তো একটু খসখস আওয়াজ হয়েছে, অমনি তাঁর সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। আর রুদ্ধ নিশ্বাসে বিড়বিড় করে তিনি বলে চলেন:

'ওই তো, দরজার কাছে... এবার ট্রাঙ্কের তলায় ঢুকেছে...'

'আচ্ছা দিদিমা, আরশোলা দেখে তুমি এত ভয় পাও কেন বলো তো?'

এ-প্রশ্নের খুব ভালো একটা জবাবও তাঁর আছে। তিনি বলেন: 'আচ্ছা বল্, আরশোলা থেকে জগতের কারও কোনো উপকার হয়? ওগুলোর কাজ হচ্ছে শুধু গুটি-গুটি এগিয়ে চলা — শুধুই গুটি-গুটি এগিয়ে চলা। কেলে শয়তান! ভগবানের সৃষ্ট এই জগতে নিকৃষ্টতম প্রাণীরও জীবনের একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। এমন যে হাজার-ঠেঙে বিছের জাত—ওগুলোকে দেখেও অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে বাড়ি স্যাঁৎসেঁতে হয়েছে। বিছানায় যদি ছারপোকা হয় তাহলে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে ঘরের দেওয়ালে ময়লা জমেছে। শরীরে যদি উকুন হয় তাহলে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে শরীরে

য়োগের বীজ ঢুকেছে। কেমন, ঠিক বলিনি? কিন্তু একবার ভাব তো ওই আরশোলাগুলোর কথা। বলতে পারিস ওগুলো কেন আছে? জগতের কোনো কাজেই যখন আসে না — তবে ওগুলো কেন বেঁচে থাকবে?'

একদিন দিদিমা নতজানু হয়ে ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করছিলেন এমন সময় দাদামশাই দরজাটা খুলে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠলেন:

'গিন্নী শুনছো, প্রভু একেবারে সাক্ষাৎদূত পাঠিয়েছেন। কারখানায় আগুন লেগেছে!'

'বলছ কি!' ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে পড়ে দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন। তারপর দুজনেই ধুপ্‌ধাপ শব্দে ছুটলেন মস্ত বৈঠকখানা ঘরের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে।

'ইয়েভগেনিয়া, আইকনগুলো নামাও! আর নাতালিয়া, তুমি ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় পরিয়ে তৈরি করে রাখ দেখি!' দিদিমার অবিচলিত উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দাদামশাই আর্ত স্বরে শুধু 'আ-আ-আ' বলে বিলাপ করে চললেন।

আমি রান্নাঘরে ছুটে এলাম। এই ঘরে উঠোনের দিকে একটা জানলা আছে। জানলাটা সোনার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। টুকরো টুকরো সোনালী আলোর এক-একটা ঝলক মেঝের ওপরে ছুটোছুটি করে লুকোচুরি খেলা শুরু করেছে যেন। ইয়াকভ-মামা রয়েছে ঘরের মধ্যে, খালি পায়ে জুতো গলিয়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে — তাকে দেখে মনে হয় আলোর ঝলকে যেন পায়ের তলাটা পুড়ে যাচ্ছে তার। দাপাচ্ছে আর চিৎকার করছে:

'এটা নিশ্চয়ই মিখাইলের কাণ্ড! ও-ই আগুন লাগিয়েছে! আগুন লাগিয়ে পালিয়েছে!'

'চুপ কর্ হতভাগা!' বলে দিদিমা তাকে এমন একটা ধাক্কা দিলেন যে ইয়াকভ-মামা দরজার ওপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

জানলার শার্সির ওপর তুষার জমেছে; সেই তুষারের ভিতর দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি কারখানার ছাদে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে, লক্‌লকে আগুনের শিখা আবর্তিত হচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে। শান্ত রাত্রিতে নির্ধূম লাল আগুন ফুলের মতো ফুটে রয়েছে যেন। শুধু আকাশের অনেক উঁচুতে থিতিয়ে রয়েছে এক টুকরো কালো মেঘ। কিন্তু এই কালো মেঘ ছায়াপথের

রুপোলি ধারাকে আড়াল করতে পারেনি। আগুনের শিখায় টক্‌টকে লাল হয়ে ঝল্‌সে উঠেছে বরফ। বাইরের দিক্‌কার ঘরগুলোর দেয়াল যেন কাৎ হয়ে পড়েছে আর কাঁপছে — মনে হয়, দেয়ালগুলো সরে যেতে চায় উঠোনের কোণের দিকে যেখানে প্রচণ্ড আগুন জ্বলছে। কারখানা-ঘরের চওড়া চওড়া ফাটলগুলো ফুটে উঠেছে আগুনের আলোয়, আর সেইসব ফাটল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে আগুনের লক্‌লকে দীপ্ত জিহ্বা। কারখানার ছাদের ওপরে শুক্‌নো কাঠের তক্তা লাগানো, তক্তাগুলোর ওপর দিয়ে লাল আর সোনালী ফিতের মতো আগুনের স্রোত বইছে; ছাদের ফাঁক দিয়ে উঠেছে লম্বা সরু একটা মাটির চিম্‌নি। তার চারপাশ দিয়ে পাতলা একটা ধোঁয়ার ঢেউ উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। এত দূরে জানলার শার্সির ওপরে আগুনের শব্দটা অনেক মৃদু শোনায়, রেশমি কাপড়ের খস্‌খসের মতো। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, আগুনের দ্যুতিতে অপরূপ দেখাচ্ছে কারখানাটা, ঠিক যেন গির্জার উপাসনা-বেদী। এই আশ্চর্য দৃশ্য দুর্নিবার আকর্ষণে টানে, কিছুতেই চোখ ফেরানো যায় না।

একটা ভারী ভেড়ার চামড়ার জামা আমি মাথায় গলিয়ে নিলাম। কার যেন জুতো ছিল সামনে পড়ে, সেটাই পরে দিয়ে থপ থপ করে এগিয়ে গেলাম উঠোনের দিকে, তারপর অলিন্দে এসে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতেই আমার সমস্ত চেতনা অবশ হয়ে এল — দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা, প্রচণ্ড গর্জনে কানে তালা ধরে যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে দাদামশাইয়ের, মামার আর গ্রিগরির চিৎকার। এর ওপরে দিদিমার কাণ্ড দেখে ভয়ে তটস্থ হয়ে গেলাম। দিদিমা করেছেন কি, একটা খালি বস্তা মাথায় জড়িয়েছেন, আস্তাবল থেকে একটা কাঁথা টেনে এনে জড়িয়েছেন গায়ে আর তারপর জ্বলন্ত কারখানার দিকে ছুটে চলেছেন আর চিৎকার করছেন:

'ওরে হাঁদার দল, কারখানার ভিতরে সালফিউরিক এসিড আছে যে! ওই এসিডে আগুনের ছোঁয়া লাগলে আর রক্ষে আছে? উড়িয়ে নিয়ে যাবে যে সব।'

দাদামশাই আর্ত স্বরে চিৎকার করছেন, 'গ্রিগরি... ধরো... ধরো, ওকে যেতে দিও না... কি সর্বনাশ, ধরতে পারলে না তো গ্রিগরি... দেখো, আর ফিরে আসতে হচ্ছে না!..'

কিন্তু দিদিমা ফিরে এসেছেন। সর্বাঙ্গ দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, মাথা ঝাঁকুনি

দিচ্ছেন; দু-হাতে সালফিউরিক এসিডের মস্ত একটা পাত্র, সেই পাত্রের ওজনে নুয়ে পড়েছেন একেবারে।

প্রচণ্ড কাশির দমক সামলাতে সামলাতে ভাঙা ভাঙা গলায় দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন, 'কর্তা, আস্তাবল থেকে ঘোড়াটাকে বার করে আনো... ওরে, হাঁ করে দেখছিস কি? এই কাঁথাটা টেনে খুলে নে আমার গা থেকে... দেখছিস না চারদিকে আগুন ধরে গেছে?'

কাঁথাটায় ধোঁয়া উঠছে। দিদিমার কাঁধ থেকে তাড়াতাড়ি কাঁথাটা টেনে নিল গ্রিগরি, তারপর একটা কোদাল নিয়ে প্রচণ্ডভাবে কাজে লেগে গেল। চাঁই চাঁই তুষার নিয়ে কারখানার দরজার ভিতরে আগুনের মধ্যে ফেলছে। একটা কুড়ুল হাতে নিয়ে গ্রিগরির চারদিকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে ইয়াকভ-মামা। দাদামশাই চলেছেন দিদিমার পিছনে পিছনে, গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার ছিটিয়ে দিচ্ছেন দিদিমার গায়ে। এসিডের পাত্রটা নিয়ে একটু দূরে সরে এলেন দিদিমা, বরফ দিয়ে চাপা দিলেন পাত্রটাকে, তারপর ছুটে এলেন সদর দরজা খুলে দেবার জন্যে। পাড়ার লোকেরা ছুটতে ছুটতে এসেছিল, সদর দরজা খুলে দিয়ে তাদের সকলকে কাকুতি-মিনতি করে দিদিমা বলতে লাগলেন, 'আপনারা পাড়ার লোক, আসুন আমাদের সঙ্গে আপনারাও একটু হাত লাগান। আমাদের এই গোলাঘরটা যে-করে হোক্ বাঁচাতে হবে। গোলাঘরে যদি আগুন লাগে তাহলে খড়ের গাদাতেও আগুন ছড়াবে। এই গোটা বাড়িটাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে একেবারে। তা যদি হয় তো আশেপাশের আপনাদের বাড়িগুলোও আগুন থেকে বাঁচবে না। আসুন আপনারা, সকলে হাত লাগিয়ে গোলাঘরের চালাটা আগে খুলে ফেলুন। খড়ের গাদাটাও আছে, ওটাকে কোদালে করে সরিয়ে দিন বাগানের দিকে! ওকি গ্রিগরি, শুধু মাটিতে বরফ ফেলে লাভ কি? উঁচু দিকেও খানিকটা ছুঁড়ে দাও। আর ইয়াকভ, তোর ওই ছুটোছুটি বন্ধ কর্ তো দেখি। কোদাল আর কুড়ুল নিয়ে এসে সবার হাতে হাতে দে! আসুন আপনারা, সকলে হাতে হাত লাগিয়ে পড়শীর উপযুক্ত কাজ করুন। ভগবান সহায় আছেন!'

আগুনের মতো দিদিমার দিকেও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। আগুনের লক্‌লকে শিখা দিদিমাকে যেন গ্রাস করতে চাইছে; উজ্জ্বল লাল আভায় আলোকিত হয়ে কালো একটা ছায়ার মতো দিদিমা ছুটোছুটি করছেন, সর্বত্র দেখা যাচ্ছে তাঁকে, সবদিকে তিনি চোখ রাখছেন, সবাইকে হুকুম করছেন।

শারাপ ঘোড়াটা ছুটে এসেছে উঠোনের মাঝখানে, পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাদামশাই ঘোড়ার লাগামটা ধরেছিলেন, টাল সামলাতে না পেরে ছিট্‌কে পড়লেন। আগুনের আভায় ঘোড়াটার ঘূর্ণায়মান চোখদুটো রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে আর ঝল্‌সে উঠেছে, কিছুতেই ঘোড়াটাকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। সামনের দুপায়ে জোরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা। দাদামশাই ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

'গিন্নী ঘোড়া সামলাও!' চিৎকার করে বললেন তিনি।

দিদিমা এগিয়ে এলেন, তারপর দু-হাত প্রসারিত করে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন ঘোড়াটার সামনে। ঘোড়াটা বশ মানল; নরম সুরে দু-একবার চিঁহি ডাক ছেড়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে দু-একবার আগুনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল শেষকালে।

'ভয় কী রে?' সান্ত্বনা দেবার সুরে দিদিমা বললেন, তারপর লাগামটা হাতে নিয়ে, ঘোড়ার ঘাড়ে আদর করে চাপড় মারতে মারতে বললেন, 'এই তো আমি আছি। হ্যাঁ রে দুষ্টু পুঁচকে ইঁদুর, তোর বিপদের সময়ে আমি কাছে থাকব না, এই বুঝি ভাবিস তুই?'

দিদিমার চেয়ে আকারে তিন গুণ বড়ো সেই পুঁচকে ইঁদুর কথাগুলো শুনে অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল; যেতে যেতে দিদিমার টক্‌টকে মুখখানার দিকে তাকিয়ে চিঁহি-চিঁহি করে ডাক ছাড়ল কয়েক বার।

ওদিকে ইয়েভগেনিয়া-ধাই বাচ্চাদের একসঙ্গে জড়ো করে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসেছে। কাপড়-জড়ানো বাচ্চাগুলোকে দেখাচ্ছে পোঁটলার মতো; পোঁটলাগুলোর ভিতর থেকে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন বেরিয়ে আসছে।

দাদামশাইকে ইয়েভগেনিয়া-ধাই বলল, 'ভাসিলি ভাসিলিচ, লেক্সেইকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

দাদামশাই জবাব দিলেন, 'যাও, যাও, এক্ষুণি বাইরে চলে যাও!'

অলিন্দের সিঁড়ির নিচে আমি লুকিয়ে রইলাম, যাতে ইয়েভগেনিয়া-ধাই খুঁজে পেয়ে আমাকে শুদ্ধ বাইরে না নিয়ে যায়।

কারখানার ছাদটা ভেঙে পড়েছে। বেরিয়ে পড়েছে ছাদের কঙ্কাল, আকাশের পটভূমিতে মোটা মোটা কড়িকাঠ পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে জ্বলন্ত কড়িকাঠ থেকে। আর এই কঙ্কালের ভিতর থেকে বিস্ফোরণের মতো দমকে

দমকে বেরিয়ে আসছে লাল সবুজ আর নীল আগুনের শিখা, লক্‌লকে জিভ বাড়িয়ে দিয়েছে উঠোন পর্যন্ত। উঠোনে অনেক মানুষের ভিড়; কোদালে বরফ ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারা এই প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড নেবাতে চেষ্টা করছে। আগুনে ঘেরা গামলা, টগ্‌বগ করে ফুটছে গামলার ভিতরকার তরল পদার্থ। রাশি রাশি ধোঁয়া উঠছে, ঘন ধোঁয়ার মেঘে ভরে গেছে উঠোনটা। বিশ্রী রকমের সব গন্ধ, আর সেই ধোঁয়ায় চোখে জল আসে। সিঁড়ির তলা থেকে আমি গুটি-গুটি বেরিয়ে আসতেই পড়ে গেলাম একেবারে দিদিমার সামনা-সামনি।

দিদিমা হাঁক দিলেন, 'যা এখান থেকে! এখানে ঘুরঘুর করছিস, একেবারে পিষে যাবি যে! যা এক্ষুণি বাইরে!'

এমন সময় টগবগিয়ে ঘোড়ায় চেপে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল পেতলের হেল্‌মেট মাথায় একজন অশ্বারোহী। লাল্‌চে বাদামী রঙের ঘোড়াটার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। অশ্বারোহীর হাতে চাবুক, শাসানির ভঙ্গিতে চাবুকটা তুলে সে হাঁক দিতে লাগল:

'হট্‌ যাও! হট্‌ যাও!'

শোনা যাচ্ছে ঢঙ ঢঙ শব্দে ঘণ্টা বাজার শব্দ। যেন উৎসব-দিনের মতো আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠেছে চারদিক। অলিন্দে দিদিমা আমায় ঠেলে বললেন:

'কথা কানে ঢোকেনি বুঝি? যা বলছি এখান থেকে!'

ঠিক এই মুহূর্তে দিদিমার আদেশ কিছুতেই অমান্য করা চলে না। আমি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম এবং আবার দাঁড়ালাম জানলার পাশে। কিন্তু জানলার সামনেই কালো কালো একদল মানুষের ভিড়ে আগুনটা আড়াল হয়ে গেছে। শুধু দেখা গেল লোকের মাথার শীতের কালো টুপি আর ক্যাপ আর তারই ফাঁকে ফাঁকে এক-একবার ঝল্‌সে উঠছে পেতলের হেল্‌মেট।

দমাদম পিটিয়ে আর জল ঢেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিবিয়ে ফেলা হল। মানুষের ভিড়কে দূরে সরিয়ে দিল পুলিস। তারপর এক সময়ে আমার দিদিমা এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে।

'কে, কে এখানে? ও, তুই? ঘুমোসনি বুঝি? ভয় পেয়েছিস? ভয় পাস্‌নে। ভয়ের আর কিচ্ছু নেই। আগুন নিবিয়ে ফেলা হয়েছে।'

দিদিমা আমার পাশে বসলেন, তারপর একটিও কথা না বলে দুলতে লাগলেন। আবার সেই নিঃশব্দ রাত্রি আর সেই অন্ধকার ফিরে এসেছে। ভালো লাগছে আমার। কিন্তু সেই আগুন আর নেই!

দাদামশাই এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

'গিন্নী?'

'উঁ?'

'পুড়ে-টুড়ে যাওনি তো?'

'না, তেমন কিছু নয়।'

ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালেন দাদামশাই। দেশলাইয়ের নীল আলোয় তাঁর ঝুলকালিমাখা কাঠবেড়ালির মতো ছোট মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। টেবিলের মোমবাতিটা জ্বালিয়ে তিনি এসে ধীরেসুস্থে একেবারে গা ছেড়ে দিয়ে বসলেন দিদিমার পাশে।

'একটু হাতমুখ ধুয়ে এলে পারতে।' দিদিমা বললেন। দিদিমা নিজেও ঝুলকালি মেখে বসে আছেন, তাঁর গা থেকেও ধোঁয়ার গন্ধ বেরোচ্ছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাদামশাই বললেন, 'মাঝে-মাঝে তোমাকে ঈশ্বর তাঁর করুণার পরিচয় দেন। অকস্মাৎ বুদ্ধি জোগান।'

দিদিমার কাঁধের ওপর মৃদু চাপড় দিতে দিতে হাসিমুখে তিনি বলে চলেন:

'অল্প কয়েক মিনিটের জন্য, সামান্য ক্ষণের জন্য হলেও তিনি বুদ্ধি জোগান।'

দিদিমাও মুচকে হাসছিলেন এবং কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে ভুরু কুঁচকিয়ে দাদামশাই বললেন:

'এই গ্রিগরিটাকে দূর করে দিতে হবে। ওর অসাবধানেই তো এই কাণ্ড হল। ওকে দিয়ে আর কিচ্ছু কাজ হবে না। ওর দিন অনেক আগেই ফুরিয়েছে। ওদিকে দেখ, বোকা ইয়াকভটা বারান্দায় বসে বসে কান্না শুরু করে দিয়েছে। তুমি বরং একটু ইয়াকভের কাছে যাও গিন্নী...'

দিদিমা উঠে দাঁড়ালেন, তারপর একটা হাত তুলে আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে বেরিয়ে চলে গেলেন।

'কী হে ছোক্‌রা, আগাগোড়া কাণ্ডটা দেখলে তো?' আমার দিকে না ফিরেই দাদামশাই নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'দিদিমাকে কী মনে হয় তোমার? আর ভুলে যেও না যেন, তোমার দিদিমা বুড়ী হয়েছে... অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে, অনেক দুঃখ সয়েছে... তবুও দেখলে তো, মানুষ বলতে এই একজন... বাকি সব — ছ্যাঃ।'

কিছুক্ষণ একটিও কথা না বলে তিনি ঘাড় নিচু করে বসে রইলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মোমবাতির পোড়া সল্‌তেটা টোকা দিয়ে ভেঙে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে:

'তুমি ভয় পাওনি তো?'

'না।'

'এই তো চাই। ভয় পাবার কি আছে? কিচ্ছু নেই।'

বিরক্তির সঙ্গে গা থেকে জামাটা খুলে ফেললেন, তারপর রান্নাঘরের অন্ধকার কোণে গেলেন হাত-মুখ ধোবার জন্যে।

'নেহাৎ গো-মুখ্যু না হলে কারও বাড়িতে আগুন লাগে?' মেঝের ওপরে পা ঠুকতে ঠুকতে উচ্চকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, 'এবার থেকে নিয়ম হয়ে যাওয়া উচিত যে যার বাড়িতে আগুন লাগবে তাকে ধরে নিয়ে আসা হবে খোলা ময়দানে। কারণ সে লোক হয় বোকা নয় চোর, তা ও দুয়েতে কোনই তফাৎ নেই, আর সেই জন্যে শাস্তি দেওয়া উচিত তাকে। ধরে ধরে জনকয়েক লোককে এমনি শাস্তি দিতে পারলেই—ব্যস সব ঠান্ডা! আর কারও বাড়িতে আগুন লাগবে না!.. ওখানে বসে আছ কেন হে ছোকরা? শুতে-টুতে যাও!'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি শুতে গেলাম। কিন্তু সে-রাত্রে ঘুম আমার কপালে ছিল না। সবেমাত্র বিছানায় শুয়েছি এমন সময় প্রচণ্ড একটা অমানুষিক চিৎকার আমাকে বিছানা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার আমি ছুটে গেলাম রান্নাঘরে। দেখলাম, রান্নাঘরের মাঝখানে মোমবাতি হাতে খালি গায়ে দাদামশাই দাঁড়িয়ে আছেন; মোমবাতিটা তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে কাঁপছে, অনবরত তিনি এক পা থেকে আর-এক পায়ে শরীরের ভর দিচ্ছেন। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে একটুও নড়ছেন না।

রুদ্ধ স্বরে তিনি বলছেন, 'কী হয়েছে গিন্নী? ইয়াকভ, বল্‌ না কী হয়েছে?'

ছুটে এসে চুল্লির ওপর উঠে আমি এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে লুকিয়ে রইলাম। ঠিক আগুন লাগার সময় যেমন অবস্থা হয়েছিল তেমনি আবার সারা বাড়িতে প্রচণ্ড একটা হৈ-হট্টগোল- ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। ভীষণ চিৎকার ঠিক যেন একটা ছন্দের তালে তালে এসে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে দেওয়াল আর ছাদের গায়ে। পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন আমার দাদামশাই আর মামা। দিদিমা দুজনকেই ধমক দিয়ে রান্নাঘর থেকে চিৎকার

করে বার করে দিলেন। ওদিকে গ্রিগরি প্রচণ্ড সোরগোল তুলে চুল্লির মধ্যে কাঠ পুরে চলেছে। জল গরম করবার বয়লারগুলির কয়েকটাতে সে জল ভরে দিয়ে গেল। চলাফেরা করছে আস্ত্রাখানের উটের মতো ঘাড় নাড়তে নাড়তে।

দিদিমা হুকুম করলেন, 'আগে আগুনটা ঠিক করো দেখি!'

কিছু জ্বালানি কাঠ নামিয়ে নেবার জন্যে গ্রিগরি চুল্লির ওপরে উঠে এল। আমার পায়ের সঙ্গে তার পায়ের ছোঁয়া লাগতেই আঁতকে চিৎকার করে উঠল সে:

'কে? কে এখানে? ওঃ তুই! কী ভয় পাইয়েই দিয়েছিলি! এমন বিদকুটে স্বভাব তোর, যেখানে তোর আসার কোনো দরকার নেই, ঠিক সেখানেই আসা চাই।'

'আচ্ছা, এত হৈচৈ কিসের?'

চুল্লির ওপর থেকে নিচে লাফিয়া নেমে শান্ত স্বরে সে জবাব দিল, 'তোর মামী নাতালিয়ার বাচ্চা হবে।'

আমার মনে পড়ে, আমার মা'র যখন বাচ্চা হয়েছিল তখন কিন্তু মা এমন অমানুষিক চিৎকার করেনি।

চুল্লি জ্বালিয়ে তার ওপরে জলের পাত্রগুলি চাপিয়ে দিয়ে গ্রিগরি আবার ওপরে উঠে এল। পকেট থেকে একটা পোড়ামাটির পাইপ বার করে দেখাল আমাকে:

'এই দ্যাখ্, চোখ ভালো করবার জন্যে তামাক খেতে শুরু করেছি। তোর দিদিমা বলেছিল নস্যি নিতে কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, নস্যি নেওয়ার চেয়ে তামাক খাওয়া ঢের ভালো...'

চুল্লির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে সে তাকিয়ে রইল মোমবাতির মিটমিটে আলোর দিকে। তার গালে আর কানে বিশ্রীরকম কালিঝুলি লেগেছে, কামিজটা ছেঁড়া, আর তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আংটার মতো উঁচু উঁচু পাঁজরার হাড়। চোখের চশমার একটা কাঁচ ফাটা আর সেই কাঁচ থেকে খসে পড়েছে বড়ো একটা টুকরো। ফাঁক দিয়ে লাল-লাল ভিজে-ভিজে চোখের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়; মনে হয় যেন চোখ নয়, দগ্‌দগে ঘা। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকটি সমানে কাৎরে চলেছে। শুনতে শুনতে গ্রিগরি পাতা-তামাক ঠেসে ভরে নিল পাইপটাতে। সে নিজেও অনেকটা যেন মাতালের মতো বিড়বিড় করে অনবরত কি বলে চলেছে।

'কী আগুন বাবাঃ... তোর দিদিমার হাত-টাত নিশ্চয়ই ঝল্‌সে গেছে...

ওই পোড়া হাত নিয়ে কি করে যে প্রসব করাবে জানি না... তোর মামীমার কথা ভুলেই গিয়েছিল সকলে... আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তো তার কাৎরানি শুরু হয়... ভয়ে কাৎরাতে শুরু করেছিল... দেখছিস তো, একটি জীবন্ত মানুষকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসা কী শক্ত কাজ... কিন্তু তবুও স্ত্রীলোকের কাণাকড়িও দাম নেই। প্রত্যেকটি স্ত্রীলোককে সম্মান করে চলা উচিত — অর্থাৎ মাকে, নয় কি? — তুই কিন্তু এ-কথাটি কখনো ভুলিস না ভাই!'

ঢুলতে ঢুলতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আবার প্রচন্ড একটা সোরগোলে ঘুম ভেঙে গেল। দুমদাম করে দরজা বন্ধ হচ্ছে, মাতালের মতো চিৎকার করছে মিখাইল-মামা, একসঙ্গে গোলমাল জুড়ে দিয়েছে সবাই। আর শুনতে পেলাম, দুর্বোধ্য ভাষায় কারা যেন কথা বলছে:

'স্বর্গের ফটক অবাধ উন্মুক্ত হবার সময় হয়েছে...'

'এক কাজ কর হে, খানিকটা বাতির তেল, খানিকটা রাম আর কাজল মিশিয়ে খেতে দাও দেখি ওকে... পরিমাণটা কি হবে জান? আধ গ্লাশ তেল, আধ গ্লাশ রাম আর টেবিল-চামচ কাজল...'

মিখাইল-মামা অনবরত একই কথা বলে চলেছে, 'আমাকে একটু দেখতে দাও, আমি একবার দেখব ওকে।'

মেঝের ওপরে দু-পা ছড়িয়ে বসে আছে সে, দু-পায়ের মাঝখানে মেঝের ওপর থুথু ফেলছে মাঝে মাঝে, দু-হাতে চাপড় দিচ্ছে মেঝের ওপরে। চুল্লির ওপরে তাতটা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল, সুতরাং আমি নীচে নেমে এলাম। কিন্তু মামার কাছে আসতেই মামা আমাকে এক-পায়ে জড়িয়ে ধরে এমন একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিল যে আমি চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলাম, মাথাটা ঠক্‌ করে লাগল গিয়ে মেঝের সঙ্গে।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'বোকা কোথাকার!'

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আমার মামা। তারপর থাবার মধ্যে আমাকে তুলে নিয়ে শূন্যে দোলাতে দোলাতে গর্জন করতে লাগল:

'তোকে আজ আমি উনুনের গায়ে পিষে মেরে ফেলব!'

আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলাম দাদামশাইয়ের কোলের ওপর আমি শুয়ে আছি। আইকনের নীচে তিনি বসে আছেন এবং আমাকে কোলের ওপর নিয়ে দোলা দিচ্ছেন। চোখের দৃষ্টি ছাদের দিকে নিবদ্ধ আর বিড়বিড় করে বলছেন তিনি:

'আর আমাদের কারও রেহাই নেই... একজনেরও নেই...'

তাঁর মাথার উপরে, আইকনের সামনেকার প্রদীপ জ্বলছে আর ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা মোমবাতি। বাইরে শীতকালের কুয়াশাম্লান ভোরের আবির্ভাব জানলা দিয়ে দেখা যায়।

আমার ওপরে ঝুঁকে পড়ে দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'যন্ত্রণা হচ্ছে?'

সারা শরীরে যন্ত্রণা। ভিজে মাথাটা, শরীরটা হয়ে উঠেছে সীসের মতো। কিন্তু এসব কথা বলবার ইচ্ছে আমার নেই — চারদিকে তাকিয়ে অদ্ভুত সব লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি; ঘরের মধ্যে চেয়ারগুলোতে যারা বসে আছে তাদের অধিকাংশকে আমি চিনি না। বেগুনে রঙের আল্‌খাল্লা পরে বসে আছে একজন পুরোহিত, চশমা চোখে আর সামরিক উর্দি গায়ে একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ, এবং আরো অনেকে। কাঠের মূর্তির মতো সকলে স্থির হয়ে বসে আছে। কাছেই কোথায় যেন জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে আর উদগ্রীব হয়ে সেই শব্দ শুনছে সকলে। পিঠের দিকে দুটো হাত রেখে ইয়াকভ-মামা টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

দাদামশাই বললেন, 'ইয়াকভ ছেলেটাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দে তো।'

মামা আমাকে ইসারায় ডাকল এবং আমরা পা টিপে টিপে দিদিমার ঘরের দিকে চললাম। তারপর আমি যখন বিছানায় গুটিসুটি হয়ে শুয়েছি, এমন সময় মামা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'তোর নাতালিয়া-মামী গেছে রে...'

খবরটা শুনে খুব বেশি অবাক হলাম না। অনেককাল ধরেই আমি নাতালিয়া-মামীকে এ-বাড়ির কোথাও দেখতে পাইনি; নাতালিয়া-মামী একবারও রান্নাঘরে আসেনি বা খাবার টেবিলে এসে বসেনি।

'দিদিমা কোথায়?'

'ওখানে।' বলে হাত বাড়িয়ে দেখাল মামা। তারপর যেমনভাবে পা টিপে টিপে ঢুকেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই নগ্ন পায়ে বেরিয়ে গেল।

আমি বিছানায় শুয়ে রইলাম। উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি চারদিকে। অন্ধ আর পাকা চুলওলা শীর্ণ কতগুলি মুখ যেন জানলার শার্সি ঘেঁষে রয়েছে। কোণের দিকে ট্রাঙ্কের ওপরে একটা পোশাক ঝুলছে; আমি জানি ওটা দিদিমার পোশাক — কিন্তু তবুও এখন মনে হয়, একটা জীবন্ত প্রাণী ছায়া-ছায়া অন্ধকারে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। একটা চোখ দরজার দিকে রেখে বালিশে মুখ গুঁজে আমি শুয়ে থাকি, ইচ্ছে হয় পালিয়ে চলে যাই এ ঘর থেকে। বিশ্রী গরম ঘরটা, আর একটা শ্বাসরোধী ভারী গন্ধ — মনে

পড়ছে ৎসিগানকের মৃত্যুর দৃশ্য, সেই রান্নাঘরের মেঝের ওপরে রক্তের ধারা। আমার মাথাটা আর বুকের ভিতরটা ফুলে উঠেছে যেন; এ-বাড়িতে যে-সব দৃশ্য আমি দেখেছি, সেগুলো ঘষটে চলেছে আমার ভিতর দিয়ে শীতের রাস্তায় স্লেজগাড়ির মতো। আমাকে পিষে দিয়ে যাচ্ছে, আমার অস্তিত্বকে শুষে নিচ্ছে...

আস্তে আস্তে ঘরের দরজাটা খুলে গেল আর দিদিমা কাৎ হয়ে গলে এলেন দরজার ফাঁক দিয়ে। কাঁধের ধাক্কায় বন্ধ করে দিলেন দরজাটা, তারপর ঠাকুরের আইকনের সামনে নীল শিখার দিকে দু-হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালেন দরজায় ঠেস দিয়ে আর ছেলেমানুষের মতো কান্না-ভাঙা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন এক সময়ে:

'আমার এই হাত দুটো... কী যন্ত্রণা যে হচ্ছে...'

পাঁচ

সেই বছরেই বসন্তকালে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেল। ইয়াকভ রয়ে গেল শহরে আর মিখাইল গেল নদী পেরিয়ে। দাদামশাই পলেভায়া স্ট্রীটে একটি চমৎকার নতুন বাড়ি কিনলেন। বাড়িটির নিচুতলায় ছিল একটা শুঁড়িখানা আর ছাদের ওপরে ভারি স্বাচ্ছন্দ্যের ছোট একটি ঘর। বাড়ির পিছনে বাগান, বাগান পেরিয়ে এক নালা। নিষ্পত্র উইলো চারায় নালাটা ছেয়ে গেছে।

'এখানে দেখছি বেতের অভাব হবে না!' আমার দিকে চোখ ঠেরে মুচ্‌কি হেসে দাদামশাই বললেন। আমরা দুজনে বাগান দেখবার জন্যে বেরিয়েছিলাম, কাদাভর্তি প্যাঁচপেঁচে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম দুজনে। দাদামশাই বললেন, 'এবার আমি তোমাকে নিয়ে বর্ণপরিচয় শুরু করব। আর তখন এই বেতগুলো খুব কাজ দেবে।'

সারা বাড়িতে ভাড়াটে গিজগিজ করছে। নিজের ব্যবহারের জন্যে এবং অভ্যাগতদের বসবার জন্যে একটি মাত্র বড়ো ঘর দাদামশাই রেখে দিলেন এবং আমি আর দিদিমা আশ্রয় নিলাম ছাদের ওপরের ঘরে। আমাদের এই ঘরটিতে রাস্তার দিকে একটি জানলা আছে। এই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে তাকালে দেখা যায়, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে মাতালরা শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। টল্‌তে টল্‌তে তারা রাস্তা দিয়ে চলে, গলা

ফাটিয়ে চিৎকার করে আর ধুপ্‌ধাপ পড়ে রাস্তার ধারে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, এক-একজন লোককে ময়দার বস্তার মতো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু লোকগুলো আবার এগিয়ে আসে দরজার দিকে। দরজা খোলা-বন্ধ হওয়ায় ঠুন্‌ঠুন্‌ শব্দ পাওয়া যায়, আর শোনা যায় মর্‌চে-পড়া কব্‌জার কিচকিচ। তারপর মারামারি চলছে। ওপরের জানলা থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে খুব মজা লাগে আমার। রোজ সকালে দাদামশাই বেরিয়ে যান। মামারা দুটি আলাদা-আলাদা কারখানা খুলেছে; কারখানাগুলো যাতে চালু হয় সেই উদ্দেশ্যে দাদামশাই দেখাশোনা করতে যান; অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এবং মন মেজাজ খারাপ করে ফিরে আসেন সন্ধ্যার সময়।

দিদিমা ব্যস্ত থাকেন সেলাই, রান্না আর বাগান নিয়ে। সারা দিনে এক মুহূর্তও ফুরসৎ ছিল না তাঁর, অদৃশ্য এক সুতোর টানে মস্ত এক লাট্টুর মতো যেন অনবরত ঘুরপাক দিয়ে চলেছেন তিনি। মাঝে মাঝে নস্যি নেন, সশব্দে হাঁচেন, আর মুখের ঘাম মুছতে মুছতে আপন মনে বলেন:

'চিরকাল সব মানুষ যেন সুখী থাকে। আলিওশা, সোনা আমার, মানিক আমার, এতদিনে আমরা শান্ত ও নির্বিঘ্ন জীবন পেয়েছি। পুণ্যময়ী মেরীমাতার অশেষ কৃপায় এতদিনে আমাদের সমস্ত অশান্তি কেটে গেছে!'

তবে আমার কিন্তু সেই জীবনকে খুব বেশি শান্ত ও নির্বিঘ্ন বলে মনে হয় না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ভাড়াটেরা বাইরের উঠোনে আর এঘর থেকে ওঘরে ছুটোছুটি করে; পাশের ঘরের স্ত্রীলোক এঘরে হুড়মুড় করে ঢোকে; আর সব সময়েই তাদের কোথাও না কোথাও যাবার তাড়া পড়েছে, সব সময়েই তাদের কোনো না কোনো একটা কাজে দেরি হয়ে গেছে, সব সময়েই তারা কিছু না কিছু একটা করবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

'আকুলিনা ইভানোভনা!' দিদিমাকে তারা ডাকে।

আর এই ডাক শুনে আকুলিনা ইভানোভনারও ক্লান্তি নেই। তাঁর নিজস্ব অন্তরঙ্গতার ধরনে সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলেন, সবার কথা শোনেন মন দিয়ে। আর মাঝে মাঝে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে নস্যি গোঁজেন নাকের মধ্যে; মস্ত একটা লাল চেক্‌কাটা রুমাল দিয়ে পরিষ্কার ভাবে মুছে নেন নাক আর আঙ্গুল।

'উকুনের কথা বলছেন? উকুন তাড়াতে হবে?' বলেন তিনি, 'উকুনের হাত থেকে যদি বাঁচতে চান তাহলে একটি কাজ করতে হবে গিন্নী। স্নানঘরে গিয়ে আর-একটু ঘন ঘন স্নান করতে হবে। আর যদি পেপারমিণ্ট তেলের ধোঁয়া

দিয়ে শরীরটাকে মেজে নিতে পারেন তাহলে তো আর কথাই নেই। আর ধরুন যদি এমন হয় যে উকুন চামড়ার ওপরে না হয়ে ভিতরে হয়েছে, তাহলে করবেন কী জানেন — প্রথমে নেবেন বড় চামচের এক চামচ হাঁসের খাঁটি চর্বি, তারপর নেবেন চায়ের চামচের এক চামচ বিষ আর তিন ফোঁটা পারা; একটা খলের মধ্যে নিয়ে সাতবার জিনিসগুলোকে মেশাতে হবে। বাস্, তৈরি হয়ে গেল আপনার ওষুধ। শরীরের যেখানে উকুন হয়েছে সেখানে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিলেই ফল পাবেন। তবে খবরদার, হাড় বা কাঠের চামচ কক্ষণো ব্যবহার করবেন না যেন, তাহলে পারাটা নষ্ট হয়ে যায়; আর তামা বা রুপোর সঙ্গে যেন কিছুতেই ছোঁয়া না লাগে — সেটা শরীরের পক্ষে হবে খুবই ক্ষতিকর।'

জিজ্ঞেস করলেই যে ওষুধ বলেন তা নয়। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে কোনো একটি সমস্যা নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করে অবশেষে বলেন:

'আপনার অসুখের ওষুধ বাৎলানো আমার কর্ম নয় গিন্নী। আপনি বরং সাধু-আসাফের কাছে, পেচোরি মঠে যান।'

সব ব্যাপারেই আছেন তিনি। ধাইয়ের কাজ করেন, বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হলে মিটমাট করিয়ে দেন, ছেলেপুলের অসুখ হলে চিকিৎসা করেন। 'মেরীমাতার স্বপ্ন' আবৃত্তি করেন আর তাঁর কাছ থেকে শুনে শুনে অন্য মেয়েরা তা শিখে নেয় — 'গৃহস্থের কল্যাণে'। তাছাড়া সংসারের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে পরামর্শ দেন তিনি:

'শশা জরাতে তো ঝামেলা কিছু নেই। শশার গায়েই একরকম লেখা থাকে, কখন শশা দিয়ে আচার হবে। যদি দেখ যে শশা থেকে মাটি-মাটি বা অন্য কোনো গন্ধ ছাড়ছে না — তাহলেই হল। কেটে-ছাড়িয়ে নুন লাগাও, আর কোনো গোলমাল নেই — আচার হবেই। ভালো ক্ভাস* তৈরি করতে হলে পাঁচনটাকে ভালো করে ঘাঁটা দরকার। ক্ভাসের সঙ্গে মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু মিশ খায় না। কয়েকটা কিশমিশ কিংবা খানিকটা চিনি দেন -- চায়ের চামচের এক চামচ এক বালতির জন্যে। ভারেনেৎস** অবশ্য নানাভাবে তৈরি করা যায়। এই ধরুন গিয়ে আপনার দানিয়ুব অঞ্চলের লোকরা একভাবে জিনিসটা তৈরি করেন। আবার স্পেন বা ককেশাস অঞ্চলের লোকরা অন্যভাবে তৈরি করেন। একেক অঞ্চলে একেক রকম স্বাদ-গন্ধ...'

সারাটি দিন আমি দিদিমার পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করি। তিনি হয়তো

---

* গমজাতীয় ফসলের ঝাঁজালো আরক। — সম্পাঃ

** দই। — সম্পাঃ

বাগানে বা উঠোনে গেছেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে আছি। তিনি পাড়াপড়শীর বাড়িতে বেড়াতে যান, আমিও চলি সঙ্গে সঙ্গে। পাড়াপড়শীর বাড়িতে গিয়ে দিদিমা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে চা খেতেন আর নানা রকমের গল্প বলতেন। মনে আছে, দিদিমার শারীরিক উপস্থিতির একটা অংশের মতো হয়ে উঠেছিলাম আমি। এই সময়ের কথা ভাবতে বসলে আমার মনে শুধু এই অক্লান্ত ও দয়ালু বৃদ্ধার কথাই ভেসে ওঠে — আর কিছু মনে পড়ে না।

মাঝে মাঝে কোথা থেকে মা আসে, অল্প কিছুদিন থেকেই চলে যায় আবার। তেমনি উদ্ধত, তেমনি ঋজু, পৃথিবীর দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকায় তা ছিল শীতকালের সূর্যালোকের মতো নিরুত্তাপ ও ধূসর। কোনো বারেই খুব বেশিদিন মা থাকে না, আর যখন চলে যায়, পিছনে নিজের কোনো স্মৃতি রেখে যায় না।

একদিন দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা দিদিমা, তুমি কি ডাইনী?'

দিদিমা হেসে উঠলেন: 'পাগল ছেলের কথা শোনো! কি দেখে একথাটা তোর মনে এল রে?' তারপরেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে চিন্তান্বিত স্বরে বললেন, 'তুক্‌তাক মন্ত্র জানাটা অত সহজ কথা নয়! আমি কোত্থেকে জানব বল্‌? আমার তো অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত নেই। ওদিকে তোর দাদামশাইকে দ্যাখ্‌, ভারি পণ্ডিত লোক তোর দাদামশাই। কিন্তু ভগবান আমাকে বিদ্যেবুদ্ধির দিক থেকে একেবারেই অপাত্র মনে করেছেন।'

তারপর তিনি তাঁর জীবনের এক নতুন পরিচ্ছেদের কাহিনী শোনালেন আমাকে:

'আমিও ছেলেবেলায় তোর মতোই ছিলাম রে। একেবারে অনাথা, বাপ ছিল না। আমার মা ছিল নেহাতই গরীব; বিকলাঙ্গ বলে কোথাও কাজ পেত না। মা যখন খুবই ছোট তখন এক বড়োলোকের বাড়িতে কাজ করত। একবার রাত্রে লোকটার ভয়ে মা জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। ফলে তার পাঁজরে আর কাঁধে এমন চোট লাগে যে তার একটা হাত আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। আসল হাতটাই অর্থাৎ ডান হাতটাই অক্ষম হয় এভাবে। আর লেসবোনার কাজে মা ছিল ভারি পাকা। কিন্তু হলে কি হবে, সেই ভদ্রলোক যখন দেখলেন যে মাকে দিয়ে আর কোনো কাজই করানো চলবে না তখন তিনি মাকে স্বাধীনতা দিলেন এবং তার ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ভাগ্য বললেই তো আর হবে না, নুলো লোকের কি আর ভাগ্য থাকতে পারে?

সুতরাং ভিক্ষে করা ছাড়া গতি ছিল না! যে সময়ের কথা বলছি, তখন বালাখ্না অঞ্চল ছিল খুবই বর্ধিষ্ণু। ছুতোর আর লেসবোনার কাজে এক দল আরেক দলকে টেক্কা দিত। আমার মা আর আমি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতাম। শরৎকাল আর শীতকাল এভাবেই কাটত। তারপর যখন দেবদূত গাব্রিলো তলোয়ারের খোঁচায় তুষারকে তাড়িয়ে দিতেন আর পৃথিবীর ওপরে নেমে আসত ঝক্ঝকে বসন্ত — তখন আমরা বেরিয়ে পড়তাম দূরে। যতোদূর চোখ যায় শুধু চলতাম, যতোক্ষণ না পা একেবারে ভারী হয়ে উঠত। কত নতুন নতুন জায়গায় যে যেতাম আমরা। যেতাম মুরোম'এ, ইউরিয়েভেৎস্'এ, ভল্গা আর শান্ত ওকা নদীর ধারে ধারে নানা জায়গায়। কী ভালোই যে লাগত, বসন্তকালে আর গ্রীষ্মকালে হেঁটে হেঁটে দেশ ঘুরে বেড়াতে কি চমৎকার লাগে! তুলতুলে নরম মাটি আর ভেল্ভেটের মতো সবুজ ঘাস। মাঠেঘাটে মেরীমাতার আশীর্বাদের মতো ফুল ফুটে থাকে। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। আর সেই খোলা আকাশের নিচে অবারিত প্রান্তর — কার মন আনন্দে ভরে ওঠে না বল্! তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মার নীল চোখদুটো বুজে আসত আর তার গানের সুর ডানা মেলে উড়ে যেত স্বর্গের দিকে। ভারি মোলায়েম আর মিষ্টি গলা ছিল আমার মায়ের — মনে হত যেন বিশ্বপ্রকৃতি চুপ হয়ে যায় সেই গান শুনে, নিশ্বাস বন্ধ করে শোনে। ভিক্ষে করবার জন্যে ঘুরে বেড়াতেও কী ভালো লাগত যে তখন! কিন্তু যখন আমার বয়স হল নয় বছর তখন আর মা আমাকে নিয়ে ভিক্ষেয় বার হত না। আর মা'র পক্ষে এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার ছিল। সুতরাং মা বালাখ্নাতেই পাকাপাকি ডেরা বাঁধল। একা একাই দোর থেকে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াত, রবিবার দিন গিয়ে বসত গির্জার চাতালে। আর আমি থাকতাম বাড়িতে, বাড়িতে বসে বসে লেসবোনা শিখতাম। কিন্তু আমার মনে হত, কাজটা শিখতে বড়ো দেরি হচ্ছে আমার। তখন আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, কি করে মা'র কিছুটা সুসার করতে পারি। এজন্যে আমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম যে যখনই আমি কোনো লেসের নক্সা ঠিকমত বুনতে পারতাম না, আমার দুচোখ ভরে জল আসত। যাই হোক্, বছর দুয়েকের মধ্যেই কিন্তু আমি কাজটা শিখে নিয়েছিলাম। আর সারা শহরে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। যখনই কোনো বিশেষ ধরনের কাজ করাবার প্রয়োজন হত, সবাই আসত আমার কাছে, এসে বলত, "কই গো আকুলিয়া, কাজ এনেছি, মাকুতে সুতো পরাও।" শুনে কত আনন্দই যে হত আমার। তবে একথাও ঠিক যে আমার জাঁক করবার কিছু ছিল না,

সবই আমার মা'র কাছ থেকে শেখা। মা নুলো হাতে লেস বুনতে পারত না বটে, কিন্তু অপরকে কি-ভাবে শেখাতে হয় জানত। আর এই শিক্ষাটাই তো আসল কথা, যে লোক ভালোভাবে শেখাতে পারে তার দাম দশজন হাতের কাজের লোকের চেয়েও বেশি। যাই হোক্ নিজেকে আর ছোট ভাবতাম না। মাকে বললাম, "মা, তুমি কিন্তু আর ভিক্ষে করতে বেরুতে পারবে না, এই বলে দিলাম। আমিই এখন হাতের কাজ করে তোমাকে খাওয়াতে পারব।" মা উত্তর দিল, "উরে বাস রে! তোর টাকা তোরই থাক বাপু, তোর বিয়ের সময় যৌতুকে লাগবে।" এর কিছুদিন পরেই এল তোর দাদামশাই — তখন তার বাইশ বছর বয়স, তরুণকান্তি চেহারা, সহজেই চোখে পড়ে। তার আগেই সে বুর্লাকিদলের মোড়ল হয়েছে। তার মা আমাকে প্রথম দেখে বেছে নিল। যখন জানল, খুব গরীব আমরা আর আমি ভিখিরীর মেয়ে — তখনই ধারণা করে নিল যে আমি খুব খাটিয়ে বৌ হতে পারব... সে নিজে মিষ্টি রুটি বিক্রী করত আর ছিল খুব কড়া প্রকৃতির। যাক্ গিয়ে, মরা মানুষের নিন্দে করতে নেই... ঈশ্বর আমাদের সাহায্য না নিয়ে নিজেই সব দেখতে পান, তিনি দেখেন আর শয়তানদের তা ভালো লাগে।'

প্রাণ খুলে দরাজ গলায় দিদিমা হেসে উঠলেন। তাঁর নাকটা অদ্ভুতভাবে কাঁপতে লাগল, চোখদুটো গানের সুরের মতো আলতোভাবে আদর করতে লাগল আমাকে। ভাষায় যেটুকু বলা যায় তার চেয়েও অনেক বেশি তিনি বললেন চোখের দৃষ্টিতে।

একদিনের কথা মনে আছে, এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যা। দিদিমা আর আমি দাদামশাইয়ের ঘরে বসে চা খাচ্ছিলাম। দাদামশাইয়ের শরীরটা সুস্থ ছিল না, তিনি বসেছিলেন বিছানার ওপরে। গায়ে জামা ছিল না, কাঁধের ওপরে চাপানো ছিল মস্ত একটা তোয়ালে, মাঝে মাঝে তোয়ালেটা দিয়ে তিনি কপালের প্রচুর ঘাম মুছছিলেন। ঘড়ঘড় শব্দ করে ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছিলেন, সবুজ চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল, মুখটা লাল আর ফুলো ফুলো। বিশেষ করে তাঁর ছোট ছোট খাড়া খাড়া কানদুটো লাল হয়ে উঠেছিল। একপাত্র চা নেবার জন্যে যখন তিনি হাত বাড়ালেন, তখন দেখলাম তাঁর হাতদুটো করুণভাবে কাঁপছে। ভারি শান্ত আর নিরীহ হয়ে উঠেছেন তিনি — তাঁর স্বভাবের সঙ্গে যা একেবারেই খাপ খায় না।

'তুমি আমাকে চিনি দিচ্ছ না কেন?' আদুরে শিশুর মতো আবদেরে গলায় দাদামশাই নালিশ জানালেন।

'চিনি দিচ্ছি না কারণ চিনির চেয়ে মধু তোমার শরীরের পক্ষে উপকারী।' সাদর তবু দৃঢ় স্বরে দিদিমা জবাব দিলেন।

তেমনি ঘড়ঘড় শব্দে নিশ্বাস নিতে নিতে, গলা দিয়ে হাঁসফাঁস শব্দ করতে করতে তাড়াতাড়ি গরম চা-টা গিলে ফেললেন তিনি আর বললেন, 'দেখো গিন্নী, আমাকে মরতে দিও না যেন।'

'তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। মরতে দেব না।'

'এই তো কথার মতো কথা। আমি যদি এখন মরে যাই তাহলে সমস্ত হিসেব গোলমেলে হয়ে যাবে — মনে হবে যেন কখনো আমি বেঁচে থাকিনি — সমস্তই নিরর্থক হবে।'

'এবার কথা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো তো দেখি।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে রইলেন তিনি। কালো ঠোঁটদুটো চাটতে লাগলেন জিভ দিয়ে। তারপর হঠাৎ এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলেন যেন কেউ তাকে চিম্‌টি কেটেছে।

'শোন গিন্নী, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় ইয়াকভ আর মিখাইলের বিয়ে দিতে হবে। বউ আর নতুন ছেলেপুলে হলে দুজনেই হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, কি বলো?'

শহরের বিবাহযোগ্যা কন্যাদের স্মরণ করে যেতে থাকেন দাদামশাই। আর দিদিমা একটিও মন্তব্য করেন না, বসে বসে শুধু গ্লাশের পর গ্লাশ চা খেয়ে যান। এদিকে আমি কোথায় যেন একটু অশোভন আচরণ করেছি, তারই শাস্তি হিসেবে দাদামশাই বাইরে যাওয়া বন্ধ করেছেন আমার। সুতরাং আমি জানলার সামনে বসে আছি, বসে বসে তাকিয়ে দেখছি বাইরের দিকে — সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর তার ঝক্‌ঝকে আলোয় কি চমৎকার লালই না দেখাচ্ছে আশেপাশের বাড়ির জানলাগুলো।

নিচে বাগানে বার্চগাছের ডালগুলোর মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে গুবরে পোকা গুন্‌গুন শব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। পাশের বাড়ির উঠোন থেকে আসছে পিপে তৈরি কাজের শব্দ — কাছেই কোথা থেকে শুনতে পাচ্ছি ছুরি শানানো চাকার আওয়াজ। বাগান পেরিয়ে নালা, সেখানে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে খেলা করছে ছোট ছেলেরা — শোনা যাচ্ছে তাদের কলধ্বনি। আমারও ভারি ইচ্ছে করছে বাইরে গিয়ে ওই ছেলের দলে যোগ দিই, আসন্ন প্রদোষের বিষণ্ণতায় মনটা ভারী হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ দাদামশাই একটা নতুন বই বার করলেন। হাতের তালুর ওপরে বইটা দিয়ে সশব্দে চপেটাঘাত করে খুশিভরা স্বরে ডাকলেন আমাকে:

'ওহে অকালকুষ্মান্ড, ওহে লম্বকর্ণ, এবার এদিকে এসো দিকি! বসো এখানে। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ এই চিহ্নটা? বলো, অ-য়ে অজগর, আ-য়ে আম, হ্রস্ব ই-য়ে ইঁদুর। আচ্ছা, এবার বল্ তো দেখি এটা কী?'

'আ-য়ে আম।'

'ঠিক হয়েছে। আচ্ছা এটা?'

'হ্রস্ব ই-য়ে ইঁদুর।'

'হল না! এটা হচ্ছে অ-য়ে অজগর। আচ্ছা, এবার এই চিহ্নটাকে ভালো করে দ্যাখ্, এটা হচ্ছে দীর্ঘ ঈ-য়ে ঈগল। হ্রস্ব উ-য়ে উট। পড়লি তো? এবার বল্ দিকিনি এটা কি?'

'হ্রস্ব উ-য়ে উট।'

'ঠিক হয়েছে। এটা?'

'দীর্ঘ ঈ-য়ে ঈগল।'

'বাঃ, বেশ বেশ। এটা?'

'অ-য়ে অজগর।'

দিদিমা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবারে দাদামশাইকে বললেন, 'তুমি অত কথা বোলো না, একটু চুপ করে শুয়ে থাকো।'

'থামো তো তুমি। বরং এতেই আমি ভালো থাকছি। ভাবনাচিন্তাগুলো মনের মধ্যে থাকছে না। পড়ে যা লেক্সেই।'

দাদামশাই তাঁর উষ্ণ ভিজে-ভিজে একটা হাত আমার কাঁধের ওপর দিয়ে নিয়ে গেছেন; সে হাত দিয়েই তিনি বইয়ের অক্ষরগুলো আমাকে দেখাচ্ছেন। আর অপর হাতে বইটা ধরে আছেন প্রায় আমার নাকের ডগায়। ভিনিগার, ঘাম আর সেঁকা পেঁয়াজের একটা মেশানো গন্ধ আসছে তাঁর গা থেকে — আর এই গন্ধে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা এসেছে তাঁর মধ্যে, আর আমার কানের পাশে অনবরত চিৎকার করে বলেছেন:

'ভ-য়ে ভল্লুক, ম-য়ে মহিলা।'

শব্দগুলো আমার কাছে খুবই পরিচিত কিন্তু স্লাভনিক অক্ষরগুলোর সঙ্গে কোনো মিল নেই। ভ-অক্ষরটার সঙ্গে ভল্লুকের যতোটা মিল আছে, তার চেয়ে বেশি মিল আছে পোকার সঙ্গে। দীর্ঘ ঈ-কে দেখে কিছুতেই ঈগল বলে মনে হয় না, ওই অক্ষরটার সঙ্গে কুজোপিট গ্রিগরির মিলটাই যেন

বেশি। পেটমোটা ব-কে দেখে আমার মনে হয়, দিদিমা ও আমি দুজনে যেন একসঙ্গে রয়েছি। আর সমস্ত অক্ষরগুলোর মধ্যেই কোথায় যেন কি একটা আছে যা ঠিক আমার দাদামশাইয়ের মতো। দাদামশাই একেবারে উঠেপড়ে লেগেছেন, একটির পর একটি অক্ষর চিনিয়ে চলেছেন আমাকে। এক-একবার অক্ষরগুলোকে ঠিক পর-পর, যেটির পর যেটি আসে, তেমনিভাবে ধরছেন, এক-একবার ধরছেন উল্‌টেপাল্‌টে। তাঁর উত্তেজনা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছে, আমিও ঘর্মাক্ত-কলেবর হয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলেছি। আমার কান্ড দেখে দাদামশাইয়ের বোধ হয় খুব মজা লাগছে। হেসে উঠতে গিয়ে তিনি ভয়ানকভাবে কেশে উঠলেন।

'দেখ, দেখ, গিন্নী, ছেলেটার কান্ড দেখ!' একহাতে বই এবং অন্য হাতে বুক চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন, 'ওরে আস্ত্রাখানী শয়তান, এমন হাঁকডাক শুরু করেছিস কেন রে?'

'আমি করছি না আপনি করছেন...'

দাদামশাই ও দিদিমার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভারি ভালো লাগছে আমার। টেবিলের ওপরে দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে, দুই হাতের মধ্যে গাল রেখে দিদিমা বসে আছেন আর আমাদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছেন।

'তোমরা থামো বাপু এবার দুজনে। মাথার খিল খুলে যাবে যে!' বললেন দিদিমা।

দাদামশাই এবারে সুর নরম করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, বুঝলি আমার না হয় অসুখ হয়েছে তাই আমি চেঁচাচ্ছি। কিন্তু তুই চেঁচাচ্ছিস কেন?'

ঘামে-ভেজা মাথাটা নাড়তে নাড়তে তারপর দিদিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাতালিয়া বেঁচে থাকতে যে-কথাটা বলেছিল তা কিন্তু ঠিক নয়। নাতালিয়া বলেছিল, ওর স্মৃতিশক্তি নাকি খুব দুর্বল। কিন্তু আমি তো দেখছি, ঘোড়ার মতো সব কথা মনে রাখতে পারে ও। ঠিক আছে খাঁদা-দাদু, এবার উঠেপড়ে লাগো!'

তারপরে একসময়ে তেমনি হাসতে হাসতে ও ঠাট্টা-তামাসা করতে করতে আমাকে বিছানা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন:

'বাস্‌ আর নয়। বইটা নিয়ে যা আর কষে পড়তে শুরু করে দে। কাল যদি আমাকে সবকটা অক্ষর ঠিক-ঠিক বলতে পারিস তবে আমি তোকে পাঁচ কোপেক্‌ দেব।'

হাত বাড়িয়ে আমি বইটা নিতে গেলাম। তিনি আমাকে নিজের দিকে টেনে নিলেন, তারপর ভাঙা-ভাঙা গলায় বিষণ্ণস্বরে বলতে লাগলেন:

'কী ভাই, তোর মা'র কি একটুও দরদ নেই রে? নইলে এমন ছেলেকে ফেলে চলে যায়?'

'আবার কেন এসব কথা তুল্‌ছ? কিছু লাভ আছে?' বলে উঠলেন দিদিমা।

'বলি কি আর সাধে? আমার দুঃখ বলতে আমাকে বাধ্য করে যে... ইস্‌, ইস্‌, এমন মেয়েটা উচ্ছন্নে গেল!'

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন আমাকে।

'যা, এবার বাইরে একটু খেলা কর গিয়ে। কিন্তু খবরদার রাস্তায় যাসনে যেন — শুধু উঠোনে আর বাগানে খেলা করবি, বুঝলি?'

বাগানে যাবার জন্যেই আমি এতক্ষণ উস্‌খুস্‌ করছিলাম। জানি, যে-মুহূর্তে আমি বাগানে গিয়ে বাঁধের উপর দাঁড়াব, উল্‌টো দিকের ঝোপঝাড় থেকে ছেলের দল আমার দিকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করবে। আমিও তাই চাই, আমিও পাল্‌টা পাথর ছুঁড়তে শুরু করি।

আমাকে দেখলেই ওরা চিৎকার করে ওঠে, 'ওই আসছে রে, টুস্‌কা আসছে। নিয়ে আয় রে তাড়াতাড়ি!' তারপর সবাই মিলে ওদের অস্ত্রাগারের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে লেগে যায়।

টুস্‌কা বলে ওরা কি বোঝাতে চায় আমি জানি না। সুতরাং আমি একটুও অপমানিত বোধ করি না। কিন্তু যখন দেখি, একদিকে এক দঙ্গল ছেলে, আরেকদিকে আমি একা — তখন ভারি মজা লাগে আমার। একটিমাত্র পাথর ঠিক মতো তাক্‌ করে ছুঁড়তে পারলে শত্রুকে, ওরা পোঁ পোঁ করে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে লুকোয় ঝোপের আড়ালে। লড়াইটা হয় অত্যন্ত নির্দোষ ধরনের, এর মধ্যে কোনো রকম রাগারাগি ফাটাফাটি নেই বা লড়াইয়ের পর মনের মধ্যে কোনো ক্ষোভও থাকে না।

বর্ণপরিচয় হতে আমার খুব বেশি সময় লাগল না। আর বোধ হয় এই জন্যেই দাদামশাই আমার দিকে ক্রমশ বেশি করে নজর দিতে লাগলেন এবং ঘন ঘন বেতমারার অভ্যেসটা ছেড়ে দিলেন। তার মানে এই নয় যে আমি খুব সুবোধ বালক হয়ে উঠেছিলাম। বরং যতোই আমার বয়স ও সাহস বাড়ছিল ততোই দৌরাত্ম্য বাড়ছিল, আগের চেয়ে বেশি করেই দাদামশাইয়ের বিধিনিষেধ

ভাঙতে শুরু করলাম। কিন্তু তবুও তিনি পিঠে বেত না ভেঙে আমায় শুধু তিরস্কার করতেন আর ঘুষি উঁচিয়ে শাসাতেন।

আমার মনে হতে লাগল যে দাদামশাইয়ের হাতে নিতান্ত অকারণেই আমি বহু মার খেয়েছি। একদিন সে-কথাটা সোজাসুজি তাঁর মুখের ওপরে বললাম।

উত্তরে তিনি আমার থুত্নিটা একটু নেড়ে দিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'কি ব-ল্-লি-ই-ই কি-ই-ই?' তালুর সঙ্গে জিভের একটা শব্দ করে টেনে টেনে বললেন তিনি।

'ওরে ছুঁচো, ওরে গিদ্ধড়, তোকে উত্তম-মধ্যম দেব কি দেব না, তা ঠিক করব আমি — তুই ব্যাটা কে রে? আমি যা করব তাই হবে — বুঝলি হতভাগা?'

আমি মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, তিনি আমার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকালেন।

'তুই কি চালাক না একেবারে গবেট?'

'আমি জানি না।'

'জানি না বলছিস তো? তাহলে শোন্, আমি বলে রাখছি। ধূর্ত হতে চেষ্টা করিস -- গবেট হওয়ার চেয়ে ধূর্ত হওয়া ভালো। গবেট হয় ভেড়ারা — বুঝেছিস? এবার যা, খেলা কর্ গিয়ে।'

কিছুদিনের মধ্যেই আমি আরম্ভ করি প্সাল্টির* পড়তে। বইয়ের যে-কোনো লাইনের প্রতিটি অক্ষর আমি ধরে ধরে পড়তে পারি। সাধারণত আমার পড়বার সময় হচ্ছে সন্ধ্যেবেলা চায়ের পরে। আর প্রত্যেকবারেই পুরো একটি স্তোত্র আমাকে পড়তে হয়।

'স-য়ে সময়, হ্রস্ব উ-য়ে উট, খ-য়ে খাবার, সুখ, ভ-য়ে ভল্লুক, ও-কার ওড়না, গ-য়ে গগন, দীর্ঘ ঈ-য়ে ঈগল, ভোগী, সুখভোগী...' এইভাবে বানান করে করে আমি পড়ে যাই আর পড়তে পড়তে এত বিরক্তি লাগে যে নানারকম প্রশ্ন জাগে মাথার মধ্যে।

'আচ্ছা, সুখভোগী কে? ইয়াকভ-মামা?'**

* প্রার্থনা সংগীত। — সম্পাঃ

** রুশভাষায় শব্দের খেলা। সুখভোগী শব্দের অন্য মানে — মূর্খ, নির্বোধ। — সম্পাঃ

দাদামশাই রেগে ওঠেন: 'হতভাগা, কষে মাথায় গাঁট্টা মারলে তারপর টের পাবি সুখভোগী কে!' দাদামশাই যখন এই ধরনের কথা বলেন তখনই আমি টের পাই দাদামশাই আসলে রাগেননি; এভাবে কথা বলা তাঁর একটা অভ্যেস। না বললে খারাপ দেখায় তাই তিনি বলেন।

এবং আমার এই ধারণা যে ভুল নয় তা টের পেতেও বেশি দেরি হয় না। একটু পরেই তিনি ভুলে যান আমার কথা আর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলেন:

'হুঁ, গান করতে বলো, খেলা করতে বলো, তার বেলা একেবারে রাজা ডেভিডের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু কাজের বেলায়... আবেসালোমের মতো শয়তান! আহা-হা! সারাদিন শুধু নাচ, গান আর হল্লা! কেন রে বাপু? "নেচে বেড়াই ফুর্তি করি সবুজ মাঠে-মাঠে।" কিন্তু লাভটা কি হবে শুনি? নাচ তোকে কতদূরে নিয়ে যেতে পারবে?'

আমার পড়া বন্ধ হয়ে যায়, তাকিয়ে থাকি দাদামশাইয়ের দিকে। সারা মুখটার ওপরে দুশ্চিন্তার ছাপ, ভুরু কোঁচকানো, সরু সরু চোখে তাকিয়ে আছেন দূরের দিকে। চোখের দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা, ভারি অন্তরঙ্গ বলে মনে হয়। যেন তাঁর মুখের কাঠিন্যটুকু আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। কাঁপছে সোনালী ভুরুদুটো, চকচক করছে রঙের ছোপ লাগানো আঙুলের নখ, আঙুল দিয়ে অস্থিরভাবে টেবিলের ওপরে টোকা দিয়ে চলেছেন।

'দাদামশাই!'

'কী রে?'

'একটা গল্প বলো না দাদামশাই।'

'পড়ার বই পড় না, কুঁড়ে বাদশা!' তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন। এমনভাবে চোখ রগড়াতে থাকেন যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন, 'প্সাল্টিরে তো মন নেই দেখছি! গল্প পেলেই হল, তা যে গল্পই হোক না কেন!'

কিন্তু দাদামশাইয়ের কথা শুনে আমার মনে হতে থাকে, তিনি নিজেও বোধ হয় প্সাল্টির চাইতে গল্প বলতে ভালোবাসেন। প্সাল্টিরের স্তোত্রগুলি তাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে আছে এবং প্রতিদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে তিনি কয়েকটি স্তোত্র চেঁচিয়ে পড়েন। এই স্তোত্রপাঠকে তিনি নিত্যকর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং গির্জার পাদ্রিরা যেমন উপাসনা-পাঠ করে তেমনি তিনি স্তোত্র পাঠ করেন।

শেষ পর্যন্ত আমাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে বৃদ্ধ বাধ্য হয়ে বলতে শুরু করেন:

'আচ্ছা বাপু বলছি। শোন, তাহলে। আর পুসাল্টির তো থাকবেই, সারা জীবন ধরেই থাকবে। কিন্তু আমি আর ক-দিন! আমার তো ওপারের ডাক আসবার সময় হল!'

পুরনো আরামকেদারার সেলাই করা দিকটায় ঠেস দিয়ে বসেন তিনি, পিছনে মাথা হেলিয়ে, চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন ছাদের ওপরে — আর পুরনো দিনের নানা স্মৃতি বলে যেতে থাকেন। ব্যবসায়ী জায়েভ'এর দোকান লুট করবার জন্যে একবার নাকি বালাখনাতে ডাকাতের দল এসেছিল। বিপদ ঘণ্টি বাজাবার জন্যে দাদামশাইয়ের বাবা ছুটে যাচ্ছিলেন ঘণ্টাঘরের দিকে; ডাকাতের দল তাঁকে ধরে ফেলে, তলোয়ার দিয়ে তাঁর শরীরটাকে কুচি কচি করে কাটে আর টুকরোগুলো ঘণ্টাঘরের ওপর থেকে ছুঁড়ে দেয় মাটিতে।

'আমি তখন খুবই ছোট। এসব ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখিনি আর আমার কিছু মনেও নেই। প্রথম যে ঘটনা আমি মনে করতে পারি তা হচ্ছে ফরাসীদের এদেশে আসা। সেটা ছিল ১৮১২ সাল — আমার বয়স তখন ঠিক বারো। সে-সময়ে বালাখনাতে জন-ত্রিশ ফরাসী বন্দীকে নিয়ে আসা হয়েছিল। মানুষগুলো শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, রোগা হাড়-জিরজিরে চেহারা, হাতের সামনে যা পেয়েছে তাই পরেছে — ভিখিরিরও অধম অবস্থা। শীতে কুঁকড়ে গেছে লোকগুলো, ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। ঠাণ্ডা লেগে হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে কয়েকজনের — তাদের উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। গাঁয়ের চাষীরা লোকগুলোকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু লোকগুলোর সঙ্গে যে সান্ত্রীর দল ছিল তারা বাধা দিল। তারপর ছাউনি থেকে এল সৈন্যরা। চাষীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে ফিরিয়ে দিল যার যার ঘরের দিকে। এই ধরনের ঘটনা অবশ্য পরে আর কোনো দিন ঘটেনি — পাশাপাশি থাকতে থাকতে ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল দু-দলেই। দেখা গেল, ফরাসীরা ভারি চালাকচতুর, যে-কোনো অবস্থায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে, হাসি-খুশি-আমুদে। আর মেজাজ এলেই গলা ছেড়ে গান শুরু করে দেয়। ফরাসী বন্দীদের দেখবার জন্যে নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ থেকে হোমরাচোমরা লোকরা আসত ত্রয়কা চেপে। কেউ কেউ ফরাসীদের গালিগালাজ করত, কেউ কেউ তাদের মুখের সামনে ঘুষি উঁচিয়ে শাসাত, কেউ কেউ মারধোর পর্যন্ত করত। আবার কেউ কেউ ছিল যারা ফরাসী ভাষাতেই তাদের সঙ্গে খুব দরদের সঙ্গে

কথা বলত, তাদের খুশি করবার জন্যে টাকাপয়সা ও পুরনো জামাকাপড় দিত। এক বৃদ্ধের কথা আমার মনে আছে, শহরের এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, তিনি তো দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন আর বলতে লাগলেন— "এই শয়তান বোনাপার্টটার জন্যেই ফরাসীদের এই অবস্থা!" একবার ভাব্‌তো দেখি ব্যাপারটা। একে রুশদেশের লোক, তার ওপরে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক — কিন্তু কী নরম হৃদয়! বিদেশী লোকদের দুঃখেও তাঁর মন কাঁদে!...'

মুহূর্তের জন্যে তিনি চুপ করেন, চোখ বুজে আঙ্গুল চালাতে থাকেন চুলের মধ্যে। পরে অতীতের মধ্যে ডুবে গিয়ে সতর্কভাবে আবার স্মৃতিমন্থন করে চলেন।

'সময়টা ছিল শীতকাল। সে কী হাড়কাঁপানো শীত, হি-হি হাওয়া আর তুষারঝড়। তুষার জমে জমে বাড়িঘর আট্‌কা পড়ে যেত। এই অবস্থায় ফরাসীরা ছুটে-ছুটে আসত আর আমাদের বাড়ির জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করত আমার মা'কে। আমার মা বাজারে বিক্রি করবার জন্যে এক ধরনের পিঠে তৈরি করতেন; সেই পিঠের জন্যে ফরাসীরা জানলার সামনে লাফঝাঁপ হাঁকডাক শুরু করে দিত আর ঠক্‌ঠক শব্দে টোকা দিত জানলায়। মা তাদের বাড়ির ভিতরে আসতে দিতেন না। জানলার ফাঁক দিয়ে পিঠে দিতেন তাদের হাতে। চুল্লির ভিতর থেকে সদ্য বার করে আনা সেইসব পিঠে, তখনো ধোঁয়া বার হচ্ছে আর আগুনের মতো গরম — কিন্তু লোকগুলো করত কি, সেই অবস্থাতেই পিঠেগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে জামার তলায় হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরত গায়ের চামড়ার ওপরে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শরীর আর বুকের ভিতরটাকে ছ্যাঁকা দিয়ে গরম করতে চেষ্টা করত এইভাবে। কি করে যে এতটা সহ্য করতে পারত জানি না! ওরা নিজেরা গরম দেশের লোক, এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর তুষারপাতে ওরা অভ্যস্ত নয়—ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে ওদের মধ্যে কত লোক যে মারা গিয়েছিল! আমাদের বাড়ির বাগানের দিকে ছিল একটা স্নানঘর, সেই ঘরে দুজন ফরাসী থাকত। একজন অফিসার, আর একজন তার এ্যাড্‌জুটাণ্ট — নাম মিরন। লম্বা, রোগা চেহারা অফিসারটির, যেন শুধু হাড় আর চামড়া। হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে-পড়া স্ত্রীলোকের কোট গায়ে চাপিয়ে ঘুরে বেড়াত। এমনিতে লোকটি ছিল সদয় কিন্তু রোজই মদ গিলত আর মাতলামি করত। আমার মা'র আরেকটা ব্যবসা ছিল — বীয়ার বানিয়ে বিক্রি করা। সেই লোকটি এই বীয়ার কিনে খেতে শুরু করত আর একেবারে মাতাল না হওয়া পর্যন্ত থামত না। আর তারপরেই শুরু হত গান।

আমাদের ভাষায় একটু-আধটু কথা বলতে পারার পর থেকেই সে মন্তব্য করত — "আপনাদের এই দেশটা সাদা নয়, দেশটা কালো — খারাপ!" তার কথাগুলো ছিল খুবই ভাঙা-ভাঙা কিন্তু সে কি বলতে চাইছে তা বুঝতে অসুবিধে হত না। আর সত্যি কথাই বলত সে, আমাদের দেশের এই উত্তরাঞ্চল সত্যিই তো আর স্বর্গরাজ্য নয়। কথাটা বুঝতে পারবি যদি ভল্‌গা নদী ধরে বরাবর দক্ষিণ দিকে নেমে যাস। দেখবি, দেশের আবহাওয়া ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছে। আর তারপর কাস্পীয় সাগর পেরিয়ে গেলে মনে হবে, সে-দেশের মাটি কোনো কালে বরফে ঢাকা পড়ে না। এ সব ঠিক। ধর্মের বই, সুসমাচার ও প্সাল্টিরে এ সব লেখা আছে। এই বইগুলিতে তুষারপাত বা শীতকালের কোনো উল্লেখ কোথাও নেই। তাহলেই ভেবে দ্যাখ্, যীশু খ্রীষ্ট তো ওই দেশেই জীবন কাটিয়েছেন... এই তো আমরা এখন প্সাল্টির পড়ছি, এটা শেষ হয়ে গেলেই সুসমাচার ধরব।'

আবার তাঁর মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় যেন ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ ঘুমে ঢলে পড়েছেন, খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে আধ-চোখে তাকিয়ে থাকেন, আর সমস্ত শরীরটা হয়ে ওঠে ছোট ও কেমন যেন খাড়া।

'কই দাদামশাই, বলুন!' শান্তভাবে আমি তাগিদ দিই।

চমকে উঠে তিনি বলেন, 'ও হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন? ফরাসীদের কথা, না? হ্যাঁ শোন্ তাহলে। ওরাও তো মানুষ! আমাদের চেয়ে যে নিকৃষ্ট স্তরের জীব, তা তো নয়! আমার মা'কে ওরা ডাকত "মাদাম" বলে, ওদের ভাষায় "মাদাম" কথাটার মানে "ভদ্রমহিলা"। কিন্তু "ভদ্রমহিলাটিকে" দেখা যেত, আড়াই-মণি এক-একটা ময়দার বস্তা অক্লেশে বয়ে এনে সার দিয়ে দিয়ে রাখছেন। অসুরের মতো ক্ষমতা ছিল তাঁর গায়ে। আমার যখন উনিশ বছর বয়স তখনো তিনি আমার চুলের মুঠি ধরে পাখির পালকের মতো আমাকে তুলে নিয়ে যেখানে-সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখ্, বিশ বছর বয়সে আমি নিজেও এমন কিছু রোগাপট্‌কা ছিলাম না। এ্যাড্‌জুটান্ট মিরন ছিল উঁচুদরের ঘোড়ার সমঝদার, ঘোড়া সে খুব ভালোবাসত। ঘোড়াকে একটু পরিচর্যা করতে পাবার জন্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত সে, হাত নেড়ে ইঙ্গিতে অনুমতি চাইত সবার কাছে। প্রথম প্রথম লোকে ভয় পেত; হাজার হোক শত্রুপক্ষের লোক, হয়তো ঘোড়াগুলোর সর্বনাশ করে দেবে। কিন্তু কিছুদিন পরে গাঁয়ের চাষীরা নিজেরাই ডাকাডাকি

করত মিরনকে: "ওহে মিরন, একটু শুনে যাও তো এদিকে!" ডাক শুনে হাসত মিরন, ষাঁড়ের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে ছুটে আসত। তার চুলগুলো ছিল গাজরের মতো লাল, নাকটা প্রকান্ড, ঠোঁটদুটো পুরু। ঘোড়ার পরিচর্যা-কাজে সে ছিল ওস্তাদ এবং ঘোড়ার নানারকম অসুখের চিকিৎসাও সে জানত। পরে এই নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদে ঘোড়ার চিকিৎসক হিসেবে সে থেকে গেল। কিন্তু লোকটার মাথা খারাপ হয়ে যায়। দমকলের লোকেরা ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। আর সেই অফিসারটির হল কি, ক্রমেই কেমন যেন শুকিয়ে শুকিয়ে আসতে লাগল। তারপর বসন্তকালে একদিন দেখা গেল যে সে মরে পড়ে আছে। এত নিঃশব্দে মরেছে যে কেউ টের পায়নি। সেটা ছিল সেণ্ট নিকোলাই দিবস, স্নানঘরের জানলার সামনে বসে বসে সে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিল, সেই অবস্থাতেই জানলার ওপরে মাথা কাৎ করে মারা গেছে।

'লোকটার জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল, কেঁদেওছিলাম। ভারি ভালো লোক ছিল। আমার কানের কাছে মুখ এনে প্রায়ই সে নিজের ভাষায় শান্ত গলায় কি-সব বলত। তার কথা আমি বুঝতে পারতাম না, কিন্তু ভারি চমৎকার লাগত আমার, বুঝতে পারতাম আমাকে আদর করেই কিছু বলছে। এই সংসারে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে আদর করে কিছু বলছে— এ-জিনিসটাই তো দুর্লভ! একবার সে আমাকে তার নিজের ভাষা শেখাতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু আমার মা বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, মা আমাকে নিয়ে এক পাদরির কাছে হাজির হয়। সেই পাদরি অফিসারটির নামে নালিশ করে আর আমাকে আচ্ছা করে মার দেবার হুকুম দেয়। বুঝলি তো দাদু, সেকালে সব বিষয়েই খুব বেশিরকম কড়াকড়ি ছিল! সেকালে আমাদের যতো কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে একালে তোদের তা করতে হয় না। যেসব কষ্ট তোদের সহ্য করতে হত তা তোরা আসবার আগেই তোদের হয়ে অন্য আরেক দল সহ্য করে গেছে। এই কথাটি কখনো যেন ভুলিসনে দাদু! এই ধর না আমার কথা — কী কষ্টই না আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল!'

অন্ধকার হয়ে আসে। সেই অন্ধকারে দাদামশাই বেখাপ্পা রকমের বড়ো হয়ে ওঠেন, তাঁর চোখদুটো বেড়ালের চোখের মতো জ্বলতে থাকে। দাদামশাই যখন গল্প বলেন তখন তাঁর গলার স্বরটা শান্ত থাকে, ভেবেচিন্তে রসিয়ে-রসিয়ে কথা বলেন; কিন্তু নিজের সম্পর্কে বলতে শুরু করলেই তাঁর গলার স্বরটা আবেগদীপ্ত হয়ে ওঠে, তখন তিনি জাঁক করতে শুরু করেন। দাদামশাইয়ের মুখে তাঁর নিজের কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না।

আর, 'এটা মনে রাখিস, এটা ভুলিসনে' বলে তিনি অনবরত যে উপদেশামৃত বর্ষণ করেন তাও আমার পছন্দ নয়।

এমন অনেক বিষয়ে তিনি আমাকে বলেছেন যা ভুলে যেতে পারলেই আমি খুশি হই। কিন্তু কথাগুলো যন্ত্রণাদায়ক ছুঁচের মতো আমার মনের মধ্যে বিঁধে আছে। কিছুতেই ভুলতে পারি না। আর সেই বিশেষ কথাটি মনে রাখবার উপদেশ তিনি একবারও না দিলেও ভুলতে পারি না। তিনি আমাকে কোনো দিন রূপকথা বলেননি, যা বলেছেন সবই সত্যি ঘটনার বিবরণ। আর আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, প্রশ্ন করলে দাদামশাই বিরক্ত হন। আমিও সেইজন্যে ইচ্ছে করেই হাজার রকম প্রশ্ন করে চলি।

'আচ্ছা দাদামশাই, রুশরা ভালো না ফরাসীরা ভালো?'

'কে জানে বাপু, অত-শত জানিনে। ফ্রান্সে গিয়ে তো আর আমি ফরাসীদের দেখতে যাইনি।' তারপরেই আবার বলেন, 'নিজের গর্তের মধ্যে যখন বসে থাকে তখন ইঁদুরও ভালো!'

'তাহলে রুশরা? রুশরা সবাই ভালো?'

'সবাই নয়, কেউ কেউ। রুশরা যখন ভূমিদাস ছিল তখন তাদের অবস্থা এখনকার চেয়েও ভালো ছিল। ঠিক যেন পেটালোহার মতো। এখন স্বাধীনতা পেয়ে গেছে কিন্তু খাবার সংস্থান নেই। এই ধর্ না কেন ভদ্রলোকদের কথা। ওদের প্রাণে দয়ামায়া বলে কোনো পদার্থ নেই — কিন্তু চাষীদের চেয়ে ওদের সাধারণ বুদ্ধিটা বেশি। অবশ্য সব ভদ্রলোকদের সম্পর্কেই একথা বলা যায় না। কিন্তু কথাটা কি জানিস, কোনো ভদ্রলোক একবার যদি ভালো হয় তবে সে সত্যি সত্যিই খুব ভালো হয়। আবার ভদ্রলোকদের মধ্যেই কতগুলো আছে একেবারে নিরেট বোকা — ঠিক বস্তার মতো। যা খুশি তাই দিয়ে ঠেসে দাও, মুখে রা-টি নেই। আমাদের মধ্যে ভেতর-ফাঁপা লোকের সংখ্যাই বেশি। প্রথমে দেখে মনে হয় যেন একটা গোটা মানুষ, কিন্তু আরেকটু ভালো করে তাকালেই বোঝা যায় যে ভেতরের সমস্ত শাঁস পোকায় খেয়ে ফেলেছে, শুধু খোলসটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখন আমাদের কী দরকার জানিস? দরকার একটু শেখা, দরকার বুদ্ধিকে আরেকটু শানিয়ে তোলা... কিন্তু শান দেবাব মতো কোনো জিনিসই নেই...'

'আচ্ছা রুশদের কি খুব শক্তি আছে?'

'তা কারও কারও আছে বৈকি। তবে শক্তিটা তো আর আসল কথা নয়,

আসল কথা হচ্ছে দক্ষতা। সবচেয়ে শক্তিশালী লোকও দেখবি একটা ঘোড়ার চেয়েও দুর্বল।'

'ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল কেন দাদামশাই?'

'যুদ্ধের কথাই যদি বলিস তো শোন্। ওটা হচ্ছে জারের ব্যাপার, যুদ্ধ হবে কি হবে না তা তিনিই বুঝবেন। আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে ওটা বুঝবার কথা নয়।'

আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, বোনাপার্ট কে? এই প্রশ্নের জবাবে দাদামশাই যা বলেছিলেন তা আমি জীবনে ভুলব না। দাদামশাই বলেছিলেন:

'ও ছিল খুব সাহসী একজন লোক। গোটা পৃথিবীটাকে ও দখল করে নিতে চেয়েছিল। কেন জানিস? ও চেয়েছিল, মানুষে মানুষে কোনো ভেদ থাকবে না — জমিদার থাকবে না, বড় চাকুরে থাকবে না, সব সমান হয়ে যাবে। মানুষের নামগুলোই শুধু আলাদা থেকে যাবে — কিন্তু সুযোগ-সুবিধার কোনো কমতি-বাড়তি হবে না। এমন কি মানুষের ধর্মকর্মগুলো পর্যন্ত এক হয়ে যাবে। কথাটার অবশ্যই কোনো মানে হয় না; একমাত্র কাঁকড়া ছাড়া আর কোনো প্রাণীই সবাই একরকম হয় না। এই ধর না মাছের কথা — মাছের মধ্যে পর্যন্ত কত আলাদা আলাদা ধরন-ধারণ রয়েছে। চাঁদামাছ সামন মাছ দেখলে পালিয়ে পালিয়ে যায়, হেরিংমাছ আর স্টার্জনমাছ তো পাশাপাশি থাকতেই পারে না। আমাদের দেশেও এমনি ধরনের বোনাপার্টরা ছিল — যেমন ধর, স্তেপান রাজিন বা এমেলিয়ান পুগাচভ*। কিন্তু এদের কথা আজ থাক্, আরেক দিন শুনবি...'

মাঝে মাঝে চোখদুটোকে বড়ো বড়ো করে আমার দিকে বহুক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হয় যেন তিনি এই প্রথম আমাকে দেখছেন। বড়ো অস্বস্তি লাগে আমার।

কিন্তু আমার বাবা বা মা'র কথা কোনো দিন আমি দাদামশাইয়ের মুখে শুনিনি।

আমাদের দুজনের মধ্যে যখন এই ধরনের কথাবার্তা হয় তখন মাঝে মাঝে দিদিমা এসে ঢোকেন ঘরে। নিঃশব্দে কোণের একটি আসনে বসে চুপচাপ শোনেন আমাদের কথা। তারপর হঠাৎ একেক সময়ে তাঁর স্বাভাবিক

* কৃষক-অভ্যুত্থানের দুজন নেতা। — সম্পাঃ

দরদভরা গলায় একেকটা প্রশ্ন করে বসেন, 'কর্তা, মনে পড়ে আমরা সেই যে মেরীমাতার কাছে প্রার্থনা করার জন্য মুরোম তীর্থে গিয়েছিলাম, কি ভালোই না লেগেছিলো? সেটা কোন বছর বল তো?'

'তা আমার ঠিক মনে নেই। তবে যে বছর কলেরা লেগেছিল, তার আগে। সেই যে গো, ওলন্চানরা বনে গিয়ে পালিয়েছিল আর তাদের খুঁজে বার করবার জন্যে সারা বন তোলপাড় করা হয়েছিল — সেই বছর।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। এবার আমার মনে পড়ছে, সেই লোকগুলোকে কী ভয়ই না করতাম আমরা!..'

'হুঁ!'

ওলন্চানরা কারা, আর কেনই বা তারা বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, আমি সেকথা জিজ্ঞেস করি। অনিচ্ছার সঙ্গে দাদামশাই জবাব দেন:

'ওরা হচ্ছে একদল গাঁয়ের লোক — ভূমিদাস। জারের কারখানায় কাজ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।'

'ওদের ধরল কী করে?'

'আর কী করে ধরবে? দেখিসনি, বাচ্চারা যখন খেলা করে তখন একদল ছোটে আর একদল তাদের পাকড়াও করবার জন্যে পেছনে পেছনে ধাওয়া করে। আর একবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। সমানে চলবে চাবুক আর বেতের বাড়ি, নাক ফেটে যাবে আর তারপর কপালের ওপরে দাগী বলে ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হবে।'

'কেন? ছাপ লাগাবে কেন?'

'কেন কে জানে? আগাগোড়া ব্যাপারটাই ছিল ভারি অস্পষ্ট। কেউ বলতে পারত না দোষটা কার — যারা পালিয়েছে তাদের না যারা পাকড়াও করেছে তাদের।'

দিদিমা আবার অন্য একটা কথা পেড়ে বসেন: 'মনে আছে গো তোমার, সেই যে মস্ত এক অগ্নিকান্ড হয়েছিল — সেই সময়কার কথা?'

'কোন্ অগ্নিকান্ডের কথা বলছ তুমি?' একটা অবিচলিত জেদের সঙ্গে দাদামশাই প্রশ্ন করেন, যে-বিশেষ ঘটনার কথা দিদিমা বলছেন সে-সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে চান।

পুরনো স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়ে আমার উপস্থিতির কথা দুজনেই ভুলে যান। শান্তভাবে কথা বলেন দুজনে, সেই কথায় এমন একটা পরিমিত ছন্দ আছে যে মনে হয় একসঙ্গে একটা গান গাইছেন দুজনে। বড় বিষণ্ণ

বিষয়বস্তু সেই গানের -- কবে আগুন লেগেছিল আর মহামারী শুরু হয়েছিল, কোথায় মানুষকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়েছে, দুর্ঘটনায় মারা গেছে কোন্ লোক, জাল-জোচ্চুরি, ধর্মান্ধতা, উচ্চতর শ্রেণীর ভদ্রলোকদের ক্রোধোন্মত্ততা, এই সব।

দাদামশাই বিড়বিড় করে বলেন, 'কত কিছুই না এই চোখদুটো দিয়ে দেখতে হয়েছে! কত ঝড়ঝাপ্টাই না গেছে এই জীবনটার ওপর দিয়ে!'

দিদিমা বলেন, 'আর আমাদের জীবনটা যে খুব খারাপ কাটিয়েছি— তাও নয়। কি বলো? ভারিয়ার যখন জন্ম হয়, কি সুন্দর বসন্তকাল এসেছিল সেবার!'

'সেটা ছিল ১৮৪৮ সালের কথা, সেই বছরেই হাঙ্গেরির ওপরে আমাদের সৈন্যরা চড়াও হয়। ভারভারাকে যেদিন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হল তার পরদিনই ওর ধর্মবাপ তিহনকে নিয়ে চলে যায়...'

দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, 'সেই যাওয়াই ওর শেষ যাওয়া।'

'হ্যাঁ, শেষ যাওয়া! সেই দিন থেকেই ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি আমরা পেয়েছি। ভেলার ওপর দিয়ে জল যেমন অনবরত গড়িয়ে পড়ে তেমনি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিও আমাদের ওপর গড়িয়ে এসেছিল। আহ্-হা ভারভারা... সর্বনাশী...'

'যাক্ গিয়ে, ওসব কথা আর তুলো না...'

'কেন তুলব না?' দাদামশাই রেগে ওঠেন, 'ছেলেমেয়েগুলো সব অপোগণ্ড হয়েছে, একটাও যদি কোনো একটা দিকেও একটু ভালো হত! আমাদের শক্তি-সামর্থ্য মিথ্যেই আমরা জলাঞ্জলি দিয়েছি! আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম, একটা নিটোল ও অক্ষত পাত্রে চলেছে ভবিষ্যতের সঞ্চয়। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই লীলা যে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, যেটাকে আমরা নিটোল ও অক্ষত পাত্র বলে মনে করেছিলাম সেটা আসলে একটা ঝাঁজরা চালুনি...'

দাদামশাই এমনভাবে চিৎকার করে ওঠেন যেন কোনো কিছুতে ছ্যাঁকা লেগেছে, ঘরের চারদিকে ছুটোছুটি লাগিয়ে দেন, হা-হুতাশ করেন, নিজের ছেলেমেয়েদের যাচ্ছেতাই বলতে থাকেন আর হাড়-বের-করা হাতের মুঠি পাকিয়ে দিদিমাকে শাসাতে থাকেন।

'তোমার দোষেই ছেলেমেয়েগুলো উচ্ছন্নে গেছে। ডাইনী বুড়ী, সায় দিউনী!..'

গলার স্বরে এত বেশি তিক্ততা থাকে, যে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, ছুটে গিয়ে উপাসনা-বেদীর সামনে দাঁড়ান আর ঢিপ্‌ঢিপে রোগা বুকে চাপড় মারতে মারতে কান্নাভরা গলায় বিলাপ করতে থাকেন:

'তোমার কাছে আমি কী দোষ করেছি প্রভু? আমার মতো দুর্ভাগা আর তো কাউকে দেখিনে!'

ভিজে চোখদুটোতে যন্ত্রণা আর অভিসম্পাতের চিহ্ন ফুটে ওঠে, চক্‌চক করে চোখদুটো, সারা শরীর কাঁপে।

দিদিমা অন্ধকার কোণটিতে নিঃশব্দে বসে থাকেন আর বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন আঁকেন। শেষকালে দিদিমা উঠে এসে দাদামশাইয়ের কাছে দাঁড়ান, মিনতিভরা স্বরে বলেন:

'কেন মিথ্যে নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? প্রভুর লীলা একমাত্র তিনি নিজেই বোঝেন। আর সব বাড়িতেই তো এই এক অবস্থা — আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতোই অন্য সব বাড়ির ছেলেমেয়ে। দিনরাত শুধু ঝগড়া মারামারি নিয়েই আছে। সব বাপ-মাকেই চোখের জলে নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। একা তুমি নও...'

মাঝে মাঝে দিদিমার এই কথা শুনে দাদামশাই শান্ত হন, এবং ক্লান্তভাবে বিছানায় শুয়ে পড়েন। দাদামশাই শুয়ে পড়লে পর আমরা দুজনে পা টিপে টিপে ছাদের ঘরে চলে যাই।

কিন্তু একদিন হয়েছে কি. দাদামশাইকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে দিদিমা সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন. আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দাদামশাই দিদিমার মুখের ওপরে দুম্‌ করে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারলেন। দিদিমার সারা শরীরটা টলে উঠল, হাত দিয়ে তিনি নিজের ঠোঁটদুটো চেপে ধরলেন। তারপর একটু সামলে উঠতে পারলে পর শান্ত অনুত্তেজিত স্বরে বললেন:

'তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে...' বলে তিনি দাদামশাইয়ের পায়ের কাছে মুখ থেকে রক্ত ফেললেন। মাথার ওপর দু-হাত তুলে দাদামশাই চেরা গলায় চিৎকার করতে লাগলেন:

'বেরিয়ে যাও বলছি! নইলে খুন করব!'

'বুদ্ধিশুদ্ধি গেছে!' দরজার দিকে যেতে যেতে দিদিমা আবার বললেন। দাদামশাই ছুটে এলেন দিদিমার পিছনে পিছনে। কিন্তু দিদিমা একটুও তাড়াহুড়ো না করে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে এসে দাদামশাইয়ের মুখের ওপরেই সশব্দে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

'ডাইনী মাগী!' দাঁতে দাঁত চেপে দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন। জ্বলন্ত কয়লার মতো ফুঁসছেন তিনি, দরজার বাজুটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছেন, হাতের নখ দিয়ে আঁচড় কাটছেন বাজুর ওপরে।

চুল্লির উপরে মৃতপ্রায় অবস্থায় আমি বসেছিলাম। নিজের চোখকে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার সামনেই দিদিমার গায়ে হাত তুলতে দাদামশাইকে আমি এই প্রথম দেখছি। ব্যাপারটার কুশ্রীতায় আমি যেন চুরমার হয়ে গেছি! দাদামশাইয়ের এক নতুন চেহারা আমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে এবং এই চেহারাটা এমনই যে কোনো কিছু দিয়েই সমর্থন করা যায় না; ভয়ঙ্কর একটা বোঝার মতো সে চেপে ধরেছে আমাকে। দরজার বাজু আঁকড়ে ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন দাদামশাই। একটু একটু করে কুঁকড়ে যাচ্ছেন, একটু একটু করে ম্লান হয়ে যাচ্ছেন আর যেন সারা গায়ে ছাইয়ের গুঁড়ো এসে পড়েছে। হঠাৎ ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, হাঁটু মুড়ে বসে দুই হাতে ভর রেখে ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে। তারপরেই আবার শরীরটাকে টান করে নিয়ে দুই হাতে বুকের ওপর চাপড় মারতে মারতে চিৎকার করে উঠলেন:

'হায় ঈশ্বর! হায় ঈশ্বর!..'

চুল্লির আঁচে গরম তাকের ওপর থেকে আমি নেমে এলাম। তারপর ছুটে গেলাম ওপরে। দিদিমা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন আর জল দিয়ে মুখ কুলকুচো করছেন।

'ব্যথা লাগছে?'

এক কোণে গিয়ে ময়লা জল ফেলবার বালতির মধ্যে তিনি মুখ কুলকুচো করে জল ফেললেন। তারপর শান্তস্বরে জবাব দিলেন: 'নাঃ, ঠিক আছে। দাঁত ভাঙেনি, শুধু ঠোঁটের ওপর কেটে গেছে খানিকটা।'

'দাদামশাই কেন করলেন একাজ?'

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দিদিমা জবাব দিলেন, 'মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। বুড়ো হয়েছে তো, আর জীবনের ওপর দিয়ে কম ঝড়ঝাপ্টা তো যায়নি, এ-অবস্থায় মেজাজ ঠিক রাখা খুবই শক্ত... আচ্ছা, তুই এবারে শুয়ে পড় গে যা। এ ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলিস...'

আমি আরও কি যেন একটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক তীব্রতার সঙ্গে তিনি জবাব দিলেন, 'কথা কানে ঢুকছে না বুঝি?.. ভারি ত্যাঁদড় ছেলে তো...'

জানলার সামনে বসে তিনি ঠোঁট চুষতে লাগলেন। মাঝে মাঝে থুতু ফেলতে লাগলেন রুমালের মধ্যে। জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে আমি দিদিমার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দিদিমার মাথার ওপর দিয়ে একটুকরো চৌকোণা তারা-ছিটনো আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাইরে চারদিক ভারি শান্ত, ভিতরে থমথমে অন্ধকার।

আমি বিছানায় শুয়ে পড়তেই দিদিমা এগিয়ে এলেন বিছানার কাছে, আমার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তুই ঘুমো, ঘুমের মধ্যে ছট্‌ফট করিসনে যেন... আমি তোর দাদামশাইয়ের কাছে যাচ্ছি... সোনা আমার, আমার কথা ভেবে মন খারাপ করিসনে... আমার নিজের দোষটাও কম নয়... আচ্ছা, এবার ঘুমো তুই!'

আমাকে চুমু খেয়ে দিদিমা বেরিয়ে গেলেন। আমার মনটা অসহ্য খারাপ হয়ে গেল। নরম ও উষ্ণ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে আমি গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালাম। বাইরে জনশূন্য রাস্তা, অসহ্য এক যন্ত্রণায় বোবা হয়ে সেই রাস্তার দিকে চেয়ে রইলাম আমি।

ছয়

জীবনটা আমার আবার রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে উঠল। একদিন সন্ধ্যার সময় চা খাবার পরে আমি দাদামশাইয়ের পাশে বসে প্‌সাল্টির থেকে পড়া করছি, দিদিমা ডিশ ধুচ্ছেন—এমন সময় ছুটতে ছুটতে ইয়াকভ-মামা এসে হাজির। ইয়াকভ-মামার তেমনি চিরাচরিত উষ্ক-খুষ্ক চেহারা — জীর্ণ ঝাঁটার মতো দেখাচ্ছে তাকে। ঘরে ঢুকে কোনোরকম কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করল না, টুপিটা কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলে ভয়ানক উত্তেজিতভাবে হাত নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল:

'মিখাইলটা হুলস্থুল কান্ড বাধিয়ে দিয়েছে, বাবা! আমাদের ওখানে সন্ধ্যের সময় খেতে এসেছিল, তারপর মদ খেয়ে কান্ডজ্ঞান হারিয়েছে আর ভয়ানক পাগলামি শুরু করে দিয়েছে। সে যে কী পাগলামি তা আর কী বলব। কাপডিশ ভেঙেছে; একজনের ফরমাশী একটা পশমের পোশাক ছিল, সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে; জানলা ভেঙেছে; আমাকে আর গ্রিগরিকে গালাগালি দিয়েছে। এখন রাস্তায় বেরিয়েছে এদিকে আসবে বলে। আপনার ওপরে কী রাগ! রাগে ফুঁসছে আর বলছে, বুড়োকে আজ দেখে

নেব! বুড়োর দাড়িগুলো সব উপড়িয়ে ফেলব! বুড়োকে খুন করব! এসব কথা চিৎকার করে বলছে আর এদিকে আসছে। আপনি বরং রাস্তার দিকে একটু নজর রাখবেন...'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দাদামশাই আস্তে আস্তে দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মুখটা বেঁকে নাকের দিকে উঠে এল—ঠিক যেন একটা ধারালো টাঙ্গির মতো দেখতে হল।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে দাদামশাই উচ্চ স্বরে চিৎকার করলেন, 'শুনলে তো তোমার ছেলের কীর্তি! কী গুণধর ছেলে! নিজের বাপকেই খুন করতে চায়! কী মনে হচ্ছে গো তোমার! তবে হ্যাঁ, আমিও বলে রাখছি... আর সময় হয়ে এসেছে... সময় হয়ে এসেছে...'

কাঁধদুটোকে টান করে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন, তারপর দরজার কাছে গিয়ে প্রকান্ড লোহার হুড়কোটা তুলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

'আসল ব্যাপারটা যে কী, তা আমি জানি।' ইয়াকভ-মামার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'তোমাদের দুজনেরই নজর রয়েছে ভারভারার যৌতুকের টাকাটার ওপর। কিন্তু জেনে রেখো, কিচ্ছু লাভ নেই, এই অষ্টরম্ভাটি পাবে।' বলে তিনি হাতের আঙুলগুলো ইয়াকভ-মামার নাকের নিচে নাচাতে লাগলেন।

'তা আমার ওপর তম্বি করে লাভ কী?' লাফিয়ে দু-পা পিছনে সরে গিয়ে অপমানিত স্বরে ইয়াকভ-মামা বলল।

'তোমাকে চিনতে বাকি আছে? তুমিও এই দলে আছ।'

দিদিমা একটি কথাও বললেন না। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করে কাপডিশগুলো আলমারিতে তুলে রাখতে লাগলেন।

'আমি তো এসেছিলাম আপনাকে বাঁচাতে।'

বিদ্রুপের হাসি হেসে দাদামশাই বললেন, 'তাই নাকি? বেশ, বেশ! বাস্তবিক ভালো রসিকতা জানিস! কোথায় গেলে গো গিন্নী, তোমার এই শয়তানের ধাড়ী পুত্ররত্নটির হাতে যা-হোক একটা কিছু দিয়ে রাখ, চুল্লী খোঁচাবার লোহা বা ইস্ত্রি বা এই ধরনের যা-হোক কিছু। আর তোমাকেও বলে রাখছি ইয়াকভ ভাসিলিয়েভিচ — দরজা ভেঙে যেই না তোমার ভাইটি ঘরে ঢুকবে অমনি ধাঁই করে তাকে এক ঘা কষিয়ে দিও! সব দায়িত্ব আমার!'

মামা হাতদুটো পকেটে ঢুকিয়ে এককোণে সরে দাঁড়াল।

'বেশ, আমার কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়...'

মেঝের ওপরে পা ঠুকতে ঠুকতে দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন, 'তোর কথায় বিশ্বাস করব? তোর কথায়! আমি বরং বেড়ালকে বিশ্বাস করব, ইঁদুরকে বিশ্বাস করব, কুকুরকে বিশ্বাস করব — কিন্তু তোকে বিশ্বাস করব না। ভাবছিস, আমি কিছু বুঝি না? তোরই কাজ এটা — তুই-ই ওকে মদ খাইয়ে খাইয়ে মাতাল করে ক্ষেপিয়ে তুলেছিস! এখন হয় তুই তোর ভাইকে খুন করবি, না হয় আমাকে খুন করবি—যা-হোক একটা কিছু করতে হবে তোকে! কোন্‌টা করবি, এখন থেকেই ঠিক করে রেখে দে!'

আমার দিকে ফিরে দিদিমা চাপা স্বরে বললেন, 'যা তো, ছুটে ওপরের ঘরে চলে যা। জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ্‌ তো গিয়ে মিখাইল-মামা আসে কিনা। যদি দেখিস আসছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিয়ে যাবি। যা, ছুটে চলে যা!'

দিদিমার কথা শুনে আমি ওপরের ঘরে গিয়ে জানলার পাশে স্থান করে নিয়ে দাঁড়ালাম। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আমার মামা যখন এসে হাজির হবে তখন কী কাণ্ডটা যে হবে তা ভেবে একটু ভয়-ভয়ও করছিল আমার। আবার, এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার যে আমার ওপর দেওয়া হয়েছে তাই ভেবে গর্বে ফুলেও উঠছিল বুকটা। চওড়া রাস্তা, পুরু হয়ে ধুলো জমেছে আর সেই ধুলোর মধ্যে মধ্যে জেগে আছে পাথরের গোল কিনারাগুলো। রাস্তাটা বাঁ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে, একটা নালা ডিঙিয়ে অস্ত্রোজনায়া স্কোয়ার পর্যন্ত। সেখানে কাদামাটির মতো জমি, তারই ওপর টান করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো জেলখানার ছাইরঙা বাড়িটা। চারকোণে চারটে উঁচু উঁচু গম্বুজ। এই চিত্তাকর্ষক বাড়িটায় কেমন একটা বিষাদমাখা সৌন্দর্য আছে। ডানদিকে, আমাদের বাড়ি থেকে তিনটে বাড়ি পরেই রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে সেন্নায়া স্কোয়ারে। স্কোয়ারের অন্য দিকের সীমানায় আর একটি জেলের হল্‌দে ব্যারাক আর ছাইরঙা অগ্নি-গম্বুজ। কোথাও আগুন লেগেছে কিনা দেখবার জন্যে এই গম্বুজের ওপর থেকে একজন লোক চারদিকে নজর রাখে; শেকলবাঁধা কুকুরের মতো অনবরত চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায় লোকটি। কতগুলো সরু সরু নালা স্কোয়ারটাকে চিরে দিয়েছে, তার মধ্যে একটি নালা সবুজ ক্লেদে ভরা। ডানদিকে দ্যুকভ পুকুর। দিদিমার মুখে শুনেছি, এই দ্যুকভ পুকুরেই

একবার আমার মামারা আমার বাবাকে বরফের একটা ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। যে-জানলায় আমি দাঁড়িয়ে আছি তার প্রায় উল্টো দিকেই একটা গলি-রাস্তা, দু-ধারে বিচিত্রবর্ণের ছোট ছোট বাড়ি; 'তিন ঋষির' গির্জায় গিয়ে গলিটা শেষ হয়েছে। জানলা দিয়ে সোজাসুজি বাইরের দিকে তাকালে বাড়ির চালগুলোকে মনে হয় যেন সবুজ গাছপালার ঢেউয়ের মাঝখানে কতগুলো উল্টনো নৌকো।

আমাদের এই রাস্তার বাড়িগুলোর গায়ে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। সারাটা শীতকাল তুষার লেগে-লেগে আর শরৎকালের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ধুয়ে-ধুয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে বাড়িগুলো। গির্জার চত্বরে অপেক্ষমাণ ভিখিরির পালের মতো জড়াজড়ি গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলো, উদ্গত জানলার প্রচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে চারদিক। মনে হয়, আমি যেমন একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি, তেমনি এই বাড়িগুলোও কোনো কিছুর অপেক্ষা করছে। রাস্তায় যা দু-একজন লোককে দেখা যাচ্ছিল তাদের কারও কোনো তাড়াহুড়ো নেই; আরশোলা যেমন চিন্তাভারগ্রস্তের মতো উনুনের গা বেয়ে ওঠে, তাদের চলাফেরাও তেমনি। ভারী গরম বাতাসের হল্কা উঠে আসছিল জানলার কাছে, বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছিল বসন্তকালের পেঁয়াজ বা গাজরে ঠাসা 'পিরগ' রান্নার বিশ্রী একটা গন্ধ। এই গন্ধটায় আমার মন সর্বদা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

দৃশ্যটা অস্বস্তিকর — এমন অদ্ভুত রকমের অস্বস্তিকর যে প্রায় অসহ্য। আমার বুকের ভিতরটা যেন গলা সীসেতে ভর্তি হয়ে গেছে, বুকে আর পাঁজরে অনবরত ধাক্কা দিচ্ছে সেই সীসে, বুদ্বুদের মতো আমি যেন ক্রমশ ফুলে ফুলে উঠছি — শেষকালে মনে হতে লাগল, কফিনের ঢাকনার মতো সিলিং চাপা এই ছোট ঘরের মধ্যে আমি আর কিছুতেই আঁটতে পারি না।

হঠাৎ মিখাইল-মামাকে আমি দেখতে পেলাম। উল্টো দিকের গলি-রাস্তাটার কোণে যে ছাইরঙা বাড়িটা আছে তারই পিছন থেকে মিখাইল-মামা উঁকি দিয়ে দেখছে। মাথার টুপিটা টেনে নামিয়ে দিয়েছে নিচের দিকে, ফলে কানদুটো বেরিয়ে আছে দু-দিকে। পরনে খাটো লালচে রঙের কোট আর হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা ধুলো-মাখা বুটজুতো। একটা হাত ঢুকিয়েছে চৌকো নক্সার প্যান্টের একটা পকেটে, অপর হাতে দাড়ির গোছা মুঠো করে ধরে আছে। মিখাইল-মামার মুখটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু মিখাইল-মামার

দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন মতলব করছে, একলাফে রাস্তাটা পেরিয়ে এসে কালো লোমশ হাতের থাবা দিয়ে দাদামশাইয়ের বাড়িটাকে গ্রাস করবে। আমার উচিত ছিল তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গিয়ে সবাইকে বলা যে মিখাইল-মামা এসে গেছে কিন্তু জানলাটার কাছ থেকে আমি কিছুতেই নিজেকে সরিয়ে আনতে পারছিলাম না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, মিখাইল-মামা পা টিপে টিপে রাস্তা পার হচ্ছে — পা ফেলার ধরন দেখে মনে হতে পারে, ছাইরঙা বুটজুতোয় রাস্তার ধুলো-ময়লা লেগে যাবার আশঙ্কায় যেন সে সন্ত্রস্ত। তারপরেই শুনতে পেলাম, দরজা খোলার কিচ-কিচ শব্দ আর কাঁচের ঠুন্‌ঠুন্‌ আওয়াজ — মিখাইল-মামা শুঁড়িখানার দরজা খুলছে।

ছুটে নিচে গিয়ে আমি দাদামশাইয়ের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম।

দাদামশাই দরজা খুললেন না, ভিতর থেকে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে? ও, তুমি? কি চাই? শুঁড়িখানায় ঢুকেছে বলছ? আচ্ছা বেশ, যেখানে ছিলে সেখানেই যাও আবার!'

'আমার ভয় করছে...'

'কিছু হবে না।'

আমি আবার ফিরে গেলাম। অন্ধকার হয়ে আসছে। ক্রমশ আরো পুরু ও আরো কালো হয়ে আসছে রাস্তার ধুলো। জানলায় জানলায় দেখা যাচ্ছে চক্‌চকে হল্‌দে বাতি। রাস্তার উল্‌টো দিকের বাড়ি থেকে তারের বাজনার শব্দ ভেসে আসছে — বিষণ্ণ একটা গানের সুর কিন্তু ভারি চমৎকার। শুঁড়িখানায় কে যেন গান গাইছে। যখনই কেউ দরজা খোলে, একটা ভাঙা-ভাঙা ক্লান্ত স্বরের গান আমি শুনতে পাই। কানা ভিখিরি নিকিতুশ্‌কার গলা। বুড়ো হয়েছে নিকিতুশ্‌কা, একমুখ দাড়ি, বাঁ চোখের পাতা শক্তভাবে আঁটা, ডান চোখটা টকটকে লাল অঙ্গারের মতো। দরজাটা খুলছে, বন্ধ হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গানটাও কুড়ুল দিয়ে কাটার মতো টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

এই ভিখিরিটির ওপর আমার দিদিমার ভয়ানক হিংসে। যতোবার ওকে গান গাইতে শোনেন, ততোবারই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর বলেন, 'লোকটার কী বরাত! কতো সুন্দর গান গাইতে জানে!'

মাঝে মাঝে তিনি ওকে আমাদের বাড়ির মধ্যে ডেকে আনেন। অলিন্দের ওপর বসে ও, হাতের লাঠিটার ওপর শরীরের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে, তারপর

গান গায় ও আবৃত্তি করে। দিদিমা বসেন ঠিক ওর পাশটিতে, ওর গান বা আবৃত্তির মাঝখানেই মাঝে মাঝে নানারকম প্রশ্ন করে ওঠেন।

'তার মানে তুমি বলতে চাও যে মেরীমাতা র‍্যাজানেও গিয়েছিলেন?'

নীচু গলায় ও জবাব দেয়, 'মেরীমাতা যাননি এমন কোনো জায়গা নেই...'

একটা ক্লান্ত ঝিমুনি অলক্ষ্যে যেন রাস্তাটাকে গ্রাস করছে। আমার বুকের ওপরেও যেন চেপে বসেছে এই ঝিমুনির ভাব, আমার চোখদুটো ঘুমে ঢুলে আসছে। এই সময়ে যদি আমার দিদিমা আমার পাশটিতে থাকতেন! এমন কি, দাদামশাইও যদি থাকতেন! আমার বাবা নিশ্চয়ই এই বিচিত্র প্রকৃতির লোক ছিল। দাদামশাই ও মামারা আমার বাবার ওপরে এমন হাড়ে-হাড়ে চটা কেন? দিদিমা, গ্রিগরি আর ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার বাবার প্রশংসায় এমন পঞ্চমুখ কেন? আর মাই বা কোথায় চলে গেল?

সম্প্রতি মা'র কথাটাই আমার বারবার করে মনে পড়ে। কল্পনার চোখে দেখি, দিদিমা আমাকে যা-কিছু গল্প ও কাহিনী বলেন তার নায়িকা হচ্ছে আমার মা। মা যে নিজের বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকতে চায়নি এতে মা'র ওপরে আমার শ্রদ্ধা আরো অনেক বেশি বেড়ে গেছে। মনে মনে কল্পনা করি, মা আছে কোনো এক সরাইখানায় এক দস্যুদলের সঙ্গে। তারা ধনীদের টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলি করে। কিংবা মা হয়তো আছে গভীর অরণ্যে এক গুহার মধ্যে, এখানেও আছে তেমনি এক দরাজ-দিল ডাকাতের দল, মা তাদের জন্যে রান্না করে আর তাদের লুণ্ঠিত সোনা পাহারা দেয়। আবার কোনো কোনো সময়ে কল্পনা করি আমার মা যেন 'ডাকাত-রাজকুমারী' ইয়েনগালিচেভার মতো পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর ধনদৌলত গুণে দেখবার জন্যে। তার সঙ্গে আছেন পুণ্যময়ী মেরীমাতা। 'ডাকাত-রাজকুমারীকে' তিনি যা বলেছিলেন, আমার মাকেও তাই বলছেন:

ধরণীর গর্ভ হতে, লুব্ধা, তব তরে —
উত্তোলিত হয় নাই রজত-কাঞ্চন:
ঢাকিতে নারিবে কভু, রে লালসাময়ী
তব লজ্জা পৃথিবীর সকল সম্পদ...

এই শুনে 'ডাকাত-রাজকুমারী' যে-ভাষায় জবাব দিয়েছিল আমার মাও ঠিক সেই জবাবই দিচ্ছে:

পুণ্যময়ী দেবী মোর ক্ষমা কর মাতা,
আত্মা মোর কলুষিত, দয়া কর মোরে;

কিন্তু নহে নিজ তরে, প্রিয় পুত্র লাগি
আমার এ দস্যুবৃত্তি, সম্পদ লুণ্ঠন।

পুণ্যময়ী মেরীমাতার মনটা ছিল আমার দিদিমার মতোই নরম। আমার মা'র জবাব শুনে মাকে তিনি ক্ষমা করলেন এবং বললেন:

চতুরা শৃগালী সম রে ভারিয়া তুই
তাতারী চরিত্র তব শোধন অযোগ্য!
নিজ পথ একান্তই না ছাড়িবি যদি — তবে পথ বাছি লহ,
দিবাভাগ কর্ পরিহার
কিন্তু যেন রুশভূমি নিবাসী মানব নাহি হয়
তব হস্তে কভু নিপীড়িত,
অরণ্যের পথে মর্দোভীয় কেহ কষাঘাতে না হয় জর্জর,
কালমিক কেহ যেন স্তেপ-ভূমে না হয় নিহত...

মনে হতে লাগল, আমি স্বপ্ন দেখছি। এই সমস্ত গল্পগাথা আমার স্মৃতিতে ভিড় করে আসতে লাগল আর আমি তার মধ্যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললাম। হঠাৎ নিচের বারান্দার দিক থেকে একটা তর্জন-গর্জন ও হুটোপাটির শব্দ প্রচণ্ড ধাক্কায় জাগিয়ে দিল আমাকে। জানলা দিয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখলাম — আমার দাদামশাই, ইয়াকভ-মামা আর শুঁড়িখানার মালিকের অদ্ভুত চেহারার চাকর মেলিয়ান, এই তিনজনে ধাক্কা দিতে দিতে মিখাইল-মামাকে গেট দিয়ে রাস্তায় বার করে দিচ্ছে। মিখাইল-মামা তেড়েফুঁড়ে ফিরে আসছে বারবার আর ওরা তাকে লাথি মারছে, তার হাতে-পিঠে-কাঁধে সমানে কিল-চড় চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মিখাইল-মামা ছিট্‌কে গিয়ে রাস্তার ধুলোর ওপরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গেটটা দড়াম করে বন্ধ করে এঁটে দেওয়া হল একেবারে। দেওয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল মিখাইল-মামার দুমড়নো-মোচড়ানো টুপিটা। তারপরেই সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় পড়ে থেকে উঠে দাঁড়াল মিখাইল-মামা। জামাপ্যাণ্ট ছিঁড়ে গেছে, বিপর্যস্ত চেহারা, উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তা থেকে পাথর তুলে ছুঁড়ে মারল গেটের দিকে। নলের মধ্যে নুড়ি ফেললে যেমন ফাঁপা আওয়াজ হয় তেমনি আওয়াজ হল একটা। শুঁড়িখানা থেকে কালো মুখওলা একদল লোক পিলপিল করে বেরিয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল আর হাত নাড়তে লাগল। বাড়ির জানলাগুলো থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল মানুষের মাথা, হাঁকডাক-চিৎকার-হাসিতে প্রাণের সাড়া জাগল রাস্তায়। এও

একটা রূপকথার গল্পের মতো — মনকে টানে কিন্তু ভালো লাগে না, এমন কি ভয় জাগিয়ে তোলে।

হঠাৎ এই দৃশ্যের ওপরে যবনিকা নেমে এল। চারদিক জনমানবশূন্য ও নিস্তব্ধ।

...দরজার কাছে ট্রাঙ্কের ওপরে আমার দিদিমা বসে আছেন। নিশ্চল শরীরটা কুঁজো হয়ে দলা পাকিয়ে ছোট্ট এতটুকু হয়ে গেছে যেন, নিশ্বাসও পড়ছে না বোধ হয়। আমি দিদিমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তাঁর নরম উষ্ণ ভিজে গালের ওপরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে। কিন্তু মনে হচ্ছে, দিদিমা তা টের পাচ্ছেন না, বসে বসে আপন মনেই শুধু বিড়বিড় করে বলে চলেছেন:

'হায় প্রভু, তোমার বিচার-বিবেচনার ভাণ্ডার কি এতই ছোট যে আমার আর আমার ছেলেমেয়েদের বেলায় তার ছিটেফোঁটাটুকুও অবশিষ্ট রইল না? তুমিই সহায় প্রভু...'

যতোদূর মনে পড়ে, পলেভায়া স্ট্রীটের বাড়িতে এক বছরের বেশি আমার দাদামশাই ছিলেন না — এক বসন্ত থেকে আরেক বসন্ত পর্যন্ত। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়িটার কুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় প্রতি রবিবারেই রাস্তার চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলো ছুটতে ছুটতে আমাদের বাড়ির গেটের সামনে আসত আর সারা পাড়াকে জানানি দিয়ে প্রচণ্ড উল্লাসে চিৎকার করত:

ওরে, আয় রে আয়, কাশিরিনদের বাড়িতে আবার মারামারি শুরু হয়েছে!'

সাধারণত মিখাইল-মামা আসত সন্ধ্যার সময় আর সারা রাত এখান থেকে নড়ত না। বাড়ির লোকেরাও একটা আতঙ্ক নিয়ে মারামারির জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করত। মাঝে মাঝে আবার মিখাইল-মামার সঙ্গে থাকত তার দু-তিনজন চ্যালা — কুনাভিনো কারখানার গুণ্ডা-ধরনের ছোক্‌রা সব। নালা পার করে তারা এসে ঢুকত বাগানে আর সেখানে তাদের মাতলামির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে যেত। বাগানে ফুলফলের যা কিছু গাছগাছড়া ছিল সমস্ত উপড়ে ফেলেছিল। একদিন এসে তারা ঢুকল স্নানঘরে এবং সেখানে ভাঙবার মতো যা কিছু ছিল সমস্ত ভেঙে চুরে স্নানঘরটা একেবারে নষ্ট করে দিয়ে গেল। বেঞ্চি, তাক, জল ফুটবার বয়লার কিছুই তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল না। চুল্লিটাকে

ভেঙে দু-খানা করে ফেলল, মেঝে থেকে কয়েকটা পাটাতন টেনে উপড়ে ফেলল, বাজু সমেত দরজাটা ফাঁক করে ফেলল একেবারে।

দাদামশাই কালো মুখে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন তাঁর জিনিসপত্র ভাঙাচোরার শব্দ। দিদিমা ছুটে চলে গেলেন উঠোনের কোথায় এবং উঠোনের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন একেবারে। শুধু তাঁর কাতর মিনতিভরা গলার স্বর ভেসে আসল:

'মিখাইল! ওরে মিখাইল! কি করছিস তুই ভেবে দ্যাখ্!'

উত্তরে কুৎসিত প্রলাপের মতো কতগুলি গালি ভেসে এল। যে-জানোয়ারেরা এই গালিগুলো উগ্‌রিয়েছে তাদের নিশ্চয়ই এমন বুদ্ধি বা বিবেচনা ছিল না যে একবার ভেবে দেখে এই গালিগুলোর অর্থ কী।

এ রকম একবারে দিদিমার পিছনে পিছনে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু একা একা থাকতেও ভয় করে। নিচে নেমে আমি দাদামশাইয়ের ঘরে গেলাম।

'হারামজাদা, বেরিয়ে যা বলছি এখান থেকে।' আমাকে দেখতে পেয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন।

ছুটে গিয়ে আবার ছাদের ঘরে উঠলাম আর তাকিয়ে রইলাম বাগানের অন্ধকারের দিকে। চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা করি দিদিমাকে, চিৎকার করে ডাকতে থাকি তাঁকে। আমার ভয় হচ্ছিল, দিদিমাকে ওরা মেরে ফেলবে। দিদিমা ফিরে আসেন না। কিন্তু আমার গলার স্বর শুনতে পেয়ে মাতাল মিখাইল-মামা এবার আমার মাকে উদ্দেশ করেই কুৎসিত গালাগালি দিতে লাগে।

এমনি আরেক সন্ধ্যায় আমার দাদামশাই অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। বালিশে তোয়ালে মোড়া মাথাটা অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করতে করতে মনের দুঃখ প্রকাশ করছিলেন চিৎকার করে:

'সারা জীবন এত জ্বলেপুড়ে, এত পাপ করে, অন্যায় করে, আমি যে টাকাপয়সা জমালাম — তা এর জন্যে! আমারই মুখে কালি পড়বে, নইলে ওটাকে ধরে আমি পুলিসে দিতাম আর আগামীকালই লাটসায়েবের সামনে উপস্থিত করতাম... কিন্তু কী লজ্জার কথা! কস্মিনকালে কেউ শুনেছে যে নিজের ছেলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পুলিসের সাহায্য বাপমাকে চাইতে হয়? শুনে রাখ্ রে বুড়ো তাহলে, তোর আর কোনো উপায় নেই, এমনিভাবেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে চুপ করে সহ্য করতে হবে!..'

কিন্তু হঠাৎ দাদামশাই এক হ্যাঁচ্‌কা টানে পা-দুটো বিছানার ধার দিয়ে নামিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চললেন জানলার দিকে। দিদিমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দাদামশাইয়ের একটা হাত ধরে চে'চিয়ে উঠলেন, 'একি, কোথায় চলেছ?'

'একটা আলো জ্বালাও তো!' বললেন দাদামশাই। ভয়ানকভাবে হাঁপাচ্ছিলেন তিনি।

দিদিমা মোমবাতি জ্বালালেন আর তখন তিনি সেই জ্বলন্ত মোমবাতিটাকে বন্দুকের মতো সামনের দিকে উ'চিয়ে ধরে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে জানলা দিয়ে চে'চিয়ে চে'চিয়ে বলতে লাগলেন, 'ও রে মিশ্‌কা! রাত্রিবেলার চোর তুই, ঘেয়ো কুকুরের মতো হন্যে হয়ে...'

সঙ্গে সঙ্গে জানলার ওপরের দিকের শার্সির কাঁচটা ঝন্‌ঝন শব্দে ভেঙে পড়ল আর একটা আধলা ইট ঠক্‌ করে এসে পড়ল টেবিলটায় দিদিমার পাশে।

'ফস্‌কে গেছে!' দাদামশাইয়ের গলা দিয়ে একটা চেরা আওয়াজ বেরিয়ে এল; সে আওয়াজ কান্নারও হতে পারে, হাসিরও হতে পারে।

দিদিমা ঠিক যেমনভাবে আমাকে কোলে তুলে নেন, তেমনিভাবে দাদামশাইকে কোলে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানায় আর আতঙ্কিত স্বরে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন:

'তুমি কি পাগল হলে নাকি? যীশু খৃষ্টের দোহাই, একটু চুপ করে থাকো! যদি কিছু হয় তাহলে ছেলেটাকে যে সারা জীবনের জন্যে সাইবেরিয়ায় ঠেলে দেবে! ওর কি কিছু জ্ঞানগম্যি আছে? ও কি আর বুঝতে পারছে যে ও যা কান্ডকারখানা শুরু করেছে তাতে ধরা পড়লে সাইবেরিয়ায় যেতে হবে?'

দাদামশাই বিছানায় শুয়ে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে, কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় চিৎকার করল: 'খুন করুক, ও আমাকে খুন করুক...'

বাইরে থেকে একটা তর্জন-গর্জন ও দাপাদাপির আওয়াজ ভেসে এল। টেবিলের ওপর থেকে সেই আধলা ইটটা তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটলাম জানলার দিকে। কিন্তু দিদিমা সময় থাকতেই এক হ্যাঁচ্‌কা টানে আমাকে সরিয়ে এনে কোণের দিকে ঠেলে দিলেন।

'এই আর এক বিচ্ছু শয়তান!' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন তিনি।

আরেকবার মিখাইল-মামা এল মস্ত একটা লাঠি নিয়ে। অলিন্দের ওপর দাঁড়িয়ে সদর দরজা ভেঙে ফেলছিল। ওদিকে সদলবলে দাদামশাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, মিখাইল-মামা একবার এলেই হয় আর কি! তাঁর সঙ্গে আছে

লাঠিহাতে দুজন ভাড়াটে আর রুটি বেলবার বেলনটাকে হাতের মুঠোয় ধরে শুঁড়িখানা-মালিকের বিরাটবপু বৌ। সবার পিছনে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করছেন দিদিমা। মিনতিভরা স্বরে দিদিমা বলে চলেছেন: 'আমাকে একবার ওর কাছে যেতে দাও! আমি একবার ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি!'

দাদামশাই হাতের লাঠিটাকে উঁচিয়ে ধরে এক পা সামনে বাড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'ভালুক শিকার' ছবিটার বর্শা হাতে সেই চাষীর মতো তাঁকে দেখাচ্ছে। দিদিমা ছুটে এগিয়ে আসতেই দাদামশাই একটিও কথা না বলে পা আর কনুইয়ের সাহায্যে ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাঁকে। প্রতীক্ষমাণ চারটি মানুষ হিংস্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাতি ঝুলছে মাথার ওপরকার দেওয়ালে আর সেই বাতির কখনো-উজ্জ্বল কখনো-ম্লান আলো এসে পড়ছে মানুষ চারজনের মুখের ওপরে। ছাদের ঘরে উঠবার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমি তাকিয়ে আছি, দিদিমার জন্যে উদ্বিগ্ন আমি, দিদিমাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারলে খুশি হই।

ওদিকে সদর দরজায় প্রচণ্ডভাবে ঘা দিয়ে চলেছে মিখাইল-মামা। নিচের দিকের কব্‌জাটা ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে আর ভারি বিশ্রী একটা ঘশ্‌-ঘশ্‌ শব্দ হচ্ছে ওটা থেকে। দরজাটা এখন শুধু ঝুলে আছে ওপরের কব্‌জার জোরেই। তবে ওটার আয়ুও আর বেশিক্ষণ নয়। দাদামশাই নিজের দলবলের দিকে তাকিয়ে গলা থেকে তেমনি বিশ্রী একটা ঘশ্‌-ঘশ্‌ শব্দ বার করে বললেন: 'খেয়াল রেখো, ওর হাত আর পা লক্ষ্য করে বাড়ি মারবে কিন্তু মাথায় নয়।'

সদর দরজার ঠিক পাশেই ছিল একটা ছোট জানলা। জানলাটা দিয়ে কোনো রকমে শুধু একটা মানুষের মাথা গলতে পারে। মিখাইল-মামা ইতিমধ্যেই এই জানলার কাঁচের শার্সি ভেঙে ফেলেছে। এখন কেবল অন্ধকারের দিকে একটা হাঁ-করা গর্ত আর ভাঙা কাঁচের টুকরো টুকরো অংশগুলো লেগে আছে গর্তের কিনারায় -- চোখ উপড়ে নেওয়া শূন্য কোটরের মতো দেখাচ্ছে জানলাটাকে।

দিদিমা ছুটে গেলেন এই জানলার কাছে, তারপর ফাঁক দিয়ে একটা হাত বার করে দিয়ে মিখাইলের দিকে সেই হাতটা নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে বলতে লাগলেন:

'মিশা, ওরে মিশা, যীশু খ্রীষ্টের দোহাই, তুই চলে যা! ওরা তোকে সারা জীবনের মতো নুলো করে দেবে! চলে যা তুই!'

মিখাইল-মামা হাতের লাঠিটা দিয়ে দিদিমার হাতের ওপর বাড়ি মারল।

আমি দেখতে পেলাম, ভারী একটা জিনিস বিদ্যুৎঝলকের মতো জানলার সামনে দিয়ে নেমে এসে পড়ল দিদিমার হাতের ওপরে। হাতের ওপরে বাড়ি খেয়ে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়লেন দিদিমা, কিন্তু নিশ্চল ও নির্বাক হবার আগে কোনো মতে আর একবার চিৎকার করে বলতে পারলেন: 'পালিয়ে যা, মিশ-শা ...'

'হায় হায়, গিন্নী!' ভীতিপ্রদ গলায় কাৎরে উঠলেন দাদামশাই।

দরজাটা খুলে গেল আর খোলা দরজার কালো ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে ভিতরে ঢুকল মিখাইল-মামা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কোদালভর্তি ময়লার মতো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হল তাকে।

শুঁড়িখানা-মালিকের বৌ দিদিমাকে তুলে নিয়ে দাদামশাইয়ের ঘরে নিয়ে এল। শীঘ্রই সেখানে এলেন দাদামশাইও।

'হাড়-টাড় ভেঙেছে নাকি?' দিদিমার ওপরে বিষণ্নমুখে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'তাই তো মনে হচ্ছে।' চোখ না খুলেই দিদিমা জবাব দিলেন, 'কিন্তু ছেলেটার কী দশা করেছো — বলো, বলো!'

দাদামশাই ফুঁসে উঠলেন, 'চুপ করো! আমি কি পশু? ওকে আমরা হাত-পা বেঁধে ভাঁড়ারে ফেলে রেখেছি। আর এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছি ওর মাথায়... পাষণ্ড দেখতে চাও তো তাকে দেখো! কেমন করে এমন সে হোলো?'

যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলেন দিদিমা।

বিছানার ওপরে দিদিমার পাশটিতে বসে দাদামশাই বললেন, 'আর কিছুক্ষণ সহ্য করো। হাড় ঠিকমতো বসিয়ে দেবার জন্যে আমি লোক আনতে পাঠিয়েছি। এক্ষুণি এসে যাবে। আর এই তোমাকে বলে রাখছি, এই ছেলেমেয়েগুলোর জন্যেই আমাদের মরতে হবে — আয়ু না ফুরোতেই আশ্রয় নিতে হবে কবরে।'

'যা আছে সব ওদের দিয়ে দাও।'

'তাহলে ভারভারার কী হবে?'

অনেকক্ষণ ধরে চলল দুজনের কথাবার্তা। দিদিমার স্বরটা শান্ত ও যন্ত্রণাকাতর, দাদামশাইয়ের ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত।

তারপর ঘরে ঢুকল এক কুঁজো আর বেঁটে বুড়ী। আকর্ণবিস্তৃত মুখ, মাছের মতো মুখটা হাঁ-করা, তলার চিবুকটা সব সময়েই থর্‌থর্‌ করে কাঁপে

আর ওপরের ঠোঁটটাকে খাড়া একটা নাক দু-ভাগে চিরে দিয়েছে মনে হয়। বুড়ীর চোখ দেখা যায় না। পা-দুটো নাড়াবার ক্ষমতাও বুড়ীর প্রায় নেই। লাঠির ওপর ভর দিয়ে মেঝের ওপর দিয়ে পা ঘষতে ঘষতে বুড়ী এগিয়ে এল। তার হাতে ছিল একটা পুঁটলি; ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হতে লাগল পুঁটলিটার মধ্যে থেকে।

আমি ভাবলাম, এই বুড়ী আর কেউ নয়, স্বয়ং মৃত্যু দিদিমার কাছে আসছে। বুড়ীর সামনে ছুটে গিয়ে আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

দাদামশাই আমাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরলেন, তারপর কোনো রকম মায়ামমতা না দেখিয়ে হ্যাঁচ্‌কা টানে আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে উঠে এলেন ছাদের ঘরে...

সাত

অত্যন্ত অল্প বয়সে আমি বুঝতে পারলাম, আমার দাদামশাইয়ের ও দিদিমার ভগবান এক নয়।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দিদিমা সাধারণত অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় বসে বসে তাঁর মাথার সেই আশ্চর্য গোছা-গোছা চুল আঁচড়াতে থাকেন। কালো রেশমের মতো লম্বা সেই চুলের গোছা আল্‌গা করে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা ঝাঁকুনি দেন। আর নিজের চুলকে গালাগালি দিয়ে মনের ঝাল প্রকাশ করেন। নিশ্বাস-চাপা স্বরে উচ্চারণ করেন শব্দগুলো যাতে আমার ঘুম না ভাঙে।

'তোদের মুখে আগুন, তোদের মুখে আগুন!'

তারপর চুলের জট্‌ মোটামুটি ছাড়ানো হয়ে গেলে চুলগুলোকে ঘন বেণীতে পাকিয়ে নেন এবং ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কুলকুচো করতে করতে দ্রুত হাতমুখ ধুতে শুরু করেন। ঘুমের পরে তাঁর প্রকাণ্ড মুখে চামড়ার ভাঁজগুলো গভীর হয়ে উঠেছে, মুখে বিরক্তির চিহ্ন — হাতমুখ ধোবার পরেও সেই বিরক্তির খানিকটা থেকে যায়। এই অবস্থাতেই তিনি এসে হাঁটু মুড়ে বসেন বিগ্রহের সামনে। তারপরেই শুরু হয় তাঁর সত্যিকার প্রাতঃকালীন অবগাহন যা তাঁর সমস্ত গ্লানিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করে দেয়।

শিরদাঁড়া সোজা করে, মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে দিয়ে তিনি প্রীতিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কাজানের মেরীমাতার গোল মুখখানার দিকে; মনের সমস্ত ভক্তি উজাড় করে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন বুকের ওপরে আর ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন:

'পুণ্যময়ী মেরীমাতা, আসন্ন এই দিনটিতে তোমার আশীর্বাদ ঢেলে দাও...'

তারপর মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করেন, ধীরে ধীরে মাথা তোলেন, ভক্তিরুদ্ধ কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে থাকেন আবার:

'হে সকল আনন্দের উৎস, হে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, ফুলভারাবনত আপেলবৃক্ষের মতো হে...'

অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাসকে প্রায় প্রতিদিনই তিনি নতুন নতুন ভাষার অলঙ্কারে প্রকাশ করেন। এই নতুন নতুন ভাষার অলঙ্কার শোনবার জন্যে রোজই আমি উৎকর্ণ মনোযোগে তাঁর প্রার্থনা-বাণী শুনি।

'ওগো আমার প্রাণনিধি, পবিত্র, স্বর্গীয়! তুমি আমার আত্মার আলো, আমার রক্ষক! তুমি স্বর্গের সূর্য, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি স্বর্ণাভ! তুমি স্বর্গের জননী! পাপ আমাদের দিকে ছুটে আসছে — আমাদের বাঁচাও সেই পাপের হাত থেকে, আমাদের বাঁচাও গালাগালির হাত থেকে, আর আমি যে মাঝে মাঝে অকারণে চটে যাই তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর...'

তাঁর কালো চোখের গভীরে একটুখানি হাসি যেন ঝিকমিক করে, তাঁর বয়স আরো কমে গেছে মনে হয়, ভারি হাতখানা তুলে আস্তে আস্তে আবার তিনি বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন।

'ঈশ্বরের সন্তান হে পরমপ্রিয় যীশু, আমি এক অধম পাপী — আমাকে করুণা করো... স্বর্গের জননীর নামে আমাকে করুণা করো...'

তাঁর উপাসনা হয়ে ওঠে প্রশংসাসূচক নামকীর্তন, সরল ও নিষ্ঠাভরা অন্তর থেকে উৎসারিত স্তবগান।

সকালবেলা তিনি বেশিক্ষণ উপাসনা নিয়ে থাকতে পারেন না। সামোভার জ্বালানোর তাগিদ থাকে। দাদামশাই বাড়ির চাকর ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন; সুতরাং দিদিমার দেরির ফলে দাদামশাইকে যদি কোনো দিন সকালের চায়ের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয় তাহলে আর দিদিমার রক্ষে নেই। দাদামশাই সেদিন প্রচণ্ড ফাটাফাটি শুরু করে দেন আর সহজে তা থামতে চায় না।

কোনো দিন যদি দিদিমার চেয়ে আগে দাদামশাইয়ের ঘুম ভাঙে তাহলে তিনি উঠে আসেন ছাদের ঘরে আর এসে দেখেন দিদিমা উপাসনায় বসেছেন। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিদিমার উপাসনা শোনেন তিনি, তাঁর কালো পাতলা ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। পরে চায়ের টেবিলে বসে তিনি মন্তব্য করেন:

'তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হবে না গো! কি-ভাবে উপাসনা করতে হয় তা তোমায় কতদিন শিখিয়ে দিয়েছি কিন্তু সে সব তুমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছো না। জংলীদের মতো বিড়বিড় করে কী যে সব বলো কিছু বুঝি না। আর ভগবান যে কী করে এসব সহ্য করেন তাও মাথায় ঢোকে না আমার!'

বিশ্বাসভরা সুরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'ভগবান সবই বোঝেন। যা-ই বলা যাক্ না কেন, যেভাবেই বলা যাক্ না কেন, ভগবান নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন।'

'উন্মাদ তুমি, বুঝলে! — হ্যাঃ ...'

দিদিমার ভগবান সারাদিন দিদিমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। এমন কি জন্তুজানোয়ারকেও তাঁর এই ভগবানের কথা বলেন তিনি। আর তাঁর এই ভগবানের কোনো ঝামেলা নেই। যে কেউ -- মানুষ, কুকুর, পাখি, মৌমাছি, এমন কি মাঠের ঘাস পর্যন্ত নিজেকে এই ভগবানের হাতে সঁপে দিতে আপত্তি করবে না। এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছুর প্রতিই তাঁর সমান স্নেহ, সমস্ত কিছু তাঁর কাছে সমান আদরের।

শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নীর একটা পোষা হুলো-বেড়াল ছিল। ভারি সুন্দর বেড়ালটা; ছাইরঙা শরীর, সোনালী রঙের চোখদুটো; আর যদিও মিটমিটে শয়তানি ও চুরি করে খাওয়া, দু-ব্যাপারেই বেড়ালটা ছিল ওস্তাদ, তা সত্ত্বেও সবাই ভালোবাসত সেটাকে। একদিন বেড়ালটা একটা স্টার্লিংপাখি ধরেছিল। তাই না দেখে আহত পাখিটাকে বেড়ালটার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দিদিমা ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠেন:

'ওরে বিট্‌কেলে জানোয়ার, তোর প্রাণে কি ভগবানের ভয়ও নেই রে!'

দিদিমার কথা শুনে শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী আর বাড়ির দরওয়ান হাসছিল। দিদিমা ওদের দুজনের ওপরেই চটে গিয়ে চিৎকার করতে থাকেন:

'তোরা ভাবিস কী, জন্তুজানোয়াররা ভগবানের কথা জানে না? ওরে অবিশ্বাসী, শুনে রাখ্, জন্তুজানোয়ারের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে তুচ্ছ, সেও ভগবানের কথা তোদের চেয়ে কিছু কম জানে না।'

মোটা আর ভগ্নোৎসাহ শারাপ ঘোড়াটাকে সাজিয়ে আস্তে আস্তে তিনি বলেন: 'কী রে ভগবানের দাস, এত মন খারাপ কেন? বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস বুঝি? ...'

ঘোড়াটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আর মাথা নাড়ে।

তবুও আমার দাদামশাই দিনের মধ্যে যতোবার ভগবানের নাম মুখে উচ্চারণ করেন, দিদিমা তা করেন না। দিদিমার ভগবানকে আমি বুঝতে পারি, দিদিমার ভগবানকে আমার ভয় করে না, কিন্তু দিদিমার ভগবানের সামনে মিথ্যে কথা বলবার সাহস আমার নেই। তা বলাটা খুবই লজ্জার ব্যাপার মনে হয় আমার কাছে। এই লজ্জার জন্যেই আমি দিদিমার কাছে কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারি না। যে ভগবানের এত দয়া, তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব, আর যতদূর আমার মনে আছে, এ-ধরনের ইচ্ছেও আমার মনে কোনো দিন জাগেনি।

একদিন শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নীর সঙ্গে আমার দাদামশাইয়ের ঝগড়া হয়ে গেল। আমার নিরীহ দিদিমাকেও অজস্র গালি পাড়ল শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী, এমন কি একটা গাজর ছুঁড়ে মারল দিদিমার দিকে।

দিদিমা শুধু শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে দেখছি!' কিন্তু দিদিমার এই হেনস্তা দেখে আমার প্রচণ্ড রাগ হল এবং ঠিক করলাম যে-করে হোক্ এ-ব্যাপারের প্রতিশোধ নিতে হবে।

তারপর থেকে এই চিন্তাটাই আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। এই স্ত্রীলোকটির শরীরটা বিপুল, মাথায় লাল চুল, মোটা চিবুক, চোখ প্রায় নেই বললেই চলে — কি করে যে এই স্ত্রীলোকটিকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে তাই আমি ভাবতে লাগলাম।

পাড়াপড়শীদের মধ্যে যখন ঝগড়াবিবাদ হয় তখন আমি দেখেছি একজন আরেক জনের ওপরে নানাভাবে প্রতিশোধ নেয়। যেমন, বেড়ালের ল্যাজ কেটে ফেলে দেওয়া, বিষ খাইয়ে কুকুর মেরে দেওয়া, মুরগী মেরে ফেলা; কিংবা রাত্রিবেলা চুপিচুপি শত্রুপক্ষের মাটির নিচের ভাঁড়ারে ঢুকে কপি বা শশাভরা পিপেয় কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আসা; কিংবা ক্ভাস'এর পাত্রের মুখ খুলে দিয়ে আসা ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার এই ধরনগুলোর একটাও আমার ভালো লাগল না। এর চেয়েও ভয়ংকর এবং এর চেয়েও দুঃসাহসী কিছু একটা উপায় ভাবা দরকার।

অনেক ভেবেচিন্তে যে উপায়টা আমি বার করলাম, তা হচ্ছে এই: একদিন শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী যেই না মাটির নিচের ভাঁড়ার ঘরে নেমেছে, আমি চট্ করে মাথার ওপরকার ঢাকনাটা দিলাম বন্ধ করে। তারপর ঢাকনাটায় তালা লাগিয়ে দিয়ে মহানন্দে কিছুক্ষণ নৃত্য করলাম ঢাকনাটার ওপরে তারপরে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ছাদের ওপরে। দিদিমা রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমি ছুট্তে ছুট্তে গিয়ে দাঁড়ালাম সেখানে। আমার এই উল্লাসের কারণ দিদিমা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেননি। তারপরে ব্যাপারটা ধরতে পেরে ঠাস্ করে চড় লাগালেন কয়েকটা; মানুষের শরীরের যে-জায়গাটা চড় মারবার জন্যে তৈরি হয়েছে সেই জায়গাতেই চড় মারলেন। হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমাকে উঠোনে নিয়ে এসে ছাদে পাঠিয়ে দিলেন চাবিটা খুঁজে আনবার জন্যে। দিদিমার এই চোটপাটের বহর দেখে আমি তো হতভম্ব; একটিও কথা না বলে আমি চাবিটা এনে দিলাম দিদিমার হাতে, তারপর উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম, দিদিমা কি করেন। দেখলাম, দিদিমা বন্দিনীকে মুক্ত করে দিলেন এবং সেই স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন আমার দিকে। দুজনের মুখেই ভারি অমায়িক হাসি।

শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী তার মোটা মোটা হাতের মুঠি পাকিয়ে আমাকে শাসাল: 'আমি তোকে দেখাব!' কিন্তু মুখে একথা বললেও তার চোখশূন্য মুখটাতে সহানুভূতির হাসি ফুটে উঠেছিল, সে-মুখে এতটুকু ঝাঁজ নেই। দিদিমা আমার ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে আমাকে নিয়ে এলেন রান্নাঘরে, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'বল্ হতভাগা, কেন তুই ঢাকনাটা বন্ধ করেছিলি?'

'ও কেন তোমার দিকে গাজর ছুঁড়ে মেরেছিল?'

'ও-ও-ও! তাহলে আমার জন্যেই তুই একাজ করতে গিয়েছিলি বল্। দাঁড়া, আজ তোকে আমি মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি, ডান্‌পিটে শয়তান! ওই চুল্লির ছাইয়ের মধ্যে যখন তোকে গুঁজে দেব আর সারা গায়ে পিলপিল করে ইঁদুর ছুটোছুটি করবে — তখন কিছুটা বুদ্ধি আসবে! দেখো সকলে, আমার রক্ষক যে কেমন! ফাটবার আগে এই ছোট্ট বুদ্বুদকে দ্যাখো একবার। তোর দাদামশাইকে যদি বলে দিই তাহলে মারতে মারতে তোর পাছার ছালচামড়া তুলে ফেলবে — তা জানিস? যা, এক্ষুণি ঘরে গিয়ে পড়ার বই নিয়ে বোস্!'

সারাদিন দিদিমা আর আমার সঙ্গে কথা বললেন না। সন্ধ্যার সময় উপাসনায় বসার আগে তিনি এসে বসলেন আমার বিছানার

পাশে, তারপর যে কথাগুলো বললেন তা আমি কখনো ভুলব না। কথাগুলো এই:

'সোনা আমার, মানিক আমার, তোকে কতগুলো কথা বলে রাখছি, ভুলিসনে যেন। কক্ষণো বড়োদের কোনো ব্যাপারে থাকবি না। বড়রা উচ্ছন্নে গেছে — নানা প্রলোভন আর খাটুনির ফলেই। কিন্তু তুই এখনো যাসনি, এখনো না। তাই তুই তোর ছেলেমানুষী বুদ্ধি যা ভালো বলে তাই নিয়ে বড় হয়ে ওঠ, যতক্ষণ না ঈশ্বর তোর হৃদয়কে স্পর্শ করেন আর তোর পথ তোকে দেখান, দেখান কোন পথ দিয়ে তোকে এগিয়ে যেতে হবে। ভগবানই বিচার করবেন, ভগবানই শাস্তি দেবেন। তুই আমি কারও দোষগুণ বিচার করতে যাব না, সে-বিচারের ভার ভগবানের ওপর!'

এই বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার ফাঁকে তিনি একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর ডান চোখটা সরু করে বলে চললেন আবার:

'মাঝে মাঝে মনে হয় স্বয়ং প্রভুও বুঝতে পারেন না, দোষটা কার।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, তিনি তো সবই টের পান, নয় কি?'

বিষণ্ণ সুরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'তা যদি পেতেন তবে পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঘটে যা আর ঘটত না। প্রভু তো স্বর্গে বসে আছেন, সেখান থেকে নিচের দিকে, পৃথিবীতে, তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি দেখেন, এই পাপী মানুষরা কি করছে। মাঝে মাঝে মানুষের দুঃখে তার বুক ফেটে যায়, অঝোরে তিনি কাঁদতে থাকেন আর বলেন, "হায় আমার সন্তানরা! আমার নিজের সন্তানরা, আমার এত আদরের সন্তানরা! তোদের দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!"'

কথাগুলো বলতে বলতে দিদিমা নিজেও কাঁদলেন। চোখের জল মুছবার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না, আইকনের কাছে গিয়ে উপাসনা করতে শুরু করলেন।

সেদিন থেকে দিদিমার ভগবান আমার আরো আপনজন হয়ে উঠলেন, তাঁকে যেন আমি আরো বেশি করে বুঝতে পারলাম।

আমাকে পড়াতে বসে দাদামশাইও আমাকে বলেন যে ভগবান সবকিছু দেখেন, সবকিছু জানেন, সব জায়গায় আছেন — মানুষের দুঃখে বিপদে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু দাদামশাইয়ের উপাসনা দিদিমার উপাসনার মতো নয়।

সকালবেলা উঠে বিগ্রহের সামনে যাবার আগে পরিপাটি করে হাতমুখ ধুয়ে আসেন তিনি, পোশাক পরেন, মাথার লাল চুল ও দাড়ি আঁচড়ান, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক করেন গায়ের জামা, ঠিক করেন ওয়েস্টকোটের ফাঁক দিয়ে গুঁজে দেওয়া কালো স্কার্ফটা। এতগুলো কাজের প্রত্যেকটি ঠিক-ঠিক হয়ে যাবার পরে চোরের মতো পা টিপে টিপে এগিয়ে আসেন আইকনের কাছে। প্রতিদিন ঠিক একই জায়গায় দাঁড়ান তিনি, কাঠের নক্শা-বসানো মেঝের এক বিশেষ সন্ধিস্থলে, ঘোড়ার চোখের মতো দেখতে জায়গাটা। হাতদুটো সৈনিকের মতো টান করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, মাথাটা নিচু ঝুঁকে পড়ে, পাতলা ঋজু শরীর — তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে বলতে থাকেন তিনি:

'আমাদের পরম পিতা এবং তাঁর সন্তান এবং দেবাত্মার নামে।'

আর তা শুনে প্রতিবারই মনে হয়েছে, কথাগুলো উচ্চারিত হবার পরে ঘরখানার মধ্যে থমথমে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। এমন কি মাছিগুলোর ভনভনানিতেও যেন কিছুটা সাবধানী ভাব।

এবার তিনি মাথাটা পিছনদিকে ঠেলে দেন, তাঁর সোনালী দাড়ি মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যায়, কুঁচি-কুঁচি ভুরুগুলো খাড়া হয়ে ওঠে — এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে উপাসনা করেন তিনি। ঋজু গলার স্বর, বেশ জোরের সঙ্গে দাবি জানানর ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেন প্রতিটি শব্দ — মনে হয় যেন পড়া মুখস্থ বলছেন।

'মানুষের জানা-অজানার নির্মোক খসিয়ে আসুক সেই পরম বিচারের দিন... শুরু হোক্ মানুষের পাপ-পুণ্যের শেষ বিচার...'

বুকের ওপরে আলগোছে চাপড় মারতে মারতে তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে চলেন:

'হে প্রভু, শুধু তোমার কাছেই আমার পাপ... আমার পাপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকো প্রভু...'

প্রত্যেকটি শব্দের ওপরে জোর দিয়ে তিনি বন্দনা-গীত আবৃত্তি করেন, ডান পা নাচিয়ে নাচিয়ে তাল দেন সঙ্গে সঙ্গে। ভারি পরিপাটি, ভারি পরিচ্ছন্ন, ভারি প্রভুত্বব্যঞ্জক চেহারা; দেবতার প্রতিমূর্তির সামনে টান করে মেলে দিয়েছেন নিজের শরীর, আরো যেন লম্বা হয়ে উঠেছেন, আরো পাতলা, আরো ঋজু।

'হে সর্বপাপহর! আমার অন্তরের সমস্ত পাপ দূর করো, হে স্বর্গের জননী! আমার আত্মার গভীর থেকে কান্না উঠে আসছে, আমাকে করুণা করো!'

গলার স্বরটা বিলাপের মতো হয়ে ওঠে, সবুজ চোখের কোণে অশ্রুর ফোঁটা চক্‌চক্‌ করে:

'হে ঈশ্বর, আমাকে বিচার কোরো আমার কৃতকর্ম দিয়ে নয়, আমার ভক্তি দিয়ে। আমার যতোটুকু শক্তি তার চেয়ে বেশি বোঝা আমার ওপরে চাপিও না প্রভু...'

উত্তেজনা-অস্থির হাতের দ্রুত বিক্ষেপে বারবার ক্রুশচিহ্ন আঁকেন বুকের ওপরে, মাথা নাড়েন ঢুঁ-মারতে-আসা ছাগলের মতো, কথা বলেন সাঁই-সাঁই করে, নিশ্বাস ফেলেন একঘেয়ে একটানা সুরে। পরে বড় হয়ে ইহুদিদের ভজনালয় দেখে বুঝতে পারি দাদামশাই ইহুদিদের মতো উপাসনা করেন।

ইতিমধ্যে অনেকক্ষণ থেকেই টেবিলের ওপরে রাখা সামোভার থেকে বাষ্প উঠছে, বাড়িতে তৈরি পনীর দিয়ে ঠাসা সদ্য-সেঁকা যবের কেকের গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। প্রচন্ড খিদেতে গর্জন শুরু করেছে আমার পেটটা। দিদিমা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার বাজুতে ঠেস্‌ দিয়ে, চোখ মেঝের দিকে নামানো, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন আর ভুরু কোঁচকাচ্ছেন। খুশির সঙ্গে জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে সূর্যের আলো। গাছের পাতায় মুক্তোর মতো চক্‌চক্‌ করছে শিশিরবিন্দু। ভোরের বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে ধনে পাতা, কারাণ্ট আর পেকে আসা আপেলের তাজা গন্ধ। কিন্তু দাদামশাই তখনো পা নাচিয়ে নাচিয়ে একটানা সুরে প্রার্থনা করে চলেছেন:

'আমার কামনার আগুন নিভিয়ে দাও হে প্রভু, আমি অতি অধম, আমি অতি নীচ!'

দাদামশাইয়ের সকাল-সন্ধ্যার উপাসনা-বাণী আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। উপাসনা করবার সময়ে তিনি কোনো ভুল করেন কিনা বা কোনো শব্দ বাদ দিয়ে যান কিনা তা দেখবার তীব্র কৌতূহলে আমি লক্ষ্য করতাম তাঁকে।

দাদামশাইয়ের ভুলভ্রান্তি কদাচিৎ হত। আর যখনই হত, মনের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হবার মতো প্রচন্ড উল্লাসে আমি মেতে উঠতাম।

উপাসনা শেষ হলে দাদামশাই আমার দিকে আর দিদিমার দিকে তাকিয়ে বলেন: 'সুপ্রভাত!'

আমরা মাথা নিচু করি এবং এতক্ষণ অপেক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত টেবিলের চারপাশে বসি গিয়ে নিজের নিজের জায়গায়।

'আজকের উপাসনায় "যথেষ্ট" কথাটি বাদ গেছে।' দাদামশাইয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলি আমি।

'তাই নাকি রে? ঠিক বল্‌ছিস?' সন্দেহভরা গলায় দাদামশাই জিজ্ঞেস করেন।

'ঠিকই বলছি। উপাসনা করবার সময়ে এক জায়গায় তুমি বলো— "হে প্রভু, আমার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ভক্তি যেন আমার থাকে"—সেই জায়গায় "যথেষ্ট" কথাটি বাদ গেছে।'

অপরাধীর মতো চোখ পিটপিট করতে করতে দাদামশাই বলেন, 'হুঁ!'

অবশ্য এই মন্তব্যটুকু করার জন্যে পরে একদিন দাদামশাই আমার ওপর শোধ তুলে নেন কিন্তু আপাতত এই সময়টুকুর জন্যে দাদামশাইয়ের বিব্রত ভাব দেখে আমি আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠি।

একদিন দিদিমা ঠাট্টার সুরে বললেন:

'তুমি রোজই সেই একই কথা বলো, একটুও এদিক ওদিক নেই — তোমার উপাসনা শুনে শুনে ভগবানের নিশ্চয়ই একঘেয়ে লাগে!'

'কী-ই-ই?' দাদামশাই ফুঁসে উঠলেন একেবারে, 'কী বলছ তুমি, খেয়াল আছে?'

'আমি কী বলছি জান? তোমার স্রষ্টার উদ্দেশে তুমি যেসব কথা বলো তা কক্ষণো তোমার প্রাণের কথা নয়।'

রাগে লাল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাদামশাই নিজের চেয়ারে বসে লাফিয়ে উঠলেন, তারপর একটা পিরিচ ছুঁড়ে মারলেন দিদিমার দিকে। কাঁচের ওপরে করাত ঘষলে যেমন শব্দ হয় তেমনি কিচ্‌কিচ্‌ গলায় তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'ডাইনি বুড়ী, দূর হয়ে যা এখান থেকে!'

ঈশ্বরের শক্তিমত্তার কথা যখনই তিনি বলেন তখনই তিনি জোর দেন ঈশ্বরের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার ওপর। একাধিক দৃষ্টান্ত দেন তিনি। একবার একদল পাপী বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। আরেকবার পাপীদের শহর ছাই হয়ে গিয়েছিল আগুনে পুড়ে। পাপের শাস্তি হিসেবে এসেছে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। ঈশ্বর হচ্ছেন উদ্যত তলোয়ারের মতো, দুর্বৃত্তদের মাথার ওপরে উদ্যত চাবুক।

'ঈশ্বরের আইন অমান্য করার পরিণাম অতি ভয়ংকর।' পাতলা পাতলা

বাঁকা আঙ্গুলে টেবিলের ওপরে টোকা দিতে দিতে তিনি আমাকে সতর্ক করে দেন।

ঈশ্বর যে এত নিষ্ঠুর, একথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। আমার কেমন জানি সন্দেহ হতে থাকে, ঈশ্বরের নামে দাদামশাই যা কিছু বলছেন সবই তাঁর বানিয়ে বলা। তাঁর উদ্দেশ্য, এসব কথা শুনে ঈশ্বরকে আমি যতোটা ভয় করি বা না করি, তাঁকে যেন ভয় করে চলি।

আমি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'আমি যাতে তোমার অবাধ্য না হই, সেজন্যেই কি এতসব কথা বলছ?'

দাদামশাইও তেমনি সোজাসুজি জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই। একবার অবাধ্য হয়েই দেখ না, মজাটা পাইয়ে দিই!'

'কিন্তু দিদিমার বেলায়?'

কঠোর স্বরে দাদামশাই বললেন, 'ওই বুড়ী বোক্‌চণ্ডীর কথায় খবরদার, কান দিস্‌নে। তোর দিদিমা আর কোনো দিন শোধরাবে না, সারা জীবনটাই মাথায় ছিট্‌ রয়ে গেল, কোনো কিচ্ছু শিখতে পারল না। আমি তোর দিদিমাকে বলে দেব যেন এইসব গুরুতর বিষয় নিয়ে সে তোর সঙ্গে কথা না বলে। আচ্ছা, এবার আমার একটা প্রশ্নের জবাব দে দেখি: বল্‌ তো পদমর্যাদার দিক থেকে দেবদূতদের কত ভাগে ভাগ করা যায়?'

দাদামশাইয়ের প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা দাদামশাই, "উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন চাকুরেরা" কথাটার মানে কী?'

'সব কথাই তোর জানা চাই -- না?' ঘোঁৎঘোঁৎ করে তিনি জবাব দিলেন, তারপর চোখের দৃষ্টি মেঝের দিকে নামিয়ে চিবোবার ভঙ্গিতে নাড়তে লাগলেন ঠোঁটদুটো। একটু পরে কি ভেবে নেহাতই অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি:

'চাকুরেরা সব এমন একদল লোক যারা আইনের কথায় ডুবে থাকে — খুসিমতো আইন গিলে ফেলতে পারে।'

'আইন কাকে বলে?'

'আইন? আইন হচ্ছে, যাকে বলা যায় -- কতগুলো রীতিনীতি যা সবাই মেনে চলে।' বৃদ্ধের বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ম চোখদুটো খুশিতে চক্‌চক্‌ করছে; তিনি বলে চললেন, 'মানুষ দল বেঁধে বাস করে এবং নিজেদের মধ্যেই কতগুলি বিষয়ে একমত হয়ে নেয়। সেই সব রীতিনীতি সবাই মেনে চলে। বা বলা যায় কতগুলো নিয়ম। এগুলোকেই সবাই বলে আইন। এই ধর্‌

না কেন, বাচ্চারা যখন একসঙ্গে খেলতে আসে তখন খেলাটা কি-ভাবে চলবে সে-সম্পর্কে তারা নিজেদের মধ্যেই ঠিকঠাক করে নেয়। তারা যা ঠিকঠাক করে তাই হচ্ছে আইন।'

'আর চাকুরেরা?'

'ওরা হচ্ছে একদল খারাপ ছেলে যারা আইন মেনে চলে না।'

'কেন?'

ভুরু কুঁচকিয়ে দাদামশাই বললেন, 'ওসব কথা তুমি বুঝতে পারবে না। মানুষ যাই করুক না কেন, প্রভু আছেন সবার ওপরে। মানুষ হয়তো করতে চায় এক কিন্তু প্রভুর ইচ্ছে অন্য। মানুষের কোনো কাজ সম্পর্কেই নিশ্চিন্ত হয়ে বলা চলে না যে এটা হবেই। প্রভুর ছোট একটি নিশ্বাসের ফুৎকারে মানুষের এই সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে একমুঠি ধুলোর মতো বাতাসে উড়ে যেতে পারে।'

কিন্তু কতগুলি কারণে সরকারী চাকুরেদের সম্পর্কেই আমার কৌতূহলটা ছিল সবচেয়ে বেশি। সুতরাং সেই একই কথা আমি বারবার জিজ্ঞেস করে চললাম:

'জান দাদামশাই, ইয়াকভ-মামা একটা গান গায়, সেই গানের দুটো লাইন হচ্ছে:

দেবদূতেরা পুণ্যবান ঈশ্বরের চাকরিতে
আব চাকুরেরা কিন্তু শয়তানের নোকর।'

দাদামশাই চোখ বুজলেন, দাড়ির গোছা হাতের মুঠিতে নিয়ে চেপে ধরলেন মুখের মধ্যে। তাঁর গালদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমি বুঝতে পারলাম, প্রাণপণে হাসি চাপবার চেষ্টা করছেন দাদামশাই। বললেন:

'তোকে আর ইয়াকভকে, দুটোকেই বস্তার মধ্যে পুরে নদীর জলে ফেলে দিলে ঠিক হয়। ইয়াকভটাও যেমন হয়েছে, আর কোনো গান পায় না গাইবার মতো। আর তুইও হয়েছিস তেমনি ত্যাঁদড়, যে যাই গান গাক্ না কেন, শোনা চাই। এগুলো হচ্ছে হাড়-হাভাতেদের গান, স্বধর্মত্যাগীদের গান—বিশ্রী রসিকতা করা হয়েছে এই গানে!'

আমার মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে কী যেন ভাবলেন দাদামশাই, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ছ্যাঃ, কী সব মানুষ!'

ঈশ্বর সম্পর্কে দাদামশাইয়ের যা ধারণা সেখানে ঈশ্বর রয়েছেন সবার উঁচুতে, মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের ওপরে সর্বপ্রভুত্বময় হিসেবে। দিদিমার মতো দাদামশাইও মনে করেন যে তাঁর সমস্ত কাজেকর্মে প্রভুর হাত আছে। একা প্রভুর হাতই নয়, অসংখ্য সাধুপুরুষেরও হাত। আমার দিদিমা কিন্তু কয়েকজন মাত্র গোণাগুণতি সাধুপুরুষকে মেনে চলেন — নিকোলাই, ইউরি, ফ্রল ও লাভ্‌র। এঁদের সকলেরই দয়ামায়া আছে, সকলেই খুব ভালো, গাঁ থেকে গাঁয়ে এবং শহর থেকে শহরে ঘুরে ঘুরে এঁদের সময় কাটে। মানুষকে এঁরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন — দোষেগুণে নিজেরাও হয়ে ওঠেন মানুষের মতোই। অন্য দিকে আমার দাদামশাইয়ের সাধুপুরুষরা সকলেই হচ্ছেন শহীদ। তাঁরা আইকন টান মেরে ফেলে দিয়েছেন, এক পাও পিছু না হটে লড়াই করেছেন সীজারদের সঙ্গে, আর ফলে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাঁদের কিংবা জীবন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে তাঁদের শরীর থেকে।

মাঝে মাঝে চিন্তিত ভাবে দাদামশাই বলেন:

'প্রভু যদি আমাকে একটুকু দয়া করেন, বেশি না হোক, অন্তত পাঁচশো রুবল্ লাভ রেখে এই বাড়িটা বিক্রি করে দিতে পারি — তাহলে শহীদ নিকোলাইয়ের উদ্দেশ্যে আমি একটা বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করব।'

একথা শুনে দিদিমা হাসেন আর আমাকে বলেন:

'তোর দাদামশাইয়ের বুদ্ধি দেখেছিস! এমনভাবে কথা বলে যেন তার এই বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া নিকোলাইয়ের আর কোনো কাজ নেই।'

গির্জার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তারিখ সম্বলিত একটি পাঁজি দাদামশাইয়ের ছিল। বহু বছর সে পাঁজি আমি রেখে দিয়েছিলাম। এই পাঁজির পৃষ্ঠায় দাদামশাইয়ের নিজের হাতে লেখা মন্তব্য ছিল নানা ধরনের। ইয়োহিম ও আন্না এই দিবসদুটির পাশে লাল কালির খাড়া অক্ষরে তিনি এই কথাগুলি লিখে রেখেছিলেন:

'আপনাদের দয়ায় মস্ত দুর্ভাগ্য থেকে বেঁচেছি।'

এই দুর্ভাগ্যটি যে কী, তা আমার মনে আছে। নিজের অপদার্থ ছেলেগুলোকে সাহায্য করবার চেষ্টা দাদামশাই সব সময়েই করতেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি শেষদিকে বন্ধকী কারবার শুরু করে দিলেন; দামী দামী জিনিসপত্র জমা রেখে টাকা ধার দিতেন তিনি। কে যেন পুলিসের কানে খবরটা পেঁছে দিয়েছিল, তারপর একদিন রাত্রে পুলিস আসে আমাদের বাড়ি

তল্লাশী করতে। সারা রাত সে কি দুশ্চিন্তা, তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায় না। দাদামশাই সকাল পর্যন্ত বসে বসে শুধু উপাসনা করেন। তারপর সকালবেলা আমার সামনেই এই কথাগুলো পাঁজির গায়ে লিখে রাখেন।

রাত্রিবেলা খেতে বসার আগে দাদামশাইয়ের সামনে বসে আমাকে প্সাল্টির, স্তোত্রের বই থেকে কিংবা ইয়েফরেম সিরিন'এর লেখা একাণ্ড ধর্মপুস্তকের কিছুটা পড়ে শোনাতে হয়। রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে তিনি আবার উপাসনা করতে শুরু করেন। সন্ধ্যার পরে চারদিক নিস্তব্ধ আর শুধু শোনা যায় একঘেয়ে সুরে তিনি অন্তরের অনুশোচনা প্রকাশ করে চলেছেন:

'হে পরম করুণাময় চিরন্তন রাজন, তুমিই দেবার মালিক আবার তুমিই ফিরিয়ে নাও... প্রলোভন থেকে বাঁচাও... দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করো... আমার অশ্রু আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে নিক...'

দিদিমা প্রায়ই বলেন:

'ইস্, শরীরটা ভারি ক্লান্ত লাগছে রে! মনে হচ্ছে আজ আর ভগবানের নাম নেওয়া হবে না, তার আগেই শুয়ে পড়তে হবে!'

দাদামশাই আমাকে গির্জায় নিয়ে যেতেন। শনিবারের সান্ধ্য উপাসনায় আর রবিবারের দুপুরের অনুষ্ঠানে। গির্জায় গিয়েও আমি বুঝতে পারতাম, কোন্ ঈশ্বরের ভজনা করা হচ্ছে। পাদ্রি পুরোহিতরা ভজনা করেন দাদামশাইয়ের ঈশ্বরকে আর সমবেত প্রার্থনাসঙ্গীতে ভজনা করা হয় দিদিমার ভগবানকে।

অবশ্য আমি এখানে যে ছবি দিলাম তা হচ্ছে ছেলেমানুষি বিচারবুদ্ধিতে আমি দুই ঈশ্বরের মধ্যে যে পার্থক্য টেনেছিলাম তারই খুব স্থূল একটা বর্ণনা। ঈশ্বরের মধ্যেও এই পার্থক্য টেনেছিলাম বলে তখন চিন্তাজগতে বহু ঘাতপ্রতিঘাত আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। দাদামশাইয়ের ঈশ্বরকে আমার ভয় করে এবং এই ঈশ্বরকে আমি মোটেও পছন্দ করি না। তিনি কাউকেই ভালোবাসেন না এবং কড়া নজর রাখেন সবার ওপরে। মানুষের মধ্যে যা কিছু নীচাশ্রয়ী, যা কিছু দুরাচার তাই খুঁজে বার করাতেই যেন তাঁর সমস্ত আগ্রহ নিবদ্ধ। স্পষ্টই বোঝা যায়, মানুষকে বিশ্বাস করেন না তিনি, অপেক্ষা করে আছেন কখন মানুষের মনে অনুশোচনা আসবে. আর মানুষকে শাস্তি দিতে পারলে ভারি খুশি হন।

আমার জীবনের এই দিনগুলিতে আমার মনের অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল প্রধানত ভগবানের চিন্তা। ভগবানই ছিলেন আমার কাছে জীবনের একমাত্র সৌন্দর্য। অন্যত্র শুধু নোংরামি আর হিংস্রতা দেখে দেখে আমি শিউরে উঠতাম, আমার মন ভারী হয়ে উঠত। আর এইসবের মধ্যে ভগবান ছিলেন আমার কাছে উজ্জ্বলতম ও শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ — আমার দিদিমার ভগবান, যিনি সকল মানুষের বন্ধু। আমি ব্যাকুল হয়ে ভাবতাম, কেন দাদামশাই ভগবানের করুণাময় রূপ দেখতে পান না।

আমাকে বাড়ির বাইরে গিয়ে খেলতে দেওয়া হয় না কারণ আমি অল্পেতেই বড়ো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠি। বাইরে খেলতে গিয়ে আমার মনে যে ভাব হয় তাতে আমি একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যাই আর তারপরেই প্রায় সর্বদা একটা মারামারি বা গোলমালের সূত্রপাত করে বসি। বন্ধুবান্ধব বলতে আমার কেউ নেই, পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমার উপর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করত। কেউ যদি আমাকে 'কাশিরিন' বলে ডাকে তাহলেই আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়: পাড়ার ছেলেমেয়েরা জানে একথা আর তাই আমাকে দেখতে পেলেই ওরা ওই নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে থাকে।

'ওই আসছে রে! কাশিরিন কিপ্‌টের নাতি আসছে! দ্যাখ্! দ্যাখ্!'

'দে না ঘুষি মেরে ফেলে!'

আর তারপরেই মারামারি শুরু হয়ে যায়।

বয়সের তুলনায় আমার গায়ে অস্বাভাবিক জোর, আর মারামারিও করতে পারি খুব। আমার শত্রুরাও স্বীকার করে একথা, সুতরাং কেউ কক্ষণো একা আমার সঙ্গে মারামারি করতে আসে না। ফলে মারামারি শুরু হলেই শত্রুপক্ষ দল বেঁধে এসে আমাকে বেধড়ক মেরে যায় আর প্রায় সর্বদাই আমি বাড়ি ফিরি কাটা নাক, কাটা ঠোঁট ও ছেঁড়া জামাকাপড় নিয়ে।

'হ্যাঁ রে ছোঁড়া, আবার মারামারি করে এসেছিস। দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি! কোথা থেকে শুরু করবো?'

দিদিমা আমার মুখ ধুয়ে দেন। হয় তামার মুদ্রা, নয়তো গাছগাছড়ার রস, না হয় কোনো আরক লাগাতে লাগাতে বলেন:

'হ্যাঁ রে, আমাকে বল্ দেখি, কেন তুই এভাবে মারামারি করে আসিস? বাড়িতে তো দিব্যি শান্তশিষ্ট ছেলে, আর রাস্তায় বেরোলেই বুঝি মারমুখী হয়ে উঠিস! ছি, ছি! তোর দাদামশাইকে এবার বলে দেব যেন তোকে আর বাইরে বেরোতে না দেয়!'

আমার মুখ কোথাও ফুলে উঠেছে, কোথাও কেটে গেছে, এসব দাদামশাইয়ের চোখ কখনো এড়ায় না। তবে তাতে তিনি কখনো সত্যিকারের রাগ করেননি, চাপা সুরে শুধু বলেছেন:

'বাঃ, আবার দেখছি মুখের ওপরে কারুকার্য ফলানো হয়েছে! কী আমার বীরপুরুষ। রে! এই তোকে বলে রাখছি, ফের যদি রাস্তায় বেরোবি তো ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেব! কথাটা কানে ঢুকছে তো?'

রাস্তায় যদি হৈচৈ না থাকে, তাহলে আর বাইরে যেতে আমার ইচ্ছে করে না। কিন্তু যেই আমার কানে আসে, পাড়ার ছেলেরা কলকল স্বরে কথা বলতে বলতে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি দাদামশাইয়ের শাসানি ভুলে গিয়ে ছুটে রাস্তায় চলে যাই। পাড়ার ছেলেদের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে আমার মুখ কেটে-ছিঁড়ে-ফুলে ওঠে, তাতে আমি বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করি না। কিন্তু ছেলেরা খেলাচ্ছলে যে-সব নিষ্ঠুর আচরণ করে তা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না আমি। প্রতিদিন চোখের সামনে আমাকে এইসব নিষ্ঠুরতা দেখতে হয়, আর যতোই দেখি ততোই রক্ত উঠে আসে আমার মাথায়। ওরা কুকুর আর মোরগের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেয়, বেড়ালের ওপর অত্যাচার করে, ইহুদিদের ছাগলগুলোকে তাড়া দেয়, মাতাল ভিখিরিগুলোর পিছনে লাগে, আর ধর্মভীরু ইগোশাকে ক্ষ্যাপায়, 'ইগোশা, তোর পকেটে রয়েছে মৃত্যু।' এসব আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

এই শেষোক্ত জনের লম্বা, রোগা, নোংরা চেহারা, হাড়-বের-করা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে একটা লম্বা ভেড়ার চামড়ার কোট আর শরীরটা সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে চলবার সময়ে শরীরটা অদ্ভুতভাবে দোলে, চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে মাটির দিকে। কালচে মুখখানায় ছোট ছোট চোখদুটো ভারি বিষণ্ণ — দেখে আমার মধ্যে একটা ভয় ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে। আমার মনে হয়, এই লোকটি নিশ্চয়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছে এবং এ সময়ে তাকে বিরক্ত করা উচিত নয়।

কিন্তু ছেলের দল তার পিছনে পিছনে ছোটে আর তার কুঁজো পিঠটা লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে। প্রথম কিছুক্ষণ সে আপন মনেই পথ চলে, যেন ইটের টুকরোগুলো তার পিঠে লাগলেও সে কিছুই টের পাচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, পিঠটা টান করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, মাথার মোটা ছেঁড়া টুপিটা ঠিক করতে করতে চারদিকে তাকিয়ে দেখে আর এমনভাবে আড়মোড়া ভাঙে যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে।

ছেলের দল চিৎকার করতে থাকে: ইগোশা, তোর পকেটে রয়েছে মৃত্যু! যাওয়া হচ্ছে কোথায় শুনি! দ্যাখ্ তো, তোর পকেটে রয়েছে মৃত্যু!'

পকেটটা সে মুঠো করে চেপে ধরে তারপর নিচু হয়ে একটা পাথর বা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নেয়, নিশ্বাসচাপা স্বরে গালাগালি দিতে দিতে লম্বা হাতের অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে ছুঁড়ে মারে। গালাগালির পুঁজিও তার খুব বেশি নয় — মাত্র তিনটি শব্দ। এদিক থেকে ছেলেদের পুঁজি অনেক বেশি সমৃদ্ধ — কোনো তুলনা হয় না। মাঝে মাঝে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছেলের দলের পিছনে ছোটে, লম্বা কোটটায় পা আট্কে আট্কে যায় আর হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে যায় একসময়ে। দুটো শুকনো কাঠির মতো নোংরা দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে কোনো রকমে সামলে নেয় নিজেকে। কিন্তু ছেলেরা ইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে ত্যক্তবিরক্ত করে তোলে আর ছেলের দলের মধ্যে যাদের সাহস একটু বেশি তারা সামনে এগিয়ে আসে, তার মাথায় একমুঠো ধুলো ছুঁড়ে ছুটে পালিয়ে যায় আবার।

আমাদের পূর্বতন দক্ষ কারিগর গ্রিগরি ইভানোভিচ মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে যায়; আমার মনে হয়, রাস্তায় যে-সব দৃশ্য দেখা যায় তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য। গ্রিগরি ইভানোভিচ এখন সম্পূর্ণ অন্ধ; রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে দিন কাটে তার। লম্বা, সুদর্শন চেহারা, মুখে একটিও শব্দ নেই, তার হাত ধরে নিয়ে চলে এক ছোট পাকাচুল বুড়ী। এই বুড়ী বাড়ীর জানলার সামনে এসে দাঁড়ায় আর সরু সরু নাকী গলায় বলে:

'এই অন্ধ ভিখিরিকে কিছু সাহায্য করো বাবারা, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন...'

গ্রিগরি ইভানোভিচ একটিও কথা বলে না। তার চশমার কালো কাঁচদুটো সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে বাড়ির দেওয়াল বা জানলার দিকে কিংবা যে কেউ সামনে এসে দাঁড়ায় তার দিকে। ঘন দাড়ির গোছায় রঙের ছোপ-বসে-যাওয়া হাত বুলায় কিন্তু একটিও কথা বলে না — শক্তভাবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে থাকে। আমি প্রায়ই তাকে দেখি কিন্তু সেই শক্তভাবে চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনো দিন একটিও শব্দ শুনতে পাই না। গ্রিগরির এই নিঃশব্দতাই আমার বুকের ওপরে সবচেয়ে বড়ো একটা ভার হয়ে চেপে বসে থাকে। আমি কিছুতেই তার সামনে যাই না — প্রাণপণ চেষ্টা করেও যেতে পারি না। তাকে রাস্তায় দেখতে পেলেই আমি ছুটে বাড়ির ভিতরে চলে আসি আর দিদিমাকে বলি:

'দিদিমা, গ্রিগরি আসছে!'

একটা ব্যথায় দিদিমার মুখের রেখাগুলো টান হয়ে ওঠে আর তিনি বলে ওঠেন: 'আহা রে! যা তো, ছুটে গিয়ে এটা ওকে দিয়ে আয়!'

তাঁর মুখের ওপরেই রেগে রুক্ষভাবে অস্বীকার করি। তখন দিদিমা নিজেই গেটের বাইরে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গ্রিগরির সঙ্গে কথা বলেন। গ্রিগরি মুচকিয়ে হাসে, দাড়ি নাড়ে কিন্তু কথা প্রায় বলে না বললেই চলে।

মাঝে মাঝে দিদিমা গ্রিগরিকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে এসে খাওয়াতে বসেন। একবার গ্রিগরি আমার খোঁজ করেছিল। দিদিমা আমাকে ডেকে পাঠান কিন্তু আমি ছুটে গিয়ে একটা কাঠের বোঝার পিছনে লুকিয়ে থাকি। গ্রিগরির সামনে আমি কিছুতেই যেতে পারি না। গ্রিগরির সামনে লজ্জায় মুখ তুলতে পারি না আমি। আমি জানি, আমার দিদিমারও ঠিক আমার মতোই মনোভাব। মনে আছে, মাত্র একবার দিদিমা আর আমি গ্রিগরির সম্পর্কে কথা বলেছিলাম। দিদিমা গ্রিগরিকে সদর দরজা পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছিলেন। মাথাটা মাটির দিকে নামানো, খুব আস্তে আস্তে পা ফেলছিলেন তিনি। আমি দিদিমার কাছে গিয়ে দিদিমার হাত ধরলাম।

শান্ত স্বরে দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রিগরি এলেই তুই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস কেন বল্ তো? ও তোকে কত ভালোবাসে, ওর মতো দয়ালু লোক হয় নাকি...'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দাদামশাই কেন গ্রিগরির খাওয়াথাকার বন্দোবস্ত করেন না?'

'দাদামশাই?'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দিদিমা। তারপর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে এক অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন:

'আমি তোকে বলে রাখছি --- মনে রাখিস আমার কথাগুলো। কাজটা ভালো হচ্ছে না। ভগবানের শাস্তি পেতে হবে এজন্যে। অতি ভয়ংকর হবে সেই শাস্তি!'

দিদিমা ভুল বলেননি। তারপর বছর দশেকও পার হয়নি, দিদিমা তখন চিরশান্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছেন আর আমার এই দাদামশাই বাতিকগ্রস্ত হয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঠিক এমনিভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর এমনি করুণ সুরে জানলায় জানলায় দুটি অন্নের জন্যে হাহাকার করেছেন:

'ভালো মানুষের ছেলেরা, একটুকরো "পিরোগ" খেতে দাও আমাকে — ছোট একটুকরো "পিরোগ"... আর কিছু চাই না বাবারা... হুঃ, কী সব মানুষ!'

'হুঃ, কী সব মানুষ!' এই একটুখানি কথার মধ্যেই আগেকার সেই মানুষটিকে চেনা যায়, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কথাটুকুর মধ্যে মনের সমস্ত জ্বালা ফুটে ওঠে, শুনলে কিছুতেই স্থির থাকা যায় না।

ইগোশা এবং গ্রিগরি ইভানোভিচ ছাড়াও ভরোনিখা নামে এক দুশ্চরিত্রা মেয়ে ছিল। তাকে দেখলেই আমি পথ ছেড়ে পালাতাম। প্রতি রবিবার দেখা যায় তাকে — প্রকান্ড শরীর, বিস্রস্ত বেশবাস, মদের নেশায় চুর। তার হাঁটার একটা অদ্ভুত ধরন আছে, মনে হয় সে নড়ছে না বা মাটিতে পা ঠেকাচ্ছে না, ঝড়ো মেঘের মতো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, অশ্লীল গান গেয়ে চলেছে ভাঙা ভাঙা গলায়। তাকে দেখলে রাস্তা থেকে লোক পালিয়ে যায়, গা ঢাকা দেয় দোকানের মধ্যে বা অলিগলিতে বা দেওয়ালের পিছনে। রাস্তাটা যেন ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিয়ে যায় বুড়ী। তার মুখটা নীল, বেলুনের মতো ফুলো ফুলো, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখদুটো এমন ঘোরে যে দেখলেই ভয় করে। মাঝে মাঝে কান্নাভরা গলায় চিৎকার করে ওঠে:

'কোথায়? কোথায় আমার ছেলেমেয়েরা?'

কথাটার অর্থ দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

প্রথমে তিনি বললেন: 'সব কথাই তোর জানতে হবে, না?' পরে তিনি খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলেন। ঘটনাটা হচ্ছে এই: বুড়ীর স্বামীর নাম ভরোনভ। লোকটা সরকারী চাকরি করত। যে পদে চাকরি করত তার চেয়েও উঁচু একটা পদ লাভ করবার জন্য সে আপিসের কর্তার হাতে তার বৌকে তুলে দেয়। আপিসের এই কর্তাটি স্ত্রীলোকটিকে দু'বছরের জন্য নিয়ে যায়। দু'বছর পরে ফিরে এসে স্ত্রীলোকটি দেখে, তার দুটি বাচ্চা — একটি ছেলে ও একটি মেয়ে — মারা গেছে আর তার স্বামী সরকারী তহবিল তছরুপের অপরাধে কারাদন্ড ভোগ করছে। শোকে স্ত্রীলোকটি মদ খেতে শুরু করে এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এখন প্রত্যেক রবিবার ও রাস্তায় বেরোয়, আর সন্ধ্যায় পুলিস এসে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যায় ওকে।

অবশ্য রাস্তায় যতো কিছু ঘটনাই ঘটুক না কেন, একথা ঠিক যে রাস্তার চেয়ে বাড়ির ভিতরটা অনেক ভালো। বিশেষ করে আমার ভালো লাগে সন্ধ্যার খাওয়াদাওয়ার পরে। এই সময়টিতে দাদামশাই বেরিয়ে যান ইয়াকভ-মামার

সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আর দিদিমা জানলার কাছে বসে বসে আমাকে নানা গল্প ও বাবার জীবনের নানা ঘটনার কথা বলতে শুরু করেন।

সেই যে স্টার্লিংপাখিটাকে তিনি বেড়ালের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তার ভাঙা ডানাটাকে কেটে দিয়েছেন, পায়ের দাঁড়ায় অত্যন্ত নিপুণভাবে বেঁধে দিয়েছেন ছোট একটা কাঠি। পাখিটা সুস্থ হয়ে উঠতেই দিদিমা উঠে-পড়ে লেগেছেন, পাখিটাকে কথা বলা শেখাবেন। হয়তো দেখা যায়, পুরো একঘণ্টা ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জানলার সামনে ঝোলানো খাঁচাটার কাছে, যে কথাগুলো তিনি পাখিটাকে শেখাতে চান, সেগুলো অক্লান্তভাবে বারবার বলে চলেছেন।

'আচ্ছা এবার বলো তো দেখি: পাখিকে পরিজ খেতে দাও!'

কথাগুলো শুনে পাখিটা সঙের মতো গোল গোল চোখ পাকিয়ে দিদিমার দিকে তাকায়, খাঁচার পাটাতনের ওপরে ঠকঠক করে কাঠের পা-টা ঠোকে, গলাটা টান করে দেয়, ঈগল পাখির মতো শিস্ দেয়, কাক বা কোকিলের নকল করে, বেড়ালের মতো মিউমিউ বা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ ডাকতে চেষ্টা করে -- কিন্তু অনেক কসরৎ করেও মানুষের মতো গলার স্বর কিছুতেই বার করতে পারে না।

দিদিমা মুখখানা ভারিক্কী করে বলেন: 'যথেষ্ট বাঁদরাম হয়েছে। এবার বলো দেখি: পাখিকে পরিজ খেতে দাও!'

আর যদি সেই পালকঢাকা বাঁদরের কিচিরমিচিরের মধ্যে কোনো সময়েও এমন একটি শব্দ পাওয়া যায় যাকে দিদিমার কথার অনুকরণ মনে করা যেতে পারে তাহলে দিদিমা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠে নিজের হাত থেকে যবের তৈরী পরিজ খাওয়াতে শুরু করেন।

'ভাবছিস তোর শয়তানি আমি বুঝতে পারি না? সব তোর শয়তানি, সব তোর চালাকি! ইচ্ছে করলে কী না পারিস তুই?' পাখিটাকে আদরের ধমক দেন দিদিমা।

কিছুদিনের মধ্যে দিদিমা সেই পাখিটাকে সত্যি সত্যিই কথা বলতে শিখিয়েছিলেন। বেশ স্পষ্ট ভাষায় পরিজ খেতে চাইত পাখিটা। দিদিমাকে দেখলেই চিৎকার করে বলত কি যেন, শব্দগুলো অনেকটা যেন শোনাত এই রকম — 'নমস্কার!'

পাখিটা প্রথমে ছিল আমার দাদামশাইয়ের ঘরে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দাদামশাই পাখিটাকে আমাদের ছাদের ঘরে নির্বাসনে পাঠালেন।

এই নির্বাসনদণ্ডের কারণ — পাখিটা দাদামশাইকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছিল। দাদামশাই উপাসনা করেন প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করে; সেই শুনতে শুনতে একদিন স্টার্লিংপাখিটা খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে হলদে ঠোঁটটা বাড়িয়ে বলে ওঠে:

'সত্যি, সত্যি, ই-ই, ই-ই, খু-উ-উ-ব সত্যি-ই-ই!'

পাখিটার এই ধরনের ডাক শুনে দাদামশাই ভয়ানক চটে যান। একদিন উপাসনা করতে করতে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গিয়ে মেঝের ওপরে পা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠলেন:

'এই শয়তানটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে নইলে আমি এটাকে শেষ করে ফেলব!'

এমনি সব ঘটনা। কোনোটা কৌতূহল জাগায়, কোনোটাতে মজা লাগে। এমনি অজস্র ঘটনা ঘটত আমাদের বাড়িতে। তবুও মাঝে মাঝে এক গভীর বিষাদ গ্রাস করত আমাকে। যেন মস্ত একটা বোঝা পিষে ফেলতে চাইছে আমাকে, যেন কালির দোয়াতের মতো একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে আমি বাস করছি, সেখানে কিছু দেখা যায় না, কিছু শোনা যায় না, কিছু অনুভব করা যায় না — এক অন্ধ ও অর্ধস্তিমিত জীবন।

আট

শুঁড়িখানার মালিকের কাছে হঠাৎ দাদামশাই আমাদের বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন। আরেকটা বাড়ি কিনলেন কানাৎনায়া স্ট্রীটে। এই রাস্তাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গোলমাল হৈচৈ নেই, প্রচুর ঘাসে ঢাকা, কাঁচা, বরাবর গিয়ে মিশেছে খোলা মাঠে। দু-পাশে সার দেওয়া ছোট ছোট ঝক্‌ঝকে রং-করা বাড়ি।

পুরনো বাড়ির চেয়ে নতুন বাড়িটা আরো সুন্দর, আরো পরিপাটি, আরো তক্‌তকে। সামনের দিকে গাঢ় ও উষ্ণ লাল রং। এই লাল রঙের পটভূমিতে একতলার তিনটে জানলার নীল খড়খড়ি আর ওপরের ঘরের জানলার ঝিল্‌মিলি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এল্‌ম ও লাইম-গাছের ডালপালা নেমে এসেছে ছাদের বাঁ দিকটায়। উঠোন আর বাগানের মধ্যে সরু সরু রাস্তা এমন গোলকধাঁধার মতো ছড়িয়ে আছে যে মনে হয় এই স্থানটি বিশেষ করে লুকোচুরি খেলবার জন্যে তৈরি। নাতিবৃহৎ বাগানটি

অতি চমৎকার, ঝোপঝাড় লতাগুল্মের প্রাচুর্যে মুগ্ধ হতে হয়। এক কোণে স্নানঘর, খেলনার মতো ছোট্ট ও পরিচ্ছন্ন। আরেক কোণে প্রচুর আগাছায় ভরা একটা চওড়া গভীর গর্ত। এখানে আগে একটা স্নানঘর ছিল, এখন তার দগ্ধাবশেষটুকু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ দিকের সীমানায় কর্নেল অভসিয়ান্নিকোভের আস্তাবল, ডানদিকে বেৎলেঙ-এর বার বাড়ি। আর বাগানের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে গোশালার কর্ত্রী পেত্রভনার জমি। মেদস্ফীত, লালমুখ পেত্রভনা, সোরগোলে স্বভাব—মস্ত একটা ঘণ্টার মতো মনে হয় তাকে। বাড়িটা ছোট, অন্ধকার ও সাজসজ্জাহীন; পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে মাটির সঙ্গে থেব্ড়ে আছে মনে হয়। পুরু শ্যাওলায় ঢেকে গেছে বাড়িটা। খোলা মাঠের দিকে দুটো জানলা! গভীর নালা মাঠটাকে চিরে দিয়েছে। দূরের অরণ্যকে এক পোঁচ আবছা নীল রঙের মতো দেখায়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই মাঠে সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে; শরৎকালের রোদে বিদ্যুতের মতো ঝল্‌সে ওঠে তাদের বেয়নেটগুলো।

আমাদের বাড়িতে আর যে-সব লোক থাকে তাদের আমি আগে কোনোদিন দেখিনি। সামনের দিকের কামরাটায় থাকে সস্ত্রীক একজন ফৌজী লোক, জন্মগত পরিচয়ে তাতার। গোলগাল ছোটখাট চেহারার বৌটি সারাদিন হাসে, হৈচৈ করে, আর হাল্‌কা নক্সায় সজ্জিত একটা গীটার বাজায়। চড়া আর সুরেলা একটা মজার গান সে প্রায়ই গায়। গানটা হল:

একটি মেয়েকে ভালোবেসে থেকে
সন্তুষ্ট থাকা যায় না।
বিবেচনা রেখে খুঁজে পেতে দেখে
আনো মেয়ে অন্যজনা।
তবে পার পেতে সন্দ নেই তাতে
মন মত পুরস্কার
সে প্রিয়া যে তবে নিশ্চিতই হবে
সব রতনের সার!
সে যে স-ব র-ত-নে-র সা-র!

স্বামীটি বলের মতো গোল। ফুলো ফুলো নীল গাল নিয়ে জানলার সামনে বসে থাকে আর পাইপ টানে। বাদামী লালচে রঙের কুৎকুতে চোখদুটো

অনবরত ঘুরপাক খায়। মাঝে মাঝে কাশে আর কাশির সঙ্গে অদ্ভুত একটা শব্দ ওঠে: 'র্-র্-রা-আ-ফ্! র্-র্-রা-আ-ফ্!'

গুদামঘর ও আস্তাবলের ওপরে যে গরম ঘরটি তোলা হয়েছে সেখানে থাকে দু'জন গাড়ি-চালক আর ভালেই নামে জাতে তাতার একজন লম্বা চেহারার বিষণ্ণ মেজাজের আর্দালি। গাড়ি-চালকদের একজনকে সবাই ডাকে পিওতর-কাকা বলে। ছোটখাটো বুড়িয়ে-যাওয়া মানুষটি। অপরজন তার বোবা ভাইপো স্তিওপা। চিকন মসৃণ চেহারা স্তিওপার, মুখখানা ঠিক তামার থালার মতো। এরা সবাই আমার অপরিচিত এবং এদের সবার প্রতিই আমি গভীর কৌতূহল বোধ করি।

কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি কৌতূহল এই বাড়ির অন্য এক বাসিন্দা 'বাঃ বেশ' সম্পর্কে। বাড়ির পিছনদিকে রান্নাঘরের পাশের লম্বা ঘরটি সে ভাড়া নেয়। দুটি জানলা ঘরটিতে, একটি বাগানের দিকে, অপরটি উঠোনের দিকে।

বাসিন্দাটি রোগা, কুঁজো। কালো দো-পাট্টা দাড়ি ফ্যাকাশে মুখটাকে আরো ফ্যাকাশে করে তুলেছে। চোখে চশমা। শান্ত, নির্বিরোধী মানুষ কোনো সাতেপাঁচে থাকে না। চা বা খাবার তৈরি হয়ে গেলে তাকে ডাকবার জন্যে কেউ গেলেই তার মুখে একটি অবধারিত জবাব শোনা যায়: 'বাঃ বেশ!'

দিদিমা লোকটির নাম দিয়েছেন 'বাঃ বেশ'; আড়ালে, এমন কি সামনা-সামনিও এই নামে ডাকেন।

'যা তো রে লেক্সেই, "বাঃ বেশ"কে বলে আয় যে চা দেওয়া হয়েছে।' কিংবা, 'একি "বাঃ বেশ", কিছুই খেলেন না যে, আরেকটু তুলে নিন!' এমনি ধরনের কথা দিদিমার মুখে শোনা যায়।

বড়ো বড়ো কাঠের বাক্স আর মোটা ব্যবহারিক বইয়ে তার ঘরটা ঠাসা। এরকমটি আমি এর আগে আর দেখিনি। আর ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে নানা রঙের তরল পদার্থে ভর্তি বোতল, তামার টুকরো, লোহা আর সীসের চাঁই। একটা বাদামী রঙের চামড়ার জ্যাকেট ও ছাইরঙের ছককাটা প্যান্ট সে সবসময়ে পরে থাকে। জামা ও প্যান্টের সর্বত্র রঙের ছিটে লেগেছে আর উৎকট একটা গন্ধ। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এই ঘরেই কাটায় সে। কখনো সীসে গলাচ্ছে, কখনো তামা ঝালাই করছে, কখনো ক্ষুদে ক্ষুদে নিক্তিতে কি যেন ওজন করছে। মাঝে মাঝে আঙুল পুড়িয়ে ফেলে নিজেই চিৎকার করে ওঠে আবার সেই পোড়া আঙুলে নিজেই ফুঁ দেয়। দেওয়ালে ব্যাখ্যা সম্বলিত

চিত্র ঝুলছে; এক এক সময়ে সেই চিত্রগুলির ওপরে ঝুঁকে পড়ে; চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে কাঁচদুটো মুছে নেয় এবং এতবেশি ঝুঁকে চিত্রগুলো দেখে যে তার চকখড়ির মতো সাদা নাকটা প্রায় ঠেকে যায় চিত্রের সঙ্গে। এক একসময়ে দেখা যায়, ঘরের মাঝখানটিতে বা জানলার পাশে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে; চোখদুটো বোজা, মাথাটা ঊর্ধ্বমুখী; নিস্তব্ধ নিশ্চল মূর্তির মতো একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বহুক্ষণ।

উঠোনের শেষদিকে একটা চালা আছে। এই চালার ছাদের ওপরে উঠে উঠোনের মধ্যে দিয়ে খোলা জানলার ভিতরে আমি লোকটিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। টেবিলের ওপরে অ্যাল্‌কোহল বাতি জ্বলে, তার নীল শিখাটা দেখা যায়। বাতির ওপরে ঝুঁকে রয়েছে সেই লোকটির কালো মূর্তিটা। মাঝে মাঝে একটা ছেঁড়া নোটবইয়ের পৃষ্ঠায় কী যেন লেখে, হিম একটা আভা ঠিকরে ঠিকরে পড়ে তার চশমার কাঁচ থেকে—নীল বরফের এক-একটা টুকরো যেন। আশ্চর্য এক যাদুকরের মতো মনে হয় তাকে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি সেই চালার ওপরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

মাঝে মাঝে জানলার ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো সে এসে দাঁড়ায় জানলার সামনে। হাতদুটো পিছনের দিকে রেখে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে উঠোনের চালাটার দিকে, কিন্তু একটিবারও আমাকে দেখতে পায় বলে মনে হয় না। এতে আমি অপমানিত বোধ করি। কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে একলাফে টেবিলটার কাছে ফিরে যায়, আরো বেশি ঝুঁকে পড়ে, অস্থিরভাবে খাতাকাগজ জিনিসপত্রের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে কি যেন।

লোকটির অনেক টাকাপয়সা থাকলে আর বেশভূষা ফিটফাট হলে হয়তো তাকে দেখে আমার ভয় হতে পারত। কিন্তু লোকটি গরীব। তার চামড়ার জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে যে কলারটা বেরিয়ে থাকে তা নোংরা ও কুঁচকনো, বিচিত্র দাগওলা প্যাণ্টটা তালি মারা, মোজাহীন পায়ে যে জুতোজোড়া সে পরে তার মধ্যে জুতোর গুণ আর বিশেষ কিছু নেই। গরীবদের দেখলে আমার দিদিমার মন গলে যায়, আমার দাদামশাই উপেক্ষা করেন তাদের; এ থেকে একটা শিক্ষা আমার হয়েছে—গরীব লোকেরা কখনো বিপজ্জনক হয় না, তাদের মধ্যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

'বাঃ বেশ'কে আমাদের বাড়ির কেউ পছন্দ করে না। সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করে। ফৌজী লোকটির আমুদে বৌ তার নাম দিয়েছে 'চকখড়ি

নাক'। পিওতর-কাকা বলে, 'রাসায়নিক', 'কুহকী'। দাদামশাই বলেন, 'যাদুকর শয়তান।'

দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমা, উনি কী করেন?'

দিদিমা মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠলেন, 'সে খোঁজে তোর কি দরকার শুনি? সব কথার মধ্যে তোর থাকা চাই, না?'

একদিন আমি আমার সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে তার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'তুমি কী করছ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। আমার উত্তেজনা আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিলাম না।

লোকটি চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে চশমার কাঁচের উপর দিয়ে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের ফোস্কাপড়া ঝল্‌সানো হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে:

'হাত ধরে উঠে এস।'

সে যে আমাকে দরজা দিয়ে না ঢুকে জানলা দিয়ে গলে ভিতরে যেতে বলেছে তাতে তার মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে গেল আমার চোখে। একটা বাক্সের উপরে বসল সে, আমাকে বসাল ঠিক তার সামনেটিতে, আমাকে একবার এপাশে একবার ওপাশে ফিরিয়ে দেখল বহুক্ষণ ধরে, শেষকালে বলল:

'তুমি কোত্থেকে আসছ?'

প্রশ্নটা অদ্ভুত; কারণ দিনের মধ্যে চারবার খাবার টেবিলে আমি তার পাশটিতে বসি।

'আমি এই বাড়ির নাতি।' আমি জবাব দিলাম।

'ও হ্যাঁ, তাইতো।' বলে সে আবার অন্যমনস্কভাবে চুপ করে গিয়ে হাতের একটা আঙুল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

আমার মনে হল, কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা দরকার। বললাম:

'আমি এ-বাড়ির নাতি বটে কিন্তু আমি কাশিরিন নই—আমি হচ্ছি পেশ্‌কভ।'

'পেশ্‌কভ?' কথাটা উচ্চারণ করবার সময়ে জোরটা 'ক'-এর ওপরে না দিয়ে ভুলভাবে দিল 'পে'-এর ওপরে, তারপর বলল, 'বাঃ বেশ।'

তারপর আমাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার উঠে গেল টেবিলটার কাছে।

'ঠিক আছে। চুপটি করে বসে থাকো। গোলমাল কোরো না।'

বসে বসে বহুক্ষণ ধরে লোকটির কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখলাম। একটা তামার টুকরোকে চিম্‌টে দিয়ে ধরে উখো দিয়ে ঘষে ঘষে তামার গুঁড়ো বার করে নিল। বেশ কিছুটা গুঁড়ো জমবার পরে সেই সোনালী ধুলোগুলোকে একজায়গায় জড়ো করে ঢালল একটা পুরু পাত্রের মধ্যে। একটা গামলায় নুনের মতো সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো কি যেন ছিল, তার থেকে খানিকটা নিয়ে মিশিয়ে দিল তামার গুঁড়োর সঙ্গে। তারপর একটা গাঢ় রঙের বোতল থেকে তরল পদার্থ ঢালল পাত্রের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের মধ্যেকার মিশ্রিত পদার্থ টগবগিয়ে উঠল, ধোঁয়া উঠতে লাগল, আর এমন একটা ঝাঁজালো গন্ধ বেরিয়ে এল যে আমি ভয়ানক কাশতে লাগলাম।

'বিশ্রী গন্ধ, না?' ঐন্দ্রজালিক বেশ খানিকটা দেমাকের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'হ্যাঁ!'

'ঠিক আছে ভাইটি! এই তো চাই! খুব ভালো কথা!'

আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না এত দর্পের কারণ কী থাকতে পারে।

ঝাঁজালো গলায় আমি বললাম, 'যা খারাপ তা সব সময়েই খারাপ—কখনো ভালো হয় না।'

চোখ পিটপিটিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'কী বললে? জেনে রেখো ভাইটি, তোমার কথাটা সব জায়গায় খাটে না। আচ্ছা তুমি হাড়ের খেলা খেলতে ভালোবাস?'

'মানে, ঘুঁটিখেলা?'

'হ্যাঁ, ঘুঁটিখেলা।'

'নিশ্চয়ই ভালোবাসি।'

'আমি তোমাকে চমৎকার এক ঘুঁটি বানিয়ে দেব—কেমন? দেখবে, কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না।'

'তাহলে তো খুব ভালো হয়।'

'তাহলে তোমার ঘুঁটিগুলো নিয়ে এসো তো দেখি।'

ধূমায়মান পাত্রটা হাতে নিয়ে আবার সে আমার কাছে এগিয়ে এল।

'তোমাকে আমি ঘুঁটি বানিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে যে

তুমি আর কক্ষণো এখানে আসবে না। বলো, রাজি আছ?' একচোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল সে।

আমার আত্মসম্মানে ভয়ানক ঘা লাগল। আমিও পাল্‌টা জবাব দিলাম:

'এমনিতেই আমি আর কখনও আসব না।' বলে আমি বাগানে চলে এলাম।

বাগানে এসে দেখলাম, দাদামশাই আপেলগাছের গোড়ায় সার দিচ্ছেন। শরৎকাল। ইতিমধ্যেই গাছের পাতা ঝরতে শুরু করেছে।

গাছের ডাল ছাঁটবার কাঁচিটা আমার হাতে দিয়ে দাদামশাই বললেন, 'নে তো এটা, র‍্যাস্‌বেরির ডালগুলোকে একটু ছেঁটে দে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, "বাঃ বেশ" কী করে?'

দাদামশাই ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলেন, 'ঘরটাকে নষ্ট করছে লোকটা। মেঝেটাকে তো অনেক জায়গায় পুড়িয়েছে, তার ওপরে ওয়াল-পেপারে দাগ ধরিয়ে দিয়েছে, এমন কি ছিঁড়ে ফেলেছে দু-এক জায়গায়। ওকে উঠে যাবার জন্যে বলতে হবে।'

'তাহলেই ঠিক হয়।' আমিও সায় জানিয়ে গাছের ডাল ছাঁটবার কাজে মন দিলাম।

কিন্তু বড়ো তাড়াতাড়ি সায় জানিয়েছিলাম আমি।

বর্ষার দিনে সন্ধ্যায় দাদামশাই বাড়ি না থাকলে দিদিমা রান্নাঘরে ছোটখাটো একটি ভোজসভার ব্যবস্থা করেন। বাড়ির সমস্ত বাসিন্দাকে ডাকেন তিনি। গাড়ি-চালকরা ও আর্দালি বাদ পড়ে না, এমন কি একজন রসিকা বাসিন্দাও থাকে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। প্রাণরসে ভরপুর পেত্রভনাও আসে মাঝে মাঝে আর নিয়মিত অভ্যাগতদের মধ্যে থাকে 'বাঃ বেশ'। উনুনের পাশের কোণটিতে সে চুপচাপ বসে থাকে, একটুও নড়েচড়ে না। বোবা স্তিওপা তাস খেলে তাতার আর্দালি ভালেই'র সঙ্গে। তাস খেলতে খেলতে স্তিওপার ধ্যাব্‌ড়া নাকটায় টোকা দিতে দিতে ভালেই বলে, 'আচ্ছা ঘাগী শয়তান তো তুই!'

পিওতর-কাকা নিয়ে আসে মস্ত একটা সাদা পাঁউরুটি আর বড় একটি কলসীতে ভর্তি ফলের জ্যাম। রুটিটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে তার ওপরে পুরু করে ফলের জ্যাম লাগায়, তারপর হাতের ওপরে রুটির টুকরো নিয়ে অতিথিদের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

'দয়া করে একটুকরো রুটি নিন।' অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা নিচু করে

সাদরে বলে সে। আর যখনই কেউ রুটির টুকরোটা তুলে নেয়, সে নিজের কালচে হাতের তালুটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে। আর যদি দেখে যে কোথাও একফোঁটা জ্যাম লেগে আছে তাহলে তা জিভ দিয়ে চেটে নেয়।

পেত্রভনা নিয়ে আসে চেরিফলের মদ আর সেই রসিকাটি আনে বাদাম ও মিষ্টি। তারপর শুরু হয় ভোজপর্ব। আমার দিদিমা তা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

'বাঃ বেশ' আমাকে ঘুষ দিয়ে তার ঘরে যেতে নিষেধ করার কিছুদিন বাদেই দিদিমা এই ধরনের এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। শরৎকালের পচা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাইরে সোঁ সোঁ বাতাস, গাছগুলো ঝরঝর শব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে আর দেওয়ালের গায়ে আঁচড় দিচ্ছে। রান্নাঘরের ভিতরটা উষ্ণ ও আরামদায়ক। মানুষগুলো ঘন হয়ে বসেছে, সকলেই কেমন যেন বিশেষভাবে শান্ত আর খুসি। দিদিমাও আজ অন্য দিনের মতো নন, তাঁর মুখে আজ গল্পের খই ফুটছে।

দিদিমা বসেছেন উনুনের ধারে, পা রেখেছেন সিঁড়ির একটা ধাপে। শ্রোতাদের দিকে ঝুঁকে তিনি গল্প বলছেন, একটা টিনের বাতির আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে। যখনই দিদিমার জমিয়ে গল্প বলবার মেজাজ আসে তিনি বসবার জন্যে উনুনের এই উঁচু আসনটি বেছে নেন।

জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'উঁচু থেকে নিচের দিকে কথা বলা, এই আর কি! শ্রোতারা যদি তলায় থাকে তাহলে কথা বলতে আমার ভারি সুবিধে হয়!'

দিদিমার পায়ের কাছে একটি ধাপে আমি বসেছিলাম, 'বাঃ বেশ'এর মাথার প্রায় ওপরটিতে। দিদিমা বলছিলেন যোদ্ধা ইভান ও ঋষি মিরনের কৌতূহলোদ্দীপক গল্প। ছন্দোবদ্ধ ভাষার সমৃদ্ধ ধারা কলধ্বনি তুলে বয়ে চলেছিল। গল্পটা হচ্ছে এই:

> গর্দিয়ন নামে এক পাপিষ্ঠ অধিনায়কের বাস ছিল এই পৃথিবীতে। পাপে ভরা ছিল তার আত্মা, পাথরের মতো বিবেক, সত্যকে ঘৃণা করত সে। গর্তের উইপোকার মতো ছিল তার পঙ্কিল জীবন। পৃথিবীতে এত লোক আছে, তাদের মধ্যে একটি লোককে সে সব চেয়ে বেশি ঘৃণা করত: ঋষি মিরন। ঋষি মিরন ছিলেন শান্তি ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক, সত্য ও সুন্দরের পূজারী। একদিন এই গর্দিয়ন ডেকে পাঠাল অনুগত বীর যোদ্ধা ইভানকে। বলল: 'এক্ষুণি যাও তুমি অহঙ্কারী বুড়ো মিরনের কাছে, কেটে ফেলো তার মাথাটা তলোয়ারের এক কোপে। তারপর কাটা

মুণ্ডুটাকে পাকা দাড়ি ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসবে আমার কাছে। আমার কুকুরগুলোর ভোজে লাগবে সেটা!'

একান্ত বাধ্য ও অনুগত ইভান সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল ঋষি মিরনের মাথা কাটবার জন্যে। নিজের মনকে সে প্রবোধ দিল এই বলে যে, সে অপরের আদেশ পালন করতে বাধ্য। বোঝা যায় এটা ভগবানের ইচ্ছে।

তারপর ঋষির কাছে এসে তলোয়ারটা নীচে লুকিয়ে রাখে তার পোষাকের তলায়, হাসিমুখে অভিবাদন জানায় বুড়োকে আর বলে: 'কেমন আছ ঠাকুর? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!'

ঋষি মিরনের অজ্ঞাত ছিল না কিছুই—স্মিত হেসে ধীর স্বরে বলেন তিনি. 'কেন তুমি আমাকে প্রতারণা করছ? পরমমঙ্গলময় ঈশ্বরের অজানা থাকে না কিছুই, তোমার পাপ-মতলবের কথাও তিনি জানেন। আমি জানি তুমি কী করতে এসেছ!'

লজ্জা হল ইভানের, লজ্জায় অন্তর ভরে গেল। আবার গার্দিয়নের ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার কথা ভেবে শিউরে উঠল সে। চামড়াব খাপ থেকে টেনে বার করল তলোয়ার — সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র উ'চিয়ে ধরল সাহসের সঙ্গে।

'আমি তোমাকে এমন ভাবে মারতে চেয়েছিলাম যে তলোয়ারটাকে তুমি দেখতেই পাবে না। কিন্তু এখন অন্য কথা। ওরে বুড়ো, নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে শেষবারের মতো প্রার্থনা করে নাও। প্রার্থনা করো সকল মানুষের জন্য। আমার জন্য, তোমার জন্য। তারপব তলোয়ারের এক ঘায়ে তোমার মস্তক ছিন্ন হবে।'

হাঁটু মুড়ে বসলেন জ্ঞানী বৃদ্ধ। বসলেন এক নবীন ওক্‌গাছের নিচে। ওক্‌গাছ তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ল। স্মিত হেসে বললেন জ্ঞানী বৃদ্ধ: 'ভালো করে ভেবে দেখ ইভান, বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। সব মানুষের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা তাড়াতাড়ি শেষ হবে না। তার চেয়ে বরং অপেক্ষা করে কাজ নেই, এই মুহূর্তেই আমার মস্তক ছিন্ন করা ভালো।'

ঋষির কথা শুনে ইভান তাকিয়ে রইল ভুরু কুঁচকে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। গর্বোদ্ধত স্বরে মূর্খের মতো জবাব দিল: 'যা কথা দিয়েছি তাই হবে। প্রার্থনা করো তুমি। যতোদিন খুশি। যদি একযুগ অপেক্ষা করতে হয় তাহলে তাই সই।'

তারপর ঋষি বসলেন প্রার্থনায। আস্তে আস্তে এল রাত্রি। রাত্রি পার হয়ে এল সকাল। সকালের পরে আবার সন্ধ্যা। গ্রীষ্ম পার হয়ে বসন্ত। বৎসরের পর বৎসর। তেমনিভাবে ঋষি বসে রইলেন প্রার্থনায়। বসে রইলেন ওক্‌গাছের নিচে। নবীন ওক্‌গাছ আকাশছোঁয়া হল। চারপাশের ওক্‌গাছের বীজ থেকে উৎপন্ন ঝোপঝাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সৃষ্টি করল নিবিড় এক অরণ্য। তবুও তেমনিভাবে বসে রইলেন ঋষি মিরন।

ঋষি মিরনের ছেদহীন প্রার্থনা আজও চলেছে। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করছেন। কামনা কবছেন মেরীমাতার কল্যাণ হাস্য। আর ঋষি মিরনের পাশেই তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বীর যোদ্ধা ইভান। তলোয়ারে মরচে পড়েছে। খসে খসে পড়ছে তলোয়ারের খাপ। ধুলো হয়ে উড়ে উড়ে গেছে পরনের পোশাক। গরমে গলে গলে পড়ে শরীর — তবুও গলেনি। পঙ্গপালে কুরে কুরে খেয়েছে তাকে — তবুও খায়নি। জন্তুজানোয়াররাও এড়িয়ে চলে। নেকড়ে ভল্লুকও ধারে কাছে আসে না। ঝড়বৃষ্টি গায়ে লাগে না তার। তুষার স্পর্শ করে না তাকে। স্থির অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। একটু হাত তোলবার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা নেই একটু সরে দাঁড়াবার। দেখো: এই হোক সেই লোকেব শাস্তি — যে অপরের পাপপরামর্শে কান দেয়, নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দেয় অপরের ইচ্ছার কাছে। আর সেই প্রাচীন ঋষি এখনো প্রার্থনা করে চলেছেন। প্রার্থনা করছেন আমাদের মতো পাপীদের জন্য। আর নদী যেমন সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় — তেমনি তাঁর প্রার্থনাও ধারাস্রোতের মতো চলেছে ভগবানের কাছে।

গল্পটা শুরু হতেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম, 'বাঃ বেশ' যে জন্যেই হোক ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। হাতদুটো অস্থিরভাবে নাড়তে নাড়তে অদ্ভুত সব ভঙ্গি করছে, চশমাটা বারবার খুলছে আর পরছে কিংবা হয়তো চশমাটা দুলিয়ে দুলিয়ে তাল দিচ্ছে কবিতার সঙ্গে সঙ্গে, মাথা নাড়ছে, চোখ কচলাচ্ছে, কপাল আর গালের ওপর দিয়ে যেন টসটস করে গড়িয়ে পড়া ঘাম মুছে নিচ্ছে। কেউ কাশলে বা মেঝের ওপর পা ঘষলে সঙ্গে সঙ্গে চাপা অধীর স্বরে শব্দ করে উঠছে, 'শ্-শ্-শ্!'

দিদিমার গল্প বলা শেষ হতেই সে সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত নাড়তে নাড়তে আর ঘুরপাক খেতে খেতে বলতে লাগল বিড়বিড় করে:

'ভারি চমৎকার! সত্যিই ভারি চমৎকার! এই গল্পটি লিখে রাখা দরকার, কিছুতেই যেন হারিয়ে না যায়! আর কী যথার্থ ও খাঁটি গল্প...'

এবার স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল যে সে কাঁদছে। চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা সত্যিই অস্বাভাবিক আর বড়ো মর্মস্পর্শী। অদ্ভুত ভঙ্গিতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘুরপাক খাচ্ছে রান্নাঘরের চারদিকে, বারবার চেষ্টা করছে চশমাটা চোখে পরতে কিন্তু চশমার তারটা কিছুতেই কানের পিছনে আঁটতে পারছে না। পিওতর-কাকা মুচকিয়ে হেসে ফেলল কিন্তু অন্যরা হতভম্ব।

দিদিমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'বেশ তো, বেশ তো, লিখে নিতে চান, লিখে নিন। এতে আর দোষ কী? এ-ধরনের কবিতা আমি আরও অনেক জানি।'

উত্তেজিত স্বরে সে চিৎকার করে উঠল, 'না! না! অন্যগুলোর কথা বলছি না! এইটেই! এই গল্পটা খাঁটি রুশদেশের গল্প!' হঠাৎ সে রান্নাঘরের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে উঁচু স্বরে কথা বলতে আরম্ভ করল। ডানহাতটা ঝাঁকাচ্ছে আর কম্পিত বাঁ হাতে ধরে আছে চশমাটা। উত্তাপ ও আবেগের সঙ্গে কথা বলে চলেছে সে, গলা চড়িয়ে জোর দিচ্ছে কথাগুলোর ওপর, পা ঠুকছে মেঝেতে।

'নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা ভুল।' বারবার বলে চলেছে এই কথাগুলো।

হঠাৎ তার গলাটা বুজে গেল। ঘরের মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সে, তারপর অপরাধীর মতো মুখ করে, মাথা নিচু করে, নিঃসাড়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ঘরের মানুষগুলো হাসল মুখ টিপে আর লাজুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল একজন আরেকজনের দিকে। দিদিমা তাকের অন্ধকারের মধ্যে শরীরটাকে সরিয়ে দিয়ে গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পুরু লাল ঠোঁটদুটোর ওপরে হাত বুলোতে বুলোতে পেত্রভনা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কী? একেবারে রেগে ক্ষেপে গেছে মনে হয়!'

'না, তা নয়। লোকটার ধরন-ধারণই ওই রকম...' জবাব দিল পিওতর-কাকা।

চুল্লির ওপর থেকে নেমে এসে দিদিমা সামোভারে আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।

'ভদ্রলোকেরা এইরকমই হয়— এমনি খামখেয়ালি।' শান্ত স্বরে কথাগুলো বলল পিওতর-কাকা।

'বিয়ে না করে আইবুড়ো থাকলে এই হয়।' বিড়বিড় করে বলল ভালেই।

হেসে উঠল সবাই। পিওতর-কাকা বলল, 'কী-ভাবে কাঁদছিল দেখেছ? রুই-কাৎলা যেখানে ঘাই মারে সেখানে এখন পুঁটিমাছের ফরফরানি আর সহ্য হয় না!'

কারও কথাবার্তাই আর ভালো লাগছে না। একটা বিষণ্ণ অবসাদ সুচের মতো আমার মনের মধ্যে বিঁধছে। 'বাঃ বেশ'কে দেখে আজ আমি খুবই অবাক হয়েছি, লোকটির ওপর আমার করুণা হচ্ছে, তার সেই

জল-ছাপিয়ে-ওঠা চোখদুটোর স্মৃতি কিছুতেই আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না।

সেদিন রাত্রে সে বাইরেই রইল; ফিরে এল পরদিন দুপুরবেলার খাওয়া শেষ হবার পরে। নিজের কৃতকর্মের কথা ভেবে সে খুব লজ্জা পেয়েছে আর মুষড়ে পড়েছে, কিছুতেই যেন আর মাথা তুলতে পারছে না।

ছোট ছেলেরা দোষ করলে পরে যেমন দোষ স্বীকার করে তেমনিভাবে সে এসে আমার দিদিমার কাছে বলল, 'কাল বড়ো গোলমাল করে ফেলেছি, না? আপনি নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছেন?'

'কেন, রাগ করব কেন?'

'আমার কথা শুনে।'

'কই, আপনি তো কাউকে ঠেকা দিয়ে কোনো কথা বলেননি।'

আমার মনে হল, দিদিমা এই লোকটিকে ভয় করে চলেন। দিদিমা লোকটির দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছেন না আর এমন নরম সুরে কথা বলছেন যে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

দিদিমার দিকে আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে সে নিতান্ত সরলভাবেই বলতে লাগল:

'দেখুন, আমি বড়ো একা, বড়ো বেশি একা। এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। সব সময়ে একা একা থাকি আর মাঝে মাঝে এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন ইচ্ছে করে নিজের মনটাকে উজাড় করে ঢেলে দিই। মনটা এমন হয়ে ওঠে যে গাছ-পাথরের সঙ্গেও কথা বলতে পারি তখন...'

লোকটির কাছ থেকে একটু দূরে সরে এসে দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বিয়ে করো না কেন?'

'বিয়ে!' হাত নেড়ে বলল সে, তারপর ভুরু কুঁচকিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দিদিমা লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর একটিপ নস্যি নিয়ে ফিরে তাকালেন আমার দিকে। রুষ্ট স্বরে বললেন:

'আর তোকেও বলে রাখছি, খবরদার ওই লোকটার কাছে ঘুরঘুর করবি না। কে জানে বাপু, কী ধরনের মানুষ।'

কিন্তু এই ঘটনার পরে লোকটির কাছে যাবার জন্যে আমার আগ্রহ আবার জ্বলে উঠল।

সে যখন বলছিল, 'আমি বড়ো একা, বড়ো বেশি একা' — তখন তার মুখের ভাবে যে পরিবর্তন এসেছিল তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কথাগুলির মধ্যে এমন কিছু ছিল যার অর্থটা আমি ধরতে পেরেছিলাম এবং যা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। লোকটির কাছে যাবার জন্যে আমি বেরিয়ে এলাম।

তার ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ঘরের মধ্যে কেউ নেই এবং আগাগোড়া ঘরটা অপ্রয়োজনীয় ও অদ্ভুত সব জিনিসে ঠাসা — ঘরের মালিক নিজেও যেমন অপ্রয়োজনীয় ও অদ্ভুত, ঘরের জিনিসগুলোও তাই। সেখান থেকে গেলাম বাগানে। বাগানে গিয়ে দেখলাম, গর্তের ধারে পোড়া গুঁড়ির ওপরে গুটিসুটি হয়ে সে বসে আছে। হাঁটুদুটো মোড়া, কনুই রেখেছে হাঁটুর ওপরে আর ঘাড়ের পিছনে একহাতের সঙ্গে আরেক হাত আট্‌কানো। গুঁড়িটা ধুলোকাদায় মাখামাখি, গুঁড়ির একটা মাথা আলকুশি সোমরাজ আর ভাঁটের ঝোপ ছাড়িয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এখানে এভাবে বসে থাকাটাও অস্বস্তিকর। কিন্তু তবুও সে বসে আছে। এই দৃশ্য দেখার পর লোকটির প্রতি আমার আগ্রহ আরো বেশি বেড়ে গেল।

পেঁচার মতো অন্ধ দৃষ্টিতে আমার মাথার ওপর দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'কি, আমাকে ডাকতে এসেছ নাকি?' তার গলার স্বরে একটু যেন রাগেব আভাস।

'না।'

'তাহলে এখানে কেন?'

'এমনি।'

চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে সে লাল-কালো ছোপ লাগানো একটা রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে লাগল।

'আচ্ছা, নেমে এসো।'

নিচে নেমে তার পাশে গিয়ে বসতেই আমাকে সে একবার জোরে জড়িয়ে ধরল।

'বসো এখানে। তুমিও কথাটি বলবে না, আমিও না। আমরা দু'জনে শুধু চুপচাপ বসে থাকব, কেমন? ঠিক, এইভাবে... তুমি তো ভারি একগুঁয়ে দেখি!'

'হ্যাঁ, আমি একগুঁয়ে।'

'বাঃ বেশ।'

বহুক্ষণ নির্বাক হয়ে আমরা সেখানে বসে রইলাম। সলজ্জ, শান্ত সন্ধ্যা; চমৎকার উষ্ণ একটি সন্ধ্যা; বিষণ্ণতার ছাপ চারিদিকে—যখন সবকিছুই রঙীন অথচ চোখের সামনে সব রঙ মুহূর্তে মুহূর্তে পাণ্ডুর হয়ে আসছে; যখন ফুরিয়ে আসে গ্রীষ্মকালের মাতাল সৌরভ আর রিক্তা পৃথিবীর শ্বাসের সঙ্গে উঠে আসে শুধু স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডার বুকচাপা গন্ধ; যখন বাতাস হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক রকমের স্বচ্ছ; যখন গোলাপী আকাশে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে পড়ে দাঁড়কাকগুলো, মনের মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক চিন্তার উদয় হয়। চারদিক নিথর ও মৌন। এই নিথর মৌনের রাজ্যে কোথায় একটা পাখি ডানা ঝট্‌পট্‌ করছে বা কোথায় একটা গাছের পাতা খসে পড়ছে--এই সামান্য শব্দটুকুই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে এমন একটা শব্দের ঝড় তোলে যে চমকে উঠে চারদিকে তাকাতে হয় এবং পর মুহূর্তেই আবার সেই সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতায় ডুবে যেতে হয় একেবারে।

এই ধরনের এককেটি মুহূর্তে মনের মধ্যে যে-সব চিন্তার উদয় হয় সেগুলো বিশেষ পবিত্র, তার মধ্যে এতটুকু মলিনতা নেই--মাকড়সার জালের মতো এই চিন্তা বড়ো বেশি স্বচ্ছ এবং বড়ো সহজেই ছিঁড়ে যায়। ভাষা দিয়ে এই চিন্তাকে বন্দী করা যায় না। তারা ঝলসে ওঠে আবার উল্কার মতো মিলিয়ে যায়। নিজের সত্তাকে বিষণ্ণতায় ভরে তোলে, নাড়া দেয়, আদর করে, দোলা দেয়—যাতে চিরকালের মতো ছাপ পড়ে তাতে। সেই সব মুহূর্তেই মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে।

আমার সঙ্গীর উষ্ণ গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখলাম আপেল-গাছের কালো ডালপালার আলপনার ভিতর দিয়ে লিনেৎ-পাখী উজ্জ্বল আকাশে উড়ছে, দেখলাম গোল্‌ড্‌ফিঞ্চ পাখীরা রসালো বীজের সন্ধানে শুক্‌নো শালগমে মাথা ঠুকরোচ্ছে, দেখলাম ছেঁড়াছেঁড়া ধূসর মেঘ- কোনগুলো এবড়ো-খেবড়ো, মাঠের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তাদের নীচে কাকগুলো উড়ে চলেছে, কবরখানায় নিজেদের বাসার দিকে। সবকিছুরই মানে আছে—অসাধারণ মানে।

মাঝে মাঝে আমার সঙ্গীটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে আর বলে উঠছে:

'চমৎকার, না ভাইটি? সত্যিই চমৎকার! ইস্‌, মাটি ভিজে গেছে, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না তো?'

তারপর যখন আকাশ কালো হয়ে গেল আর রাত্রির অন্ধকারে ডুবে গেল সবকিছু, তখন বলল সে:

'বাস্, আর নয়, এবার উঠে পড়ো...'

বাগানের দরজার কাছে এসে থেমে গিয়ে আবার বলল, 'তোমার দিদিমার মতো আশ্চর্য মানুষ আমি আর দেখিনি। কী বিচিত্র এই সংসার!'

কথাগুলো বলে একটু হেসে চোখ বুজল, তারপর খুব চাপা স্বরে আর খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে আবৃত্তি করতে লাগল:

এই হোক্ সেই লোকের শাস্তি — যে অপরের পাপপরামর্শে কান দেয়, নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দেয় অপরের ইচ্ছার কাছে।

'কথাগুলো মনে রেখো ভাইটি!' উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে আমাকে ঠেলে দিল সামনের দিকে।

'তুমি লিখতে পার?'

'না।'

'শিখে নাও। আর যখন লিখতে শিখবে তখন তোমার দিদিমার এই ছড়াগুলো লিখে নিও। একটি বড়ো কাজ করা হবে তাহলে।'

এই ঘটনার পর থেকেই আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যাই। যখনই ইচ্ছে হয়, 'বাঃ বেশ'এর সঙ্গে দেখা করতে যাই আমি। ছেঁড়া কাপড়চোপড়ে ঠাসা একটা বাক্সের ওপরে নির্বিবাদে বসে বসে তার কাজ দেখি। সে সীসে গলায়, তামা গরম করে; লোহার পাতকে নেহাইয়ের ওপর রেখে সুন্দর কারুকার্য-করা হাতলওলা একটা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে নানা আকারের জিনিস তৈরি করে; নানা রকমের উখো আর সিরিশকাগজ দিয়ে ঘষে সেগুলোকে। কত রকমের উখো যে আছে! আর আছে একটা চুলের মতো সরু করাত। তামার নিক্তিতে ওজন করে প্রত্যেকটা জিনিস। পুরু মোটা চীনামাটির পাত্রে অনেক রকমের তরল পদার্থ মেশায়, ঝাঁজালো ধোঁয়ায় ভরে যায় ঘরটা। একটা মোটা বই দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে, বিড়বিড় করে বকে, নিজের লাল ঠোঁটদুটো কামড়ে নীচু কর্কশ গলায় সে গায়:

হায় রে সারন'এর গোলাপ...

'তুমি কী তৈরি করছ?'

'একটা জিনিস তৈরি করছি ভাইটি...'

'কী জিনিস?'

'কী করে তোমাকে বলি! তোমাকে বোঝাবার মতো করে বলতে পারব না মনে হচ্ছে...'

'দাদামশাই বলেন, তুমি নাকি জাল টাকা তৈরি করছ।'

'দাদামশাই? হুঃ!.. একেবারে বাজে কথা। একটা কথা মনে রেখো ভাইটি, টাকা জিনিসটা এমন কিছু নয় যে তার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে।'

'বলছ কি তুমি? টাকা না থাকলে রুটি কিনতে পারবে?'

'ঠিকই বলেছ ভাই, টাকা না থাকলে রুটি কেনা যায় না...'

'কেমন? আচ্ছা মাংস...'

'হাঁ, মাংসও কেনা যায় না।'

প্রশান্ত হাসি হাসল সে; ভারি ভালো লাগল আমার এই হাসিটুকু। বেড়ালছানাকে লোকে যেভাবে আদর করে তেমনিভাবে আমার কানের পিছনে সুড়সুড়ি দিতে দিতে সে আমাকে বলে:

'ভাইটি, তোমার সঙ্গে আমি বাদপ্রতিবাদ করতে পারব না। প্রত্যেকবারেই তুমি আমাকে কোণঠাসা করে ফেলছ। তার চেয়ে বরং কথাবার্তা না বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকা যাক্, কেমন?'

মাঝে মাঝে সে কাজ থামিয়ে জানলার সামনে আমার কাছে এসে চুপটি করে বসে থাকে। দু'জনে বহুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, আপেল গাছ বিবর্ণ হয়ে উঠছে, তার পাতা পড়ছে ঝরে, ঘাসে ঢাকা উঠোনের ও ছাদের ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। 'বাঃ বেশ' কখনো খুব বেশি কথা বলে না কিন্তু যেটুকু বলে যথার্থ কথাই বলে। যদি সে কোনো কিছু আমাকে দেখাতে চায় তাহলেও অধিকাংশ সময়ে কথা না বলে আস্তে ঠেলা দেয় আমার গায়ে এবং চোখ টিপে তাকিয়ে আমার দৃষ্টি জিনিসটির দিকে আকর্ষণ করে।

আমাদের বাড়ির উঠোনটিতে বিশেষ করে দেখবার মতো কিছু আছে বলে আগে আমার কোনো দিন মনে হয়নি। কিন্তু তার পাশে বসে থাকবার সময়ে মাঝে মাঝে আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে আর মাঝে মাঝে কথা বলে সে আমাকে যে-সব জিনিস দেখিয়েছে সেগুলোর মধ্যে যেন একটা বিশেষ তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছি, সেগুলো আমার স্মৃতিতে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে।

হয়তো একটা বেড়াল ছুটে উঠোনটা পার হয়ে যেতে যেতে কোনো খানা-ডোবায় নিজের ছায়াটা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর এমনভাবে থাবা উঁচিয়ে ধরে যেন জলের ভিতরকার ছায়াটাকে সে মারতে চাইছে।

'বাঃ বেশ' বলে, 'বেড়ালের ভয়ানক দেমাক আর স্বভাবটাও তেমনি অবিশ্বাসী।'

সোনালী-লাল রঙের মোরগ 'মামাই' উড়ে গিয়ে বসে বেড়ার ওপরে, ডানা ঝট্পট্ করে, টাল্ ঠিক রাখতে না পেরে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয়, রেগে যায়, ঘাড় টান করে ক্রুদ্ধ স্বরে কি যেন বিড়বিড় শুরু করে।

'এই সেনাপতি নিজেকে একজন হোমরাচোমরা মনে করে, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিটা একটু কম।'

উষ্কখুষ্ক চেহারার ভালেই বুড়ো-ঘোড়ার মতো কাদার ভিতর দিয়ে থপ্থপ্ করে হেঁটে আসে, ফুলো ফুলো চওড়া মুখটা তুলে আড়চোখে আকাশের দিকে তাকায়, শরৎকালের একফালি ফ্যাকাশে রোদ এসে পড়ে ওর বুকের ওপরে আর জ্যাকেটের পেতলের বোতামটা ঝক্ঝক্ করে ওঠে। ভালেই দাঁড়িয়ে পড়ে আর বাঁকা বাঁকা আঙ্গুল দিয়ে বোতামটা নাড়াচাড়া করে।

'এমন করছে যেন ওটা বোতাম নয়, বুকের ওপরে মেডেল ঝুলিয়েছে।'

কিছুদিনের মধ্যেই 'বাঃ বেশ'এর ওপর আমার টান খুব বেশি রকম বেড়ে গেছে। দুঃখই হোক্ বা আনন্দই হোক্, যে-কোনো ব্যাপারে তাকে না হলে আমার কিছুতেই চলে না। আর যদিও সে নিজে চুপচাপ থাকে, বেশি কথা বলাটা তার স্বভাব নয় তবু আমায় কথা বলতে কখনো বাধা দেয় না। তার সামনে বসে আমি খুশিমতো বক্বক্ করে যাই। আমার দাদামশাইয়ের স্বভাব ঠিক উল্টো। কথা বলতে গেলেই এক ধমক দিয়ে তিনি আমাকে থামিয়ে দেন:

'ওহে কথার জাহাজ, বক্বকানিটা একটু থামাও তো দেখি!'

আর আমার দিদিমা নিজের চিন্তা নিয়েই এত ব্যতিব্যস্ত যে অপরের কথায় কান দেবার অবসর তাঁর নেই।

কিন্তু 'বাঃ বেশ' আমার কথা সব সময়েই খুব মন দিয়ে শোনে আর মাঝে মাঝে অল্প একটু হেসে বলে:

'ঠিক বলোনি ভাইটি! এটা তুমি বানিয়ে বলছ!'

মন্তব্যগুলো সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঠিক সময়টিতে এবং ঠিক কথাটির ওপরে। এমনভাবে মন্তব্য করে যে মনে হতে পারে, সে আমার হৃদয়ের ও মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে আর কথাগুলো আমার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে আসবার আগেই বুঝতে পারছে, কোন্টা মিথ্যা ও অবান্তর। সঙ্গে

সঙ্গে সেই কথাগুলোকে খুন করছে স্নেহকোমল সুরে বলা তিনটি কথার সাহায্যে:

'বানিয়ে বলছ, ভাইটি!'

তার এই আশ্চর্য যাদুকরী ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্যে মাঝে মাঝে আমি ইচ্ছে করে গল্প বানিয়েছি আর এমনভাবে তার কাছে তা বলেছি যেন সেগুলো সত্যি ঘটনা। কিন্তু প্রতিবারেই অবধারিতভাবে দেখা যায়, অল্প কিছুক্ষণ শোনার পরেই সে মাথা নাড়ে আর বলে:

'বানিয়ে বলছ, ভাইটি!'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমি? আমি ঠিক জানতে পারি।'

সেন্নায়া স্কোয়ার থেকে জল আনবার সময় প্রায়ই দিদিমা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। একদিন যাবার পথে আমরা দেখলাম, পাঁচজন শহুরে লোক একজন গাঁয়ের চাষীকে ধরে পিটোচ্ছে। মাটিতে ফেলে দিয়ে একপাল কুকুরের মতো তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে। দিদিমা করলেন কি, বাঁক থেকে খুলে ফেললেন বাল্‌তিদুটো, তারপর সেই বাঁকটাকে লাঠির মতো ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে গেলেন শহুরে লোকগুলোর দিকে। আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তুই চলে যা!'

কিন্তু ভয় পেয়ে আমিও ছুটলাম দিদিমার পিছনে পিছনে। শত্রুদের লক্ষ্য করে আমি ঢিল ও পাথর ছুঁড়তে লাগলাম আর দিদিমা প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁর বাঁক দিয়ে তাদের খোঁচাতে লাগলেন আর তাদের মাথায় পিঠে দুমদাম বাড়ি মারতে লাগলেন। আরও বহু লোক জুটে গেল। মারতে মারতে তাড়িয়ে দেওয়া হল শহুরে লোকগুলোকে। চাষীর মুখটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, দিদিমা তার মুখ ধুইয়ে দিতে লাগলেন। এই ঘটনার কথা ভাবলে আজও আমি কেঁপে উঠি। আমার মনে পড়ে, লোকটা ধুলোমাখা আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরেছিল ছেঁড়া নাকের পাশটা আর সমানে আর্তনাদ করছিল, কাশছিল। ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসছিল তার দুই আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে, দিদিমার মুখ আর বুক ভেসে গিয়েছিল রক্তে, দিদিমাও চিৎকার করছিলেন, তাঁর শরীরটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর্‌থর্ করে কাঁপছিল।

বাড়ি ফিরেই আমি ছুটতে ছুটতে গেলাম আমাদের সেই বাসিন্দাটির কাছে। তার কাছে আগাগোড়া ঘটনাটা বলতে শুরু করলাম। কাজ থামিয়ে

আমার কাছে এসে দাঁড়াল সে। একহাতে মস্ত একটা উখো তলোয়ারের মতো উ'চিয়ে ধরে রইল। চোখের চশমার ফাঁক দিয়ে স্থির ও কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, তারপর হঠাৎ আমার কথায় বাধা দিয়ে অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বলল:

'চমৎকার! এই তো চাই! বেশ, বেশ!'

কিন্তু এই ঘটনা আমাকে এত বেশি অভিভূত করেছিল যে আমি তার এই কথাগুলোয় অবাক না হয়ে অনর্গল কথা বলে চললাম। তখন সে আমাকে একহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে মৃদু ভৎর্সনার সুরে বলতে লাগল:

'বাস্, বাস্, আর নয়! তুমি যে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলে তা বলা হয়ে গেছে, বুঝেছ? এবার থামো!'

আমি চুপ করে গেলাম। আমাকে এভাবে থামিয়ে দেওয়াতে প্রথমে আমার মনে খুবই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পরে ব্যাপারটা ভালো করে ভাবতেই বুঝতে পারলাম এবং বুঝতে পেরে অবাক হলাম যে ঠিক সময়টিতে সে আমাকে থামিয়েছে। সত্যি সত্যিই আমার যা কিছু বলার ছিল, সবই বলা হয়ে গেছে।

সে বলল, 'এসব কথা মনের মধ্যে পুষে রেখো না, ভুলে যেতে চেষ্টা কোরো।'

মাঝে মাঝে আচমকা সে আমাকে এমন সব কথা বলেছে যা আমি সারা জীবনেও ভুলিনি। একবার আমার শত্রু ক্ল্যুশনিকভের কথা তার কাছে আমি বলেছিলাম। ক্ল্যুশনিকভ হচ্ছে নোভায়া স্ট্রীটের আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। ছেলেটির মোটা শরীর, মস্ত মাথা। আমরা দু'জনেই কেউ কেউকে বাগে আনতে পারি না। আমার এই নিদারুণ সমস্যার কথা শুনে 'বাঃ বেশ' বলল:

'এ সব বাজে কথা! এই ধরনের জোরকে সত্যিকারের জোর বলে না! চটপটে হতে পারাটাই হচ্ছে আসল জোর। যতো তাড়াতাড়ি তুমি হাত-পা নাড়তে পারবে ততোই জোর বাড়বে তোমার। বুঝেছ?'

পরের রবিবার কথাটা পরীক্ষা করে দেখলাম। ঘুষিগুলো চালালাম আরো তাড়াতাড়ি। দেখা গেল, ক্ল্যুশনিকভকে কাবু করতে বেশি সময় পেতে হল না। এই ব্যাপারে আমাদের এই বাসিন্দাটির কথায় আমার আরও বেশি আস্থা এসে গেল।

'সব জিনিসকে কিভাবে আয়ত্তে আনতে হয় সেটা জানতে হয় — বুঝেছ? যে কোনো জিনিসকে পুরোপুরি আয়ত্তে নিয়ে আসা খুবই শক্ত।'

কথাগুলোর অর্থ আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু সেগুলো এবং এই ধরনের আরো অনেক কথা আমার মনে আছে। এসব মনে থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, কথাগুলো আপাতবিচারে খুবই সহজ কিন্তু তবুও তার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর দুর্বোধ্যতা থেকেই যায়, যেমন বলা যেতে পারে একটা ঢিল, একটুক্‌রো রুটি, একটা পেয়ালা বা একটা হাতুড়ি -- এসব জিনিসকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসা কি শক্ত কাজ?

আমাদের বাড়ির অন্য সবাই কিন্তু দিন দিনই 'বাঃ বেশ'কে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। আমাদের বাড়ির হাসিখুশি তরুণীটির একটি পোষা বেড়াল আছে, ডাকলেই কাছে আসে, কোলে উঠে বসে, কিন্তু এই বেড়ালটিও কিছুতেই তার কোলে আসে না বা হাজার আদর করে ডাকলেও তার ডাকে সাড়া দেয় না। এজন্যে বেড়ালটাকে আমি মারতে ধরতে বাকি রাখিনি, আচ্ছা করে বেড়ালটার কান মলে দিয়েছি, নানাভাবে বেড়ালটাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে এই লোকটিকে ভয় পাবার কিছু নেই---কিন্তু আমার নিজের প্রায় কান্না এসে গেছে তবুও বেড়ালটাকে বোঝাতে পারিনি।

'কি জান ভাইটি, আমার জামাকাপড়ে অ্যাসিডের গন্ধ কিনা তাই বেড়ালটা আমার কাছে আসতে চায় না।' এই বলে সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু আমি জানতাম বাড়ির আর সবাই-ই, আমার দিদিমাও বাদ যান না, অন্য কথা বলে। সবাই তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। আমার মনে হত এটা অন্যায়, আমার কষ্ট হত এতে।

আমার দিদিমা রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'ওই লোকটার কাছে সব সময়ে ঘুরঘুর করিস কেন বল্‌ তো? বুঝেশুনে চলিস্‌ বাপু, নইলে তোর মাথাতেও তুকতাক মন্ত্র ঢুকিয়ে দেবে!'

আর আমার লালমুখো বদমেজাজী দাদামশাই যতোবার শুনতেন যে, আমি এই বাসিন্দাটির কাছে গিয়েছি ততোবারই নির্দয়ভাবে বেত মারতেন আমাকে। স্বভাবতই আমি 'বাঃ বেশ'কে কক্ষণো বলতাম না যে, তার কাছে আসতে আমাকে সবাই বারণ করে কিন্তু তার সম্পর্কে অন্যরা কী বলাবলি করে সেকথা আমি তার কাছে গোপন করিনি।

'দিদিমা তোমাকে ভয় করেন। দিদিমা বলেন, তুমি নাকি তুক্‌তাক কি

সব শয়তানী মন্ত্র জান। দাদামশাইয়েরও সেই ধারণা। দাদামশাই বলেন, তুমি নাকি ভগবান মানো না, তুমি খুবই ভীষণ লোক।'

কথাগুলো শুনে সে মাছি তাড়াবার মতো করে মাথাঝাঁকুনি দেয়। তার ফ্যাকাশে মুখে চাপা একটু হাসি ফুটে ওঠে। তাই দেখে আমার বুকের ভিতরটা কুঁকড়ে যায় আর মাথাটা ঘুরতে থাকে।

নীচু স্বরে সে বলে, 'ভাইটি, একথা আমি জানি। আমিও টের পাই। ভারি বিশ্রী ব্যাপার — না? কি বলো?'

'হ্যাঁ।'

'ভারি বিশ্রী, ভাইটি!'

শেষ পর্যন্ত তাকে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

একদিন সকালে প্রাতরাশের পর দেখলাম, নিজের ঘরে মেঝের ওপরে বসে সে একটা বাক্সের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছে আর আপন মনেই গুনগুন করে গাইছে, 'হায় রে সারন'এর গোলাপ!'

'ভাইটি, এবার তাহলে বিদায় দাও। আমি চলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

জবাব দেবার আগে তীব্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে একবার আমার দিকে তাকাল।

'কেন, তুমি কিছু জান না? তোমার মা আসছেন, সেজন্যে এই ঘরটি দরকার।'

'কে বলেছে একথা?'

'তোমার দাদামশাই।'

'দাদামশাই মিথ্যে কথা বলেছেন!'

'বাঃ বেশ' আমাকে টেনে নিয়ে কাছে বসাল। মেঝের ওপরে তার পাশটিতে আমি বসলাম। আর তখন নীচুস্বরে বলল সে:

'রাগ কোরো না ভাইটি! আমি ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা জেনেও তুমি আমার কাছে কিছু বলোনি। সেটা আমার ভালো লাগেনি।'

যে জন্যেই হোক, কথাটা আমাকে ঘা দিল এবং তার জন্যে আমি রেগে উঠলাম।

অল্প একটু হেসে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে সে বলল, 'শোন ভাইটি, তোমার মনে আছে তোমাকে যে একবার আমি আমার কাছে আসতে বারণ করেছিলাম?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় জানালাম।

'তখনই তোমার মনে খুব কষ্ট হয়েছিল, নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'আর আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনি। কিন্তু আমি জানতাম, তোমার সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব হয় তাহলে বাড়ির লোক তোমাকে বকাঝকা করবে।'

এমনভাবে সে কথা বলল যেন সে ছোট, আমার সমবয়স্ক। তার কথা শুনে আমি ভারি খুশি হলাম। আমার মনে হতে লাগল, সে এইমাত্র আমাকে যে-কথাটি বলেছে তা আমি অনেক আগে থেকেই জানতাম।

বললাম, 'আমি একথা অনেক আগেই জানতাম।'

'বেশ। তাহলে ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এই, বুঝলে তো ভাইটি? এই।'

আমার বুকের ভিতরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে লাগল।

'কেউ তোমাকে পছন্দ করে না কেন?'

আমাকে সে জোরে বুকের ওপরে চেপে ধরল আর চোখ মিটমিট করে বলল:

'কেন জান ভাইটি? আমি অন্য কারও মতো নই। আসল কারণটা তা-ই। আমি তাদের মতো নই!'

কী বলব বুঝতে না পেরে আমি তার জামার আস্তিনটা আঁকড়ে টেনে রইলাম।

'রাগ কোরো না ভাইটি।' তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল সে আমার কানে কানে: 'আর কেঁদোও না!'

কিন্তু তার অজান্তেই তার ঝাপসা চশমার কাঁচদুটোর নীচ দিয়ে টস্‌টস করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

অন্য দিনের মতো সেদিনও আমরা বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে সামান্য দু-একটা কথার আদানপ্রদান হল মাত্র।

সেইদিন সন্ধ্যায় প্রত্যেকের কাছে প্রসন্ন মুখে বিদায় নিয়ে এবং আমাকে একবার নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে সে চলে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলাম। শীতে কাদা জমে রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে, গাড়ির চাকা লাফাচ্ছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরেও ঝাঁকুনি লাগছে। যতোক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

এদিকে সে চলে যেতেই আমার দিদিমা নোংরা ঘরটা পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেছেন। আমি করলাম কি, ইচ্ছে করে ঘরের একোণ থেকে ওকোণে ঘোরাঘুরি করে তাঁর কাজে বাধা দিতে লাগলাম।

আমার গায়ে হোঁচট খেয়ে দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন, 'বেরো, বেরো এখান থেকে।'

'ওকে কেন তোমরা এখানে থাকতে দিলে না?'

'তাতে তোর কী?'

'তোমরা সবাই বোকা!' বললাম আমি।

একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে আমাকে সপাং সপাং করে মারতে মারতে দিদিমা চিৎকার করতে লাগলেন, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? বদ্ধ পাগল হয়েছিস নাকি?'

'বদ্ধ পাগল তো সকলেই, তুমি ছাড়া।' সংশোধন করে বললাম আমি কিন্তু দিদিমা তবুও শান্ত হলেন না।

রাত্রিবেলা খেতে বসে দাদামশাই বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে লোকটা চলে গেছে! যতোবার লোকটাকে দেখতাম, আমার বুকে যেন ছুরি বিঁধত। যাক্, এতদিনে রেহাই পাওয়া গেছে।'

রাগে আমি একটা চামচ ভেঙে ফেললাম এবং সেজন্যে যথারীতি শাস্তিও আমাকে পেতে হল।

এই ভাবে শেষ হোলো আমার প্রথম বন্ধুত্ব সেই ধরনের অসংখ্য লোকের সঙ্গে নিজের দেশে যারা পরবাসী — যারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতিনিধি।

নয়

আমার ছেলেবেলাটাকে মৌচাকের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই মৌচাকে জীবন সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধু আহরণ করেছে নানান সাধারণ ও সাদাসিধে মানুষ। আমার চরিত্রের গঠন ও বিকাশে এদের দান তুচ্ছ নয়। এই মধু মাঝে মাঝে নোংরা ও তেতো না হয়েছে তা নয়। কিন্তু যেহেতু সেগুলি জ্ঞান সেহেতু তারা মধু বৈকি।

'বাঃ বেশ' চলে যাবার পরে আমার সঙ্গে পিওতর-কাকার বন্ধুত্ব হল। আমার দাদামশাইয়ের সঙ্গে তার মিল এইদিক থেকে যে দাদামশাইয়ের মতো সেও রোগা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে চেহারার দিক থেকে এবং অন্য

সমস্ত দিক থেকে দাদামশাইয়ের চেয়ে সে খাটো। তাকে দেখে আমার মনে হত, বাচ্চা একটি ছেলে যেন শুধু মজা করবার জন্য বুড়ো মানুষের সাজপোশাক পরেছে। সরু সরু চামড়ার ফিতে পাকিয়ে চুবড়ির মতো তৈরি করা তার মুখখানা একটা খাঁচার মতো দেখতে হয়েছে আর এই খাঁচার ভিতর থেকে ছোট ছোট দুটো পাখির মতো কৌতুকোজ্জ্বল চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে থাকে। কোঁকড়ানো পাকা চুল, ছোট ছোট চক্রে পাক খাওয়া দাড়ি। পাইপ টানবার সময় মুখ থেকে যে ধোঁয়া বেরোয় তার রঙটাও ঠিক তার চুলের মতো আর তার প্রবাদভরা কথাবার্তাও সেই ধোঁয়ার ছোট ছোট চক্রের মতো পাক খায়। কথা বলার ধরনটা খুবই পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি, কথা বলে ভন্‌ভন্‌ স্বরে, মনে হয় কথাগুলোর মধ্যে দরদ ও নম্রতা আছে-- কিন্তু আমার কেমন জানি একটা ধারণা যে, তার কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে।

'আমার মনিব ছিলেন একজন কাউণ্টেস। নাম—তাতিয়ান, পৈতৃকনাম -- লেক্সেভনা। ব্যাপারটা শুরু হল এইভাবে। তিনি আমাকে বললেন—তুমি কামারশালায় কাজ শেখ গিয়ে। কিন্তু যেই না আমি কামারশালায় গিয়েছি, তিনি আমাকে ডেকে বললেন—তুমি বাগানের মালীর সঙ্গে কাজ করো গিয়ে। আমার তো কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই, এক জায়গায় হলেই হল। কিন্তু সেই যে কথায় আছে না—যার কাজ তারে সাজে, অন্য হাতে লাঠি বাজে! সুতরাং কিছুদিন পরেই দেখা গেল, আমাকে দিয়ে সুবিধে হচ্ছে না। কাউণ্টেস আমাকে ডেকে বললেন—"পেত্রুশ্‌কা, তার চেয়ে বরং তুমি মাছ ধরার কাজে লেগে যাও!" যেমন বলা তেমনি কাজ। আমিও উঠে-পড়ে লেগে গেলাম। তারপর কাজটা যখন একটু-আধটু রপ্ত হয়ে আসছে, বাস্‌, হয়ে গেল মাছ ধরা! গাড়ি চালাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল শহরে। তারপর থেকেই আমি গাড়ি-চালক। আরও কত কী হতাম কে জানে। কিন্তু কাউণ্টেসের ঝোঁক অন্য কোনো দিকে যাবার আগেই মুক্তি-আইন পাশ হয়ে গেল। তারপর আর কী! আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম, ঘোড়াটা রইলো আমার কাছে আর তখন থেকে কাউণ্টেসের বদলে ঘোড়াটার পিছন-পিছন চলি।'

সেটা বুড়ো হয়ে গেছে, গায়ের রং সাদা, কিন্তু দেখে মনে হয়, এক মাতাল চিত্রকর নানা রঙের তুলি নিয়ে ঘোড়াটার সারা গায়ে ফুটফুট দাগ দিয়েছে। পাগুলো বাঁকা, উল্টোপাল্টা লাগিয়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু কিমাকার

চেহারা—ছেঁড়া ন্যাকড়ায় সেলাই করা কোনো রকমে একটা ঘোড়ার চেহারা দাঁড় করানো হয়েছে যেন। ছানিপড়া দুটো চোখ সমেত হাড়গিলে মাথাটা কাতরভাবে ঘাড় থেকে ঝুলছে; কয়েকটা শীর্ণ পেশী ও শিথিল চামড়া কোনো রকমে আটকে রেখেছে মাথাটাকে। ঘোড়াটার ওপরে পিওতর-কাকার ভারি শ্রদ্ধা, ঘোড়াটাকে সে ডাকে 'তান্‌কা' বলে আর কক্ষণো তার গায়ে হাত তোলে না।

দাদামশাই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার ঘোড়াটাকে এমন একটা খ্রীষ্টান নাম দিয়েছ কেন বলো তো হে?'

সে জবাব দিয়েছিল, 'না, ভাসিল ভাসিলিচ, না, তোমার কথাটা ঠিক নয়। "তান্‌কা" খ্রীষ্টান নাম নয়—খ্রীষ্টান নাম হচ্ছে "তাতিয়ানা"।'

পিওতর-কাকাও লেখাপড়া জানে এবং তার শাস্ত্রজ্ঞানটা প্রখর। সাধুমহাত্মাদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট এই নিয়ে দাদামশাইয়ের সঙ্গে সব সময়েই তর্কবিতর্ক চলে তার। বাইবেলে যে-সব পাপীদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে দু'জনেই খড়্গহস্ত। দু'জনেই সবচেয়ে বেশি অপবাদ দেয় আবেসালোমকে। আবার মাঝে মাঝে দু'জনের তর্কবিতর্ক হয়ে ওঠে ব্যাকরণগত চুলচেরা বিচার। আমার দাদামশাই বলেন 'পাপাচারবাদ', 'উচ্ছৃঙ্খলবাদ', 'মূর্তিপূজাবাদ'। আর পিওতর-কাকা বলে--'পাপাচারিতা', 'উচ্ছৃঙ্খলচারিতা', 'মূর্তিপূজাচারিতা'।

রাগে মুখখানা লাল টকটকে করে আমার দাদামশাই হুঙ্কার ছাড়েন, 'তুমি বলছ এক কথা আর আমি বলছি অন্য কথা। তোমার ওই "-চারিতা"র কাণাকড়িও দাম নেই।'

পিওতর-কাকা একটুও বিচলিত হয় না, তেমনিই তার মাথার চারপাশ দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে। টেনে টেনে তিক্ত স্বরে বলে:

'আর তোমার "-বাদ"টা যে আরো উঁচুদরের ব্যাপার তা কিন্তু মোটেই নয়। ভগবানের কাছে সেটা আমার চেয়ে একটুও বেশি ভালো নয়। আবার এমনও হতে পারে, তোমার উপাসনা শুনে প্রভু হয়তো মনে মনে ভাবেন—উপাসনার কথাগুলো জাঁকালো বটে কিন্তু কাণাকড়িও তার দাম নেই!'

সবুজ দুই চোখে আগুন ঝরিয়ে দাদামশাই হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'এই লেক্সেই! তোর এখানে থাকার কি দরকার? যা, বাইরে যা!'

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে পিওতর ভালোবাসে। উঠোন দিয়ে

চলবার সময়ে পায়ের সামনে হাড়ের টুক্‌রো বা কাঠি পড়ে থাকলে পা দিয়ে সরিয়ে দেয় আর বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে:

'যত সব বাজে জিনিস, শুধু বাধার সৃষ্টি করে।' কথা বলে একটু বেশি, যেন হাসিখুশি দিলদরিয়া মানুষ। কিন্তু মাঝে মাঝে চোখদুটো নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে আর মড়ার মতো তাকিয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, কোনো একটা অন্ধকার কোণে সে আপনমনে বসে আছে; তার ভাইপোর মতো সেও তখন বিষণ্ণ ও নির্বাক।

'পিওতর-কাকা, কী হয়েছে তোমার?'

নিস্পৃহ গলায় যতোটা সম্ভব ঝাঁজ এনে সে জবাব দেয়, 'দূর হ!'

আমাদের এই রাস্তার একটা বাড়িতে এক ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁর কপালে আব্‌, আর একটা অদ্ভুত অভ্যেস আছে ভদ্রলোকের। রবিবার দিন তিনি জানলার কাছে বসে ছর্‌রা বন্দুক ছোঁড়েন; তাঁর লক্ষ্যস্থল হয় রাস্তার কুকুর, বেড়াল, হাঁস-মুরগি, কাক, এমন কি যে-সব পথচারীকে তাঁর পছন্দ হয় না তারাও। একদিন 'বাঃ বেশ'কে লক্ষ্য করে ছর্‌রা ছুঁড়েছিলেন; ছর্‌রা 'বাঃ বেশ'এর চামড়ার জ্যাকেট ফুটো কবতে পারেনি, কিন্তু কতগুলি ছর্‌রা এসে পড়েছিল তার পকেটের মধ্যে। আমার মনে আছে, আমাদের বাসিন্দাটিকে পকেট থেকে ছর্‌রা বার করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে দেখেছিলাম। আমার দাদামশাই তাকে নালিশ করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু সে-কথায় কান না দিয়ে সে ছর্‌রা রান্নাঘরের কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু বলে, 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে অত ঝামেলা পুইয়ে লাভ কি!'

আরেকবার এই লক্ষ্যভেদকারী ভদ্রলোকের ছর্‌রা এসে লাগে আমার দাদামশাইয়ের পায়ে। ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে দাদামশাই দোষীর বিরুদ্ধে বিচারকের কাছে নালিশ করেন এবং সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা যায়, ভদ্রলোক উধাও।

রাস্তার দিক থেকে সেই ভদ্রলোকের ছর্‌রা ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেলেই পিওতর-কাকা তাড়াহুড়ো করে গেট দিয়ে বেরিয়ে যায়। মাথায় গলিয়ে নেয় রবিবারের-জন্যে-তোলা মস্ত-কিনারওলা রং-চটা টুপিটা। রাস্তায় বেরিয়ে এসে কোটের ভিতর দিয়ে এমনভাবে হাত গলিয়ে দেয় যে কোটের পিছনদিককার অংশটুকু উঁচু হয়ে থাকে মোরগের লেজের মতো। পেটটা চিতিয়ে দিয়ে ভারিক্কী চালে পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়ায় বন্দুকধারী ভদ্রলোকটির জানলার সামনে। প্রথমবারের পরিক্রমা কার্যকরী না হলে দ্বিতীয়বার, দ্বিতীয়বার না

হলে তৃতীয়বার, এমনি সমানে। ঘটনাটা দেখবার জন্যে আমাদের বাড়ির সবাই ভিড় করে এসে দাঁড়ায় গেটের সামনে, কৃষ্ণমুখ ফৌজী লোকটি ও তার সোনালী-চুল বৌ তাকিয়ে থাকে জানলা দিয়ে। বেৎলেংদের বাড়ির লোকেরাও বেরিয়ে আসে রাস্তায়। শুধু অভসিয়ান্নিকোভদের ছাইরঙা বাড়িটায় জীবনের সাড়া পাওয়া যায় না।

মাঝে মাঝে পিওতর-কাকার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়— এমন একটি শিকারকে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে দেখেও বন্দুকধারী ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই দোনলা বন্দুকটা থেকে ছর্‌রা ছুটে আসে।

'বুম্‌—বুম্‌!'

পিওতর-কাকা পালিয়ে আসে না, তেমনি ভারিক্কী চালে ধীরেসুস্থে পা ফেলে এগিয়ে এসে আমাদের খবর দিয়ে যায়: 'কোটের পিছনদিকটার অংশেতে ছর্‌রা লেগেছে।'

একদিন ছর্‌রা এসে লাগল পিওতর-কাকার কাঁধে আর ঘাড়ে। সূচ দিয়ে ছর্‌রাকে বার করতে করতে দিদিমা বললেন, 'এই বুনো লোকটাকে এভাবে উস্‌কিয়ে তুলে লাভ কী! এমন করলে কোন্‌দিন চোখে ছর্‌রা করে বসবে!'

কথাটায় কিছুমাত্র আমল না দিয়ে পিওতর বলল, 'আকুলিনা ইভানোভনা, আপনিও যেমন! হাতের তাক্‌ বলে কোনো কিছু আছে নাকি ও-লোকটার!'

'তাহলে ওকে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া কেন?'

'প্রশ্রয়? আমি ভদ্রলোককে একটু ক্ষেপাই!'

হাতের ছর্‌রাগুলোর দিকে তাকিয়ে সে আবার বলল, 'এ লোকটা বন্দুক ছোঁড়ায় একেবারে আনাড়ি। তাহলে শুনুন, কাউন্টেস তাতিয়ান লেক্সেভনার একটা গল্প বলি। এই কাউন্টেসটি বিয়ের ব্যাপারে কোনো স্থায়ী বন্ধনের মধ্যে কখনো ধরা দিতেন না। যেমন তিনি চাকর বদ্‌লাতেন, তেমনি স্বামী বদ্‌লাতেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন এমনি ধারা অস্থায়ী স্বামিত্বে রয়েছে সেনাবাহিনীর একজন লোক, নাম মামন্‌ৎ ইলিচ। হ্যাঁ, হাতের তাক্‌ ছিল বটে এই লোকটির! বন্দুক নিয়ে কি না করতে পারত! ছর্‌রা সে ছুঁড়তো না, কেবল গুলি। ইগ্‌নাশ্‌কা নামে একটা ভ্যাবামার্কা লোককে দাঁড় করিয়ে দিত দূরে, এই পা চল্লিশেক হবে। তার বেল্টের সঙ্গে একটা বোতল বেঁধে দিত, আর বোতলটা ঝুলত দুই পায়ের মাঝখানে। দুই ঠ্যাঙ যতোটা সম্ভব ফাঁক করে ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো হাসতে

হাসতে দাঁড়িয়ে থাকত ইগ্‌নাশ্‌কা আর সেই বোতল লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ত মামনৎ ইলিচ। বুম্‌! চুরমার হয়ে যেত বোতলটা। কিন্তু একবার হল কি, একটা ডাঁশপোকা বোধ হয় ইগ্‌নাশ্‌কাকে কামড়িয়েছিল বা যা-হোক একটা কিছু হয়েছিল—লোকটি স্থির থাকতে না পেরে সরে গেল একটু, আর যাবে কোথায়, বুলেট এসে বেঁধে হাঁটুতে, একেবারে ঠিক গাঁটের হাড়টিতে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার এসে একটুও সবুর করে না — চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঠ্যাঙটা কেটে বাদ দিয়ে দেয়। ঠিক যেমনটি বললাম তেমনটি ঘটেছে! সেই কাটা ঠ্যাঙটা পরে কবর দেওয়া হয়েছিল...'

'আর ইগ্‌নাশ্‌কার কী হল?'

'তার আবার কী হবে! সেরে উঠেছিল। ভ্যাবাগঙ্গারামের হাত-পা থাকাই বা কি, না-থাকাই বা কি। সবাই তাদের সাহায্য করে। সেই যে কথায় আছে—যার বুদ্ধি নেই তার শত্রুও নেই।'

এই গল্প দিদিমাকে তেমন নাড়া দিতে পারেনি। এই ধরনের বহু গল্প দিদিমার নিজেরও জানা আছে। কিন্তু আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

'বড়লোকরা খুশিমতো যে-কোনো লোককে খুন করতে পারে বুঝি?'

'কেন পারবে না? খুশিমতো খুন করতে পারে, কেউ আট্‌কাবার নেই। আবার কি জান, বড়মানুষরা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যেও খুনোখুনি শুরু করে দেয়। একবার এক অশ্বারোহী সৈনিক দেখা করতে এল তাতিয়ান লেক্সেভনার সঙ্গে। মামনৎ'এর সঙ্গে তার হল ঝগড়া। তখন তারা দু'জনেই পিস্তল বাগিয়ে ধরে হেস্তনেস্ত করবার জন্যে পার্কে চলে গেল। পুকুরের ধারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সৈনিকটি গুলি করল মামনৎ'কে। বুম্‌! গুলিটা গিয়ে সোজা লাগল মামনৎ'এর যকৃতে। তারপর আর কি, মামনৎ'কে কবর দেওয়া হল আর সৈনিকটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ককেশাসে। ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য হয়নি। তাহলেই দেখছ তো? নিজেরাই খুনোখুনি করত! আর চাষাভুষোদের খুন করার কথা যদি বলো তো তাহলে আর লেখাজোখা নেই। যতো জনকে খুশি খুন করা চলে। বিশেষ করে আজকাল। আজকাল তো আর চাষাভুষোরা ওদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আগেকার দিনে চাষাভুষোরা ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তখন তবু যা হোক এমন চট করে প্রাণ নিত না।'

দিদিমা বললেন, 'কিন্তু তখনও প্রাণ নিতে তাদের কারুরই বিশেষ আফ্‌সোস দেখা যেত না।'

'তাও ঠিক।' পিওতর-কাকা সায় দিল, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল বটে তবে খুবই শস্তা দামের সম্পত্তি।'

আমার সঙ্গে কথাবার্তায় সে অতি নম্র। আমার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে সে আমার সঙ্গে কথা বলে; এত ভালো ব্যবহার বড়োদের সঙ্গেও সে করে না। কিন্তু তার মধ্যে কি যেন একটা আছে যা আমি কিছুতেই পছন্দ করতে পারি না। তার অতি প্রিয় খাদ্য ফলের জ্যাম যখন সে আমাদের খাওয়াতে আসে, তখন করে কি, অন্যদের রুটিতে যতোটা না পুরু করে জ্যাম মাখে তার চেয়ে অনেক বেশি পুরু করে মাখে আমার রুটিতে। শহরে গেলে সে আমার জন্যে আদা দেওয়া মিষ্টি কেক আর পোস্তর পিঠে নিয়ে আসে। ধীর মস্তিষ্কে এবং যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে আমার সঙ্গে সব সময়ে কথা বলে সে।

'আচ্ছা বলো তো দেখি, বড়ো হয়ে তুমি কি হতে চাও? সৈনিক হবে না কর্মচারী হবে?'

'সৈনিক।'

'সেই ভালো। আজকাল সৈন্য হওয়াটা শক্ত নয়। অবশ্য পাদ্‌রি হওয়াটাও খুবই সোজা—শুধু চোখ বুজে চিৎকার করে যাওয়া "পরমমঙ্গলময় প্রভু আমাকে বাঁচাও!" বাস্‌, আর কিচ্ছুটি করতে হবে না। আমার তো মনে হয়, সৈন্য হওয়ার চেয়েও পাদ্‌রি হওয়াটা সোজা। কিন্তু সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে জেলে হওয়া। কোন কিচ্ছু জানবার দরকার নেই—শুধু একটু অভ্যেস, বাস্‌!'

তারপর সে ভারি মজা করে দেখাতে শুরু করে, কি-ভাবে মাছ এসে টোপের চারপাশে ঘুরপাক খায়, কি-ভাবে টোপ গেলার পর বাস্‌ বা ব্রীম বা মাকেরেল জাতীয় মাছ হুটোপাটি করে।

সান্ত্বনার সুরে আমাকে বলে, 'তোমার দাদামশাই যদি তোমাকে মারধোর করেন তাহলে তো তুমি একেবারে ক্ষেপে ওঠো, নয় কী? কিন্তু তোমায় বলি শোনো, এসব ব্যাপারে অমন ক্ষেপে উঠবার কোনো কারণ নেই। তোমার দাদামশাই যে তোমাকে মারধোর করেন, সে তোমার মঙ্গলের জন্যেই। আর তোমার দাদামশাইয়ের মারধোর তো কিছুই নয়, নেহাতই একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। তাহলে শোন তোমাকে তাতিয়ান লেক্সেভনার একটা গল্প বলি।

মারধোর করার কথাই যদি ওঠে তাহলে এই হচ্ছে একটি লোক যার তুলনা নেই। মারধোর করার জন্যে ক্রিস্তোফোর নামে তাঁর একজন বিশেষ চাকর ছিল। আর মারধোর করার ব্যাপারে লোকটার এমন পাকা হাত যে আশেপাশের জমিদাররা তাতিয়ান লেক্সেভনার কাছে এই বলে খবর পাঠাত: "তাতিয়ান লেক্সেভনা, অনুগ্রহ করে আপনার ক্রিস্তোফোরকে একবার পাঠিয়ে দেবেন— দু-এক দফা মারধোরের ব্যাপার আছে।" আর খবর পেলেই কাউন্টেস পাঠিয়ে দিতেন ক্রিস্তোফোরকে।'

তারপর পিওতর-কাকা ভাবলেশহীন গলায় খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতে শুরু করে। তাঁর বাড়ির থামওলা অলিন্দে লাল আর্মচেয়ার পেতে, ধবধবে সাদা পোশাকের ঝলক তুলে, কাঁধে নীলরঙের স্কার্ফ জড়িয়ে, কাউন্টেস এসে বসেন। মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে ভূমিদাসদের চাবুক মারে ক্রিস্তোফোর আর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন কাউন্টেস।

'এই ক্রিস্তোফোর লোকটা এসেছিল র‍্যাজান থেকে। খানিকটা বেদে বা খখল'এর* মতো। আকর্ণবিস্তৃত গোঁফ কিন্তু দাড়ি কামিয়ে ফেলে বলে মুখটা নীলচে দেখায়। কিছুতেই বোঝা যেত না, লোকটি সত্যিই হাবাগোবা ছিল না বাইরের উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্যে লোকের কাছে হাবাগোবা সেজে থাকত। থেকে থেকে রান্নাঘরে এসে একটা পাত্র জলে ভর্তি করে নেয়, তারপর একটা মাছি বা আরশোলা বা গুবরে পোকা জাতীয় যা হোক্ একটা কিছু ধরে একটা সরু কাঠির ডগা দিয়ে ঠেসে চুবিয়ে ধরে জলের মধ্যে। অনেকক্ষণ চুবিয়ে ধরে রেখে দেয় এইভাবে। তার নিজের কলারের মধ্যে হয়তো উকুন আছে সেটাকেই খপ্ করে ধরে কয়েকবার জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরে...'

এ-ধরনের গল্প আমি ভালোভাবেই জানি, আমার দাদামশাই ও দিদিমার কাছ থেকে এ-ধরনের অনেক গল্পই আমি শুনেছি। এইসব গল্পের মধ্যে অমিল যতোটুকুই থাক্, একটা বিষয়ে কিন্তু মিল আছে এগুলো সবই মানুষের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার গল্প। শুনে শুনে আমার আর ভালো লাগে না।

আমি বলি, 'এসব গল্প নয়, অন্য গল্প বলো।'

গাড়ি-চালকের মুখটা রেখায় রেখায় কুটিল হয়ে ওঠে। একটু পরে মুখের

---

* তখনকার রাশিয়ায় প্রচলিত ইউক্রেনবাসীদের চলতি নাম। — সম্পাঃ

রেখাগুলি সরতে সরতে জড়ো হয় দুই চোখের চারপাশে। তারপর সায় জানিয়ে সে বলে:

'তোমার দেখছি আর আশ মেটে না। আচ্ছা শোনো তবে অন্য একটা গল্প। আমাদের এক পাচক ছিল...'

'আমাদের মানে কাদের?'

'কাউণ্টেস তাতিয়ান লেক্সেভনার।'

'আচ্ছা তুমি কাউণ্টেসকে তাতিয়ানা না বলে তাতিয়ান বলো কেন? তাতিয়ান তো পুরুষের নাম। কাউণ্টেস তো আর পুরুষ ছিলেন না, নয় কি?'

'সে কথা তো ঠিকই—কাউণ্টেস মহিলাই ছিলেন। কিন্তু মহিলা হলেও কাউণ্টেসের গোঁফ ছিল। ছোট কালো একটুখানি গোঁফ। তাঁর গায়ের রং ছিল কালো, জার্মান বংশে জন্ম—অনেকটা নিগ্রোদের মতোই একটা জাতি। তারপর শোনো কি কাণ্ড হল আমাদের এই পাচককে নিয়ে—সে এক ভারি মজার ঘটনা...'

মজার ঘটনাটা হচ্ছে এই: সেই পাচক একবার এক ধরনের মাংসের পুর-দেওয়া খাবার তৈরি করেছিল। রান্নার দোষে নষ্ট হয়ে যায় খাবারটা। তখন সেই পাচককে শাস্তি হিসেবে সমস্ত খাবার গিলিয়ে দেওয়া হয়। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে লোকটি।

রেগে উঠে আমি বলি, 'এটা কি খুব মজার ঘটনা হল?'

'তবে মজার ঘটনা কাকে বলে শুনি? বলো তুমি, তোমার মুখেই শোনা যাক্।'

'জানি না।'

'তাহলে বক্‌বক্ কোরো না। মুখটি বুজে থাকো।'

আবার সে তার একঘেয়ে গল্পের জাল বুনতে থাকে।

কোনো কোনো রবিবার আমার মামাতো ভাইয়েরা বেড়াতে আসে। দুই ভাইয়ের নামই সাশা। একজন মিখাইল-মামার ছেলে—গোমড়া মুখ আর ঢিলেঢালা গোছের। অপরজন ইয়াকভ-মামার ছেলে—ফিটফাট, সবজান্তা। একদিন আমরা তিনজনে বাইরের বাড়ির ছাদের ওপরে অভিযানে বেরিয়েছি এমন সময় দেখলাম, বেৎলেংদের বাড়ির উঠোনে একটা কাঠের গাদার ওপরে বসে এক ভদ্রলোক কতগুলো কুকুরছানার সঙ্গে খেলা করছেন। পরনে লোমের আস্তরদেওয়া একটা সবুজ রঙের ঝুলকোট কিন্তু মাথার হলুদরঙের

ছোট টাকটুকু অনাবৃত। আমার মামাতো ভাইদের একজন প্রস্তাব করল যে একটা কুকুরছানা চুরি করে আনা যাক্। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভেবেচিন্তে একটা পরিকল্পনা স্থির করলাম। আমার মামাতো ভাইয়েরা রাস্তায় বেরিয়ে বেৎলেংদের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমি গিয়ে লোকটাকে ভয় পাইয়ে দেব। আর যেই সে ভয়ে পালিয়ে যাবে, আমার মামাতো ভাইয়েরা একছুটে উঠোনের মধ্যে এসে একটা কুকুরছানা নিয়ে পালিয়ে আসবে।

'কিন্তু আমি ভয় দেখাব কী করে?'

মামাতো ভাইদের একজন পরামর্শ দিল: 'ওর টাকমাথায় থুতু ফেললেই লোকটা ভয় পেয়ে যাবে।'

টাকমাথায় থুতু ফেলে আসার মধ্যে যে বিশেষ রকমের দোষণীয় কিছু আছে তা আমার মনে হল না। এর চেয়েও বড়ো অপরাধ ঘটতে আমি দেখেছি এবং শুনেছি। সুতরাং আমার ওপরে যে দায়িত্ব দেওয়া হল তা পালন করতে আমি একটুও ইতস্তত করলাম না।

কিন্তু ঘটনাটি ঘটার পরেই একটা প্রচণ্ড রকমের হৈচৈ আর গণ্ডগোল শুরু হল। বেৎলেংদের বাড়ি থেকে এক দঙ্গল মেয়েপুরুষ চড়াও হল আমাদের বাড়িতে। সবার আগে আগে এল একজন সুন্দরপানা তরুণ অফিসার। এবং যেহেতু এই অপকর্মটি ঘটবার সময়ে আমার মামাতো ভাইয়েরা অত্যন্ত নিরীহের মতো রাস্তায় বেড়াচ্ছিল তাদের কোনো দোষ আছে বলে মনে করা হল না। একমাত্র আমিই দাদামশাইয়ের হাতে মার খেলাম। দাদামশাই আমাকে প্রচণ্ড মার মারলেন। বেৎলেংদের বাড়িকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে, মারের প্রচণ্ডতার মধ্যে দিয়ে তাকে লাঘব করবার চেষ্টা করলেন দাদামশাই।

থেঁৎলানো শরীর ও সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা নিয়ে আমি যখন রান্নাঘরে পড়ে আছি তখন পিওতর-কাকা এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। ফিটফাট সাজপোশাক আর বেশ খোসমেজাজ। চাপা স্বরে বলল:

'চমৎকার বুদ্ধি মাথা থেকে বার করেছিলে, হে ছোকরা। ঠিক শিক্ষা হয়েছে। পাজির পা-ঝাড়া। ওদের সবকটার মাথায় থুতু ফেললে ঠিক হয়। আরো ভালো হত যদি ওর গোবরঠাসা মাথাটা লক্ষ্য করে একটা ইট ছুঁড়তে পারতে।'

সবুজ কোট পরা ভদ্রলোকটির গোলগাল, চাঁচাছোলা, ছেলেমানুষি মুখটার কথা আমার মনে পড়ছে। ছোট ছোট হাত দিয়ে হলদে টাক থেকে

থুতু মুছতে মুছতে ভদ্রলোক সরু সরু গলায় সখেদে দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে উঠেছিলেন — ঠিক কুকুরছানার ডাকের মতো। তাই শুনে আমার মনে ভয়ংকর একটা অনুতাপ এসেছিল আর আমার মামাতো ভাইদের ওপরে এসেছিল ঘৃণা। কিন্তু এখন গাড়ি-চালকের চুবড়ির মতো পাকানো মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সমস্ত ভুলে গেলাম। আমাকে ধরে মারবার সময় আমার দাদামশাইয়ের মুখটা যেমন আতঙ্কজনক ও কুৎসিত হয়ে উঠেছিল, গাড়ি-চালকের মুখটাও অবিকল সেইভাবে কাঁপছে।

পিওতরকে হাত ও পা দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'চলে যাও এখান থেকে!'

হেসে হেসে আর চোখ টিপে তাকিয়ে সে উনুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সেই দিন থেকেই লোকটির সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তিটুকুও আমার আর নেই। তাকে আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করি; আবার সঙ্গে সঙ্গে তার গতিবিধির ওপরেও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখি। কি যেন একটা ঘটবে, এমনি একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা থেকে যায় আমার মনে।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই আরেকটি ঘটনা ঘটল। অনেকদিন থেকেই অভসিয়ান্নিকোভদের নিঃসাড় বাড়িটা সম্পর্কে আমার একটা চাপা কৌতূহল ছিল। কেন জানি আমার মনে হত, এই ছাইরঙা বাড়িটার মধ্যে এক রহস্যভরা রূপকথার জীবনের অস্তিত্ব।

বেৎলেংদের বাড়িতে সব সময়েই হৈচৈ আর সোরগোল। কয়েকটি আকর্ষণীয় চেহারার তরুণী এই বাড়িতে থাকে এবং তরুণীদের সঙ্গলিপ্সু ছাত্র ও অফিসারেরা আসে। তারা সব সময়েই কথা বলে, হাসে, গান গায় আর বাজনা বাজায়। বাড়িটার চেহারার মধ্যেই যেন একটা আনন্দের ছাপ। তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে জানলাগুলোর কাঁচ দেখা যায়, কাঁচের পিছনে ফুলগুলো সবুজ এক অপরূপ দ্যুতিতে জ্বলজ্বল করছে। আমার দাদামশাই এই বাড়িটা পছন্দ করেন না।

'বিধর্মী! নাস্তিক!' এই বাড়ির সমস্ত বাসিন্দার সম্পর্কেই দাদামশাই সাধারণভাবে এই মন্তব্য প্রয়োগ করেন। আর বিশেষ করে মেয়েদের সম্পর্কে ব্যবহার করেন একটি অতি কুৎসিত শব্দ। পিওতর-কাকা মহা উল্লাসের সঙ্গে আর অতি নোংরাভাবে আমাকে এই শব্দটির অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু অভসিয়ান্নিকোভের রূঢ় ও নিঃশব্দ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাদামশাই ভারি তারিফ করেন।

একতলা তবু উঁচু বাড়িটা, পিছনদিকে অনেকখানি লম্বা হয়ে এসে মিশেছে একটা পরিষ্কার ও খোলা উঠোনের সঙ্গে। সবুজ ঘাসে ঢাকা উঠোন, ঠিক মধ্যিখানে একটা কুয়ো। দু-দিকে দুটো থাম তুলে কুয়োর ওপরে ছাদ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়িটা যেন রাস্তার দিক থেকে সরে গেছে; মনে হতে পারে, বাড়িটা আড়ালে থাকতে চায়। সামনের দিকে খিলান দেওয়া তিনটে সরু সরু জানলা, জানলার শার্সির ওপরে সূর্যের আলো পড়ে রামধনু-রঙ হয়েছে। সদর দরজার ডানদিকে একটা গোলাঘর। মূল বাড়ির অনুকরণে গোলাঘরের সামনের দিকেও তিনটে জানলা। কিন্তু জানলাগুলো নকল, ছাই রঙের দেওয়ালের ওপরে ঢালাই করে দেওয়া হয়েছে, ফ্রেম ও শার্সি সাদা রঙ দিয়ে আঁকা। এই নকল জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। মনে হতে থাকে, গোলাঘরটা এই কথাই জোর গলায় ঘোষণা করছে যে এই বাড়ি আড়ালে থাকতে চায়, নিভৃত জীবন যাপন করতে চায় এই বাড়ি। শূন্য আস্তাবল আর প্রকান্ড প্রকান্ড শূন্য গাড়ি-ঘর সমেত সমস্ত সম্পত্তি যেন নিঃশব্দে অপমানিত হয়ে কিংবা শান্ত গর্বে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

মাঝে মাঝে এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠোনে ঘুরে বেড়ান। দাড়ি নেই, সূচের মতো খোঁচা খোঁচা সাদা গোঁফ। আরেকজন বৃদ্ধকেও প্রায়ই দেখা যায় — দুইগালে মোটা জুলপি, বাঁকা নাক। তিনি আস্তাবল থেকে একটা ছাইরঙা ঘোড়া বার করে নিয়ে আসেন। উঠোনে বেরিয়ে সরু-বুক রোগা-পা ঘোড়াটা চারদিকে তাকিয়ে বিনম্র মঠবাসিনীর মতো অনবরত মাথা নোয়ায়। খোঁড়া বৃদ্ধ চটাং করে একটা চড় মারেন ঘোড়াটার গায়ে, শিস দেন, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, তারপর অন্ধকার আস্তাবলের দিকে ফিরিয়ে দেন ঘোড়াটাকে। আমার মনে হয়, বৃদ্ধ এই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চান কিন্তু একটা অশুভ শক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে এখানে আটকে আছেন।

প্রায় প্রতিদিনই দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তিনটি ছোট ছেলে উঠোনে খেলা করে। তিনজনের পরনে একই রকমের ছাইরঙা প্যান্ট, জামা ও টুপি। চেহারার দিক থেকেও ওদের মধ্যে খুব বেশি মিল — তিনজনেরই একই রকম গোলগাল মুখ আর ছাইরঙা চোখ। ওদের মিল এমনি যে, ওদের চিনতে হলে আমি দেখি কে বড়ো আর কে ছোট, মুখ দেখে চেনা যায় না।

বেড়ার গায়ের একটা ফাটল দিয়ে ওদের লক্ষ্য করি। ওদের নজরে না পড়ায় আমি হতাশ হই। ওরা যে-সব খেলা খেলে তা আমার কাছে

নতুন। ঝগড়া নেই, মারামারি নেই, মনের আনন্দে ওরা খেলা করে — দেখে মন খুশি হয়ে ওঠে। যে-ভাবে ওরা সাজপোশাক করে, যে-ভাবে ওরা একে অপরের জন্যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে — বিশেষ করে ছোটজনের জন্য বড়ো দু'জন — তা দেখে খুব ভালো লাগে আমার। এই ছোটটির চেহারা নাদুসনুদুস, চলন-বলন দেখলে হাসি পায়। যদি ও পড়ে যায় তাহলে বড়ো দু'জন হেসে ওঠে। কাউকে পড়ে যেতে দেখলে লোকে যে-ভাবে হাসে তেমনি ভাবেই ওরা হাসে — ওদের হাসির মধ্যে কোনো হিংস্রতার পরিচয় থাকে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ওকে তুলে ধরে, আগাছার পাতা বা রুমাল দিয়ে ওর হাত-পা মুছিয়ে দেয়।

মেজোজন বলে, 'একেবারে ক্যাবলা!'

ওরা কক্ষণো নিজেদের মধ্যে মারমারি করে না বা একজন আরেকজনকে জব্দ করতে চেষ্টা করে না। তিনজনেই শক্তসমর্থ, চটপটে এবং উৎসাহে ভরা।

একদিন আমি একটা গাছের ওপরে চেপে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে শিস দিলাম। শিসের শব্দ শুনে ওরা থামল তারপর এক জায়গায় জড়ো হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কী যেন আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে। আমার মনে হয়েছিল, ওরা বোধ হয় এবার আমার দিকে ইট ছুঁড়তে শুরু করবে। সুতরাং আমি নিচে নেমে এসে পকেট ভর্তি করে পাথর নিয়ে আবার গাছে উঠলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে ওরা উঠোনের অন্যদিকের কোণে গিয়ে আবার খেলা শুরু করে দিয়েছে এবং দেখে মনে হল, আমার কথা ওদের আর মনে নেই। ব্যাপারটা ভারি দুঃখের কিন্তু কী আর করা যায়, আমি প্রথমে যুদ্ধঘোষণা করতে চাই না। সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় জানলা দিয়ে কে ডেকে উঠল:

'বাড়ি এসো ছেলেরা — দেরি কোরো না!'

ডাক শুনে বাধ্য ছেলের মতো তারা বাড়ির দিকে ফিরল, খুব বেশি তাড়াহুড়ো করল না। ঠিক যেন পোষা হাঁস।

তারপর থেকে প্রায়ই আমি বেড়ার ওপরে গাছে চেপে বসে থাকি। মনে মনে আমার আশা থাকে যে ওরা আমাকে ওদের সঙ্গে খেলতে ডাকবে। কিন্তু একদিনও ওরা ডাকে না। কল্পনায় আমি প্রায়ই ওদের সঙ্গে গিয়ে ওদের খেলায় যোগ দিই, মাঝে মাঝে এমন মেতে উঠি যে সশব্দে হাঁকডাক শুরু করে দিই, হেসে উঠি। শব্দ শুনে ওরা তিনজনেই আমার দিকে তাকায়,

ফিসফাস করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে। তখন লজ্জা পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে আসি।

একদিন ওরা লুকোচুরি খেলতে শুরু করল। মেজো ভাই হল 'চোর'। গোলাঘরের একটা কোণে চোখের ওপরে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, একবারও হাতের ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে চেষ্টা করল না। এবার অন্য দু-ভাইয়ের লুকোবার পালা। গোলাঘরের চালাটা অনেকটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, তারই তলায় একটা স্লেজগাড়ি -- সবচেয়ে বড়ো ভাই গিয়ে লুকোল এই গাড়ির মধ্যে, ওদিকে ছোটটি কুয়োটার চারপাশে ঘুরছে, কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছে না কোথায় লুকোবে।

যে ছেলেটি চোর হয়েছে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গুণছে: 'এক! দুই!..'

ইতিমধ্যে ছোটটি কুয়োর কিনার বেয়ে ওপরে উঠেছে, বাল্‌তি সমেত দড়িটা ঝুলছিল। হাত বাড়িয়ে মুঠো করে ধরল দড়িটা, তারপর এক লাফ দিল শূন্য বাল্‌তিটার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দড়ি সমেত বাল্‌তিটা নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুয়োর ধারের সঙ্গে বাল্‌তির ধাক্কা লেগে লেগে ফাঁপা একটা আওয়াজ হতে লাগল শুধু।

নিঃশব্দে এবং দ্রুত পাক খুলে খুলে দড়িটাকে নিচে নামতে দেখে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। কিন্তু পরিণতির কথা ভেবে নিতে আমার এক মুহূর্তও দেরি হল না। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠোনে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগলাম:

'ও কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে!'

আমি যখন কুয়োর কাছে পেঁছলাম, সেই একই সময়ে মেজো ভাইও চলে এসেছে। দড়িটা আঁকড়ে ধরল সে আর দড়ির টানে শূন্যে উঠে গেল; হাতটা ছড়ে গেল একেবারে। কিন্তু তখন আমি দড়িটাকে ধরলাম, ইতিমধ্যে বড়ো ভাইও উপস্থিত হয়েছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও দড়ি টেনে টেনে বাল্‌তিটাকে ওঠাতে লাগল।

'দয়া করে আরেকটু আস্তে টান, এত জোরে নয়,' বলল সে।

আমরা সকলে মিলে ছোটটিকে উদ্ধার করলাম। মারাত্মক রকমের ভয় পেয়েছে ছেলেটি। ডানহাতের আঙুল থেকে রক্ত পড়ছে, একটা গাল ছড়ে গেছে বিশ্রীভাবে। কোমর পর্যন্ত জলে ভেজা আর মড়ার মতো ফ্যাকাশে চেহারা। কিন্তু ওপরে উঠে এসে চোখদুটো মেলে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে হেসে বলল:

'আমি কেমন প-ড়ে গি-য়ে-ছি-লাম!'

'একেবারে থুনকো!' এই বলে মেজো ভাইটি তাকে জড়িয়ে ধরে মুখ থেকে রক্ত মুছিয়ে দিল।

'বাড়ি যাই চল্। এটা তো আর লুকিয়ে রাখা যাবে না, দেরি করে লাভ কী।' ভুরু কুঁচকিয়ে মন্তব্য করল বড়ো ভাই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়ির লোক শুনে তোমাদের মারবে না?'

ঘাড় নেড়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল, 'কী ভীষণ জোরেই না ছুটে এসেছ!'

এই প্রশংসা শুনে আমি এত অভিভূত হলাম যে তার বাড়িয়ে-ধরা হাতটা ধরবার কথা মনে রইল না। ভালো করে খেয়াল ফিরে আসতে শুনলাম, সে মেজো ভাইকে বলছে, 'চল্ বাড়ি যাই। নইলে ওর ঠাণ্ডা লাগবে। বাড়ি গিয়ে বলব, ও ছুটতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেছে। কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, এসব বলে কোনো লাভ নেই।'

ছোটটি সায় দিল: 'ঠিক কথা। আমরা গিয়ে বলব যে আমি একটা জলভরা গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছি।'

তারপর ওরা তিনজনেই চলে গেল।

সমস্ত ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে ওপরের দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম, যে-ডালটা থেকে আমি লাফিয়ে পড়েছি সেটা তখনো নড়ছে আর হল্‌দে পাতা খসে খসে পড়ছে ডালটা থেকে।

তারপর প্রায় এক সপ্তাহ তিন ভাইকে উঠোনে খেলতে দেখা গেল না। যেদিন প্রথম খেলতে এল, সেদিন তাদের কলরবটা যেন আগের চেয়েও বেশি। বড়ো ভাইটি আমাকে দেখতে পেয়েই বন্ধুভাবে ডাক দিল:

'আমাদের সঙ্গে খেলবে তো চলে এস।'

সকলে গিয়ে স্লেজগাড়িটার ওপরে বসলাম। অনেকক্ষণ ধরে বসে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে নিলাম আমরা।

'সেদিন তোমরা মার খেয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তা খেয়েছিলাম বইকি।' জবাব দিল বড়োজন।

আমার কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না যে এদের মতো ছেলেদেরও আমার মতো মার খেতে হয়। ব্যাপারটা খুবই অন্যায় বলে মনে হতে লাগল আমার।

'আচ্ছা তুমি পাখি ধরো কেন?' জিজ্ঞেস করল ছোটটি।

'পাখি কী চমৎকার গান গায় বল তো! সেজন্যেই ধরি।'

'আর পাখি ধরো না। পাখিরা যদি খুশিমতো উড়ে উড়ে বেড়ায়, তাহলেই তো ভালো।'

'ঠিক আছে। আমি আর কোনো দিন পাখি ধরব না।'

'শুধু আর একটিমাত্র পাখি ধরবে আর সেটা দেবে আমাকে, কেমন?'

'বেশ তো, কোন্ পাখি চাও বলো?'

'যে পাখি খুব ফুর্তিতে থাকে—আমি খাঁচায় রাখব।'

'ঠিক আছে। তোমাকে একটা চেফিঙপাখি ধরে দেব।'

এবার মেজো ভাই কথা বলল, 'বেলালে খেয়ে ফেলবে। আল বাবা থিক্ লাগ কলবেন।'

'ঠিক কথা।' বড়ো ভাই সায় দিল।

'তোমাদের মা নেই?'

'না।' জবাব দিল বড়ো ভাই কিন্তু মেজো ভাই কথাটাকে শুধরিয়ে বলল, 'মা আছে কিন্তু সে অন্য মা, থিক্ মা নয়--থিক্ মা মলে গেছে।'

আমি বললাম, 'তার মানে তোমাদের সৎ-মা।'

বড়ো ভাই সায় জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

তারপর তিনজনেই অন্যমনস্কভাবে চুপ করে রইল।

সৎ-মা যে কী তা দিদিমার কাছে গল্প শুনে শুনে আমি জানি। সুতরাং তাদের এইভাবে চুপ করে থাকার কারণও আমি বুঝতে পারলাম। মটরশুঁটির তিনটি বিচির মতো গায়ে গা লাগিয়ে তিনজনে বসে রইল। আমার মনে পড়ল সেই ডাইনী সৎ-মার গল্প। আসল মায়ের জায়গা নেবার জন্যে সেই ডাইনী সৎ-মা কত রকম ফন্দিফিকিরই না করেছিল। ছেলে তিনজনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি বললাম:

'কিছু ভেব না। তোমাদের আসল মা আবার ফিরে আসবেন।'

বড়োটি কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তা কী করে হবে? মা তো মরে গেছে। যে মরে যায় সে আর কক্ষনো ফিরে আসে না।'

বলে কী ছেলেটা? যে মরে যায় সে আর কক্ষনো ফিরে আসে না? সঞ্জীবনী জল ছিটিয়ে দিলে মড়া তো মড়া এমন কি যাদের কুচি-কুচি করে কেটে ফেলা হয়েছে তারাও বেঁচে ওঠে! আর এমন তো কতবারই দেখা গেছে যে একজন লোক মরে গেছে বলে মনে করা হল--কিন্তু পরে দেখা

গেল, সে সত্যি সত্যিই মরেনি; ভগবান তাকে মারতে চাননি, তাকে মেরেছে ডাইনী ও কুহকিনীরা!

দিদিমার কাছে যেসব গল্প শুনেছি সেগুলি মহা উৎসাহে আমি বলতে শুরু করলাম। কিন্তু বড়োটি ঠাট্টার হাসি হেসে বলল:

'ওসব গল্প আমরাও শুনেছি, ও তো রূপকথার গল্প!'

অন্য দু-ভাই চুপ করে বসে আমার গল্প শুনছিল। ছোটটি ভুরু কুঁচকে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে আছে, মেজোটি একটা কনুই রেখেছে হাঁটুর ওপরে, আরেকটা হাত দিয়ে ছোটটির কাঁধ জড়িয়ে ধরে আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। গোলাপী মেঘ নিচু হয়ে বাড়ির ছাদের ওপরে নেমে এসেছে। এমন সময় সাদা গোঁফওলা বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে পাদ্রিদের মতো বাদামী রঙের ঝুলকোট, মাথায় একটা ঝুলঝুলে লোমের টুপি।

আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ছেলেটা কে?'

বড়োটি উঠে দাঁড়িয়ে আমার দাদামশাইয়ের বাড়ির দিকে মাথা নেড়ে বলল, 'ওই বাড়ির ছেলে।'

'ওকে কে এখানে আসতে বলেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে সেই তিনটে ছেলে স্লেজগাড়িটা থেকে নেমে নিঃশব্দে বাড়ির দিকে চলে গেল। ওদের দিকে তাকিয়ে আমার আরেকবার মনে হল, ছেলেগুলো ঠিক পোষা হাঁসের মতো।

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার ঘাড় শক্তভাবে চেপে ধরে গেটের সামনে নিয়ে এলেন। আতঙ্কে আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে এমন তাড়াতাড়ি হিড়হিড় করে ঠেলে নিয়ে এলেন যে কান্না আসবার আগেই দেখলাম আমি একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমার দিকে আঙুল তুলে শাসিয়ে তিনি বললেন:

'খবরদার বলছি এ-বাড়িতে আর আসবে না!'

আমিও ক্রুদ্ধ স্বরে পাল্টা জবাব দিলাম, 'বুড়ো শয়তান, তোমার মুখ দেখবার জন্যে আমি এ-বাড়িতে আসিনি।'

লম্বা হাত বাড়িয়ে তিনি আবার আমাকে ধরে ফেললেন। আর রাস্তার ধার দিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে যেতে মাথার ওপরে হাতুড়িপেটার মতো একই প্রশ্ন করতে লাগলেন:

'তোমার দাদামশাই বাড়িতে আছেন?'

আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে দাদামশাই বাড়িতে ছিলেন। সেই ভয়ানক বুড়োর সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, মাথাটা পিছনে হেলিয়ে, তাঁর দাড়িটা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভদ্রলোকের গোল ভাঁটার মতো অনুজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন:

'এই ছেলেটার মা এখানে নেই। আমি নিজে সবসময়ে কাজে ব্যস্ত থাকি। কেউ নেই যে ছেলেটার দিকে একটু নজর রাখে। কর্ণেল, আপনি এবারকার মতো অপরাধ মার্জনা করুন।'

কথাটা শুনে সারা বাড়ি কাঁপিয়ে কর্ণেল গলা খাঁকারি দিলেন। তার পরেই কাঠের থামের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন গট্ গট্ করে পা ফেলে। খানিকক্ষণ পরে পিওতর-কাকার গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল আমাকে।

ঘোড়ার লাগামটা খুলতে খুলতে গাড়ি-চালক জিজ্ঞেস করল, 'কী হে ছোকরা, আবারও দেখছি একচোট হয়েছে। তা এবার মার খাওয়া হল কী জন্যে?'

আগাগোড়া ঘটনাটা যখন তাকে বললাম, একেবারে ফুঁসে উঠল সে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল:

'ওদের মতো ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে গিয়েছিলে কেন শুনি? ওরা সব বড়লোকের বাচ্চা। দেখ তো, ওদের জন্যে তোমার কি দুর্ভোগটা হল? যাক্ গিয়ে, এরপর থেকে ছেলেগুলোর ওপরে আচ্ছা করে এর শোধ তুলো।'

এমনি বিড়বিড় করল সে অনেকক্ষণ। সদ্য ঘা-খাওয়া শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে প্রথম দিকে আমার ভালো লাগছিল তার কথাগুলো; কিন্তু কথাগুলো বলতে বলতে তার চুবড়ির মতো মুখটা এমন বিশ্রীভাবে কাঁপছে যে আমার মনে পড়ে যায়, ওই ছেলে তিনজনকেও এজন্য মার খেতে হবে আর ওরা তো আমার কাছে কোনো দোষ করেনি।

আমি বললাম, 'ওরা কোনো দোষ করেনি। ওদের ওপরে শোধ তুলতে যাব কেন? আর তুমি যা বলছ তার একবর্ণও সত্যি নয়।'

আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে একটা হুঙ্কার ছাড়ল:

'বেরিয়ে যা বলছি আমার গাড়ি থেকে।'

একলাফে গাড়ি থেকে নেমে আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'বোকা কোথাকার!'

'কী, আমাকে বোকা বলা? আমাকে মিথ্যেবাদী বলা? আমি তোকে মজা

দেখাব...' এই বলে সে আমার পিছনে উঠোনময় ধাওয়া করে বেড়াল, কিন্তু কিছুতেই আমাকে ধরতে পারল না।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দিদিমা এসে অলিন্দে দাঁড়ালেন। আমি ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। সেও এসে আমার নামে নালিশ করতে শুরু করল:

'এই বাঁদরটার জন্যে আমার একটুও শান্তি নেই। আমাকে যা-তা বলে। আমি ওর চেয়ে পাঁচগুণ বয়সে বড়ো অথচ আমাকে সব চেয়ে নোংরা গালাগালি দিতেও কসুর করে না...'

লোকে যখন আমার মুখের উপর মিথ্যে কথা বলে তখন আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে যাই। এখনও এই কথাগুলো শুনে কী বলব বুঝতে না পেরে আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু আমার দিদিমা দৃঢ়স্বরে বললেন:

'দেখ পিওতর, কথাগুলো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? ও তোমাকে নোংরা গালাগালি দেয়নি।'

দাদামশাই হলে গাড়ি-চালকের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে বসতেন।

সেইদিন থেকে গাড়ি-চালকের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দাঁড়ায় এক নিঃশব্দ ও হিংস্র বৈরিতা। সে তক্কে তক্কে থাকে, সুযোগ পেলেই হাতের লাগাম দিয়ে ধাঁই করে আমাকে এক ঘা লাগিয়ে এমন ভাব করে যেন হঠাৎ লেগে গেছে। খাঁচার মধ্যে আমি যে-সব পাখি ধরে রাখি সেগুলো সে ছেড়ে দেয়। একদিন পাখিগুলোর দিকে বেড়াল লেলিয়ে দিল। আর আমার দাদামশাইয়ের কাছে গিয়ে আমার নামে নানা নালিশ করে। যা নয় তাই বলে আমার নামে সাতখানা করে লাগায়। দেখেশুনে আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায় যে ওই লোকটাও আসলে বুড়োর সাজপোশাক পরা আমারই মতো ছেলেমানুষ। আমিও ছেড়ে কথা বলি না। যে লাপ্তিজোড়া আছে সেটার প্যাঁচ খুলে সুতো আল্‌গা করে এমন অবস্থায় রেখে দিই যে পায়ে দিলেই ছিঁড়তে শুরু করে। একদিন তার টুপির মধ্যে মরিচ ছড়িয়ে রেখেছিলাম। টুপিটা মাথায় দেবার পর পুরো একটি ঘণ্টা সে শুধু হেঁচেছিল। মোট কথা, আমার ক্ষমতায় যতোদূর কুলোয় আমি করে যাই, তার ঢিলের উত্তরে পাটকেল ছুঁড়তে কসুর করি না। রবিবার হলেই সে সারাটি দিন আমার পিছনে গোয়েন্দার মতো লেগে থাকে। সেই বড়োলোকের তিনটি ছেলের সঙ্গে গুপ্ত যোগাযোগ রাখতে গিয়ে বহুবার তার কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। আর যতোবার সে আমাকে ধরতে পেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা জানিয়ে এসেছে আমার দাদামশাইয়ের কাছে।

সেই ছেলে তিনটির সঙ্গে মেলামেশা আমি বন্ধ করিনি। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিন দিনই আমার বেশি ভালো লাগছে। দাদামশাইয়ের বাড়ির আর অভসিয়ান্নিকোভের বাড়ির মাঝখানে যে আঁকাবাঁকা বেড়া আছে সেই বেড়ার একটা কোণ গাছপালায় অন্ধকার হয়ে থাকে। এল্‌ম্‌ ও লাইম গাছ এবং এল্‌ডারবেরির ঘন ঝোপ। এই ঝোপের পিছনদিকে বেড়াটা কেটে আমি একটা ফাঁক করে নিয়েছি। এই ফাঁকের কাছে তিন ভাই এসে আমার সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলে। কখনো আসে একা একা, কখনো জোড়ায় জোড়ায়। কর্ণেল হঠাৎ এসে না পড়ে সেজন্যে একজন সর্বদা পাহারায় থাকে।

ওরা আমাকে ওদের নিজেদের জীবনের কথা বলে। ভারি একঘেয়ে জীবন ওদের, শুনতে শুনতে মন খারাপ হয়ে যায় আমার। নানা বিষয়ে কথা বলি আমরা। পাখির কথা, নানা ছেলেমানুষি ঝোঁকের কথা, কিন্তু ওরা কখনো আমাকে ওদের বাপ বা সৎ-মার কথা বলেনি, অন্ততঃ যতোদূর আমার মনে আছে। অধিকাংশ দিনই ওরা শুধু আমার কাছে গল্প শুনতে চায় এবং আমিও দিদিমার কাছ থেকে শোনা সমস্ত গল্প খুঁটিয়ে বলতে শুরু করি। গল্পের কোনো অংশই বাদ দিই না। যদি গল্পের কোনো অংশ ভুলে যাই তাহলে ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলে ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে আসি। দিদিমা খুশি হয়েই গল্পের ভুলে যাওয়া অংশটুকু আমাকে বলে দেন।

আমার দিদিমার কথা ওদের কাছে প্রায়ই বলি। একদিন বড়োজন আমার কথা শুনতে শুনতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল·

'সব দিদিমাই খুব ভালো হয়। আমাদেরও এক সময়ে ভারি চমৎকার এক দিদিমা ছিল...'

এই ছেলেটির কথা বলার ধরনই এই রকম। 'এক সময়ে ছিল,' 'এতকাল ধরে যেমনটি হয়ে আসছে,' 'কোনো এক সময়ে,' ইত্যাদি ধরনের কথাগুলো সে এত বেশিবার বলে আর বলবার সময়ে তার গলার স্বরটা এত বেশি ভারি হয়ে ওঠে যে মনে হতে পারে, তার বয়স মাত্র এগারো নয়, একশো বছর পার হয়ে গেছে। আমার মনে আছে, ছেলেটির হাততালুদুটো ছিল রোগা, সরু লম্বা হাতের আঙ্গুল। তার শরীরটাও ছিল রোগাটে আর পল্‌কা। চোখদুটি লাজুক, গির্জার উপাসনা-বেদীর বাতির মতো পরিষ্কার। তার দুই ভাইকেও আমার খুব ভাল লাগে। ওদের ওপরে দরদে আমার মনটা ভরে যায় আর ভারি ইচ্ছে করে ওদের জন্যে চমৎকার একটা কিছু করি। কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে বড়োজনকে।

ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি এমন মেতে উঠি যে পিওতর-কাকা এলেও টের পাই না। পিওতর-কাকা আমাদের সকলকে চম্‌কে দিয়ে টানা টানা স্বরে চিৎকার করে ওঠে:

'আ-বা-র!'

আমি দেখছিলাম পিওতর-কাকা আজকাল প্রায়ই বড়ো মনমরা হয়ে পড়ে। কাজ থেকে ফিরবার সময় তার মেজাজটা কি রকম আছে তা জানবার একটা উপায়ও আমি বার করেছিলাম। সাধারণত সে সদরের গেটটা খোলে ধীরেসুস্থে। সুতরাং কব্‌জাটায় অনেকক্ষণ ধরে একটানা কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ হয়। কিন্তু গাড়িওলার মেজাজ যদি ভালো না থাকে তাহলে কব্‌জাটা আচমকা যেন তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে।

তার বোবা ভাইপো গেছে দেশের বাড়িতে বিয়ে করবার জন্যে। একাই আছে পিওতর। আস্তাবলের ওপরে নিচু ছাদওলা তার ঘরটি, একটিমাত্র ছোট জানলা, আর ঘরের মধ্যে আলকাতরা, পুরনো চামড়া, তামাক আর ঘামের গন্ধ। এই গন্ধটার জন্যেই আমি তার ঘরে কিছুতেই যেতে পারি না। আজকাল আবার সে সারারাত বাতি জ্বালিয়ে ঘুমোয়; দাদামশাই ভারি অসন্তুষ্ট হন তাতে।

'ওহে পিওতর, তোমার যা কান্ডকারখানা দেখছি, কোন্‌দিন ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

অন্য কোন দিকে তাকিয়ে সে জবাব দেয়, 'না, সে ভয় নেই। রাত্রিবেলা একপাত্র জলের মধ্যে আমি বাতিটাকে বসিয়ে রাখি।'

আজকাল সে তার চোখদুটো অনবরত অন্য দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে। দিদিমার ভোজসভায় সে আর আসে না বা আমাদের আর ফলের জ্যামও খাওয়ায় না। তার মুখখানা আরো শুকিয়ে গেছে, মুখের রেখাগুলো আরো গভীর হয়েছে আর হাঁটাচলার সময়ে সে রোগীর মতো টল্‌তে থাকে।

একদিন রাত্রিবেলা খুব বেশি বরফ পড়েছিল, সকালবেলা দাদামশাই ও আমি বেল্‌চা দিয়ে সেই বরফ সরাচ্ছিলাম, এমন সময়ে সদরের গেট সশব্দে খুলে গেল আর খোলা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল একজন পুলিসের লোক। পিঠ ঠেস্‌ দিয়ে গেটটা বন্ধ করে সে দাঁড়াল। মোটা ধ্যাব্‌ড়া আঙ্গুলটা নেড়ে ডাকল দাদামশাইকে। দাদামশাই কাছে এগিয়ে গেলে পুলিসের লোকটি নিচু হয়ে নিজের মস্ত নাকটা দাদামশাইয়ের মুখের মধ্যে প্রায় ঢুকিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে কি যেন বলল। শুনে দাদামশাই একেবারে আঁতকে উঠে বললেন, 'এখানে? কখন? আমি যদি তা মনে করতে পারতাম...'

তারপরেই হাস্যকরভাবে এক লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর! এ যে বিশ্বাস করা যায় না!..'

'শ্-শ্-শ্,' পুলিসের লোকটি দাদামশাইকে রূঢ়ভাবে বলল।

দাদামশাই এদিক ওদিক তাকাল। তাঁর চোখ পড়ল আমার দিকে।

'বেল্‌চাদুটোকে নিয়ে বাড়ি চলে যা!'

বাড়ির দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি দু'জনকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। আস্তাবলের ওপরে গাড়ি-চালকের ঘরে গিয়ে ঢুকল দু'জনে। পুলিসের লোকটি ডান হাত থেকে দস্তানাটা খুলে নিয়ে বাঁ হাতের ওপরে দস্তানাটা দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি মারতে লাগল।

'লোকটা ঠিক টের পেয়েছে। ঘোড়া-টোড়া ফেলেই পালিয়ে গেছে এখান থেকে।'

রান্নাঘরে দিদিমার কাছে আমি ছুটে গেলাম। যা দেখেছি এবং শুনেছি, সবই বললাম দিদিমার কাছে। দিদিমা রুটি তৈরি করবার জন্যে আটা মাখছিলেন, সারা মুখে আটা লেগেছিল, সেই অবস্থাতেই মাথা নাড়তে লাগলেন, তারপর আমার বলা শেষ হলে শান্ত স্বরে বললেন তিনি:

'নিশ্চয়ই কোথাও কিছু চুরি-টুরি করে এসেছে। যা, বাইরে গিয়ে খেলা কর গিয়ে। সব ব্যাপারে তোর থাকার দরকার কি?'

আমি আবার ছুটে গিয়ে উঠোনে দাঁড়ালাম। দেখলাম, দাদামশাই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মাথায় টুপি নেই, চোখদুটো আকাশের দিকে তোলা আর বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছেন তিনি। মুখটা রাগে ফুলে ফুলে উঠছে আর একটা পা ঝাঁকি দিয়ে কেঁপে উঠছে।

আমাকে দেখেই মাটিতে পা ঠুকে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফের এসেছিস? বললাম না বাড়ির ভিতরে যেতে?'

আমি আবার রান্নাঘরে এলাম। পিছনে পিছনে দাদামশাইও এলেন।

'গিন্নি, একটু শুনে যাও।' দিদিমাকে বললেন তিনি।

দু'জনে পাশের ঘরে গেলেন। অনেকক্ষণ ফিস্‌ফাস্ কথা হল দু'জনের মধ্যে। ফিরে আসার পর দিদিমার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আমি বুঝতে পারলাম, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমা, কী হয়েছে? তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন?'

নীচুস্বরে দিদিমা বললেন, 'তুই চুপ করে থাক্ তো।'

তারপর সারা দিন বাড়ির আবহাওয়াটা সন্ত্রস্ত ও থম্‌থমে হয়ে রইল। দাদামশাই ও দিদিমা থেকে থেকে চম্‌কে উঠে তাকাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে যা একটু কথাবার্তা হল তা খুবই দুর্বোধ্য আর সংক্ষিপ্ত। এতে আতঙ্কের ভাবটা আরো ঘন হয়ে উঠল।

গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে দাদামশাই দিদিমাকে হুকুম দিলেন, 'গিন্নী, আইকনের সবকটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও।'

আহারপর্ব শেষ হল অতি দ্রুত যদিও কারও খিদে নেই। মনে হতে লাগল, কারও জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে। দাদামশাই বারবার ক্লান্তভাবে গাল ফোলাতে লাগলেন, বারবার গলা পরিষ্কার করলেন আর বিড়বিড় করে বললেন:

'শয়তান একবার ভর করলে তার আর নিস্তার নেই। এই ধরো না এই লোকটির কথা। দেখে তো মনে হয় দয়ালু আর দেবতায় ভক্তি আছে, কক্ষনো কোনো অধর্মের কাজ করে না---কিন্তু দেখো এই লোকটা কী কাণ্ডই না করেছে!'

দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

শীতকালের রূপোলি দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, এই দিনটির যেন আর শেষ নেই। আর যতোই সময় যেতে লাগল, ততোই বাড়ির আবহাওয়াটা হয়ে উঠল আরো বেশি অস্বস্তিকর ও আরো বেশি রুদ্ধশ্বাস।

সন্ধ্যার দিকে এল আরেকজন পুলিসের লোক। এই লোকটির শরীরটা মোটা, মাথাটা লাল। রান্নাঘরের একটা বেঞ্চিতে বসে নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে ঢুলতে লাগল সে।

দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল কি করে?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পুলিসের লোকটি ঘোঁৎঘোঁৎ করে জবাব দিল, 'এতো সহজ কথা। পুলিসের কাছে কোনো কথাই চাপা থাকে না।'

মনে আছে, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পুরনো একটা মুদ্রা মুখের মধ্যে পুরে গরম করতে চেষ্টা করছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তুষারঢাকা জানলার শার্সির ওপরে বিজয়ী সেন্ট জর্জের একটা ছাপ তোলা।

হঠাৎ সদরের দিক থেকে প্রচণ্ড একটা হুটোপাটির শব্দ শোনা গেল। দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। চৌকাঠের ওপরে পেত্রভনা দাঁড়িয়ে। চিৎকার করে বলল সে:

'দেখতে আসুন, আপনাদের বাগানের পিছন দিকে কী কাণ্ড হয়েছে!'

তারপর পুলিসের লোকটির দিকে নজর পড়ল। সে আবার সদরের দিকে ফিরে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু পুলিসের লোকটি তার স্কার্ট ধরে তাকে আট্‌কে ফেলেছে। সন্ত্রস্ত স্বরে সেও সমানে চেঁচিয়ে উঠল:

'দাঁড়াও! তুমি কে? বাইরে কী কান্ড হয়েছে?'

চৌকাঠে হুমড়ি খেয়ে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদতে শুরু করে দিল পেত্রভনা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে আর ঢোঁক গিলতে গিলতে বলল সে:

'আমি দুধ দুইবার জন্যে বাইরে এসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, কাশিরিনদের উঠোনে একজোড়া বুটজুতোর মতো কি একটা জিনিস।'

দাদামশাই ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মিথ্যে কথা বলবার আর জায়গা পাস্‌ না মাগী! আমাদের উঠোনে কি আছে বা না-আছে তা তুই দেখবি কি করে? উঠোনের বেড়া যথেষ্ট উঁচু আর তাতে একটিও ফুটো নেই। ওপার থেকে দেখবি কি করে? সব মিথ্যে কথা! আমাদের বাগানে কোনো কান্ড ঘটেনি!'

একটা হাত দাদামশাইয়ের দিকে বাড়িয়ে আর একহাতে মাথা চেপে ধরে পেত্রভনা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে লাগল:

'শোন বাপু! ও সত্যিই বলছে যে আমি মিথ্যে কথা বলছি। হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম একটা পায়েচলা দাগ বেড়া পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে আর এক জায়গায় বরফ একেবারে পায়ে মাড়ানো হয়ে গেছে। তখন আমি বেড়া বেয়ে ওপরে উঠে উঁকি মেরে দেখলাম। সেই লোকটা ওখানে পড়ে আছে...'

'কে-এ-এ?'

টানা-টানা আর ভয়ার্ত একটা চিৎকার উঠল। তারপরেই রান্নাঘরের সবকটি লোক পাগলের মতো ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে ছুটল উঠোনের দিকে। সেখানে বরফঢাকা গর্তের মধ্যে পিওতর-কাকা পড়ে আছে। একটা পোড়া খুঁটিতে পিঠটা ঠেস্‌ দেওয়া, মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপরে। আর ঠিক ডান কানের নিচেই গভীর একটা হাঁ-করা ক্ষত। মনে হয় লাল একটা মুখ। ধারে ধারে নীল্‌চে অংশটুকু দাঁতের মতো বেরিয়ে আছে। ভয়ে আমি চোখ বুজেছিলাম। চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, পিওতর-কাকার ঘোড়ার লাগামের ছুরিটা তার কোলের ওপরে পড়ে আছে; পাশেই ডানহাতটা, ডানহাতের আঙুলগুলো কাল্‌চে হয়ে বেঁকে গেছে। বাঁ হাতটা বরফের মধ্যে গোঁজা। পাতলা শরীরটার চাপে খানিকটা বরফ গলে গেছে, পেঁজা তুলোর মতো সাদা বরফের মধ্যে বসে গেছে শরীরটা। এতে আরো

বেশি ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছে তাকে। ডানদিকে বরফের ওপরে লালরঙের ছোপ পড়েছে; বিশেষ একটা আকার নিয়েছে লালরঙের ছোপটুকু, পাখির মতো মনে হয়। বাঁ দিকে কোনো দাগ পড়েনি, মসৃণ বরফ ঝক্ঝক্ করছে। মাথাটা অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে নেমে এসে ঠেকে গেছে বুকের সঙ্গে, কোঁকড়ানো দাড়ি ঠেলে উঠেছে ওপরের দিকে। দাড়ির ঠিক নিচেই ঝুলছে মস্ত একটা পেতলের ক্রুশ। রক্তের ধারা শুকিয়ে জমাট বেঁধে ক্রুশটাকে ফ্রেমের মতো ঘিরে রয়েছে। চারদিকে এলোমেলো কলরব, আমার মাথাটা ঘুরছে। তারস্বরে একটানা চিৎকার করে চলেছে পেত্রভনা, পুলিসের লোকটা চিৎকার করে ভালেইকে সেখান থেকে চলে যেতে বলছে; আমার দাদামশাই চিৎকার করছেন, 'খবরদার, পায়ের দাগগুলো যেন নষ্ট না হয়!'

হঠাৎ তিনি ভুরু কুঁচকিয়ে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিলেন।

'মিথ্যে আপনি অত চেঁচামেচি করছেন,' উঁচু গলায় কর্তৃত্বের সুরে তিনি পুলিসের লোককে বললেন, 'এ হচ্ছে ঈশ্বরের লীলা, ঈশ্বরের বিচার। আপনারা যতোই হম্বিতম্বি করুন না কেন -- এখানে সবই নিষ্ফল!'

আর তখনই সব চুপ করে গেল। মৃতের দিকে তাকিয়ে সবাই বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে।

পেত্রভনার বাড়ির দিক থেকে বেড়া ডিঙিয়ে অনেকে এসেছে এপারে। ছুট্তে ছুট্তে এসেছে উঠোনের ওপর দিয়ে। পড়ে গেছে বারবার, বিড়বিড় করেছে আপন মনে—কিন্তু কোনো রকম হৈচৈ না করে। অবশেষে আমার দাদামশাই চারদিকে তাকিয়ে হতাশার সুরে চীৎকার করে উঠলেন, 'পড়শীরা, কী করছ তোমরা! তোমাদের পায়ের চাপে আমার ফলের গাছগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের কি চক্ষুলজ্জা বলেও কিছু নেই?'

আমার হাত ধরে দিদিমা বাড়ির ভিতরে চলে এলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কী করেছিল দিদিমা?'

কান্না চেপে তিনি জবাব দিলেন, 'তা তো দেখলিই এতক্ষণ ধরে।'

সেদিন সারাটা সন্ধ্যে এবং তারপরেও অনেক রাত পর্যন্ত অজানা অচেনা সব লোক যাতায়াত আর হৈচৈ করতে লাগল আমাদের বাড়ির রান্নাঘরে ও তার পাশের ঘরে। হুকুমের স্বরে চলল পুলিসের হাঁকডাক। পাদরির মতো দেখতে একটা লোক খাতায় কী সব লিখতে লিখতে হাঁসের মতো প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে অনবরত শুধু বলতে লাগল:

'কী করে? কী করে?'

প্রত্যেককে চা দিলেন দিদিমা। চায়ের টেবিলে বসেছিল একজন গোলগাল চেহারার লোক। গোঁফওলা মুখটিতে বসন্তের দাগ। তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় সে বলল:

'ওর আসল নাম কেউ জানে না। শুধু এটুকু জানা গেছে, ওর দেশ এলাথমা। আর ওই যে বোবা-কালা লোকটি ছিল, সে আসলে বোবাও নয়, কালাও নয়। সে সবকিছুই স্বীকার করেছে। আরো একজন তাদের সঙ্গে ছিল। সেও স্বীকার করেছে সব কথা। বহুদিন থেকেই এই দলটি একটা কাজে হাত পাকিয়েছিল — তা হচ্ছে গির্জার সম্পত্তি লুট করা...'

পেত্রভনা দরদর করে ঘামছিল, দীর্ঘনিঃশ্বেস ফেলে সে বলে উঠল, 'কী কাণ্ড মাগো!'

তাকের ওপরে শুয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি দেখছিলাম লোকগুলোকে। মনে হতে লাগল, তারা যেন একদল বেঁটে, মোটা আর কুৎসিত চেহারার লোক...

দশ

এক শনিবার খুব ভোরে বুলফিঞ্চ পাখী ধরবার জন্যে আমি গেলাম পেত্রভনার বাগানে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও একটি পাখিও আমার ফাঁদে ধরা দিল না। বুকে লাল রঙের ছিটে দেওয়া পাখিগুলো: আর কী দেমাক তাদের। রুপোলী বরফের ওপরে ভারিক্কী চালে বেড়িয়ে চলে। কিংবা উড়ে যায় ঝোপের মধ্যে, সেখানে তুষারঢাকা গাছের ডালে চিক্‌চিকে নীল্‌চে বরফের গুঁড়োর মধ্যে উজ্জ্বল একটা ফুলের মতো দুলতে থাকে আপন মনে। দৃশ্যটা এত সুন্দর যে পাখি ফাঁদে না পড়ার হতাশা আমার মনে আসতে পারে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে আমি যে একজন খুব একাগ্র শিকারী তাও নয়। কোনো ঘটনার ফলাফলটা যাই হোক্ না কেন, তার রূপায়ণের প্রক্রিয়াই আমার মনে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে পাখিদের জীবনযাত্রা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে আর তাদের নিয়ে চিন্তা করতে।

শীতের দিনের ঘনীভূত নিস্তব্ধতায় বরফঢাকা মাঠের ধারে একা-একা বসে পাখির কিচির-মিচির শোনা — এর চেয়ে আনন্দ আর কী আছে! অনেক

দ্ূর দিয়ে চলে যায় একটা ত্রয়কা, টিং টিং করে বাজে তার ঘণ্টা — ঠিক যেন রুশদেশের শীতকালের বিষণ্ণ লার্কপাখী।

তারপর ঠাণ্ডায় আমার হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরে গেল, আর যখন অনুভব করলাম আমার কানগুলো জমে আসছে, তখন ফাঁদ আর খাঁচা তুলে নিয়ে বেড়া টপকে আমি চলে এলাম বাড়ির দিকে। আমাদের বাড়ির গেটটা খোলা আর প্রকাণ্ড চেহারার একজন চাষী তিন-ঘোড়ার এক মস্ত ঢাকা স্লেজগাড়িকে গেট দিয়ে রাস্তায় বার করে নিচ্ছে। কুণ্ডলি পাকিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে ঘোড়াগুলোর গা থেকে, মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে লোকটি। আমার হৃৎপিণ্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন থমকে পড়ল।

'এই গাড়িতে কে এসেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার দিকে ফিরে হাতের তলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল লোকটি, তারপর লাফিয়ে চালকের আসনে উঠে বলল:

'পাদ্রিমশাই এসেছেন!'

পাদ্রিমশাই এসেছেন কি আসেননি — তা নিয়ে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল না। তিনি যদি এসে থাকেন তবে খুব সম্ভব তিনি কোনো ভাড়াটের বাড়িতে এসেছেন।

'হট্! হট্! চল্ রে আমার মাণিকরা!' ঘোড়াগুলোর গায়ে চাবুকের বাড়ি মেরে লোকটি চিৎকার করে উঠল। একলাফে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াগুলো, টিং টিং শব্দ উঠল বাতাসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটা চলে যেতে দেখলাম, তারপর গেটটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকতেই শুনতে পেলাম পাশের ঘর থেকে আমার মা'র গভীর গলার স্বর ভেসে আসছে।

'বেশ তো, তোমরা কী করতে চাও তাহলে? আমার মাথা কাটবে—না কি?'

হাতের খাঁচা আর ফাঁদ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি ছুটলাম পাশের ঘরের দিকে। গায়ের কোট খুলবারও তর সইল না। কিন্তু হঠাৎ দাদামশাই আমাকে আটকালেন। তিনি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, ঢোঁক গিলে একটা যন্ত্রণা চাপতে চেষ্টা করলেন যেন, তারপর মুখ দিয়ে জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে বললেন:

'আচ্ছা যাও!'

দরজার কাছে এসে আমি অন্ধের মতো হাতড়াতে লাগলাম। উত্তেজনা ও

ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে আমার আঙ্গুলগুলো কাঁপছিল, কিছুতেই দরজায় তালা লাগানর আংটাটা খুঁজতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে আমি চৌকাঠের ওপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

মা বলল, 'এই তো, এসেছিস এতক্ষণে! আরে বাব্বাঃ, কত বড়ো হয়ে গিয়েছিস! কী রে, চিনতে পারছিস না আমাকে? আচ্ছা তোমাদের কী কাণ্ড বলো তো! জামাকাপড়ের কী অবস্থা! আরে, কানদুটো যে দেখছি ঠাণ্ডায় জমে গেছে! মা, শীগগির যাও তো, আমাকে একটু হাঁসের চর্বি এনে দাও!'

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে আর ঠিক একটা বলের মতো আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মা আমার গা থেকে জামাকাপড় খুলে ফেলতে লাগল। দীর্ঘ উন্নত গড়ন আমার মা'র; তুলতুলে আর নরম লালরঙের একটা পোশাক রয়েছে গায়ে, পুরুষের জামার মতো চওড়া; বড়ো বড়ো কালো বোতাম কাঁধ থেকে একেবারে নিচে পর্যন্ত কোণাকুণি নেমে এসেছে। এ-ধরনের পোশাক আমি আগে আর কোনো দিন দেখিনি।

মা'র মুখটা যেন আরো ছোট হয়ে গেছে, আরো ফ্যাকাশে, চোখগুলো হয়েছে আরো বড়ো বড়ো, আরো গভীর, চুলগুলো আরো সোনালী। লাল ঠোঁটদুটো বিরক্তির সঙ্গে বেঁকিয়ে, আমার গা থেকে খুলে নেওয়া জামাকাপড়গুলো চৌকাঠে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে, মা ধমকের সুরে বলে উঠল:

'কি রে, কথা বলছিস্‌নে কেন? আমাকে দেখে খুশি হস্‌নি? ইস্‌, কী ময়লা জামা বাবা!'

তারপর আমার কানে হাঁসের চর্বি ঘষতে লাগল মা। ভারি ব্যথা লাগছিল, কিন্তু মা'র গা থেকে স্নিগ্ধ আর চমৎকার একটা গন্ধ নাকে আসতেই সমস্ত ব্যথা আমি ভুলে গেলাম। মা'র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি, উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিলাম না। মা'র কথার ফাঁকে ফাঁকে কানে আসছিল দিদিমার কথা। অনুচ্চ বিষণ্ণ স্বরে দিদিমা বলে চলেছেন:

'ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গেছে, এমন কি দাদামশাইকে পর্যন্ত ওর ভয়ডর নেই। ভারিয়া রে, ভারিয়া...'

'মা, তুমি আর ঘ্যানঘ্যান কোরো না বাপু। সব ঠিক হয়ে যাবে!'

মা'র সঙ্গে এই পরিবেশটা খাপ খাচ্ছে না। মা এসে দাঁড়াতেই চারদিকের সবকিছু মনে হচ্ছে পুরনো করুণ আর ময়লা। এমন কি আমি নিজেও যেন দাদামশাইয়ের মতো বুড়ো হয়ে গেছি।

দুই হাঁটুর মধ্যে আমাকে শক্তভাবে চেপে ধরে ভারি ভারি উষ্ণ হাত দিয়ে আমার চুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে আমার মা বলল:

'তোর চুলগুলো কাটতে হবে দেখছি। আর এবার তোকে স্কুলে ভর্তি করে দেব। আর দেরি করা উচিত নয়। কি রে, লেখাপড়া শিখবি তো?'

'লেখাপড়া তো আমি শিখেছি।'

'আরো কিছু শিখতে হবে। ইস্, কী গাঁট্টাগোঁট্টা হয়েছিস রে তুই!' আমাকে আদর করতে করতে খুশিভরা প্রাণোচ্ছল হাসি হাসল মা।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন দাদামশাই। মুখখানা থম্‌থমে আর রেখাকুটিল, চোখদুটো রক্তবর্ণ। দাদামশাইকে ঢুকতে দেখে একটা ঠেলা দিয়ে আমাকে সরিয়ে মা উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে বাবা, আমি কী করব? চলে যাব এখান থেকে?'

দাদামশাই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে নখ দিয়ে বরফ আঁচড়াতে লাগলেন। একটি কথাও বললেন না। আবহাওয়াটা উৎকণ্ঠায় টান হয়ে রইল। আমার মনে হতে লাগল, আমার দুই চোখ আর দুই কান বাড়তে বাড়তে সারা অবয়ব জুড়ে বসেছে। চিৎকার করার আবেগে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে বুকটা।

'লেক্সেই, তুই যা তো বাইরে।' নিস্তেজ গলায় বললেন দাদামশাই।

'কেন? ও কেন বাইরে যাবে?' আমাকে আবার নিজের দিকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল মা।

'খবরদার বল্‌ছি তুই বাইরে যাবি না!'

মা উঠে দাঁড়াল, তারপর সূর্যাস্তের লাল মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে ঘরের অপর প্রান্তে গিয়ে দাদামশাইয়ের পিছনে দাঁড়াল।

'বাবা, আমার কথাটা শোন...'

'চুপ!' তার দিকে ফিরে চেরা গলায় দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন।

'আমার সঙ্গে অমন ধমক দিয়ে কথা বলা চলবে না বলে রাখছি!' নীচু স্বরে বলল মা।

'ভারভারা!' ডিভান ছেড়ে দাঁড়িয়ে শাসানির ভঙ্গিতে আঙুল নাড়তে নাড়তে দিদিমা বলে উঠলেন।

দাদামশাই একটা চেয়ারে বসে পড়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন আপন মনে:

'কী হল ব্যাপারটা, এ্যাঁ? দাঁড়াও, ভাবতে দাও আমাকে... আমি একটু ভেবে নিই... কোথা দিয়ে কি যে হচ্ছে...'

তারপরেই আহত পশুর মতো হঠাৎ প্রচন্ড একটা হুংকার ছাড়লেন:

'আমাদের সকলের মুখে কালি দিয়েছিস তুই ভারভারা!'

'তুই যা তো এখান থেকে।' দিদিমা আমাকে বললেন। মনের মধ্যে একটা বিষণ্ণ ভার নিয়ে রান্নাঘরে চলে এলাম আমি। উঠে বসলাম চুল্লির ওপরে; সেখান থেকে পাশের ঘরের কথাবার্তা শোনা যায়। শোনা গেল, একেকবার সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠছে, আবার একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার মতো সবাই হঠাৎ চুপ করে যাচ্ছে। যতোদূর বোঝা গেল, আমার মা'র একটি বাচ্চা হয়েছে এবং বাচ্চাটিকে মা অন্য একজনের কাছে দিয়ে এসেছে--এই নিয়েই কথাবার্তা। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না, দাদামশাইয়ের মত না নিয়েই মা'র বাচ্চা হয়েছে সেজন্যে দাদামশাইয়ের রাগ, না দাদামশাইয়ের কাছে বাচ্চাটিকে মা নিয়ে আসেনি সেজন্যে দাদামশাইয়ের রাগ।

তারপর একসময়ে দাদামশাই এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে। মুখচোখ লাল হয়ে রয়েছে, এলোমেলো চেহারা, ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছেন। দাদামশাইয়ের পিছনে পিছনে এলেন দিদিমা, ব্লাউজের কোণ দিয়ে চোখের জলে ভেসে যাওয়া গাল মুছছেন। একটা বেঞ্চির ওপরে ধপ্ করে বসে পড়ে দু-হাত দিয়ে বেঞ্চির ধারটা আঁকড়ে ধরে রইলেন দাদামশাই; মুখখানা কুঁকড়ে রয়েছে, ছাইরঙের ঠোঁটটা কামড়াচ্ছেন। দাদামশাইয়ের পায়ের কাছে জানু মুড়ে বসে পড়লেন দিদিমা।

'এবারকার মতো তুমি ওকে ক্ষমা করো! যীশু খ্রীস্টের দোহাই, একবারটি মুখ তুলে চাও! এর চেয়ে অনেক বেশি শক্ত আর মজবুত নৌকোও তো ভরাডুবি হচ্ছে! বড়োমানুষদের ঘরে কিংবা বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের বাড়িতে এসব ঘটনা কি ঘটে না? আকছার ঘটে। একবার তাকিয়ে দেখো কী সুন্দর মেয়ে সে! এবারকার মতো তোমার মেয়েকে ক্ষমা করো... দোষ কার নেই?..'

শরীরটা এলিয়ে দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন দাদামশাই, দিদিমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন:

'তা তো বটেই... ঠিক কথাই বলেছ... সত্যিই তো! তোমার আর কি,

তুমি তো হাত বাড়িয়েই বসে আছ, তোমার কাছে সবারই সব দোষ মাপ হয়ে যায়... হুঃ, কী সব মানুষ!'

তারপর দিদিমার দিকে ঝুঁকে দিদিমার কাঁধটা আঁকড়ে ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন।

'শুধু মানুষ তো নয়, ঈশ্বরও আছেন,' চাপা স্বরে বলতে লাগলেন তিনি, 'ঈশ্বরের ক্ষমা পাবার কি হবে? তিনি এত সহজে সবকিছু ক্ষমা করেন না। এই দেখ না, আমরা তো কবরের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, আর তো এই শেষ কয়েকটা দিন — কিন্তু এখনো শাস্তির ভোগ চলছে। শান্তি নেই, আনন্দ নেই, আশা-ভরসা করবার মতো কেউ নেই। ভিখিরির মতো মরতে হবে আমাদের — দেখে নিও, আমার এই কথা মিথ্যে হবে না — ভিখিরির মতো মরতে হবে আমাদের!'

দাদামশাইয়ের হাত নিজের হাতে নিয়ে তার পাশটিতে বসলেন দিদিমা, সান্ত্বনার হাসি হেসে বললেন:

'তাতে আর কী হয়েছে? ভিখিরি হওয়া যদি কপালে থাকে তো ভিখিরিই হব। ভয়ের কী আছে? তোমার কিচ্ছুটি করতে হবে না, চুপটি করে বাড়িতে বসে থেকো — আমিই ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দোরে দোরে ঘুরব। সবাই ভিক্ষে দেবে আমাকে — না খেয়ে থাকতে হবে না আমাদের। আমি যতোদিন আছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এসব কথা ভেবে মাথা গরম কোরো না!'

দাদামশাইয়ের মুখে হঠাৎ বেঁকা এক হাসি ফুটল। হঠাৎ ছাগলের মতো মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরে জোরে চেপে ধরলেন দিদিমাকে। দিদিমার হাতের মধ্যে ছোট এতটুকু দেখাতে লাগল তাঁকে। এলোমেলো উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি বলতে লাগলেন:

'তুমি সেই বোকাই রয়ে গেলে গো! নেহাতই বোকা! আবার তুমিই আমার একমাত্র ভরসা! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই! কিন্তু তোমার তো আর কোনো দিন বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না। যেটুকু আছে তা খুইয়ে বসতেও তোমার আপত্তি নেই! একবার ভাব তো, এই ছেলেমেয়েদের জন্যে কত কীই না করেছি আমরা! কত পাপ পর্যন্ত করেছি আমি! আর এই শেষ বয়সে কিছুই রইলো না, এতোটুকু টুকরোও না...'

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমার দু-গাল বেয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল, চুল্লি থেকে লাফিয়ে নেমে আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম আমি — কাঁদতে লাগলাম

এই আনন্দে যে আমার মা এসেছে, আমার দাদামশাই ও দিদিমা এমন অভাবিতপূর্ব মাধুর্য ও কোমলতায় একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদের দুঃখের ভাগ দিয়েছেন আমাকে, কারণ দুজনেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আদর করতে লাগলেন, চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেন।

'এই যে বিচ্ছু, শয়তান, তুইও আছিস এখানে!' আমার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে লাগলেন আমার দাদামশাই, 'এখন আর কী, তোর মা এসে গেছে, এখন কি আর আমার কাছে কোনো দরকারে আসবি? তোর এই বুড়ো শয়তান দাদামশাইকে কি আর মনে থাকবে? কী রে, ঠিক বলিনি? আর দেখিস, ওই করুণাময়ী দিদিমার কথাও ভুলে যাবি! এই দিদিমা কেবল জানে আদর দিয়ে তোর পরকাল ঝরঝরে করতে। হুঁঃ, কী সব মানুষ!'

আমাদের দু'জনকেই ঠেলে সরিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন:

'সবাই আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে -- সবাই এখান থেকে চলে যেতে চায়... হাঁ করে দেখছ কি, ডেকে আন না মেয়েটাকে... তাড়াতাড়ি যাও!'

দিদিমা রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেলেন আর দাদামশাই মাথা নিচু করে কোণের দিকে গিয়ে বলেন:

'পরম করুণাময় হে ঈশ্বর, দেখতে পাচ্ছ কি, আমার কী অবস্থা হয়েছে?'

তারপর নিজের বুকের উপর সশব্দে এক ঘা বসালেন। এ-ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি। শুধু এখনকার কথা নয়, দাদামশাই সাধারণত যে-ভাবে ঈশ্বরের কাছে কথা বলেন তা আমার মোটেই ভালো লাগে না। ভারি একটা দম্ভের ভাব থাকে তাঁর মধ্যে।

আমার মা ঘরে ঢুকল; তার লাল পোশাকের খুশিভরা ঝলক উঠল ঘরের মধ্যে। টেবিলের পাশে বেঞ্চটাতে একপাশে দাদামশাই ও একপাশে দিদিমাকে নিয়ে বসল মা, জামার আস্তিন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল দু-জনের কাঁধ। খুব নরম সুরে আর প্রত্যেকটি কথার ওপরে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে কথা বলল মা, দাদামশাই ও দিদিমা নির্বাক হয়ে মা'র কথা শুনলেন। মা'র পাশে দু'জনকেই এত ছোট দেখাচ্ছে যে মনে হতে লাগল আমার মা-ই হচ্ছে দাদামশাই ও দিদিমার মা আর ওঁরা দুজন তার ছেলেমেয়ে।

উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে আমি তাকের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় দাদামশাই ও দিদিমা তাঁদের সেরা পোশাক পরে

গির্জার সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিলেন। সর্দার কারিগরের পোশাকে আর রেকুনের লোমের তৈরি কোট গায়ে দিয়ে দাদামশাইয়ের চেহারার শোভা বেড়ে গিয়েছিল। একগাল হাসি নিয়ে দাদামশাইয়ের দিকে চোখ টিপে আর মা-র গায়ে কনুইয়ের একটা গুঁতো দিয়ে দিদিমা বললেন:

'দেখ্ রে, তাকিয়ে দেখ্, তোর বাবা কেমন পরিপাটি ছাগলটি সেজে বসে আছে।'

মা হো হো করে হেসে উঠল।

তারপর যখন ঘরের মধ্যে মা ও আমি ছাড়া আর কেউ রইলাম না তখন মা পা দুটো মুড়ে ডিভানের ওপরে বসে পাশের জায়গাটা হাত দিয়ে দেখিয়ে বসতে বলল আমাকে।

'আয় বোস্ এখানে। তারপর, কেমন আছিস বললি না তো? ভালো নয়, না?'

'কেমন আছি আমি? সে-কথা আমি জানি না।'

'তোর দাদামশাই কি তোকে মারে?'

'না, আজকাল আর তেমন নয়।'

'সত্যি? আচ্ছা, যা তোর মনে আসে আমাকে বলে যা।'

দাদামশাইয়ের কথা বলবার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি বলতে শুরু করলাম আমাদের সেই বাসিন্দাটির কথা। বললাম, কী চমৎকার লোক ছিল সে, আমরা এখন যে-ঘরে বসে আছি সেই ঘরেই থাকত; কেউ তাকে পছন্দ করত না, শেষ পর্যন্ত দাদামশাই তাকে উঠিয়ে দেন। মা'কে দেখে মনে হল, এই লোকটির গল্প মা'র ভালো লাগেনি। মা বলল:

'আচ্ছা, এবার অন্য কিছু বল্ শুনি।'

তখন আমি তাকে সেই তিনটি ছোট ছেলের কথা বললাম; আর বললাম, কর্ণেল আমাকে কী-ভাবে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল।

শুনে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মা বলল, 'চামার, একেবারে চামার!'

তারপরেই আবার চুপ করে গেল মা। চোখদুটো কুঁচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মা, দাদামশাই তোমার ওপর এত রেগে গেছেন কেন?'

'আমারই দোষ।'

'তুমি যদি বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে তাহলে আর এমন হত না...'

আমার কথা শুনে মা চমকে উঠল। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই হো হো করে হেসে উঠে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিল আবার।

'তবে রে পাজি ছেলে! এসব কথা কক্ষণো বল্‌বিনে, বুঝেছিস্‌? একটি কথাও নয় — মুখটি বুজে থাকবি! এমন কি এসব চিন্তাও যেন আর কখনো মাথায় না আসে!'

শান্ত ও কঠোর স্বরে আরো অনেক কথা বলে গেল মা। সেগুলোর একবর্ণও আমি বুঝতে পারলাম না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চিবুকে আঙ্গুলের টোকা দিতে দিতে আর পুরু ভুরুদুটো নাচাতে নাচাতে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

টেবিলের ওপরে একটা মোমবাতি জ্বলছে। গলে গলে পড়ছে মোম। একটা আয়না থেকে ঠিকরে আসছে মোমবাতির আলো। লম্বা লম্বা বিশ্রী ছায়া পড়েছে মেঝের ওপরে। কোণের আইকনের সামনে জ্বলছে একটা প্রদীপ। চাঁদের আলোয় রুপোলী হয়ে উঠেছে তুষার ঢাকা জানলাগুলো। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মা, যেন শূন্য দেওয়াল ও সিলিং-এর মধ্যে কী একটা খুঁজছে।

'তুই শুতে যাবি কখন?'

'আরেকটু পরে!'

'তাই তো, আমার মনেই ছিল না বিকেলবেলা খানিকক্ষণ তুই ঘুমিয়েছিস।' নিজেকে মনে করিয়ে দেবার মতো করে মা বলল।

'তুমি কি এখান থেকে চলে যাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কোথায় যাব,' অবাক হয়ে মা জবাব দিল। তারপর এগিয়ে এসে আমার মুখটা তুলে ধরে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সেই স্থিরদৃষ্টির সামনে আমি কিছুতেই চোখের জল চেপে রাখতে পারলাম না।

'কাঁদছিস কেন?'

'আমার ঘাড়ে ব্যথা লাগছে।'

কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি ব্যথা লাগছে আমার বুকের মধ্যে। আমি বুঝতে পারলাম, মা'র পক্ষে এ-বাড়িতে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়; একদিন না একদিন তাকে যেতেই হবে...

মেঝের ওপর পাতা কার্পেটটা পা দিয়ে নাড়তে নাড়তে মা বলল, 'বড়ো

হলে তুই ঠিক তোর বাবার মতোই দেখতে হবি। তোর দিদিমা নিশ্চয়ই তোর কাছে তোর বাবার গল্প করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোর দিদিমা মাক্সিমকে খুব ভালোবাসত। তেমনি সেও খুব ভালোবাসত তোর দিদিমাকে...'

'আমি জানি।'

মোমবাতিটার দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মা সেটাকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল।

'এই ভালো হয়েছে।' বলল মা।

মোমবাতির আলোটুকু না থাকাতে ঘরের ভিতরটা যেন আরো স্নিগ্ধ ও আরো পরিষ্কার দেখাতে লাগল। মেঝের ওপরে সেই লম্বা লম্বা বিশ্রী ছায়াগুলো আর নেই, তার বদলে নীল চাঁদের আলোয় ঘরটা ভরে গেছে। জানলার শার্সিগুলোতে চিক্‌চিক্‌ করছে একটা রুপোলী আভা।

'আচ্ছা মা, এখানে আসবার আগে তুমি কোথায় ছিলে?'

একাধিক শহরের নাম করল আমার মা। যেন বহুদিন আগের ভুলে যাওয়া কোনো ঘটনার কথা মনে করছে এমনিভাবে বলল শহরগুলির নাম। আর সর্বক্ষণ ঘরের মধ্যে বাজপাখির মতো পাক খেতে লাগল।

'এই পোশাকটা তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'এটা আমি নিজে তৈরি করেছি। আমার নিজের সবকিছু আমি নিজেই করি।'

মা যে অন্য সকলের মতো নয়, সবার থেকে এত বেশি আলাদা, এতে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু মা এত কম কথা বলছে দেখে আমার কষ্ট হতে লাগল। আমি যদি প্রশ্ন না করি তাহলে মা একটিও কথা বলে না।

তারপর মা আবার এসে ডিভানে আমার পাশটিতে বসল। দু'জনে দু'জনকে জোরে আঁকড়ে ধরে নিঃশব্দে আমরা বসে রইলাম। একসময়ে দাদামশাই ও দিদিমা সারা গা থেকে মোম আর ধূপের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে গম্ভীর সমাহিত মুখে বাড়ি ফিরে এলেন।

সাড়ম্বরে রাত্রের আহারপর্ব শেষ হল থমথমে আবহাওয়ায়। আমরা কথা বললাম খুবই কম, যেটুকু বললাম তা এত সতর্কভাবে যেন কারও খুব পাতলা ঘুম ভেঙে যাবার আশঙ্কা আছে।

একটুও সময় নষ্ট না করে আমাকে 'পার্থিব' শিক্ষায় শিক্ষিত করে

তোলার কাজে মা উঠেপড়ে লাগল। 'মাতৃভাষায় প্রথম পাঠ' নামে একটা বই কিনে দিল আমাকে। কিছুদিনের মধ্যেই পার্থিব ভাষার বর্ণমালা শিখে ফেললাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মা আমাকে কবিতা মুখস্থ করাতে চাইল। আর তা করতে গিয়েই আমাদের দু'জনের পক্ষে একটা মর্মান্তিক অবস্থার সূত্রপাত হয়।

আমাকে প্রথম যে কবিতাটি মুখস্থ করতে হয়েছিল তা হচ্ছে এই:

পথখানি আঁকাবাঁকা নিঃসীম শূন্যে মিলায়,
ঘরবাড়ি খামারের পাশ দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়,
কোদাল কিম্বা গাঁইতি এ পথ তো করেনি সৃজন,
হাজারো পায়ের ছাপ এ পথেরে করে রূপায়ণ।

কবিতাটি আবৃত্তি করবার সময়ে আমার সব সময়েই কতগুলো ভুল হত। আঁকাবাঁকা না বলে বলতাম ছাঁকাছাঁকা, কোদালকে বলতাম কোটাল, পায়ের-কে বলতাম ভায়ের।

মা আমাকে শুদ্ধ করে দিত, 'আচ্ছা, তুই একবার ভেবে দ্যাখ্ তো, রাজপথ কখনো ছাঁকাছাঁকা হয়? রাজপথকে ছাঁকাছাঁকা বললে লোকে বোক বলবে যে! ছাঁকাছাঁকা নয়! বল্ আঁকাবাঁকা, ভুলিসনে যেন।'

কথাটা আমিও বুঝতাম। কিন্তু তবুও আবৃত্তি করবার সময়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসত 'ছাঁকাছাঁকা', আর ভয়ে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হত।

শেষকালে রেগে গিয়ে মা একদিন বলে বসল যে আমার মাথায় কিচ্ছু নেই আর আমি ভীষণ একগুঁয়ে। নিজের নামে এই অপবাদ শুনে ভয়ানক লাগল আমার মনে এবং আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম যাতে এই গোলমেলে লাইনগুলোকে ঠিকঠিক মনে রাখতে পারি। মনে মনে যখন আবৃত্তি করি তখন আমার একটিও ভুল হয় না, কিন্তু চেঁচিয়ে বলতে গেলেই অবধারিতভাবে শব্দগুলো গুলিয়ে ফেলি। শেষকালে এই কুহকী লাইনগুলো আমার দু-চোখের বিষ হয়ে উঠল। তারপর থেকে আমি ইচ্ছে করে শব্দের সঙ্গে শব্দের মিল দিয়ে দিয়ে লাইনগুলোকে বিকৃত করতে লাগলাম। আর লাইনগুলো যতোই কিম্ভূতকিমাকার অর্থহীন হয়ে উঠতে লাগল ততোই আনন্দ হতে লাগল আমার।

কিন্তু এই আনন্দ আমার কাছে শেল হয়ে উঠেছিল। একদিন মা'র কাছে পড়া দিচ্ছিলাম, কোথাও একটিও ভুল করিনি, এমন সময়ে মা আমাকে

কবিতাটা আবৃত্তি করতে বলল। তখন নিজের আপ্রাণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মুখ থেকে যে কবিতাটা বেরিয়ে এল তা হচ্ছে এই:

রাজপথ, গাছপথ, রথ নথ ঘর্ঘর
শাবল ধর্, মাদল ধর্, বাদল বাকল মর্মর...

ব্যাপারটা যে কী ঘটছে তা আমি বুঝতে পারলাম খুবই দেরিতে। টেবিলের ওপর দু-হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল মা, তারপর প্রত্যেকটি কথার ওপর জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'এটা তুমি কোত্থেকে শিখেছ?'

আমার তো এদিকে হৃৎকম্প শুরু হয়েছে, বললাম, 'জানি না।'

'তবুও বলো আমাকে!'

'এই এমনি বললাম।'

'কী এমনি বললে?'

'এই একটু মজা করবার জন্যে।'

'যাও, কোণে গিয়ে দাঁড়াও।'

'কী জন্যে?'

'কোণে যাও বলছি!' মা প্রচন্ড একটা ধমক দিল।

'কোন্ কোণে?'

এবার আর মা কোনো জবাব দিল না। কিন্তু এমন একটা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যে আমার আর জ্ঞানবুদ্ধি বলতে কিছু রইল না। আমি কি করতে চলেছি বা মা আমাকে কি করতে বলছে, এসব চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল একেবারে। আইকনের নীচের কোণে রয়েছে একটা গোল টেবিল; টেবিলের ওপরে ফুলদানিতে মিষ্টিগন্ধওলা কতকগুলো শুক্‌নো ফুল আর ঘাস। আরেকটা কোণে রয়েছে একটা গালিচাঢাকা ট্রাঙ্ক। তৃতীয় কোণে বিছানা আর চতুর্থ কোণে দরজা।

'মা, তুমি আমাকে কি করতে বলছ তা আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না।' ব্যাপারটা বুঝতে পারার জন্যে মরিয়া হয়ে আমি বললাম।

মা একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে নিঃশব্দে কপাল আর গাল ঘষতে লাগল।

'তোমার দাদামশাই কি কোনো দিন তোমাকে কোণে দাঁড় করিয়ে রাখেনি?'

'কবে?'

'যবেই হোক্, দাঁড় করিয়েছে কিনা?' টেবিলের ওপরে দু-বার ঘুষি মেরে অধৈর্যের সঙ্গে মা চেঁচিয়ে উঠল।

'কই, আমার তো মনে পড়ছে না।'

'কোণে দাঁড়িয়ে থাকা যে একটা শাস্তি তাও তুমি জান না?'

'না। কেন, এটা শাস্তি কেন?'

'পোড়া কপাল আমার!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলল, 'আচ্ছা, এদিকে আয় দেখি।'

মা'র কাছে এসে আমি বললাম, 'তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ কেন মা?'

'একটা কবিতা ঠিক করে বলতে পারিস না? কেন তুই ইচ্ছে করে বারবার গুলিয়ে ফেলিস!'

আমি মাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম যে চোখ বুজে মনে মনে বললে আমি কবিতাটি যেমন লেখা আছে বলতে পারি কিন্তু চেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করলেই অন্য নানারকম শব্দ এসে পড়ে।

'ঠিক বলছিস তো? বানিয়ে বলছিস না?'

আমি বললাম বানিয়ে বলছি না। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা চিন্তা এল: ঠিক কথা বললাম তো? তারপর হঠাৎ আরেকবার একটু সময় নিয়ে চেষ্টা করতেই কবিতাটি আমার মুখ থেকে নির্ভুলভাবে বেরিয়ে এল। শুনে আমি নিজেই অবাক ও অভিভূত হলাম।

নিজেই বুঝতে পারলাম, আমার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, কানদুটো জ্বলছে। মা'র সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জায় আমি মরে যেতে লাগলাম। চোখের জলে ঝাপ্সা দৃষ্টি দিয়েই দেখতে পেলাম, আমার মা'র মুখটা হতাশায় কালো হয়ে গেছে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তাকিয়ে আছে ভুরু নামিয়ে।

'এবার কি হল?' অদ্ভুত স্বরে মা জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, তুমি সত্যি সত্যিই বানিয়ে বলছিলে!'

'কী জানি। আমি অনিচ্ছায়...'

মাথা নিচু করে মা বলল, 'তোর সঙ্গে পেরে ওঠা যার-তার কর্ম নয়! আচ্ছা, যা তুই।'

তারপর দিনের পর দিন মা আমাকে আরো অনেক কবিতা মুখস্থ করাল। কিন্তু কবিতাগুলোকে কিছুতেই মনের মধ্যে গেঁথে নিতে পারি না।

কবিতার লাইনগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে এবং নতুন নতুন শব্দ বানিয়ে লাইনগুলোকে বিকৃত করে তোলার বদ ইচ্ছেটা ভয়ানকভাবে আমাকে পেয়ে বসে। এজন্যে আমাকে একটুও ভাবনাচিন্তা করতে হয় না, বিদ্‌কুটে শব্দগুলো আপনা থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আমার মন জুড়ে বসে। এই শব্দগুলো এসে কবিতার আসল শব্দগুলোকে হটিয়ে দেয়। প্রায়ই এমন হয় যে কবিতার গোটা একেকটা লাইন মন থেকে মুছে যায় একেবারে, হাজার চেষ্টা করেও তা আর মনে করতে পারি না। মনে আছে, একবার একটি কবিতা — প্রিন্স ভিয়াজেম্‌স্কির লেখা — আমার শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল। কবিতাটি হচ্ছে এই:

পাখী-ডাকা ভোর থেকে, রাতের গভীরে,
বুড়ো-বুড়ি, বিধবা আর অনাথার দল
এক মুঠি অন্ন লাগি ফেলে অশ্রুজল।

এই কবিতার তৃতীয় লাইনটি আমার কিছুতেই মনে থাকে না, আবৃত্তি করবার সময়ে সব সময়েই বাদ দিয়ে যাই। লাইনটি হচ্ছে এই:

হাত পেতে ভিখ্‌ মাগে অসহায় সবে

শেষ পর্যন্ত মা আমার ওপরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে দাদামশাইয়ের কাছে গিয়ে আমার এই এলোমেলো স্মৃতিশক্তির কথা বলল।

দাদামশাই বললেন, 'ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে, এই আর কি! ওর স্মৃতিশক্তিতে কোনো গোলমাল নেই। প্রার্থনাগুলো আমার যতোটা না মনে থাকে তার চেয়েও ওর অনেক বেশি মনে থাকে। ওর স্মৃতিশক্তিটা হচ্ছে ঠিক একটা পাথরের মতো — একবার কোনো একটা জিনিস দাগ কাটলে চিরকাল থেকে যায়। ওকে একবার উত্তম-মধ্যম দেওয়া দরকার।'

দিদিমাও এই মতের সঙ্গে সায় দিলেন।

'রূপকথার গল্প আর গান তো ও কখনো ভোলে না। আর গান ও কবিতা তো একই জিনিস।'

এসবই সত্যি কথা। আমি অনুভব করলাম যে আমারই দোষ। কিন্তু যেই আবার কবিতা মুখস্থ করতে যাই অমনি নানা নতুন শব্দ আরশোলার মতো গুটিগুটি এসে ভিড় করে সারি দিয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের সদরে রাত্রি আর দিন
খোঁড়া কানা ভিখিরি অতি দীনহীন।
ভিখ্ মাগে বারবার বোবা কান্না কাঁদে
ভিখ্ নিয়ে চলে যায় পেত্রভ্নার ফাঁদে।
পেত্রভনার গোয়ালেতে বহু গোরুগাই
পয়সা দিয়ে নগদ দামে কিনে নেয় সে তাই।
তারপর চলে মদ, চলে হুটোপুটি —
মদের নেশায় তারা করে লুটোপুটি।

রাত্রিবেলা দিদিমার পাশটিতে শুয়ে শুয়ে আমি তাঁর কাছে আমার বইয়ের পড়া আর আমার বানানো কবিতাগুলো বলে যাই। মাঝে মাঝে তিনি হেসে ওঠেন কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তিনি আমাকে তিরস্কার করে বলেন:

'এই দ্যাখ্, ইচ্ছে করলে তুই কী না পারিস! কিন্তু এভাবে ভিখিরিদের নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করে কবিতা বানানোটা ঠিক নয়। যীশু খ্রীষ্টও ভিখিরি ছিলেন। সাধুমহাত্মারা সকলেই তাই।'

আমি নিজের মনে কবিতা আবৃত্তি করে জবাব দিই:

ভিখিরিকে আমি
দু-চোখে দেখতে পারি না
তেমনি পারি না দু-চোখে দেখতে
দাদামশাইকে।
তাই ভগবানের কাছে বলি
আমার আর ক্ষমতা কী
বলে দাও আমাকে
কী করলে পরে
আমার ভাগ্যকে আর দাদামশাইয়ের বেতকে
দেখাতে পারি অপক্ক কদলী।

দিদিমা বলে ওঠেন, 'তোর জিভ খসে পড়বে যে পাজি ছেলে! তোর দাদামশাই শুনলে আর আস্ত রাখবে না।'

'শুনুক গে!'

তারপর একসময়ে হয়তো আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে দিদিমা বলেন, 'হ্যাঁ রে, তোর মা'কে তুই এত জ্বালাতন করিস কেন রে? এমনিতেই

তোর মা'র জ্বলুনি-পুড়ুনির শেষ নেই—তার ওপরে তোকে নিয়ে যদি এতটা ভুগতে হয় তাহলে কি করে বাঁচবে বল্ তো!'

'কেন, জ্বলুনি-পুড়ুনি কেন?'

'চুপ কর্ হতভাগা ছোঁড়া! সব ব্যাপার নিয়ে তোর মাথা না ঘামালেও চলবে!'

'আমি জানি দাদামশাইয়ের জন্যেই...'

'ফের কথা বল্‌ছিস!'

ভারি বিশ্রী লাগতে লাগল আমার। এত বিশ্রী যে প্রায় একটা হতাশা এসে পড়ে। তবু জানি না কেন, আমার এই মনোভাব মা'র চোখ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই। তখন আমি আরো দুর্বিনীত ও আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠি। আমার মা'র আমাকে লেখাপড়া শেখানোর বহরটা যেমন বেড়ে যায় তেমনি লেখাপড়া ব্যাপারটাও আরো শক্ত হয়ে ওঠে। অঙ্কটা নিয়ে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয় না, কিন্তু হাতের লেখা শেখাটা আমার পক্ষে একটা অসহ্য ব্যাপার, আর ব্যাকরণ আমি বুঝতে পারি না। আমি টের পাই, আমার দাদামশাইয়ের এই বাড়িতে মা'র জীবনটা একেবারেই সুখের নয় এবং এই চিন্তাটা অন্য সবকিছুকে চাপা দিয়ে আমার মনের ওপর একটা ভার হয়ে চেপে বসে থাকে। যতো দিন যায় মা ততোই মনমরা হয়ে ওঠে। সবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, বাগানের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানলায় বসে থাকে, আর দিন-দিন কেমন যেন শুকিয়ে যায়। এখানে আসার পরে কিছুদিন পর্যন্ত আমার মা ছিল প্রাণের আনন্দে ভরপুর আর সদাচঞ্চল। কিন্তু এখন তার চোখের চারদিকে কালো দাগ পড়েছে, চেহারার দিকে আর আগেকার মতো নজর নেই, চুল না আঁচড়ে একটা বোতামছেঁড়া দুমড়ানো মুচ্‌ড়ানো ব্লাউজ পরে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। মা'কে এমন বিশ্রী চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে ভারি খারাপ লাগে আমার। মা থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে, মা হবে এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ।

আমাকে পড়াতে বসে মা অন্যমনস্ক হয়ে দেওয়ালের দিকে বা জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন করে ক্লান্ত স্বরে আর আমি যে জবাব দিই তা শুনতে ভুলে যায়। আর মা'র মেজাজটা ভারি তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে, কারণে অকারণে আমাকে ধমক দেয়। এটাও আমাকে আঘাত দিত: মা হবে অন্যদের চেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণা, রূপকথার গল্পের মায়েদের মতো।

মাঝে মাঝে আমি মাকে বলতাম:

'মা, তোমার কি আমাদের সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে না?'

'নিজের চরকায় তেল দে।' ধমকের সুরে মা বলত।

আমি আরও টের পেলাম, দাদামশাই এমন একটা কিছু করতে চলেছেন যা আমার দিদিমাকে ও মা'কে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। প্রায়ই দেখি, দাদামশাই মা'র ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেন আর তারপর শোনা যায় রাখাল-ছেলে নিকানোরের বিরক্তিকর কাঠের বাঁশিটার কিচকিচানির মতো দাদামশাইয়ের ফোঁসানি। একদিন তো আমার মা এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে বাড়ির সব জায়গা থেকে শোনা গেল সেই কথাগুলো:

'না, কক্ষণো না, না, না, না!'

তারপরেই ঠাস্ করে কপাটের আওয়াজ ও দাদামশাইয়ের হুঙ্কার।

ঘটনাটা ঘটেছিল সন্ধ্যেবেলা। দিদিমা রান্নাঘরে বসে দাদামশাইয়ের জন্যে একটা শার্ট সেলাই করছিলেন। সেলাই করতে করতে আপন মনে বিড়বিড় করে বলছিলেন কি যেন। ঠাস্ করে কপাটের শব্দ হতেই দিদিমা কান পেতে শুনলেন, আর তারপর বললেন:

'হা ভগবান! মেয়েটা ভাড়াটেদের ঘরে গেল!'

হঠাৎ দাদামশাই রান্নাঘরে ছুটে এসে দিদিমার মাথায় ঘা কতক লাগিয়ে দিলেন। তারপর নিজের ব্যথা-পাওয়া হাতটায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন দাঁতে দাঁত চেপে:

'বুড়ী ডাইনী! তোর পেটে কথা থাকে না কেন?'

মাথার টুপি ঠিক করতে করতে শান্ত স্বরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'জেনে রাখ, তুমিও একটি আস্ত বোকা! ভাব কি আমাকে? তোমার ভয়ে মুখ বুজে থাকব? এই তোমাকে বলে রাখছি, তোমার মতলব যেটুকু আমি টের পাব তা ওর কাছে গোপন রাখব না...'

একথা শুনে দাদামশাই দিদিমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দিদিমার মাথায় সমানে ঘুষি মারতে লাগলেন। দিদিমা বাধা দিলেন না, শুধু বলতে লাগলেন:

'মারো, মারো, বোকা বুড়ো যতো খুশি মারো।'

আমি বসেছিলাম তাকের ওপরে। সেখান থেকে দাদামশাইকে লক্ষ্য করে বালিশ, কম্বল আর জুতো ছুঁড়তে লাগলাম। কিন্তু দাদামশাই রাগে আমার দিকে দৃকপাত করলেন না। দিদিমা পড়ে গেলেন মেঝের ওপরে আর দিদিমার মাথায় সমানে লাথি মারতে লাগলেন দাদামশাই। শেষকালে টাল্ সামলাতে

না পেরে জলের একটা পাত্র উল্‌টে দিয়ে নিজেই পড়ে গেলেন চিৎপটাং হয়ে; লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বুনো দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে মুখ থেকে থুতু ছিটিয়ে ফুঁসতে লাগলেন। তারপরেই রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে গেলেন ওপরে নিজের ঘরে। যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে উঠে বেঞ্চটার ওপরে বসলেন দিদিমা; মাথার চুলের জট্ ছাড়াতে লাগলেন। তাক থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এলাম আমি।

রাগের সঙ্গে দিদিমা বললেন, 'নে খুব হয়েছে! এবার এই বালিশ আর অন্য সব জিনিস তুলে ঠিক জায়গায় রেখে দে। বালিশ ছুঁড়ে ছুঁড়ে খুব বীরত্ব দেখানো হয়েছে! আচ্ছা তুই কেন সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসিস? আর এই বুড়ো শয়তানটাও হয়েছে তেমনি। যখন তখন মাথা গরম করে বসে!'

হঠাৎ দিদিমার মুখ থেকে ছোট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। ভুরু কুঁচকে আমাকে কাছে ডেকে তিনি বললেন, 'দ্যাখ্ তো, এ-জায়গাটা ব্যথা করছে কেন?'

দিদিমার মাথার ভারি চুলের গোছা সরাতেই আমার চোখে পড়ল, একটা চুলের কাঁটা দিদিমার মাথার চামড়ায় ঢুকে গেছে। কাঁটাটাকে আমি টেনে তুললাম। তখন চোখে পড়ল, আরেকটি কাঁটাও তেমনিভাবে ঢুকে আছে। আমার হাতের আঙ্গুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেল।

বললাম, 'আমি বরং মা'কে ডেকে আনি। আমার ভয় করছে।'

হাতটাকে ঝাঁকিয়ে দিদিমা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'কী বললি—"মা'কে ডেকে আনি।" ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এটা সে দেখতে বা শুনতে পায়নি! আর তুই কিনা তাকে ডেকে আনতে চাইছিস! যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে!'

লেস্ বোনার দক্ষ আঙ্গুল দিয়ে মাথার সেই রাশি রাশি কালো চুলের গোছার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে দিদিমা খুঁজতে লাগলেন আর কোথায় কোথায় চুলের কাঁটা মাথার চামড়ার মধ্যে বসে গেছে। আমার সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে হাত চালিয়ে আমি আরো দুটো চুলের কাঁটা টেনে তুললাম।

'ব্যথা লাগে?'

'এমন কিছু নয়। দেখিস না, কাল আচ্ছা করে গরম জলে স্নান করব আর সমস্ত ব্যথা চলে যাবে!' তারপর আদরের সুরে তিনি আমাকে বলতে

লাগলেন, 'সোনা আমার, মাণিক আমার, তোর মা'কে গিয়ে আবার বলিসনে যেন যে দাদামশাই আমাকে মেরেছে। এমনিতেই দু'জনে দু'জনের ওপরে রেগে আছে—বুঝলি না? বলবি না তো, কেমন?'

'না, বলব না।'

'বাঃ, এই তো চাই! ভুলে যাসনে যেন! আচ্ছা এবার এদিকটা একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া যাক্। দ্যাখ্ তো, আমার মুখে কোনো চিহ্ন আছে কিনা? নেই? খুব ভালো। বাস্, আর কোনো গোলমাল নেই। একেবারে ডেজি ফুলের মতো নিষ্কলঙ্ক।'

বলেই তিনি মেঝে মুছতে শুরু করলেন। গভীর আবেগের সঙ্গে আমি বললাম:

'দিদিমা তুমি ঠিক ঋষির মতো। তোমাকে মারে, তোমার ওপর অত্যাচার করে—কিন্তু তুমি নির্বিকার, কক্ষণো শোধ তুলতে চেষ্টা করো না!'

'দূর! দূর! বাজে বকিসনে! আমি হলাম গিয়ে ঋষি! আচ্ছা লোককে ঋষি বানিয়েছিস যা হোক্!'

বিড়বিড় করে বকতে বকতে দিদিমা উবু হয়ে ঘর মুছতে লাগলেন। আর দরজার কাছে সিঁড়িতে বসে আমি জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম, যে করে হোক্ দাদামশাইয়ের কৃতকর্মের শোধ তুলতে হবে।

আমার সামনেই দিদিমাকে এভাবে মারপিট করা দাদামশাইয়ের এই প্রথম। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেও আমি যেন দেখতে পেলাম, তাঁর লাল মুখটা চোখের সামনে ভেসে আছে আর তাঁর মাথার লাল চুলগুলো উড়ছে। প্রচণ্ড রাগে আমার বুকের ভিতরটা জ্বলছিল আর কি করলে যে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হয় সেটা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

দু-দিন পরে ওপরের তলায় দাদামশাইয়ের ঘরে ঢুকে দেখলাম, একটা খোলা সিন্দুকের সামনে মেঝের ওপরে বসে দাদামশাই কতকগুলো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। পাশেই একটা চেয়ারে পড়ে আছে তাঁর অতি প্রিয় সাধু-মহাত্মাদের চিত্রসম্বলিত পাঁজিটা। পুরু মোটা ছাইরঙা কাগজ, বারো মাসের জন্যে বারোটি। প্রত্যেকটি কাগজে মাসের দিনগুলোর জন্যে চৌকো চৌকো ঘর কাটা; আর এই ঘরগুলোতে সাধু-মহাত্মাদের ছবি। এই পাঁজিটাকে দাদামশাই মূল্যবান সম্পত্তি বলে মনে করেন। ক্বচিৎ কখনো যদি আমার ওপরে বিশেষ রকমের খুশি হবার কোনো কারণ ঘটে একমাত্র তাহলেই তিনি আমাকে এই পাঁজিটা দেখতে দেন। পাঁজির সেই ছোট ছোট বুড়োটে

ছবিগুলো দেখে আমার ভারি ভালো লাগে আর তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত একটা আবেগ আসে আমার মনে। এই সাধু-মহাত্মাদের কয়েকজনের জীবনীও আমি জানি; যেমন, কিরিক ও উলিতা, শহীদ ভারভারা, পানতেলেইমোন্ এবং আরো অনেকে। বিশেষ করে ঈশ্বরানুগত আলেক্সেইয়ের করুণ জীবনী আমাকে বিচলিত করে; আমার দিদিমা তাঁর সম্পর্কে চমৎকার চমৎকার সব ছড়া বলেন আর তা শুনে গভীর আবেগে আমি অভিভূত হই। পাঁজির কয়েকশো সাধু-মহাত্মার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গভীর একটা সান্ত্বনা আসে মনের মধ্যে; এই উপলব্ধি হয় যে পৃথিবীতে কোনো কালেই শহীদের অভাব হয়নি।

কিন্তু সেদিন আমি স্থির করলাম যে এই পাঁজিটাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলব। ঈগলপাখির শীলমোহর দেওয়া একটা নীল কাগজ ভালো করে পড়বার জন্যে দাদামশাই জানলার কাছে উঠে যেতেই আমি এক থাবায় পাঁজির কতকগুলো পাতা মুঠো করে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে চলে এলাম। তারপর দিদিমার টেবিল থেকে কাঁচিটা তুলে নিয়ে সটান চলে এলাম চুল্লির ওপরে এবং সাধু-মহাত্মাদের মাথাগুলো কাটতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু একটি সারির সবকটি মাথা কাটবার পরেই ছবিগুলোকে দেখে আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। তখন মাথা না কেটে আমি শুধু দাগ বরাবর কাঁচি চালিয়ে যেতে লাগলাম অর্থাৎ কাগজগুলোকে কাটলাম চৌকো চৌকো ঘরের দাগ বরাবর। কিন্তু প্রথম সারি শেষ করে দ্বিতীয় সারিতে কাঁচি চালাবার আগেই আমার দাদামশাইয়ের মূর্তি ভেসে উঠল দরজার সামনে।

'কার হুকুমে এই পাঁজিটা নিয়ে এসেছ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

হঠাৎ তাকের ওপরে ছড়ানো চৌকো চৌকো কাগজের টুক্‌রোগুলোর দিকে নজর পড়ল তাঁর। হাতের মুঠিতে কাগজগুলোকে তুলে নিলেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন টুক্‌রোগুলোর দিকে; একমুঠি শেষ হলে, আরেক মুঠি। আর তারপর যখন বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কী ঘটেছে তখন তাঁর মুখটা হাঁ হয়ে গেল, দাড়ি কাঁপতে লাগল, এত জোরে নিশ্বাস ফেললেন যে উড়তে লাগল কাগজের টুক্‌রোগুলো।

'এ কী করেছিস তুই?' শেষ পর্যন্ত তাঁর গলা দিয়ে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। কথাটা বলেই তিনি আমার পা ধরে এক হ্যাঁচ্‌কা টান মারলেন। শূন্যে ডিগ্‌বাজি খেয়ে আমি পড়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু দিদিমা ধরে ফেললেন আমাকে।

'তোকে আমি খুন করব!' চেরা গলায় চিৎকার করতে করতে আমার ও দিদিমার দু'জনের মাথাতেই সমানে ঘুষি চালাতে লাগলেন দাদামশাই।

হঠাৎ আমার মা এসে হাজির হল। দেখলাম, আমি একটা কোণে দাঁড়িয়ে আছি আর মা রয়েছে ঠিক আমার সামনেটিতে।

দাদামশাইয়ের ঘুষিগুলোকে হাত দিয়ে ঠেকিয়ে মা চেঁচিয়ে উঠল, 'এসব কী পাগলামি হচ্ছে! মাথাটা একটু ঠান্ডা করো!'

জানলার পাশে বেঞ্চটিতে ধপ্ করে বসে পড়ে দাদামশাই কান্নার সুরে বলে উঠলেন, 'আমার সর্বনাশ হয়েছে! সবাই আমার শত্রু! বাড়িশুদ্ধ সবাই!'

মা'র চাপা গলার স্বর শোনা গেল, 'এমন হৈচৈ কান্ড বাধিয়ে তুলতে তোমার লজ্জা করে না!'

দাদামশাই একটা হুঙ্কার ছেড়ে লাথি ছুঁড়লেন। চোখদুটো শক্তভাবে বোজা, আর মুখের দাড়ি অতি অদ্ভুত ভঙ্গিতে সিলিং-এর দিকে উঁচিয়ে আছে। আমার মনে হতে লাগল, মা'র সামনে এমন একটা হৈচৈ কান্ড বাধিয়ে তোলবার জন্যে দাদামশাই বোধ হয় সত্যিই লজ্জিত আর সেজন্যেই চোখ বুজে আছেন।

পাঁজির কাগজগুলোকে হাত দিয়ে সমান করতে করতে মা বলল, 'এই টুকরোগুলো ক্যালিকোর ওপরে আঠা দিয়ে সেঁটে দেব'খন। তখন দেখো, পাঁজিটা আরো অনেক সুন্দর দেখাবে, আরো অনেক মজবুত হবে। এই দেখ না, কাগজগুলো তো এমনিতেই পুরানো হয়ে খসে খসে পড়ছে।'

পড়তে বসে আমি যদি কোনো একটা জিনিস না বুঝতে পারি তাহলে মা যেমনভাবে আমাকে সেটা বুঝিয়ে দেয় ঠিক তেমনিভাবেই এখন কথা বলছে মা। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন দাদামশাই, বেশ ভারিক্কী চালে জামা ও কোট সমান করে নিয়ে গলাটা কেশে পরিষ্কার করে বললেন:

'আচ্ছা বেশ, কিন্তু কাগজগুলো যেন আজকের মধ্যেই সাঁটা হয়। পাঁজির বাকি কাগজগুলো আমি এনে দিচ্ছি।'

দরজা দিয়ে বাইরে যেতে যেতে হঠাৎ চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'তবু ছেলেটাকে একবার আচ্ছা করে পিট্‌টি দেওয়া দরকার!' বলে বিকৃত আঙ্গুল তুলে ধরলেন আমার দিকে।

'হ্যাঁ, তাই দরকার।' সায় দিল মা তারপর আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, তোর কি কান্ডজ্ঞান নেই?'

'আমি ইচ্ছে করেই একাজ করেছি। আর দাদামশাই যদি আবার কোনো

দিন দিদিমাকে মারে তাহলে আমি দাদামশাইয়ের দাড়ি কেটে ফেলব!'

দিদিমা গা থেকে ছেঁড়া ব্লাউজটা খুলে ফেলবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমার কথা শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে থু থু করে মনের বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'এই তোর কারও কাছে না বলা! এই তোর কথা রাখা! তোর জিভ ফুলে ঢোল হয়ে উঠুক, ওই জিভ নেড়ে কাউকে যেন আর কোনো দিন কোনো কথা না বলতে হয়!'

দিদিমার দিকে একবার তাকিয়ে মা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কবে মেরেছে রে?'

'হ্যাঁ রে ভারভারা, তুইও কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিস? ওকে জিজ্ঞেস করছিস এসব কথা? এতসব জেনে তোর কী দরকার বাপু!' ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন দিদিমা।

আবেগের সঙ্গে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মা বলে উঠল, 'মা আমার, মা-মণি আমার!'

'থাক্, থাক্, খুব হয়েছে! মা-মণি না আরো কিছু! ছাড়্, আমি যাই...'

দু'জনে দু'জনের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর দূরে সরে বসল। ওদিকে বাইরের ঘর থেকে দাদামশাইয়ের পায়চারির শব্দ ভেসে আসছে।

এখানে আসার প্রথম কয়েক দিন থেকেই ফৌজী লোকটির হাসি-খুশি বৌয়ের সঙ্গে মা'র খুব ভাব। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় মা এই বৌটির ঘরে যায়। বেৎলেংদের বাড়ির লোকেরাও সেখানে আসে — সুন্দর সুন্দর চেহারার তরুণী আর জোয়ান চেহারার অফিসার। আমার দাদামশাই এ-ব্যাপারটা খুব পছন্দ করেন না। প্রায়ই রাত্রিবেলা খেতে বসে হাতের চামচটা সেই বিশেষ ঘরের দিকে উঁচিয়ে নাড়তে নাড়তে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন:

'আবার সেই খাওয়াদাওয়া আর ফুর্তি শুরু হয়েছে, বাস, আজ রাত্রে ঘুমের দফা শেষ। চুলোয় যাক।'

কিছুদিন না যেতেই তিনি সমস্ত ভাড়াটেকে উঠে যেতে বললেন। ভাড়াটেরা চলে যেতেই দু-গাড়ি বোঝাই আজেবাজে আসবাব নিয়ে এলেন কোত্থেকে যেন। শূন্য কামরাগুলোতে আসবাব বোঝাই করে বড় তালা লাগিয়ে দিলেন দরজায়।

'দরকার নেই আমার এমন ভাড়াটে দিয়ে। এবার থেকে আমি নিজেই লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করব।'

তারপর থেকে প্রতি রবিবার এই নিমন্ত্রিতজনের আবির্ভাব হতে লাগল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন হচ্ছেন দিদিমার বোন মাত্রিওনা ইভানোভনা। এই হৈ-চৈ-করা ধোবানীর নাকটি প্রকাণ্ড, ডোরাকাটা সিল্কের পোশাক পরেন, সোনালী রঙের টুপি জড়ান মাথায়। তাঁর সঙ্গে আসে তাঁর দুই ছেলে। একজনের নাম ভাসিলি, নক্‌শা আঁকার কাজ করে, পরনে ছাইরঙা পোশাক আর লম্বা চুল — হাসিখুশি খোশমেজাজী ধরনের মানুষ। অপরজন ভিক্টর, ঘোড়ার মতো মাথা, বসন্তের দাগওলা লম্বাটে মুখ। সদরে ঢুকে যখন সে পায়ের জুতো থেকে রবারের ওভারশু খোলে তখনই শোনা যায় ক্লাউনের মতো পিন্‌পিনে গলায় সে একটা সুর ভাজছে:

'আন্দ্রেই-বাবা, আন্দ্রেই-বাবা...'

শুনে আমি অবাক ও আতঙ্কিত হই।

ইয়াকভ-মামা তার গীটার নিয়ে আসে। আর একজনও আসে তার সঙ্গে। ঘড়ি মেরামতের ব্যবসা লোকটির, টাক-মাথা, একচোখ কাণা। ভারি চুপচাপ লোকটি, পরনে লম্বা কালো কোটটার জন্যে তাকে মনে হয় যেন মঠের সন্ন্যাসী। ঘরের এক কোণে তার বাঁধা জায়গা; পরিষ্কার ভাবে কামানো চেরা চিবুকের ভর একটা আঙ্গুলের ওপর দিয়ে মাথাটা একদিকে কাত করে হাসিমুখে বসে থাকে সে। তার রংটা কালো, একচোখের তীব্র ও ধারালো দৃষ্টিতে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কথাবার্তা বলে খুবই কম আর একটি কথাই অনবরত তার মুখে শোনা যায়:

'সব ঠিক হয়ে যাবে — ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই...'

প্রথম দিন তাকে দেখে হঠাৎ আমার অনেক দিন আগেকার (তখনো আমরা নোভায়া স্ট্রীট থেকে উঠে আসিনি) একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একদিন শুনলাম রাস্তার দিকে ড্রাম বাজছে। সেই বাজনার মধ্যে যেন একটা অশুভ বার্তা প্রচ্ছন্ন ছিল। বাইরে এসে দেখলাম, প্রকাণ্ড একটা কালো গাড়ি ঘিরে একদল সৈন্য ও লোকজনের ভীড় চলেছে। কয়েদীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জেলখানা থেকে ময়দানে। গাড়ির ভিতরে বেঞ্চির ওপরে গোল টুপি মাথায় একটি লোক বসেছিল। দু-হাত ও পায়ে শেকলে বাঁধা, আর শরীরের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে সেই শেকল ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠছে। কালো একটা বোর্ড ঝুলছে তার গলা থেকে, বোর্ডটার ওপরে গোটা গোটা সাদা অক্ষরে কী যেন লেখা। লোকটির মাথা বুকের ওপরে এমনভাবে ঝুলে পড়েছে যেন সে পড়বার চেষ্টা করছে এই লেখাগুলো। ঘড়িওলাটির সঙ্গে আমার পরিচয়

করিয়ে দিয়ে মা যখন বলল, 'আমার ছেলে,' তখন শুনে পিঠের দিকে হাত ঢেকে ভয়ে আমি দু-পা পিছিয়ে এলাম।

একটা আতঙ্কজনক ভঙ্গিতে মুখের হাঁ-টা ডান কান পর্যন্ত প্রসারিত করে লোকটি বলল, 'ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।' তারপর আমার কোমরের বেল্ট ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে দক্ষ জহুরীর মতো পাকা হাতে আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

'নাঃ ঠিক আছে! ডাঁটো ছেলে!' তারিফের সুরে এই মন্তব্য করে ছেড়ে দিল আমাকে।

আমি গিয়ে বসলাম একটা চামড়ার আর্মচেয়ারে। চেয়ারটা এত প্রকাণ্ড যে তার মধ্যে অনায়াসে ঘুমিয়ে থাকা যায়। দাদামশাই সব সময়েই জাঁক করে বলেন যে এটা নাকি প্রিন্স গ্রুজিন্‌স্কির চেয়ার। কোণের সেই চেয়ারটাতে বসে বসে আমি দেখতে লাগলাম, একটুখানি ফুর্তি করবার জন্যে বড়োদের কী পরিমাণ চেষ্টাই না করতে হয়, আর সেই ঘড়িওলার অদ্ভুত ও সন্দিগ্ধ মুখের ভাব মুহূর্তে মুহূর্তে কি ভাবে বদ্‌লে যাচ্ছে। মুখটা তার তেলতেলে; থলথলে একটা জিনিস যেন গলে গলে পড়ছে। যখন সে হাসে তার পুরু ঠোঁটদুটো ডানদিকে সরে যায় আর ঝোলের মধ্যে মাংসের টুক্‌রোর মতো ছোট নাকটা টলটল করতে থাকে। কুলোর মতো প্রকাণ্ড কানদুটোও অদ্ভুতভাবে নড়ে। কখনো ওপরে ওঠে একচক্ষু ভুরুটা উঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, কখনো পিছনে চলে আসে চোয়ালের হাড়ের দিকে। আমার মনে হতে লাগল, ইচ্ছে হলে ঠিক দুটো হাতের মতো এই কানদুটোকেও সে নাকের ওপর দিয়ে ভাঁজ করে রাখতে পারে। মাঝে মাঝে মুষলের মতো গোল গাঢ়রঙের জিভটা বার করে চক্রাকারে ঘুরিয়ে নিয়ে তেলতেলে পুরু ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে নেয়। দেখেশুনে আমার যতোটা না মজা লাগতে লাগল তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম। এবং কিছুতেই লোকটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলাম না।

অতিথিরা রম্‌-সহযোগে চা খেল। পোড়া পেঁয়াজের মতো গন্ধ বেরোচ্ছিল পানীয়টা থেকে। দিদিমা বাড়িতে যে-সব মদ তৈরি করেছেন তাও খেল অতিথিরা। তার কোনোটা সোনালী, কোনোটা সবুজ, আবার কোনোটা আলকাতরার মতো কালো। আহার্যের মধ্যে ছিল রসানো 'ভারেনেৎস্‌', মধু আর পোস্তদানা দিয়ে তৈরি কেক্‌। অতিথিরা ফুলতে লাগল, ঘামতে লাগল আর আমার দিদিমার সুখ্যাতি করে চলল। তারপর এক পেট খেয়ে, মুখ

লাল করে প্রফুল্ল হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ইয়াকভ-মামাকে গান গেয়ে শোনাতে বলল অলসভাবে।

গীটারের ওপরে ঝুঁকে পড়ল ইয়াকভ-মামা, তারপর গীটারের টুং-টাং শব্দ তুলে বিরক্তিকর গলায় গাইতে শুরু করে দিল:

> কী পরিপূর্ণ জীবন ছিলো হায়রে
> অকারণ গোলমাল উন্মত্ততা তায়রে।
> কাজান মেয়েকে সবাই আমরা দেখেছিলাম
> সবাইকার সব কথাই তাকে বলেছিলাম।

আমার মনে হল ভারি বিষণ্ন গান এটি। দিদিমা বললেন, 'অন্য একটা গান গাও ইয়াকভ। একটা সত্যিকারের গান। মত্রিয়া, তোর মনে আছে কত সব গান আমরা শুনতাম?'

ধোবানী বেশ ভারিক্কী চালে পোশাকের খসখসানি তুলে বললেন, 'বোন, সে-সব গান আর নেই। আজকাল গানের ধারাই পাল্‌টে গেছে।'

ইয়াকভ-মামা আধবোজা চোখে দিদিমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন দিদিমা অনেক দূরের কোনো মানুষ। কিন্তু তার গান থামেনি। গীটারের বিষণ্ন টুং-টাং আর সেই বিশ্রী গানটা সমানে চলেছে।

দাদামশাই ঘড়িওলার সঙ্গে কী যেন আলাপ করছেন আর মাঝে মাঝে হাত নেড়ে দেখাচ্ছেন কী যেন। ঘড়িওলা ভুরু তুলে আমার মা'র দিকে তাকাচ্ছে আর একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে তার তল্‌তলে মুখের ওপর।

অন্যদিনের মতোই মা বসেছে সের্গেয়েভদের পাশে, চাপা ভারিক্কী গলায় কথা বলছে ভাসিলির সঙ্গে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাসিলি বলছে, 'হুঁম্! কথাটা ঠিকই বটে তবে ভেবে দেখতে হবে।'

ভরা-পেটের পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে ভিক্টর, মেঝের ওপরে পা ঘষছে আর হঠাৎ সরু সরু গলায় গান গাইতে শুরু করে দিল:

'আন্দ্রেই-বাবা, আন্দ্রেই-বাবা...'

এই গান শুনে সবাই কথা থামিয়ে অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে।

ব্যাপারটা গর্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বললেন ওর মা: 'এটা হচ্ছে থ্যাটরের গান। আজকাল থ্যাটরে এই রকমের গানই গাওয়া হয় কিনা!'

অসহ্য ক্লান্তির জন্যে স্মরণীয় এই ধরনের দুটি কি তিনটি সন্ধ্যা পার হতেই এক রবিবার দুপুরবেলা ঘড়িওলা এসে হাজির। রবিবারের পূর্বাহ্নকালীন উপাসনা তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। মা'র ঘরে আমি বসে আছি। পুঁতির কাজ করা পুরানো একটা এম্‌ব্রয়ডারি থেকে মা সুতো খুলছিল আর সে-কাজে তাকে আমি সাহায্য করছিলাম। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল আর খোলা দরজার ফাঁকে দিদিমার মুখটা একবার ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল আবার। আর সেই সময়টুকুর মধ্যেই উচ্চস্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করে তিনি বলে গেলেন:

'ভারিয়া, সে এসেছে!'

শুনে মা যেমনি বসেছিল তেমনি বসে রইল, তার মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন এল না। কিছুক্ষণ পরে দরজাটা আবার খুলে গেল আর খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাদামশাই গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন:

'ভারভারা, এক্ষুণি তৈরি হয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো!'

তাঁর মুখের দিকে না তাকিয়ে এবং তেমনি ভাবে বসে থেকেই মা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'এসোই না বলছি! ঈশ্বর তোমার সহায় হবেন! এই নিয়ে এখন আর তর্ক জুড়ে দিও না। সব দিক দিয়েই ভালো এই লোকটি, কাজেকর্মে চৌকস, আর লেক্সেইও সত্যিকারের বাপ পাবে...'

অস্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়ে দাদামশাই কথা বলছেন। কথা বলতে বলতে হাতদুটো আস্তে আস্তে বুলোচ্ছেন উরুর ওপরে। কনুই এমনভাবে কাঁপছে যে মনে হয়, হাতদুটো বারবার থাবা বাড়িয়ে আসতে চাইছে কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে সে ইচ্ছাকে সংযত করেছেন।

শান্ত স্বরে মা বলল, 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, এ হবার নয়।'

দু-হাত অন্ধের মতো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দুম্‌ দুম্‌ করে পা ফেলে দাদামশাই এগিয়ে এলেন মা'র দিকে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠলেন:

'আসবি তো আয়! নইলে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাব!'

'টানতে টানতে নিয়ে যাবে?' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মা বলল। তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে, হিংস্র দৃষ্টিতে কুটিল হয়ে উঠেছে চোখদুটো। ফর্‌ ফর্‌ করে টেনে গা থেকে স্কার্ট আর ব্লাউজ খুলে ফেলল মা; শুধু একটা

পেটিকোট ছাড়া আর কিছু পরনে নেই — এমনি অবস্থায় দাদামশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলল:

'এসো এবার! টানতে টানতে নিয়ে যাও আমাকে!'

দাঁত কড়মড় করে ঘুষি পাকিয়ে দাদামশাই বললেন, 'ভালো হচ্ছে না ভারভারা, শীগ্‌গির জামাকাপড় পরে নে!'

দাদামশাইকে ঠেলে সরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মা, চিৎকার করে বলল:

'কই, আসছ না যে? চলো।'

দাদামশাই ফুঁসে উঠলেন, 'তোর সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না!'

'আমি ভয় পাই না। কই, চলো!'

মা দরজা খুলল। মা'র পেটিকোটের একটা প্রান্ত চেপে ধরে দাদামশাই হাঁটু মুড়ে বসে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে উঠলেন:

'ভারভারা, ওরে শয়তানী! তোর সর্বনাশ হবে বলে দিচ্ছি! আমার মুখে এভাবে চুনকালি দিস্‌নে! গিন্নি! গিন্নি!'

দিদিমা আগেই এসে মা'র পথ আটকিয়েছিলেন। মুরগীর মতো মাকে তাড়া দিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে আনতে বিড়বিড় করে বললেন:

'তোর কি বুদ্ধিলোপ হয়েছে, ভারভারা! হতভাগী, লজ্জাশরম বলেও কি কিছু নেই!'

মা'কে ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে এনে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিলেন দিদিমা। তারপর ফিরে দাঁড়ালেন দাদামশাইয়ের দিকে। একহাতে মেঝে থেকে টেনে তুললেন দাদামশাইকে, অপর হাত শাসানির ভঙ্গিতে তাঁর সামনে নাড়তে লাগলেন।

'বুড়ো শয়তান! ভীমরতি ধরেছে!'

দাদামশাইকে ধরে ডিভানের ওপরে বসিয়ে দিলেন দিদিমা। ন্যাকড়ার পুতুলের মতো ঝুলঝুল করতে লাগল দাদামশাইয়ের মাথাটা, মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

মা'র দিকে তাকিয়ে দিদিমা ধমক দিলেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি। জামাকাপড় পর না!'

স্কার্ট আর ব্লাউজ কুড়িয়ে নিতে নিতে মা বলল, 'আমি কিন্তু ওই লোকের কাছে যাব না তা আগে থেকেই বলে রাখছি।'

আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে দিদিমা বললেন, 'যা তো, একটা পাত্র করে খানিকটা জল নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি যা!'

চাপা স্বরে দিদিমা কথা বলছেন। শান্ত ও আদেশব্যঞ্জক গলার স্বর। এক ছুটে আমি বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। সেখান থেকে শুনতে পেলাম, সামনের দিককার ঘরে কে যেন আস্তে আস্তে পায়চারি করছে।

শুনতে পেলাম মা বলছে, 'আমি কালই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব!'

স্বপ্নচালিতের মতো রান্নাঘরে গিয়ে জানলার কাছে বসলাম আমি।

দাদামশাইয়ের হাঁকডাক চিৎকার শোনা যাচ্ছে। দিদিমা ফিস্‌ফিস্‌ করে কী যেন বলে চলেছেন। একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল। তারপরেই চারিদিক নিস্তব্ধ আর থম্‌থমে। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমাকে কী জন্যে পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাত্রে জল নিয়ে আমি বাইরের ঘরে এলাম। এবার দেখা গেল, বাড়ির সামনের দিক থেকে ঘড়িওলা বেরিয়ে আসছে, ফারের টুপিটায় টোকা দিতে দিতে কাতরাচ্ছে ভাঙা গলায়। ঘড়িওলার পিছনে পিছনে আসছেন আমার দিদিমা। হাতদুটো পেটের ওপরে আড়াআড়ি করে রেখে মাথা নুইয়ে শান্ত স্বরে তিনি বলছেন:

'ব্যাপারটা আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন তো! কাউকে তো আর জোরজবরদস্তি করে অপরকে ভালো লাগানো যায় না!'

হোঁচট খেতে খেতে ঘড়িওলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠোনে চলে গেল। দিদিমা সেই জায়গায় দাঁড়িয়েই বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন। তাঁর সারা শরীরটা কাঁপছিল। তিনি হাসছিলেন না কাঁদছিলেন তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না।

দিদিমার দিকে ছুটে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?'

এক ঝটকায় জলের পাত্রটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, খানিকটা জল চল্‌কে ফেলে আমার পা ভিজিয়ে দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন:

'জল আনতে কোন্‌ রাজ্যে গিয়েছিলি তুই? দরজা বন্ধ করে দে!'

দিদিমা আমার মা'র ঘরে ফিরে গেলেন, আমি আবার এলাম রান্নাঘরে। মা'র ঘর থেকে গোঙানি, দীর্ঘনিশ্বাস আর অস্ফুট কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসতে লাগল; যেন ঘরের লোকগুলো কোনো সাধ্যাতীত ভারি জিনিস ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

দিনটি ভারি চমৎকার। শীতকালের রোদ দীর্ঘ রেখায় জানলাদুটির তুষারঢাকা শার্সির ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। টেবিলে বৈকালিক

আহার্য সাজানো। সীসার মেশাল দেওয়া টিনের তৈরি ডিশ আর কাঁচের পাত্র ঝক্‌ঝক্‌ করছে। কাঁচের পাত্রগুলোতে রয়েছে সোনালীরঙের 'ক্‌ভাস' পানীয় আর দাদামশাইয়ের নিজের হাতে তৈরি মেঠো ফুলের সুগন্ধিযুক্ত সবুজরঙের ভদ্‌কা। জানলার শার্সিতে এক জায়গায় তুষার গলে গিয়েছিল, সেই ফাঁক দিয়ে আমি দেখলাম, বাড়ির ছাদগুলোতে চোখঝলসানো বরফ জমেছে, চক্‌চকে রুপোলী টোপর মাথায় বেড়ার খুঁটি ও পাখির বাসাটি। জানলার খিলান থেকে ঝোলানো খাঁচার মধ্যে রয়েছে আমার ধরা সব পাখি; প্রচুর সূর্যের আলো এসে পড়েছে খাঁচাগুলোর ওপর। মনের আনন্দে কিচিমিচির করছে চেফিঞ্চ্‌ পাখিগুলো, বুল্‌ফিঞ্চের দল হুটোপাটি লাগিয়েছে, গান গাইছে গোল্‌ড্‌ফিঞ্চ্‌রা। কিন্তু এই রুপোলী দিনের সুর ও উজ্জ্বলতা আমাকে কোনো আনন্দই দিতে পারছে না। একটা না-চাওয়া দিন। সব কিছুই না-চাওয়া। ইচ্ছে হচ্ছে, খাঁচা খুলে পাখিগুলোকে মুক্ত করে দিই। হয়তো দিতামও। খাঁচাগুলোকে নামাতে যাচ্ছি এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন দিদিমা। উরুতে চাপড় দিতে দিতে আর চিৎকার করতে করতে দিদিমা ছুটলেন চুল্লির দিকে।

'মরণও হয় না তোমাদের! হায়, হায়, আমার কি বুড়ো বয়সে বুদ্ধি নাশ হল গো!'

বলতে বলতে চুল্লির ভিতর থেকে 'পিরোগ' টেনে বার করলেন তিনি। ওপরের পোড়া ছালটায় দু-তিনবার টোকা দিয়ে মুষড়ে পড়লেন একেবারে।

'ইস্‌, একেবারে শুকিয়ে গেছে! তোদের জ্বালায় কি ধীরেসুস্থে কিছু করবার জো আছে! রাক্ষুসে গুষ্টি, তোদের ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাক্‌ না, ভাসিয়ে নিয়ে যাক্‌ না বন্যায়! অমন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছিস কেন রে প্যাঁচা-মুখো! ভাঙা কল্‌সীর টুকরোর মতো তোদের সবকটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তবে আমার শান্তি!'

দিদিমা কাঁদতে শুরু করে দিলেন। উল্‌টেপাল্‌টে দেখছেন 'পিরোগ'-টাকে, পোড়া ছালটার ওপরে টোকা দিচ্ছেন, চোখের জলের বড়ো বড়ো ফোঁটায় ভিজিয়ে দিচ্ছেন খাদ্যবস্তুটিকে।

আমার মা ও দাদামশাই এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে। নষ্ট-হয়ে-যাওয়া 'পিরোগ'টা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দিদিমা। টেবিলের ডিশগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল।

'দেখ, জিনিসটার কী হাল্ হয়েছে! তোমাদের দোষেই তো হল এটা! উচ্ছন্নে যাও তোমরা!'

আমার মা'র মেজাজ এতক্ষণে শান্ত হয়েছে, মনটাও প্রফুল্ল। দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে মিষ্টি কথায় শান্ত করতে চেষ্টা করল। দাদামশাইকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তিনি খুব দমে গেছেন। চোখের ওপরে রোদ এসে পড়েছিল; ফোলা ফোলা চোখ পিটপিট করে, গলায় ন্যাপ্‌কিন জড়িয়ে বিড়বিড় করে বললেন তিনি:

'যাক গে, যা হবার হয়েছে! ভাল 'পিরোগ'ও তো আমরা আগে খেয়েছি। প্রভুর ধরনই এমনি! তাঁর স্বভাবটা হচ্ছে একটু কৃপণ—কয়েক বছরেরটা শোধ দেন একটি মুহূর্তে। আবার সুদের ধার ধারেন না! বোসো ভারিয়া... যা হবার হয়ে গেছে!'

দাদামশাই এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন তিনি কোনো একটা ব্যাপারে অভিভূত হয়েছেন। খেতে বসে সারাক্ষণ তিনি ঈশ্বরের কথা বললেন, বললেন অধার্মিক আহাব'এর কথা; আর বাপ হলে কত কিছু যে সহ্য করতে হয় ও কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় সে কথা। দিদিমা রেগে গিয়ে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'হয়েছে বাপু হয়েছে! এবারে বক্‌বক্ না করে খাওয়ার দিকে মন দাও তো!'

মা হাসছে, চক্‌চক্ করছে তার পরিষ্কার চোখদুটো।

আমাকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে মা জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, একটু আগে খুব ভয় পেয়েছিলি তো?'

আমি তখন যে খুব ভয় পেয়েছিলাম তা নয়। কিন্তু এখন আমার কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে। কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কী হয়েছে আমার।

রবিবারে যেমন হয়, তেমনি অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু খাওয়া হল। বিশ্বাস করা শক্ত যে আধ ঘণ্টা আগে এই লোকগুলো নিজেদের মধ্যে এত চোটপাট করছিল, প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল। মাত্র আধ ঘণ্টা আগেই এত কান্নাকাটি, রাগারাগি আর ফোঁসফোঁসানি — কিন্তু এখন আর কিচ্ছু নেই। আমি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এ-ধরনের ঘটনা এদের কাছে বিশেষ গুরুতর ঘটনা আর এর জন্যে এদের বিশেষ কোনো চেষ্টা করতে হয়। এদের স্বভাবই এই রকম--এই হয়তো ভয়ানক কান্নাকাটি, চোটপাট আবার পরের মুহূর্তেই কিছু নেই। কতবার যে এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে, দেখে দেখে আমি অভ্যস্ত

হয়ে উঠেছি। প্রথম দিকে এ-ধরনের ঘটনা আমার মনে দাগ কাটত, এখন আর কাটে না।

অনেক কাল পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, রুশদেশের তখনকার জীবনে এইটেই ছিল স্বাভাবিক। সেই জীবনে একদিকে ছিল চরম দারিদ্র্য, অন্যদিকে এতটুকু বৈচিত্র্যের অভাব—সুতরাং তারা এ-জীবনকে ভুলে থাকতে চাইত দুঃখের মধ্যে, শিশুর মতো পুতুলখেলার অভিনয় করে। নিজেদের দুর্ভাগ্য নিয়ে নিজেদের মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জা ছিল না।

জীবনে যদি কোন কিছু বৈচিত্র্য না থাকে তাহলে দুঃখকেও আশীর্বাদের মতো মনে হয়; ঘরে আগুন লাগলেও তা উপভোগের দৃশ্য হয়ে ওঠে; আঁচিল হচ্ছে ভাবলেশহীন মুখের শোভা...

এগার

এই ঘটনার পর থেকে আমার মা'র প্রতাপ বেড়ে গেল এবং আমার মা-ই হয়ে উঠল বাড়ির সর্বেসর্বা। দাদামশাই অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ ও নির্বিরোধী হয়ে গেলেন।

দাদামশাই বাড়ি থেকে এখন বিশেষ আর বেরোন না। ওপরের ঘরটিতে একা একা বসে তিনি একটি রহস্যজনক বই পড়েন। বইটির নাম 'আমার বাবার লেখা থেকে'। বইটি তিনি রাখেন সিন্দুকের মধ্যে তালাচাবি বন্ধ করে। বহুবার আমি দেখেছি, বইটি বার করার আগে তিনি ভালো করে হাত ধুয়ে নেন। বইটি ছোট এবং মোটা পাটকিলে রঙের চামড়া দিয়ে বাঁধানো। বইয়ের নীলচে রঙের পরিচয়পত্রে অস্পষ্ট কালিতে এই কথাগুলো লেখা আছে:

'আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত পরমপূজনীয় ভাসিলি কাশিরিনকে'।

লেখাটির নিচে যে নামটি স্বাক্ষর করা আছে তা ভারি অদ্ভুত। স্বাক্ষরের শেষে যেন উড়ন্ত পাখির ছবি এঁকে খানিকটা অলংকরণ করা হয়েছে। দাদামশাই বইটাকে হাতে নিয়ে অতি সাবধানে চামড়ার বাঁধাই এক ভারি আবরণ খুলে চোখে আঁটেন রুপোর ফ্রেমের চশমা আর এই লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বহুক্ষণ ধরে নাকটা কোঁচকান চশমাটা ঠিক করে নেবার জন্যে। এই বইটির কথা আমি তাঁকে একাধিকবার জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু প্রত্যেকবারেই তিনি তদ্‌গতভাবে সেই একই জবাব দিয়েছেন:

'এখনো তোর জানবার সময় হয়নি। একটু সবুর কর—মরবার সময় আমি তোকে এই বইটা দিয়ে যাব। আর সেই সঙ্গে রেকুনের লোমের তৈরি আমার কোটটাও।'

মা'র সঙ্গে কথাবার্তা আজকাল তিনি কমিয়ে দিতে শুরু করেছেন। যেটুকু বলেন তাও অনেক নম্রভাবে। আবার মা যখন কোনো কিছু বলে তখন তিনি মন দিয়ে শোনেন আর অদ্ভুত সব ভঙ্গিতে পিওতর-কাকার মতো চোখ পিটপিট করে মা'র কথার জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করে বলেন:

'আচ্ছা, যা খুশি করো।'

তাঁর ট্রাঙ্কগুলো ভর্তি রয়েছে নানা রকমের দামী আর আশ্চর্য সব পোশাকে। সিল্কের সার্ট, সাটিনের জ্যাকেট, রেশমী রুপোখচিত সারাফান, কিকা ও কোকোশ্নিক*, উজ্জ্বল রঙের রুমাল ও স্কার্ফ, মর্দোভীয় হার এবং বিচিত্রবর্ণের পাথর ও পুঁতি। জিনিসগুলো তিনি মা'র ঘরে নিয়ে এসে টেবিল ও চেয়ারের ওপরে বিছিয়ে দিলেন। এই সূক্ষ্ম কারুকার্য করা জিনিসগুলোকে মা যখন প্রশংসা করতে লাগল, দাদামশাই বললেন:

'আজকাল লোকে কি আর এমন সাজপোশাক করে। আমাদের সময়ে সাজপোশাকের যেমন ঘটা ছিল তেমনি খুব দামী আর চমৎকার পোশাকও লোকে পরত। তবে সাজপোশাকের যতোই চটক থাকুক, মানুষগুলোর জীবন আরো অনেক সাদাসিধে ছিল। অনেক বেশি মিলেমিশে থাকতে পারত। সে-সব দিন আর ফিরে আসবে না! এগুলো তোর কাছেই রইল, খুশিমতো পরিস...'

একদিন মা কিছুক্ষণের জন্যে পাশের ঘরে উঠে গেল, তার পর ফিরে এল সোনালী কাজকরা গাঢ় নীল রঙের সারাফান আর মুক্তো-খচিত কিকা পরে। দাদামশাইয়ের সামনে এসে নীচু করে মাথা নুইয়ে বলল:

'মান্যবরের কি এই পোশাক পছন্দ হয়?'

দাদামশাইয়ের খুশি আর ধরে না: চোখেমুখে খুশি ফেটে পড়ছে। স্বপ্নচালিতের মতো মা'র চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে হাত-পা নেড়ে বিড়বিড় করে বলে চলেছেন:

'ওরে ভারভারা, তোর যদি অনেক টাকা থাকতো আর কাছাকাছি যদি থাকতো সজ্জন মানুষ।'

* সারাফান—লম্বা আস্তিনশূন্য পোশাক। কিকা ও কোকোশ্নিক—বিশেষ মস্তকাবরণ। — সম্পাঃ

বাড়ির সামনের দিককার ঘরদুটি মা নিজের থাকার জন্যে বেছে নিয়েছে। প্রায়ই অতিথি-আপ্যায়ন করে মা। অভ্যাগতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাদের দেখা যায় তারা হচ্ছে মাক্সিমোভ ভ্রাতৃ-যুগল। একজন পিওতর—প্রকাণ্ড শরীর ও সুন্দর চেহারার একজন অফিসার, মস্ত সোনালী দাড়ি আর নীল চোখ। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের টাকে থুতু ফেলবার জন্যে এই লোকটির সামনেই সেবার দাদামশাই আমাকে মেরেছিলেন। অপরজন ইয়েভগেনি; ফ্যাকাশে লম্বা চেহারা, সরু সরু লম্বা ঠ্যাঙ, ছুঁচলো আর ছোট কালো দাড়ি, চোখদুটো কুলের মতো; সোনালী বোতাম আর সরু সরু দুই কাঁধে সোনালী প্রতীক-চিহ্ন লাগানো সবুজরঙের পোশাক পরে থাকে সব সময়ে। মাথায় লম্বা লম্বা কোঁকড়ানো চুল; চুলগুলো উঁচু কপালটার ওপরে এসে পড়ে; মাথাটা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো সরিয়ে নেওয়া এবং মাতব্বরী চালে হাসা একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে তার। ভাঙা ভাঙা নীচু গলায় সব সময়েই কোনো একটি বিষয়ে মত প্রকাশ করে চলেছে, আর যাই বলুক না কেন, বক্তব্য শুরু করে অবধারিতভাবে এই কথাগুলো বলে:

'আমি যে-ভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছি তা হচ্ছে...'

আধ-বোজা চোখে মা এই লোকটির কথা শোনে আর কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রায় হেসে উঠে বলে:

'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয় আপনি এখনো একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন...'

'ঠিক কথা—একেবারে ছেলেমানুষ!' অফিসারটি হাঁটুতে চাপড় মেরে মা'র কথায় সায় জানায়।

বড়োদিনের ছুটিগুলো হৈ-হল্লা আমোদপ্রমোদের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় মা ও তার বন্ধুরা বাহারওলা সাজপোশাক পরে বেড়াতে যেত। দলের মধ্যে মা'র পোশাকই হত সবচেয়ে সুন্দর।

উচ্চস্বরে কথা বলতে বলতে এই দলটি গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই মনে হত, আমাদের বাড়িটা যেন মাটির অন্ধকারে ডুবে গেছে, চারদিকে থম্‌থমে বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা আর কোথাও এতটুকু প্রাণের চিহ্ন নেই। বুড়ো হাঁসের মতো নিঃশব্দ সঞ্চারে ঘর থেকে ঘর ঘুরে বেড়িয়ে ঝাড়ামোছা করতেন দিদিমা আর টালির চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে পিঠ গরম করতে করতে দাদামশাই আপনমনে বিড়বিড় করে বলতেন:

'থাকুক... যে-ভাবে খুশি থাকুক ও... দেখিয়ে দেবে কী হবে...'

বড়োদিনের ছুটির পর আমাকে আর মিখাইল-মামার ছেলে সাশাকে স্কুলে ভর্তি করে দিল মা। সাশার বাবা অরেকবার বিয়ে করেছে এবং সাশার সৎ-মা প্রথম দিন থেকেই সাশাকে একেবারে দেখতে পারে না। ছেলেটাকে তার সৎ-মা এমন মার মারত যে দাদামশাইকে বলে-কয়ে দিদিমা ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। মাসখানেক আমরা দুজনে একসঙ্গে স্কুলে যাই। এই একমাস স্কুলে গিয়ে যেটুকু শিক্ষা আমার হয়েছে তার মধ্যে একটা জিনিস আমার মনে আছে। তা হচ্ছে এই: আমাকে যদি আমার নাম জিজ্ঞেস করা হয় আর আমি যদি জবাব দিই — 'পেশ্‌কভ' — তাহলে জবাবটা ঠিক হবে না। বলতে হবে — 'আমার নাম পেশ্‌কভ'। আর মাস্টারমশাইকে একথাও কিছুতেই বলা চলবে না — 'আমার ওপর অমন চোটপাট করিস না ভাই। আমি তোকে ভয় করিনে...'

স্কুলকে আমি প্রথম দিন থেকেই অপছন্দ করি। ওদিকে আমার মামাতো ভাই ঠিক উল্‌টো। তার কিন্তু গোড়া থেকেই স্কুল ভালো লেগেছে, আর বন্ধুত্বও হয়েছে অনেকের সঙ্গে। কিন্তু একদিন হল কি, ক্লাশের পড়ার সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চিৎকার করে ওঠে — 'না, কক্ষণো না!' তারপর জেগে উঠে মাস্টারমশাইয়ের অনুমতি নিয়ে ক্লাশ ছেড়ে চলে যায়। এই ব্যাপারটা নিয়ে অন্য ছেলেরা তার পিছনে লেগে লেগে তাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে তোলে।

পরদিন সেন্নায়া স্কোয়ারের সামনে নালাটার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বলল:

'তুই একাই যা, আমি আজ আর স্কুলে যাব না। আমি বরং একটু টহল দিয়ে আসি।'

নিচু হয়ে বরফের মধ্যে বইগুলোকে চাপা দিয়ে সে চলে গেল। জানুয়ারি মাসের উজ্জ্বল দিন, ঝক্‌ঝকে সূর্যের আলোয় সারা পৃথিবী হাসছে। মামাতো-ভাইকে আমার হিংসে হতে লাগল। কিন্তু মা'র কথা ভেবে নিজের ইচ্ছাকে চাপা দিয়ে স্কুলে গেলাম। সাশা যে বইগুলোকে বরফ চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিল সেগুলো চুরি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল এবং তাই হল। সুতরাং পরদিনও সে স্কুলে গেল না — বই-খাতা খুইয়ে বসে সেদিন আর স্কুলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তৃতীয় দিন সাশার এই স্কুল-পালানোর ব্যাপারটা দাদামশাই টের পেয়ে গেলেন।

আমাদের দুজনকেই ডাকা হল বিচারসভায়। আমাদের জেরা করবার

জন্যে রান্নাঘরের টেবিলের পিছনে সারি দিয়ে বসলেন দাদামশাই, দিদিমা ও মা। দাদামশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে সাশা যে-সব মজার মজার জবাব দিয়েছিল তা এখনো আমার মনে আছে।

'ব্যাপারটা কি যে তুমি বাড়ি থেকে রওনা হয়ে স্কুলে আর পেঁছতে পারলে না?'

ভীরু দুই চোখ তুলে সোজাসুজি দাদামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সাশা জবাব দিল, 'স্কুলের রাস্তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

'ভুলে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। কত আঁতিপাঁতি খুঁজলাম...'

'তা লেক্সেইয়ের সঙ্গে সঙ্গে গেলেই তো পারতে। লেক্সেই তো আর ভোলেনি।'

'সেই যে কোথায় হারিয়ে গেল তা বুঝতে পারলাম না।'

'লেক্সেই হারিয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'কী করে হারাল?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সাশা বলল, 'আমি যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিলাম না—সে কী ভয়ানক তুষারঝড় উঠেছিল!'

তুষারঝড়ের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল কারণ সেটা ছিল রোদ-ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার দিন। সাশা নিজেও একটু মুচ্‌কি হাসল। দাদামশাই দাঁত বার করে উপহাসের স্বরে বললেন:

'তা, তুমি তো লেক্সেইয়ের হাত বা কোমরের বেল্ট শক্তভাবে চেপে ধরতে পারতে?'

'আমি তো চেপে ধরেছিলাম। কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল।'

ধীরে ধীরে হতাশভাবে কথার পিঠে কথা বলে যাচ্ছে সে। এই নিষ্ফল ও এলোমেলো মিথ্যে কথা শুনে আমি নিজেও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম এবং সাশার এই গোঁয়ার্তুমির অর্থ বুঝে উঠতে পারলাম না।

সেদিন আমরা দু'জনেই মার খেলাম। দমকলের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে রাখা হল আমাদের দু'জনকে স্কুলে পেঁছে দিয়ে আসবার জন্যে। লোকটার একটা হাত মুচড়ে ভেঙে গেছে। বিশেষ করে তাকে সাশার ওপরে নজর রাখতে বলা হল; সাশা যেন কিছুতেই জ্ঞানের পথ থেকে বিচ্যুত

না হয়। কিন্তু এসব ব্যবস্থা ব্যর্থ হল। পরদিন স্কুলে যাবার পথে স্কোয়ারের সামনে নালাটার কাছাকাছি আসতেই আমার মামাতো-ভাই করল কি, পায়ের জুতোজোড়া খুলে নিয়ে একপাটি ছুঁড়ে ফেলল ডানদিকে, আর একপাটি বাঁদিকে। তারপর মোজা পায়ে চোঁচা ছুট্ দিল স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে। কাণ্ড দেখে সেই বুড়ো লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর জুতোজোড়া খুঁজেপেতে কুড়িয়ে নিয়ে এল। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে স্কুলের দিকে আর না গিয়ে আমাকে নিয়ে সোজা ফিরে এল বাড়িতে।

তারপর সারাদিন ধরে দাদামশাই, দিদিমা ও মা সারা শহরে পলাতক আসামীকে খুঁজে বেড়ালেন। সন্ধ্যার দিকে মঠের কাছে চিরকোভের শুঁড়িখানায় পাওয়া গেল তাকে: সেখানে সে ক্রেতাদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচছিল। এবার সে একেবারে মুখ বুজে রইল এবং ব্যাপার-স্যাপার দেখে সবাই এমন থ' হয়ে গিয়েছিল যে তাকে উত্তম-মধ্যম দেবার কথাও কারও মনে হয় না। তাকে আমার পাশে শুয়ে ছাদে লাথি ছুঁড়তে ছুঁড়তে শান্ত স্বরে সে বলল:

'আমার সৎ-মা আমাকে ভালোবাসে না, আমার বাবা আমাকে ভালোবাসে না, আমার ঠাকুর্দা আমাকে ভালোবাসে না। যারা আমাকে ভালোবাসে না তাদের সঙ্গে আমি কেন থাকতে যাব? ঠাকুমার কাছ থেকে আমি জেনে নেব কোথায় গেলে ডাকাতদলের দেখা পাওয়া যায়, তারপর বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যাব তাদের কাছে। তখন আমার কথা ভেবে তোদের কষ্ট হবে দেখিস! আচ্ছা চল্ না দু'জনে একসঙ্গে যাই—যাবি?'

কিন্তু আমার পক্ষে তার সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সে-সময়ে আমার জীবনের অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল—তা হচ্ছে, মস্ত এক সোনালী দাড়িওলা অফিসার হওয়া, কিন্তু তার জন্যে পড়াশুনো করা দরকার। মামাতো-ভাইকে আমার পরিকল্পনার কথা বলতেই সে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে আমার কথায় সায় জানাল:

'আচ্ছা ঠিক আছে। তুই হবি অফিসার আর আমি হব ডাকাতদলের সর্দার। তারপর তুই আসবি আমাকে ধরতে। তারপর হয় তুই মরবি, না হয় আমি মরব। কিংবা, হয় তুই ধরা পড়বি, না হয় আমি ধরা পড়ব। আমি কিন্তু কিছুতেই তোকে খুন করব না।'

'আমিও তোকে খুন করব না।'

এইভাবে মতের মিল হবার পর আমাদের আলোচনা শেষ হল।

দিদিমা ঘরে ঢুকলেন; চুল্লির ওপরের তাকে আমাদের বিছানায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে কথা বলতে লাগলেন আমাদের সঙ্গে।

'কুটুর কুটুর মাণিকরা আমার! বাপমায়ের আদর-ছাড়া দস্যি ছেলেরা আমার!..'

আমাদের জন্যে গভীর দরদে ভরা দিদিমার মন। সেই মন নিয়েই তিনি সাশার সৎ-মাকে নিন্দে করতে লাগলেন; এক শুঁড়িখানার মালিকের মেয়ে মোটা নাদেজ্দা-মামী হচ্ছে সাশার সৎ-মা। সাশার সৎ-মাকে নিন্দে করতে গিয়ে তিনি পৃথিবীর সমস্ত সৎ-মা ও সৎ-বাপকেই নিন্দে করতে শুরু করলেন এবং এই প্রসঙ্গে কথায় কথায় বললেন জ্ঞানী-ঋষি আয়োনের গল্প। আয়োন তখন ছেলেমানুষ, কিন্তু তখনই তিনি নিজের সৎ-মার ওপরে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের দণ্ড নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। আয়োনের বাপ ছিল সাদা হ্রদের জেলে; আর তার ছিল এক দজ্জাল বৌ। তাকে টেনে এনেছিল সর্বনাশের পথে।

একদিন তাকে ছলাকলায় ভুলিয়ে খাওয়াল মদ — মদের নেশায় বেহুঁশ করে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াল।

ওক্কাঠের তৈরি এক ডিঙ্গির মধ্যে — কফিনের মতো সরু আর অন্ধকার এক ডিঙ্গির মধ্যে — তুলে নিল অচেতন শরীরটাকে। মেপ্লকাঠের দাঁড় টেনে নৌকো বেয়ে চলল নিজেই। চলল যেখানে জল ফুঁসছে আর অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে এক লজ্জাহীনার দুষ্কৃতির প্রতীক্ষায়।

ডিঙ্গি থেকে ঝুঁকে পড়ে, ডিঙ্গিকে টলিয়ে দিয়ে, নড়িয়ে দিয়ে, উল্টিয়ে দিল একেবারে। কেউ সাক্ষী রইল না। হ্রদের অতল গভীরে ভারি পাথরের মতো তলিয়ে গেল তার স্বামী।

তারপর জল সাঁতরে ফিরে এল সর্বনাশী। মাটিতে আছড়ে পড়ে, বুক চাপড়ে, মৃত স্বামীর নাম স্মরণ করে, শুরু করল মড়া-কান্না। যে স্বামীকে সে নিজেই খুন করেছে তারই জন্যে মায়াকান্না!

গাঁয়ের লোকেরা সবাই তার দুঃখে দুঃখপ্রকাশ করল। তার বিধবার বেশ দেখে, তার চরম দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে, চোখের জল ফেলল একই সঙ্গে। এত অল্প বয়সেই যে মেয়েকে বিধবা হতে হল, এক আশাভরসাহীন অন্ধকার জীবন যার ভবিতব্য — তাকে সান্ত্বনা দিল এই বলে যে, ঈশ্বরের বিধান অমোঘ ও দুর্লঙ্ঘ, মানুষের জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন।

কিন্তু সেই দলের মধ্যে একজন মাত্র ছিল — তার সতীনের ছেলে আয়োনুশ্কা — যে তার সৎ-মার মায়াকান্নাকে বিশ্বাস করেনি। সৎ-মার বুকের ওপরে হাত রেখে ধীর স্বরে বলতে লাগল তাকে.

তোমাকে বিশ্বাস করি না, কুচক্রী নারী তুমি, রাত্রিচর সুখোন্মত্ত পাখি, বিশ্বাসঘাতিনী। তোমার ওই অজস্র মায়াকান্না টলাতে পারবে না আমাকে। বাইরে তোমার যতোই কান্না থাকুক, বুকের ভিতরটা আনন্দে উছলে উছলে উঠছে। এসো তবে ঈশ্বরের বিচার প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের দণ্ড আসুক নেমে। যে কেউ একজন একটা ধারালো ছুরি আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিক্। যদি আমি অপরাধী হই ছুরি বিঁধবে আমার বুকে। যদি তুমি অপরাধী হও ছুরি বিঁধবে তোমার বুকে।

একথা শুনে সৎ-মা ধীরে মুখ ফেরাল। ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। জ্বলে উঠেছে তার চোখদুটি। ঘৃণা ঝরে পড়ছে তার মুখ থেকে। দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। শ্লেষ ও প্রতিহিংসায় তীব্র হয়ে উঠল গলার স্বর। বলল:

নির্বোধ না হলে এমন কথা কেউ বলে? শয়তানীর গর্ভে জন্ম তোমার — মায়ের গর্ভপাত। যে কথা মুখে আনাও পাপ — তাই বলে চলেছ তুমি। যে কথা মিথ্যে — তাই উগরে চলেছ। বলো কোন্ পাপ-চক্রান্ত করেছ তুমি?

যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল সেখানে — তারা শুনল এসব কথা।

শুনল যে ব্যাপারটা অমঙ্গলে ভরা।

নিঃশব্দে তাকাল পরস্পরের দিকে। বুকের ভিতরটা ভারি হয়ে উঠল সকলের। ফিসফিস করে আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে।

তারপর ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল একজন বুড়ো জেলে। প্রণাম করল সকলকে। অভিবাদন জানাল চেনা-পরিচিত জনকে। কথা বলল প্রত্যয় নিষ্ঠ স্বরে:

এখানে সৎ মানুষ যারা আছে তাদের বলছি শোনো। সেই ধারালো ছুরি এনে দাও আমার কাছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো — ছুরিটা নিয়ে আমি ছুঁড়ব আকাশের দিকে। তারপর নেমে আসুক ছুরি পাপীর বুকে। খুন করুক তাকে।

এল ছুরি। বুড়ো জেলের হাতে তুলে দিল সবাই। একমাথা পাকা চুল ঝাঁকিয়ে ছুরিটাকে ছুঁড়ল সে আকাশের দিকে। ঘন নীল আকাশে পাখির মতো মিলিয়ে গেল ছুরিটা।

তারপর নিঃসীম গাঢ় নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষা করল তারা। অপেক্ষা করল — কখন ঘন নীল আকাশ থেকে ছুরিটা নেমে আসে। টুপি খুলে ফেলল মাথা থেকে, দাঁড়িয়ে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে।

নিঃশব্দে নামল রাত্রি।

হ্রদের ওপারে ফুটে উঠল ঊষার রক্তিমাভা।

তখন সৎ-মার উল্লাস দেখে কে! আহ্লাদে ডগমগ সে।

এমন সময় নীল আকাশ চিরে বাবুইপাখির মতো সহসা নেমে এল সেই ছুরি। তীরের মতো গিয়ে বিঁধল সৎ-মার বুকে।

তখন সেই ধার্মিক লোকেরা বসল হাঁটু মুড়ে। প্রাণের ভক্তি উজাড় করে প্রার্থনা করতে লাগল। জয় হোক্ ঈশ্বরের ন্যায়-বিধান!

তারপব সেই বৃদ্ধ এল আয়োনুশ্কার কাছে। নিয়ে গেল তাকে এক আশ্রমে।

অনেক দূরে কেরজেনেৎস নদীর ধারে সেই আশ্রম — অনেক দূরে যেখানে আছে রূপকথার শহর কিতেজ...*

পরদিন সকালে আমার যখন ঘুম ভাঙল তখন আমার সর্বাঙ্গে লাল লাল গুটি বেরিয়েছে। এটা ছিল বসন্তরোগের আক্রমণের সূচনা। বাড়ির পিছন দিকে চিলেকোঠার একটা ঘরে আমার জন্যে স্থান নির্দিষ্ট হল। বহুদিন আমাকে থাকতে হল সেই ঘরে। চোখ বন্ধ, হাতপায়ে চওড়া চওড়া ব্যান্ডেজ বাঁধা — এই অবস্থায় ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিন কাটল আমার। একদিন এক দুঃস্বপ্ন দেখে প্রায় মরতে বসেছিলাম আর কি। বাইরের লোকের মধ্যে শুধু দিদিমাই আসতেন, চামচ দিয়ে শিশুর মতো খাইয়ে দিতেন আমাকে। অজস্র গল্প রূপকথা বলতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় একটা কান্ড ঘটল; তখন আমি অনেকটা সেরে উঠেছি, আমার হাতপায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে—শুধু দুই হাতে দস্তানা পরিয়ে রাখা হয়েছে যাতে আমি মুখ চুলকোতে না পারি। সেদিন নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাবার পরেও দিদিমা এলেন না। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার মনে হতে লাগল, চিলেকোঠা থেকে নামবার সিঁড়ির মুখেই ধুলোভর্তি জায়গাটায় দিদিমা মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। দুই হাত দু-দিকে ছড়ানো আর ঘাড়ের কাছে প্রকান্ড একটা হাঁ-করা ক্ষতচিহ্ন—পিওতর-কাকার বেলায় যেমনটি দেখেছিলাম। আর ধুলো ও নোংরা কোণ থেকে প্রকান্ড একটা বেড়াল গুটি গুটি বেরিয়ে এসে মস্ত সবুজ চোখদুটো পাকিয়ে, লোভীর মতো কটকট করে তাকিয়ে আছে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পা ও কাঁধের গুঁতোয় দু-দিকে শার্সি দেওয়া জানলার কাঁচ আমি গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙে ফেললাম। বাইরের দিকে জানলার ঠিক নিচেই বরফ জমেছিল, ছিট্‌কে তারই মধ্যে এসে পড়লাম আমি। সেদিন সন্ধ্যায় আমার মা অতিথি-আপ্যায়নের কাজে ব্যস্ত ছিল, সেই সোরগোলে কেউ কাঁচভাঙার শব্দ শুনতে পেল না। এইভাবে সকলের অলক্ষ্যে বেশ কিছুক্ষণ আমি পড়ে রইলাম সেই বরফের মধ্যে। আমার হাড় ভাঙেনি, শুধু কাঁধের হাড় সরে গিয়েছিল আর সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল

* তামবোভ প্রদেশের বরিসগ্লেবস্ক জেলায় কলুপানোভকা গ্রামে থাকবার সময়ে আমি এই গল্পটিরই রূপান্তর শুনেছি। রূপান্তরিত গল্পে ছেলে সৎ-মায়ের কুৎসা করছে আর ছুরিটা এসে খুন করছে ছেলেকে। — গোর্কি

ভাঙা কাঁচে। কিন্তু আমার পা সাময়িকভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। তিনমাস আমি হাঁটতে পারিনি। নিজের ঘরটিতে চুপচাপ শুয়ে থেকে শুনতাম—বাড়ির মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র কলরব চলেছে, ঠাস-ঠাস শব্দে দরজা বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে, মানুষজন অনবরত যাতায়াত করছে।

ছাদের ওপর দিয়ে তুষারঝড় বয়ে যেত, গোঁ গোঁ শব্দে বাতাস আছড়ে পড়ত চিলেকোঠার ছাদে। চিমনির মধ্যে ভীত মড়াকান্নার মতো বাতাসের শোঁসানি, আগুনের চিম্‌নির খড়খড়িতে হত বাতাসের খট্ খট্ আওয়াজ। আর শুনতাম, দিনের বেলায় কাকের কা-কা ডাক, নিস্তব্ধ রাত্রিতে দূরের মাঠে নেকড়ের ক্রুদ্ধ হুংকার।

এই বিচিত্র ঐকতানের মধ্যে আমার আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ করল। তারপরেই কুণ্ঠিতপদে, নিঃশব্দসঞ্চারে এবং ক্রমবর্ধমান প্রগল্‌ভতার সঙ্গে এল বসন্ত। ঝলমলে চোখ মেলে তাকাল আমার ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে। শুরু হল বেড়ালের চিৎকার আর ডাকাডাকি। দেওয়ালের ওপার থেকে ভেসে আসতে লাগল বসন্তদিনের নানা শব্দ: তুষারকণাগুলো সহসা গলে গিয়ে মাটিতে খসে খসে পড়ে, ছাদের ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে বরফ, আর ঘণ্টা বাজতে থাকে এমন একটা ভরাট আওয়াজ তুলে যা শীতকালে কখনো শোনা যায় না।

দিদিমা আসেন আমাকে দেখতে। আজকাল দিদিমার মুখ থেকে যখন-তখন ভদ্‌কার গন্ধ বেরোয় এবং সেই গন্ধের উগ্রতাও ক্রমশ বাড়ে। এমন কি, শেষ দিকে আমার ঘরে আসবার সময় তিনি প্রকাণ্ড একটা সাদা চায়ের পাত্রও নিয়ে আসতে শুরু করেছেন। পাত্রটাকে তিনি আমার বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখেন এবং আমাকে চোখ টিপে বলেন:

'সোনা আমার, মাণিক আমার, তোর ওই পিশাচ দাদামশাইকে যেন বলে দিস্‌নে!'

'দিদিমা, তুমি এত মদ খাও কেন?'

'চুপ, চুপ! বড়ো হলে তুই নিজেই বুঝতে পারবি, কেন খাই।'

তারপরেই তিনি চায়ের পাত্রের নলটা মুখে ঢুকিয়ে এক ঢোঁক গিলে নেন, জামার আস্তিন দিয়ে মুখ মোছেন, এবং প্রাণখোলা হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন:

'মাণিক আমার, সোনা আমার, বলো শুনি কাল তোমাকে কোন্ কথাটা বলছিলাম!'

'আমার বাবার কথা।'

'কোন্ পর্যন্ত বলেছিলাম?'

কোন্ পর্যন্ত বলা হয়েছে বলতেই গানের সুরের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মুখ থেকে কথা বেরিয়ে আসে।

একদিন ভারি ক্লান্ত ও মনমরা হয়ে এবং মদ না খেয়েই দিদিমা আমার ঘরে এসেছিলেন; সেদিন নিজের থেকেই বলতে শুরু করেছিলেন বাবার কথা।

'শোন্ দাদু, কাল রাত্রে তোর বাবাকে স্বপ্নে দেখেছি। হেজেলগাছের একটা ডাল হাতে নিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে তোর বাবা যেন হেঁটে যাচ্ছিল। জিভটাকে ঝুলিয়ে হ্যা-হ্যা করতে করতে একটা কুকুর ছুটছিল তার পিছনে। জানিস্ দাদু, আজকাল কেন জানি মাক্সিম সাভাতেয়েভিচকে আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখি — মনে হয় ওর আত্মা শান্তি পায়নি, এই আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে...'

তারপরেই পর-পর কয়েক সন্ধ্যা ধরে দিদিমা আমার কাছে বাবার গল্প করেছেন। দিদিমার মুখে শোনা অন্য সব গল্পের মতোই বাবার গল্পও সমান কৌতূহলোদ্দীপক। আমার বাবা ছিলেন এক সৈনিকের ছেলে। আমার ঠাকুর্দা সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করে পরে অফিসার হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের অপরাধে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। সাইবেরিয়ায় আমার বাবার জন্ম হয়। বাবার ছেলেবেলাটা ছিল খুবই কষ্টের এবং বাচ্চা বয়সেই তিনি বারকয়েক বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। একবার এমনি পালিয়ে যাবার পরে আমার ঠাকুর্দা শিকারী কুকুর নিয়ে ঠিক খরগোশ-খোঁজার মতো আমার বাবাকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। আরেকবার এমনি পালিয়ে যাবার পরে বাবাকে ধরে এনে ঠাকুর্দা এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগলেন যে পাড়াপড়শীরা এসে বাবাকে উদ্ধার করে এবং লুকিয়ে রেখে দেয়

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ছোটদের মারপিট করাটা সবকালেই ছিল, না দিদিমা?'

দিদিমা সহজভাবেই জবাব দিলেন, 'ছিল বৈকি।'

বাবার খুব ছোট বয়সে তার মা মারা গেছেন আর বাবার যখন নয় বছর বয়স তখন তার বাপ মারা যান। বাবার ধর্মবাপ পোষ্যপুত্র নেন বাবাকে। বাবার ধর্মবাপ ছিলেন ছুতোরমিস্ত্রী এবং বাবাকে তিনি পের্ম শহরের ছুতোরমিস্ত্রী-দলে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু আমার বাবা পালিয়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে। প্রথমে কিছুদিন তাঁর জীবিকা ছিল অন্ধদের হাত ধরে রাস্তায়-বাজারে পথ

দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া। তারপর ষোল বছর বয়সে তিনি এলেন নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদে। সেখানে কলচিনের স্টীমবোটে ছুতোরমিস্ত্রীর একটি কাজ পেলেন তিনি। বছর কুড়ি যখন তাঁর বয়স তখন তিনি নিজেই একজন পাকা ছুতোরমিস্ত্রী এবং কামরার আভ্যন্তরিক সাজসজ্জা-অভিজ্ঞ। যে কারখানায় তিনি কাজ করতেন সেটি ছিল কোভালিহা স্ট্রীটের আমার দাদামশাইয়ের বাড়ির ঠিক পাশেই।

দিদিমা হাসতে হাসতে বললেন, 'বেড়াটা ছিল খুবই নিচু আর এমন লোক আছে যারা বেড়ার আড়াল মানে না। ব্যাপার হল কী জানিস, একদিন ভারিয়া আর আমি বাগানে ঘুরে ঘুরে র‍্যাস্‌প্‌বেরি ফল তুলছি এমন সময় হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই ধুপ্‌ করে এক লাফ দিয়ে তোর বাবা বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে আমাদের বাগানের মধ্যে হাজির। আমি তো হতভম্ব! ওমা, মানুষটা দেখি আপেলগাছের ফাঁক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের দিকেই আসে! লম্বাচওড়া দৈত্যের মতো চেহারা, পরনে সাদা শার্ট ও ভেল্‌ভেটের ট্রাউজার। তবু খালি পা, খালি মাথা। চামড়ার একটা ফিতে দিয়ে মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মানুষটা কেন এসেছিল জানিস? তোর মা'কে বিয়ে করবার কথা বলতে! আগেও কয়েকবার ওকে জানলার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি। যতোবার চোখ পড়েছে, মনে মনে ভেবেছি—বাঃ, ভারি চমৎকার লোকটি কিন্তু! তারপর মানুষটা যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন বলি—বাপুহে, সোজা রাস্তায় না গিয়ে এমন বাঁকা রাস্তা ধরেছ কেন? — শুনে সে আমার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে বলে—"আকুলিনা ইভানোভনা, আমি তোমার পায়েই নিজেকে সঁপে দিচ্ছি। একবারটি মুখ তুলে তাকাও। একবার তাকিয়ে দেখো আমার দিকে আর ভারিয়ার দিকে। যীশু খ্রীষ্টের দোহাই, আমাদের দু'জনের যাতে বিয়ে হয় সেই ব্যবস্থা করো তুমি!" বোঝ্‌ একবার ব্যাপারটা। কথা বলব কি, থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওদিকে তাকিয়ে দেখি—মাগো মা, তোর মা হতচ্ছাড়ী একটা আপেলগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ইঙ্গিতে মানুষটাকে কি যেন বলছে। দু-চোখ টলটল করছে জলে আর মুখটা ঠিক র‍্যাস্‌পবেরি ফলের মতো টকটকে লাল। আমি বলি -- তোমাদের দু'জনেরই এখনো খুব কাঁচা বুদ্ধি -- তাই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারনি। কিন্তু এ-ধরনের কিছু করার চেয়ে শুকিয়ে মরে যাওয়া ভালো। আর ভারভারা, তোকেও বলিহারি যাই, তুইও কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে খুইয়েছিস? আর শোনো

বাপু, তোমাকেও বলি, তুমি যে কত বড়ো গর্হিত কাজ করেছ তা বুঝতে পারছ না। তুমি কি তার সমান মর্যাদার লোক? -- যে সময়ের কথা বলছি তখন তোর দাদামশাই রীতিমতো পয়সাওলা লোক। তখনো ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়নি, চার-চারটে বাড়ি ও অগাধ টাকাপয়সার মালিক সে এবং একজন গণ্যমান্য লোক। এই ঘটনার কিছুদিন আগেই সবাই মিলে তোর দাদামশাইকে জরি ও ফিতের কাজ করা টুপি আর উনিফর্ম উপহার দিয়েছিল। তোর দাদামশাই একটানা ন-বছর কারিগরদের প্রধান কর্মকর্তা থেকেছেন কিনা তাই। সে-সব কী দিনই গেছে—তোর দাদামশাইয়ের অহংকার কি তখন! এই অবস্থায় আমি আর কী করি বল্? যেটুকু আমার না বললে চলে না তাই বলি ওদের। ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করছিল। আর ওরা দু'জনে এত মুষড়ে পড়েছিল যে ভারি করুণা হচ্ছিল ওদের দেখে। আমার কথা শুনে তোর বাবা দাঁড়িয়ে বলে — "ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে আমি যতোদূর জানি, তিনি কিছুতেই নিজের ইচ্ছায় তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। সুতরাং এই অবস্থায় ভারিয়াকে চুরি করে নিয়ে আমার পালিয়ে যেতেই হবে। আর পালিয়ে যাবার ব্যাপারেই আমরা দু'জনে তোমার সাহায্য চাই।" শোন্ একবার কথাটা! আমার নিজের মেয়েকে আমি চুরি করে পালিয়ে যেতে সাহায্য করব! মানুষটাকে আমি ভাগিয়ে দিতে চাইলাম—এমন কি হাত নাড়িয়ে শাসালাম -- তবু সে সরে যায় না, বলে -- "ইচ্ছা হয় তো তুমি ঢিল তুলে নিয়ে আমার গায়ে ছুঁড়ে মারতে পারো—কিন্তু এ-ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতেই হবে। তোমার সাহায্য না নিয়ে আমি এখান থেকে কিছুতেই নড়ব না।" এমন সময়ে ভারভারা এগিয়ে আসে, মানুষটার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে —"শোনো মা, আমরা অনেক দিন থেকেই স্বামী-স্ত্রী হয়ে আছি। বলতে গেলে গত মে মাস থেকে। এখন শুধু আমাদের বিয়েটা হওয়া দরকার।" কথাগুলো শুনে আমার একেবারে বসে পড়বার মতো অবস্থা। কী কাণ্ড, মাগো!'

হাসির দমকে দিদিমার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল। তারপর একটিপ নস্যি নিয়ে, চোখ থেকে জল মুছে, আরামের নিশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন:

'তুই এখনো খুবই ছোট, দু'জনে স্বামী-স্ত্রী হওয়া আর দু'জনের বিয়ে হওয়া—এ-দুটোর মধ্যে যে কি তফাৎ তা তুই এখনো বুঝতে পারবিনে। কিন্তু কোনো মেয়ের বিয়ে হবার আগেই যদি বাচ্চা হয় তবে তার চেয়ে কলঙ্ক আর

কিছু নেই। আমার এই কথাটা বড়ো হয়েও মনে রাখিস কিন্তু। কক্ষণো কোনো মেয়েকে লোভ দেখিয়ে এ-ধরনের বিপদের মধ্যে ফেলিসনে যেন। কোনো মেয়েকে এই ধরনের বিপদের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যাওয়া আর আইনের চোখে বাচ্চাকে জারজ হতে দেওয়া — এর চেয়ে বড়ো পাপ আর কিছু নেই। তাহলে আমার কথাটা মনে থাকবে তো? মনে রাখিস কিন্তু! স্ত্রীলোককে সব সময়ে দরদ ও প্রীতির চোখে দেখবি, স্ত্রীলোককে ভালোবাসবি সমস্ত মন দিয়ে, শুধু খানিকটা আমোদ করবার জন্যে নয়। আমার এই কথাগুলো ফেল্না মনে করিসনে যেন।'

কথাগুলো বলে দিদিমা কিছুক্ষণের জন্যে নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে চুপ করে রইলেন, তারপর এক সময়ে গা ঝাড়া দিয়ে এগিয়ে চললেন গল্পের সূত্র ধরে।

'শোন্ তারপর। আমি তো ব্যাপারটার কোনো কুলকিনারাই পেলাম না। মাক্সিমের মাথায় একটা চাটি মারলাম, ভারভারার চুলের ঝুঁটি ধরে টানলাম। কিন্তু ওসব করে তখন আর লাভ কি? তোর বাবাই বলে—"আমাদের মারধোর করে তো কোনো ফল হবে না।" তোর মাও তার প্রতিধ্বনি করে— "তার চেয়ে কিছু একটা উপায় ভাবা দরকার। মারধোরের সময় তো অনেক পড়ে আছে।" তখন আমি বলি—তা, টাকাপয়সা কিছু আছে তো? সে বলে—"ছিল। কিন্তু ভারিয়ার জন্যে একটা আংটি কিনে সব খরচ হয়ে গেছে।" তাহলে কি তোমার তিন রুব্‌লই ছিল? সে বলে—"তিন রুব্‌ল নয়। প্রায় একশো।" যে সময়ের কথা বলছি তখন জিনিসপত্রের দাম শস্তা. টাকাটাই ছিল মাগ্‌গি। তোর মা ও বাবার মুখের দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম। দু'জনেই একেবারে ছেলেমানুষ! দু'জনেই একেবারে বোকা! তোর মা বলে--"আংটিটা আমি মেঝের পাটাতনের তলায় রেখে দিয়েছি যাতে তোমার চোখে না পড়ে। আংটিটা বিক্রি করলেই তো টাকা আসে।" এমনি সব কথা। এক্কেবারে ছেলেমানুষ—তাই মনে হচ্ছে না তোর? যাই হোক্, তিনজনে মিলে ঠিক করলাম যে সেই সপ্তাহের মধ্যেই বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে আর আমিই গিয়ে পাদ্‌রির সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিকঠাক করে আসব। কথাবার্তা হল বটে কিন্তু দু-চোখ ফেটে কান্না আসছিল আমার। তোর দাদামশাইয়ের ভয়ে বুকের ভিতরটা কাঁপছিল আর ধুকপুক করছিল। আর ভারভারারও ভয়ংকর অবস্থা। যাই হোক্, সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করলাম আমরা।

কিন্তু তোর বাবার একজন শত্রু ছিল—তোর দাদামশাইয়ের কারখানার এক সর্দার কারিগর। ভীষণ হিংসুটে লোকটা। অনেকদিন থেকেই লোকটা আমাদের ওপর চোখ রেখে সমস্ত ব্যাপারটাই টের পেয়েছিল। তারপর বিয়ের দিন তো এল। বুঝতেই পারছিস, আমার একমাত্র মেয়ে, সুতরাং আমার কাছে সবচেয়ে ভালো পোশাক যা কিছু ছিল তাই দিয়ে তাকে সাজালাম, তারপর হাত ধরে গেটের বাইরে নিয়ে এলাম তাকে। বাইরে রাস্তায় একটা ত্রয়কা অপেক্ষা করছিল; ভারভারা গিয়ে গাড়িতে ওঠে, মাক্সিম শিস দেয়—আর তারপরেই দু'জনকেই নিয়ে গাড়ি চলল। চোখের জল চাপতে চাপতে আমি তো বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই কার সঙ্গে দেখা হল জানিস? সেই শয়তানটার সঙ্গে। আমার কাছে এসে সে বলে — "আমার মনে কোনো বদ মতলবও নেই বা আমি কারও সুখের কাঁটাও হতে চাই না। আকুলিনা ইভানোভনা, আমার দাবি খুবই সামান্য, মাত্র পঞ্চাশটা রুবল আমাকে দিতে হবে। তাহলেই আমি আর কোনো বাদ সাধব না।" আমার হাতে তখন একটি টাকাও ছিল না। টাকার জন্যে আমার যেমন আকাংক্ষাও নেই, তেমনি টাকা হাতে থাকলেও জমিয়ে রাখতে পছন্দ করিনে। সুতরাং তার কথার জবাবে বোকার মতো আমি বলে বসি—আমার হাতে কিছু নেই, কাজেই তোমাকে আমি একটি পয়সাও দিতে পারব না। সে বলে—"তাহলে তুমি আমাকে কথা দাও যে পরে দেবে, তাহলেই হবে।" আমি বলি—কথা দেওয়া? কথা দিলেই বা কি, টাকা আসবে কোত্থেকে? সে বলে—"বড়োলোক স্বামীর পুঁজি থেকে পঞ্চাশটা রুবল সরিয়ে নেওয়া কি খুবই শক্ত কাজ?" আমি কী বোকা, আমার দরকার ছিল তার সঙ্গে কথা বলা, তাকে সেখানে থামানো, আর আমি তার বদলে তার মুখে থুথু ফেলে বাড়ি এসেছিলাম। কিন্তু আমার আগেই সে গিয়ে ঢুকল বাড়ির মধ্যে। তারপরেই সে কী হৈচৈ আর সোরগোল!'

দিদিমা চোখ বুজে রইলেন। অস্পষ্ট একটু হাসি তাঁর মুখের ওপরে খেলা করতে লাগল।

'সে দৃশ্য কল্পনা করে আজও আমার বুক কেঁপে ওঠে। সে যে কী এক এলোপাতাড়ি কান্ড! পাগলা বুনো জানোয়ারের মতো হুংকার দিয়ে ওঠে তোর দাদামশাই। তার পক্ষে এ আঘাত সহ্য করা সত্যিই খুব কষ্টের ব্যাপার ছিল। কতদিন ভারভারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জাঁক করে বলেছে যে মস্ত এক উঁচু ঘরে মস্ত বড়োলোকের সঙ্গে ভারভারার বিয়ে দেবে। শেষকালে এই

কিনা সেই উ'চু ঘর, এই সেই বড়োলোক! তবে কি জানিস, যে যাই ভাবুক না কেন, পুণ্যময়ী মেরীমাতা যার সঙ্গে যার জোট বে'ধে রেখেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু হবার উপায় নেই, তারপর তোর দাদামশাই উঠোনময় দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল—যেন সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে। ডাকাডাকি করে জড়ো করল সবাইকে। ইয়াকভ, মিখাইল, কোচ্‌মান ক্লিম, আর সেই সারামুখে ফুটফুট দাগওলা সর্দারকারিগর লোকটা—সবাই এল তৈরি হয়ে। দেখলাম, দাদামশাইয়ের হাতে রয়েছে একটা লাঠি আর ভারি ওজন ঝোলানো চামড়ার ফিতে। মিখাইলের হাতে বন্দুক! আমাদের ঘোড়াগুলো ছিল খুবই ভালো আর তেজী, আমাদের গাড়িটাও ছিল খুব হাল্‌কা ধরনের। মনে মনে আমি ভাবি—ওরা নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবে। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে যায়; ভারভারার ভার রয়েছে যে দেবদূতের ওপর তাঁরই দয়াতে এই বুদ্ধি এসেছিল। আমি করলাম কি, একটা ছুরি নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম কেটে দিয়ে এলাম। আমার ধারণা ছিল, এইভাবে লাগাম কেটে দিলে জোয়াল চলতে চলতে ছি'ড়ে যাবে আর গাড়ি অচল হয়ে যাবে। আর শেষ পর্যন্ত হলও তাই। গাড়ির জোয়াল আল্‌গা হয়ে খসে পড়ল এবং এই দুর্ঘটনায় প্রায় মরতে বসেছিল তোর দাদামশাই, মিখাইল ও ক্লিম। কাজে কাজেই রাস্তায় তাদের অনেকটা দেরি হয়ে গেল। আর ভগবানের অশেষ দয়া, তারা যখন শেষ পর্যন্ত গির্জায় পে'ৗছল তার আগেই মাক্সিম ও ভারিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে।

আমাদের বাড়ির লোকরা অত সহজে ছাড়বে কেন। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাক্সিমের ওপর। কিন্তু মাক্সিমও কম যায় না, লম্বাচওড়া চেহারা তার, গায়ের জোরে খুব কম লোকেই তার সঙ্গে এ'টে উঠতে পারে। মিখাইলকে সে ধাপের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়; পড়ে গিয়ে একটা হাত জখম হয় তার। আর ক্লিম তো একটা ঘুষি খেয়েই চিৎপটাং। ব্যাপার দেখে তোর দাদামশাই, ইয়াকভ আর সেই সর্দার-কারিগর ভয়েই আর কাছে এগোয় না।

কিন্তু মাক্সিম রাগলেও মাথা গরম করে না। রাগকে সে ঘেন্না করে। তোর দাদামশাইকে সে বলে—"তোমার হাতের ওই লাঠিটা রেখে দাও। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাকে যেটুকু দিয়েছেন তাই আমি নিয়েছি। এখন কোনো মানুষের সাধ্য নেই ঈশ্বরের এই দানকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। তোমার কাছ থেকেও আমি শুধু এইটুকুই চাইছি!" তারপর আমাদের বাড়ির লোকরা ফিরে আসে। গাড়িতে বসে তোর দাদামশাই চিৎকার করে বলে—"ভারভারা, জন্মের মতো বিদায় দিলাম

তোকে। তুই আর আমার মেয়ে বলে পরিচয় দিস্‌নে। আমি আর তোর মুখদর্শন করতে চাই না! তুই মরিস, বাঁচিস, আমার আর কিচ্ছু এসে যায় না তাতে!" বাড়ি ফিরে এসে তোর দাদামশাই আমাকে খুব একচোট গালাগালি দিল আর মারল কিন্তু আমি মাঝে মাঝে উঁ-আঁ করা ছাড়া মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করলাম। আমি জানতাম প্রথম চোটটা কেটে গেলেই সব শান্ত হয়ে যাবে এবং যা হবার তা হবেই। তারপর তোর দাদামশাই আমাকে শাসিয়ে রাখে—"শোনো, আকুলিনা, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার মেয়ের সঙ্গে এ-বাড়ির সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে গেছে একথাটি যেন কক্ষণো ভুলে যেও না। মনে করবে, তোমার কোনো মেয়ে নেই — এখানেও নেই, অন্য কোথাও নেই। বুঝেছ তো?" আমি তবু মনে মনে বলি—তোমার ওই লালচুলওলা মাথা নেড়ে যতোই বলো না কেন বাপু, আমি চিনি—রাগ পড়ে গেলে এসব কথা আর কিচ্ছু মনে থাকবে না।'

রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি দিদিমার গল্প শুনছিলাম। দিদিমার গল্পের কোনো কোনো অংশ শুনে আমি অবাক হয়েছি। আমার মা'র বিয়ে সম্পর্কে দাদামশাইয়ের মুখে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বর্ণনা শুনেছি আমি। দাদামশাই বলেছেন যে তিনি মা'র এই বিয়ের বিরোধী ছিলেন এবং বিয়ের পরে মা'কে আর নিজের বাড়িতে ঢুকতে দেননি। কিন্তু দাদামশাইয়ের বর্ণনা অনুসারে, মা'র বিয়ে এভাবে গোপনে হয়নি এবং বিয়েতে দাদামশাই নিজেও উপস্থিত ছিলেন। দিদিমাকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, মা'র বিয়ে সম্পর্কে দু'জনের দু-ধরনের বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টা সত্যি, কিন্তু আমার কেমন বাধো-বাধো ঠেকল। তাছাড়া দিদিমার বর্ণনাটাই আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে কারণ দিদিমার গল্পটাই অনেক বেশি চমকপ্রদ। দিদিমা গল্প বলেন দুলে দুলে যেন নৌকায় ভেসে; গল্পের যে-সব অংশ করুণ বা ভয়ংকর সেই সব জায়গা বলবার সময় তাঁর শরীরের এই দুলুনি আরো বেড়ে যায়। একটা হাতে কি যেন তুলে ধরেছেন। চোখ বুজে থাকেন সব সময়েই, ঘন ভুরুদুটো কাঁপতে থাকে আর তাঁর গালে ফুটে ওঠে নিবিড় এক হাসির রেখা। জগতের সবকিছুর প্রতি তাঁর এক অন্ধ ক্ষমা আছে যা দেখে আমি প্রায়ই অভিভূত হই—কিন্তু একেক সময়ে ইচ্ছে হয়, দিদিমা যেন প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠেন।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। প্রথম সপ্তাহ দুয়েক আমি কোনো খোঁজখবরই পেলাম না, ভারিয়া আর মাক্সিম কোথায় আছে। তারপর ওরা বাচ্চা একটা

ছেলেকে দিয়ে আমাকে খবর পাঠাল। পরের শনিবার আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম যেন গির্জার সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগ দিতে চলেছি। কিন্তু তার বদলে সোজা গিয়ে হাজির হলাম ওদের বাড়িতে। অনেক দূরে চলে গেছে ওরা। সুয়েতিনস্কি স্ট্রীটের এক বাড়ির একটা অংশে থাকে। কারখানার কুলিমজুর এবং নানা ধরনের লোক রয়েছে এই বাড়িতে। নোংরা বাড়ি আর হৈ-হট্টগোল লেগেই আছে। কিন্তু ওদের দু'জনের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—দুটি বেড়ালছানার মতো মনের খুশিতে ঘড়ঘড় আওয়াজ করে একসঙ্গে খেলা করছে। আমি ওদের জন্যে কয়েকটা জিনিস এনেছিলাম—চা, চিনি, কিছু ফসলদানা, জ্যাম্, শুকনো ব্যাঙের ছাতা, আর কিছু টাকাপয়সা। টাকাপয়সা ঠিক কত তা আমার মনে নেই, তোর দাদামশাইয়ের থলে থেকে যা পেরেছি চুরি করে এনেছি। নিজের জন্যে যদি না হয় তাহলে আর চুরি করতে দোষ কি! কিন্তু তোর বাবা তো এসব জিনিস কিছুতেই নিতে চায় না, ক্ষুব্ধস্বরে বলে—"আমরা কি ভিখিরি নাকি?" ভারিয়াও স্বামীর সুরে সুর মেলায়—"মা, আপনি আবার এতসব জিনিস আনতে গেছেন কেন?" কিন্তু এসব বললে কি হবে, জিনিসগুলো আমি ঠিকই দিয়ে এসেছিলাম। মাক্সিমকে আমি বলি—হ্যাঁ রে বোকা, ভগবান সাক্ষী করে তুই আমাকে মা বলে মেনে নিয়েছিস না? আর এই বোকা মেয়েটা! তোকে বলি, তুই আমার পেটের মেয়ে নোস্? নিজেদের মা'কে অপমান করলে তোদের ভালো হবে—এ-শিক্ষা তোদের কোত্থেকে হয়েছে? পৃথিবীর মা'কে অপমান করলে স্বর্গের মা চোখের জল ফেলেন যে! আমার কথা শুনে মাক্সিম করে কী, দু-হাতে আমাকে জাপ্টে ধরে ঘরের মধ্যে নাচানাচি শুরু করে দেয়, এমন কি খানিকক্ষণ নাচে আমার সঙ্গে। ভাল্লুকের মতো জোর লোকটার গায়ে। আর ভারিয়ার তো যেন মাটিতে পা পড়ে না। স্বামীর দেমাকে ময়ূরের মতো পেখম তুলে হেঁটে বেড়ায়। তারপর এমন ভারিক্কী চালে নিজের "সংসারের" কথা বলতে শুরু করে যেন সত্যিকারের গিন্নী সে—শুনতে শুনতে আমার তো পেটে খিল ধরবার মতো অবস্থা! ওদিকে চায়ের সঙ্গে যে "ভাত্রুশ্কা"গুলি খেলাম, তা চিবোতে হলে মানুষ তো কোন্ ছার নেকড়ের দাঁতও ভেঙে যায়! আর ঘরেতৈরি পনির বলে যে-জিনিসটা দেওয়া হল তা ঠিক যেন বালি আর কাঁকরের মণ্ডা!

এইভাবেই কাটল অনেক দিন। তুই তখন মায়ের পেটে কিন্তু তবুও তোর দাদামশাই টুঁ শব্দটি করেন না। ভারি একগুঁয়ে এই বুড়ো, পিশাচ! বুড়ো

টের পেত, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। কিন্তু এমন ভাব করত যেন কিছু জানে না। বাড়িতে ভারভারার নাম পর্যন্ত মুখে আনতে পারত না কেউ। কেউ মুখে আনতও না, আমিও না। কিন্তু আমি জানতাম, হাজার হলেও বাপের হৃদয় তো — একদিন না একদিন টলবেই। এবং টললও শেষ পর্যন্ত। একদিন রাত্রে প্রচণ্ড তুষারঝড় হচ্ছে, একপাল ভালুকের মতো জানলাগুলোকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চাইছে বাতাস, গোঁ গোঁ আর্তনাদ করছে চিমনিগুলো, নরকের শয়তানগুলো যেন নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর ওপরে—তোর দাদামশাই আর আমি পাশাপাশি শুয়ে আছি, কারও চোখে ঘুম নেই, হঠাৎ আমি বলে ফেলি — "কী ভয়ংকর রাত গো! গরীব মানুষগুলোর আজ বড়ো হেনস্তা। বিশেষ করে যাদের মনে শান্তি নেই, তাদের আরো কষ্ট!" আমার কথা শুনে তোর দাদামশাই আচমকা জিজ্ঞেস করে বসে — "ওরা কেমন আছে?" আমি বলি — ভালোই আছে। তোর দাদামশাই বলে — "চট্ করে যে জবাব দিলে, কাদের কথা জিজ্ঞেস করছি বলো তো?" আমাদের মেয়ে ভারভারা আর জামাই মাক্সিমের কথা। "কী করে বুঝলে যে ওদের কথাই জিজ্ঞেস করছি?" আমি বলি — হয়েছে গো, হয়েছে! আর কথা ঘুরোতে হবে না! এসব ভড়ং করে লাভ কি — এতে কারও কি শান্তি হচ্ছে? গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে তোর দাদামশাই বলে — "ও রে, শয়তানের দল! হুঃ, কী সব মানুষ!" তারপরে জিজ্ঞেস করে — "তা সেই গবেট্‌টার খবর কী? ওটা একেবারেই গবেট — না?" গবেট কাকে বলছে বুঝলি তো? তোর বাবাকে। আমি বলি — আসল গবেট কারা জান? যারা নিজেরা খেটে খায় না, অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকে। তোমার দুই ছেলে ইয়াকভ আর মিখাইলের কথা ভেবে দেখ তো! গবেট যদি বলতে হয় তো ওদেরই বলা উচিত। এ-বাড়িতে খেটে পয়সা আনছে কে? তুমি। আর ওরা কুটোটি নেড়েও তোমাকে সাহায্য করে না! আমার কথা শুনে তোর দাদামশাই যা মুখে আসে তাই বলে আমাকে গালাগালি করতে শুরু করে। বলে, আমি বোকা, আমি কুঁদুলে, আমি ডাইনী, আরো কত কি তা আমার মনে নেই। আমি একটিও কথা বলি না। তোর দাদামশাই বলে — "তোমাকেও বলিহারি! লোকটা কোত্থেকে এল, কী ধরনের লোক — কিছু জানা নেই, শোনা নেই, তবুও তার পেছনে কি করে তোমার সায় থাকে বুঝি না!" তবুও আমি চুপ করে থাকি। শেষকালে মনের সমস্ত ঝাল ঝেড়ে তোর দাদামশাই যখন শান্ত হয়, তখন আমি বলি — তুমি তো একবার গেলেও পার। নিজের চোখেই

দেখে আসতে পার, দু'জনে কেমন চমৎকারটি আছে। তোর দাদামশাই বলে — "বটে! ওদের অহঙ্কার তো কম নয় যে আমি যাব ওদের কাছে! কেন, ওরা আসতে পারে না?" বাস্, যেই না একথাটি বলা আমি তো একেবারে আনন্দে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করে দিই। আর তোর দাদামশাই আমার চুলের বিনুনিটা খুলতে শুরু করে — আমার চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে ভারি ভালোবাসত তোর দাদামশাই। আমার কান্না দেখে বলে — "হয়েছে গো হয়েছে! তুমি কি ভাব, আমার বুকটা পাথর দিয়ে তৈরি?" তখন তোর দাদামশাইয়ের মনটা খুবই ভালো ছিল রে। পরে এক সময়ে তার মাথায় ঢুকল যে তার মতো চালাক-চতুর আর কেউ নেই। তখন থেকেই তার মনটা ছোট হয়ে গেছে আর বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পেয়েছে।

তারপর আর কি, দু'জনে, অর্থাৎ তোর মা আর বাবা, একদিন এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। সেদিনটি ছিল "সর্বপাপক্ষয় রবিবার"। মস্ত মানুষ দু'জনেই — কী পরিচ্ছন্ন, কী শ্রীমন্ত! তোর দাদামশাইয়ের পাশে মাক্সিম যখন দাঁড়ায়, তোর দাদামশাই তার কাঁধের নিচে পড়ে থাকে। মাক্সিম বলে — "ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, মনে করো না আমি তোমার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক নেবার জন্যে এসেছি। সেই উদ্দেশ্যই আমার নেই। আমি এসেছি আমার সহধর্মিণীর পিতাকে শ্রদ্ধা জানাতে।" একথা শুনে তোর দাদামশাই খুব খুশি; হাসতে হাসতে বলে — "বটে! তোমার বজ্জাতিটা তো কম নয় দেখছি! ওসব চলবে না এখন! আর ওসব বাইরে বাইরে থাকাও নয়, আমার সঙ্গে এ বাড়িতে এসে থাকতে হবে।" ভুরু কুঁচকে মাক্সিম বলে — "ভারিয়া যা ঠিক করবে তাই হবে। আমার এ-বিষয়ে বলার কিছু নেই — ভারিয়ার ইচ্ছাই সব।" তখন শুরু হয়ে যায় তর্কাতর্কি — কিছুতেই দু'জনকে থামানো যায় না। আর তোর বাপও তেমনি, যতোই আমি চোখ টিপি, যতোই আমি টেবিলের নিচ দিয়ে পা দিয়ে ওর পা চেপে ধরি — সে গোঁ ধরে নিজের কথাই বলে চলে! তার চোখদুটো ছিল ভারি সুন্দর — পরিষ্কার আর খুসিতে ভরা দুটি চোখ; ঘন ভুরু। মাঝে মাঝে দু-চোখের ওপরে ভুরুদুটো টেনে নামিয়ে যখন তাকায়, তখন মুখটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। শুধু আমার কথাই শোনে তখন, আর কারও সাধ্য নেই সে-অবস্থায় তার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে। আমার নিজের পেটের ছেলেদের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসতাম ওকে। ও নিজেও সেকথা জানত আর আমাকেও তেমনি ভালোবাসত। দস্যুটা করত কী, আমাকে জড়িয়ে ধরে পাঁজাকোলা করে তুলে

নিত আর সেই অবস্থাতেই ঘরময় ঘুরত আর বলত — "তুমি হচ্ছ আমার সত্যিকারের মা — মাটি-মায়ের মতোই তুমি আমার মা! ভারভারাকে যতোটা না ভালোবাসি তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি তোমাকে!" দুষ্টুমিতে তোর মাও তখন কিছু কম যেত না। একথা শুনে মাক্সিমের দিকে ছুটে এসে সে রাগ দেখাত — "বটে! বটে! তোমার সাহস তো কম নয় হে কপি-কর্ণ, শালগমের ছা!" আর তারপরেই শুরু হত ঘরের মধ্যে একজনের পিছনে আরেকজনের ধাওয়া আর তিনজনের ছুটোছুটি। কী সব দিনই গেছে তখন, সোনা আমার, মাণিক আমার! আর নাচতে জানত বটে মাক্সিম! অমন নাচ আর কাউকে নাচতে দেখিনি। গানই বা জানত কত! কী চমৎকার সব গান — অন্ধ ভিখিরিদের কাছে শেখা কিনা, অন্ধ ভিখিরিরা যেমন গান গাইতে পারে তেমন আর কেউ পারে না।

তারপর, কী বলছিলাম। দু'জনে উঠে এল আমাদের বাড়ির বাগানের দিককার অংশে। সেখানেই একদিন ঠিক দুপুরবেলা তোর জন্ম হয়। দুপুরবেলা তোর বাবা খেতে আসে বাড়িতে। বাড়িতে এসে ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে তোর অভ্যর্থনা শুনে আহ্লাদে সে যে কী করবে ঠিক করতে পারে না। একেবারে অস্থির কান্ড! তোর মাও রেহাই পায় না। তোর মা'কে নিয়ে এমন রাখ্-রাখ্ ঢাক্-ঢাক্ শুরু করে দেয় যে মনে হতে থাকে, এ-জগতে বাচ্চা বিয়োবার মতো শক্ত কাজ আর কিছু নেই! তারপর আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হয় তোর দাদামশাইয়ের কাছে এবং তোর দাদামশাইকে বলে যে তার আরেকটি নাতি হয়েছে। কান্ড দেখে তোর দাদামশাইও না হেসে থাকতে পারে না, বলে — "তুমি তো আচ্ছা শয়তান হে মাক্সিম!"

কিন্তু তোর মামারা ওকে দেখতে পারত না। কারণ কী জানিস? ও মদ খায় না, ওর সঙ্গে কথায় কেউ এঁটে উঠতে পারে না, আর কত রকমের ফন্দিফিকির যে ওর মাথায় ঘোরে তার হদিস কেউ পায় না। এই ফন্দিফিকিরই ওর কাল হয়েছিল! একবার "লেণ্ট" উপবাসের সময় প্রচন্ড এক ঝোড়ো বাতাস উঠেছিল। হঠাৎ শোনা যায়, এক কানে-তালা-লাগানো অমানুষিক শিস্ দেওয়ার শব্দ উঠছে - গোটা বাড়িটা যেন কেঁপে ওঠে। সকলের সে কী ভয় আর আতঙ্ক! বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে বসেছিল। তোর দাদামশাই তো ছুটোছুটি লাগিয়ে দিলেন, আর্তস্বরে চিৎকার করে বললেন যে আইকনের নিচে সমস্ত আলো যেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আর সবাই যেন

প্রার্থনায় বসে। কিছুক্ষণ পরে, যেমন হঠাৎ শব্দটা উঠেছিল তেমনি হঠাৎ সব একেবারে চুপচাপ হয়ে যায়। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। এতে আগের চেয়েও আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল সকলে। তবে তোর ইয়াকভ-মামা কিন্তু ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল। সে বলল — "নিশ্চয়ই মাক্সিমের কাণ্ড এটা!" কথাটা মিথ্যে হয়নি। পরে মাক্সিমই আমাদের বলেছে, সেদিন সে চিলেকোঠার জানলায় এমনভাবে কতগুলো বোতল সাজিয়ে রেখেছিল যে বাতাসের ধাক্কায় বোতলগুলি থেকে শিস দেওয়ার মতো শব্দ হতে থাকে। শুনে তোর দাদামশাই মাক্সিমকে সাবধান করে দিয়ে বলে — "আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি মাক্সিম, বুঝেশুনে চলতে চেষ্টা কোরো, নইলে কোন্‌দিন এই ফন্দিফিকির করতে গিয়েই আবার না তোমাকে সাইবেরিয়ায় চালান হতে হয়!"

একবার এমন শীত পড়ল যে স্তেপ্‌অঞ্চল থেকে নেকড়েগুলো পর্যন্ত পালিয়ে আসে। তারপর থেকে এই নেকড়েগুলোর জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠে সবাই! কখনো কুকুর পাওয়া যায় না, কখনো ঘোড়া ভয় পায়, একবার দেখা যায় একজন মাতাল পাহারাওলার আধ-খাওয়া মরা শরীরটা পড়ে আছে। তোর বাবা করত কি, পায়ে স্কি এঁটে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যেত রাত্রিবেলা। কখনো খালি হাতে ফিরত না — দু-একটা নেকড়েকে শিকার করে আনত। নেকড়েগুলোর ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে ভিতরটা অন্য জিনিস দিয়ে ঠেসে কাঁচ বসিয়ে দিত দু-চোখে। দেখে বোঝাই যেত না যে সেগুলো জ্যান্ত নেকড়ে নয়। একদিন রাত্রে তোর মিখাইল-মামা পায়খানায় গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফিরে আসে। তখন তার এমন অবস্থা যে কথা বলবার ক্ষমতা নেই — চোখদুটো কপালে উঠেছে, মাথার চুল খাড়া হয়ে রয়েছে, নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে প্যাণ্টে জড়াজড়ি হয়ে ধপাস্‌ করে পড়ে যায় আর হাঁপাতে হাঁপাতে কোনো রকমে বলে — "নেকড়ে!" শুনে যে যা হাতের সামনে পায় তুলে নিয়ে ছুটে যায় বাইরের দিকে। গিয়ে দেখে, মিখাইলের কথাই সত্যি; একটি সিন্দুক থেকে নেকড়ের মাথাটা বেরিয়ে আছে। মাথাটাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয় ও লাঠির বাড়ি মারা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু না; মাথাটা নড়েচড়ে না, যেমনি ছিল তেমনি থাকে। তখন সকলে পা টিপে টিপে এগিয়ে উঁকি দিয়ে দ্যাখে। আর তখন বোঝা যায়, আসলে ওটা নেকড়েই নয়, শুধু একটা চামড়া; মাথার ভিতরটায় অন্য জিনিস ঠেসে দেওয়া হয়েছে আর সামনের ঠ্যাঙদুটোয়

পেরেক ঠুকে আট্‌কে দেওয়া হয়েছে সিন্দুকের সঙ্গে! এবারে এই কাণ্ডের জন্যে তোর দাদামশাই মাক্সিমের ওপরে মারাত্মক রকমের ক্ষেপে গেল। অমন চণ্ডালে রাগ আমি আর দেখিনি! কিছুদিন পরে মাক্সিমের এই সমস্ত ফন্দিফিকিরের দোসর হয় ইয়াকভ। হয়তো মাক্সিম একটা কার্ডবোর্ড কেটে মানুষের মাথা তৈরি করেছে, তার মধ্যে চোখ-নাক-মুখ এঁকে দিয়েছে রং দিয়ে, খানিকটা চটের ফেঁসো লাগিয়ে তৈরি হয়েছে চুল — তারপর দু'জনে মিলে বেরিয়ে এই কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটিকে লোকের বাড়ির জানলায় এঁটে দিয়ে আসে। স্বাভাবিকভাবেই পাড়াপড়শীরা ভয় পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে। মাঝে মাঝে দু'জনে চাদর মুড়ি দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। একবার তো এই মূর্তি দেখে একজন পাদ্‌রি ভীষণ ভয় পেয়ে যায় এবং ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে হাজির হয় একজন পাহারাওলার কাছে। পাহারাওলা আরো ভয় পেয়ে প্রাণপণে "বাঁচাও, বাঁচাও!" বলে চিৎকার করতে থাকে। দিনের পর দিন এমনি চলে, ফন্দিফিকিরের আর শেষ নেই। নিজেদের গোঁ ধরে চলে। লোকের পিছনে এভাবে না লাগতে আমি কতবার বলেছি, ভারিয়া বলেছে — কিন্তু কারও কথায় তারা কান দেয় না। বারণ করতে গেলে মাক্সিম হো-হো করে হাসে আর বলে, লোকে যখন না ভেবে না চিন্তে নিতান্তই একটা হাস্যকর কারণে বেসামাল হয়ে পড়ে তখন নাকি তার খুব মজা লাগে। তারপর কী করে তার সঙ্গে কথা বলা যায়, এ্যাঁ?

কিন্তু মানুষকে নাকাল করবার এই স্বভাবের জন্যেই সে নিজেও প্রায় মরতে বসেছিল। তোর মিখাইল-মামার স্বভাবটা ঠিক তার বাপের মতো — তেমনি ছোট মন আর মনের মধ্যে তেমনি একটা আক্রোশ পুষে রাখে। এই মিখাইল মনে মনে ঠিক করল, যে করে হোক্ তোর বাবাকে এই পৃথিবী থেকে সরাতে হবে। শীতের শুরুতে একদিন কোথায় যেন বেড়াতে গেল ওরা। ওরা ছিল চারজন — মাক্সিম, তোর দুই মামা আর একজন পাদ্‌রি (একজন কোচ্‌মানকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অপরাধে এই পাদ্‌রিটি পরে পদচ্যুত হয়)। ইয়ামস্কায়া স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ওরা যায় দ্যুকভ পুকুরের দিকে — ভাব দেখায় যেন ওখানে তারা স্লাইডিং করতে যাচ্ছে। তোর বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু দ্যুকভ পুকুরে পৌঁছেই ওরা করে কি, তোর বাবাকে ধাক্কা দিয়ে বরফের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে পুকুরে ফেলে দেয়। এ ঘটনাটা তোকে বোধ হয় আগেও একদিন বলেছি...'

'মামারা এত বদ কেন?'

একটিপ নস্যি নিয়ে শান্ত স্বরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'ওরা বদ নয়, বোকা। একেবারেই বোকা। মিশ্কা শুধু বোকা নয়, ধূর্তও; ইয়াকভটার তো এখনো জ্ঞানগম্মি কিছু হয়নি... হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওকে তো ওরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়; আর ও যতোবার ভেসে উঠে হাত দিয়ে বরফের কিনারটা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে, ওরা পায়ের বুট দিয়ে ঠুকে ঠুকে ওর আঙুলগুলোকে থেঁতলে দিতে চায়। ওর কপাল ভালো বলতে হবে যে ও ছিল স্বাভাবিক অবস্থায় আর তোর মামারা ছিল মাতাল। কোনো রকমে ও গর্তের মাঝখানটিতে ভেসে থাকে আর জল থেকে নাকটা উঁচু করে নিশ্বাস নেয়। তোর মামারা ওর মাথা লক্ষ্য করে বরফ ছুঁড়তে থাকে, কিন্তু যতোই ছুঁড়ুক, ওকে ঘায়েল করতে পারেনি। তোর মামাদের যখন ধারণা হল যে আর ওদের চেষ্টা করতে হবে না, এমনিতেই ও জলে ডুবে মরবে — তখন ওরা চলে গেল। তার পর দু-হাতে ভর দিয়ে যা হোক্ করে ও জল থেকে বেরিয়ে আসে এবং সোজা ছুটে যায় পুলিসের কাছে। দেখেছিস তো, পুলিসের সদরদপ্তর স্কোয়ারটার ঠিক পাশেই। থানার সার্জেণ্ট ওকে এবং আমাদের বাড়ির সকলকেই জানত। কি করে ব্যাপারটা ঘটেছে জানতে চাইল সার্জেণ্ট।'

বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে কৃতজ্ঞতাভরা স্বরে দিদিমা বলতে লাগলেন:

'মাক্সিম সাভাতেয়েভিচের আত্মাকে ভগবান শান্তি দিন! খাঁটি মানুষ ছিল ও! খাঁটি পথে থাকার পুরস্কার সে পাবেই! পুলিসের কাছে গিয়ে সে আসল ঘটনা একেবারেই ফাঁস করেনি। বলে যে, দোষটা নাকি তার নিজের, মদ খেয়ে বেহুঁশ অবস্থায় ছিল, আচমকা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। সার্জেণ্ট তার কথা বিশ্বাস করেনি, বলে যে সে মিথ্যে কথা বলছে, মাক্সিম যে মদ খায় না তা সে জানে। পুলিসের লোকরা তার সারা গা ভদ্কা দিয়ে ডলে দেয়, শুক্নো পোশাক পরিয়ে তার ওপরে চাপিয়ে দেয় একটা গরম ভেড়ার চামড়ার কোট, তারপর নিয়ে আসে বাড়িতে। সার্জেণ্ট ও আরো দু'জন লোক আসে তার সঙ্গে। ইয়াকভ ও মিখাইল তখনো বাড়ি ফেরেনি, নিজেদের বাবা মা'র মর্যাদা বাড়াতে অন্য কোথাও মদ গিলতে গিয়েছিল। মাক্সিমকে দেখে তোর মা আর আমি তো একেবারেই চিনতে পারি না; সারা শরীর লাল হয়ে গেছে, হাতের আঙুলগুলো থেঁৎলানো — রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, রগের কাছে সাদা সাদা বরফের মতো কি লেগে আছে যেন কিন্তু সেগুলো কিছুতেই গলে পড়ছে না; পরে বোঝা যায় যে ওগুলো হচ্ছে তার মাথার সাদা-হয়ে-যাওয়া চুল।

ভারভারা আর্ত স্বরে চিৎকার করে ওঠে — "মাক্সিম, কী হাল করেছে ওরা তোমার?" ওদিকে সেই সার্জেণ্ট সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে আর হাজার রকম প্রশ্ন করছে। আমার কেমন যেন মনে হতে থাকে, ব্যাপারটা বড়ো গোলমেলে। তখন সার্জেণ্টের কাছে ভারভারাকে পাঠিয়ে মাক্সিমের কাছে এসে আসল ঘটনাটা জেনে নিতে চেষ্টা করি। ফিস্‌ফিস্ করে মাক্সিম বলে — "আগে মিখাইল আর ইয়াকভকে খুঁজে বার করো গিয়ে। ওদের বোলো, ওরা যেন পুলিসের কাছে বলে যে ইয়াম্‌স্কায়া স্ট্রীটে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে — ওরা গেছে পোক্রভকার দিকে, আর আমি প্রিয়াদিলনি গলির দিকে। ওদের ভালো করে বলে দিও যেন পুলিসের কাছে এই কথাগুলো ঠিকঠাক বলে, নইলে ভারি বিশ্রী পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে।" তখন আমি তোর দাদামশাইয়ের কাছে যাই। বলি — তুমি গিয়ে সার্জেণ্টের সঙ্গে কথা বলো, আমি গেটের কাছে ছেলেদের অপেক্ষায় থাক্‌ছি। তারপর তার কাছে দুর্ঘটনা ও বিপদের কথা খুলে বললাম। শুনে তোর দাদামশাই তো কেঁপেই অস্থির, পোশাক পরতে পরতে বিড়বিড় করতে থাকে — "আমি জানতাম! এমনটি যে ঘটবে তা আমি জানতাম!" অবশ্য তোর দাদামশাইয়ের এই কথাটা ঠিক নয় — কিছুই জানত না সে! তারপর আমার সুপুত্তুররা তো বাড়ি ফিরল। আচ্ছা করে দু'জনের কান মলে দিলাম। মিশ্‌কার মদের নেশা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। কিন্তু ইয়াকভের পেটে বোধ হয় একটু বেশি পড়েছে, সে আবোল-তাবোল বকতে থাকে — "আমি কিছু জানি না! এটা মিশ্‌কার কাণ্ড — ও-ই তো গোদা!" যাই হোক্, সার্জেণ্টকে তো কোনো রকমে শান্ত করা হল, লোকটা এমনিতে খারাপ ছিল না। যাবার সময়ে সে বলে যায় — "তবে আপনারা খেয়াল রাখবেন। যদি আপনাদের বাড়িতে কোনো গণ্ডগোল হয় তো অপরাধীকে আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে বার করব!" সার্জেণ্ট চলে যেতে তোর দাদামশাই মাক্সিমের কাছে গিয়ে বলে — "তোমাকে আর কী বলব বাবাজী! আমি ভালো করেই জানি, তুমি না হয়ে আর কেউ হলে আজ অন্য ব্যাপার দাঁড়িয়ে যেত। আর ভারভারা, তোকেও ধন্যবাদ, এমন একজন সৎ লোককে আমাদের বাড়িতে আনার জন্যে।" সে-সময়ে তোর দাদামশাই ইচ্ছে করলে খুব চমৎকার কথা বলতে পারত। অবশ্য এখন আর সে-লোক নেই, এখন মানুষটার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে আর বুকের ভিতরটাকে কুলুপ এঁটে রেখেছে। ঘরের মধ্যে তখন আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। মাক্সিম কাঁদতে শুরু করে; রোগীর মতো

যেন প্রলাপ বকে—"ওরা কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল? আমি ওদের কাছে কি অপরাধ করেছি? মাগো, কেন ওরা একাজ করতে গেল?" ও আমাকে সবসময়েই ডাকত "মাগো" বলে, ঠিক যেমনভাবে শিশুরা তাদের মা'কে ডাকে; কক্ষণো শুধু "মা" বলত না। আর ওর স্বভাবের মধ্যেও এমন অনেক কিছুই ছিল যা শুধু শিশুদের মধ্যেই থাকে। "কেন? মাগো, কেন?" ও জিজ্ঞেস করে। আমি আর কি করতে পারি? নিরুত্তর হয়ে বসে থাকি আর ওর সঙ্গে সঙ্গেও কাঁদি। তবে ওরাও তো আমার ছেলে, ওদের জন্যেও আমার দুঃখ হতে লাগল। তোর মা করে কি, পট্‌পট্‌ করে ব্লাউজের বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেলে এমন এলোমেলো চেহারা করে বসে থাকে যে মনে হতে পারে যে সে এইমাত্র কারও সঙ্গে লড়াই করে এসেছে, হুঙ্কার দিয়ে বলে সে—"চলো মাক্সিম, আমরা এখান থেকে চলে যাই! আমার ভাইরা আমাদের শত্রু—ওদের দেখলেই ভয় করে! চলো, চলে যাই এখান থেকে!" মেয়েটাকে একটা ধমক দিই—তুমি আর আগুনে খড় গুঁজবার চেষ্টা কোরো না, এমনিতেই বাড়িতে যথেষ্ট ধোঁয়া হয়েছে! এমন সময় তোর দাদামশাই সেই দুটো নির্বোধকে পাঠিয়ে দেয় মাক্সিমের কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে। মেয়েটা করে কি, মিশ্‌কার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে বলে, "এই নাও তোমার ক্ষমা চাওয়া!" আর তোর বাবা বারবার সেই একই প্রশ্ন করে চলে—"তোমরা কি করে একাজ করতে পারলে ভাই? তোমরা তো আরেকটু হলে আমাকে সারা জীবনের মতো পঙ্গু করে ফেলতে? আমার আঙ্গুলগুলোই যদি না থাকত তাহলে আর আমি কাজ করে খেতাম কি করে?" যাই হোক্‌, কোনো রকমে ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলা হল। তারপর সাত সপ্তাহ কি তারও বেশি শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিল তোর বাবা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমাকে খালি বলত—"মাগো, চলো যাই আমরা অন্য কোনো শহরে। আমার এখানে ভালো লাগে না, বিষণ্ণ জীবন তোমাদের।" তারপরে শীঘ্রই তাকে আস্ত্রাখানে পাঠানো হয়। আস্ত্রাখানে জারের যাবার কথা ছিল, সেই উপলক্ষে বিজয়-তোরণ তৈরি করবার ভার পড়ে তোর বাবার ওপরে। বসন্তকালে প্রথম যে স্টীমবোট ছাড়ে তাতেই তারা চলে যায়। আমার মনে হতে লাগল, আমার বুকের আধখানা কে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। মাক্সিমেরও ভারি কষ্ট হয়েছিল, বারবার আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলে। কিন্তু খুশি হয়েছিল ভারভারা, এত খুশি হয়েছিল যে লুকোবার চেষ্টাও করেনি বেহায়া পাষাণী! এই ভাবে তারা চলে গেল... বাস...'

একঢোঁক ভদ্‌কা গিলে, একটিপ নস্যি নিয়ে, জানলার বাইরে তাকিয়ে স্মৃতি-মন্থন করতে করতে দিদিমা বললেন:

'তোর বাবার সঙ্গে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আমরা ছিলাম অভিন্ন আত্মা...'

মাঝে মাঝে দিদিমার গল্প বলার মধ্যে দাদামশাই এসে ঘরে ঢোকেন, পাখির মতো মুখটা তুলে গন্ধ শোঁকেন বাতাসে, সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাকান দিদিমার দিকে, খানিকক্ষণ গল্প শোনেন দিদিমার, তারপর বিড়বিড় করে বলেন:

'মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা, আগাগোড়া বানানো...'

একদিন দাদামশাই আচমকা জিজ্ঞেস করে বসলেন:

'লেক্সেই, তোর দিদিমা কি এখানে এসে মদ খায়?'

'না।'

'তুই মিথ্যে কথা বলছিস—তোর চোখ দেখেই বুঝতে পারছি, তুই মিথ্যে কথা বলছিস...' অবিশ্বাসের ভাব নিয়েই চলে গেলেন দাদামশাই। তাঁর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে চোখ মটকে একটি প্রবাদবাক্য বললেন দিদিমা:

'জলে দিলে নাড়া, মাছে খায় তাড়া!'

একদিন দাদামশাই এসে দাঁড়ালেন ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে। মেঝের থেকে একটিবারের জন্যেও চোখ না তুলে বললেন:

'গিন্নী...'

'উঁ?'

'ব্যাপারটা দেখছ তো?'

'দেখছি।'

'কী মনে হয় তোমার?'

'কপালের লেখা, বুঝলে গো, কপালের লেখা। মনে আছে অভিজাত ভদ্রলোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে?'

'আছে বৈকি।'

'মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলেছিলে।'

'তবু তার কিছুই অবশিষ্ট যে নেই, সে এখন গরীব।'

'যাক্‌ গিয়ে, মেয়ের ব্যাপার মেয়ে নিজেই বুঝুক।'

দাদামশাই চলে গেলেন। আমার মনে হতে লাগল, একটা কিছু দুর্বিপাক ঘটতে চলেছে। দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম:

'তোমরা কি বিষয়ে কথা বলছিলে?'

আমার পায়ে মালিশ করতে করতে দিদিমা মনের ঝাল প্রকাশ করতে লাগলেন, 'সব কথা তোর জানা চাই—না? এইটুকু বয়সেই যদি সবকথা জেনে বসে থাকিস তাহলে বড়ো হলে আর জানবার কিছুই বাকি থাকবে না।' বলে তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে হেসে উঠলেন।

'হায় রে লেক্সেই, তোর দাদামশাইয়ের আজ কী অবস্থা! ভগবানের চোখে কতটুকু সে? একটা ধুলোকণার মতো! কাউকে কিছু বলিসনে লেক্সেই, কিন্তু তুই শুনে রাখ, তোর দাদামশাইয়ের আর নিজের বলতে কিছু নেই—শেষ কপর্দক পর্যন্ত হারিয়েছে। এক ভদ্রলোককে মোটা রকমের টাকা ধার দিয়েছিল, বেশ কয়েক হাজার হবে। সেই ভদ্রলোক ফতুর হয়ে গেছে...'

নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে বহুক্ষণ তিনি চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গিয়ে সারা মুখটা জুড়ে বসল একটা থম্‌থমে বিষণ্ণতা।

'কী ভাবছ দিদিমা?'

'ভাবছি তোকে কোন্ গল্পটা বলব।' হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে তিনি বললেন, 'আচ্ছা শোন্ তাহলে ইয়েভস্তিগনেই-এর গল্পটাই বলি, কেমন? গল্পটা হচ্ছে এই:

এক যে ছিল বুড়ো ডীকন — ইয়েভস্তিগনেই নাম
মনে মনে ভাবত সে যে, প্রকাণ্ড তার দাম।
অগ্নিসম উজ্জ্বলতা তার কোথায় তুলনা
জার পুরোহিত সবার চেয়েও অধিক মহিমা।
দোকানদার বা ব্যবসায়ী — এরা তো কোন্ ছার
আর কেউ নাই তাহার মতো কী অপরূপ বাহার।
দেমাক-ঠাসা ময়ূর কিংবা বোকা মুরগীর মতো
বকম বকম চলাফেরা চাউনি পেঁচার মতো।
পাড়াপড়শী সবার তরে আছে অনুক্ষণ
বড়ো বড়ো বুলি ঠাসা বাছা অনুশাসন।
সকাল থেকে রাত অবধি বিরাম বিশ্রাম নাই
সবার কান ঝালাপালা সবাই খোঁজে ঠাঁই।
এ পৃথিবীর কোনো কিছুই নয়কো মনমতো
সবখানেতেই দোষত্রুটি আপদ জঞ্জাল যতো।

তাকিয়ে দেখেন ছাদের দিকে — ছাদটা নিচু অতি
হাঁকিয়ে চলেন ঘোড়ার গাড়ি — গাড়ির নেইকো গতি।
কামড় বসান আপেলফলে — একটুও নয় মিঠে
বসেন এসে বাইরে রোদে — পান না স্বস্তি মোটে।
যতোই দেখেন দুনিয়াটাকে ততোই বলেন তিনি:

চোখ ঘুরিয়ে গাল ফুলিয়ে গল্প বলতে লাগলেন দিদিমা, তাঁর মুখে ফুটে উঠল একটা চেষ্টাকৃত অদ্ভুত বোকামির ছাপ, সুর করে করে তিনি বলে চললেন:

দুনিয়া গড়ার ফন্দিফিকির ভালোমতোই জানি।
সৃষ্টিকর্তা হতাম যদি দেখিয়ে দিতাম ক্ষণে
এই পৃথিবী হত ভালো হাজার হাজার গুণে।
কিন্তু আমার নেইকো সময় নেইকো কোনো সায়
হাজার কাজের মানুষ আমি হাজার রকম দায়।

এক মুহূর্ত থেমে চাপা স্বরে বলে চললেন আবার:

হঠাৎ একদিন শয়তানেরা এসে হাজির হয়
বলে তাকে: 'এ পৃথিবীর কোনো কিছুই পছন্দ তো নয়?
চলো তবে সবাই মিলে নরকে বাস করি
কী চমৎকার আগুন সেথায় আহা মরি মরি।'
এই না শুনে ডীকনমশাই যেই না উঠে দাঁড়ায়
জোড়া শয়তান চাপে পিঠে ঘাড়টি ধরে হায়।
বাদবাকিরা কামড়ে ছিঁড়ে আঁকড়ে ধরে তাকে
ডীকনমশাই নাকাল ভারি মুখটি বুজে থাকে।
শয়তানেরা ঠেলা মারে — পড়েন গিয়ে শেষে
ফুঁসছে যেথায় আগুন সেথায় প্রচণ্ড আক্রোশে।
'এবার বলুন ডীকনমশাই ভালো লাগছে কিনা?'
ডীকনমশাই ভাজা-ভাজা চক্ষু রক্তপানা।
তবুও তাঁর ভারিক্কী চাল বজায় রাখেন তিনি
ঠোঁট বাঁকিয়ে ঝাঁজ ফুটিয়ে বলেন, 'জানি জানি,
নরক দেশের আগুনটা তো চোখধাঁধানো বটে
কিন্তু বড়ো বেশি ধোঁয়া ভালো নয়কো মোটে।'

ঘুমজড়ানো গভীর টানা সুরে গল্পটা শেষ করলেন তিনি, তারপর মুখের ভাব বদলে আমার দিকে ফিরে বললেন:

'ইয়েভস্তিগনেই শেষ পর্যন্ত হার মানেনি। লোকটার এই একটা মস্ত গুণ ছিল—নিজের গোঁ বজায় রাখতে পারত সব সময়ে—ঠিক তোর দাদামশাইয়ের মতো! নে, এবার রাত হয়েছে, ঘুমো...'

আমার মা ক্বচিৎ আমাকে দেখবার জন্যে ওপরে আসত। এলেও বেশিক্ষণ থাকত না, দু-একটা কথা বলেই চলে যেত তাড়াতাড়ি। মা দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে, আরো ভালো ভালো পোশাক পরে—কিন্তু দিদিমার মতো মা'র মুখেচোখেও একটা কেমন নতুন ভাব, কী যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে মা। ব্যাপারটা কী হতে পারে, আমি অনুমান করতে চেষ্টা করলাম।

দিদিমা আমাকে গল্প বলেন কিন্তু আমার আর তাতে আগ্রহ নেই। অস্পষ্ট একটা আতঙ্ক দিনের পর দিন আমার মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে—এমন কি দিদিমা যখন বাবার গল্প বলতে শুরু করেন তখনো এই আতঙ্কের ভাব আমার মন থেকে দূর হয় না।

একদিন আমি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার বাবার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না কেন?'

চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে দিদিমা জবাব দিলেন, 'তা আমি কী করে জানব? ওসব হচ্ছে স্বর্গের ব্যাপার—ঈশ্বরের রাজ্য। আমাদের মতো মানুষের পক্ষে ওসব বোঝা সম্ভব নয়...'

মাঝে মাঝে রাত্রে যখন ঘুম আসে না, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি গাঢ় নীল আকাশে তারার মিছিল চলেছে। কল্পনায় নানা করুণ গল্প ভেসে ওঠে, আর প্রত্যেকটি গল্পেরই নায়ক আমার বাবা। তিনি চলেছেন একা একা, তাঁর হাতে লাঠি, আর একটা লোমশ কুকুর চলেছে তাঁর পিছনে...

বার

বিকেল বেলা একদিন অল্প একটু ঘুমিয়েছিলাম। সন্ধ্যার সময়ে ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম, আমার পাদুটোতেও সাড়া জেগেছে। বিছানার ধার দিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম পাদুটোকে; তখন আবার পাদুটোকে অসাড় ও অবশ মনে হতে লাগল। তবে যাই হোক্, একটা উপকার হয় এ-ব্যাপারে; আমার পাদুটো যে আস্ত আছে এবং আবার আমি হাঁটা-চলা করতে পারব—এই বিশ্বাসটুকু ফিরে আসে আমার মনে। এই অভিজ্ঞতা আমার মনে এমন একটা তীব্র আনন্দ সঞ্চারিত করে যে আমি চিৎকার করে উঠি এবং মেঝের ওপরে পায়ে

ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। অবশ্য চেষ্টাটা সফল হয় না; আমি পড়ে যাই। কিন্তু তবুও হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাই দরজার দিকে; সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামি আর ভাবি—আমাকে দেখে নিচের সবাই কি-ভাবেই না আঁতকে উঠবে।

এখন আর আমার মনে নেই, সে-অবস্থায় কী করে আমি মা'র ঘরে পেঁাছেছিলাম। দেখলাম, আমি দিদিমার কোলে শুয়ে আছি আর আমার চারদিকে অপরিচিত সব লোকের ভিড়। সবুজ রোগা এক বুড়ীও ছিল সেই ভিড়ের মধ্যে।

ঘরের অন্য সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে বুড়ী বলল, 'ওকে র‍্যাস্‌পবেরি জ্যাম দিয়ে একটু চা খেতে দাও আর কম্বল দিয়ে মুড়ে দাও ভালো করে...'

বুড়ীর আপাদমস্তক সবুজ। পোশাক সবুজ, টুপি সবুজ, মুখ সবুজ, বাঁ চোখের নিচের আঁচিল সবুজ, এমন কি আঁচিলের মাঝখান থেকে যে একগাছি চুল বেরিয়ে এসেছে তাও সবুজ ঘাসের মতো। তলার ঠোঁটটাকে নিচের দিকে নামিয়ে আর ওপরের ঠোঁটটা উঁচু দিকে তুলে, সবুজ দাঁতের পাটি বার করে এবং আঙ্গুল খোলা লেসের কালো দস্তানাপরা হাত দিয়ে চোখদুটোকে আড়াল করে বুড়ী তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমতা আমতা করে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে, দিদিমা?'

জবাব দিলেন দাদামশাই, অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন, 'ইনি তোমার আরেকজন ঠাকুমা হতে চলেছেন।'

আমার মা মুচকে হেসে ইয়েভগেনি মাক্সিমোভকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল:

'আর এই হবে তোর বাবা।'

আরও কি সব কথা মা তাড়াতাড়ি বলে গেল কিন্তু আমার মাথায় একবর্ণও ঢুকল না। চোখদুটো কুঁচকে মাক্সিমোভ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছে:

'আমি তোমাকে এক বাক্স রং কিনে দেব খোকা।'

ঘরের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল আলো। কোণের একটা টেবিলের ওপর রুপোর ঝাড়বাতি জ্বলছে; প্রত্যেকটি ঝাড়ে পাঁচটি করে মোমবাতি। ঝাড়বাতিগুলোর ঠিক মাঝখানে দাদামশাইয়ের প্রিয় আইকন: 'ওগো মা, কেঁদো না!' মোমবাতির আলোয় আইকনের মুক্তাখচিত ফ্রেম ঝল্‌সে উঠছে, গলে গলে পড়ছে; সোনালী মুকুটে বসানো গাঢ় লাল পাথরগুলি উঠছে ঝিকমিকিয়ে। জানলার

বাইরের অন্ধকার থেকে কতগুলো অস্পষ্ট মুখ শার্সির ওপরে নাক চেপে পিটপিট করে তাকিয়ে আছে ঘরের মধ্যে। আমার চারদিকে দুলে উঠেছে সমস্ত কিছু। সেই সবুজ স্ত্রীলোকটি ঝুঁকে পড়েছে আমার ওপরে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে আমার কানের পিছনদিক পরীক্ষা করে বিড়বিড় করে বলছে:

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...'

আমাকে কোলে নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে দিদিমা বললেন, 'মূর্ছা গেছে।'

আমি কিন্তু মূর্ছা যাইনি, শুধু চোখ বন্ধ করে ছিলাম। আমায় নিয়ে যখন দিদিমা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন, আমি বললাম:

'তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। বাস, আর একটিও কথা নয়।'

'ঠকের দল...'

আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দিদিমা নিজেই বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। আর বারবার বলতে লাগলেন আমাকে:

'ওরে, এবার কেঁদে নে, প্রাণ ভরে কেঁদে নে!'

কিন্তু কাঁদবার ইচ্ছে আমার ছিল না। ওপরের এই ঘরটা ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। আমার শরীরটা কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা নড়ছে আর কিচ-কিচ শব্দ করে উঠছে। সেই সবুজ স্ত্রীলোকটি যেন দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে; কিছুতেই মিলিয়ে যায় না। আমি ভান করলাম যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। দিদিমা আমাকে একা রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

তার পরের কয়েকটা দিন কাটল একটা নিরুৎসাহ একঘেয়েমির মধ্যে দিয়ে। বিয়ের কথা ঘোষণা করেই আমার মা চলে গেছে। বাড়ির মধ্যে বুক-চাপা নিস্তব্ধতা নেমে এল।

একদিন সকালে একটা বাটালি হাতে নিয়ে দাদামশাই হাজির। শীত-জানলার পুটিং তিনি বাটালি দিয়ে কেটে কেটে তুলে ফেলতে লাগলেন। তারপরেই দিদিমা এলেন এক বালতি জল আর খানিকটা ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে।

নীচু গলায় দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর গো?'

'কিসের খবর?'

'তুমি কি খুশি হয়েছ?'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দিদিমা আমাকে যে-জবাব দিয়েছিলেন, এবারে দাদামশাইকেও সেই একই জবাব দিলেন:

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। বাস, আর একটিও কথা নয়।'

এই সরল কথাগুলোর এখন একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। মস্ত আর অপ্রিয় একটা ঘটনা গোপন করে রাখতে চাইছে কথাগুলো। এমন একটা ঘটনা যা সবাইকে মেনে নিতে হচ্ছে কিন্তু মুখে যা উল্লেখ করা যায় না।

শীত-জানলার কপাটটা সাবধানে খুলে নিয়ে দাদামশাই সেটা নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। দিদিমা গিয়ে দাঁড়ালেন উন্মুক্ত জানলার সামনে। বাইরে বাগান থেকে স্টার্লিং আর চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। ভিজে মাটির মাথা-ঝিমঝিম-করা গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। চুল্লির নীলাভ টালিগুলো ঔদাসীন্যে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে — সেদিকে তাকিয়ে আমার শরীরটা শিরশির করে উঠল। সাবধানে বিছানা থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

'এখন আর খালি পায়ে হাঁটাচলা করিসনে বাপু,' দিদিমা আমাকে সাবধান করে দিলেন।

'আমি একটু বাগানে যাচ্ছি।'

'আরেকটু পরে যাস। এখনো মাটি ভিজে রয়েছে।'

দিদিমার কথা মেনে চলবার ইচ্ছে আমার ছিল না। বড়োদের সান্নিধ্য এখন আর আমার ভালো লাগছে না।

ফ্যাকাশে সবুজ রঙের কচি কচি ঘাসের ডগা ইতিমধ্যেই মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলেছে। আপেল গাছগুলো ছেয়ে গেছে নবমঞ্জরীতে। পেত্রভনার বাড়ির ছাদে সবুজ শ্যাওলার চমৎকার কার্পেট বিছানো। চারদিকে পাখির মেলা। বরফ-গলা মাটির গন্ধে আমার নেশা ধরে গেল। বরফের তাড়নায় নুয়ে-পড়া বাদামী রঙের আগাছায় চিহ্নিত হয়ে আছে কালো গর্তটার কিনারা। এখানেই পিওতর-কাকা নিজের গলায় ছুরি বসিয়েছিল। সারা বাগানের মধ্যে এই আগাছাগুলোকেই সবচেয়ে বিশ্রী দেখতে। এই আগাছাগুলো বা আগুনে-পোড়া এই নিঃসঙ্গ খুঁটিগুলো চারদিকের বসন্ত-আবহাওয়ায় একেবারেই বেমানান। এক কথায়, সারা বাগানের মধ্যে এই গর্তটাই গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেবার মতো একটা বেখাপ্পা ব্যাপার হয়ে উঠেছে। আমার কেমন একটা রোখ চেপে গেল যে এক্ষুণি গিয়ে আগাছাগুলোকে উপড়ে ফেলি, ইট আর আগুনে পোড়া খুঁটিগুলোকে সরিয়ে দিই ওখান থেকে, যতো জঞ্জাল জড়ো

হয়ে আছে সব ঝেঁটিয়ে ফেলে পরিষ্কার করে ফেলি জায়গাটা, তারপর নিজের জন্যে একটা কুঞ্জ রচনা করি ওখানে—যেটা হবে বড়োদের নাগালের বাইরে আমার নিভৃত গ্রীষ্মযাপনের স্থান। সঙ্গে সঙ্গে আমি কাজে লেগে গেলাম। এতে আমার খানিকটা উপকারও হল। কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমাদের বাড়ির সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো ভুলে গেলাম আমি। ঠিক যে ভুলে গেলাম তা নয়, ক্ষতটা রয়েই গেল, কিন্তু তার যন্ত্রণাটা কমে এল আস্তে আস্তে।

আমার দিদিমা ও মা জিজ্ঞেস করেন, 'অমন মনমরা হয়ে থাকিস কেন রে?' এ-প্রশ্নের কী জবাব দেব ভেবে পাই না। বাড়ির কারও ওপর আমার রাগ নেই, কিন্তু বাড়ির কোনো ব্যাপারই আমার আর ভালো লাগে না, সব কিছু যেন আমার পর হয়ে উঠল। সেই সবুজ স্ত্রীলোকটি প্রায়ই আসে আমাদের বাড়িতে; কখনো বিকেলের খাবার সময়ে, কখনো চায়ের সময়ে, কখনো রাত্রের খাবার সময়ে। এসে বসে থাকে পুরনো বেড়ার জীর্ণ খুঁটির মতো। তার চোখদুটো যেন অদৃশ্য সুতো দিয়ে মুখের সঙ্গে সেলাই করা; হাড়-বের-করা গর্তের মধ্যে চোখদুটো অতি অনায়াসে ঘুরপাক খায়; সমস্ত কিছু দেখে, সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। ঐশ্বরিক বিষয়ে কথা বলবার সময় ছাদের দিকে চোখদুটো নিবদ্ধ হয়, আর পার্থিব বিষয়ে কথা বলবার সময় মেঝের দিকে। তার ভুরুদুটোকে দেখে মনে হয়, কোনো একটা দুর্জ্ঞেয় পদ্ধতিতে ভুষির প্রলেপ দিয়ে তৈরি। চওড়া চওড়া দাঁতগুলো যা কিছু সে মুখের মধ্যে পোরে তা নিঃশব্দে গুঁড়িয়ে ফেলে। খাবার সময়ে কাঁটাটা ধরে অদ্ভুত তির্যক ভঙ্গিতে, হাতের ছোট আঙুল উঁচিয়ে থাকে। কানের সামনে গোল গোল বলের মতো হাড় চর্‌কির মতো ঘোরে আর কানদুটো নড়তে থাকে। মুখের চামড়া হল্‌দে আর কুঁচ্‌কনো আর এত বেশি মাজাঘষা যে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে। আর এই চামড়ার ওপরে আঁচিলের সবুজ চুলগাছা নড়াচড়া করে বেড়ায়। মা ও ছেলে দু'জনেই এত মাজাঘষা যে ওদের কাছে ঘেঁষতে আমার ভয় করে। আমাদের দেখাসাক্ষাতের প্রথম কয়েকদিন বুড়ী বারকয়েক চেষ্টা করেছিল, ধুনো আর ধোবিখানার সাবানের গন্ধওলা তার শুক্‌নো হাতটায় যেন আমি চুমু খাই। কিন্তু যতোবারই এই উপলক্ষ উপস্থিত হয়েছে, আমি পালিয়ে গেছি।

বুড়ী তার ছেলেকে বাররার বলে, 'বুঝলি তো ইয়েভগেনি, ছেলেটাকে ভালোমতো শিখিয়ে পড়িয়ে একটু সভ্যভব্য করা দরকার।'

একথা শুনে ইয়েভগেনি বাধ্য ছেলের মতো ভ্রূ কুঁচকে মাথা নোয়ায় কিন্তু একটিও কথা বলে না। বুড়ীর এই সবুজ উপস্থিতির সামনে সবাই ভ্রূ কোঁচকায়।

এই বুড়ীকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। বুড়ীর ছেলেকেও না। আমার এই বিদ্বেষ এত বেশি প্রগাঢ় যে এজন্যে আমাকে বহু প্রহার সহ্য করতে হয়েছে।

একদিন আমরা একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম। বুড়ী হঠাৎ চোখ ভয়ানকভাবে পাকিয়ে বলে উঠল:

'বাছা আলিওশা, অমন গপ্‌গপ করে রাক্ষসের মতো গিলছ কেন? খাবার গলায় আটকে যাবে যে।'

আমি করলাম কী, খাবারের টুকরোটা মুখ থেকে বার করে নিয়ে কাঁটায় বিঁধিয়ে বাড়িয়ে ধরলাম তার দিকে।

'খাবারের ওপর আপনার এতই যদি লোভ তো এই নিন।' বললাম আমি।

মা আমাকে এক ঝট্‌কায় টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপরে লজ্জাকরভাবে আমাকে বন্ধ করে রাখা হল ছাদের ঘরে।

কিছুক্ষণ পরেই দিদিমা উঠে এলেন ওপরের ঘরে। তারপরেই মুখে হাত চাপা দিয়ে তাঁর সে কী হো-হো হাসি।

'আরে, বাবাঃ, কোথায় যাব রে আমি! তোর মাথায় এত দুষ্টু বুদ্ধিও খেলে!'

দিদিমার মুখে হাত চাপা দেবার ভঙ্গিটুকু আমার ভালো লাগল না। দিদিমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমি ছাতে উঠে এলাম এবং সেখানে চিম্‌নির পিছনটিতে বসে রইলাম বহুক্ষণ। হ্যাঁ, আমার ভয়ানক ইচ্ছে করে, ওদের সবাইকেই মুখের ওপরে যা-তা বলি, ওদের সবাইকেই খানিকটা নাকানি-চোবানি খাওয়াই। এই ইচ্ছেকে আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারি না। চেপে রাখাটা আমার পক্ষে ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাকে এই শক্ত ব্যাপারটাই আয়ত্ত করতে হয়েছিল।

একদিন আমি করলাম কী, আমার ভাবী সৎ-বাপ আর ভাবী ঠাকুমা যে চেয়ারদুটিতে বসে, তার ওপরে চেরি-আঠা মাখিয়ে রেখে দিলাম। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনেই শক্তভাবে এ'টে গেল চেয়ারের সঙ্গে—সে এক ভারি মজার ব্যাপার। সেজন্যে দাদামশাই তো আমাকে ধরে আচ্ছা করে পিট্‌টি দিলেন। এসব হয়ে যাবার পরে মা উঠে এল আমার

ছাদের ঘরে। আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে শক্তভাবে চেপে ধরে বলল:

'হ্যাঁ রে, তুই এত দুষ্টুমি করিস কেন বল্ তো? তোর এই দুষ্টুমির জন্যে আমাকে যে কতখানি ভুগতে হয় তা যদি তুই জানতিস!'

মা'র দু-চোখ ভরে উজ্জ্বল জল টলটল করছে। গালের ওপরে আমার মাথাটা চেপে ধরেছে মা। মা'র মারের চেয়েও এতে বেশি কষ্ট হত। মা'র কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, মা যদি না কাঁদে তাহলে আর আমি কক্ষণো মাক্সিমভদের পিছনে লাগব না।

আমাকে নীচু গলায় মা বলল, 'এই তো চাই। আর কক্ষণো দুষ্টুমি করিসনে। এই দ্যাখ্ না, শীগ্গিরই আমাদের বিয়ে হবে, বিয়ের পরে আমরা যাব মস্কোতে। মস্কো থেকে ফিরে এলে তুইও থাকবি আমাদের সঙ্গে। ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ খুব ভালো লোক — যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি মনটাও নরম। দেখিস তুই, ওকে তোরও ভালো লাগবে। তোকে আমরা হাইস্কুলে ভর্তি করে দেব। তারপর তুইও হবি ওর মতো ছাত্র। তা হলে পর তুই ইচ্ছে করলে ডাক্তারও হতে পারিস বা অন্য যা খুশি হতে পারিস। লেখাপড়া যে শেখে তার কি আর কিছু অসাধ্য থাকে! যা এবার একছুটে বাইরে গিয়ে একটু খেলা কর গিয়ে...'

আমার মনে হতে লাগল, এই 'তারপর' বা 'তা হলে পর' ইত্যাদি কথাগুলো সিঁড়ির ধাপের মতো পর পর নেমে গেছে আর সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি ক্রমশ মা'র কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে এক অন্ধকার নিঃসঙ্গতায় চলে যাচ্ছি। আমার জন্যে ভবিষ্যতের যে চিত্র মা এঁকেছে তাতে আমি কিছুমাত্র উল্লসিত হইনি। ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে বলি:

'মা, তুমি বিয়ে কোরো না। আমি নিজেই কাজ করে তোমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেব।'

কিন্তু কথাটা আমি বলতে পারিনি। মা যখনই আমার সঙ্গে কথা বলে তখন আমার মনটা আবেগে একেবারে গলে যায় আর মা'র জন্যে মস্ত কিছু একটা করতে ইচ্ছে করে—কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে কোনো দিনই মা'র কাছে বলতে পারিনি।

এদিকে বাগানে আমার পরিকল্পনামতো কাজ এগিয়ে চলেছে। আগাছাগুলোকে টেনে তুলেছি আর গোড়া থেকে কেটে দিয়েছি। ইটের গাঁথুনি তুলেছি, গর্তের ঢালু কিনারের চারদিক থেকে ইট সাজিয়ে দিলাম,

সেগুলি দিয়ে তৈরি করেছি বেশ চওড়া একটি আসন যাতে শুয়ে থাকাও চলতে পারে। নানা রঙের কাঁচ আর ডিশের ভাঙা টুক্‌রো যোগাড় করে চমৎকারভাবে বসিয়ে দিয়েছি ইটের ফাঁকে ফাঁকে গাঁথুনির মধ্যে। সূর্যের আলো এসে যখন পড়ে তখন এই কাঁচ আর ডিশের টুক্‌রোগুলো গির্জার উপাসনা-বেদির মতো চক্‌চক্‌ করে আর ঝল্‌সে ওঠে।

মনোযোগের সঙ্গে আমার কাজ পর্যবেক্ষণ করতে করতে একদিন আমার দাদামশাই বললেন, 'বাঃ, মাথা খাটিয়ে চমৎকার জিনিসটা করেছিস তো! তবে কি জানিস, আগাছাগুলোর শেকড় মাটির মধ্যে রয়ে গেছে, ওগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আচ্ছা, ওজন্যে তোকে ভাবতে হবে না। তুই একটা কাজ কর তো, আমাকে একটা কোদাল এনে দে, আমি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে শেকড়গুলো বার করে দিচ্ছি।'

কোদাল আনতেই তিনি প্রথমে থুথু দিয়ে হাত ভিজিয়ে নিলেন, তারপর হুঁম হুঁম শব্দ করতে করতে গভীরভাবে খুঁড়তে শুরু করে দিলেন জমিটা।

'এবার আগাছার শেকড়গুলোকে ফেলে দে। দেখিস তুই, তোর জন্যে আমি এখানে সূর্যমুখী আর হলিহক্‌'এর চারা লাগিয়ে দেব। তাহলে কী সুন্দর যে হবে জায়গাটা — সত্যিই ভারি সুন্দর...'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি কোদালে ঠেস দিয়ে নিশ্চল ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িযে রইলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ক্ষুদে ক্ষুদে, কুকুরের মতো বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর চোখদুটো থেকে দর দর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

'কী হল দাদামশাই?'

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মুখটা মুছে নিয়ে তিনি তাকালেন আমার দিকে।

'হুঃ, এর মধ্যেই শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে গেছে। আরে বাবাঃ, পোকাগুলো কি-রকম কিলবিল করছে দেখছিস!'

আবার খুঁড়তে শুরু করলেন তিনি। হঠাৎ বলে উঠলেন:

'এসব করে কিচ্ছু লাভ নেই। মিথ্যে এসব করা, ভাই। শীঘ্রই এই বাড়িটা আমাকে বিক্রি করে ফেলতে হবে। হয়তো সামনের শরৎকালের মধ্যেই। তোর মা'র বিয়ের যৌতুক দিতে হবে তো — সেজন্যে টাকা দরকার। বুঝলি কিনা, আর যে-ভাবেই থাকুক না কেন, অন্তত তোর মা'র যেন কোন কালে থাকাখাওয়ার কষ্ট না হয়...'

কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতটা একবার ঝাঁকিয়ে তিনি চলে গেলেন স্নানঘরের পিছনে; বাগানের ওই কোণটিতে কতকগুলো লালনক্ষেত্র তৈরি করেছেন তিনি। আমি নিজেই খুঁড়তে শুরু করলাম এবং আচমকা কোদালটা লেগে গিয়ে আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটায় বড় আঘাত দিল।

এই আঘাতের ফলে মা'র বিয়েতে আমি আর যোগ দিতে পারিনি। কোনোমতে গেট পর্যন্ত হেঁটে এসে দূর থেকেই মা'র যাওয়া দেখেছি। মাক্সিমভের হাতটা ধরে আছে আর মাথা নিচু করে পথ চলছে মা। পাথরবসানো ফুটপাথের ফাটল দিয়ে কচি কচি ঘাসের ডগা মাথা তুলেছে; সেই ঘাসের ডগাগুলোকে সতর্কভাবে বাঁচিয়ে সাবধানে পা ফেলছে মা— যেন পেরেক-বসানো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে তাকে।

কোনো রকম ধুমধাম না করে বিয়ে হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের শেষে যে চায়ের আসর বসল সেখানেও কোনো রকম হৈচৈ হল না। চা-খাওয়া হয়ে যেতেই কালবিলম্ব না করে মা নিজের ঘরে গিয়ে বাক্সপেঁটরা গুছোবার কাজে লেগে গেল। আমার সৎ-বাপ বসল এসে আমার পাশে, বলল:

'মনে আছে তো, তোমাকে বলেছিলাম, এক বাক্স রং উপহার দেব। কিন্তু এখানকার বাজারে ভালো রং কিনতে পাওয়া যায় না। আমার নিজের রঙের বাক্সটাও দেওয়া চলে না। মস্কো থেকে তোমাকে আমি রঙের বাক্স পাঠিয়ে দেব।'

'রঙের বাক্স নিয়ে কী করব আমি?'

'কেন, ছবি আঁকতে তোমার ভালো লাগে না?'

'আমি ছবি আঁকতে জানি না।'

'তাহলে তোমার জন্যে আমি অন্য কিছু পাঠাব।'

এই সময়ে আমার মা ঘরে ঢুকে আমাকে বলল:

'আমরা শীগ্‌গিরই ফিরে আসব। তোমার বাবা পড়াশুনো শেষ করে পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই ফিরে আসব আমরা।'

দুজনে আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে যেন আমি আর ছোটটি নই। এতে ভারি ভালো লাগছে আমার। কিন্তু যে-লোকের দাড়ি গজিয়ে গেছে সে এখনো পড়াশুনা করছে শুনে আমার খুব অবাক লাগল।

'আপনি কী পড়েন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জরিপবিদ্যা।'

'জরিপবিদ্যা' জিনিসটা কী, জিজ্ঞেস করতেও আলস্য লাগছে আমার।

বাড়ির আবহাওয়াটা ভারি হয়ে রয়েছে একটা থম্‌থমে নিস্তব্ধতায়; লোমশ কিছুর খসখসানি যেন। উৎকণ্ঠ হয়ে আমি রাত্রির জন্যে প্রতীক্ষা করছি; আরো তাড়াতাড়ি রাত্রি নেমে আসুক। চুল্লির দিকে পিছন ফিরে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাদামশাই আধ বোজা চোখে তাকিয়ে আছেন জানলার বাইরের দিকে। সবুজ বুড়ীটা ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে আর বিড়বিড় করতে করতে মা'কে বাক্সপেঁটরা বাঁধতে সাহায্য করছে। দিদিমা দুপুর থেকেই মদে বেসামাল; তিনি যাতে বিসদৃশ কিছু কাণ্ড করে পরিবারের নাম না ডুবিয়ে বসেন, সেজন্যে তাঁকে ছাদের ঘরে আটকে রাখা হয়েছে।

পরদিন সকালবেলা মা চলে গেল। যাবার আগে আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সে আমাকে অনায়াসে তুলে নিল মাটি থেকে এবং বুকের ওপরে চেপে ধরে স্থির অপরিচিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। আমাকে চুমু খায়, বলে, 'এবার যাই, কেমন?'

'ওকে বলে যা যেন আমার অবাধ্য না হয়।' তখনও গোলাপী আকাশের দিকে তাকিয়ে নিরুৎসুক গলায় দাদামশাই বললেন।

'শুনছিস তো, দাদামশাইয়ের কথা মেনে চলবি।' আমার মাথার ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে মা আমাকে উপদেশ দিল। আমি আশা করছিলাম, মা হয়তো আমাকে অন্য কিছু বলবে। মা'র কথায় এভাবে বাধা দেওয়াতে আমি দাদামশাইয়ের ওপরে রেগে গেলাম।

দু'জনে গিয়ে গাড়ীতে চেপে বসল। গাড়ীতে উঠবার সময় কিসে যেন আটকে গেল মা'র পরনের স্কার্ট। বেশ খানিকক্ষণ মা'র সময় লাগল স্কার্টটাকে খুলতে; হিমসিম খেয়ে রেগে উঠল মা।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি? দ্যাখ্‌ না গিয়ে স্কার্টটা কোথায় লেগেছে!' দাদামশাই আমাকে বললেন কিন্তু আমার নিজের মনের বিষণ্ণ ভার আমাকে তখন এমনভাবে গ্রাস করেছে যে কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

মাক্সিমভের পরনে আঁটসাঁট নীল ট্রাউজার। ট্রাউজার-মোড়া পা দুটোকে সতর্কভাবে গুটিয়ে নিয়ে বসল সে। তার হাতে কতকগুলো পুঁটলি দিলেন দিদিমা। পুঁটলিগুলোকে সে হাঁটুর ওপরে পরপর সাজিয়ে নিয়ে চিবুক দিয়ে চেপে ধরে রইল।

'বাস, বাস, অনেক হয়েছে!' ফ্যাকাশে কপালটা আতঙ্কে কুঁচকে আমতা-আমতা করে বলল সে।

অপর একটি গাড়ীতে উঠেছে সেই সবুজ বুড়ীটা আর তার বড়ো ছেলে। বুড়ী বসে আছে ঠিক মোমের পুতুলের মতো টান হয়ে আর তার বড়ো ছেলে তলোয়ারের বাঁটটা দিয়ে দাড়ি ঘষছে আর অনবরত হাই তুলছে।

'তাহলে আপনাকে যুদ্ধেই যেতে হবে, না কী বলুন?' দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন।

'নিশ্চয়।'

'খুব ভালো কথা। ওই তুর্কীগুলোকে একটু ধোলাই দেওয়া দরকার।'

তারা রওনা হয়ে গেল। বারবার পিছন ফিরে তাকিয়ে মা রুমাল নাড়ছে। বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন দিদিমা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনবরত চোখের জল মুছছেন দাদামশাইও।

'ভালো হবে না... এই বিয়ের ফল কক্ষণো ভালো হবে না...' বিড়বিড় করে বললেন দাদামশাই।

একটা টুলের ওপরে বসে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ীদুটো লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। একসময়ে রাস্তার একটা বাঁক ঘুরে গাড়ীদুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরেও একটা কপাট সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল যেন... এতটুকু ফাঁক রইল না... নিশ্ছিদ্র...

তখনো ভালো করে সকাল হয়নি। রাস্তা জনশূন্য, বাড়ির জানলাগুলো খড়খড়ি-আঁটা। এমন শূন্যতা এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি। দূরের কোথা থেকে যেন এক রাখালের বাঁশির টানা-টানা বিলাপ ভেসে আসছে।

আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে যেতে দাদামশাই বললেন, 'আয় রে, চা-টা খাবি আয়। মনে হচ্ছে, আমার কাছে পড়ে থাকাটাই তোর কপালের লেখা। পাথরের ওপরে দেশলাইয়ের কাঠির মতো আমার ওপর লেগে থাকবি।' ,

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমরা দু'জনে নিঃশব্দে বাগানের কাজ করে চলি। দাদামশাই মাটি খোঁড়েন, র‍্যাস্‌প্‌বেরির ঝোপ ছেঁটে দেন, আপেলগাছের ছালের ওপর থেকে ঘষে ঘষে শ্যাওলা ওঠান, শুঁয়োপোকাগুলোকে থেঁতলে মেরে ফেলেন — আর আমি লেগে থাকি আমার নিভৃত কুঞ্জটিকে আরো পরিপাটি করে তোলার কাজে। আগুনে পোড়া খুঁটিকে কেটে ফেলে দিয়ে দাদামশাই বাঁশ পুঁতে দিয়েছেন; আমি আমার পাখির খাঁচাগুলোকে সেই বাঁশে ঝুলিয়ে রেখেছি। শুক্‌নো ঘাসপাতার চাঁচ বুনে

বুনে রোদ আর শিশির থেকে আড়াল করেছি আমার এই কুঞ্জটিকে। স্থানটি অতি চমৎকার হয়ে উঠেছে।

আমার দাদামশাই বলেন, 'তুই যে নিজেরটা নিজেই করে নিতে শিখছিস এটা সত্যিই খুব ভালো কথা।'

জীবন সম্পর্কে দাদামশাইয়ের মতামতের আমি যথেষ্ট মূল্য দিয়ে চলি। বসবার যে জায়গাটুকু আমি ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিয়েছি সেখানে এসে মাঝে মাঝে তিনি বসেন। কথা বলেন ধীরে ধীরে, কোনো রকম তাড়াহুড়ো না করে — যেন রীতিমতো চেষ্টা করে করে প্রত্যেকটি শব্দ মুখের ভিতর থেকে টেনে বার করতে হচ্ছে।

'এখন থেকে তোর মা'র সঙ্গে তোর আর কোনো সম্পর্ক রইল না। তুই একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে গেলি। এবার তোর মা'র আরো ছেলেপুলে হবে। তোর চেয়ে তাদের ওপরেই তোর মা'র টানটা হবে বেশি। আর তোর দিদিমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস, সব সময়েই মদে বেহুঁশ হয়ে থাকে।'

কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ চুপ করে যান, অনেকক্ষণ আর কোনো কথা বলেন না। মনে হয় যেন কান পেতে কোনো কিছু শুনছেন। তারপর আবার একসময়ে তাঁর মুখ থেকে গুরুভার শব্দগুলো একটি করে বেরিয়ে আসতে থাকে।

'তোর দিদিমার এভাবে মদে বেহুঁশ হয়ে থাকা - এই নিয়ে দু-বার এই ব্যাপারটা হল। প্রথমবার এমনি হয়েছিল যখন মিখাইলকে পল্টনে ডেকে পাঠায়। এই বোকা বুড়ীর কথায় পড়ে সেবার আমি ছেলেটার জন্যে রিক্রুট সার্টিফিকেট কিনে আনি। এখন মনে হচ্ছে, ছেলেটা যদি পল্টনে যেত তাহলে হয়তো ভালোই হত ওর পক্ষে। এমনটি হয়তো ও থাকত না। হুঃ, কী সব মানুষ! আমি আর ক'দিন! শীঘ্র মরব! তার মানে আর কেউ থাকবে না — একেবারে অনাথ হবি। বুঝলি তো? তোকে একাই পাড়ি দিতে হবে সংসারে। দ্যাখ, একটা কথা বলি। নিজের হুকুম তামিল করে চলতে শিখিস কিন্তু কক্ষণো অপর কেউ যেন তোকে দিয়ে হুকুম তামিল করিয়ে নিতে না পারে। লোকের সঙ্গে ব্যবহার করবি ধীরস্থির ভাবে কিন্তু নিজে যে পথে চলবি ঠিক করেছিস তা থেকে সরে দাঁড়াবি না। সবার কথা শুনবি কিন্তু নিজের বিবেচনায় যা সবচেয়ে ভালো মনে হবে তাই করবি...'

বর্ষার দিনগুলো বাদ দিয়ে সারাটা গ্রীষ্ম আমি বাগানেই কাটিয়ে দিই। এমন কি, গরম হলে রাত্রিবেলা বাগানেই ঘুমোই। দিদিমা আমাকে এব

ফেল্ট্'এর কাপড় দিয়েছেন, তাই হয় আমার বিছানা। দিদিমা নিজেও মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে রাত্রি কাটান; একরাশ খড় নিয়ে এসে আমার বিছানার পাশটিতে পেতে শুয়ে পড়েন। শুয়ে শুয়ে গল্প বলেন আমাকে। তাঁর নিজেরই অন্য দু-একটা মন্তব্যে মাঝে-মাঝে সেই গল্পে ছেদ পড়ে। মন্তব্যগুলো এই ধরনের:

'দ্যাখ্, দ্যাখ্, একটা তারা খসে পড়ছে! ও হল মাটি-মায়ের কথা মনে-পড়া উৎকণ্ঠিত একজনের আত্মা! এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন ভালো মানুষের জন্ম হল।'

কিংবা:

'ওই দ্যাখ্ রে, একটা নতুন তারা উঠেছে! কী অসীম ঐশ্বর্য! ভাব তো দেখি একবার — কত দূরে রয়েছে এই আকাশ... ভগবানের উত্তরীয় মুক্তোবসানো এই আকাশ!'

দাদামশাই বিড়বিড় করে বলেন: 'সাধে কি আর বোকা বলে! মরবার পথ হয়েছে! কোমরে গেঁটে বাত ধরবে যে — আর নইলে চোরের দল এসে গলা কাটবে!..'

এমনি চলে — সূর্য ডোবে, আগুনের নদী বন্যার মতো বয়ে যায় সারা আকাশ দিয়ে। আর সেই আগুন যখন নিভতে থাকে তখন বাগানের সবুজ ভেলভেটের ওপরে সোনালী-লাল ছাইয়ের গুঁড়ো ঝরে ঝরে পড়ে। স্পষ্ট বোঝা যায়, বিশ্ব-চরাচর আঁধার হয়ে যাচ্ছে আর প্রদোষের উষ্ণতায় অবগাহন করে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। রৌদ্র-পরিতৃপ্ত গাছের পাতাগুলি ডালের ওপরে মুদে আসে, ঘাসের ডগাগুলি মাটিতে মাথা নুইয়ে দেয়। চারদিকে বিপুলতর ঐশ্বর্য ও কমনীয়তা; গানের সুরের মতো নরম একটা সুগন্ধ চারদিক থেকে নিঃসৃত হয়। আর বাজনার সুর ভেসে আসে দূর-মাঠের সৈন্যদের তাঁবু থেকে। মা'র ভালোবাসার মতো জোরালো আর তাজা একটা অনুভূতি জেগে ওঠে রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে; নিঃশব্দতা তার উষ্ণ আর তুলতুলে ছোঁয়া দিয়ে শান্ত করে তোলে মনকে। সারাদিনে যা কিছু ধুলো আর জঞ্জাল জমে, যা কিছু ভুলে যাওয়া উচিত — সমস্ত গ্লানি কেটে যায়। আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে শুয়ে থাকতে কী ভালোই না লাগে তখন। একটি একটি করে তারা ফুটে ওঠে আকাশের গায়ে; আর প্রত্যেকটি তারা আকাশের গভীরতাকে নতুন করে উদ্ঘাটিত করে। সেই দূরপ্রসারী গভীরতা মানুষকে আল্তোভাবে মাটি থেকে তুলে ধরে — তখন কিছুতেই বোঝা যায় না, পৃথিবীটা কুঁকড়ে

কুঁকড়ে ছোট হয়ে মানুষটার সমান হয়ে গেছে, না, মানুষটা এক আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় ফুলেফেঁপে বড়ো হতে হতে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। তারপর নিঃশব্দতা আরো বেড়ে চলে, অন্ধকার আরো গাঢ় হয়, সর্বত্র ছোট ছোট ঝঙ্কার তুলে অদৃশ্য তারগুলি কাঁপতে থাকে। একটা ঘুমন্ত পাখি গান গেয়ে ওঠে, একটা শজারু খস্‌খস্‌ শব্দে ছুটে চ'লে যায়, একটা মানুষের গলার স্বর ভেসে আসে — আর এই প্রত্যেকটি ঝঙ্কারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক একটা রূপ আছে, এই বিশিষ্টরূপের জন্যেই এই শব্দগুলোকে দিনের বেলার বিভিন্ন শব্দ থেকে আলাদা করে চেনা যায়; আর প্রত্যেকটি ঝঙ্কারের নিজস্ব এই রূপ স্পর্শকাতর নিঃশব্দতার পটভূমিকায় আরো চমৎকারভাবে রেখায়িত হয়ে ওঠে।

দিনের মৃত্যু হচ্ছে। ঝরে পড়ছে দিনের শেষ পাতাগুলি — একর্ডিয়নের সুর, স্ত্রী-কণ্ঠের হাসি, পাথরবাঁধানো রাস্তায় তলোয়ারের আঘাতের খট্‌খট্‌ শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক।

আর মাঝে মাঝে হঠাৎ বাইরের রাস্তা বা খোলা মাঠের দিক থেকে মাতলামির সোরগোল ও ছুটে-চলার ধুপ্‌ধাপ শোনা যায়। এই শব্দগুলি এতবেশি নিত্যনৈমিত্তিক যে মনোযোগ আকর্ষণ করে না।

দিদিমা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতের ওপরে মাথা দিয়ে চোখ খোলা রেখে শুয়ে থাকেন। নিজের আবেগেই বলে চলেন পুরনো দিনের অনেক কথা। সে-সব কথা আমি শুনছি কি শুনছি না, সেদিকে দিদিমার বিশেষ ভ্রূক্ষেপ থাকে বলে মনে হয় না। আর কাহিনী নির্বাচনে তাঁর এমন একটা দক্ষতা আছে যা প্রতিটি রাত্রিকেই বিশেষ সৌন্দর্য ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে।

দিদিমার কথার সুর আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ঘুম ভাঙে যখন মুখের ওপরে রৌদ্র এসে পড়ে আর কানের কাছে পাখিরা গান গায়। রৌদ্রের উত্তাপে সকালবেলার বাতাস আড়মোড়া ভাঙে, আপেল গাছের পাতাগুলি গা-ঝাড়া দিয়ে শিশির ঝরিয়ে দেয়, সবুজ ঘাসগুলো এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে কাঁচের মতো স্বচ্ছ মনে হয়, ঘাসের উপর থমকে থাকে পাতলা কুয়াশা। সূর্যের রশ্মি সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে আর লাইলাক-রঙা আকাশ নীল হয়ে ওঠে একটু একটু করে। চোখের দৃষ্টির বাইরে আকাশের অনেক উঁচু থেকে ভেসে আসে লার্কপাখির গান। নবজাত দিনের সমস্ত শব্দ আর বর্ণ শিশিরবিন্দুর মতো চুঁইয়ে চুঁইয়ে আমার আত্মার গভীরে প্রবেশ করে আর

এক অনির্বচনীয় শান্ত আনন্দে ভরে যায় আমার অন্তর। ইচ্ছে জাগে, দিনের কর্মতৎপরতার মধ্যে নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিই, মনের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ না রেখে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকি।

আমার সারা জীবনের মধ্যে এই সময়টিতেই আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশান্তি ও অনুধ্যান এসেছিল। এই গ্রীষ্মকালটিতে আমার নিজের শক্তি সম্পর্কে একটা চেতনা জেগে উঠেছিল আমার মধ্যে। সে-সময়ে লোকজনকে আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করি। অভসিয়ান্নিকোভদের বাড়ির ছেলেদের ডাকাডাকি ও চিৎকার কানে আসে, তবুও ওদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে ইচ্ছে করে না। আবার মামাতো-ভাইরা যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন খুশি তো হই-ই না, বরং প্রতি মুহূর্তে ভয় হতে থাকে, ওরা আমার বাগানটিকে না নষ্ট করে ফেলে। এই বাগানটাই হচ্ছে আমার নিজের হাতে তৈরি জিনিসের প্রথম নিদর্শন।

দাদামশাইয়ের বচন শুনতেও আমার আর ভালো লাগে না। বচনগুলি ক্রমাগতই বেশি কাটা-কাটা ও নালিশে ভরা হয়ে উঠেছে। দিদিমার সঙ্গে প্রায়ই তাঁর ঝগড়া লেগে যায় আর দিদিমাকে তখন তিনি বাড়ি থেকে বের করে দিতেন। আর যখনই এ-ধরনের ব্যাপার হয়, দিদিমা গিয়ে ওঠেন ইয়াকভ-মামা কিংবা মিখাইল-মামার বাড়িতে। এককেবার এমন হয় যে কিছুদিন তিনি আর বাড়িই ফেরেন না। বাধ্য হয়ে দাদামশাইকেই নিজের হাতে রান্না করতে হয়। রান্না করতে গিয়ে চিৎকার আর গালিগালাজ করে, আঙুল পুড়িয়ে, কাপ-ডিশ ভেঙে এক তুমুল কাণ্ড শুরু করে দেন এবং দিনের পর দিন আরো বেশি কৃপণ হয়ে ওঠেন।

মাঝে মাঝে বাগানের মধ্যে আমার কুঞ্জটিতে এসে হাজির হন। বেশ আয়েসের সঙ্গে ঘাসের চাপড়ার ওপরে বসে নিঃশব্দে বহুক্ষণ তাকিয়ে দেখেন আমাকে। তারপরে একসময়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন:

'কী রে, মুখে কথা নেই কেন?'

'জানি না।'

তারপরেই শুরু হয় তাঁর উপদেশ-বর্ষণ:

'আমাদের আর কতটুকু দাম রে! কেউ আমাদের কোনো কিছু শেখাতে আসবে না — সব আমাদের নিজেদের শিখে নিতে হবে। এত বই লেখা হয়েছে, এত স্কুল তৈরি হয়েছে — কিন্তু সে-সব অপরের জন্যে, আমাদের জন্যে নয়। নিজেদেরটা নিজেদেরই করে নিতে হবে আমাদের...'

বলতে বলতে নিজের চিন্তাতেই ডুবে গিয়ে চুপ করে যান, নিস্পন্দ ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর দিকে তাকাতে ভয় করে সে-সময়ে।

সেই বছর শরৎকালেই দাদামশাই বাড়ি বিক্রি করে দিলেন। বাড়িটা বিক্রি করার আগে একদিন সকালবেলা চায়ের টেবিলে বসে বিষণ্ণ ও দৃঢ় স্বরে দিদিমার কাছে ঘোষণা করলেন খবরটা:

'গিন্নী, তোমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা এতদিন ধরে আমিই করে এসেছি। কিন্তু আমার পক্ষে আর তা সম্ভব নয়। এবার থেকে তোমার নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে।'

খবরটা শুনে দিদিমা কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না মনে হল, যেন অনেক দিন থেকেই তিনি ঠিক এই কথাগুলোই দাদামশাইয়ের মুখ থেকে শুনবেন বলে আশা করছিলেন। ধীরে-সুস্থে নস্যির কৌটা বার করে ছিদ্রবহুল নাকের মধ্যে নস্যি ঠেসে জবাব দিলেন তিনি:

'তা কী আর করা যাবে। যেমন অবস্থা, তেমনি ব্যবস্থা — এছাড়া আর উপায় কি!'

একটা বন্ধ গলির মধ্যে পুরনো এক বাড়ির মাটির নীচের দুটি অন্ধকার ঘর ভাড়া নিলেন দাদামশাই। বাড়ি ছেড়ে উঠে যাবার আগে দিদিমা করলেন কি, লম্বা ফিতে লাগানো বাকলের তৈরি একটা জুতো নিয়ে গুঁজে দিলেন চুল্লির নীচে। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে বাড়ির উপদেবতাকে ডাকতে লাগলেন:

'হে বাড়ির উপদেবতা, তোমাকে ডাকছি, তুমি বেরিয়ে এসো। তোমার জন্যে বাহন এনেছি — চেপে বসো বাহনটিতে। তারপর আমাদের সৌভাগ্যকে বহন করে নিয়ে চলো আমাদের নতুন বাড়িতে।'

দাদামশাই গিয়েছিলেন বাইরের উঠোনে। সেখান থেকে জানলা দিয়ে তাকিয়ে বললেন:

'আবার ওইসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড শুরু হয়েছে! ধর্মকর্ম আর কিছু রইল না দেখছি! খবরদার বলছি থাম! আমার মুখে কালি লাগাতে তোমাকে দেব না!'

'আমি তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে বাধা দিও না গো। বাধা দিলে অকল্যাণ হবে! কিছুতেই তা তুমি ঠেকাতে পারবে না!' দিদিমা সাবধান করে দিতে চাইলেন। কিন্তু দাদামশাই ততোক্ষণে রাগে অগ্নিশর্মা — দিদিমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিলেন তিনি।

তারপর তিনদিন ধরে চলল বাড়ির পুরানো আসবাব বেচাকেনা — পুরানো মালের আড়ৎদার একদল তাতারের কাছে দাদামশাই বিক্রি করলেন

আসবাবগুলোকে। প্রচণ্ড হাঁকডাক আর গালাগালি করে দরাদরি করলেন। জানলায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলেন দিদিমা; কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন, কখনো মৃদু স্বরে বলছেন—'ভাঙুক, সব জিনিস ভাঙুক! বাড়ি উজাড় করে নিয়ে যাক্ সব!..'

আমার খেলার জায়গা সেই কুঞ্জটিকে ছেড়ে যেতে হবে বলে আমারও কান্না পাচ্ছে।

আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে দুটো গাড়ি এল। মালপত্র ও টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা যে গাড়িটাতে আমি চেপে বসলাম, সেটা রাস্তায় চলতে চলতে এমন ঝাঁকুনি দিতে লাগল যেন আমাকে ছিট্‌কে ফেলে দিতে চাইছে।

এই ঘটনার দু-বছর পরে আমার মা মারা যায় এবং এই দুটি বছরের প্রতিটি মুহূর্তে এই অনুভূতিই আমাকে তাড়া করে ফিরেছে—সব সময়ে মনে হত, কিসের যেন একটা ঝাঁকুনি অনবরত ছিট্‌কে ফেলে দিতে চাইছে আমাকে।

নীচের তলার ঘরদুটোতে উঠে আসার কিছুদিন পরেই মা এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। মা'র শরীরটা রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আচম্‌কা একটা বিস্ময়েই যেন জ্বলজ্বল করছে বড়ো বড়ো চোখদুটো। সবকিছুকে এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মা যেন তার নিজের বাপ-মাকে এবং তার নিজের ছেলেকে এই প্রথম দেখছে। একটি কথাও না বলে মা শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ওদিকে আমার সৎ-বাপ অনবরত ঘরের এমাথা-ওমাথা পায়চারি করছে, চাপা স্বরে শিস্ দিচ্ছে, গলা খাঁকারি দিচ্ছে, পিঠমোড়া করে হাত রেখে আঙুল কচ্‌লাচ্ছে।

'আরে বাবাঃ, কত বড়োটি হয়ে গেছিস রে!' দুই হাতের উত্তপ্ত তালুর মধ্যে আমার মুখখানাকে নিয়ে বলল আমার মা। মা'র পরনে বাদামী রঙের বিশ্রী একটা ঢিলেঢালা পোশাক—পেটের কাছটায় উঁচু হয়ে ঢোল হয়ে আছে।

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সৎ-বাপ বলল, 'নমস্কার খোকা, কেমন আছ?'

ঘরের বাতাসটা শুঁকে নিয়ে বলল আবার:

'বড়ো স্যাঁৎসেঁতে ঘরটা।'

ভারি শ্রান্ত আর এলোমেলো দেখাচ্ছে দু'জনকেই; যেন, দু'জনকে অনবরত শুধু ছুটতে হয়েছে এবং আপাতত দু'জনেরই যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার তা হচ্ছে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম।

চুপচাপ চা খেলাম আমরা। আবহাওয়াটা যেন থমকে রয়েছে। জানলার শার্সির ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আর দাদামশাই তাকিয়ে আছেন সেদিকে।

'তাহলে তুমি বলছ যে ঘরে আগুন লেগে তোমরা সর্বস্বান্ত হয়েছ?'

'একেবারে সর্বস্বান্ত,' দৃঢ় স্বরে বলল আমার সৎ-বাপ, 'আরেকটু হলে আমরাও আট্‌কা পড়তাম, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হত না।'

'হুঁ, আগুন তো আর ছেলেখেলা নয়।'

দিদিমার দিকে ঝুঁকে পড়ে দিদিমার কানে কানে কি যেন বলল আমার মা। শুনতে শুনতে, উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মতো করে দিদিমা চোখদুটো কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। আবহাওয়াটা আরো বেশি থমকে রইল।

হঠাৎ দাদামশাই বিষভরা গলায় শান্ত স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, লোকে বলাবলি করে, ওসব আগুন-টাগুন কিছু নয়, তাস-খেলায় তুমি সর্বস্বান্ত হয়েছ।'

ঘরের মধ্যে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা নেমে এল; শুধু জানলার শার্সিতে বৃষ্টি পড়ার রিমঝিম শব্দ আর সামোভারে জল ফুটবার শোঁ শোঁ আওয়াজ।

'বাবা...' অনেকক্ষণ পরে কথা বলল আমার মা।

'বাবা!' দাদামশাই হিংস্র একটা হুংকার ছাড়লেন, 'এবার? এবার কী হবে? তখন আমি বলিনি যে ত্রিশ বছরের মেয়ের পক্ষে কুড়ি বছরের ছোকরাকে বিয়ে করার মতো পাগলামি আর কিছু নেই? কেমন, এবার শিক্ষা হয়েছে তো? আর এই যে তুমি এখানে, চমৎকার নমুনা — নয় কী? তোকে ভদ্রঘরের বৌ করেছে, না? এখন কেমন লাগছে বেটি?'

একথার পর চারজনে একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। সবচেয়ে বেশি চিৎকার করল আমার সৎ-বাপ। ঘর থেকে বেরিয়ে সদরের দিকে চলে এলাম আমি এবং একটা কাঠের স্তূপের ওপরে হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। যাকে আমি দেখছি, সে কক্ষণো আমার মা হতে পারে না — আমার মা ছিল একেবারে আলাদা ধরনের মানুষ। ঘরে থাকার সময়েই এই ধারণা খানিকটা আমার মধ্যে এসেছিল কিন্তু এখন বাইরের এই অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে পুরানো দিনের মা'কে আমি খুব স্পষ্টভাবে মনে করতে পারলাম।

তারপরের ঘটনাগুলি আমি ভুলে গেছি। শুধু এটুকু মনে আছে,

সর্মোভো'র* একটা নতুন বাড়িতে আমাকে উঠে আসতে হয়েছিল। কাঠের বাড়ি, দেওয়ালগুলোতে কাগজ আঁটা নেই। পাট গুঁজে রাখা হয়েছে ফাটলগুলোতে — অসংখ্য আরশোলার বাস সেখানে। রাস্তার দিকের ঘরদুটিতে থাকে আমার মা ও আমার সৎ-বাপ আর দিদিমা ও আমি থাকি রান্নাঘরে। রান্নাঘরটিতে একটিমাত্র জানলা; জানলাটা খুললে একটা ছাদ দেখা যায়। তার পিছনে আকাশের পটভূমিকায় কালো ছবির মতো ফুটে আছে কারখানার কালো কালো চিম্‌নি। চিম্‌নিগুলো থেকে পাক খেয়ে খেয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া ওঠে আর শীতকালের বাতাসে সেই ধোঁয়া সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। সেই চিম্‌নির ধোঁয়ার তেল-চিটচিটে গন্ধে আমাদের শীতল ঘরগুলো সব সময়ে ভরে থাকে। ভোর না হতেই কারখানার বাঁশি নেকড়ের মতো হুঙ্কার ছাড়ে:

'উ-উ-ওয়া! উ-উ-ওয়া!'

একটা বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে জানলার ওপর দিকের শার্সি দিয়ে তাকিয়ে দেখলে কারখানার আলোকোজ্জ্বল গেট দেখতে পাওয়া যায়; গেটটা বুড়ো ভিখিরির দন্তহীন মুখের মতো হাঁ করে আছে আর ক্ষুদে মানুষগুলোকে পালে পালে গিলছে। দুপুরবেলা আবার কারখানার বাঁশি বেজে ওঠে। তখন কারখানার গেট আরেকবার তাদের কালো কালো ঠোঁটগুলো ফাঁক করে দেয় আর বেরিয়ে পড়ে একটি অতল গহ্বর। সেই গহ্বর থেকে জীর্ণ ও অবসন্ন অবস্থায় উগরে উগরে বার করে দেয় সেই ক্ষুদে ক্ষুদে মানুষগুলোকে; কালো একটা স্রোতের মতো রাস্তা থেকে রাস্তায় প্রবাহিত হয়ে চলে সেই মানুষের দল। তুষারতাড়িত বাতাস রুক্ষ সাদা হাতের মতো তাদের ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ঘরের মধ্যে। আকাশ প্রায় দেখাই যায় না। সারি সারি ছাদ ও বরফের পাড়ের ওপরে নিচু হয়ে ঝুলে থাকে আরেকটা ধূসর ও সমতল ছাদ যা কল্পনাশক্তিকে ব্যাহত করে এবং নিরানন্দ একঘেয়েমিতে দৃষ্টি অন্ধ করে দেয়।

সন্ধ্যার সময়ে কারখানার ওপরে আকাশে আবছা একটা লাল আভা থমকে থাকে। আলোর রেখা পড়ে চিম্‌নির কিনারগুলোতে আর তা দেখে মনে হয় — চিম্‌নিগুলো মাটি থেকে আকাশে উঠছে না, আকাশের পাণ্ডুর মেঘ থেকে

* নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ'এর শিল্প-অঞ্চল। এই অঞ্চলেই জাহাজ-তৈরির কারখানা ও অন্যান্য কারখানা ছিল। — সম্পাঃ

নেমে আসছে নিচের দিকে; আগুন গিলে খাচ্ছে আর পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ঢেঁকুর তুলছে আর হুঙ্কার ছাড়ছে। দিনের পর দিন এই একই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অসহ্য একটা যন্ত্রণা হয় আর মনের মধ্যে একটা হিংস্রতার জ্বালা অনুভব করতে থাকি। গৃহস্থালির সব কাজই করেন দিদিমা। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাঁর ফুরসৎ নেই — রান্না করেন, ঘর মোছেন, কাঠ কাটেন, জল তোলেন। সারাদিনের পর সন্ধ্যের দিকে আর চুপ করে থাকতে পারেন না, কাৎরাতে থাকেন ক্লান্তিতে। মাঝে মাঝে রান্না হয়ে যাবার পরে তিনি একটা তুলো-ঠাসা খাটো জ্যাকেট পরে স্কার্টটা তুলে ধরে বেরিয়ে পড়েন শহরের দিকে। বলেন:

'যাই একটু দেখে আসি বুড়ো কেমন দিন কাটাচ্ছে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব দিদিমা!'

'পাগল হয়েছিস নাকি! ঠাণ্ডায় জমে যাবি একেবারে! কী রকম হাওয়া দেখছিস তো!'

বরফে চাপা পড়ে রাস্তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। তার ওপর দিয়েই পুরো সাত ভার্স্ট* পথ হেঁটে তিনি শহরে যান।

আমার মা অন্তঃসত্ত্বা; শরীরটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আর ফুলে উঠেছে। লম্বা পাড় বসানো একটা ছাইরঙা ছেঁড়া শাল গায়ে দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে মা বসে থাকে। এই শালটাকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। এই শালটা মুড়ি দিয়ে বসলে মা'র দীর্ঘাঙ্গ সুন্দর চেহারাটা কেমন বিকৃত হয়ে যায়। শালের পাড়টা ঝুলঝুল করছে, দেখে আমার গা জ্বালা করে, এই পাড়টা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে; এই কারখানা, এই গোটা অঞ্চলটাই আমার দু-চোখের বিষ হয়ে উঠেছে। একটা পুরনো ছেঁড়া ফেল্টের জুতো পায়ে দিয়ে মা বেড়ায়, কাশে, আর কাশতে গিয়ে মস্ত পেটটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। মা'র ধূসর-নীল চোখদুটোতে একটা কঠোর ও শুষ্ক ক্রোধের আগুন ঝিলিক দিয়ে যায়। কিংবা ফাঁকা দেওয়ালের দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে মা, মনে হয় যেন দেওয়ালের সঙ্গে তার চোখের দৃষ্টি এঁটে গেছে। মাঝে মাঝে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে, হয়তো পুরো একটি ঘণ্টা কেটে যায় তবুও খেয়াল হয় না। রাস্তাটা যেন একটা চোয়ালের মতো; এই চোয়ালের কতগুলো দাঁত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কালো আর বিশ্রী হয়ে গেছে, বাকিগুলো

দেড় ভার্স্ট এক মাইলের কাছাকাছি। — সম্পাঃ

খসে পড়েছে একেবারে; আর এই খসে-পড়া দাঁতের জায়গায় লাগানো হয়েছে চোয়ালের তুলনায় বেমানান রকমের বড়ো থ্যাব্‌ড়া থ্যাব্‌ড়া নতুন দাঁত।

'এমন জায়গায় আমরা থাকি কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'চুপ, চুপ, একথা বলিসনে।' মা জবাব দেয়।

আজকাল মা আমার সঙ্গে খুবই কম কথাবার্তা বলে। যেটুকু বলে তাও হচ্ছে শুধু ফাইফরমাশ। যেমন:

'এটা নিয়ে আয় তো, ওটা নিয়ে যা তো, যা তো একবার চট্‌ করে দোকানে...'

বাইরে খেলাধুলো করতে যাওয়া আমার প্রায় একেবারেই বারণ; মা আমাকে সহজে ছাড়তে চায় না। বাইরে গেলেই আমি সঙ্গীদের হাতে প্রচণ্ড রকমের মার খেয়ে ফিরে আসি — মারামারি করে আমি যা আনন্দ পাই এমন আর কোনো কিছুতে নয়, আমার সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই কাজেই লেগে থাকি। মা আমাকে বেল্ট দিয়ে প্রহার করে কিন্তু যতোই শাস্তি পাই ততোই এ-ব্যাপারে আমি একরোখা হয়ে উঠি। ফল হয় এই যে, পরের বার মারামারি করবার সময় আমার গোঁয়াতুর্মিটা আরো বেশি বেড়ে যায় আর বাড়ি ফিরে এলে মা আমাকে আরো বেশি শাস্তি দেয়। একবার তো মা'কে আমি সাবধান করে দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিই যে মা যদি আমাকে মারপিট করা বন্ধ না করে তাহলে মা'র হাত কামড়ে দিয়ে আমি বাইরে মাঠে গিয়ে পড়ে থাকব আর ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মরে যাব। আঁতকে উঠে মা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে আর ক্লান্তিতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে:

'আস্ত একটা জানোয়ার হয়েছিস তুই!'

মানুষের মনের যে জীবন্ত আর রামধনুর মতো উচ্ছল অনুভূতির নাম ভালোবাসা, তা আস্তে আস্তে আমার মন থেকে মুছে যেতে থাকে। আর সে জায়গায় দেখা দেয় সবার বিরুদ্ধে ও সবকিছুর বিরুদ্ধে আক্রোশের নীল ঝলক, ধিকি ধিকি অসন্তোষ, আর এই একঘেয়ে ও বীভৎস রকমের অর্থহীনতায় আমি একেবারেই একা — এমনি একটা ধারণা।

আমার সৎ-বাপ আমাকে কড়া শাসনে রাখে আর আমার মা'র সঙ্গে প্রায় কথাই বলে না। এই লোকটি সব সময়েই শিস দেয় আর কাশে আর একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁকা-বাঁকা দাঁতগুলো খোঁটে। প্রায়ই ঝগড়া করে আমার মা'র সঙ্গে আর এই ঝগড়াটা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। মাকে এমন

নীরস ও অনাত্মীয় স্বরে ডাকে যা আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি না। ঝগড়ার সময়ে রান্নাঘরের দিকের দরজাটা সে বন্ধ করে দেয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে তার কথাগুলি আমি শুনি, এটা তার ইচ্ছে নয়। কিন্তু সেই গম্ভীর ও রূঢ় গলার স্বর শোনবার জন্যে আমি ওৎ পেতে থাকি।

একদিন শুনলাম, মেঝেতে পা ঠুকতে ঠুকতে সে চিৎকার করে বলছে: 'কুত্তী কোথাকার, তোর ওই জয়ঢাক পেটটার জন্যে আমি লোকজনকে বাড়িতে ডাকতে পারি না!'

শুনে আমি একেবারে থ' হয়ে গেলাম। রাগে আমার সর্বাঙ্গ রি-রি করতে লাগল। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে মাথাটা ছাদের সঙ্গে এমন জোরে ঠুকে গেল যে দাঁত বসে গেল আমার জিভে।

প্রতি শনিবার দলে দলে মজুর আসে আমার সৎ-বাপের কাছে। কোম্পানির দোকান থেকে খাদ্যবস্তু কেনবার জন্যে মজুরদের বরাদ্দ কুপন আছে; কুপনগুলি তারা বিক্রি করে যায়। কারখানা থেকে এই কুপনগুলি দেওয়া হয় মজুরির বদলে আর আমার সৎ-বাপ সেগুলি কেনে আধাআধি দরে। মজুরদের সঙ্গে সে দেখা করে রান্নাঘরে টেবিলের সামনে বসে, মুখে বেশ একটা ভারিক্কী ভাব ফুটিয়ে তোলে আর প্রতিটি কুপন হাতে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভুরু কুঁচকিয়ে থাকে।

'দেড় রুবল।'

'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, যীশু খ্রীষ্টের দোহাই...'

'দেড় রুবল।'

এই বিপর্যস্ত ও অন্ধকার জীবন খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মা'র যখন আঁতুড়ঘরে যাবার সময় হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দাদামশাইয়ের বাড়িতে। দাদামশাই তখন কুনাভিনো অঞ্চলে পেশচানায়া স্ট্রীটে একটা দোতলা বাড়িতে থাকেন। বাড়িটার অদূরে নাপোলনায়া গির্জার সমাধিস্থান। দাদামশাইয়ের ঘরটি ছোট আর এই ছোট ঘরটিতে একটি বৃহৎ রুশ চুল্লি। উঠোনের দিকে দুটি জানলা।

'এই যে, এসে গেছিস!' আমাকে দেখে দাদামশাই একটু যেন শব্দ করেই হেসে উঠলেন, 'কথায় আছে না, মা'র চেয়ে বড়ো আপন নেই — কিন্তু তোর বেলায় দেখছি কথাটা খাটছে না। এই বুড়ো-শয়তান দাদামশাইটাই কিনা হয়ে উঠল তোর সবচেয়ে আপন জন! হুঃ, কী সব মানুষ!'

এই বাড়িটার সঙ্গে সবে আমি খানিকটা পরিচয় করে নিয়েছি এমন সময়

বাচ্চা কোলে নিয়ে আমার মা ও দিদিমা এসে হাজির। মজুরদের ঠকাবার অপরাধে কারখানার চাকরিটি খুইয়েছে আমার সৎ-বাপ। কিন্তু বন্ধুবান্ধবকে ধরাধরি করে সঙ্গে সঙ্গে রেলস্টেশনের ক্যাশিয়ারের চাকরি পেয়ে গেছে।

তারপর বেশ কিছুটা ফাঁকা সময় কেটে যাবার পরে আবার আমাকে পাঠানো হল মা'র সঙ্গে থাকবার জন্যে। এবারে পাথরে তৈরি একটা বাড়ির মাটির তলার ঘর। সঙ্গে সঙ্গে মা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিল আর প্রথম দিন থেকেই আমি স্কুলকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখলাম।

স্কুলে হাজির হবার সময়ে আমার সাজপোশাকটা ছিল এইরকম: পায়ে মা'র একজোড়া জুতো; পরনে দিদিমার ব্লাউজের কাপড় কেটে তৈরি কোট, হল্‌দে শার্ট আর লম্বা ট্রাউজার। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আমার পিছনে লাগতে শুরু করে দিল আর গায়ের হল্‌দে শার্টটার জন্যে সবাই ঠাট্টা করে আমার নাম রাখল — 'রুইতনের টেক্কা'। ছেলেদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হল না। কিন্তু স্কুলের পাদরি ও শিক্ষকমশাই গোড়া থেকেই আমাকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখলেন।

শিক্ষকমশাইটির টাকমাথা ও হল্‌দে মুখ। মাঝে মাঝে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। নাকের ফুটোদুটোয় তুলো গুঁজে দিয়ে তিনি ক্লাশঘরে ঢোকেন, ডেস্কের সামনে নিজের জায়গাটিতে বসে নাকি নাকি সুরে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন আমাদের। আর মাঝে মাঝে হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে নাক থেকে তুলো টেনে বার করেন আর মাথা ঝাঁকিয়ে সেটাকে পরীক্ষা করতে শুরু করেন। তাঁর মুখটা থ্যাবড়া আর কট্‌কটে। মুখের রঙটা তামার মতো, চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে সবুজ একটা আস্তরণ পড়েছে মনে হয়। কিন্তু তাঁর মুখের যে জিনিস দেখে সবচেয়ে বেশি গা ঘিন ঘিন করে তা হচ্ছে তাঁর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো। সারা মুখমণ্ডলের সঙ্গে এই চোখদুটোর যেন এতটুকু সঙ্গতি নেই। আর এই চোখদুটো সারাক্ষণ আমার মুখের ওপরে এঁটে আছে। তখন আমার এমন একটা অবস্থা হয় যে ইচ্ছে হতে থাকে, হাত দিয়ে আমার মুখটা মুছে নিই।

প্রথম কয়েকদিন আমি বসেছিলাম সামনের বেঞ্চিতে, শিক্ষকমশাইয়ের একেবারে নাকের নিচে। ক্রমশ সেটা অসহ্য হয়ে ওঠে। আমার মনে হতে থাকে, শিক্ষকমশাই যেন আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পান না, এবং নাকি নাকি সুরে আমাকেই শুধু বলে চলেছেন:

'পেস্কো-ও-ভ, শার্ট বদলে আসবে! পেস্কো-ও-ভ, মেঝের ওপরে পা ঘোষো না! পেস্কো-ও-ভ, তোমার জুতো থেকে আবার মেঝের ওপরে কাদার দাগ লেগেছে!'

আমিও ছেড়ে কথা বলি না। মাথা থেকে অতি মারাত্মক রকমের সব কৌশল আবিষ্কার করে তাঁকে নাস্তানাবুদ করে তুলি। একদিন করলাম কী, একটা আধ-পচা তরমুজ যোগাড় করে সেটাকে আধখানা করে ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর একটা কপিকল দিয়ে সেটাকে ঝুলিয়ে দিলাম অন্ধকার বাইরের ঘরের দিকের দরজাটার ওপরে। দরজাটা খুললেই তরমুজের টুক্‌রোটা শূন্যে উঠে যায় কিন্তু শিক্ষকমশাই যেই না দরজাটা বন্ধ করলেন অমনি তরমুজের টুক্‌রোটা নেমে এসে টুপির মতো থপ্‌ করে বসে গেল তাঁর টাকমাথার ওপরে। এই ঘটনার পরে স্কুলের রাত্রিবেলার পাহারাদার শিক্ষকমশাইয়ের চিঠি নিয়ে আমাকে বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে গেল। অপকর্মটির জন্যে একচোট পিটুনি খেতে হল আমাকে।

আরেকবার তাঁর ডেস্কের ড্রয়ারে নস্যির গুঁড়ো ছড়িয়ে রেখেছিলাম। ফলে হাঁচতে হাঁচতে তাঁর এমন অবস্থাই হল যে বাধ্য হয়ে তিনি ক্লাশ ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি নিজে আর আসতেই পারলেন না, সে-জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এক জামাইকে। এই জামাইটি হচ্ছে একজন অফিসার। সে ক্লাশ নিতে এসে আমাদের দিয়ে সারাক্ষণ শুধু দুটি গান গাওয়াল। একটি হচ্ছে, 'ভগবান জারকে দীর্ঘজীবী করুন!' অপরটি, 'স্বাধীনতা, আমার প্রিয় স্বাধীনতা!' কেউ বেসুরো গেয়ে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে তার মাথায় রুল দিয়ে টোকা মারে। টোকা মারার ভঙ্গিটা ভারি মজার; খেজায় শব্দ হয় কিন্তু একটুও ব্যথা লাগে না।

ধর্মপুস্তক যিনি পড়ান তিনি একজন তরুণ বয়সী পাদ্রি, মাথায় ফুলো ফুলো ঘন চুল এবং তাঁর চেহারাটা সুন্দর। তিনি আমাকে অপছন্দ করেন কারণ 'বাইবেলের গল্প' বইটা আমার নেই আর তাঁর কথা বলার ভঙ্গি আমি নকল করি।

ক্লাশঘরে ঢুকেই তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞেস করা:

'পেশ্‌কভ, তুমি বই এনেছ কি আননি? হ্যাঁ, বই।'

'না, আনিনি। হ্যাঁ।'

'"হ্যাঁ" মানে?'

'না।'

'যাও, এক্ষুণি বাড়ি চলে যাও! হ্যাঁ, বাড়ি। কারণ তোমার মতো ছেলেকে পড়াবার ইচ্ছে আমার নেই। হ্যাঁ, বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।'

বাড়ি ফিরে যেতে আমার আপত্তি নেই। তাহলে আমি স্কুল-ছুটির সময় না হওয়া পর্যন্ত এই অঞ্চলের নোংরা রাস্তাগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারি এবং চারপাশের বিচিত্র কোলাহলপূর্ণ জীবনকে লক্ষ্য করতে পারি।

পাদরিমশাইয়ের মুখটি সুকুমার, যিশু খ্রীষ্টের মুখের মতো। মেয়েলি চোখদুটো থেকে স্নেহ ঝরে পড়ছে। ছোট ছোট হাত; বই বা রুল বা কলম বা অন্য যা-কিছুর ওপরে সেই হাতের ছোঁয়া পড়ে, মনে হয় যেন আদর করছেন। মনে হয়, প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনি ভালোবাসেন, প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনি জীবন্ত বলে মনে করেন — যেন অসতর্কভাবে নাড়াচাড়া করলে এই জিনিসগুলোর ব্যথা লাগবে। তবে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ওপরে তাঁর স্নেহটা এর চেয়ে কমই — তা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা তাঁকে ভালোবাসে।

স্কুলে সাধারণত আমি মোটামুটি ভালোই নম্বর পেয়েছিলাম কিন্তু তবুও আমাকে জানিয়ে দেওয়া হল যে আমার বেয়াদবির জন্যে আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। খবরটা শুনে আমি বিচলিত হলাম। ব্যাপারটা যদি তাই ঘটে তবে নিঃসন্দেহে এই ব্যাপারের ফলাফল আমার পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠবে। আমার মা'র মেজাজটা দিনের পর দিন তিরিক্ষি হয়ে উঠছে এবং আজকাল প্রায়ই সে আমাকে মারধোর করে।

কিন্তু এই চরম বিপদ থেকে আমি উদ্ধার পেয়ে গেলাম। বিশপ ক্রিসান্‌ফ* আমাদের স্কুল পরিদর্শনে এলেন; একেবারেই হঠাৎ-আসা, আগে থেকে কোনো রকম ঠিক ছিল না। যতোদূর আমার মনে আছে বিশপ ক্রিসান্‌ফের পিঠে কুঁজ ছিল।

মানুষটি ছোট, পরনে ফুরফুরে কালো পোশাক; তিনি যখন ক্লাশঘরে ঢুকে ডেস্কের সামনে আসন গ্রহণ করলেন তখন খুশি ও অন্তরঙ্গতার একটা অপরিচিত হাওয়ায় ক্লাশঘরটা যেন ভরে গেল।

* বিশপ ক্রিসান্‌ফ — বিখ্যাত তিনখণ্ডে-সমাপ্ত 'প্রাচীন পৃথিবীর ধর্ম' পুস্তকের গ্রন্থকার এবং 'মিশরীয় দেহান্তরবাদ' ও 'নারী ও বিবাহ' প্রবন্ধদ্বয়ের লেখক। শেষোক্ত প্রবন্ধটি আমাকে তরুণ বয়সে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। প্রবন্ধটির শিরোনামা হয়তো আমি ভুল লিখে থাকতে পারি — প্রবন্ধটি অষ্টম দশকে একটি ধর্ম-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। — গোর্কি

জামার মস্ত মস্ত আস্তিনের ভিতর থেকে হাতদুটো বার করে তিনি বললেন, 'বাবারা, এস একটু গল্পগুজব করা যাক্।'

নাম ধরে ধরে তিনি এক-একজনকে ডেস্কের সামনে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। আমার পালা এল তালিকার একেবারে শেষ দিকে।

'তোমার বয়স কত?' জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, 'সত্যি? বাব্বাঃ, এইটুকু বয়সেই কী প্রকাণ্ড শরীর হয়েছে তোমার! অনেক রোদজল গায়ের ওপর দিয়ে গেছে নিশ্চয়ই?'

রোগা রোগা হাত, আঙুলের নখগুলো লম্বা আর ছুঁচলো। একটা হাত রাখলেন টেবিলের ওপরে, আরেক হাতে ধরলেন মুখের অল্প কয়েক গোছা দাড়ি। দরদভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি:

'আচ্ছা, ধর্মপুস্তকের যেসব গল্প তোমার ভালো লাগে তার একটা বলো তো শুনি।'

যখন আমি তাঁকে বললাম যে পাঠ্য ধর্মপুস্তকের বইটি আমার নেই, সুতরাং কোনো গল্পই আমি পড়তে পারিনি — তিনি তাঁর টুপি ঠিকঠাক করে বসে বললেন:

'বই না থাকলে তো চলবে না। এসব তো তোমাকে শিখতেই হবে — বুঝেছ তো? বইয়ের গল্পগুলোর কথা থাক্। আচ্ছা, অন্যের মুখে শুনে-টুনেও তো কিছু জানা থাকতে পারে — এই কোনো একটা গল্প বা যা-হোক্ কিছু — তাই একটা বল তো শুনি। তুমি প্সাল্টির পড়েছ? বেশ, বেশ! উপাসনা করতে শিখেছ? বাঃ, কে বলে তুমি কিচ্ছু জান না? আচ্ছা, কোনো সাধু-মহাপুরুষের জীবনী জানা আছে? কি বললে, ছড়ায় বলে যেতে পার? কী কাণ্ড, তুমি যে দেখছি একেবারে পণ্ডিত লোক হয়ে উঠেছ!'

এমন সময়ে আমাদের স্কুলের পাদ্রিমশাই এসে হাজির। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে আর জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন। বিশপ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, তারপরেই তিনি আমার নামে বলতে লাগলেন বিশপের কাছে।

'একটু সবুর করুন!' হাত উঠিয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে বিশপ বললেন, তারপর আবার ফিরে তাকালেন আমার দিকে, 'আচ্ছা, তুমি আমাদের "ঈশ্বরানুগৃহীত আলেক্সেই"এর গল্পটা একটু শোনাও তো দেখি...'

একটা লাইন ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা মনে করবার জন্যে একটু থামতেই তিনি বললেন, 'ভারি চমৎকার ছড়া, না বাবা? মনে হচ্ছে, এ গল্পটা ছাড়াও

আরো কিছু কিছু গল্প তোমার জানা আছে। আচ্ছা, রাজা ডেভিডের গল্পটা জানো? বেশ, বেশ। ভারি খুশি হলাম তোমার কথা শুনে!'

আমি বুঝতে পারছিলাম, এই গল্পগুলি শুনতে তাঁর খুবই ভালো লাগছে এবং ছড়া তিনি খুবই ভালোবাসেন। অনেকক্ষণ ধরে আমি বলে চললাম। আমাকে বাধা না দিয়ে চুপ করে শুনে গেলেন তিনি, শেষকালে বললেন:

'তোমার কি প্সাল্টির থেকে বর্ণপরিচয় হয়েছে? কে তোমাকে পড়িয়েছিলেন? ভালো-মানুষ দাদামশাই? ভালো নয়? খারাপ-মানুষ দাদামশাই! ছি, ছি, এমন কথা বলতে নেই! আর তুমি কি খুব দুষ্টুমি কর?'

আমি লজ্জা পেলাম কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলাম। শিক্ষকমশাই আর পাদ্রিমশাই ফলাও করে আমার অপরাধের বর্ণনা দিতে শুরু করলেন। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বিশপ শুনলেন তাঁদের কথা।

শেষকালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'শুনছ তো, তোমার সম্পর্কে ওঁরা কী বলছেন? এদিকে এস!'

একটা হাত রাখলেন আমার মাথার ওপরে, তাঁর হাতে সাইপ্রেসের গন্ধ। বললেন:

'তুমি এত দুষ্টুমি করো কেন?'

'স্কুল আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না? শোন বাবা, তোমার একথা শুনে বুঝতে পারছি, তোমার মধ্যে কোথাও একটা কিছু গলদ আছে। স্কুল যদি তোমার ভালো না লাগে তাহলে বলতে হবে যে তুমি খারাপ ছেলে। কিন্তু তোমার পরীক্ষার নম্বর দেখে বুঝতে পারছি যে তুমি খারাপ ছেলে নও। নিশ্চয়ই কোথাও একটা কিছু গলদ আছে।'

আলখাল্লার ভিতর থেকে ছোট একটা বই বার করে তিনি লিখলেন, 'পেশ্কভ, আলেক্সেই'। আর বলতে লাগলেন, 'তোমার ওই দুষ্টুমি যদি বন্ধ করতে পার বাবা, তবেই তোমার মঙ্গল। একটু-আধটু দুষ্টুমি করলে কোনো ক্ষতি নেই, ওতে লোকে কিছু মনে করে না। কিন্তু দুষ্টুমির মাত্রাটা বড়ো বেশি হয়ে গেলে সবার পক্ষেই তা অসহ্য। ঠিক বলিনি বাবারা?'

'ঠিক বলেছেন!' কলকণ্ঠে ও সমস্বরে জবাব এল।

'আচ্ছা এবার তোমাদের কথা বলো তো শুনি। তোমরা সবাই খুব লক্ষ্মী ছেলে — না?'

'না, না, মোটেই নই।' ছেলেরা হাসতে লাগল।

বিশপ আমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর এমন একটা অবাক-হওয়া সুরে কথা বলতে লাগলেন যে শিক্ষকমশাই ও পাদ্রিমশাই পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারলেন না।

'শোন তোমাদের বলি — তোমাদের মতো বয়সে আমিও খুব দুষ্টু ছিলাম! কেন আমাদের ও-রকম হয় জানো?'

ছেলেরা হাসছে। তিনি তাদের প্রশ্ন করছেন; প্রশ্নগুলি এমন চালাকির সঙ্গে করছেন যে ছেলেরা নিজেদের কথার জালে নিজেরাই আটকা পড়ে যাচ্ছে। ভারি একটা ফুর্তির আবহাওয়া এসে গেছে ক্লাশঘরের মধ্যে, ফুর্তিটা ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে। শেষকালে একসময়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন:

'তোমাদের মতো দুষ্টু ছেলেদের ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করে না! কিন্তু আমার যাবার সময় হয়ে গেছে, এবার রওনা হতে হবে।'

চওড়া আস্তিনটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাত তুলে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন ক্লাশের উদ্দেশে:

'বেঁচে থাক বাবারা। ভালো কাজে মন দাও। জগৎ-পিতা আর তাঁর সন্তানের নামে, পরম আত্মার নামে, তোমাদের এই আশীর্বাদই করি। বিদায়।'

'বিদায়, প্রভু! তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসবেন!' ছেলেরা চেঁচিয়ে বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি জবাব দিলেন, 'আসব, নিশ্চয়ই আসব। তোমাদের জন্যে বই নিয়ে আসব আমি।' তারপর শিক্ষকমশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'আজ ওদের ছুটি দিয়ে দিন।'

আমাকে নিয়ে সদরের কাছে এসে থামিয়ে চাপা স্বরে তিনি বললেন, 'বাবা, আমাকে কথা দিতে হবে যে আর কক্ষণো এমন দুষ্টুমি করবে না। কথা দিচ্ছ তো বাবা? কেন যে তুমি এমন দুষ্টুমি করো তা আমিও বুঝি — কিন্তু বাবা, একটু রয়ে-সয়ে। আচ্ছা চলি এবার, কেমন?'

কথাগুলো শুনে আমি খুবই বিচলিত হলাম। অদ্ভুত একটা আবেগ বুকের মধ্যে ফুলেফেঁপে উঠছে। অবস্থা এমন হল যে, আমার শিক্ষকমশাই যখন আমাকে ক্লাশের পরে আটকে রেখে উপদেশ দিতে শুরু করলেন এবং

বললেন যে এবার থেকে আমাকে ভেড়ার মতো বাধ্য হয়ে চলতে হবে—তখনো আমি স্বেচ্ছায় ও স-মনোযোগে তাঁর কথা শ্ুনলাম।

কোটটা পরতে পরতে সস্নেহে পাদ্রিমশাই বললেন, 'এখন থেকে আমার ক্লাশে তোমাকে থাকতে হবে। হ্যাঁ, থাকতে হবে। আর চুপটি করে বসে থাকতে হবে। হ্যাঁ, চুপটি করে।'

স্কুলের গোলমাল মিটে গেল। কিন্তু বাড়িতে একটা ভারি বিশ্রী কাণ্ড করে বসলাম। একটা র্ুব্ল চুরি করলাম মা'র তহবিল থেকে। ব্যাপারটা প্ূর্বপরিকল্পিত নয়। একদিন সন্ধ্যার সময় মা যেন কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল এবং বাচ্চাটিকে আগলে আমি ছিলাম বাড়িতে। চুপ করে বসে থেকে থেকে যখন ভালো লাগছিল না তখন যা-হোক একটা কিছ্ু নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে আমার সৎ-বাপের একটা বই টেনে নিয়েছিলাম। বইটার নাম, 'চিকিৎসকের স্মারকলিপি'। লেখক জ্যেষ্ঠ ড্রুমা। বইটা ওল্টাতে ওল্টাতে পাতার ভাঁজে একটা এক-র্ুবল ও একটা দশ-র্ুব্লের নোট পেলাম। বইটার একবর্ণও আমি ব্ুঝতে পারিনি কিন্তু বইটা বন্ধ করে রেখে দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার মাথায় একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল। র্ুবল্টা যদি আমি নিয়ে নিই তাহলে সেটা দিয়ে শ্ুধ্ু যে 'বাইবেলের গল্প' বইটাই কেনা চলে তা নয়, 'রবিনসন ক্রুসো' বইটাও কেনা চলে। রবিনসন ক্রুসো নামে যে একটা বই আছে, এ-খবরটা আমি অল্প কিছ্ুকাল হল পেয়েছি। এক শীতের দিনে টিফিনের সময় আমি ছেলেদের কাছে র্ূপকথার গল্প বলছিলাম, হঠাৎ একটি ছেলে ঠোঁট উল্টিয়ে বলে উঠল, 'এসব র্ূপকথার গল্প একেবারে বাজে! গল্পের মতো গল্প হচ্ছে, রবিনসন ক্রুসো—সত্যিকারের গল্প।'

ছেলেদের দলে আরো কয়েকজন ছিল যারা রবিনসন ক্রুসো পড়েছে। সকলেই বইটার স্ুখ্যাতি করল। দিদিমার গল্পকে এভাবে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দেখে আমি খ্ুবই আঘাত পেলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যে-করে হোক্ রবিনসন ক্রুসো বইটা যোগাড় করব এবং বইটা পড়ে নিয়ে দেখিয়ে দেব যে দিদিমার গল্পের চেয়ে বইটা কিছ্ুতেই ভালো হতে পারে না!

পরদিন আমি যখন স্কুলে এলাম তখন আমার সঙ্গে ছিল 'বাইবেলের গল্প', এণ্ডারসনের র্ূপকথার দ্ুটি জীর্ণ খণ্ড, তিন পাউণ্ড সাদা র্ুটি আর এক পাউণ্ড সসেজ। ভ্লাদিমির গির্জা পেরিয়ে রাস্তার মোড়ে যে অন্ধকার ছোট বইয়ের দোকানটা আছে সেখানেই 'রবিনসন ক্রুসো' বইটাও

পেয়েছি। বইটা খুবই পাতলা, হলদে মলাট, মলাট উলটিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় বইয়ের নাম ও এক দাড়িওলা লোকের ছবি। লোকটির মাথায় ফারের টুপি আর কাঁধে বাঘের ছাল। এই ছবিটা আমায় মোটেই আকর্ষণ করতে পারেনি। বরঞ্চ রূপকথার বইয়ের পুরনো আর ছেঁড়া বাঁধাইটুকু পর্যন্ত আমার কাছে মনোমুগ্ধকর ঠেকেছে।

টিফিনের সময়ে অনেকক্ষণ ছুটি। সেই সময়ে ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গে ভাগ করে আমি রুটি আর সসেজ খেলাম, তারপর সকলে মিলে 'বুলবুল' নামে গল্পটা পড়তে শুরু করলাম। ভারি চমৎকার গল্পটি, একেবারে প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়।

'চীনদেশে সব মানুষই চীনা, এমন কি সম্রাটও চীনা।' আমার এখনো মনে আছে, এই লাইনটির সহজ সরসতা ও উচ্ছল সুর এবং তা ছাড়াও আশ্চর্যরকমের ভালো আরো কিছু আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

'বুলবুল' গল্পটা স্কুলে শেষ পর্যন্ত পড়বার সময় পাইনি। বাড়ি ফিরে আসতেই এক কাণ্ড। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিম ভাজছিল, আমাকে দেখেই মুখ তুলে থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল:

'তুই একটা রুবল নিয়েছিস?'

'হ্যাঁ। এই যে বই কিনেছি...'

সঙ্গে সঙ্গে লাঠি দিয়ে মা আমাকে দমাদম পিটোতে শুরু করল। রূপকথার বইগুলো ছিনিয়ে নিল আমার হাত থেকে এবং এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখল যাতে আমি আর কোনো দিনই বইগুলো খুঁজে না পাই। পিটুনি দেওয়ার চাইতেও এই শাস্তিটাই আমার কাছে অসহ্যরকমের যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়েছিল।

তারপর কয়েকদিন আমি আর স্কুলে যাইনি। ইতিমধ্যে আমার সৎ-বাপ আমার এই কীর্তির কথা কারখানার লোকদের কাছে বলেছে, আবার কারখানার লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করেছে এই নিয়ে, তারপর ছেলেদের মুখে মুখে স্কুলেও ছড়িয়ে পড়েছে এই গল্প। আমি যতোদূর বুঝতে পারি এইভাবেই গড়িয়েছিল ব্যাপারটা। তারপর আমি যেদিন আবার প্রথম স্কুলে গেলাম, সবাই আমাকে অভ্যর্থনা জানাল নতুন একটা ডাকনামে ডেকে: চোর! নামটি সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট—কিন্তু অসঙ্গত। রুবলটা যে আমি নিয়েছি এ-ব্যাপারটা গোপন করবার কোনো চেষ্টা আমি করিনি, ব্যাপারটা তাদের আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু

কেউ আমার কথা বিশ্বাস করল না। তাই বাড়ি ফিরে এসে আমি মা'কে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম যে স্কুলে আমি আর কোনো দিন যাব না।

আমার মা আবার অন্তঃসত্ত্বা। জানলার ধারে বসে খাওয়াচ্ছিল আমার ভাই সাশাকে। পাশ্চুটে মুখটা ফিরিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত আর ক্লিষ্ট দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, মুখটা হাঁ হয়ে গেল মাছের মতো।

'তুই মিথ্যে কথা বলছিস,' মৃদুস্বরে বলল মা, 'তোর রুব্‌ল নেবার কথা অন্য লোক শুনবে কি করে?'

'যাও তুমি, জিজ্ঞেস করে দেখ গিয়ে।'

'নিশ্চয় তুই নিজেই তাদের বলেছিস। সত্যি কথা বল্‌ তো—বলেছিস কিনা? খবরদার যা-তা বলবিনে—কাল আমি স্কুলে গিয়ে নিজেই খোঁজ করে আসব, কে একথা বলেছে।'

আমি ছাত্রটির নাম করলাম। শুনে মা'র মুখটা কেমন মুষড়ে গেল আর চোখের জলে ভিজে গেল।

রান্নাঘরে চুল্লির পিছনদিকে পুরানো কাঠের বাক্স সাজিয়ে আমার জন্যে বিছানা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলাম, পাশের ঘরে আমার মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে:

'হায় প্রভু! হায় প্রভু!..'

তেলচিট্‌চিটে গরম ছেঁড়া কম্বলগুলোর গন্ধ অসহ্য মনে হতে লাগল। বিছানা ছেড়ে বাইরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'কোথায় যাচ্ছিস রে? আয়, আমার কাছে আয়?' মা ডাকল আমাকে।

তারপর মেঝের ওপরে পাশাপাশি বসে রইলাম দু'জনে। সাশা শুয়ে আছে মা'র কোলে আর মার জামার বোতাম ধরে টানাটানি করছে। মাঝে মাঝে আপন মনেই মাথা নাড়ে আর বলে, 'বুবম।' মানে, বোতাম।

মা'র গা ঘেঁষে আমি বসে রইলাম। একটা হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল মা। বলল:

'জানিস তো, আমরা খুবই গরীব। আমাদের কাছে প্রত্যেকটি কোপেক... প্রত্যেকটি কোপেক...'

উষ্ণ হাত দিয়ে মা আমাকে জোরে চেপে ধরেছে। যে কথাগুলো সে বলতে চাইছে তা আর কিছুতেই শেষ করতে পারছে না।

'চামার, একেবারে চামার!' হঠাৎ কথাগুলো বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। ঠিক এই কথাগুলো মা'র মুখে আগে আরেকবার আমি শুনেছি।

'মার,' মা'র কথাটাকে নকল করতে চেষ্টা করছে সাশা।

ভারি অদ্ভুত হয়েছে এই বাচ্চাটা। ল্যাকপেকে চেহারা আর প্রকাণ্ড একটা মাথা। চোখদুটো আশ্চর্যরকমের নীল, আর হাসি-হাসি চোখে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যে মনে হয় যে কিছু একটা ঘটবে বলে সে আশা করছে। অস্বাভাবিক অল্প বয়সেই সে কথা বলতে শুরু করেছে। কক্ষণো কাঁদে না, আনন্দের একটা তুরীয় অবস্থায় বাস করছে যেন। সে এত দুর্বল যে হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতাটুকুও তার প্রায় নেই। কিন্তু আমাকে যখনই দেখে ভারি খুশি হয়। ক্ষুদে ক্ষুদে হাতদুটো বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে আর নরম-নরম ছোট-ছোট আঙুলে আমার কান নিয়ে খেলা করে। আর ওর আঙুলগুলোতে সব সময়েই কেন জানি ভায়োলেট ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। এই বাচ্চাটি আচমকা মারা গিয়েছিল, কোনো রকম অসুখ পর্যন্ত করেনি। সকালবেলাতেও নিজের চাপা আনন্দে নিজেই মশগুল হয়ে ছিল, আর সন্ধ্যেবেলায় যখন গির্জার সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা বাজছে তখন কবর দেবার জন্যে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। ব্যাপারটা ঘটেছিল ওর পরের ভাই নিকোলাইয়ের জন্মের ঠিক পরেই।

স্কুলে গিয়ে সকলের ভুল ধারণা কাটিয়ে দিয়ে আসবে বলে মা যে কথা দিয়েছিল তা রেখেছে। তারপর থেকে আবার আমি নিয়মিত লেখাপড়া করছি। কিন্তু আবার এমন একটা ঘটনা ঘটে যার ফলে আবার আমাকে দাদামশাইয়ের কাছে চলে যেতে হয়। ঘটনাটি এই:

একদিন চায়ের সময়ে আমি উঠোন থেকে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় শুনতে পেলাম, আমার মা ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করছে:

'ইয়েভগেনি, ইয়েভগেনি, তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি যেও না!'

আমার সৎ-বাপ জবাব দিল, 'বাজে বোকো না!'

'কিন্তু আমি জানি তুমি ওই মেয়েটির কাছেই যাও।'

'বেশ করি যাই — তাতে কী হয়েছে?'

দুজনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কাশির দমকের ফাঁকে ফাঁকে মা বলল:

'কী নীচ আর অপদার্থ চামার হয়েছ তুমি'

তারপরেই শুনলাম, আমার সৎ-বাপ আমার মা'কে মারছে। ছুটে ঘরের ভিতরে ঢুকলাম আমি। দেখলাম, আমার মা হাঁটু মুড়ে বসে আছে, পিঠ আর কনুই দিয়ে একটা চেয়ার শক্তভাবে চেপে ধরে আটকে রেখেছে নিজেকে, মাথাটা হেলে পড়েছে পিছনদিকে, অস্বাভাবিক চক্‌চক্‌ করছে চোখদুটো—আর মা'র ঠিক সামনেটিতে ফিটফাট নতুন পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে আমার সৎ-বাপ, লম্বা পা তুলেছে মাকে লাথি মারবার জন্যে। রুপোর বাঁট লাগানো একটা ছুরি তুলে নিলাম টেবিলের ওপর থেকে—আমার বাবার যে-সমস্ত জিনিস মা'র কাছে ছিল তার মধ্যে এই ছুরিটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারপরে আমার সৎ-বাপের শরীরের পাশের দিকটা লক্ষ্য করে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুরি বসালাম।

আমার সৎ-বাপের কপাল বলতে হবে, আমার মা ঠিক সময়টিতে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। ছুরিটা তার কোট ফুঁড়ে গায়ের চামড়া ছুঁয়ে গেছে মাত্র। কাৎরে উঠে একপাশটা চেপে ধরে সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর্ত চিৎকার করে আমার মা শক্তমুঠোয় আমাকে ঠেসে ধরল মেঝের ওপরে। উঠোন থেকে ফিরে এসে আমার সৎ-বাপ মা'র কবল থেকে মুক্ত করল আমাকে।

আর এতসব কাণ্ডের পরেও আমার সৎ-বাপ সেদিন সন্ধ্যার পরে বেরিয়েছিল। চুল্লির পিছনদিকে যেখানে আমি শুয়েছিলাম, সেখানে মা এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আলতোভাবে আমাকে বুকের ওপরে চেপে ধরে চুমু খেয়ে বলল:

'কিছু মনে করিসনে, আমারই দোষ। কিন্তু তোর কি মাথা খারাপ হয়েছিল? ছুরি নিয়ে তেড়ে এসেছিলি!'

আমি যে-জবাব দিয়েছিলাম তার অর্থ সম্পর্কে আমার মনে কোনো রকম অস্পষ্টতা ছিল না। মা'কে জানিয়ে দিলাম যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার সৎ-বাপকে খুন করব এবং তারপরে নিজেও খুন হব। আরেকটু হলে করে বসতামও—অন্তত একবার চেষ্টা তো করতাম। এখনো পর্যন্ত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই কলুষিত পাটাকে। উজ্জ্বল রঙের ফেটি লাগানো ট্রাউজার পরা সেই পাটা বাতাসে দুলছে আর একটি স্ত্রীলোকের বুক লক্ষ্য করে নেমে আসছে।

মাঝে মাঝে যখন এই বর্বরোচিত রুশ জীবনের ঘৃণিত অস্তিত্বের কথা ভাবি তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এ-সব কথা নতুন করে বলার কোনো

সার্থকতা আছে কিনা। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে কথাগুলো সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতেই হবে। কারণ এ হচ্ছে সেই সময়কার এক অতি ভয়ঙ্কর ও বাস্তব সত্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত এর মূল উৎপাটিত হয়নি। এ হচ্ছে এমন এক সত্য যা পুরোপুরি উদ্ঘাটিত করতে হবে এবং আমাদের এই লজ্জাকর ও বীভৎস জীবন থেকে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে—যেন মানুষের স্মৃতিতে আর মানুষের আত্মায় এর চিহ্নমাত্র না থাকে।

তাছাড়া, এই সমস্ত বীভৎসতাকে বর্ণনা করবার কাজে আমাকে যে হাত দিতে হয়েছে, তার পিছনে আরও বাস্তব কারণ আছে। এই বীভৎসতা দেখে শিউরে উঠতে হয়, এমনিতে অতি চমৎকার মানুষকেও এই বীভৎসতা বিকৃতচরিত্র করে তোলে—কিন্তু তবুও রুশজাতির এখনো এমন তারুণ্য ও সুস্থ প্রাণশক্তি আছে যে এই বীভৎসতাকে সে একেবারে মুছে দিতে পারে এবং সম্পূর্ণভাবে তা মুছে দেবেও।

আমাদের জীবনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় শুধু এইজন্যে নয় যে এই জীবনের একদিকে আছে পশুসুলভ প্রচণ্ড একটা নোংরামি যা দিনের পর দিন পাহাড়প্রমাণ হয়ে উঠেছে; আশ্চর্য হতে হয় এইজন্যেও যে এই জীবনের অন্তরালে এক সুস্থ সৃজনশীল শক্তিও দেদীপ্যমান। সৎশক্তির প্রভাব বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস জাগে যে একদিন না একদিন আমাদের দেশের মানুষ এক পূর্ণ প্রস্ফুটিত জীবনের সৌন্দর্যে ও উজ্জ্বল মানবিকতায় অধিষ্ঠিত হবে।

তের

আবার সেই দাদামশাইয়ের সঙ্গে থাকা।

'কী রে হতচ্ছাড়া, এসেছিস!' টেবিলের ওপরে অস্থিরভাবে আঙুলের টোকা দিতে দিতে দাদামশাই আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন, 'আমি কিন্তু তোকে আর খাওয়াব না বলে রাখছি। এবার তোর ভার তোর দিদিমাকেই নিতে হবে।'

দিদিমা বললেন, 'সে আমি ব্যবস্থা করব'খন। এ আর এমন কি শক্ত কাজ!'

'আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে,' দাদামশাই হুঙ্কার ছাড়লেন, আর তৎক্ষণাৎ

শান্ত হয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন আমার কাছে, 'জানিস তো, আমাদের এখন সব আলাদা আলাদা—যার যার, তার তার।'

জানলার কাছে বসে বসে দিদিমা লেস বোনেন। তাঁর হাতের শলাকা আনন্দের সুরে টুংটাং শব্দে বেজে ওঠে, নিচে পেতলের পিন বসানো ছোট্ট বালিশটা বসন্তকালের রোদে সোনালী সজারুর মতো ঝক্‌ঝক্‌ করে। আর চেহারার দিক থেকেও দিদিমা এতটুকু বদ্‌লাননি, মনে হয় যেন ব্রোঞ্জের গড়া মূর্তি। কিন্তু দাদামশাই আরো রোগা হয়ে গেছেন, তাঁর গায়ের চামড়ায় আরো বেশি ভাঁজ পড়েছে, মাথার লাল চুল পাতলা হয়েছে আরো। তাঁর চালচলনের মধ্যে যে একটা প্রশান্ত আড়ম্বর ছিল তা আর নেই, তার বদলে মেজাজটা উগ্র আর খিটখিটে হয়ে গেছে, কিছু না কিছু নিয়ে সব সময়েই তোলপাড় করছেন। সবুজ চোখদুটো দিয়ে সবকিছুই দেখেন সন্দেহের দৃষ্টিতে।

দিদিমা ও দাদামশাইয়ের মধ্যে কি-ভাবে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়েছে সেকথা হাসতে হাসতে দিদিমা বললেন আমাকে। থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি জিনিসগুলো দিদিমাকে দিয়ে দাদামশাই বলেছেন, 'এগুলি সব তোমার। বাস, এই শেষ। এছাড়া আর কিছু চাইতে এস না আমার কাছে।'

একথা বলে দিদিমার সমস্ত পুরানো পোশাক এবং সম্পত্তি বলতে যা কিছু ছিল, তার মধ্যে শেয়াল-কোটটা, তিনি নিয়েছেন। সাতশো রুব্‌লে বিক্রি করেছেন জিনিসগুলো। তারপর এই সাতশো রুব্‌ল সুদে ধার দিয়েছেন নিজের ধর্মপুত্রকে; এই ধর্মপুত্রটি একজন দীক্ষিত ইহুদি, ফলের ব্যবসা আছে তার। নির্লজ্জ রকমের লোভী হয়ে উঠেছেন দাদামশাই, এত বেশি লোভ যে সেটা তাঁর প্রায় অসুখে দাঁড়িয়ে গেছে। পুরনো দিনের পরিচিত লোকজনের কাছে যাতায়াত শুরু করেছেন। এরা কেউ বা ধনী ব্যবসায়ী, কেউ বা কারিগর--সকলেই তাঁর পুরনো দিনের সহকর্মী। এদের কাছে গিয়ে তিনি বলেন যে ছেলেরা তাঁর সর্বনাশ করেছে এবং এই বলে টাকা চান। পুরনো দিনের খাতিরে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে এবং দরাজ হাতে টাকা দেয়। বাড়ি ফিরে এসে মোটা মোটা নোটের তাড়া দিদিমার নাকের নিচে নাড়তে নাড়তে ছোটো ছেলের মতো আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলতে থাকেন:

'দেখে নাও, ভালো করে দেখে নাও! দেবে তোমাকে কেউ এতগুলি টাকা? এর দশভাগের একভাগ টাকাও কেউ তোমাকে দেয় তো কি বলেছি!'

এই টাকাটা আমার দাদামশাই দু'জন নতুন পরিচিত লোককে সুদে ধার দিলেন। একজনকে সবাই ডাকে 'চাবুক' বলে: পশুর লোমের ব্যবসা করে লোকটি, লম্বা চেহারা, মাথায় টাক। অপরজন হচ্ছে তার বোন; একটি দোকান চালায় সে: লাল গাল, কালো চোখ, ঝোলাগুড়ের মতো মিষ্টি ও টইটম্বুর চেহারা।

বাড়ির মধ্যে সব ব্যাপারেই ভাগাভাগি। একদিন হয়তো দিদিমা তাঁর নিজের টাকা দিয়ে খাবার কিনে এনে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন, আবার পরের দিন রুটি ও খাবার কিনে আনেন দাদামশাই। যেদিন দাদামশাইয়ের পালা সেদিন খাওয়াদাওয়াটা যাচ্ছেতাই হয়। দিদিমা কিনে আনেন সরেস মাংস আর দাদামশাই কেনেন কলিজা ও নাড়িভুঁড়ি। চা আর চিনির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা তবে চা ভেজানো হয় একই পাত্রে। প্রতিবার চা ভেজানোর পরে দাদামশাই আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন:

'দাঁড়াও, দেখি, কতটা চা ভিজিয়েছ?'

তারপর চায়ের পাতাগুলো হাতের ওপর নিয়ে খুব সাবধানে একটি একটি করে গুণতে থাকেন।

'তোমার চায়ের পাতাগুলো সরু সরু আর আমার গুলো মোটা মোটা। আমার চায়ে ভালো লিকার হয়—কাজেই তোমার চায়ের ভাগটা আমার চেয়েও বেশি হওয়া দরকার।'

তারপর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, তাঁর নিজের পাত্রের চা দিদিমার পাত্রের চায়ের মতোই ঠিক সমান কড়া হচ্ছে কিনা এবং দিদিমা নিজের কাপে যতোবার চা ঢালছেন তাঁর কাপেও ঠিক ততোবার চা ঢালছেন কিনা।

শেষবার চা ঢালবার সময় দিদিমা জিজ্ঞেস করেন, 'শেষবারের মতো আরেক কাপ হবে নাকি?'

চায়ের পাত্রের ভিতরটা দেখে নিয়ে দাদামশাই সায় জানান, 'আচ্ছা বেশ, শেষবারের মতো আরেক কাপ হোক না!'

এমন কি আইকনের প্রদীপে যে তেলটুকু খরচ হয় তাও দু'জনে পালা করে কিনে আনেন। আর এ সব ঘটে পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে ঘর করার পরে!

প্রতিটি ব্যাপারে দাদামশাইয়ের এইসব খুঁতখুঁতানি দেখে আমি মজাও পাই আবার বিরক্তও হই। দিদিমা কিন্তু শুধু মজাই পান। দিদিমা আমাকে বলেন:

'এসব কথা মনে রাখিসনে! এতে আর কী হয়েছে? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো বাতিক হয়েছে—এই আর কি। চার কুড়ি বয়স হয়ে গেছে—ব্যাপারটা একবার ভাব তো দেখি! এই বয়সে অমন একটু-আধটু বাতিক হয়েই থাকে—ওটুকু সহ্য করে নিতেই হয়, এতে কারুরই কিছু যায় আসে না। আর তোর আর আমার কথা যদি ধরিস—আমাদের দু'জনের জন্যে তো ভাবনা নেই, যে করে হোক দু-মুঠো জুটিয়ে নিতে পারব!'

আমিও রোজগার করতে শুরু করি। প্রতি রবিবার ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ি একটা থলে নিয়ে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি; হাড়ের টুক্‌রো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, পেরেক ও কাগজ কুড়োই। আধ মণ ছেঁড়া ন্যাকড়া বা কাগজ বা ধাতুর বদলে আবর্জনার কারবারী আমাদের কুড়ি কোপেক দেয়, আর আধ মণ হাড়ের টুক্‌রোর জন্যে আট বা দশ কোপেক। আবর্জনা কুড়োবার কাজটা সারা সপ্তাহ ধরেই চালিয়ে যাই আমি; রবিবার ছাড়া অন্যান্য দিনগুলোতে বেরোই স্কুল ছুটির পরে। প্রত্যেক শনিবারে আমার রোজগার হয় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কোপেক (কপাল খুলে গেলে কোনো সপ্তাহে এর চেয়ে বেশিও হয়)। রোজগারের পয়সা দিদিমার হাতে এনে দিলেই দিদিমা পয়সাগুলোকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের স্কার্টের পকেটে রেখে দেন, চোখ নিচু করে থাকেন ও আমার সুখ্যাতি করেন:

'সোনা আমার, মাণিক আমার, কী বলে যে তোকে আশীর্বাদ করব! দেখছিস তো, তোকে আর আমাকে কোনো দিন উপোস করতে হবে না! আমরা তো সব পারি?'

একদিন আমার চোখে পড়ে গেল, আমার রোজগারের পয়সার পাঁচ-কোপেক হাতে নিয়ে দিদিমা নিঃশব্দে কাঁদছেন। তাঁর তুলতুলে নাকের ডগা থেকে একফোঁটা আলো-ঠিকরনো চোখের জল ঝুলে রয়েছে।

আমি কিন্তু টের পেয়ে গেলাম যে রাস্তার আবর্জনা কুড়িয়ে যতোটুকু না লাভ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয় কাঠগোলাগুদাম থেকে কাঠ চুরি করতে পারলে। লাকড়ি-গুদাম আছে ওকা নদীর ধারে আর বালুচর নামে একটা দ্বীপে। এই দ্বীপে বছরে একবার মেলা বসে, সেখানে ধাতু কেনাবেচা হয়। কাজ চলা গোছের অস্থায়ী ঘর তৈরি হয় এই উদ্দেশ্যে। মেলা শেষ হয়ে গেলে ঘরগুলো খুলে ফেলে কাঠ আর তক্তা সাজিয়ে রাখা হয় থাক্ দিয়ে। বসন্তকালে নদীর জল বেড়ে ওঠা না পর্যন্ত এই কাঠগুলো বালুচর দ্বীপেই থাকে। ভালোমতো একটা তক্তা এনে দিতে পারলে গৃহস্থদের কাছে

দাম পাওয়া যায় দশ কোপেক। সারা দিনের মধ্যে এই রকম দু-তিনটে তক্তা আমরা চুরি করতে পারি। অবশ্য এক বিষয়ে নজর রাখা দরকার। যে-সব দিনে কুয়াশা হয় বা বৃষ্টি পড়ে, যখন পাহারাদাররা গিয়ে ঢোকে ঘরের মধ্যে, সেই দিনগুলোতেই অভিযান চালাতে হয়।

অভিযান হয় সদলে; সবার ওপরে সবার টান আছে—ছেলে-ছোকরাদের এমনি একটি দল। এই দলে আছে মর্দোভীয় ভিখিরি-মায়ের দশ বছরের ছেলে শান্তশিষ্ট সান্‌কা ভিয়াখির*—নরম প্রকৃতির ছেলে সে, কখনো কারও অনিষ্ট করে না; আছে গৃহহীন কস্ত্রমা—চামড়াসার চেহারা, খোঁচা খোঁচা চুল, প্রকাণ্ড কালো চোখ, পরে, যখন তার বয়স তেরো বছর, সে-সময়ে এক জোড়া পায়রা চুরি করার অপরাধে তাকে পাঠানো হয়েছিল এক শিশু-শোধনাগারে; সেখানে গলায় দড়ি দিয়ে সে আত্মহত্যা করে; আছে তাতার ছেলে খাবি—বারো বছর বয়স, অসাধারণ শারীরিক শক্তি এবং উদার ও সরল স্বভাবের মিশ্রণ ঘটেছে তার মধ্যে; আরো আছে খ্যাঁদানাক ইয়াজ—আট বছর বয়স, এক কবরখননকারী ও কবরখানার পাহারাদারের ছেলে, মাছের মতো নির্বাক; অসুখে ভুগছে ছেলেটি। এছাড়া আমাদের দলে আরেকজন যে আছে সে হচ্ছে আমাদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো। নাম গ্রিশ্‌কা চুরকা। তার মা বিধবা, সেলাইয়ের কাজ করে। এই ছেলেটি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ঘুষোঘুষিতে রীতিমতো ওস্তাদ। আমরা সবাই একই রাস্তায় থাকি।

আমাদের এই অঞ্চলে চুরিকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। যারা ক্ষুদে ক্ষুদে ব্যবসাদার, আধপেটা খেয়ে যাদের দিন কাটে, তাদের অধিকাংশেরই অন্নসংস্থানের প্রায় একমাত্র উপায় হচ্ছে এটি। দেড় মাস ধরে বছরে একবার যে মেলা হয় তার আয় সারা বছরের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বহু সম্ভ্রান্ত গৃহস্থঘর 'নদীপথে বাড়তি আয়' করে। অর্থাৎ, নদীর স্রোতে ভেসে-যাওয়া কাঠের গুঁড়ি বা তক্তা ধরে, অল্পস্বল্প মালপত্র নিয়ে পাড়ি দেয়। তার অধিকাংশ সময়েই তাদের নজর থাকে চুরি করার দিকে; ভল্‌গা আর ওকা নদীর ধারে ধারে 'অন্ধিসন্ধি খুঁজে খুঁজে' বেড়ায়, জাহাজঘাটায় বা বজরায় বা নদীর পাড়ে যা কিছু হাতিয়ে নিতে পারে তাই আত্মসাৎ করে। কে কত বেশি জিনিস

* রুশ ভাষায় ভিয়াখির বলতে বোঝায় পায়রার একটা বিশেষ রূপ। — সম্পাঃ

হাতিয়ে নিতে পেরেছে তাই নিয়ে রবিবারে বড়োরা নিজেদের মধ্যে বড়াই করে আর ছোটরা তা শোনে ও শেখে।

বসন্তকালে যখন মেলার তোড়জোড় চলে তখন কর্মব্যস্ত কারিগর ও শ্রমজীবীরা সারা দিনের কাজের শেষে মদে চুর হয়ে দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। আর ঠিক সেই সময়ে শুরু হয় এই অঞ্চলের বাচ্চাদের পকেটকাটা-ব্যবসার মরশুম। এই বিশেষ ব্যবসাটির মধ্যে যে কোনো কিছু অবৈধ ব্যাপার আছে তা একেবারেই মনে করা হয় না এবং বড়োদের চোখের ওপরেই নির্ভয়ে এই ব্যবসাটি চালানো হয়।

ছুতোর মিস্ত্রীর হাতুড়ি, ফিটার মিস্ত্রীর চিম্‌টে, গাড়ির ধুরোর বল্টু— সবই তারা চুরি করে। কিন্তু আমাদের দলটি এসব চুরির দিকে যায় না।

'আমি ভাই, চুরির ব্যাপারে নেই—মা শুনলে রাগ করবে,' চুরকা একদিন বলে।

'আমিও নেই। আমার ভয় করে,' খাবি বলে।

কস্ত্রমা পারতপক্ষে চোরের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে আর 'চোর' শব্দটা সে উচ্চারণ করে অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে। যদি সে দেখে, কোনো ছেলে কোনো মাতালের পকেট মারছে তাহলে সে সেই ছেলের পিছনে তাড়া করে যায় আর তাকে পাকড়াও করতে পারলে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। বিষণ্ণ মুখ, বড় বড় চোখ, এই ছেলেটির হাবভাব চালচলন সব সময়েই বড়োদের মতো। পথ চলে খালাসীদের মতো হেলেদুলে, চেষ্টা করে গলার স্বরকে গুরুগম্ভীর ও বাজখাঁই করে তুলতে। সব মিলিয়ে তার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যেজন্যে তাকে অস্বাভাবিক বুড়োটে বলে মনে হয়। আর ভিয়াখিরের স্থির ধারণা যে চুরি করাটা পাপ।

কিন্তু বালুচর থেকে খুঁটি বা তক্তা পাচার করে আনাটাকে আমরা একেবারে অন্য ধরনের কাজ বলে মনে করি। একাজে আমাদের কারও ভয় নেই এবং এমন একটা কৌশল আমরা উদ্ভাবন করি যে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে যাবার পরে কিংবা কুয়াশার দিনে ভিয়াখির আর ইয়াজ সকলের চোখের ওপর দিয়েই গিয়ে হাজির হয় বালুচর দ্বীপে। পায়ের নিচে এবড়োখেবড়ো গলা বরফ, তার ওপর দিয়েই প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে শুরু করে। ওদের দুজনের চেষ্টা থাকে, পাহারাওলাদের নজর যেন ওদের দুজনের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইতিমধ্যে আমরা চারজনে গা ঢাকা দিয়ে নানা দিক থেকে গুটিগুটি এগিয়ে আসি। ওদিকে পাহারাওয়ালা ভিয়াখির

আর ইয়াজের ওপরেই নজর রাখতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়ে তক্তাগুলোকে বাছাই করি। তারপর আমাদের সঙ্গী দু'জন নানা ছলছুতোয় পাহারাওলাদের নাকাল করে পালিয়ে চলে যায় আর আমরাও ফিরতি পথ ধরি। আমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে থাকে একটা করে দড়ি; দড়িটার একপ্রান্তে থাকে বড় একটা বাঁকানো পেরেক; এই পেরেকটাকে আট্‌কে দেওয়া হয় তক্তার সঙ্গে, যাতে বরফ ও তুষারের ওপর দিয়ে তক্তাটাকে টেনে নেওয়া চলে। ক্বচিৎ আমরা পাহারাওলাদের নজরে পড়েছি, আর যদি নজরেও পড়ি তাহলেও পাহারাওলারা আমাদের ধরতে পারে না। তক্তাগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে লভ্যাংশ ছয়টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকের ভাগে পড়ে পাঁচ কিংবা সাত কোপেক।

একদিন পেট পুরে খাওয়ার পক্ষে এই যথেষ্ট। কিন্তু মা'কে ভদ্‌কার টাকা ভিয়াখির যদি না দিয়ে যায় তাহলে তার মা তাকে ধরে মারে। কস্ত্রমার অনেক দিনের শখ, সে পায়রা পুষবে এবং এই স্বপ্নকে চরিতার্থ করবার জন্যে সে টাকা জমায়। চুরকার মা রোগে ভুগছে সুতরাং চুরকার প্রতিটি পয়সার দরকার হয় মা'র চিকিৎসার জন্যে। খাবিও টাকা জমায়, কারণ যে-শহর থেকে সে এখানে এসেছে সেখানেই ফিরে যেতে চায় আবার। খাবির এক মামা তাকে নিয়ে এসেছিল সেই শহর থেকে কিন্তু নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদে আসার অল্প কিছুদিন পরেই তার মামা জলে ডুবে মারা যায়। শহরটির নাম খাবি ভুলে গেছে; তার শুধু এটুকু মনে আছে যে শহরটি হচ্ছে ভল্‌গার কাছে কামা নদীর ধারে।

কেন জানি আমাদের মনে হয়, খাবির কল্পনাজগতের এই শহরটি খুবই একটা মজার ব্যাপার। এই শহরের কথা তুলে আমরা ট্যারাচোখ তাতার ছেলেটিকে অনবরত ক্ষেপাই:

আছে এক শহর অতি অপরূপ
খোঁজ করে করে হন্যে।
দেখ যদি পাও এখানে ওখানে
কিংবা আকাশে শূন্যে!

এই ছড়া শুনে প্রথম প্রথম খাবি আমাদের ওপর রেগে যেত। কিন্তু একদিন ভিয়াখির তাকে বলে:

'হয়েছে বাপু, হয়েছে। বন্ধুবান্ধবরা অমন বলেই থাকে, তাই বলে রাগ করতে হয় নাকি?'

মিষ্টি স্বরে কথাগুলি বলে; আমরা যে ওর নাম 'পায়রা' রেখেছি তা মিথ্যে নয়।

তাতার ছেলেটি লজ্জা পায়। তারপর থেকে আমরা পিছনে লাগলেও ও আর গায়ে মাখে না, এমন কি কামা নদীর ধারের শহরটি সম্পর্কে এই ছড়া নিজেই সুর করে করে বলতে শুরু করে।

কিন্তু তবুও তক্তা চুরি করার চেয়ে রাস্তার টুকিটাকি কুড়নোটাই আমরা বেশি পছন্দ করি। আর বিশেষ করে বসন্তকালে তো কথাই নেই; তখন একাজে খুবই মজা। বরফ গলে যায় আর বৃষ্টির জল ধুয়ে দিয়ে যায় শূন্য মেলার মাঠ। সে-সময়ে মেলার মাঠ থেকে কখনো শূন্য হাতে ফিরতে হয় না; আবর্জনার স্তূপে খুঁজলেই পেরেক বা ধাতুর টুকরো পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে তামা ও রুপোর মুদ্রাও হাতে এসেছে। কিন্তু পাহারাওলারা দেখলেই তাড়া করে এবং আমাদের থলেগুলোকে কেড়ে নেয়। পাহারাওলাদের ঠেকাবার জন্যে হয় আমাদের দু-কোপেক করে ঘুষ দিতে হয়, নইলে ধরতে হয় হাতে-পায়ে। মোট কথা, পয়সা উপায় করাটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না কিন্তু এই পয়সা উপায় করার মধ্যে দিয়েই আমাদের মধ্যে সেরা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে ঝগড়াও হয়েছে কিন্তু কখনো মারামারি করেছি বলে মনে পড়ে না।

আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মিটমাট করে দেয় ভিয়াখির। উত্তেজনার যতো কারণই থাকুক না কেন, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলতে পারে ও এবং ওর কথা শুনে আমরা শান্ত হই। কথাগুলো খুবই সহজ ও সাধারণ কিন্তু এমনই যে আমরা অবাক হই এবং নিজেদের ব্যবহারে নিজেরাই লজ্জা পাই। এমন কি কথাগুলো বলে ভিয়াখির নিজেও অবাক হয়ে যায়। ইয়াজকে নীচুস্তরের ফন্দিফিকির করতে দেখেও ও কোনো দিন রাগ করেনি বা আতঙ্কিত হয়নি। এসব ও ভ্রূক্ষেপই করে না; বলে, এসব হচ্ছে মূর্খতা, এসবের কোনো অর্থ হয় না—আর এই বলে শান্তভাবে উড়িয়ে দেয়

ও প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, বল্ তো কেন তুই এসব কাজ করিস?' আর ওর প্রশ্ন শুনে সকলেই স্পষ্ট বুঝতে পারে যে সত্যি সত্যিই এসব কাজের কোনো অর্থ হয় না।

নিজের মা'র সম্পর্কে কিছু বলতে হলে, মা'কে বলে 'আমার মর্দোভীয়নী'। আমাদের কারও কিন্তু কোনো দিন মনে হয়নি যে এই কথাগুলোর মধ্যে কোনো মজা আছে।

গোল দুই সোনালী চোখের ঝিলিক তুলে হাসতে হাসতে সে বলে, 'গত রাত্রে আমার মর্দোভীয়নী একেবারে চুর হয়ে বাড়ি ফেরে। তারপরে সদরের সিঁড়ির ওপরেই থেবড়ে বসে গান জুড়ে দেয়। গান গেয়েই চলে, থামেই না আর—এমনি বেহায়া! ধাড়ী মুরগীর মতো!'

গুরুগম্ভীর চুরকা জিজ্ঞেস করে, 'কী গান গাইছিল রে?'

মা'র গাওয়া গানটা ভিয়াখির গেয়ে শোনায়; সরু সরু চড়া গলা, আর গানের সঙ্গে সঙ্গে চাপড় মারে হাঁটুতে। গানটা হচ্ছে এই:

ঠক্ ঠক্ ঠক্!
রাখাল টোকা দিচ্ছে শার্সিতে
ঘরে আমি রইতে নারি কোনো মতে!
সূর্য্যি ডোবে পশ্চিমে — রাখাল বাজায় বাঁশি
অতি মধুর সুরের লহর, অতি মধুর হাসি।
থমকে শোনে লোক।
ঠক্ ঠক্ ঠক্!

এমনি ধরনের অজস্র মজাদার গান জানে ও। আর গাইতেও পারে চমৎকার ভাবে।

তারপর সে বলে চলে, 'তারপর কী হল শোন্। ওখানে, ওই সদরের চৌকাঠে সে ঘুমিয়ে পড়ে। আর খোলা দরজা দিয়ে সে কি হি-হি ঠান্ডা হাওয়া। জামাকাপড় ফুঁড়ে আমার সর্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। আর সেই বিরাট বপু দরজা থেকে সরিয়েও আনতে পারি না। সকাল হলে তাকে বলি, আচ্ছা কেন বলো তো তুমি এতবেশি মদ খাও? সে জবাব দেয়, আর ক'টা দিন একটু মুখ বুজে সহ্য করে যা, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না রে!'

'ঠিকই তো, বেশিদিন আর বাঁচবে না। তোর মা'র সারা শরীরটা কি-রকম ফুলে উঠেছে দেখেছিস তো?' অভিভূত স্বরে চুরকা সায় জানায়।

'মা মরে গেলে তোর মন খারাপ হবে না রে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

আমার প্রশ্ন শুনে ভিয়াখির একটু যেন অবাক হয়ে জবাব দেয়, 'হবে বৈকি। নিশ্চয়ই হবে। সে যে ভালো মেয়ে।'

আমরা সবাই জানি, ভিয়াখিরের মা ওকে প্রায়ই ধরে মারে। তবুও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মানুষ হিসেবে সে ভালো। আর তাই, কোনো দিন আমাদের লাভের বখরা নগণ্য হলে চুরকা বলে:

'ভিয়াখিরের মা'কে ভদ্‌কা কিনে দেবার জন্যে সবাই একটা একটা কোপেক দিয়ে দাও। নইলে ভিয়াখিরকে ওর মা মারবে।'

দলের মধ্যে চুরকা ও আমি ছাড়া আর কেউ লিখতে পড়তে জানে না। এজন্যে ভিয়াখির হিংসে করে আমাদের।

ইঁদুরের মতো ছুঁচলো কান টেনে ধরে মিহি সুরে সে বলে, 'আমার এই মর্দোভীয়নী যেদিন মারা যাবে, সেদিন আমিও গিয়ে স্কুলে ভর্তি হব। মাস্টারমশাইয়ের পায়ে মাথা কুটে রাজি করাব তাঁকে। তারপর লেখাপড়া শেষ হয়ে গেলে আর্চবিশপের বাগান তদারক করার কাজ নেব আমি। চাই কি, আর্চবিশপের বাগান না হয়ে জারের বাগানও হতে পারে।'

সেই বছরই বসন্তকালে ভিয়াখিরের মর্দোভীয়নীটি কাঠের স্তূপে চাপা পড়ে গেল। তার সঙ্গে ছিল এক বোতল ভদ্‌কা। গির্জার নতুন বাড়ি তুলবার জন্যে এক বুড়ো চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিল, সেও চাপা পড়ল একই সঙ্গে। স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে।

ভিয়াখিরকে বলে গুরুগম্ভীর চুরকা: 'তুই আয়, আমাদের সঙ্গে থাকবি। আমার মা তোকে অক্ষর চিনিয়ে দেবে।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই দোকানগুলির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ভিয়াখির পড়তে লাগল:

'মুদিরদো কান।' লেখাটা পড়তে পেরে গর্বের সঙ্গে মাথা তুলে তাকাল সে।

চুরকা শুধরে দিল, 'দূর গাধা! মুদিরদো কান নয়, মুদির দোকান!'

'জানি বাবা জানি। তবে কি জানিস, কাব্য গুলিয়ে যায়।'

'কাব্য নয়, বাক্য!'

'অক্ষরগুলো নেচে নেচে বেড়ায়। অক্ষরগুলোকে কেউ একজন পড়বে— এতেই অক্ষরগুলোর খুশি যেন আর ধরে না।'

গাছ এবং ঘাসকে ও ভালোবাসে। ওর ভালোবাসার বহর দেখে আমরা অবাক হই, আবার মজাও পাই।

আমাদের এই অঞ্চলে বালু-জমি। গাছগাছড়া প্রায় নেই বললেই চলে। গাছগাছড়া বলতে উঠোনের এখানে-ওখানে দু-একটা সরু সরু উইলো,

কুঁকড়নো এল্‌ডারবেরির ঝোপ বা বেড়ার আড়ালে অলক্ষ্যে কিছু শুকনো ঘাস। আমাদের মধ্যে কেউ যদি এই ঘাসের ওপর বসে তাহলেই ভিয়াখির রেগে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক দেয়:

'ঘাসগুলোর দফারফা করছ কেন? বালির ওপরে বসতে পার না? ঘাসের ওপর বসা আর বালির ওপর বসা—একই কথা।'

ও যদি হাজির থাকে তাহলে গাছগাছড়ায় হাত দেবার সাহস হয় না আমাদের। এল্‌ডারবেরির ঝোপে ফুল ফুটে থাকে, তার একটা শীষ, বা ওকা নদীর ধার থেকে উইলো গাছের একটা ডাল—কোনো কিছুই ভাঙি না।

অবাক হয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ও বলে, 'আচ্ছা, এভাবে শয়তানি করে যে জিনিসপত্র নষ্ট করিস—এতে কী লাভ হয় বল্‌ তো?'

ওকে অবাক হতে দেখে আমরা লজ্জা পাই।

প্রতি শনিবার আমাদের একটা খেলা আছে। এই খেলার তোড়জোড় চলে সারা সপ্তাহ ধরে—তোড়জোড় মানে, রাস্তা থেকে ফেলে-দেওয়া গাছের ছালের চটিজুতো কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখা। শনিবার সন্ধ্যার সময় যখন সাইবেরিয়ার জাহাজঘাট থেকে তাতার খালাসীরা ফিরে যায় তখন আমরা রাস্তার মোড়ে কোনো একটা আড়ালে লুকিয়ে থেকে তাদের দিকে চটিজুতোগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি। প্রথমে ওরা রেগে যায় ও আমাদের পিছনে তাড়া করে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেরাই খেলায় মেতে ওঠে। তখন ওরাও আসন্ন লড়াইয়ের কথা ভেবে গাছের ছালের চটিজুতো দিয়ে নিজেদের অস্ত্রাগার ভরিয়ে তোলে। আমরা কোথায় অস্ত্র লুকিয়ে রাখি সেটা ওরা লক্ষ্য করে আর মাঝে মাঝে আমাদের অস্ত্রাগার থেকে চুরি করতে আসে।

আমরা প্রতিবাদ করি, 'এভাবে খেলা হয় না।'

ওরা তখন চুরি-করা জিনিসগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। তারপর চলে লড়াই। সাধারণত ওরা দাঁড়িয়ে থাকে খোলা জায়গায় আর আমরা তারস্বরে চিৎকার করতে করতে ওদের চারপাশে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াই ও হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি। ওরাও তারস্বরে চিৎকার করে। আর যখনই একটা চটিজুতো খুব ভালোভাবে তাক্‌ করে ছুঁড়ে মারা হয় আর সেই জুতোয় পা আটকে গিয়ে আমাদের কেউ বালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে—অমনি ওরা হো-হো করে গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠে।

অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত মাঝেমাঝে খেলা চলে। ক্ষুদে ব্যবসাদাররা কোণে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখে আমাদের কাণ্ডকারখানা। মুখে অবশ্য ভর্ৎসনা

করে আমাদের—না করলে ভালো দেখায় না তাই। কিন্তু জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি চলে সমানে; ছাইরঙা, ধুলোমাখা পাখির মতো শূন্যে উড়তে থাকে জুতোগুলো। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো মারাত্মক রকমের আঘাত পায়। কিন্তু লড়াইয়ের আনন্দে কোনো আঘাত বা যন্ত্রণা আমরা গায়ে মাখি না।

তাতাররাও আমাদের মতোই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। লড়াই শেষ হয়ে গেলে মাঝে মাঝে আমরা ওদের সঙ্গে ওদের বাড়িতে যাই। ওরা আমাদের খেতে দেয় ঘোড়ার মাংস আর শাকসব্জির একটা অদ্ভুত রান্না। ঘন চা ও পিঠে দেয় খাওয়ার পরে। এই লোকগুলোর চেহারা প্রকাণ্ড, গায়ের জোরে একজন আরেকজনকে ছাড়িয়ে যায় মনে হয়—ভারি ভালো লাগে ওদের। ওদের স্বভাবের মধ্যে কি একটা আছে যাতে মনে হয় ওরা শিশুর মতো সরল ও সাদাসিধে। আমি বিশেষ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম এই দেখে যে ওরা কক্ষণো রাগারাগি করে না আর প্রত্যেকের ওপরেই প্রত্যেকের ভারি দরদ।

প্রাণ খুলে হাসে ওরা, সে-হাসি আর থামতেই চায় না। একজন ছিল (এই লোকটি হচ্ছে কাসিমভ'এর চাষী, নাকটা ভাঙা, রূপকথার বীরের মতো গায়ের জোর; একবার সে একটা দশমণি গির্জার-ঘণ্টা বজরা থেকে তুলে নিয়ে পাড় ভেঙে ডাঙায় উঠেছিল)—সে হাসতে শুরু করলে গাঁক গাঁক করে হুংকার ছাড়ে আর চিৎকার করে বলে:

'উ-উ! উ-উ! মুখের কথা—আকাশের চিঁড়িয়া! কথা শুনলে তো চিঁড়িয়া ধরা পড়ল! আর শুধু সোনার মুদ্রাই হোলো আসল কথা!'

একদিন ভিয়াখিরকে হাতের তালুর ওপরে বসিয়ে একেবারে শূন্যে তুলে ধরল।

'আকাশে থাকার সোয়াদটা বুঝে নাও!' বলল সে।

বাদলার দিনে আমরা জড়ো হই ইয়াজের বাড়িতে। গোরস্থানের মধ্যে ছোট একটি বাড়িতে ইয়াজ তার বাবাকে নিয়ে থাকে। ইয়াজের বাবার বাঁকা তোবড়ানো শরীর, লম্বা লম্বা হাত, মাথায় ও মুখে খোঁচা খোঁচা নোংরা চুল। তার মাথাটাকে দেখে মনে হয়, বোঁটার মতো লিকলিকে ঘাড়ের ওপরে যেন একটা শুকনো শালগম। খোশমেজাজে হল্‌দে হল্‌দে চোখদুটোকে সরু করে বিড়বিড় করে সে বলে চলে: 'কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই! হুঁ হুঁ!'

আমরা খানিকটা চা, চিনি, রুটি আর ইয়াজের বাবার জন্যে অল্পকিছু ভদ্‌কা কিনে নিয়ে যাই।

চুরকা হুকুম দেয়, 'ওরে পাজী চাষী, সামোভারে আগুন দাও তো দেখি!'

শুনে পাজী চাষী হাসে ও হুকুম-মতো কাজ করে। জল ফুটে উঠতে উঠতে আমরা নিজেদের ব্যাপারগুলো একটু আলোচনা করে নিই। সেও আমাদের পরামর্শ দেয়:

'নজর রেখো বাবারা—পরশুদিন ত্রুসভদের বাড়িতে শ্রাদ্ধের খাওয়া আছে। অনেক হাড় পড়ে থাকবে কিন্তু!'

সবজান্তা চুরকা বলে, 'ত্রুসভদের বাড়িতে যে মেয়েলোকটা রান্না করে, সে একটা হাড়ও পড়ে থাকতে দেয় না। সব নিজে নেয়।'

জানলা দিয়ে বাইরের কবরখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভিয়াখির বলে, 'শীঘ্রই আবার জঙ্গলে ঢোকা যাবে।'

ইয়াজ খুব কমই কথা বলে। বিষণ্ণ চোখদুটো তুলে ও শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আমাদের দিকে। ছাইগাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে কতগুলো পুতুল পেয়েছে ও; সেগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখায় আমাদের। পুতুল বলতে একটা কাঠের সেপাই, একটা ঠ্যাঙ-ভাঙা ঘোড়া, কয়েকটা বোতাম আর কয়েক টুক্‌রো পেতল।

ওর বাবা টেবিলের ওপরে পেয়ালা সাজিয়ে দেয়, সামোভার নিয়ে আসে। পেয়ালাগুলো কিম্ভূতকিমাকার, কোনোটার সঙ্গে কোনোটা মেলে না। কস্ত্রমা চা ঢালে। বুড়ো ভদ্‌কা খেয়ে নিয়ে সোজা গিয়ে ওঠে চুল্লির ওপরে আর সেখান থেকে লিকলিকে ঘাড় নিচু করে প্যাঁচার মতো চোখে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে আর বিড়বিড় করে বলে:

'উচ্ছন্নে যা! উচ্ছন্নে যা! তোরা কি মানুষ নাকি? হুঃ! তোরা হচ্ছিস একদল চোর! কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই!'

'আমরা চোর নই।' ভিয়াখির বলে।

'ক্ষুদে চোর আর কি।'

ইয়াজের বাবার বকবকানি শুনে যখন আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠি, চুরকা ধমক দিয়ে ওঠে:

'চুপ করো বলছি, পাজী চাষী!'

ইয়াজের বাবা বসে বসে ফিরিস্তি দিল, এই অঞ্চলের কতজন লোকের

অসুখ করেছে; তারপর জল্পনা-কল্পনা করে, এদের মধ্যে কে আগে মরবে, তার কথা শুনতে ভিয়াখির, চুরকা ও আমার অসহ্য লাগে। ইয়াজের বাবাকে দেখে মনে হয়, কে আগে মরবে ভাবতে পেরেই যেন সে খুশিতে ঠোঁট চাটছে। তার মধ্যে একটুকু মায়াদয়া দেখা যায় না। আর যখন সে বুঝতে পারে যে এসব কথা শুনতে আমরা বিরক্তি বোধ করছি, তখন ইচ্ছে করে করে আরো আমাদের পিছনে লাগে।

'হুঁ, হুঁ, বাবারা, ক্ষুদে মহারাজদের মনে অমনি ভয় ঢুকে গেছে! এই আমি বলে রাখছি, শুনে রাখ্, ওই যে মোটা হোঁৎকা লোকটা আছে, ও শীগ্‌গিরই পটল তুলবে। তারপর পচে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ও ব্যাটার অনেক দিন লাগবে!'

আমরা তাকে থামিয়ে দিই কিন্তু কিছুতেই তার মুখ বন্ধ করতে পারি না।

'আর দেখে নিস, তোদের পালাও শীগ্‌গিরই আসছে! ছাইগাদার ময়লা ঘেঁটে ঘেঁটে খাবার জোটাস—তোদের পরমায়ু খুব বেশি বলে মনে করিস নাকি তোরা!'

ভিয়াখির বলে, 'বেশ, বেশ, মরবই তো। ভালোই হবে, মরলে পরে আমরা সবাই দেবদূত হয়ে যাব।'

'তোরা হবি দেবদূত? তোরা!' থ' হয়ে তাকিয়ে থাকে ইয়াজের বাবা, তারপরেই হাসিতে ফেটে পড়ে আর আবার মরা মানুষের বিশ্রী বিশ্রী গল্প বলে উত্ত্যক্ত করে তোলে আমাদের।

কিন্তু মাঝে মাঝে গুনগুনে চাপা গলায় অদ্ভুত সব কথা বলতে শুরু করে সে:

'ওরে শোন, শোন। পরশুদিন একজন মহিলাকে কবর দিতে এনেছিল। মহিলাটির সে এক অদ্ভুত ইতিহাস। খোঁজ করে করে আমি সব জানতে পেরেছি। ভাবিস কি তোরা?..'

প্রায়ই সে মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করে। মেয়েদের সম্পর্কে সর্বদাই কথা বলে অতি নোংরাভাবে। কিন্তু তার গল্পগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যাকুলতার সুর ও প্রশ্ন থেকে যায় যাতে মনে হতে পারে, সে যেন ভেবেচিন্তে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করতে পারে তার জন্যে আমাদের সাহায্য সে চাইছে। মন দিয়ে আমরা শুনি। থেমে থেমে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার জন্যে মাঝে মাঝে কথা বন্ধ করে সে বলে চলে। কিন্তু যা-ই বলুক

না কেন, তার কথাগুলো আমাদের স্মৃতিতে একটা অস্বস্তিকর ছাপ ও কাঁটা-বেঁধার মতো জ্বালা সৃষ্টি করে।

'মেয়েটিকে ওরা জিজ্ঞেস করে, "কে আগুন লাগিয়েছিল?" মেয়েটি বলে, "আমি আগুন লাগিয়েছিলাম!" "বললেই হল আর কি, সেদিন রাত্রে তুমি তো হাসপাতালে ছিলে!" মেয়েটি আবার বলে, "আমি আগুন লাগিয়েছিলাম" এই একই কথা বলে চলে। কেন বলেছিল কে জানে! কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই! হুঁ, হুঁ!..'

এই বৈচিত্র্যহীন ও বিষাদমাখা কবরখানায় মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে যতোজন লোককে সে কবর দিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জীবন-কাহিনী সে জানে। যখন সে কথা বলে তখন মনে হয় যেন আশেপাশের সমস্ত বাড়ির অন্দরমহলের দরজা আমাদের সামনে সে খুলে ধরেছে। সেই খোলা দরজা দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকেছি আর দেখছি বাড়ির বাসিন্দারা কি-ভাবে দিন কাটায়। মনে হচ্ছে যেন কাজটা হেলাফেলার নয়, এর মধ্যে গুরুগম্ভীর ব্যাপার কিছু আছে। তাকে দেখে মনে হয়, শুধু কথা বলেই সে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জানলার বাইরে যেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে অমনি চুরকা উঠে দাঁড়ায় আর বলে:

'আমি বাড়ি যাচ্ছি -- নইলে মা আমার ভয় পাবে। তোরা কেউ উঠবি নাকি?'

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠি। ইয়াজ আমাদের সঙ্গে সদর পর্যন্ত আসে, গেটটা বন্ধ করে দেয়, বাখারির ওপরে চোয়াড়ে কালো মুখটা চেপে ধরে চাপাস্বরে বিদায় জানায় আমাদের।

আমরাও বিদায় জানাই। ওকে এই কবরখানার মধ্যে ফেলে রেখে যেতে সর্বদা অস্বস্তি লাগে আমাদের। একদিন কস্ত্রমা ফিরে আসতে আসতে মুখ ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বলল:

'কোন্ দিন না সকালে উঠে শুনতে হয় যে ও মরে গেছে।'

চুরকা প্রায়ই বেশ জোর দিয়ে বলে যে আমাদের মধ্যে ইয়াজের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। কিন্তু ভিয়াখির একথা স্বীকার করে না।

'আমাদের অবস্থা তো খারাপ নয়। খারাপ কেন হতে যাবে?' সমান জোর দিয়ে ও বলে।

ভিয়াখিরের কথায় আমি সায় দিই। বাইরের এই মুক্ত জীবন আমার খুবই ভালো লাগে। আর আমার সঙ্গীদেরও আমি পছন্দ করি। ওদের সঙ্গ

পেয়ে আমার মন এক মস্ত নতুন অনুভূতিতে ভরে গেছে। মনের মধ্যে সব সময়ে ইচ্ছা জাগে, ওদের সাহায্য ও উপকার করি। আর এই ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে আমাকে।

এদিকে স্কুলে আবার আমি বিভ্রাটে পড়েছি। স্কুলের ছেলেরা আমাকে বাউণ্ডুলে ও আবর্জনা-কুড়ুনে বলে ডাকতে শুরু করেছে। একদিন ঝগড়া হয়ে যাবার পরে ওরা মাস্টারমশাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করে যে আমার গায়ে নাকি ভয়ানক জঞ্জালের গন্ধ এবং আমার পাশে কিছুতেই বসে থাকা যায় না। মনে আছে, একথা শুনে আমার খুবই কষ্ট হয় এবং এ ঘটনার পর আবার স্কুলে যেতে খুবই খারাপ লাগে। ছেলেদের এই নালিশটা ছিল মনগড়া; এটা ওদের কুচুটেপনা ছাড়া কিছু নয়। রোজ সকালে আমি খুব ভালো করে স্নান করি; আর যে জামাকাপড় পরে আমি রাস্তার আবর্জনা কুড়োই, তা পরে কক্ষণো স্কুলে যাই না।

অবশেষে আমি তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। ভালো ভাবে লেখাপড়া করার পুরস্কার হিসেবে আমাকে দেওয়া হল একটা সুকৃতিজ্ঞাপক সার্টিফিকেট, একটা বাইবেল, একখন্ড ক্রিলভের উপকথা আর 'ফাতা মরগানা' এই দুর্বোধ্য নামের কাগজের মলাট দেওয়া একটা বই। উপহারগুলো নিয়ে বাড়ি এলাম। উপহারগুলো দেখে দাদামশাইয়ের খুবই আনন্দ হল এবং তিনি খুবই অভিভূত হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে বইগুলোকে সযত্নে রাখা দরকার এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি বইগুলোকে নিজের সিন্দুকের মধ্যে রেখে দেবেন। এদিকে গত কয়েক দিন ধরে দিদিমা অসুস্থ, তাঁর হাতে একটিও পয়সা নেই। দাদামশাই বিড়বিড় করে মনের ঝাল প্রকাশ করছেন:

'তোরাই আমার সর্বনাশ করবি দেখছি — তোদের খাইয়ে খাইয়েই ফতুর হতে হবে আমাকে...'

এই ব্যাপার দেখে আমি এক বইয়ের দোকানে গিয়ে বইগুলোকে পঞ্চান্ন কোপেকে বিক্রি করে ফেললাম। টাকাটা এনে দিলাম দিদিমার হাতে। সুকৃতিজ্ঞাপক সার্টিফিকেটটার ওপরে হিজিবিজি লিখে নষ্ট করে ফেললাম সেটা। তারপর সার্টিফিকেটটা দিলাম দাদামশাইয়ের হাতে। হিজিবিজি লেখাগুলো দাদামশাইয়ের চোখে পড়ল না। তিনি সেটা সযত্নে তুলে রাখলেন।

স্কুলের শেষে আমি আবার রাস্তার জীবনে ফিরে যাই। বসন্ত এসে গেছে: এখন এই রাস্তার জীবনে আগের চেয়েও অনেক বেশি যাদু রয়েছে।

এখন আমরা আরও বেশি পয়সা উপায় করি। রবিবার প্‌রো দল আমরা বেরিয়ে পড়ি মাঠে কিংবা জঙ্গলে, ফিরে আসি সন্ধ্যা পার করে, মধ্‌র ক্লান্তিতে সারা শরীরটা ভেঙে পড়ে, আর দলের প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকের টান আরো অনেকখানি বেড়ে যায় যেন।

কিন্তু এই জীবনের স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয়নি। আমার সৎ-বাপ আবার চাকরি খ্‌ইয়ে বসে এবং কোথায় যেন চলে যায়। আমার মা ও ছোট ভাই নিকোলাই এসে ওঠে দাদামশাইয়ের বাড়িতে। এদিকে দিদিমা চলে গেছেন এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে, সেখানে তিনি যীশ্‌ খ্রীষ্টের শয্যাবরণীর ওপরে স্‌চের কাজ করছেন এবং সেখানেই থাকেন তিনি। স্‌তরাং ছোট ভাইকে দেখাশোনার ভার পড়ল আমার ওপরে।

আমার মা কথা বলে না, তার শরীরটা রক্তহীন হয়ে গেছে, এমন কি একটা পা নাড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত তার নেই। ছোট ভাইয়ের পায়ের গোড়ালিতে বিষাক্ত ঘা; বাচ্চাটা এত দ্‌র্বল যে কাঁদতে পর্যন্ত পারে না। খিদে পেলে ভয়ানকভাবে গোঙায়, আর পেট ভরা থাকলে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে আর ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে — বেড়ালের মতো ঘড় ঘড় আওয়াজ হয় গলা থেকে।

একদিন দাদামশাই বাচ্চাটাকে খ্‌ব ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, 'ওর এখন যেটুকু দরকার তা হচ্ছে ভালো খাওয়া। কিন্তু তোদের এতগ্‌লি লোককে খাওয়াবার সামর্থ্য কই আমার বল্‌?'

শ্বাস টেনে টেনে ভাঙা ভাঙা গলায় মা বলল, 'ওর জন্যে আর কতটুকু বা দরকার।'

'এর জন্যে একটুখানি — ওর জন্যে একটুখানি — সব মিলিয়ে অনেকখানি...'

বিরক্তির সঙ্গে হাতটাকে ঝাঁকিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালেন:

'নিকোলাইয়ের গায়ে একটু রোদ-হাওয়া লাগা দরকার। ওকে নিয়ে বাইরে বালির ওপর শ্‌ইয়ে দে...'

কয়েক বস্তা শ্‌ক্‌নো আর পরিষ্কার বালি নিয়ে এলাম আমি। জানলার নিচে যেখানে রোদ এসে পড়ে, সেখানে ঢেলে দিলাম। তারপর দাদামশাই যেমনটি বলেছেন সেইভাবে ছোট ভাইকে ঘাড় পর্যন্ত ডুবিয়ে দিলাম বালির মধ্যে। বাচ্চাটাকে দেখে মনে হল এভাবে থাকতে ওর ভালো লাগছে। একইভাবে বসে থাকে; আরামে চোখ ব্‌জে আসে আর টেরিয়ে তাকায়

আমার দিকে। কী আশ্চর্য চোখ ওর! মনে হয়, নীল মণিকে ঘিরে আরো ফিকে সাদা নীল একটা চক্র দিয়েই শুধু বুঝি ওর চোখদুটো তৈরি।

ভাইটি আমার খুবই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল। মনে হয়, আমার চিন্তাগুলোও ও বুঝতে পারে। জানলার নিচে ওর পাশটিতে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ শুয়ে থাকি। জানলা দিয়ে ভেসে আসে দাদামশাইয়ের কিচকিচে গলার স্বর:

'মরতে তো বোকারাও পারে। তুমি যদি জানতে কী করে বাঁচতে হয়...'

শোনা যায় মা'র কাশি; অনেকক্ষণ ধরে চলে সেই কাশি...

নিকোলাই তার ক্ষুদে ক্ষুদে হাতদুটো বালির ভিতর থেকে টেনে বার করে আনে; ফ্যাকাশে মাথাটা নাড়তে নাড়তে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ওর মাথায় পাত্‌লা রুপোলি চুল, মুখটা বুড়োটে ও গুরুগম্ভীর।

যদি কোনো বেড়াল বা মুরগী কাছে আসে তাহলে নিকোলাই নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে আর তারপর এক সময়ে আমার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে মুচ্‌কি হাসে। ওর এই হাসি দেখে আমি অস্বস্তি বোধ করি। ওর পাশে চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে বলে আমার ভারি বিশ্রী লাগছে — এটা কি ভাইটি টের পায়? ও কি বুঝতে পারে যে আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখান থেকে উঠে চলে যাই এবং রাস্তায় গিয়ে আমার দলবলের সঙ্গে জুটি?

উঠোনটা ছোট আর যতো আবর্জনায় ভর্তি। সদর থেকে উঠোনের পিছনদিককার স্নানঘর পর্যন্ত এলোমেলো কাঠের গুদাম ও চালা জড়াজড়ি করে রয়েছে। চালার ওপরে স্তূপ করা রয়েছে তক্তা, কাঠের গুঁড়ি, ভিজে চ্যালাকাঠ আর ভাঙা নৌকোর টুক্‌রো। বসন্তকালে যখন বরফ গলতে শুরু করে আর নদী ফেঁপে ওঠে সেই সময়ে ওকা নদী থেকে সংগৃহীত সামগ্রী এগুলো। নদীর জলে জবজবে ভিজে কাঠ ছড়ানো রয়েছে সারাটা উঠোনে। কাঠগুলো যখন রোদে শুকোতে শুরু করে তখন একটা পচা গন্ধ বেরোয়।

আমাদের বাড়ির একেবারে পাশেই একটা কসাইখানা। প্রায় রোজই ভোরে শোনা যায় বাছুর আর ভেড়ার আর্ত চিৎকার। আর রক্তের গন্ধ এত ঝাঁজালো হয়ে ওঠে যে আমার মনে হয়, ধুলোভরা বাতাসে সূক্ষ্ম একটা জালের মতো রক্ত ঝুলে আছে।

দুই শিঙের মাঝখানে খাঁড়ার ঘা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারগুলোর চিৎকার শোনা যায়। আর নিকোলাই তখন ভুরু কুঁচকে ঠোঁট ফুলোয়। দেখে

মনে হয় যেন জানোয়ারের ডাক ও নকল করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর মুখ থেকে 'ফু' 'ফু' শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরোয় না।

দুপুর হলে দাদামশাই জানলা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে ডাক দেন:

'খাবার তৈরি!'

তিনি নিজেই বাচ্চাকে কোলের ওপরে তুলে নিয়ে খাওয়ান। রুটি আর আলু নিজে চিবিয়ে নিয়ে গুঁজে দেন বাচ্চার ক্ষুদে ক্ষুদে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। বাচ্চার সারা মুখে আর ছুঁচলো ছোট চিবুকে রুটি আর আলু মাখামাখি হয়ে যায়। এইভাবে অল্প একটু খাওয়ানো হয়ে গেলেই তিনি বাচ্চার গায়ের জামাটা তুলে ফুলো ফুলো পেটের ওপরে টোকা দিতে দিতে বলেন:

'কে জানে বাপু পেট ভরেছে কিনা। নাকি, আরেকটু লাগবে?'

'দেখতে পাচ্ছেন না ও হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে রুটিটা ধরতে চাইছে?' অন্ধকার কোণ থেকে বিছানায় শুয়ে শুয়েই মা বলে ওঠে।

'তাহলেই হয়েছে! বাচ্চাদের আর কতটুকু বোধ আছে যে পেট ভরে গেছে কিনা বুঝতে পারবে?'

একথা বলার পরে তিনি আবার মুখ থেকে একটা দলা বার করে বাচ্চার মুখে দিয়ে দেন। এই ধরনের খাওয়ানো দেখে আমি লজ্জায় মরে যাই। আমার গলার কাছটায় কী যেন উঠে এসে শ্বাসরোধ করে, ভেতরে বমি পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে।

অবশেষে দাদামশাই বলেন, 'বাস, হয়ে গেছে। এবার ওকে ওর মা'র কাছে নিয়ে যা।'

নিকোলাইকে কোলে তুলে নিয়ে আসার পরেও ও গোঙাতে গোঙাতে খাবার টেবিলের দিকে হাত বাড়াতে থাকে। মা বিছানায় উঠে লম্বা অস্থিসার হাতদুটো বাড়িয়ে দেয় বাচ্চাকে নেবার জন্যে। মা এত রোগা হয়ে গেছে যে তাকে দেখে মনে হয় যেন ডালপাতা ছাঁটা পাইনগাছ।

আজকাল মা কথা প্রায় বলেই না। কখনো-সখনো দু-একটা কথা যা বলে, সেগুলো তার সারা বুকের মধ্যে হাঁপানি তুলে বুকটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসে। সারাটি দিন পড়ে আছে ঘরের কোণে। আর এই অবস্থায় নিঃশব্দে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। আমি বুঝতে পারি, মা'র মৃত্যু আসন্ন। আর দাদামশাইয়ের কথা শুনে এ-বিষয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়। দাদামশাই আজকাল বড়ো বেশি আর বড়ো ঘন ঘন মৃত্যুর কথা বলেন;

বিশেষ করে বলেন সন্ধ্যার সময়ে যখন বাইরে পচা গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

ঘরের কোণে আইকনের প্রায় নিচে দাদামশাইয়ের বিছানা। জানলা ও আইকনের দিকে মাথা দিয়ে শোয়া অভ্যেস তাঁর আর রোজই ঘুমিয়ে পড়ার আগে বিড়বিড় করে বলেন:

'আর কি, মরবার সময় তো হয়েছে। এবার সৃষ্টিকর্তার কাছে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব? কী কৈফিয়ৎ দেব তাঁর কাছে? খেটে খেটে সারাটা জীবন পাত করেছি—কাজ ছাড়া একটি দিনও কাটাইনি। কিন্তু কী লাভ হয়েছে তাতে? নিজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছি!'

চুল্লি আর জানলার মাঝখানে মেঝের ওপরে আমি ঘুমোই। জায়গাটা আমার পক্ষে বড়ো ছোট। বাধ্য হয়ে আমার পা-দুটোকে চালিয়ে দিতে হয় চুল্লির ফোকরের মধ্যে। সেখানে আরশোলাগুলো আমার পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই বিশেষ জায়গাটা থেকে অন্য একটা দিকে লক্ষ্য রাখার সুবিধা আছে। রান্না করতে গিয়ে দাদামশাই অনবরত জানলার শার্সিগুলো ভেঙে ফেলেন; যে শলাকা বা বাঁশ দিয়ে তিনি পাত্রগুলো নামিয়ে নেন তারই উল্‌টো দিকের ঘা লেগে শার্সিগুলো ভেঙে যায়। আমি দেখি আর একটা কুচুটে আনন্দে খুশি হই। বাঁশের মাথাটা কেটে ফেললেই আর কোনো গোলমাল থাকে না; এই সামান্য বুদ্ধিটুকু দাদামশাইয়ের মতো বুদ্ধিমান লোকের মাথায় কেন যে আসে না — এটা আমার কাছে একটা অদ্ভুত ও উদ্ভট ব্যাপার বলে মনে হয়।

একদিন হল কী, চুল্লির ওপরে কি যেন ফুটছিল, এমন সময় বাঁশটা ধরে তিনি এমন এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিলেন যে চুল্লির ওপরে বসানো মাটির পাত্রটা উল্‌টে গিয়ে ভেঙে গেল, দুটো শার্সি আর শার্সির ফ্রেম চুরমার হয়ে গেল একেবারে। এত বড়ো একটা দুর্বিপাক দাদামশাই সহ্য করতে পারলেন না, মেঝের ওপরে বসে পড়ে কেঁদে ফেললেন আর বিলাপ করতে লাগলেন, 'হায় প্রভু! হায় প্রভু!'

পরে তিনি বেরিয়ে যেতেই আমি রুটি কাটার ছুরিটা নিয়ে বাঁশের মাথার খানিকটা অংশ থুড়ে থুড়ে বাদ দিয়ে দিলাম।

ফিরে এসে আমার কীর্তি দেখেই একেবারে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি: 'বেআক্কেল! নরকের কীট! করাত দিয়ে কাটতে পারলি না? শুনতে পাচ্ছিস তো? করাত, করাত, করাত! তাহলে বাড়তি টুকরোটা দিয়ে বেলুন তৈরি করে

বিক্রি করা যেত বাজারে। যতো শয়তানের ঝাড় এসে জুটেছে আমার কপালে!'

কথাগুলো বলে সদরের দিকে ছুটে গেলেন দাদামশাই। আর তখন মা আমাকে বলল, 'কেন তুই সব ব্যাপারে সর্দারি করতে যাস? নিজেরটা নিয়ে নিজে থাকবি।'

আগস্ট মাসের এক রবিবারের দুপুরে মা'র মৃত্যু হয়। তার কিছুদিন আগে আমার সৎ-বাপ বাইরে থেকে ফিরে এসেছে এবং একটা চাকরি পেয়েছে। থাকে স্টেশনের পাশে একটা ছোট পরিষ্কার বাড়ীতে। দিদিমা ও নিকোলাই আগেই চলে গেছে সেখানে। আর কয়েক দিনের মধ্যে মা'কেও নিয়ে যাবার কথা।

মৃত্যুর দিন সকালবেলা মা আমাকে বলল, 'যা তো রে, ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচকে এক্ষুণি একবার আসতে বল।' ক্ষীণ গলার স্বর, কিন্তু সচরাচর যেমন থাকে তার চেয়ে স্পষ্ট ও হাল্‌কা।

বিছানায় মা উঠে বসল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এলিয়ে দিল শরীর। তারপর বলে উঠল, 'দেরি করিসনে — ছুটে যা!'

মনে হচ্ছিল, মা হাসছে। একটা নতুন আলো ঝিকমিক করছে তার চোখে। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে শুনলাম, আমার সৎ-বাপ গির্জার উপাসনায় যোগ দিতে গেছে। সেখানে থেকে দিদিমা আমাকে দোকানে পাঠালেন নস্যি কিনে আনবার জন্যে। দোকানে নস্যি ছিল না এবং ইহুদী দোকানদার মহিলা আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নস্যি তৈরি করে দিল।

শেষকালে আবার যখন আমি দাদামশাইয়ের বাড়িতে ফিরে এলাম তখন চোখে পড়ল, মা টেবিলের কাছে বসে আছে। পরনে ফিকে নীল রঙের পরিষ্কার পোশাক, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো। ঠিক সেই আগেকার দিনের মতো গর্বোদ্ধত চেহারা।

'শরীরটা ভালো লাগছে — না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। কেন জানি না আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।

'এদিকে আয়,' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মা বলল, 'এতক্ষণ কোথায় টো-টো করে ঘুরছিলি?'

আমি জবাব দেবার সময় পেলাম না। তার আগেই মা আমার চুলের মুঠি ধরেছে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে করাতের মতো একটা লম্বা ছুরি তুলে নিয়ে ছুরিটার চ্যাপ্‌টা ফলা দিয়ে মারতে লাগল আমাকে। মারতে মারতে শেষ পর্যন্ত ছুরিটা পড়ে গেল মা'র হাত থেকে।

'তুলে আন! দে এখানে!'

ছুরিটা তুলে আমি টেবিলের ওপরে রাখলাম। মা আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। আমি গিয়ে বসলাম চুল্লির ধারে, সেখান থেকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইলাম মা'র দিকে।

চেয়ার থেকে উঠে মা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কোণের বিছানার দিকে, তারপর বিছানায় শুয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগল। তার হাতের নড়াচড়াটা এলোমেলো, দু-বার হাতটা এলিয়ে পড়ল বালিশের ওপরে... রুমালটা দলা পাকিয়ে গেল হাতের আঙুলের মধ্যে।

'জল...'

পাত্র থেকে পেয়ালাভর্তি জল নিয়ে আমি সামনে ধরলাম। অতি কষ্টে মাথাটা তুলে একঢোঁক জল খেল মা তারপর ঠান্ডা হাত বাড়িয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল আমাকে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকাল কোণের আইকনের দিকে, তারপর আমার দিকে; ঠোঁটদুটো নড়তে লাগল — যেন হাসছে; তারপর তার চোখের পাতা আস্তে আস্তে নেমে এল চোখের ওপর। দু-হাতের কনুই শরীরের দু-দিকে শক্তভাবে এঁটে রয়েছে; হাতদুটো ধীরে ধীরে চলেছে বুকের ওপরে, গলার কাছে। অলক্ষ্যে একটা ছায়া নেমে এল মুখের ওপরে। এবার মুখের হলদে চামড়া টান হয়ে রয়েছে, নাকটা ধারালো। মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল, কিন্তু নিশ্বাস বেরিয়ে এল না।

পেয়ালাটা হাতে নিয়ে আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম যেন অনন্তকাল ধরে। আমার দৃষ্টির সামনে মা'র মুখটা শক্ত ও পাঁশুটে হয়ে গেল।

দাদামশাই ঘরে ঢুকলেন।

'মা মরে গেছে,' আমি বললাম।

'মিথ্যে কথা বলে তোর কী লাভ হচ্ছে?' বললেন তিনি বিছানার দিকে তাকিয়ে।

তারপর তিনি চুল্লির কাছে গিয়ে কড়াই ও বাঁশের ঘটাং ঘটাং শব্দ করে 'পিরোগ' তুলে আনতে লাগলেন চুল্লির ভিতর থেকে। আমি জানি আমার মা মরে গেছে, সুতরাং আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম দাদামশাইয়ের দিকে। দাদামশাই নিজের থেকেই ব্যাপারটা টের পেয়ে নিক।

আমার সৎ-বাপ ঘরে ঢুকল। পরনে লিনেনের কোট, মাথায় সাদা ক্যাপ। একটিও কথা না বলে সে একটি চেয়ার তুলে মা'র বিছানার কাছে নিয়ে গেল।

তারপরেই হঠাৎ চেয়ারটা খসে পড়ল তার হাত থেকে, পেতলের শিঙার মতো আওয়াজ তুলে বলে উঠল সে, 'আরে! মরে গেছে যে!'

দাদামশাই অন্ধের মতো টলতে টলতে এগিয়ে এলেন বিছানার কাছে; তাঁর হাতের মুঠোয় বাঁশিটা ধরা আছে, আর চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে।

মা'র কবর যখন শুকনো বালি দিয়ে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে, তখন দিদিমা অন্য সব কবরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অন্ধের মতো হোঁচট খেলেন একটা ক্রুশের ওপরে, মুখে চোট লেগে কেটে গেল। ইয়াজের বাবা দিদিমাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। সেখানে দিদিমা যখন ক্ষতস্থানটা ধুয়ে নিচ্ছিলেন তখন ইয়াজের বাবা আমার কাছে এসে চাপা স্বরে আমাকে সান্ত্বনার কথা শোনাতে চেষ্টা করল:

'কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই! কী ব্যাপার হে তোমার? এসব ব্যাপারকে কক্ষণো মনে ঠাঁই দিতে নেই। ঠিক বলিনি ঠানদি? গরীব ধনী সবাই আসতে হবে এ-ঠাঁই। ঠিক বলিনি ঠানদি?'

জানলা দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ফিরে এল যখন, তার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর ভিয়াখিরকে নিয়ে এসেছে টানতে টানতে।

'দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে কী আছে,' একটা ভাঙা জুতোর-নাল বাড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ বলল, 'কী চমৎকার জিনিস বলো তো! ভিয়াখির আর আমি তোমাকে এটা উপহার দিচ্ছি। এটা যে কোনো একজন কসাকের জুতো থেকে খসে পড়েছে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই! ভিয়াখিরের কাছ থেকে এটা আমি কিনে নেব ভাবছিলাম -- দু কোপেক দামও দিতে চেয়েছিলাম ওকে...'

দাঁতে দাঁত ঘষে ভিয়াখির বলল, 'মিথ্যে কথা বলছ কেন?' এদিকে ইয়াজের বাবা চোখদুটো পিটপিট করতে করতে আমার সামনে লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে।

'ভিয়াখির কেমন চীজ দেখছ তো? আচ্ছা, আচ্ছা, শোনো, আমি নয়, ও নিজেই এটা তোমাকে উপহার দিচ্ছে...'

ক্ষতস্থান ধোয়া হয়ে গেলে দিদিমা নিজের নীল ও ফুলে-ওঠা মুখে একটা রুমাল জড়ালেন তারপর আমাকে ডাকলেন বাড়ি যাবার জন্যে। কিন্তু আমি বাড়ি যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। আমি জানতাম, বাড়িতে এখন

শেষকৃত্যের খাওয়াদাওয়া উপলক্ষে মদ্যপান চলবে এবং হয়তো একচোট ঝগড়াও হয়ে যাবে। গির্জা থেকে তখনো আমরা বেরিয়ে আসিনি, শুনেছিলাম মিখাইল-মামা ইয়াকভ-মামাকে বলছে:

'আজ বেশ খানিকটা মদ-টদ টানা যাবে রে! কী বলিস!'

ভিয়াখির আমাকে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করছে। সেই জুতোর নালটা গলায় ঝুলিয়েছে ও, আর চেষ্টা করছে তাতে জিভ ঠেকাতে। ইয়াজের বাবা হাসছে, ইচ্ছে করে বেশি বেশি করে হাসছে, তা বোঝা যায়। আর সমানে চিৎকার করে চলেছে:

'দেখ, দেখ, ওর কান্ড দেখ!' কিন্তু যখন দেখল যে এত করার পরেও আমি কিছুমাত্র কৌতুক বোধ করছি না তখন সে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে বলল:

'বাড়াবাড়ি ভালো নয়! অমন মুষড়ে পোড়ো না। সবাইকেই মরতে হবে। এমন কি পাখিদেরও মরতে হয়। শোনো—যদি চাও তো আমি তোমার মা'র কবরের ওপরে ঘাসের চাপড়া বসিয়ে দিতে পারি। তাহলে বেশ হবে, না? চলো না এখনই মাঠে চলে যাই। তুমি যাবে, ভিয়াখির যাবে, আমি যাব — আমার ইয়াজও যাবে। আমরা সবাই মিলে ঘাসের চাপড়া কেটে নিয়ে আসব, তারপর কবরের ওপরে সুন্দরভাবে বসিয়ে দেব। আর তখন কবরটি দেখে মনে হবে যে এর জুড়ি আর নেই!'

এই পরিকল্পনা আমার ভালো লাগল। তারপর আমরা সকলে মিলে মাঠে গেলাম।

আমার মা'র শেষকৃত্য হবার কয়েকদিন পরে দাদামশাই আমাকে বললেন:

'শোনো লেক্সেই, তোমাকে এভাবে মেডেলের মতো গলায় ঝুলিয়ে রাখব, তা তো আর চলতে পারে না। এখানে আর তোমার জায়গা হবে না। এবার তোমার দুনিয়ার ঘাটে বেরুবার সময় হয়েছে...'

তাই আমি দুনিয়ায় বেরিয়ে পড়লাম।

১৯১৩—১৯১৪

আমার ছেলেবেলা

অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

কলকাতা • বোম্বে • দিল্লী • হায়দ্রাবাদ

প্রকাশক :
রাজীব নিয়োগী
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩

তৃতীয় সংস্করণ
পৌষ ১৩৬৭
জানুয়ারি ১৯৬০

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শিবব্রত রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীশিবনাথ পাল
প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৪

এক

ছোট ঘুপ্সি ঘর। জানলার ঠিক নিচেই মেঝের উপরে আগাগোড়া সাদা পোশাক পরিয়ে আমার বাবাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। অস্বাভাবিক লম্বা দেখাচ্ছে তাঁকে। খোলা পায়ের পাতা, পায়ের আঙুলগুলো অদ্ভুত রকমের ফাঁক-ফাঁক হয়ে রয়েছে। বুকের উপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখা দুটি নিশ্চল শান্ত হাত — কিন্তু এই কোমল হাতের আঙুলগুলো পায়ের আঙুলের মতই বিকৃত। হাসি-হাসি চোখদুটো ঢেকে দেওয়া হয়েছে দুটি গাঢ় রঙের তামার মুদ্রার চাকতি দিয়ে। দরদভরা মুখখানা হয়ে উঠেছে সীসের মত বিবর্ণ। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুসংবদ্ধ দাঁতের আভাস। আর সেদিকে তাকিয়ে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি।

বাবার পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে আছে আমার মা, পরনে একটা লালরঙের স্কার্ট। বসে বসে কালো একটা চিরুনি দিয়ে বাবার নরম চুলগুলো আঁচড়ে দিচ্ছে: এই কালো চিরুনিটাই আমার হাতে তরমুজের খোসা কাটবার করাত হয়েছিল। মা বসে আছে আর ভাঙা গম্ভীর গলায় বিড়বিড় করে বলছে কি যেন। আর চোখদুটো ফুলো ফুলো, কান্নায় গলে পড়ছে মনে হয়।

আমার একটা হাত ধরে আছেন দিদিমা। দিদিমার চেহারাটা গোলগাল, মস্ত মাথা, প্রকান্ড চোখ, মজার থ্যাবড়া নাক। তাঁর সর্বাঙ্গ কোমল, হাবভাব গম্ভীর — কী যেন এক যাদু তাঁকে ঘিরে আছে। তিনিও কাঁদছেন, কিন্তু অদ্ভুত তাঁর কান্না — আমার মা'র কান্নার সঙ্গে সেই কান্না চমৎকার পোঁ ধরেছে যেন। তিনি কাঁপছেন আর অনবরত আমাকে ঠেলছেন বাবার দিকে। কিন্তু আমি তাঁকে আকড়ে ধরে আছি, তাঁর স্কার্টের পিছনে লুকচ্ছি। আমার ভয় হচ্ছে, আমি অস্বস্তি বোধ করছি।

ইতিপূর্বে আর কোনো দিন আমি বড়দের কাঁদতে দেখিনি। দিদিমা আমাকে অনবরত বলে চলেছেন, 'যাও বাছা, বাবাকে একবার দেখে এসো, আর এই তো শেষ দেখা! সময় না হতেই তোমার বাবা মারা গেছে...' কিন্তু দিদিমার এই কথাগুলোর অর্থও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি নিজে সবেমাত্র খুব শক্ত একটা অসুখ থেকে উঠেছি। স্পষ্ট মনে আছে, অসুখের সময় বাবা আমার কাছে আসতেন এবং নানারকম খেলার ভিতর দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। তারপর হঠাৎ তাঁর আসা বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই জায়গায় আসতে লাগলেন এই বিচিত্র স্ত্রীলোকটি, আমার দিদিমা।

দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'দিদিমা, কোথা থেকে হেঁটে এলে তুমি?'

দিদিমা জবাব দিলেন, 'আমি আসছি সেই উঁচু দেশ, নিজ্‌নি* থেকে। হেঁটে আসিনি, জাহাজে চেপে এসেছি। আরে ওঁচা, জলের উপর দিয়ে কি হাঁটা যায়?'

কথাগুলো আমার কাছে ভারি এলোমেলো মনে হয়েছিল। আমাদের বাড়ির উঁচুতলায় থাকে একদল দাড়িওয়ালা পারসী। পরনে তাদের নানা রঙের জামাকাপড় আর নিচুতলার কুঠরিতে থাকে হলুদরঙা বুড়ো কালমিক, ভেড়ার চামড়ার কারবারি। ওপর থেকে নিচে আসতে হলে রেলিংএর পিছনে গা বেয়ে বেয়ে নামা যায়, কিংবা পা হড়কে গেলে ডিগবাজি খেতে খেতে। এসব কথা আমি খুব ভালো করে জানি। এই তো সোজা কথা, কিন্তু এখানে আবার জল আসে কোত্থেকে? বুড়ী ঠিক কথা বলেননি, আগাগোড়া একেবারেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন।

'তুমি আমাকে ওঁচা ছেলে বললে কেন?'

হাসতে হাসতে তিনি জবাব দিলেন, 'কারণ তুই যে বড় চেঁচাস।'

তাঁর কথা বলার ধরণটা ভারি মিষ্টি, ভারি সরস, কথাগুলো যেন খুশিতে ভরা। সেই প্রথম দিন থেকেই আমাদের দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এই ঘরের মধ্যে আমার আর ভালো লাগছে না। দিদিমা যদি আমার হাত ধরে আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যান তাহলে বেঁচে যাই।

মা'র অবস্থা দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। মা'র এই কান্না আর আর্ত চিৎকার আমার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। মা'র এমন অবস্থা আমি আর কোনো দিন দেখিনি। এমনিতে মা খুব কড়া মেজাজের লোক, বাড়তি কথা বলে না। ফিটফাট পরিষ্কার ও মাদীঘোড়ার

* 'নিজ্‌নি' হচ্ছে নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদের সংক্ষিপ্ত নাম, এই শব্দের বাংলা অর্থ নিম্নদেশ। — সম্পাঃ

মত মস্ত। শরীরের বাঁধুনি আছে এবং হাত দুটি দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। কিন্তু এখন আমার মা বিশ্রীরকম ফুলে উঠেছে, কেমন যেন এলোমেলো। পরনে ছেঁড়া জামা, আলুলায়িত চুল। এমনিতে আমার মা'র ফিকে চুলগুলো মাথার উপরে ভারি সুন্দর মনোরম ভঙ্গিতে চুড়ো করে বাঁধা থাকে, কিন্তু এখন সেই চুল অনাবৃত কাঁধ আর চোখের উপর দিয়ে খসে পড়েছে; আমার বাবার ঘুমন্ত মুখের উপরে দুলছে চুলের একটা গুচ্ছ। বেশ কিছুক্ষণ হল আমি এই ঘরের মধ্যে আছি কিন্তু আমার মা একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পায়নি — সারাক্ষণ শুধুই আর্তনাদ করে কেঁদেছে আর বাবার মাথার চুল আঁচড়ে দিয়েছে।

একজন পুলিস ও জনকয়েক কালো রঙের চাষী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বিরক্তির সঙ্গে পুলিসটি বলল, 'নাও, হয়েছে।'

জানলায় একটা কাল রঙের পর্দা টাঙানো হয়েছিল, দমকা বাতাসে পর্দাটা নৌকোর পালের মত ফুলে উঠেছে। মনে আছে, বাবার সঙ্গে একবার আমি একটা পালতোলা নৌকোয় চেপে বেড়াতে গিয়েছিলাম আর হঠাৎ মেঘ-গর্জন শোনা গিয়েছিল। বাবা আমাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'বোকা ছেলে, ভয় পাবার কী আছে, ও কিছু নয়!'

হঠাৎ মা'র শরীরটা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল। চিত হয়ে মেঝেয় আছড়ে পড়ল; তার চুলগুলো লুটোপুটি খাচ্ছে, ফ্যাকাশে মুখটা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি অন্ধ। তার দাঁত কপাটি লেগেছে — ঠিক বাবার দাঁতের মতো।

যন্ত্রণাকাতর বিকৃত স্বরে মা বলল, 'দরজা বন্ধ করে দাও — আলেক্সেই'কে বাইরে যেতে বলো!'

দরজার দিকে ছুটে এগিয়ে যেতে যেতে দিদিমা আমাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। চিৎকার করে বললেন:

'ভয় পেয়ো না, ভালো মানুষের ছেলেরা! যিশু খৃীষ্টের দোহাই, তোমরা এখান থেকে চলে যাও, ওকে ছুঁয়ো না। ওর কলেরা টলেরা কিছু হয়নি, গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়েছে। দয়া করো, বাবারা!'

অন্ধকার কোণের দিকে একটা ট্রাঙ্কের পিছনে আমি গা-ঢাকা দিয়েছিলাম। সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার মা যন্ত্রণায় মেঝের উপর গড়াগড়ি

দিতে দিতে গোঙাচ্ছে আর দাঁতে দাঁত চেপে ধরছে। এদিকে দিদিমা মা'র চার দিকে হামা দেন, কোমল ও সানন্দস্বরে বলেন:

'জগৎপিতা ও তাঁর সন্তানের নামে বলছি! আরেকটু সহ্য করতে চেষ্টা করো, ভারিয়া*! হে পরমকরুণাময়ী জগৎমাতা, হে সর্বজীবরক্ষিকা...'

আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম। আমার বাবাকে যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে তারই চারপাশে মেঝের ওপরে ওঁরা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছেন, গোঙানি আর চিৎকার করছেন; মাঝে মাঝে বাবার গা স্পর্শ করেছেন, কিন্তু বাবা স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছেন, মনে হচ্ছে ওঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছেন যেন। অনেকক্ষণ ধরে চলে এই ব্যাপার। আমার মা কয়েকবার দু-পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু প্রত্যেকবারেই টলে পড়ে যায়। প্রকাণ্ড একটা কালো বলের মতো দিদিমা বারকয়েক ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি করেন এবং তারপর এক সময়ে হঠাৎ অন্ধকার থেকে শিশুর কান্না শোনা যায়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দিদিমা বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ছেলে হয়েছে গো!'

দিদিমা একটা মোমবাতি জ্বাললেন।

আমি বোধ হয় ঘরের সেই কোণেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কারণ আর কিছু আমার মনে নেই।

তারপরেই আমার স্মৃতিতে যে-ঘটনা অম্লান হয়ে আছে তা হচ্ছে এই: বর্ষার দিন, সমাধিস্থানের এক জনবিরল অংশ এবং একটা পিচ্ছিল মাটির ঢিবির উপরে আমি দাঁড়িয়ে। একটা গর্তের মধ্যে আমার বাবার কফিন নামানো হয়েছে আর সেদিকে তাকিয়ে আছি আমি। গর্তের তলায় জল জমেছে, ব্যাঙ লাফালাফি করছে — দুটো ব্যাঙ কফিনের হলদে ডালাটার উপরে লাফিয়ে উঠেছে।

সেই কবরের পাশে লোক বলতে আমরা কয়েকজন মাত্র। ভিজে জুবজুবে পুলিস, কোদাল হাতে দুজন রুক্ষ মেজাজী চাষা, আমার দিদিমা ও আমি। ঝিরঝিরে ইল্‌শে-গুঁড়ি বৃষ্টিতে আমরা সকলেই ভিজে গেছি।

'নে, এবার মাটি ফেল্।' বলে প্রহরীটি চলে গেল।

চাদরের খুঁটে মুখ চাপা দিয়ে দিদিমা কাঁদতে লাগলেন। লোক দুটি ঝুঁকে পড়ে কোদালভর্তি মাটি ফেলল। ঝপাং করে মাটি পড়তেই ছিট্‌কে

* ভারিয়া হচ্ছে ভারভারার সংক্ষিপ্ত নাম। — সম্পাঃ

এল গর্তের জল, ব্যাঙগুলো গর্তের গায়ে লাফালাফি করতে লাগল কিন্তু তাল তাল মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

আমার কাঁধে হাত দিয়ে দিদিমা বললেন, 'আয় রে, আলিওশা*।' কিন্তু আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না, দিদিমার হাত থেকে আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম।

'হায় প্রভু!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন। এমন সুরে কথাগুলো বললেন যে সন্দেহ থেকে গেল তাঁর অভিযোগটা কার বিরুদ্ধে, আমার না প্রভুর? বহুক্ষণ তিনি সেখানে মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন: এমন কি কবরের গর্তটা পুরোপুরি ভরাট হয়ে যাবার পরেও দাঁড়িয়ে রইলেন।

লোক দুটি কোদালের উল্‌টো দিক দিয়ে ঠুকে ঠুকে কবরের ওপরকার মাটি সমান করে দিল। বাতাস বইছে, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে বৃষ্টি। দিদিমা আমার হাত ধরে দূরের গির্জার দিকে আমাকে নিয়ে চললেন। গির্জার চারদিকে অনেকগুলো কবর, কবরের ওপরকার কালো ক্রুশচিহ্নগুলো ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

সমাধিস্থান থেকে বেরিয়ে আসার পর দিদিমা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তুই কাঁদছিস না কেন? একটুখানি কেঁদে নে।'

আমি বললাম, 'আমার কান্না পাচ্ছে না দিদিমা।'

শান্তস্বরে তিনি জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, যদি কান্না না পায় তো কাঁদিস নে।'

দিদিমা যে আমাকে কাঁদতে বললেন এটা খুবই অবাক হবার মতো কথা। আমি সচরাচর কাঁদি না, শারীরিক কোনো যন্ত্রণায় তো নয়ই। মনের দিক থেকে কোনো রূঢ় আঘাত পেলেই আমার কান্না আসে। আমাকে কাঁদতে দেখলে আমার বাবা হো-হো করে হেসে উঠতেন কিন্তু মা ধমক দিত:

'চুপ কর বলছি।'

পরে আমরা গাড়িতে চেপে ফিরে এলাম। চওড়া কাদা-প্যাচপেচে রাস্তা, দু-পাশে গাঢ় লাল বাড়ি।

'ব্যাঙগুলো কি বেরিয়ে আসতে পারবে না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, পারবে না। ভগবান ওদের মঙ্গল করুন!' দিদিমা জবাব দিলেন।

* আলিওশা হচ্ছে আলেক্সেইয়ের সংক্ষিপ্ত নাম। — সম্পাঃ

মা কিংবা বাবার মুখে কখনো এত ঘন ঘন এবং এমন আপনজনের মত ভগবানের উল্লেখ শুনিনি।

কিছুদিন পরে আমার মা, দিদিমা আর আমি একটা জাহাজের ছোট কেবিনে চেপে পাড়ি দিলাম। আমার ছোট ভাই মাক্সিম মারা গেছে এবং কোণের একটা টেবিলের ওপরে লাল ফিতে বাঁধা সাদা কাপড় জড়ানো অবস্থায় রাখা হয়েছে তাকে।

আমি বসে আছি আমাদের বাক্সপেঁটরা-পোঁটলাপুঁটলির ওপরে। আমার সামনে একটা উদ্‌গত গোল জানলা, ঠিক ঘোড়ার চোখের মতো দেখতে। বাইরের দিকে আমার দৃষ্টি। জানলার কাঁচের ঠিক নিচ দিয়েই ফেনাতোলা ঘন কালো জল ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে একেবারে জানলার কাঁচের উপরেই ঝাপ্‌টা দিয়ে যায় আর চমকে উঠে। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি মেঝের উপরে লাফিয়ে পড়ি।

আমার দিদিমা নরম দুটি হাত দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে আবার সেই পোঁটলার উপরে বসিয়ে দিয়ে বলেন, 'ভয় পাসনে যেন।'

ধূসর ভিজে কুয়াশা জলের উপরে জমে আছে। মাঝে মাঝে যেই দূরের এক টুকরো কালো জমি কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে আবার তা মিলিয়ে যায়। আমাদের চারপাশে সবকিছু কাঁপছে। শুধু আমার মা দাঁড়িয়ে আছে স্থির ও অবিচল, চোখদুটো শক্ত করে বোজা, মাথার পিছনে হাত দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখটা কালো, থমথমে আর অন্ধ। মা একটিও কথা বলছে না আর কেমন জানি মনে হচ্ছে মা একেবারে বদলে গেছে, সেই পুরনো মানুষ আর নেই। এমন কি মা যে পোশাক পরে আছে তাও আমার কাছে নতুন ঠেকছে।

বার বার দিদিমা খুব নরম গলায় বলছেন, 'ভারিয়া, লক্ষ্মীটি, একটু কিছু মুখে দে।'

কিন্তু আমার মা নির্বাক ও নিশ্চল।

দিদিমা আমার সঙ্গে কথা বলছেন ফিস্‌ফিস্‌ করে; মা'র সঙ্গে কথা বলবার সময় আরেকটু উচ্চকণ্ঠে, কিন্তু যেন খুবই ভয়ে ভয়ে এবং খুবই সাবধানে। তাও কচিৎ কখনো। আমার মনে হচ্ছে, দিদিমা আমার মা'কে ভয় করেন। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি এবং এই কারণেই দিদিমার ওপর আমার টান আরো বেড়ে যায়।

আচমকা আমার মা উঁচু কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল, 'সারাতভ। কোথায় গেল সেই নাবিক?'

'সারাতভ', 'নাবিক'... মা'র এই কথাগুলোও কেমন যেন অদ্ভুত অপরিচিত মনে হতে লাগল আমার কাছে।

ঘরে ঢুকল একজন বিশালস্কন্ধ পক্বকেশ লোক, পরনে নীল পোশাক, হাতে ছোট একটা বাক্স। দিদিমা তার হাত থেকে বাক্সটা নিলেন এবং আমার ছোট ভাইয়ের দেহকে সেই বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর প্রসারিত দুই হাতের ওপরে বাক্সটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। কিন্তু দিদিমা এত মোটা যে একপাশ না হয়ে তাঁর পক্ষে সেই দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কি করবেন বুঝতে না পেরে হাস্যকরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।

'মা যে কী!' বলে মা ধৈর্য হারিয়ে দিদিমার হাত থেকে কফিনটা কেড়ে নিল। তারপর দুজনেই বেরিয়ে চলে গেল। আমি সেই নীল পোশাক পরা লোকটির সঙ্গে কেবিনে রয়ে গেলাম।

লোকটি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'তাহলে কি, তোমার ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেল?'

'তুমি কে?'

'আমি একজন নাবিক।'

'আর সারাতভ কে?'

'সারাতভ একটা শহরের নাম। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওই হচ্ছে সারাতভ।'

কুয়াশার মালা জড়ানো অন্ধকার উঁচুনিচু জমি জানলার বাইরে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে পাঁউরুটি থেকে কেটে নেওয়া মস্ত একটা টুকরোর মতো মনে হচ্ছিল আমার।

'দিদিমা কোথায় গেল?'

'নাতিকে কবর দিতে।'

'ওকে কি মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

আমার বাবাকে কবর দেবার সময় কি-ভাবে কতগুলো জ্যান্ত ব্যাঙ মাটিতে চাপা পড়েছিল — সে-কথা আমি নাবিকটিকে বললাম। শুনে লোকটি

আমাকে দু-হাতে তুলে নিল এবং বুকের উপরে শক্ত করে চেপে ধরে চুমু খেল।

'ভাই, তুমি এখনো কিছু বুঝতে পারনি! ব্যাঙের জন্যে অত দরদ দেখাবার দরকার নেই — ব্যাঙের দল চুলোয় যাক্! তোমার মা'র জন্যে দরদ দেখাও, তাঁর অবস্থা দেখতে পাচ্ছ তো? শোক পেয়ে পেয়ে কী হয়ে গেছেন!'

হঠাৎ ওপরের দিক থেকে প্রচণ্ড একটা সোরগোল এবং তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এল। আমি জানতাম শব্দটা স্টীমবোটের, সুতরাং আমি ভয় পেলাম না। কিন্তু নাবিকটি তাড়াতাড়ি আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল 'আমাকে যেতে হবে' বলতে বলতে।

আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল, বেরিয়ে যাই। কেবিনের বাইরে এলাম। অন্ধকার সরু চলা পথটায় একজন লোকও নেই। দেখতে পাচ্ছিলাম, পিতলমোড়া সিঁড়িটা ঝক্‌ঝক্ করছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পোঁটলাপুঁটলি হাতে নিয়ে দলে দলে লোক চলেছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, সবাই জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার মানে আমাকেও যেতে হবে।

কিন্তু যখন আমি জাহাজ থেকে নামবার পাটাতনের কাছে ভিড়ের মধ্যে ডেকের উপরে গিয়ে দাঁড়ালাম, সবাই আমাকে ধমক দিতে শুরু করল:

'তুমি কোত্থেকে এলে? কার সঙ্গে এলে?'

'আমি জানি না।'

অনেকক্ষণ ধরে তারা আমাকে নিয়ে ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি করল। শেষকালে সেই পাকাচুল নাবিকটি এসে হাজির। সে বলল, 'ও এসেছে আস্ত্রাখান থেকে, একা একাই কেবিন থেকে বাইরে চলে এসেছে...'

আমাকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড়ে কেবিনে ফিরে এল সে, সেখানে পোঁটলার উপরে আমাকে বসিয়ে তর্জনী তুলে বলল, 'খবরদার!'

এই বলে শাসিয়ে সে চলে গেল।

উপরের হৈচৈ-সোরগোল আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছে। থেকে গেছে স্টীমারের ঝাঁকুনি আর জলের শব্দ। কেবিনের জানলাটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে একটা ভিজে দেওয়াল; ফলে কেবিনের ভিতরটা গুমোট আর অন্ধকার। আমার মনে হতে লাগল, পোঁটলাগুলো যেন ফুলেফেঁপে আমাকে পিষে ফেলতে চাইছে। তাই আমার অস্বস্তি হতে লাগল। এই জনমানবহীন

স্টীমারে আমাকে একেবারে ফেলে রেখে যদি সবাই চলে গিয়ে থাকে, তাহলে কী হবে?

আমি দরজার কাছে গেলাম। দরজাটা শক্তভাবে বন্ধ করা, দরজা খোলবার পিতলের হাতল আমি কিছুতেই ঘোরাতে পারলাম না। একটা দুধের বোতল নিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘা মারলাম হাতলটার উপরে। বোতলটা চুরমার হয়ে গিয়ে আমার পা ও জুতোর উপরে দুধ গড়িয়ে পড়ল।

কোনো দিক দিয়ে কিছু করতে না পেরে আমি মনমরা হয়ে পোঁটলা-গুলোর উপরে শুয়ে রইলাম এবং কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম, স্টীমারটা আবার কাঁপছে, শোনা যাচ্ছে জলের শব্দ, কেবিনের জানলাটা সূর্যের মত ঝল্‌সে উঠেছে। দিদিমা আমার পাশে বসে চুল আঁচড়াচ্ছেন আর কপাল কুঁচকে নিজের মনে মনেই বিড়বিড় করে কী বলছেন যেন। দিদিমার মাথায় গোছা গোছা নীলাভ কালো চুল দেখে অবাক হতে হয়। সেই চুলের গোছা তাঁর কাঁধ বুক আর হাঁটুর উপর দিয়ে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ছে। একহাতে তিনি সেই চুলের গোছাকে মেঝের উপর থেকে তুলে শক্ত করে ধরে আছেন এবং অপর হাতে একটা মোটা কাঠের চিরুনি দিয়ে গোছা গোছা চুলের জট্ ছাড়াতে চেষ্টা করছেন। তাঁর মুখ কুঁচকে উঠেছে, রাগে জ্বলছে কালো চোখদুটো, আর গোছা গোছা চুলের মাঝখানে ছোট আর হাস্যকর দেখাচ্ছে মুখখানাকে।

দিদিমাকে দেখে মনে হচ্ছিল আজ তাঁর মেজাজ ভালো নেই। কিন্তু তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর চুলগুলো এত লম্বা কেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গলার স্বরটা নরম হয়ে এল। তখন আগের দিনের মতোই দরদভরা সুরে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

'চুলের কথা বলছিস, এটা খুব সম্ভব ভগবানের দেওয়া একটা শাস্তি। ভগবান বলেছেন — এই নে, তোকে একমাথা চুল দিলাম, এই আপদ সামলাতে সামলাতেই তোর দিন কাটুক! অল্প বয়সে এই চুল নিয়েই আমার দেমাক ছিল কত! আর এখন এটা হয়েছে আমার দু-চোখের বিষ। কিন্তু দাদু, এবার ঘুমোও তো। এখনো ভালো করে সূর্য ওঠেনি — এত তাড়াতাড়ি উঠতে হবে না।'

'আমি আর ঘুমোব না দিদিমা।'

'বেশ, ইচ্ছে যদি না হয় তো ঘুমিও না।' বেণী বাঁধতে বাঁধতে তিনি সায় জানালেন। একটা খাটিয়ার উপরে আমার মা তীরের মত টান হয়ে

চিত হয়ে শুয়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কাল দুধের বোতলটা ভাঙলি কী করে রে? চেঁচাসনে বাপু, যা বলবি নীচু স্বরে বল।'

তাঁর কথা বলার বিশেষ একটা ভঙ্গি ছিল। গানের সুরের মত কথাগুলো — ফুলের মত সুস্পষ্ট ও মনোরম। একবার শুনে সহজেই আমি মনে রাখতে পারি। তিনি যখন হাসেন তখন তাঁর চেরির মত কালো চোখের মণি বড়ো হয়ে যায় আর একটা বর্ণনাতীত দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাসলে দেখা যায় দৃঢ়সংবদ্ধ সাদা দাঁতের সারি। ময়লা রঙের গালদুটিতে অসংখ্য বলিরেখা ফুটে ওঠা সত্ত্বেও সারা মুখটায় তারুণ্য ও আলো ফুটে ওঠে যেন। মুখের একমাত্র খুঁৎ হচ্ছে সেই মাংসল নাকটি; এই বড় বড় দুটো নাসারন্ধ্র ও লাল নাসাগ্র। রুপোর গুটি লাগানো কালো একটি কৌটো থেকে তিনি নস্যি নেন। বহিরাবয়বে তিনি ফর্সা নন, কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে অন্তরের এক অনির্বাণ আলোর উষ্ণ ও উদ্দীপ্ত শিখায় তিনি উজ্জ্বল। শরীরটা এত নুয়ে পড়েছে যে তাঁকে প্রায় কুঁজো বলে মনে হয়। কিন্তু মস্ত একটা বেড়ালের মতো অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর চলাফেরায় এবং পুশি বেড়ালের মতোই তুলতুলে তিনি।

আমার মনে হয়েছিল, আমার জীবনে তাঁর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আমি এক অন্ধকার সুপ্তিতে অবলুপ্ত ছিলাম। কিন্তু তিনি এসে আমাকে জাগিয়ে দিলেন এবং আমার হাত ধরে নিয়ে এলেন এক আলোর রাজ্যে। আমার সমগ্র পরিবেশকে অখণ্ড ও একক একটি সূত্রে গ্রথিত করে এক বিচিত্রবর্ণ জরিতে রূপান্তরিত করলেন। প্রথম দিনটি থেকেই তিনি হলেন আমার সারা জীবনের বন্ধু, আমার সবচেয়ে নিকট ও আপনার জন। জীবনের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমাকেও সমৃদ্ধ করেছে এবং কঠোর ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি জুগিয়েছে আমার মধ্যে।

চল্লিশ বছর আগে স্টীমার চলত আস্তে আস্তে। নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ পৌঁছতে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগল। সৌন্দর্যস্নাত সেই প্রথম কয়েকটি দিনের কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে।

আবহাওয়াটা চমৎকার, আর সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমি দিদিমার সঙ্গে ডেকের উপরে থাকি। উজ্জ্বল আকাশের নিচ দিয়ে, শরৎকালের স্বর্ণময়

রেশমি কারুকার্য-খচিত ভল্‌গার দুই তীরের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলি আমরা। বাদামী রঙের স্টীমারটার সঙ্গে একটা বজ্‌রা বাঁধা; স্রোতের বিরুদ্ধে জল কেটে কেটে, নীলাভ ধূসর জলে চাকার ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ তুলে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে স্টীমারটা। ধূসর রঙের বজ্‌রাকে দেখায় জলের পোকার মতো। অলক্ষ্যে সূর্য ভল্‌গা নদীর ওপরে সাঁতার দিয়ে ভেসে যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রূপান্তর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুনের আবির্ভাব। সবুজ পাহাড়গুলো যেন মাটির বহুমূল্য পোশাকের ভাঁজ। দূরে দূরে শহর ও গ্রাম পার হয়ে যায়; তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় সেগুলো বুঝি মিষ্টি পাঁউরুটির টুকরো দিয়ে তৈরি। শরৎকালের গাছের সোনালী পাতা ভাসে জলের ওপরে।

'দেখ্‌, দেখ্‌, কী সুন্দর!' আমার দিদিমা বলে চলেন; আর উদ্ভাসিত মুখে, খুশিভরা বড়ো বড়ো চোখে ডেকের একদিক থেকে আরেক দিকে ঘুরে বেড়ান।

মাঝে মাঝে তীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার উপস্থিতি একেবারে ভুলে যান। তখন তাঁর অন্য চেহারা। দুই হাত বুকের ওপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখা, ঠোঁটদুটো হাসিতে সম্প্রসারিত, চোখভরা জল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি আর তখন আমি তাঁর গাঢ়রঙের ফুলকাটা স্কার্ট ধরে টান দিই।

'এ্যাঁ,' বলে তিনি চমকে সজাগ হয়ে ওঠেন, তারপর বলেন, 'ও তুই! কী মনে হচ্ছিল জানিস? আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি।'

'তুমি কাঁদছ কেন দিদিমা?'

'বাছা আমার, সোনা আমার, কেন কাঁদছি জানিস? ভালো লাগছে বলে কাঁদছি, শরীরে জোর নেই বলে কাঁদছি,' হাসতে হাসতে তিনি বলেন, 'বুড়ো হয়ে গেছি দাদু, তিন কুড়ি বয়স হয়ে গেছে...'.

তারপর তিনি একটিপ্‌ নস্যি নিয়ে আমাকে অদ্ভুত সব গল্প বলতে শুরু করেন; সাধুদের গল্প, জন্তুজানোয়ারের গল্প, দয়ালু ডাকাত আর অশুভ শক্তির গল্প!

আমার মুখের কাছে মুখ এনে রহস্যভরা শান্ত গলায় তিনি গল্প বলেন, তাকিয়ে থাকেন আমার চোখের দিকে। তাঁর চোখের মণিদুটো বড়ো হয়ে ওঠে — আর তাঁকে দেখে মনে হয়, তিনি আমার মধ্যে শক্তিপ্রবাহ সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন, যাতে আমি অবলম্বন পাই। তিনি যেন কথা বলেন না, গান গেয়ে ওঠেন। আর যতোই কথা বলেন ততোই তাঁর বলার ভঙ্গির

মধ্যে আরও বেশি ছন্দ আসে। তাঁর কথা শুনে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর তাই একটা গল্প শেষ হলেই আমি বলে উঠি:

'আরো বলো দিদিমা!'

'তাহলে শোন্ তারপর কী হল। উনুনের মধ্যে যে দানোটা থাকত সে তো বসে আছে উনুনের নিচে; থাবায় চিলতে বিঁধেছে। বসে বসে দুলছে আর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলছে—ছোট ইঁদুর, ছোট ইঁদুর! হায় হায়, আর তো আমি বাঁচব না, ছোট ইঁদুর!'

তিনি নিজেই নিজের পা-টা আঁকড়ে ধরে দুলতে শুরু করেন, তাঁর চোখমুখ কুঁচকে ওঠে — মনে হয়, না-বাঁচতে পারার কষ্টটা তাঁকেই ভোগ করতে হচ্ছে।

ভালোমানুষ গোঁফদাড়িওলা নাবিকরা চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গল্প শুনতে শুনতে হেসে ওঠে, বাহবা দেয়, একটা গল্প শেষ হলে আরেকটা শুনতে চায়।

'থেমো না ঠানদি, আরো বলো!'

আর তারপর বলে:

'ঠানদি, আমাদের সঙ্গে রাত্রের খাওয়া খেতে চলো!'

রাত্রিবেলা খাবার সময় তারা দিদিমাকে ভদ্‌কা খেতে দেয় আর আমাকে দেয় ফুটি আর তরমুজ। ব্যাপারটা চুপি চুপি সারতে হয়, কারণ স্টীমারের ওপরে ফল খাওয়া নিষিদ্ধ। কেউ যাতে ফল না খায় সে-বিষয়ে খবরদারি করবার জন্যে একজন লোক আছে। যদি সে কাউকে ফলসমেত হাতে-হাতে ধরতে পারে তাহলে ফল ছিনিয়ে নিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। লোকটির সাজপোশাক পুলিসের মতো, জামায় পিতলের বোতাম, সব সময়ে মাতাল অবস্থায় থাকে। তার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকে সবাই।

আমার মা ক্বচিৎ কখনো ডেক্'এ আসত। পারতপক্ষে মা আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। মা সব সময় গম্ভীর. তার চেহারা আজো আমার মনে আছে — দীর্ঘ সুন্দর গড়ন, থমথমে গম্ভীর মুখ, আর মাথায় সোনালী চুলের গুচ্ছ। মনে হত তার সমস্ত শক্তি ও কাঠিন্য যেন কুয়াশা বা স্বচ্ছ মেঘের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই। এত বছর পরেও দেখতে পাচ্ছি তার ধূসর চোখের সেই অনাত্মীয় চাউনি। ঠিক আমার দিদিমার মতোই বড়ো বড়ো চোখ আমার মা'র।

একদিন মা কঠোর স্বরে দিদিমাকে বলে, 'মা, তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে লোকে হাসাহাসি করে।'

অত্যন্ত সহজ ভাবে কথাটা নিয়ে দিদিমা জবাব দেন, 'লোকের যদি ইচ্ছে হয় তো হাসুক না বাপু। ভালো কথাই তো, যতো হাসতে পারবে ততোই ভালো।'

আমার মনে আছে, নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ চোখের সামনে ভেসে উঠতেই ছেলেমানুষের মতো দিদিমার সে কী আনন্দ!

'দেখ্‌, দেখ্‌, কী চমৎকার!' বলে তিনি আমার হাতটা আঁকড়ে ধরে রেলিং'এর দিকে আমায় ঠেলে দিলেন, 'দেখেছিস তো, এই হচ্ছে নিজ্‌নি! কি সুন্দর! ভগবানের শহর আমার! গির্জার চুড়োগুলোকে দেখ্‌—ঠিক যেন উড়ছে!'

তারপর তিনি আমার মা'র দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রায় কে'দে ফেলে বললেন, 'ভারিয়া! তুই তো এতদিনে বোধ হয় সব ভুলেই গেছিস। দু চোখ ভরে দেখে নে!'

মা বিষণ্ণ ভাবে হাসল।

সেই সুন্দর শহরের সামনে এসে স্টীমারের গতি বন্ধ হল, নদীর মাঝখানে থামল স্টীমারটা। চারদিকে নৌকো আর জাহাজের ভিড়, আকাশ ছেয়ে শ'য়ে শ'য়ে মাস্তুল উঠেছে। লোকবোঝাই মস্ত একটা নৌকো এসে আমাদের স্টীমারের নামিয়ে দেওয়া সি'ড়ির পাটাতনের গায়ে লাগল। তারপর সেই সি'ড়ি দিয়ে একে একে লোক উঠে এল স্টীমারের ডেক্‌'এ। সেই দলের সবচেয়ে আগে এলেন লম্বা কালো জামা গায়ে রোগামত একজন বৃদ্ধ। তাঁর চোখদুটো সবুজ, ব'ড়শির মত নাক, সোনার মতো টকটকে দাড়ি।

'বাবা!' বলে চে'চিয়ে ডেকে উঠেই আমার মা বৃদ্ধের দু-হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছোট ছোট লাল দুটি হাতের মধ্যে মা'র মাথাটা তুলে ধরে গালের উপরে মৃদু চাপড় দিতে দিতে চাপা উত্তেজিত স্বরে বৃদ্ধ বললেন, 'ফিরে এলি পাগলী! আহা-রে!'

চাকার মতো ঘুরপাক খেতে খেতে দিদিমা সবাইকে জড়িয়ে ধরছেন আর চুমু খাচ্ছেন।

'আয়, আয়, এগিয়ে আয়,' বলে আমাকে সেই ভিড়ের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে তোর মামা মিখাইল, এই হচ্ছে ইয়াকভ, আর এই হচ্ছে

তোর মামী নাতালিয়া। আর এই যে বাচ্চাদের দেখছিস, এরা সব তোর মামাতো ভাইবোন—এই দুজনেরই নাম সাশা, আর এর নাম কাতেরিনা। দেখছিস তো কতো লোক— সবাই আমাদের জাত!'

আমার দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেমন আছ গিন্নী?'

তারপর তাঁরা পরস্পরকে তিনবার চুমু খেলেন।

আমি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমাকে এক হ্যাঁচ্‌কা টানে টেনে নিয়ে মাথার ওপর একটা হাত রেখে দাদামশাই বললেন, 'তারপর তুই কে, তোর নাম কী?'

'আমি এসেছি আস্ত্রাখান থেকে, কেবিনে থাকি...'

'কী বলে ও?' মা'র দিকে ফিরে তাকিয়ে দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই আমাকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'ঠিক বাপের মতো গালের হাড়গুলো হয়েছে।' মন্তব্য করলেন চলতে চলতে।

'নৌকোয় নামো,' বললেন তিনি।

তীরে পেঁছে একটা পাথর-বাঁধানো পথ ধরে আমরা ওপরে উঠে এলাম। দু-দিকে উঁচু বাঁধ, মাঝে পায়ে-দলা হল্‌দে ঘাসে ঢাকা পথ।

সবচেয়ে আগে চলেছেন আমার দাদামশাই আর আমার মা। লম্বায় দাদামশাই আমার মা'র কাঁধের কাছাকাছি, ছোট পদক্ষেপে খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে তিনি চলছেন। দাদামশাইয়ের দিকে উঁচু থেকে মা তাকাচ্ছে আর মনে হচ্ছে যেন উড়ে চলেছে। তাদের দুজনের পিছনে চলেছে আমার দুজন মামা—একজন হচ্ছে মিখাইল, খাড়া খাড়া কালো চুল আর দাদামশাইয়ের মতোই রোগা শরীর, অপরজন ইয়াকভ, কোঁকড়ানো সোনালী চুল। তারপরেই রঙচঙে পোশাক পরিহিতা কয়েকজন মোটা স্ত্রীলোক, সঙ্গে গুটি ছয়েক ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েরা সকলেই আমার চেয়ে বড়ো আর সকলেই ভারি চুপ্‌চাপ। আমি চলেছি আমার দিদিমা আর ছোট নাতালিয়া-মামীর সঙ্গে। নাতালিয়া ফ্যাকাশে চেহারা, নীল চোখ আর মস্ত পেট। খানিকক্ষণ পর পরেই নাতালিয়া-মামীর হাঁপ ধরে যায়, দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে ফিসফিস করে বলে, 'উঃ, আর চলতে পারছি না।'

রেগে উঠে আমার দিদিমা বিড়বিড় করে বলেন, 'তোমাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছে তারা? কী বোকা গুষ্টি!'

এদের কাউকেই আমার ভালো লাগছে না; না বয়স্কদের, না বাচ্চাদের। নিজেকে একেবারে বাইরের লোক বলে মনে হচ্ছে। এমন কি আমার

দিদিমাও যেন এখানে এসে ম্লান হয়ে গেছেন এবং দূরে সরে গেছেন।

বিশেষ করে দাদামশাইকে আমার একেবারেই পছন্দ নয়। প্রথম থেকেই মনে মনে বুঝতে পারছি, তিনি আমার শত্রু হবেন। তিনি আমার মধ্যে একটা সন্দিগ্ধ ভাব জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর প্রতি আমি বিশেষ নজর রাখছি।

উঁচু পথটার শেষ মাথায় এসে পেঁছিলাম আমরা। একেবারে এই শেষ মাথায় ডানদিকের বাঁধের গা ঘেঁষে একটা নিচু একতলা বাড়ি। এখান থেকেই শহরের রাস্তা শুরু। বাড়িটার কেমন ময়লা ময়লা গোলাপী রং, জানলাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর বাড়ির ছাদটা নিচু হয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জানলাগুলোর ওপরে। বাইরে থেকে দেখে বাড়িটাকে বেশ বড়োই মনে হয়েছিল আমার, কিন্তু ভিতরে ঘরগুলো ছোট ছোট ও অন্ধকার। আর সর্বত্র লোক গিজগিজ করছে; বিরক্তিকর একদল লোক অনবরত ব্যস্ত হয়ে চলেছে এঘরে-ওঘরে। স্টীমারে যাত্রীরা ওঠা-নামা করার সময়ে যেমন অবস্থা হয়, অনেকটা তাই। ফিকিরসন্ধানী চড়ুইপাখির মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বাচ্চাগুলো। আর বাড়ির সর্বত্র কেমন একটা ঝাঁঝালো অপরিচিত গন্ধ।

তারপর বাইরে উঠোনে এসে দেখলাম, সেখানকার অবস্থাও কোনো দিক দিয়েই উন্নত নয়। ঘন রং গোলা জলভর্তি বড় বড় গামলা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তাতে কাপড় আর মস্ত মস্ত কাপড় টাঙানো হয়েছে শুকোবার জন্যে। এক কোণের একটা নিচু চালাঘর থেকে দেখা যাচ্ছে আগুনের আভা; কাঠের উনুন জ্বলছে, চিড়বিড় শব্দে সিদ্ধ হচ্ছে কি যেন। আর শোনা যাচ্ছে একজন অদৃশ্য মানুষের উচ্চকণ্ঠ চিৎকারে কতগুলো অদ্ভুত শব্দ:

'চন্দন - ম্যাজেণ্টা — সালফিউরিক এসিড...'

দুই

তারপর থেকেই এক দ্রুত, ঘটনাবহুল ও অবর্ণনীয় রকমের আশ্চর্য জীবনের শুরু। এক বিষাদগম্ভীর গল্পের মতো এই জীবনের কথা আমার মনে পড়ে; একজন দয়াবান প্রতিভাধর ব্যক্তি, যিনি এত বেশি বাস্তবানুগ যে এতটুকু বিচ্যুতিও সহ্য করেন না — তাঁর মুখেই যেন শোনা এই গল্প।

আজ যখন অতীতের কথা ভাবি তখন মাঝে মাঝে বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে যে সত্যিই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল কারণ দিদিমা যাদের বলেছেন 'বোকা গুষ্টি' তাদের জীবনটা ছিল খুবই অন্ধকার আর ভয়ংকর হিংস্র। আজো ইচ্ছে হয়, ঘটনাগুলোকে মুছে ফেলে দিই, জোর করে ভাবি যে ঘটনাগুলো সত্যি নয়।

কিন্তু ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বা না-লাগার ওপরে সত্যি নির্ভর করে না; আর তাছাড়া এই কাহিনী আমার নিজের সম্পর্কে নয়। সে-সময়ে রাশিয়ার সাধারণ মানুষেরা যে শ্বাসরোধী ও আতঙ্কজনক পরিবেশে বাস করত এবং এখনো করে — তারই চিত্র এই কাহিনী।

আমার দাদামশাইয়ের বাড়িটা ছিল পরস্পর বিদ্বেষের বাষ্পে ঠাসা। কেউ কাউকে পছন্দ করত না। বয়স্কদের হাড়েমজ্জায় এই বিদ্বেষের বিষ ঢুকেছিল, এমন কি ছোটরাও এর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচতে পারেনি। পরে দিদিমার মুখে গল্প শুনে আমি জেনেছি — আমার মা এমন এক সময়ে এই বাড়িতে হাজির হয়েছিল যখন মামারা উভয়ই দাবি তুলেছে, দাদামশাই তাঁর বিষয়সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিক। আমার মা'র ফিরে আসাটা অপ্রত্যাশিত এবং এই ব্যাপারে এই দাবিটা আরো জোরালো হয়ে ওঠে। মামাদের ভয় হল যে মা হয়তো এবার তার বিয়ের যৌতুক দাবি করে বসবে। মা বিয়ে করেছিল 'নিজের পছন্দমত', মা'র বিয়েতে দাদামশাইয়ের মত ছিল না — তাই তিনি কোনো যৌতুক দেননি। মামারা মনে করেছিল যে এই যৌতুকও তাদের মধ্যেই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। অনেকদিন ধরেই মামাদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছে, কে বা শহরে থেকে কারখানা খুলবে, কে বা যাবে ওকা নদীর অপর তীরে কুনাভিনো বসতিতে।

আমরা আসার কিছুদিনের মধ্যেই একদিন রান্নাঘরে খেতে বসে শুরু হয়ে যায় ঝগড়া। মামারা দুজনেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর টেবিলের ওপরে ঝুঁকে কুকুরের মত তেড়েফুঁড়ে আর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে দাদামশাইয়ের মুখের ওপরেই যা-তা চীৎকার করতে লাগল। রাগে লাল হয়ে ওঠেন দাদামশাই, তারপর টেবিলের ওপর চামচ ঠুকে মোরগের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন:

'রাস্তায় রাস্তায় তোদের ভিক্ষে করাব!'

যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে দিদিমা বলেন, 'কর্তা, দিয়ে দাও ওদের সব। যা আছে দিয়ে দাও। কী দরকার এত অশান্তির!'

'থামো গো, সায়-দিউনী!' আগুন-ঝরা চোখে দাদামশাই হুংকার দিয়ে ওঠেন। এই ছোট মানুষটিও এমন কান-ফাটানো চিৎকার করতে পারেন — অবাক কাণ্ডই বলতে হবে!

আমার মা উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীর পায়ে জানলার কাছে গিয়ে ঘরের মানুষগুলোর দিকে পিঠ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ মিখাইল-মামা তার ভাইয়ের মুখে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারে। ঘুষি খেয়ে ভাইটি গাঁ গাঁ করে জাপটি ধরে মিখাইল-মামাকে। তারপরেই শুরু হয় মেঝের ওপরে গড়াগড়ি, গালাগালি, ঘোঁৎ ঘোঁৎ চিৎকার আর হাঁপানি।

বাচ্চারা কান্না জুড়ে দিয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা নাতালিয়া-মামী জুড়েছে বিলাপ, মা তাকে দু-হাতে ধরে বাইরে কোথায় নিয়ে যায়। বসন্তের দাগওলা হাসিখুশি ইয়েভগেনিয়া-ধাই ছেলেমেয়েদের তাড়া দিয়ে বার করে দেয় রান্নাঘর থেকে, চেয়ারগুলি পড়ে যায়। তরুণ বিশালস্কন্ধ শিক্ষানবীশ ৎসিগানক মিখাইল-মামার পিঠে বসে তাকে চেপে ধরে আর গ্রিগরি ইভানোভিচ ধীরেসুস্থে একটা তোয়ালে দিয়ে মামাকে পিঠমোড়া করে বাঁধে। গ্রিগরি ইভানোভিচের মাথায় টাক, মুখে দাড়ি, চোখে কালো চশমা। সে হচ্ছে একজন ওস্তাদ কারিগর।

আমার মামা পাতলা পাতলা কালো দাড়িসমেত চিবুকটা মেঝের উপর ঘষতে ঘষতে গলা ফাটিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার জুড়ে দেয়।

'কী লোক সব! এরা নাকি আবার এক মায়ের পেটের ভাই। ছিঃ, কী সব লোক!' টেবিলের চারপাশে ঘুরপাক খেতে খেতে আমার দাদামশাই করুণ স্বরে চিৎকার করতে থাকেন।

কথা কাটাকাটি শুরু হতেই আমি ভয়ে চুল্লির ওপরে গিয়ে উঠেছিলাম। সেখান থেকে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে দেখি, আমার দিদিমা ইয়াকভ-মামার মার-খাওয়া মুখ থেকে রক্ত ধুয়ে দিচ্ছেন। ইয়াকভ-মামা কাঁদছে আর দাপাচ্ছে আর দিদিমা ভারী গলায় বলছেন:

'তোদের বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে রে জংলী গুষ্টি!'

আর গায়ের ছেঁড়া জামাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে দাদামশাই দিদিমার দিকে তেড়ে আসছেন আর চিৎকার করছেন:

'ডাইনী বুড়ী, দ্যাখ্, তুই কী অসভ্য জংলীদের পেটে ধরেছিলি!'

ইয়াকভ-মামা বেরিয়ে যাবার পর দিদিমা জড়োসড়ো হয়ে এক কোণে গিয়ে বসে ভীষণ আর্তনাদ করতে থাকেন:

'হে পুণ্যময়ী জগৎমাতা! আমার এই ছেলেগুলোকে একটু সুবুদ্ধি দিও!'

টেবিলের উপরে জিনিসপত্রগুলো ছত্রাকার হয়ে উল্টে-পাল্টে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে দাদামশাই বলেন, 'গিন্নী, তোমার এই ছেলেগুলোর দিকে নজর রেখো। বিশ্বাস নেই, হয়তো ভারভারাকে খুন করেই ফেলবে...'

'ভগবান জানেন তুমি কী বলছো! আচ্ছা, এবার তোমার গায়ের শার্টটা খুলে দাও তো, সেলাই করে দিই।'

দাদামশাইয়ের মুখটা দু-হাতে ধরে দিদিমা তার কপালে চুমু খান। দিদিমার তুলনায় দাদামশাই মানুষটি ছোটখাটো — দিদিমার কাঁধের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকেন তিনি।

'গিন্নী, মনে হচ্ছে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়াই ভালো।'

'তাই ভালো, কর্তা।'

বহুক্ষণ তাঁরা কথা বলেন। প্রথম দিকে কারও কথাবার্তার মধ্যে উষ্মা ছিল না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দাদামশাই ফুঁসে ওঠেন। লড়াই শুরু করার আগে মোরগ যেমন মাটি আঁচড়ায় তেমনিভাবে মেঝেয় পা ঘষে তিনি দিদিমার দিকে আঙুল তুলে শাসাতে শাসাতে বলতে থাকেন, 'তোমাকে ভালো করেই চিনি। ওদের চিন্তাতে তুমি পাগল — আমাদের কথা ভাববে কেন?' তীক্ষ্ণ চাপা গলায় দাদামশাই চিৎকার করতে থাকেন, 'ওই যে তোমার মিখাইল — ওটার মুখে এক, মনে এক! ইয়াকভটা হচ্ছে একটা আসল শয়তান! ওদের হাতে পড়লে দুদিনে ফুটফাট করে উড়িয়ে দেবে সব!'

হঠাৎ আমি একটা কান্ড করে বসি। অসাবধানে নড়তে গিয়ে আমার কাঁধের ধাক্কায় একটা ইস্ত্রি পড়ে যায়। প্রচন্ড শব্দে চুল্লির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে ইস্ত্রিটা। কাপ-ডিশের তলানি ফেলবার জন্যে একটা বড় গামলা ছিল — ইস্ত্রিটা গিয়ে পড়ে তার মধ্যে। চমকে লাফিয়ে উঠে আমার দাদামশাই এক হ্যাঁচ্কা টানে আমাকে টেনে নিয়ে আসেন, তারপর মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যেন এই তিনি প্রথম আমাকে দেখছেন।

'তোকে ওই চুল্লির ওপরে কে উঠিয়ে দিয়ে গেল? তোর মা?'

'আমি নিজেই উঠেছি।'

'মিথ্যে কথা বলছিস।'

'না, মিথ্যে কথা বলছি না। ভয় পেয়ে আমি নিজেই চুল্লির ওপরে উঠেছি।'

আমাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে কপালে ধাঁই করে একটা চাটি মেরে বলেন:

'ঠিক বাপের স্বভাব পেয়েছে! বেরিয়ে যা এখান থেকে!'

আমিও তাই চাই। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পেরে খুশিই হই আমি।

বেশ বুঝতে পারতাম দাদামশাইয়ের ধারালো সবুজ চোখের দৃষ্টি সব সময়ে আমাকে অনুসরণ করছে, তাই আমি তাঁকে ভয় করে চলতাম। মনে আছে, সেই কুৎকুতে চোখের দৃষ্টিকে সব সময়ে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতাম আমি। আমার মনে হত, তিনি নীচ প্রকৃতির লোক; লোকের আঁতে ঘা দিয়ে এবং লোকে যা পছন্দ করে না সেইভাবে সবার সঙ্গে কথা বলেন তিনি, লোককে রাগিয়ে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আনন্দ পান।

'হুঃ, তোমরাই-ই!' কথাটা তিনি প্রায়ই বলতেন এবং বলতে ভালোবাসতেন। 'ই' বলবার সময় অনেকক্ষণ ধরে টেনে টেনে উচ্চারণ করা 'ই' শব্দটুকু শুনে আমার শরীরটা শির-শির করে উঠত আর ভারি একা মনে হত নিজেকে।

সন্ধ্যার চা খাবার সময়টা ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারখানা খালি করে বেরিয়ে আসতেন আমার দাদামশাই, আমার মামারা আর কারিগররা। ক্লান্ত পায়ে সবাই এসে ঢুকত রান্নাঘরে। এ্যাসিড-ঝল্সানো চন্দনের রঙমাখা হাত আর ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা উল্টানো চুল — অন্যরকম হয়ে যেত চেহারাগুলো। রান্নাঘরের কোণে রাখা সাধুসন্তদের কালো কালো আইকনের মতো মনে হত মানুষগুলোকে। আর ঠিক সেই বিপজ্জনক মুহূর্তে আমার দাদামশাই আমার সামনাসামনি বসে কথা বলতেন। আমার সঙ্গে যতো বেশি কথা বলতেন, অন্য নাতিনাতনিদের সঙ্গে তা বলতেন না; আর আমার ওপর ঈর্ষা হত তাদের। আমার দাদামশাইয়ের চেহারার মধ্যে বেশ একটা পারিপাট্য ছিল, পাথর কুঁদে গড়া অত্যন্ত মসৃণ মূর্তির মতো।

তিনি যে রেশমকাটা সাটিন ফতুয়া গায়ে দিতেন তা ছিল পুরনো ও জীর্ণ, সুতির কামিজ কুঁচ্‌কনো, হাঁটুর কাছে তালিমারা প্যাণ্ট; ওদিকে তাঁর ছেলেরা কোট গায়ে দিত, গলায় রেশমি রুমাল — তবুও মনে হত ছেলেদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং তাঁর সাজপোশাকটাও অনেক ভালো।

আমরা পেঁছবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিলেন: কি-ভাবে উপাসনা করতে হয় তা শেখা। বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড়ো এবং তারা ইতিমধ্যেই লিখতে পড়তে শিখেছে। আমাদের বাড়ির জানলা দিয়ে তাকালে একটা সোনালী চূড়ো দেখা যায়। গির্জাটার নাম উস্পেনস্কি ক্যাথেড্রাল। এই ক্যাথেড্রালের পুরুত এ-বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

আমাকে শিখিয়েছিল আমার মামী নাতালিয়া। শান্ত ভীরু স্বভাব, মুখখানা ঠিক ছেলেমানুষের মতো, আর তার চোখদুটো এত স্বচ্ছ যে সেই চোখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে একেবারে তার মাথার পিছনদিকটা পর্যন্ত দেখে নেওয়া যায় যেন।

চুপ করে বসে নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগত আমার। মামীমা অস্বস্তি বোধ করত, চোখ কুঁচকিয়ে মাথা বেঁকিয়ে কথা বলত চাপা ফিস্‌ফিসানির মতো স্বরে।

'লক্ষ্মীটি, আমি যা বলছি বলো — "আমাদের পিতা যিনি হন..."'

'"যিনি হন" মানে কী?'

'চুপ, প্রশ্ন কোরো না।' চকিতে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মামীমা জবাব দিত, 'প্রশ্ন করলে কথাগুলো আরো গুলিয়ে ফেলবে। আমি যেমনটি বলছি, তেমনটি বলে যাও — "আমাদের পিতা..." কই, চুপ করে আছ যে?'

প্রশ্ন করলে কথাগুলো আরো গুলিয়ে ফেলব কেন, আমি তা কিছুতেই বুঝতে পারি না। আমার মনে হয়, 'যিনি হন' কথাগুলোর অন্য কিছু একটা গুপ্ত অর্থ আছে। আমি ইচ্ছা করে সঠিক কথাগুলো না বলে উল্‌টো-পাল্‌টা বলতে শুরু করি:

'"যিনি জন", "বিনি ধন"...'

মামীমার সাদা ধবধবে মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হত, যেন মামীমা আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। ধৈর্য না হারিয়ে আমার ভুল ধরিয়ে দিতে চেণ্টা করত।

'না, তা নয়, আমি কী বলছি শোন — "যিনি হন..."'

কিন্তু আমার কাছে মামীমা এবং মামীমার মুখের কথা দুটোকেই জটিল বলে মনে হত। আমি রেগে উঠতাম আর তাই উপাসনাব কথাগুলো আমার পক্ষে মনে রাখা আরো শক্ত হত।

একদিন দাদামশাই আমার সারা দিনের কাজের হিসেব নিতে বসলেন:

'এই যে লেক্সেই, আজ সারাটি দিন কী করেছ শুনি? শুধু খেলা হয়েছে — না? হুঃ, কপালটা যে-রকম ফুলে উঠেছে তা থেকেই বুঝতে পারছি। ওহে বাপু, খেলতে গিয়ে কপাল ফুলিয়ে আসাটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, সবাই পারে — কিন্তু লেখাপড়ার কদ্দুর? "আমাদের পিতা" উপাসনাটা শিখেছ?'

মামীমা ফিসফিস করে বলল, 'ওর মুখস্থ হতে একটু সময় লাগে।'

মুচকে হেসে আমার দাদামশাই লাল লাল ভুরুদুটো তুলে বললেন:

'তাই যদি হয় তো ওকে একটু উত্তম-মধ্যম দিতে হয়।'

'কিরে, তোর বাবার হাতে মাঝে মাঝে প্রহারেণ হত?' আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

দাদামশাই কী বলছেন বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে রইলাম।

আমার মা জবাব দিল, 'না, মাক্সিম কক্ষণো ছেলের গায়ে হাত তুলত না। আমাকেও বারণ করত।'

'কেন?'

'মাক্সিম বলত, মারধোর করে কাউকে কোনো কিছু শেখানো যায় না।'

ফুঁসে উঠে দাদামশাই স্পষ্টভাবে বললেন, 'মাক্সিমের আত্মা যেন শান্তি পায়। কিন্তু তবুও বলি, লোকটার কোনো বিষয়েই বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে ছিল না।'

দাদামশাইয়ের কথাগুলোতে আমি যে দুঃখিত হলাম, তা তিনি বুঝতে পারলেন।

'থাক্, আর ঠোঁট বাঁকাতে হবে না। বরং বুঝেশুনে চলতে চেষ্টা কোরো! দেখ না, আঙুঠির জন্যে সাশকাকে এই শনিবার কেমন ধোলাই হয়।' কথাগুলো বলে তিনি নিজের মাথার লাল ও রুপোলি চুলগুলোকে হাত দিয়ে মসৃণ করতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ধোলাই মানে কী?'

সবাই হেসে উঠল। আমার দাদামশাই জবাব দিলেন, 'সবুর করো, নিজেই দেখতে পাবে এর মানে কী।'

ঘরের এক কোণে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আমি ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। ধোলাই দিতে হলে কাপড়চোপড়কে আলাদা আলাদা বাছাই করে ভাঁটিতে দিতে হয়। কিন্তু উত্তম-মধ্যম দেওয়া আর প্রহার দেওয়া বোধ হয় একই ব্যাপার। আচ্ছা, লোকে তো প্রহার দেয় কুকুর ঘোড়া আর বেড়ালকে। আস্ত্রাখানে পুলিস পারসিকদের ধরে প্রহার দেয়—এটা আমার নিজের চোখে দেখা। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের প্রহার দিতে আমি কাউকে দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, মামাদের অবশ্য মাঝে মাঝে দেখেছি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কপালে বা মাথার পিছনদিকে দু-একটা চাঁটি মারতে — কিন্তু যারা চাঁটি খায় তারা এতে বিশেষ কিছু মনে করে না। শুধু ব্যথার জায়গায় দু-একবার হাত বুলিয়েই ভুলে যায় ব্যাপারটা। মাঝে মাঝে আমি ওদের জিজ্ঞেস করি, ওরা ব্যথা পেয়েছে কিনা।

বুক ফুলিয়ে ওরা জবাব দেয়, 'উঁহু, কিচ্ছু ব্যথা লাগেনি।'

আঙুঠির বিখ্যাত ঘটনাটি আমি জানতাম। চা-পানের পর রাত্রের খাওয়া পর্যন্ত সময়টুকুতে আমার মামারা ও কারিগর সেলাই নিয়ে বসে। রঙ ছোপানো কাপড়ের টুকরোগুলো পর-পর জোড়া দিয়ে কার্ডবোর্ডের চাক্‌তি লাগিয়ে রাখে। সেদিন আধা-অন্ধ গ্রিগরিকে নিয়ে খানিকটা তামাসা করবার জন্যে মিখাইল-মামা একটা কান্ড করেছিল। ন-বছরের ভাইপোকে বলে, গ্রিগরির আঙুঠিটা মোমবাতির ওপরে ধরে গরম করতে। সেই কথা শুনে সাশা একজোড়া চিমটে দিয়ে আঙুঠিটাকে মোমবাতির শিখার ওপরে ধরে থাকে। তারপর যখন আঙুঠিটা তেতে লাল হয়ে ওঠে তখন সেটাকে গ্রিগরির পাশে রেখে দিয়ে লুকিয়ে থাকে চুল্লির পিছনে। ঠিক সেই সময়ে আমার দাদামশাই সেখানে আসেন এবং কাজ করবার জন্যে বসে গরম আঙুঠিটা তুলে নেন।

আমার মনে আছে, কিসের এত গন্ডগোল জানবার জন্যে আমি ছুটে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম। দেখলাম, আমার দাদামশাই হাস্যকরভাবে দাপাদাপি করছেন আর পোড়া আঙুলগুলো দিয়ে কান চেপে ধরে চিৎকার করছেন:

'কোন বেল্লিকের কান্ড এটা?'

মিখাইল-মামা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আঙুঠিটা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে আর ফুঁ দিচ্ছে; গ্রিগরির কোন দিকে খেয়াল নেই, আপন মনে সেলাই করে চলেছে — লম্বা লম্বা ছায়া এসে পড়েছে তার মাথার মস্ত টাকের ওপরে। ইয়াকভ-মামা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এল, তারপর হাসি চাপবার জন্যে লুকিয়ে

রইল চুল্লির পিছনে। আমার দিদিমা পুলটিস দেবার জন্যে কাঁচা আলু বাটতে শুরু করলেন।

'ইয়াকভের ছেলে সাশকার কান্ড এটা,' হঠাৎ বলে উঠল মিখাইল-মামা।

'মিথ্যে কথা,' উনুনের পিছনে থেকে লাফিয়ে এসে বলল ইয়াকভ।

ওদিকে ঘরের এক কোণ থেকে ইয়াকভের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে তার-স্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে:

'না বাবা, মিথ্যে বলছে! জেঠা নিজেই তো আমাকে আঙুঠিটা গরম করতে বলল!'

তারপর শুরু হয়ে গেল মামাদের মধ্যে ঝগড়া। আর সেই ঝগড়া শুনে আমার দাদামশাই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। আর একটি কথাও বললেন না, আঙ্গুলে পুলটিস লাগিয়ে বেরিয়ে এলেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

সকলে মিখাইল-মামাকেই দোষ দিতে লাগল। সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনে প্রশ্ন জাগল, মিখাইল-মামাকে এবার ধোলাই এবং প্রহার দেওয়া হবে কিনা। চা-পানের সময়ে প্রশ্নটা আমি জিজ্ঞেস করে বসলাম।

'তাই দেওয়াই তো উচিত।' আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন আমার দাদামশাই।

'শোনো ভারভারা, তোমার ওই কুকুরছানার মতো ছেলেকে যদি না সামলাও তাহলে ওর মুন্ডুটা আমি ছিঁড়ে ফেলব।'

আমার মা জবাব দিল, 'ওর গায়ে একবার হাত তুলেই দেখ না!'

সকলে চুপ করে রইল।

আমার মা'র এই একটা ক্ষমতা আছে। ছোট দু-একটা কথাকে এমন প্রচন্ড শক্তিতে ছুঁড়ে মারতে পারে যে অন্যরা পিছু হটে যায়।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, সবাই মা'কে ভয় করে চলে। এমন কি মা'র সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার দাদামশাইয়েরও গলার সুর বদলে যায়। অন্যদের সঙ্গে যে-ভাবে তিনি কথা বলেন, তার চেয়েও অনেক শান্তভাবে বলেন মা'র সঙ্গে। এতে আমি খুশি হতাম।

'আমার মা'র মতো ক্ষমতা আর কারও নেই।' মামাতো ভাইদের কাছে জাঁক করে বলতাম আমি।

আমার মামাতো ভাইরাও কথাটা অস্বীকার করত না।

কিন্তু তার পরের শনিবারের ঘটনায় আমার মা'র সম্পর্কে আমার সমস্ত ধারণা টলে উঠল।

শনিবারের আগেই আমিও একটা কাণ্ড করে বসলাম এবং নিজেই পড়ে গেলাম গণ্ডগোলের মধ্যে।

বড়রা যে-ভাবে কাপড়ের রং বদলায় তা দেখে আমি খুবই অবাক হতাম। হয়তো একটা হলদে কাপড়ের টুকরো নিয়ে কালো জলে ডোবায় আর সঙ্গে সঙ্গে কাপড়টা হয়ে ওঠে গাঢ় নীল — এই হচ্ছে 'বনজ নীল'। কিংবা হয়তো একটা ছাইরঙা কাপড় নিয়ে লাল্চে জলে ছুপিয়ে নেয় আর কাপড়টা হয়ে ওঠে টক্‌টকে লাল — এই হচ্ছে 'তুঁতে লাল'। কাজগুলো খুবই সহজ কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয় কিছুই বোঝা যায় না।

মনে মনে আমার খুবই ইচ্ছে ছিল, কাপড় রং করাটা একবার নিজে পরখ করে দেখি। ইয়াকভের ছেলে সাশার কাছে আমি মনের এই ইচ্ছা প্রকাশ করে বললাম। ছেলেটি বিনয়ী, গম্ভীর প্রকৃতির আর সব সময়ে বড়দের পিছনে ঘুর-ঘুর করে এবং বড়দের সব কাজে সাহায্য করতে চায়। ওর এই বুদ্ধি ও বাধ্য স্বভাবের জন্যে এক দাদামশাই বাদে আর সবাই প্রশাংসা করে ওকে।

'দূর দূর, একেবারে তোষামুদে!' ছেলেটির দিকে অপছন্দের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাদামশাই বলেন।

ইয়াকভের ছেলে সাশার গায়ের রং কালো, হাড়-জিরজিরে শরীর, চোখদুটো কাঁকড়ার মত ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চাপা স্বরে তড়বড়িয়ে কথা বলে, অর্ধেক কথা মুখ দিয়ে বেরোয় আর অর্ধেক বেরোয় না, আর কথা বলতে বলতে এমনভাবে চোরের মত এদিক-ওদিক তাকায় যেন ছুটে পালিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দেবার মতলব আঁটছে। এমনিতে তার কটা চোখদুটো অনড় কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠলে মনে হয়, তার চোখের মণিদুটো পর্যন্ত কাঁপছে।

ওকে আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে মিখাইলের ছেলে সাশাকে অনেক বেশি ভালো লাগে — যদিও এই সাশার মধ্যে লক্ষণীয় কিছু নেই এবং একটু যেন হাবাগোবা ধরনের। সাশার স্বভাব শান্তশিষ্ট, মায়ের মতই দুটি বিষণ্ণ চোখ ও ভুবনজয়ী হাসি। ওর দাঁতগুলি ভারি বিশ্রী; মুখ থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর দুই সারি দাঁত গজিয়েছে উপরের মাড়িতে। এই দাঁতের পিছনেই সর্বক্ষণ লেগে থাকে ও, মুখের মধ্যে আঙুল পুরে অনবরত শুধু চেষ্টা করে পিছনের দাঁতগুলোকে টেনেটুনে আল্‌গা করে তুলে ফেলা যায় কিনা। কেউ যদি আঙুল দিয়ে ওর দাঁতগুলোকে পরখ

করতে চায়, তাহলেও ওর কোনো উচ্চবাচ্য নেই. বাধ্য ছেলের মত হাঁ করে। শুধু এইটুকু ছাড়া ওর মধ্যে আর কোনো বিশেষত্ব আমি খুঁজে পাইনি। বাড়ির মধ্যে মানুষ গিজ্‌গিজ করছে কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যেও ও যেন একা, ওকে দেখতে পাওয়া যায় কোনো একটা অন্ধকার কোণে হয়তো আপন মনে বসে আছে কিংবা জানলার ধারে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে সারাটা সন্ধ্যা। ওর পাশে বসলে বক্‌বক্‌ করতে হয় না, খুশিমত চুপচাপ থাকা যায়। জানলার ধারে ওর পাশটি ঘেঁষে বসে একটি কথাও না বলে পুরো এক ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া চলে। শুধু চেয়ে থাকা যায় — উস্পেনস্কি ক্যাথেড্রালের চারপাশে দাঁড়কাকগুলো চক্রাকারে উড়ছে আর সূর্যাস্তের লাল আভার পটভূমিতে ক্যাথেড্রালের সোনালী চূড়াগুলো উৎকীর্ণ লিপির মত অপরূপ হয়ে উঠেছে। পাখিগুলো অনেক উপরে উঠে যায়, আবার নিচে নেমে আসে, তারপর সহসা একসময়ে ম্লানায়মান আকাশে কালো একটি জাল বিস্তার করে অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে; পিছনে পড়ে থাকে এক সীমাহীন শূন্যতা। এই ধরনের দৃশ্যের দিকে চেয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে না; আনন্দে ও বিষণ্নতায় বুকটা টনটন করে ওঠে।

এদিকে ইয়াকভ মামার ছেলে সাশার স্বভাবটা ঠিক উল্‌টো। বড়োদের মতো যে কোনো বিষয়ে যতক্ষণ খুশি চটকদার কথা বলতে পারে ও। কাপড়চোপড়ে রং করার বিদ্যে আয়ত্ত করবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব এ কথা জানতে পেরে ও আমাকে পরামর্শ দিতে এল। ও বলে যে ছুটির দিনে পাতবার জন্যে যে টেবিল-ঢাকনাটি দেরাজে আছে সেটিকে বার করে নিয়ে আমি গাঢ় নীল রঙে চুবিয়ে নিতে পারি।

'আমার তো মনে হয়, সাদা কাপড়ে সব রং যেমন ফোটে, এমন আর কোনো কিছুতে নয়। আমার এই কথাটি জেনে রাখ।' খুব ভারিক্কী চালে বলে ও।

সেই মস্ত টেবিল-ঢাকনাটা আমি টেনে বার করলাম, তারপর ছুটে গেলাম উঠোনে। গামলাতে গাঢ় নীল রং তৈরি করা ছিল, সেই গামলাতে সবেমাত্র ঢাকনাটার একটা প্রান্ত চুবিয়েছি এমন সময় ৎসিগানক একেবারে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আমার হাত থেকে টেবিল-ঢাকনাটা কেড়ে নিয়ে প্রকাণ্ড থাবার মতো দুই হাত দিয়ে নিঙড়াতে শুরু করল। আমার মামাতো ভাই অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাণ্ড দেখছিল, তার দিকে তাকিয়ে ৎসিগানক চেঁচিয়ে বলল:

'যাও তো, ছুটে গিয়ে ঠাকুমাকে ডেকে নিয়ে এস!'

তারপর উস্কখুস্ক চুলের কাল মাথাটা আমার দিকে ফিরিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল:

'দেখ না, কেমন মজাটা টের পাবে।'

আমার দিদিমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন, তারপর চোখের সামনে এই কান্ড দেখে তাকিয়ে রইলেন হাঁ করে। এমন কি আমাকে হাস্যকরভাবে ধমক দিতে গিয়ে তাঁর চোখ দিয়ে দু-এক ফোঁটা জল পর্যন্ত বেরিয়ে এল। তাঁর নিজস্ব অদ্ভুত ঢঙে তিনি আমাকে ধমক দিলেন:

'ওরে, বাঁধাকপির মতো কানওলা পাজিছোঁড়া, তোকে মেরে গুঁড়ো করে ছুঁড়ে ফেলা উচিত।'

তারপর তিনি ৎসিগানককে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন:

'ভানিয়া, ঠাকুরদার কানে ওঠাসনে যেন! আমি কাউকে টের পেতে দেব না, তাহলে আর কোনো গোলমাল হবে না...'

'আমার সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। বরং আপনি সাশাকে সাবধান করে দিন, ও যেন এ নিয়ে ফিস্‌ফাস না করে।' পরনের চিত্রবিচিত্র এপ্রনে হাত মুছতে মুছতে উদ্বিগ্ন স্বরে ভানিয়া জবাব দিল।

'ওর হাতে কিছু পয়সা দিলেই ওর মুখ বন্ধ করা যাবে।' আমার হাত ধরে বাড়ির ভিতরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে দিদিমা বললেন।

শনিবার, সন্ধ্যা প্রার্থনা-সভার আগে, কে যেন আমাকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম, ঘরের ভিতরটা অন্ধকার ও চুপচাপ। মনে আছে, বাইরের দিকের এবং এই ঘর থেকে অন্যান্য ঘরে যাতায়াতের দরজাগুলো শক্ত করে আঁটা ছিল। জানলার বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ও কুয়াশাম্লান শারদ সন্ধ্যা। চুল্লির কালো মুখটার সামনে একটা বেঞ্চিতে অস্বাভাবিক রকমের ক্রুদ্ধ মুখে ৎসিগানক বসে আছে। আমার দাদামশাই দাঁড়িয়ে আছেন এক কোণের একটা গামলার কাছে, বার্চগাছের ডাল দিয়ে তৈরি লম্বা লম্বা বেতগুলোকে জল থেকে টেনে টেনে তুলছেন, বেতগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করছেন আর তীক্ষ্ন শিস তুলে শপ্ শপ্ বেতের বাড়ি মারছেন হাওয়ায়। আমার দিদিমা ঘরের অন্ধকারে কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন যেন এবং জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে নস্যি নিতে নিতে বিড়বিড় করে বলছেন:

'পাষন্ড, এই কাজেই তোমার আনন্দ...'

রান্নাঘরের মাঝখানটিতে একটি চেয়ারে বসে আছে ইয়াকভের ছেলে সাশা। দুই হাতের মুঠি দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে বুড়ো ভিখিরির মত করুণ সুরে টেনে টেনে বলে চলেছে:

'যীশু খ্রীষ্টের দোহাই, আমি এবারকার মতো মাপ চাইছি...'

মিখাইল-মামার ছেলে সাশা ও তার বোন খুঁটির মতো টান হয়ে চেয়ারের পিছনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

'আগে তোমার উপযুক্ত শাস্তি হোক, তারপরে মাপ করব।' একটা লম্বা ভিজে বেত মুঠোর মধ্যে টানতে টানতে দাদামশাই জবাব দেন। 'আচ্ছা বেশ, এবার প্যাণ্ট খোল।'

শান্তভাবে তিনি কথা বলেন। রান্নাঘরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার, ধোঁয়ায় কালো সিলিং — আর ঘরের মধ্যে এমন এক স্তব্ধতা যা ভোলা যায় না। আমার দাদামশাইয়ের কথা, নড়বড়ে আর কিচ্‌কিচ্‌-শব্দ-হওয়া চেয়ারের ওপরে ছেলেটির নড়াচড়া, আমার দিদিমার এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভর দিয়ে দাঁড়ানো — কোনো কিছুতেই ঘরের এই স্তব্ধতা ভঙ্গ হয় না।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় সাশা। প্যাণ্টটা খুলে হাঁটু পর্যন্ত নামায়, তারপর ঝুঁকে পড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় বেঞ্চির দিকে। ওর এই অবস্থা দেখে গা শির্‌শির্‌ করে ওঠে। আমারও হাঁটুদুটো কাঁপছে। কিন্তু তারপরের দৃশ্য আরো ভয়াবহ। অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো সাশা উপুড় হয়ে বেঞ্চির ওপরে শুয়ে পড়ে আর ভানিয়া একটা লম্বা তোয়ালে ওর বগলের তলা দিয়ে নিয়ে ঘাড়ের ওপরে বাঁধে শক্ত ভাবে। তারপর হেলে ওর পায়ের কব্‌জিদুটো চেপে ধরে থাকে।

'লেক্সেই!' আমার দাদামশাই ডাকেন, 'সামনে এগিয়ে এস। কী হে, কথা কানে ঢুকছে না বুঝি? ধোলাই কাকে বলে জানতে চেয়েছিলে, এবার তা চোখের সামনে দেখতে পাবে। ভালো করে তাকিয়ে দেখ। এক!...'

অনুচ্চে হাত তুলে তিনি সাশার খোলা গায়ের ওপরে বেতের বাড়ি মারেন। ছেলেটি আর্তনাদ করে ওঠে।

দাদামশাই বলেন, 'বাড়াবাড়ি কোরো না। ওতে তোমার কিচ্ছু ব্যথা লাগেনি! তবে এবারে ব্যথা লাগবে!'

সপাং করে তিনি বেত চালান; সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চামড়া চাকা চাকা হয়ে ফুলে লাল দাগ হয়ে ওঠে। আর আমার মামাতো ভাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়।

'কেমন লাগছে?' গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার মতো আমার দাদামশাইয়ের হাতটা একবার ওপরে ওঠে, একবার নিচে নামে, আর তিনি প্রশ্ন করে চলেন, 'মিষ্টি লাগছে না বুঝি? এইবার বোঝ আঙুঠিতে হাত দিলে কী হয়!'

যতোবার তিনি হাত ওঠান, আমার মনে হয়, আমার বুকের মধ্যে থেকে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে ঠেলে উঠে আসে; আর যতোবার তিনি হাত নামান, আমার মনে হয়, আমিও পড়ে যাচ্ছি।

ভাঙা-ভাঙা চেরা গলায় সাশা চিৎকার করে চলেছে। কান পেতে শোনা যায় না।

'আর কক্ষণো এমন কাজ করব না-আ... টেবিল-ঢাকনার কথাটা আমি কি বলিনি... আমিই তো বলেছি...'

'আরেকজনের নামে লাগালেই তো আর নিজের দোষ কাটে না।' শান্তস্বরে দাদামশাই বলে চললেন — 'লাগানিভাঙানিরাই প্রথম মার খায়। আচ্ছা, এবারে টেবিল-ঢাকনাকে ধরা যাক্।'

আমার দিদিমা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যান।

'খবরদার বলছি! যতো বড় পাষণ্ডই তুমি হও না, কিছুতেই তোমাকে লেক্সেইয়ের গায়ে হাত তুলতে দেব না!'

দিদিমা দরজার ওপরে লাথি মারতে থাকেন আর চিৎকার করেন, 'ভারিয়া! ভারভারা!'

দাদামশাই ছুটে আসেন, ধাক্কা দিয়ে দিদিমাকে ফেলে দেন, তারপর আমাকে সাপটিয়ে ধরে বেঞ্চির দিকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চলেন। আমি তাঁর হাতের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে দিই, তাঁর লাল দাড়িটা ধরে টানি, তাঁর আঙুল কামড়ে দিই। তিনি গাঁ গাঁ করে চিৎকার করে ওঠেন এবং আমাকে চেপে ধরে শেষ পর্যন্ত এনে ফেলেন বেঞ্চির ওপরে। আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যাই। মনে আছে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দাদামশাই তখন চিৎকার করছেন:

'বাঁধ্ শক্ত করে! খুন করব!'

আর মনে আছে আমার মা'র সাদা ফ্যাকাশে মুখখানি আর বড়ো বড়ো চোখদুটো। বেঞ্চির পাশে মা অনবরত ছুটোছুটি করছে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে:

'বাবা, এবার থাম... ছেড়ে দাও ওকে!'

শেষ পর্যন্ত আমি জ্ঞান হারাবার পর দাদামশাই থেমেছিলেন। তারপরে কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম আমি, ছোট একটি ঘরে মস্ত চওড়া আর উষ্ণ একটি বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে দিনরাত শুয়ে থাকতাম। ঘরটিতে একটিমাত্র জানলা, আর আইকনগুলির কাছে ছোট একটি লাল আলো সারা দিন সারা রাত ধরে জ্বলত।

আমার অসুখের কয়েক দিন আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। মনে হয়, এই সময়েই আমি হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠেছিলাম এবং নতুন একটি গুণ অর্জন করেছিলাম — সেই দিন থেকে শুরু করে, সব মানুষকে আপন বলে মনে করতে লাগলাম। যেন আমার বুকের ওপর থেকে একটা চামড়ার আবরণ খসে গেছে এবং আমি নিজের ও অপরের আঘাত সম্পর্কে অসহ্য রকমের অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠেছি।

প্রথম কথা, আমার মা ও দিদিমার মধ্যে যে কথা কাটাকাটি হয় তা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে উঠি। এই ছোট ঘরটির মধ্যে আমার দিদিমা তাঁর প্রকাণ্ড কালো শরীরটি নিয়ে আমার মা'র ওপরে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, টানতে টানতে মাকে নিয়ে গেলেন আইকনগুলির কাছে, তারপর ফোঁস ফোঁস করে বললেন:

'ওকে তুই ছিনিয়ে আনতে পারলি না কেন? এ্যাঁ?'

'আমার ভয় করছিল।'

'এত বড়ো হয়েও তোর ভয় করে! ছি, ছি, ভারভারা! আমি বুড়ী হয়েছি কিন্তু আমি ভয় পাইনি! ছি, ছি!'

'থাম মা, এ সব আমার বড্ড খারাপ লাগে!'

'ওর জন্যে তোর এতটুকু ভালোবাসা বা দরদ নেই! আহা, বাপ-মরা অনাথ ছেলে!'

যন্ত্রণাভরা গলায় মা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি নিজেও তো একজন অনাথা — বাকি জীবনে আমার আর কী আছে!'

ঘরের কোণে ট্রাঙ্কের ওপরে বসে তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ কাঁদেন।

আমার মা বলে, 'আলেক্সেই যদি না থাকত তাহলে আমি এখানে থাকতাম না — অনেক দূরে অন্য কোথাও চলে যেতাম! এই নরকে আমি আর থাকতে পারি না, এই জায়গা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে, মা! এখানে থাকবার মতো মনের জোর আমার নেই!'

আমার দিদিমা ফিসফিস করে বলেন, 'আহা-রে, বাছা আমার, প্রাণ আমার!'

এতদিনে আমি জানতে পারি, আমার মাকে আর যাই হোক্ শক্তিমতী বলা চলে না। অন্য সকলের মতো মাও দাদামশাইকে ভয় করে চলে। এখানকার জীবন মা'র কাছে অসহ্য তবুও আমার জন্যেই মাকে থাকতে হচ্ছে এখানে। কথাটা ভাবতেই আমার মন অতি বিষণ্ণ হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আমার মা কোথায় যেন নিখোঁজ হয়ে যায়।

একদিন আমার দাদামশাই এলেন আমাকে দেখতে। এমন হঠাৎ এলেন যে মনে হল যেন তিনি ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন। বিছানার ধারটিতে বসে বরফের মতো ঠান্ডা আঙ্গুল দিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বললেন:

'কেমন আছ হে ছোক্‌রা... কথা বলো না বাপু — মনের মধ্যে রাগ পুষে রেখ না। কী হে?'

ইচ্ছা হচ্ছিল, লাথি মেরে ফেলে দিই; কিন্তু যন্ত্রণায় হাত-পা নাড়বার ক্ষমতা ছিল না। তাঁর চুল যেন আগের চেয়েও লাল, অস্বস্তির সঙ্গে তিনি অনবরত মাথা নেড়ে চলেছেন, তাঁর উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি দেওয়ালের ওপর কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। পকেট থেকে তিনি বার করলেন মিষ্টি রুটির তৈরি একটা ছাগল, চিনির তৈরি দুটি ঢোল, একটা আপেল ও কিছু কিসমিস; জিনিসগুলো বালিশের ওপরে আমার নাকের পাশে রেখে বললেন:

'দেখ দাদু, তোমার জন্যে আমি কত উপহার এনেছি।'

নিচু হয়ে তিনি আমার কপালের ওপরে চুমু খেলেন। তারপর কপালের ওপরে হাত বুলোতে বুলোতে কথা বলতে লাগলেন; তাঁর ছোট খস্‌খসে হাতটায়, বিশেষ করে তাঁর হাতের পাখির মতো বাঁকানো নখগুলোতে ঝক্‌ঝকে হলুদ রঙের ছোপ পড়েছে।

'দাদু, সেবারে তোমার যতোটুকু পাওনা ছিল, তার চেয়ে খানিকটা বেশি দেওয়া হয়ে গেছে। কথাটা কী জান, তুমি আমাকে এমন আঁচড়-কামড় দিয়েছ যে আমি ক্ষেপে গিয়েছিলাম। আর সেজন্যেই একেবারে মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। তবে এই বাড়তি মাত্রাটুকু তোমার পক্ষে এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। এটা তোমার হিসেবে আগামী বারের জন্যে জমা রইল। একটা কথা মনে রেখ ভাই। বাড়ির লোকেরা যদি তোমাকে মারে তাতে দোষের কিছু

নেই। সেটা ভালো শিক্ষা! কিন্তু খবরদার, বাইরের লোককে তোমার গায়ে হাত তুলতে দিও না। আপনার জন হলে কিছু আসে যায় না, কিন্তু বাইরের লোক কিছুতেই নয়। তুই কি মনে করিস, ছেলেবেলায় আমার কপালে কিছু জোটেনি? আলিওশা, অতি বড়ো দুঃস্বপ্নেও তুই কল্পনা করতে পারবি না আমায় কি মার খেতে হয়েছে! এক-একদিন এমন মার খেতাম যে স্বয়ং ভগবানও হয়তো তা দেখে স্থির থাকতে পারতেন না। আর এত মার খাওয়ার ফল কি কিছুই হয়নি? তাকিয়ে দেখ তো আমার দিকে — আমি ছিলাম ভিখারিমায়ের ছেলে, বাপ-মরা অনাথ — আর আজ আমি কারিগরদের প্রধান কর্মকর্তা, আমার হুকুমে কত লোক চলে।'

রোগা মজবুত শরীরটা নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি তাঁর ছেলেবেলার গল্প বলতে শুরু করলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একটির পর একটি শক্ত-শক্ত কথা জুড়ে গল্প বললেন তিনি।

তাঁর সবুজ চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, খাড়া হয়ে উঠেছে তাঁর সোনালী চুল, তাঁর কথাগুলো তীরের মতো এসে লাগছে আমার মুখের ওপরে।

'তুই এখানে এলি জাহাজে চেপে। বাষ্প সেই জাহাজকে চালিয়ে এনেছে। বাষ্প তোকে পৌঁছে দিয়ে গেল এখানে। কিন্তু ছেলেবেলায় আমি আমার নিজের গায়ের জোরে ভল্‌গার ওপর দিয়ে বজ্‌রা টেনে নিয়ে যেতাম, পাঞ্জা লড়তাম ভল্‌গার সঙ্গে। জলের ওপরে বজ্‌রা, আমি ডাঙায় — খালি পায়ে তীক্ষ্ণ পাথর আর ঢিবি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলা। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে চলার বিরাম নেই। সারাটি দিন মাথার ওপরে সূর্য জ্বলে, আর শেষকালে মনে হয় মাথাটা যেন লোহার একটা পাত্র আর সেই পাত্রের মধ্যে কী একটা তরল পদার্থ টগ্‌বগ করে ফুটছে। চুলের কাঁটায় মতো সারাটা শরীর বেঁকে যায়, মট্‌মট করে শব্দ হয় হাড়ের মধ্যে — আর শুধু চলা আর চলা। দর্‌দর করে ঘাম ঝরে চোখের ওপরে তবুও অন্ধের মতো শুধু পথ চলা, বুকের মধ্যে দপ্‌দপ করে, যন্ত্রণায় ঠোঁট বেঁকে যায় — তবুও কোনো নালিশ না জানিয়ে মুখটি বুজে পথ চলা। এই ছিল আমাদের অবস্থা আলিওশা! আর এইভাবে চলতে চলতে একসময়ে দড়ি খসে পড়ে কাঁধ থেকে, মুখ থুবড়ে আশ্রয় নিতে হয় মাটিতে... কিন্তু তবুও ভালো লাগে তখন, — কারণ, শরীরের শেষ বিন্দু শক্তি পর্যন্ত ক্ষয় হয়েছে। আর শুয়েই আছি যতক্ষণ না জ্ঞান হারাই কিংবা মারা যাই — তখন মনে হয় ঐ দুটির মধ্যে

বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। ঈশ্বরের জগতে, পরম মঙ্গলময় যীশু খ্রীষ্টের জগতে এইভাবেই বেঁচে থাকতাম আমরা!.. এইভাবেই তিন-তিন বার আমি ভল্‌গা নদী লম্বালম্বি পাড়ি দিয়েছি — সিম্বিরস্ক থেকে রিবিনস্ক'এ, সারাতভ থেকে এখানে, আস্ত্রাখান থেকে মাকারিয়েভের বাজারে! এইভাবে হাজার হাজার মাইল পথ পার হতে হয়েছে! তারপর, তিন বছর এইভাবে চলার পর, আমার পদোন্নতি হল, বজ্‌রাটার মোড়ল হলাম। মালিক বুঝতে পেরেছিল যে অন্য সকলের চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি!'

আমার মনে হতে লাগল যেন আমার চোখের সামনে তিনি এক টুকরো মেঘের মতো বাড়তে বাড়তে মস্ত হয়ে উঠেছেন। ছোটখাটো রোগা বুড়ো লোকটি যেন হয়ে উঠেছেন রূপকথার বীরের মতো শক্তিশালী — মস্ত এক নদীর বিপুল স্রোতের বিরুদ্ধে মস্ত এক ছাইরঙা বজ্‌রাকে টেনে নিয়ে চলেছেন তিনি।

মাঝে মাঝে বিছানা থেকে এক লাফে নিচে নামেন। হাত-পা নেড়ে নিজেই দেখিয়ে দেন বুর্লাকরা* কি-ভাবে দড়ি কাঁধে নিয়ে পথ চলে আর কি-ভাবে জল ছেঁচে ফেলে বাইরে। মোটা-মোটা গলায় অপরিচিত সুরে গান গেয়ে ওঠেন; তারপরেই আবার তরুণোচিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফিয়ে উঠে আসেন বিছানার ওপরে। ভারি চমৎকার মানুষটি — কথা বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে এবং ক্রমেই তাঁর কথার মধ্যে প্রত্যয়ের ভাবটুকু বেশি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

'তবে কি জানিস আলিওশা, সেই জীবনের অন্য একটা দিকও ছিল। গ্রীষ্মের কোনো কোনো সন্ধ্যায় আমরা জিগুলিতে বিশ্রাম করতাম, সামনে থাকত সবুজ পাহাড় আর এখানে আগুন জ্বালতাম আমরা। সে-সব কী দিনই গেছে, আলিওশা! ওদিকে হয়তো পরিজ্ ফুটছে, এমন সময় একজন হতভাগ্য বুর্লাক্ মনকে হালকা করবার জন্যে দরদভরা গান গেয়ে উঠত। অন্য সবাই যারা থাকতাম তাঁরাও গলা মেলাতাম সেই গানের সঙ্গে। আহা, কী সব গান! সেই গান শুনে সারা গা শির্‌শিরিয়ে উঠত। এমন কি মনে হত ভল্‌গা নদীও সেই গানের তালে তালে গতিময়ী হয়ে উঠছে, ঘোড়ার মতো টগ্‌বগিয়ে উঠে বেরিয়ে যেতে চাইছে আকাশ ফুঁড়ে! ঝড়ের

* যারা ডাঙায় হেঁটে বড়ো বড়ো মালবাহী বজ্‌রা টেনে নিয়ে যায়। — সম্পাঃ

মুখে ধুলোর মতো আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। গানে আমরা এমন মত্ত হতাম যে অগ্নিকুণ্ডের ওপরে চাপানো পরিজের কথা কারও মনে থাকত না—শেষকালে পরিজ্ পাত্র উপচে পড়তো। রান্নার তদারকে যে থাকত তার মাথায় চাটি মেরে তখন আমরা বলতাম—গান-টান যতো খুশি কর বাপু, কিন্তু নিজের কাজটিতে যেন ভুল না হয়।'

তাঁকে ডাকবার জন্যে মাঝে মাঝে লোক আসছে। যতোবার লোক আসে আমি আব্দার ধরি: 'দাদামশাই, আরেকটি গল্প বলো, এখন যেও না।'

তিনি হাসেন, তারপর হাত নেড়ে বলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা। ওরে, ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলে দে।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে গল্প বলে চলেন তিনি। তারপর সস্নেহে বিদায় নিয়ে উঠে যান। আমি বুঝতে পারি, দাদামশাই নীচ প্রকৃতিরও নন, ভয়ঙ্কর কিছুও নন। ভাবতেও কষ্ট হয় যে এই একই লোক আমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছেন। কিন্তু ঘটনাটা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

দাদামশাই আমাকে দেখে যাওয়ার পর থেকেই আমার কাছে অন্য সকলের আসা অবারিত হয়ে গেল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কেউ না কেউ আমার বিছানার পাশে বসে থাকে, নানা মজার কথা বলে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে আমাকে। তবে এটুকু আমার মনে আছে, চেষ্টা করলেই যে আমাকে ভুলিয়ে রাখা যেত তা নয়। সবচেয়ে বেশি আসতেন আমার দিদিমা, অন্য কেউ তাঁর মতো এত ঘনঘন আসত না। দিদিমা আমার সঙ্গে শুতেন পর্যন্ত। কিন্তু এই সময়ে আর একজন আমার মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছিল। তার নাম ৎসিগানক। গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, চওড়া কাঁধ, মস্ত মাথা আর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। পরনে আগাগোড়া উৎসবের পোশাক—সোনালী সিল্কের কামিজ, মখমলের ট্রাউজার আর মশ্মশে বুটজুতো। চলবার সময় গোড়ালির কাছে জুতোর চামড়ায় একর্ডিয়নের মতো ভাঁজ পড়ে। মাথার চুল চক্চক্ করছে, ঘন ভুরুর নিচে তের্ছা চোখের দৃষ্টি কৌতুকে উদ্ভাসিত, ঠোঁটের ওপরে তরুণ বয়সের গোঁফের উদ্ভিন্ন কালো রেখা—আর সেই কালো রেখার নিচে ঝক্ঝকে সাদা দাঁত। পরনের কামিজ থেকে নরম আলো ফুটে বেরুচ্ছে,—আইকনের লাল আলো প্রতিফলিত হয়ে আসছে কামিজ থেকে।

কামিজের আস্তিন তুলে সে দেখায়; দেখা গেল তার অনাবৃত হাতের ওপরে অনেকগুলো লাল রেখা জালের মতো ফুটে রয়েছে। বলে, 'দেখছিস

তো কেমন ফুলে আছে। এর চেয়েও খারাপ অবস্থা ছিল, এখন অনেকগুলো প্রায় সেরে গেছে।'

তারপর বলে চলে, 'দেখলাম, রাগে তোর দাদামশাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, হয়তো মারতে মারতে মেরেই ফেলত তোকে। তখন বেতের নিচে আমি হাত পেতে দিলাম। ভেবেছিলাম, বেতটা ভেঙে যাবে। তাহলে আরেকটা বেত নিয়ে আসতে যেটুকু সময় লাগত তার মধ্যেই তোর দিদিমা বা মা তোকে ছিনিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু ভাবলে কি হবে, বেতটা ছিল মজবুত; জল খাওয়ানো হয়েছিল বেতটাকে। তবে যাই বল্ না কেন, কয়েকটা বেতের ঘা থেকে তোকে আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি কিন্তু। গুণে দেখতে পারিস কতগুলি। আমি বাবা বড্ড চালাক, হ্যাঁ!'

আলতোভাবে সে হেসে ওঠে। ভারি সুন্দর তার হাসিটুকু। নিজের ফুলো ফুলো হাতটার দিকে তাকিয়ে আবার সে বলে:

'তোর অবস্থা দেখে ভারি কষ্ট হচ্ছিল আমার। দম আটকে আসছিল। তখনই বুঝেছিলাম যে তোকে ভুগতে হবে, কিন্তু তোর দাদামশাইয়ের হুঁশ হয়নি, সপাং সপাং করে সমানে চালিয়ে গেলেন...'

কথা বলতে বলতে ঘোড়ার মতো চিঁহি-চিঁহি শব্দ করে ওঠে, মাথা দুলিয়ে সে দাদামশাইয়ের উদ্দেশ্যে কি যেন বলতে লাগল আর সেই মুহূর্তে সে আমার অত্যন্ত আপনার লোক হয়ে উঠল। শিশুর মতো সরল সে।

আমি বললাম যে আমি তাকে খুবই ভালোবাসি। আমার কথা শুনে তেমনি অনুপম সারল্যের সঙ্গে সে জবাব দেয়, 'আমিও তোকে ভালোবাসি। এই ধর্ না, এই যে ইচ্ছে করে তোর জন্যে যন্ত্রণা ভোগ করছি, তা কেন, তোকে ভালোবাসি বলেই তো! ভাবছিস, তুই না হয়ে আর কেউ হলে আমি একাজ করতাম? ফুঃ! বয়ে গেছে আমার!'

তারপর দরজার দিকে বারবার সাবধানী দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে আমাকে সে তালিম দিতে শুরু করে। বলে, 'শোন্, তোকে একটা কথা বলে রাখি। এর পরের বার আবার যখন তোকে পিটুনি দেবে তখন একটা জিনিস খেয়াল রাখবি। কক্ষণো শরীর খিঁচিয়ে শক্ত করে রাখবি না। ওতে দ্বিগুণ ব্যথা লাগে। শরীরটাকে একেবারে আল্‌গা করে ছেড়ে রাখবি, যেন জেলির মতো তুলতুলে হয়ে থাকে! আর খবরদার, দম বন্ধ করে থাকিসনে যেন। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস টানবি আর ছাড়বি। আর পুরো দমে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকবি। আমার এই কথাগুলো মনে রাখিস।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে কি আবার মারবে নাকি রে?'

ৎসিগানক শান্তভাবে জবাব দেয়, 'ভাবছিস কী তুই? আলবৎ মারবে! শুধু একবারই নয়, এবার থেকে মাঝে মাঝে তোর কপালে এটি আছে ধরে রাখ্।'

'ইস, কী জন্যে?'

'তোর দাদামশাই যেমন করে হোক বের করবে অপরাধ।'

দারুণ একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে তারপর আবার সে আমাকে তালিম দিতে শুরু করে:

'দ্যাখ্, বেতের বাড়িটা কি-ভাবে পড়ছে খেয়াল রাখবি। যদি দেখিস সোজাসুজি ঘা পড়ছে, সপাং করে ওপর থেকে নিচে, তাহলে আর নড়াচড়ার দরকার নেই, শরীরটাকে আল্তোভাবে ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকবি। আর যদি দেখিস, বেতের ঘা দিয়ে হ্যাঁচ্কা টানে শরীরের ছালচামড়া উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, তাহলে মানুষটার দিকে এগিয়ে যাবি। বুঝতে পারছিস তো, তার মানে বেত যেদিকে চলছে সেদিকে যাবি। তাহলে আর বেতের ঘাগুলো তেমন মারাত্মক হতে পারবে না।'

কালো তেরছা চোখের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ টেপে, তারপর বলে, 'মারধোরের কথা যদি বলিস তো এ-বিষয়ে পুলিসের চেয়েও আমি বেশি জানি। মার খেয়ে খেয়ে আমার চামড়া এমন রুক্ষ হয়েছে যে তা দিয়ে একজোড়া দস্তানা তৈরি করে ফেলা যায়।'

ৎসিগানকের হাসিখুশি মুখটার দিকে তাকিয়ে দিদিমার মুখে শোনা গল্পের কথা মনে পড়ে যায়।—রাজকুমার ইভান এবং বোকা ইভানুশ্কার গল্পগুলি।

তিন

ভালো হয়ে ওঠার পর আমি টের পেলাম, আমাদের বাড়িতে ৎসিগানকের একটু বিশেষ খাতির। আমার দাদামশাই নিজের ছেলেদের ওপরে যতো বেশি চোটপাট করেন, ৎসিগানকের ওপরে ততোটা নয়। এবং ৎসিগানকের আড়ালে যখনই ৎসিগানকের কথা ওঠে, দাদামশাই চোখ দুটো পিটপিট করে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন:

'দ্যাখ্ তো ভানিয়া*! হতভাগাটার মত অমন কাজের হাত থাকা

* ভানিয়া হচ্ছে ইভানের সংক্ষিপ্ত নাম। — সম্পাঃ

চাট্টিখানি কথা নয়। এই আমি বলছি, তোরা দেখে নিস, এই যে ছেলেটা আমাদের বাড়িতে বড়ো হয়ে উঠছে, এ মস্ত বড় হবে।'

আমার মামারাও ৎসিগানকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখে এবং কক্ষণো ঠাট্টাতামাসা করে তার পিছনে লাগে না। কারিগর গ্রিগরির সঙ্গে যা করে ৎসিগানকের সঙ্গে তা করে না। গ্রিগরিকে নিয়ে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তাদের কিছু একটা মারাত্মক ধরনের রসিকতা লেগেই আছে। হয়তো সে যে কাঁচিটা ব্যবহার করে সেটাকে তাতিয়ে রেখে দেয়; কিংবা গ্রিগরি যে চেয়ারটায় বসে তাতে পেরেক ফুটিয়ে রাখে; কিংবা হয়তো গ্রিগরি সেলাই করবার জন্যে যে কাপড়ের স্তূপ রেখেছে তাতে নানা রঙের কাপড় মিশিয়ে রাখে আর আধকানা গ্রিগরি সেই কাপড়ের টুকরোগুলোকেই সেলাই করে করে জোড়া লাগায় এবং তারপরে প্রচণ্ড বকুনি খায় দাদামশাইয়ের কাছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে গ্রিগরি রান্নাঘরের একটা বেঞ্চির ওপরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে আমার মামারা গ্রিগরির মুখখানাকে ম্যাজেণ্টা রং দিয়ে চিত্রবিচিত্র করে তোলে। রঙমাখা মুখখানা কিম্ভূতকিমাকার আর বীভৎস হয়ে ওঠে। একমুখ ভর্তি পাকা দাড়ি, মাঝখানে চশমার কালো কালো দুটো কাচ — আর দুই কাচের ফাঁক দিয়ে লম্বা লাল নাকটা জিভের মতো ঝুলে রয়েছে। এই চেহারা নিয়েই গ্রিগরি বহুক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ায়।

মামাদের মাথায় এই ধরনের নিত্য নতুন ঠাট্টাতামাসা দেখা দেয়; তার যেন শেষ নেই। কিন্তু গ্রিগরি মুখে কোনো প্রতিবাদ জানায় না, শুধু আপন মনে বিড়বিড় করে আর কোনো কাজ শুরু করবার আগেই সাবধান হয়ে নেয়; যেমন কাঁচি, ইস্ত্রি, চিমটে বা আঙুঠি হাত দিয়ে ধরবার আগে প্রচুর থুতু দিয়ে ভিজিয়ে নেয় আঙ্গুলগুলো। ক্রমে এটা তার একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। এমন কি খাবার টেবিলে বসেও কাঁটা-চামচ ধরবার আগে থুতু দিয়ে আঙ্গুল ভেজায় আর এই কাণ্ড দেখে ভারি মজা পায় ছেলেমেয়েরা। কোনো ব্যাপারে ঘা খেলে গ্রিগরির প্রকাণ্ড মুখের চামড়া কুঁচকে ওঠে। সেই কোঁচকানি পর-পর ঢেউয়ের মতো চলে যায় মুখের ওপর দিয়ে, অদ্ভুতভাবে উঠে আসে কপালে, ভুরুদুটোকে তুলে ধরে, তারপর টাকের মধ্যে দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

গ্রিগরিকে নিয়ে মামাদের এই ঠাট্টাতামাসা দাদামশাই কী চোখে দেখেন

আমি জানি না কিন্তু আমার দিদিমা শাসানির ভঙ্গীতে মামাদের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে চিৎকার করতে থাকেন:

'লজ্জা করে না তোদের — পাষণ্ড, পিশাচ!..'

কিন্তু ৎসিগানকের আড়ালে তার সম্পর্কে আমার মামারা যা-তা বলে। তখন তারা ৎসিগানককে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না। নানাভাবে খেলো করে তাকে; খুঁৎ ধরে কাজে, চোর, আল্‌সে এইসব বলে গালাগালি দেয়।

দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মামারা এ-রকম কেন করে।

সর্বদাই দিদিমা যে-রকম স্পষ্ট করে এবং সাগ্রহে কথা বলে থাকেন সে-ভাবে বলেছিলেন, 'বুঝতে পারিসনে, ওরা প্রত্যেকেই মতলব ভেঁজে রেখেছে যে নিজের নিজের কারখানা খুলবে। প্রত্যেকেই চায়, ভানিয়া তার কারখানাতেই কাজ করুক। তাই বজ্জাতগুলো করে কি, একজন আরেকজনের কাছে গিয়ে ভানিয়ার নিন্দে করে। কিন্তু দু'জনেই ভয় পায় ভানিয়া হয়তো তাদের সঙ্গে যাবার চেয়ে তোর দাদামশাইয়ের কাছেই থাকতে চাইবে। তারা মিথ্যে করে লাগায়, নানা ছল চাতুরী করে। আবার তোর দাদামশাইও তো আর ঘাস খায় না — হয়তো দেখবি, এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়, সে ভানিয়াকে নিয়ে বাড়-বাড়তি আরেকটা কারখানাই খুলে বসেছে। তা যদি হয় তো তোর মামারাই আচ্ছা প্যাঁচে পড়বে কিন্তু। বুঝলি?'

নিঃশব্দে তিনি হাসতে থাকেন।

'আর এও বলি, এসব তোদের কী কাণ্ডকারখানা বাপু! ভগবান যে ভগবান, তিনিও বোধ হয় তোদের ব্যাপার দেখে হাসছেন। ভাবছিস, তোর দাদামশাই বুঝি ওদের এসব চালাকি ধরতে পারে না? খুব পারে। তাই তো মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এমন ক্ষেপিয়ে তোলে ওদের। হয়তো বলে বসবে, "ওরে শোন্, ইভানকে একটা রিক্রুট্ সার্টিফিকেট কিনে দেব ভাবছি। তাহলে আর ওকে পল্টনে ডাকতে পারবে না। ওকে ছাড়া কাজ চলবে না, একথা তো ঠিক।" তাই না শুনে তোর মামারা তো একেবারে খাপ্পা। এতে ওদের কারও মত নেই, সার্টিফিকেট কিনতে খরচ তো আর কম নয় — পয়সাটা ওরা খুব চিনেছে।'

সেই স্টীমারে কয়েকদিন যেমন কেটেছিল, আবার আমি তেমনি দিদিমার সঙ্গেই থাকছি। আর রোজ সন্ধ্যায় ঘুমোতে যাবার আগে তিনি আমাকে রূপকথার গল্প কিংবা নিজের জীবনের গল্প বলেন। তাঁর নিজের জীবনের

গল্পও রূপকথার মতোই চমৎকার। মাঝে মাঝে তোলেন সংসারের কথা; দাদামশাইয়ের সম্পত্তি হয়তো ভাগ করে দিতে হতে পারে কিংবা দাদামশাই হয়তো নিজের জন্যে নতুন একটা বাড়ি বানাতে পারেন, এমনি সব সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কথা। নির্বিকার ভাবে কথাগুলি তিনি বলে যান, গলার স্বরে বিদ্রূপ ফুটে ওঠে। তখন কিছুতেই মনে হয় না যে দাদামশাইয়ের পরে তিনিই এ-বাড়ির সবচেয়ে জাঁদরেল লোক। এমনভাবে কথা বলেন যেন তিনি এ-বাড়ির লোকই নন।

দিদিমার কাছেই শুনি যে ৎসিগানক কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। বসন্তের শুরুতে এক বাদলা রাতে আমাদের বাড়ির ফটকের পাশে বেঞ্চিতে পাওয়া গিয়েছিল তাকে।

কী যেন ভাবতে ভাবতে রহস্যভরা সুরে তিনি বললেন, 'শুধু একটা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ফেলে গিয়েছিল ওকে। ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিল একেবারে, চিৎকারটুকু করবার মতো ক্ষমতাও প্রায় ছিল না।'

'আচ্ছা দিদিমা, লোকে বাড়ির বাচ্চাদের এভাবে ফেলে যায় কেন?'

'মায়ের কপাল আর কি, হয়তো এমনই অবস্থা যে বাচ্চাকে একটু দুধ বা অন্য কিছু খাওয়াবার ক্ষমতাটুকুও নেই। তখন আর উপায় কি বল্? এই অবস্থায় মা কি করে, আশেপাশে খুঁজে দেখে কোন্ বাড়িতে সদ্য একটি বাচ্চা মারা গেছে। সেই বাড়ির সামনেই তখন বাচ্চাকে ফেলে আসে।'

দিদিমা চুল আঁচড়াতে লাগলেন, কিছুক্ষণ আর কোনো কথা বললেন না।

তারপর ছাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে চললেন, 'কি জানিস আলিওশা, এসবের মূলে রয়েছে অভাব-অনটন। এমন লোক আছে, যারা এত গরীব যে মুখের কথায় তাদের অবস্থা বোঝানো যায় না! আর যে-মেয়ের বিয়ে হয়নি তার যদি বাচ্চা হয় তবে সেটাকে সবাই খুব একটা লজ্জার কথা মনে করে! তোর দাদামশাইয়ের ইচ্ছে ছিল ভানিয়াকে নিয়ে থানায় জমা দিয়ে আসে, কিন্তু আমার ইচ্ছেটা ছিল অন্যরকম। তোর দাদামশাইকে আমি বললাম, কী দরকার বাপু বাচ্চাটাকে থানায় দিয়ে! আমাদের তো অনেকগুলি বাচ্চা মারা গেছে, তার বদলে ভগবান দয়া করে এই একটিকে পাঠিয়েছেন, এটিকে আমরাই মানুষ করি। কম তো নয়, একটি একটি করে আঠারোটি বাচ্চাকে আমি পেটে ধরেছি। যদি সবকটি বেঁচে থাকত তবে পুরো একটি রাস্তা লাগত তাদের থাকার জন্যে। আঠারো — আঠারোটা

বাড়ি! ব্যাপার কি হয়েছিল জানিস, চোদ্দ বছর বয়স হবার আগেই আমার বিয়ে হয়ে যায় আর পনেরো না হতেই প্রথম বাচ্চা হয়। তবে আমার পেটের বাচ্চাদের ওপর ভগবানের বিশেষ একটু দয়া আছে বলতে হবে — একটি একটি করে তিনি বাচ্চাগুলোকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছেন। কষ্ট হত খুব, আবার আনন্দও পেতাম।'

বিছানার ধারটিতে বসে রইলেন তিনি। পরনে শুধু রাত পোশাক। আগাগোড়া কালো মাথার চুলে ঢাকা শরীর। মস্ত লোমশ একটি মূর্তি। তাঁকে দেখে ভল্লুকীর মতো মনে হচ্ছিল; কিছুদিন আগে একজন দাড়িওলা চাষী সের্গাচ'এর জঙ্গল থেকে ধরা একটি ভল্লুকীকে আমাদের উঠোনে নিয়ে এসেছিল, অনেকটা সেই রকম।

তুষারের মতো সাদা বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে, থর থর করে হাসতে হাসতে, আপন মনে তিনি বলে চললেন, 'বাচ্চাদের মধ্যে সেরাগুলোকেই ভগবান টেনে নিয়েছেন আর ওঁচাগুলো পড়ে আছে। ভানিয়াকে পেয়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল — তোদের মতো ছোট বাচ্চাগুলোকে দেখলে আমি আর স্থির থাকতে পারিনে রে! তখন থেকেই আমি মানুষ করতে লাগলাম ভানিয়াকে, গির্জায় নামকরণ করালাম ওর। আর এখন দেখছিস তো কত বড়ো আর কী চমৎকার হয়েছে ছেলেটি। প্রথম প্রথম আমি ওকে ডাকতাম গুবরে পোকা বলে। হুবহু অমনি একটা শব্দ করত মুখ দিয়ে, গুটি গুটি হামাগুড়ি দিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াত আর গুবরে পোকার মত গুন্ গুন্ শব্দ করত। আলিওশা, বড়ো সরল আর সাদাসিধে ছেলেটি — ওকে একটু ভালোবাসতে চেষ্টা করিস।'

ইভানকে আমি সত্যিই ভালোবাসতাম। আবার ওকে যতোই দেখতাম ততোই অবাক হতাম।

প্রত্যেক শনিবার দাদামশাইয়ের দুটি বাঁধা কাজ ছিল; প্রথম, সপ্তাহের মধ্যে যে-সব ছেলেমেয়ে কোনো না কোনো দোষ করেছে তাদের প্রহার দেওয়া; দ্বিতীয়, সন্ধ্যাবেলার প্রার্থনা-সভায় যোগ দেওয়া। আর দাদামশাই বেরিয়ে যাবার পরেই রান্নাঘরে মজার মজার কাণ্ডকারখানা শুরু হত; ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। উনুনের পিছন থেকে কয়েকটা কালো কালো আরসোলা ধরে আনত ৎসিগানক, তৈরি হত সুতোর লাগাম আর কাগজের স্লেজগাড়ি — আর তারপর সেই আরসোলা-টানা স্লেজগাড়ি ছুটত ঝক্‌ঝকে হলুদ রঙ লাগানো পরিষ্কার টেবিলের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত। ছোট

একটা কাঠি দিয়ে আরসোলাগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে উত্তেজিত স্বরে চিৎকার করে উঠত ৎসিগানক, 'এই যে, পাদ্রিমশাইকে নিয়ে আসার জন্যে গাড়ি চলেছে!'

তারপর সে আর-একটা আরসোলার পিঠে এক টুকরো কাগজ এ'টে দিত আর আরসোলাটাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেত গাড়িটার পিছনে পিছনে; সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা:

'তারা ঝোলাটা ভুলে ফেলে গিয়েছে কিনা, তাই মঠের সন্ন্যাসী চলেছে ঝোলাটা পে'ৗছে দেবার জন্যে।'

তারপর আর-একটা আরসোলার ঠ্যাঙ বে'ধে ছেড়ে দিত; মাথা দিয়ে গ‍ু'তিয়ে টাল খেতে খেতে এগিয়ে যেত আরসোলাটা। উল্লাসে হাততালি দিয়ে ভানিয়া বলে উঠত, 'এই যে পুরুত শ‍ু'ড়িখানা থেকে বেরিয়ে সান্ধ্য উপাসনায় চলেছেন!'

কতগুলো কায়দা-দুরস্ত ই'দুর ছিল ভানিয়ার। ই'দুরের খেলা দেখাত সে। ই'দুরগুলোকে পিছনের দু-পায়ে দাঁড় করাত ও হাঁটাত, তাদের লম্বা লেজগুলো ঝুল-ঝুল করে দুলত পিছনের দিকে আর কালো মটরের মতো গোল-গোল চোখগুলো পিট্‌পিট করত অদ্ভুতভাবে। ই'দুরগুলোকে ভারি আদরযত্ন করত সে, কামিজের ভিতরে নিয়ে ঘুরে বেড়াত সর্বত্র। চিনি খাওয়াত নিজের মুখ থেকে, চুমু খেত আর বেশ জোরের সঙ্গে বলত:

'জানিস তো, ই'দুর বড্ড বুদ্ধিমান জন্তু, ভারি এদের মায়া মমতা। বাস্তুভূতের সঙ্গে এদের খুব ভাব। আর ই'দুরকে যারা খাওয়ায় আর আদর করে বাস্তুভূত তাদের কোনো অনিষ্ট করে না।'

তাস আর পয়সার ম্যাজিক দেখাতে পারত ৎসিগানক। বাচ্চাদের দলে তারই হাঁকডাক ছিল সবচেয়ে বেশি! আসলে তার সঙ্গে অন্যদের চোখে পড়বার মতো কোনো তফাৎ ছিল না। একদিন তাস খেলায় পরপর কয়েকবার তাকে 'গাধা' হতে হল। ভয়ানক চটে গেল সে, হাতের তাস ফেলে ঠোঁট ফুলিয়ে উঠে গেল খেলা থেকে। পরে সে আমার কাছে নালিশ জানাতে আসে, নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে, ভাঙা গলায় বলে:

'সব ওদের কারসাজি। একজন আরেকজনকে চোখ টিপছে আর টেবিলের তলা দিয়ে তাস চালাচালি করছে। একে তুই খেলা বলিস? অমন হাতের কারসাজি আমিও করতে পারি!'

ৎসিগানকের বয়স উনিশ বছর, আমাদের মতো চারজনকে এক করলে যা হয়, তেমনি প্রকাণ্ড শরীর।

ছুটির দিনগুলোর সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়লে ৎসিগানককে বিশেষভাবে মনে পড়ে, তাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। আমার দাদামশাই ও মিখাইল-মামা ছুটির দিনের সন্ধ্যায় দেখাসাক্ষাতের পালা সারতে যান। আর তখন একমাথা কোঁকড়া উষ্কখুষ্ক চুল নিয়ে ইয়াকভ-মামা এসে বসে; হাতে থাকে একটা গীটার। দিদিমা জলখাবারের বন্দোবস্ত করেন। প্রচুর খাবার আসে, কাঁচের গায়ে আশ্চর্য কৌশলে লাল ফুলের গুচ্ছের নকশা কাটা একটা সবুজ পাত্র থেকে ভদ্‌কা ঢালা হয়। ছুটিব দিনের পোশাক পরে ৎসিগানক লাট্টুর মতো চর্‌কি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। শরীরটা একপাশে হেলিয়ে নিঃশব্দে এসে ঢোকে গ্রিগরি, চশমার কালো কাঁচদুটো জ্বলজ্বল করে। আসে আমাদের ধাই ইয়েভগেনিয়া; লাল মুখে বসন্তের দাগ, জালার মতো মোটা, ছোট ছোট ধূর্ত চোখ আর নীচু গলার স্বর। মাঝে মাঝে আসেন উস্পেনস্কি ক্যাথেড্রালের পুরুত, সারা শরীরে যাঁর অজস্র লোম। এ-ছাড়াও আরো কয়েকজন আসে যাদের চেহারাগুলো আমার স্পষ্ট মনে নেই; রোগা-রোগা কালো কালো একদল মানুষ, ছায়া-ছায়া আবছা কতকগুলো রেখামূর্তি।

প্রচুর পানাহার করে সবাই আর ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। বাচ্চারাও তাদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না, তাদের জন্যে আসে ছোট একগ্লাশ মিষ্টি মদ। তারপর আস্তে আস্তে জমে ওঠে একটা অদ্ভুত উৎসব-মত্ততা।

ইয়াকভ-মামা খুব দরদের সঙ্গে সুর বাঁধে গীটারে; সুর বাঁধা হয়ে গেলে বলে, 'এবার তাহলে আমি শুরু করছি।' যতোবার এই ধরনের অনুষ্ঠান হয়, ইয়াকভ-মামা বরাবর এই একই কথা বলে।

তারপর মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো ঝাঁকানি দিয়ে সরিয়ে ঝুঁকে পড়ে গীটারের ওপরে, হাঁসের মতো গলা বাড়ায়, গোলগাল নিশ্চিন্ত মুখটাতে ফুটে ওঠে স্বপ্নাচ্ছন্নতা, একটা তেল্‌তেলে পর্দায় উজ্জ্বল চোখদুটো ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে। খুব আল্‌তোভাবে আঙুল চালায় তারের ওপর দিয়ে জেগে ওঠে সুর, আর সেই সুর শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

সেই সুর মুখের কথাকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেয়। মনে হয় যেন স্রোতস্বিনীর ধারা অনেক দূর থেকে দেওয়াল আর মেঝের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। বুকের ভিতরটা ভারী হয়ে ওঠে আর অশান্ত হয়ে ওঠে। কেমন যেন দুঃখ হয়;

দুঃখ হয় নিজের কথা এবং আর সকলের কথা ভেবে। বড়দের যেন বয়স কমে যায়, স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকে সবাই। থমথম করে স্তব্ধতা।

মিখাইলের ছেলে সাশা যেন বিশেষ উৎকর্ণ হয়ে সেই সুর শোনে। চোখের দৃষ্টি আঠার মতো লেগে থাকে গীটারের ওপরে, মুখটা হাঁ-করা, ঠোঁটের কোণ থেকে লাল গড়ায় — আর বাজনাটার দিকে সমস্ত শরীর নিয়ে ঝু'কে পড়ে। মাঝে মাঝে এতবেশি তন্ময় হয়ে যায় যে চেয়ার থেকে পড়ে যায় মাটিতে। কিন্তু মাটিতে পড়ে যাবার পরেও নড়ে-চড়ে না, দুই পা আর দুই হাতে ভর দিয়ে তেমনি স্থির নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

সেই সুর মুগ্ধ করে সবাইকে। নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে সবাই। শুধু শোনা যায় সামোভারের একটানা ও অভ্যস্ত গুঞ্জন। ছোট ছোট দু'টি জানলা, জানলার বাইরে অন্ধকার শারদ রাত্রি। মাঝে মাঝে কেউ হয়তো এসে খুব আল্‌তোভাবে জানলার শার্সিতে টোকা দেয়। টেবিলের ওপরে দু'টি মোমবাতি জ্বলে কে'পে ওঠে বর্শাফলকের মতো ঋজু হল্‌দে শিখা।

একটু একটু করে ইয়াকভ-মামা একটা গভীর আচ্ছন্নভাবের মধ্যে ডুবে যায়; দাঁতে দাঁত চেপে ধরে; মনে হয়, ইয়াকভ-মামা গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ছে। ঘুম নেই শুধু তার হাতের, হাতদুটোর মধ্যে অন্য এক প্রাণ আছে যেন।

ডান হাতের বাঁকানো আঙুলগুলো গীটারের কালো ফাঁকের উপরে অলক্ষ্যে কাঁপছে। যেন ডানা-ঝাপ্‌টানো পাখি তার বাঁ হাতটা অদৃশ্যভাবে দ্রুত উঠা-নামা করছে তারের ঘাটে ঘাটে।

মদ খাওয়া হলে প্রায় রোজই সে একই গান গায়। তার যেন শেষ নেই; বিদকুটে গলার স্বর — চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা হিস্‌হিস শব্দের মতো।

ইয়াকভ গান গায়:

হত যদি ইয়াকভ এক কুকুর ছানা
ঘেউ ঘেউ চিৎকারে পড়শীদের ঘুম
ছুট্‌ত কোথায় নেইকো জানা —
হায় হায় হায় প্রভু দয়াময়!
এ একঘেয়েমির জীবন সওয়া দায়!
এক মঠবাসিনী রাস্তা চলে কদমে কদমে,
কাক এসে এক কা-কা ডাকে পায়ের কাছে নেমে,
এ একঘেয়েমির জীবন সওয়া দায়!

ঝি' ঝি' পোকা ঝি' ঝি' ডাকে চুল্লির আড়ালে,
ব্যাঙ ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে আঁধারে জাঙ্গালে,
এ একঘেয়েমির জীবন সওয়া দায়!
এক ভিখিরী দাঁড়ির পরে প্যাণ্ট শুকোতে দেয়,
পথ-চলা আর এক ভিখিরী চুরি করে নেয়,
এ একঘেয়েমির জীবন সওয়া দায়!
এ নীরস জীবন সওয়া দায়, হে প্রভু দয়াময়!

এ গানটা আমি সহ্য করতে পারি না। গাইতে গাইতে মামা যখন ভিখিরীর কথায় আসে, আমি একেবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি। কিছুতেই সেই কান্না থামে না।

অন্যদের মতো ৎসিগানকও তন্ময় হয়ে গান শোনে। গান শুনতে শুনতে মাথার গোছা গোছা চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালায়, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে আর বেদনার্ত স্বরে মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে:

'ইস্, আমার যদি এমন গলা থাকত! কত গানই না তবে গাইতাম!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিদিমা বলেন, 'ওরে, তুই এবার একটু থাম্, ইয়াকভ! বুকের ভিতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে! ভানিয়া, তুই বরং তোর নাচটা একটু দেখা!'

দিদিমার অনুরোধ সবসময়ে যে মেনে চলা হয় তা নয়। তবে হঠাৎ এক-একসময়ে গান গাইতে গাইতে গায়কের ভাবান্তর ঘটে। তারগুলি ক্ষণকালের জন্যে চেপে ধরে অকস্মাৎ হাতটা মুঠি করে তুলে ধরে, সারা শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করে যেন নিঃশব্দে একটা কিছু অদৃশ্য বস্তু মেঝের ওপরে ছুঁড়ে ফেলছে। আর বুনো ষাঁড়ের মতো চেঁচায়:

'অসহ্য এই বিষণ্ণতা! ভানিয়া, উঠে পড়ো!'

ভানিয়া উঠে দাঁড়িয়ে গা-হাত-পা ঝাড়ে, পরনের হলদে জামাটা সমান করে নেয়, তারপর, পা টিপে টিপে এঁসে দাঁড়ায় ঘরের মাঝখানে। তার হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে বুঝি পিচ্ছিল কাঁচের ওপর দিয়ে আসছে।

'ইয়াকভ ভাসিলিয়েভিচ, আরেকটু জোরে।' সলজ্জ ও বিব্রত ভঙ্গিতে একটুখানি হেসে খুব নরম সুরে অনুরোধ জানায় সে।

সহসা উদ্বেল সুর-মূর্ছনায় ফেটে পড়ে গীটারটা, শুরু হয় মেঝের ওপরে পায়ের গোড়ালির ঠোকাঠুকি। তাকের ওপরে আর টেবিলের ওপরে ডিশগুলো ঠক্-ঠক্ শব্দে নড়ে ওঠে। আর ঘরের মাঝখানে ঘুরপাক খায়

ৎসিগানক। পাখির মতো ঝাপ্‌টা দিয়ে দিয়ে ওঠে শরীরটা, হাতদুটো ডানার মতো আন্দোলিত হয়, পা-দুটো এত দ্রুত নড়াচড়া করে যে চোখ দিয়ে সেই গতিভঙ্গিকে অনুসরণ করা চলে না। নাচতে নাচতে অদ্ভুত আর দুর্বোধ্য একটা শব্দ বার করে মুখ দিয়ে, পাছায় ভর দিয়ে মেঝেতে বসে, তারপর সোনালী একটা লাট্টুর মতো চর্‌কিপাক খায়। পরনের সিল্‌কের জামাটা ঢেউয়ের মতো কাঁপতে থাকে আর শিখার মতো ঝল্‌সে ওঠে — তখন মনে হয় যেন সেই ঝল্‌মলে পোশাকের আলো ছিট্‌কে এসে ঘরের চারিদিক আলোকিত করে তুলছে।

ৎসিগানক নেচেই চলে, কিছুতেই যেন ওর ক্লান্তি নেই। একেবারে আত্মহারা হয়ে যায়। মনে হয়, দরজাটা খোলা পেলে সে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়বে রাস্তায়, নাচতে নাচতে পেরিয়ে যাবে শহর, চলে যাবে দূর কোনো অজানা দেশে...

মেঝের ওপরে পা ঠুকে তাল দিতে দিতে ইয়াকভ-মামা চেঁচিয়ে ওঠে, 'সাবাস!' কানে তালা লাগানো শিস্‌ দেয় আর চেরা গলায় গান গেয়ে ওঠে:

যদি জুতো জোড়া রাস্তার মাঝে নাইকো যেতো ছিঁড়ে,
তবে আজই আমি পালিয়ে যেতাম বউকে আমার ছেড়ে!

টেবিলের চারপাশে বসে থাকা লোকগুলোর মধ্যেও এই মেজাজের ছোঁয়াচ লাগে। মাঝে মাঝে আর্তনাদের মতো এক-একটা চিৎকার বেরিয়ে আসে মুখ থেকে — যেন আগুনে ছেঁকা লেগেছে। দাড়িওয়ালা কারিগর বসে বসে টাক মাথায় আঙুলের টোকা দেয় আর কি যেন বিড়বিড় করে। মনে আছে, একদিন এমনি বসে থাকতে থাকতে গ্রিগরি ঝুঁকে পড়েছিল আমার দিকে। আমার কাঁধের ওপরে তার নরম দাড়ির ছোঁয়া লাগছিল আর বড়োরা যেমনভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলে তেমনিভাবে আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিল:

'লেক্সেই মাক্সিমীচ! তোমার বাবা এখানে থাকলে কী ভালোই না হত! অন্য রং ধরিয়ে দিতে পারত সবার মনে! ভারি আমুদে লোক ছিল হে! বাবাকে তোমার মনে আছে?'

'না।'

'সত্যি? জানো তো! তোমার বাবা আর তোমার দিদিমা... তাই তো, আচ্ছা একটু সবুর করো!'

ঋষিমূর্তির মতো লম্বা কৃশ শরীরটা নিয়ে গ্রিগরি উঠে দাঁড়াল।

দিদিমাকে প্রণাম জানিয়ে বলল অস্বাভাবিক গভীর স্বরে: 'আকুলিনা ইভানোভনা, আপনি যদি আমাদের একটু নাচ দেখান তো ভারি খুশি হই। মাক্সিম সাভাতেঁয়েভিচের সঙ্গে আপনি যেমন নাচতেন তেমনি আজও আপনাকে একটু নাচ দেখাতে অনুরোধ করছি।'

'তুমি কি পাগল হলে নাকি গ্রিগরি ইভানোভিচ? বলছ কি তুমি? কী লজ্জার কথা গো!' বলে হেসে উঠে দিদিমা আরো জড়োসড়ো হয়ে বসলেন -- 'আমাকে নাচতে বলছ তুমি? আমি যদি এই বয়সে নাচতে শুরু করি লোকে হাসাহাসি করবে...'

কিন্তু ততোক্ষণে সবাই দিদিমাকে ধরে বসেছে, নাচতেই হবে। সকলের পীড়াপীড়ির মধ্যেই দিদিমা হঠাৎ একসময়ে তরুণী মেয়ের মতো উঠে দাঁড়ালেন। পরনের স্কার্টটা ঠিক করে নিয়ে, শিরদাঁড়া টান করে, ভারী মাথাটা পিছন দিকে ঝাঁকিয়ে নাচের ভঙ্গিতে মেঝের ওপর দিয়ে চলতে চলতে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'হাসুক, যে যতো খুশি হাসুক! কোথায় রে ইয়াকভ, সুর তোল্!'

ইয়াকভ-মামা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি। আধ-বোজা চোখে, পা ফাঁক করে বসে ধীর লয়ে সুর তুলল। একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল ৎসিগানক, তারপর লাফিয়ে উঠে এসে দিদিমার চারপাশে পাক দিতে দিতে শুরু করল লম্ফঝম্ফ। দিদিমা নিঃশব্দ সঞ্চারে মেঝের ওপরটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছেন, যেন ভেসে বেড়াচ্ছেন বাতাসে; লীলায়িত হাতের ভঙ্গি, উচ্চকিত ভুরু আর কালো চোখের দূরচারী দৃষ্টি। দিদিমাকে দেখে আমার কেন জানি হাসি পেয়ে গেল, হাসি চাপতে গিয়ে গলা দিয়ে একটা চাপা শব্দ করে ফেললাম। কিন্তু আর কেউ তাতে যোগ দিল না; গ্রিগরি তর্জনী তুলে আমাকে ধমক দিল, বয়স্করা রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

হাসতে হাসতে গ্রিগরি হাঁক দিল, 'সরে এস ইভান!' বাধ্য ছেলের মতো ৎসিগানক একপাশে সরে এসে চৌকাঠে বসে পড়ল। আর তখন চমৎকার ভরাট গলায় গান ধরল ইয়েভগেনিয়া-ধাই; গান গাইতে গাইতে তার গলার কণ্ঠমণিটা উঁচু হয়ে উঠেছে। গানটা এই:

একটি দিনের নেই অবসর কাজের বোঝা ফেলি,
নিথর বসে তরুণী চলে লেসের মালা বুনি,
বিবশ হল শুকিয়ে আসা হাতের আঙুলগুলি,
লালিমা কোথায় ফ্যাকাশে মুখখানি।

দিদিমাকে দেখে মনে হচ্ছে, এটা তাঁর নাচ নয়, ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে তিনি একটি গল্প বলে চলেছেন। এই তো অতি ধীর গতি, কী যেন একটা চিন্তা প্রকাশ পায়। শরীরটা এদিক-ওদিক দোলে। উত্তোলিত বাহুভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় চোখের দৃষ্টি। পায়ে পায়ে পথ খুঁজে দ্বিধা ভরে নড়েন। মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে যান থম্‌কে। মুখটা কাঁপে আর ভুরু কুঁচকে থমথমে হয়ে ওঠে। আবার একেক সময়ে একটা দরদী ও অন্তরঙ্গ হাসিতে ঝল্‌মলিয়ে ওঠে সমস্ত অঙ্গ। সরে দাঁড়ান একপাশে, যেন কোনো একজনের জন্যে পথ করে দিচ্ছেন। মাথা নিচু করে উৎকর্ণ হয়ে শোনেন কি যেন, একটা খুশির হাসিতে ধীরে ধীরে সারা মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তারপর এক সময়ে সহসা প্রচন্ড উল্লাসে নেচে ওঠেন, একটা উদ্দাম ঘূর্ণিপাকে শরীরটা যেন আগের চেয়েও লম্বা ও ঋজু হয়ে ওঠে। উজ্জীবিত তারুণ্যের এই মুহূর্তটিতে তিনি এত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন যে কিছুতেই অন্য দিকে চোখ ফেরানো যায় না।

এদিকে সারাক্ষণ ইয়েভগেনিয়া-ধাই ফুঁ দেওয়ার মতো গেয়ে চলেছে:

রবিবারের উপাসনার পরে সময় থেকে
নাচল সে ভোরের আলো উঠল যখন ফুটে;
হায়গো পলক ফেলার আগেই সোমবার এল হেঁকে—
হৈচৈ আর ছুটির দিনটা কেমনে গেল কেটে।

নাচ শেষ হয়ে গেলে দিদিমা সামোভারের পাশে নিজের জায়গাটিতে এসে বসলেন। সবাই তাঁর নাচের প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু তিনি সকলের কথার প্রতিবাদ করলেন:

'থাক্, থাক্, হয়েছে! সত্যিকারের নাচ কাকে বলে তোমরা তা দেখনি।' মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো ঠিক করতে করতে তিনি বলে চললেন, 'তাহলে শোন তোমাদের একটি মেয়ের কথা বলি। আমি তখন থাকতাম বালাখ্‌নাতে, সেখানকারই মেয়ে। তার নাম কি, কোন্ বাড়ির মেয়ে সে, তা আমার মনে নেই। কিন্তু সে কেমন নাচে! হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হত। কিছুতেই চোখ ফেরানো যেত না—জল এসে যেত কারো কারো চোখে। শুধু চোখের দেখা, তাতেই মনে হত মন ভরে গেছে—এর চেয়ে বড়ো আনন্দ আর কিছুতে নেই। কী হিংসে করতাম মেয়েটাকে আমি পাপিনী!'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই খুব ভারিক্কি চালে বলল, 'নাচিয়ে আর গাইয়েরাই তো পৃথিবীর সেরা মানুষ।' তারপর রাজা ডেভিড সম্পর্কে একটা গান গাইতে শুরু করে দিল। ওদিকে ইয়াকভ-মামা ৎসিগানকের গলা জড়িয়ে ধরে বলছে, 'তোমার উচিত নাচ করা সরাইখানায়। তাহলে দেখবে, তোমার নাচ দেখবার জন্যে সবাই ভিড় করে আসবে!'

ৎসিগানক নালিশ জানায়, 'আমি গান গাইতে চাই। ভগবান যদি আমাকে গান গাইবার গলা দিতেন তাহলে সারা দিন সারা রাত শুধু গানই গাইতাম। দশটি বছর শুধু গানই গাইতাম আমি। গাইয়ে হবার জন্যে যদি আমাকে মঠের বাবাজী হয়েও থাকতে হয় তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

সবাই ভদ্‌কা খাচ্ছে, বিশেষ করে গ্রিগরি। দিদিমা গ্রিগরিকে গ্লাসের পর গ্লাস মদ ঢেলে দিচ্ছেন আর বার বার সাবধান করছেন, 'দেখো বাবা, বেশি খেও না যেন, একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে।'

গ্রিগরি গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, 'হলে হব — তাতে আর কি। দুনিয়াটাকে যথেষ্ট দেখে নিয়েছি, আর দেখার দরকার নেই।'

মদ খেয়ে গ্রিগরির নেশা হয় না। তবে আরো বেশি কথা বলতে শুরু করে। ভদ্‌কা টানছে আর অনবরত আমার সঙ্গে কথা বলে চলেছে — বলছে আমার বাবার কথা।

'বড়ো দরাজ দিল ছিল হে! আর আমার ছিল প্রাণের বন্ধু মাক্সিম সাভাতেয়েভিচ!'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দিদিমাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, 'আহা অনাথ বাছা রে!'

এসব কথা আমি সাগ্রহে শুনি আর উত্তেজনায় দম বন্ধ করে টান হয়ে বসে থাকি। একটা শান্ত বিষণ্ণতায় আবহাওয়া নিরন্ধ্র ও ভারী হয়ে ওঠে। বিষণ্ণতা ও আনন্দ একই সঙ্গে বাসা বাঁধে মানুষের মনে; একটি থেকে অপরটিকে কিছুতেই আলাদা করা যায় না। আর কখন যে একটির জায়গায় অপরটি এসে জুড়ে বসে তার হদিশ পাওয়া যায় না।

একদিন ইয়াকভ-মামার মদের নেশাটা তখনো ভালো করে চাপেনি, হঠাৎ সে গায়ের জামাটা ফালা ফালা করে ছিঁড়তে শুরু করে, মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আর সাদাটে গোঁফ ধরে টান দেয়, নাকে আর ঝুলে-পড়া ঠোঁটে খাম্‌চি কাটে — আর জলভরা চোখে ককিয়ে ওঠে:

'কেন? কেন এমন হয়?'

নিজের গালে, কপালে, বুকে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে:

'আমি একটা হতভাগা, কাপুরুষ, আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না... নরকেও স্থান হবে না আমার!'

'আহ-হা, ঠিক কথা, ঠিক তাই!' ভারী গলায় সায় দেয় গ্রিগরি।

আমার দিদিমা বলেন, 'ইয়াকভ, এবার একটু থাম্ বাছা তুই! ভগবান জানেন আমাদের কী শেখাতে হবে।' বলতে বলতে ছেলের হাতটা চেপে ধরেন; মদের নেশায় তাঁর অবস্থাও ঠিক স্বাভাবিক নেই।

মদ খেতে পেলে দিদিমার রূপ আরও খুলে যায়। হাসি-হাসি কালো চোখদুটো থেকে উষ্ণ আলোর ধারা ঝরে পড়ে সবার ওপরে, রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে দুই গালে, রুমাল নেড়ে নেড়ে হাওয়া খান আর জড়ানো গলায় সুর করে করে বলতে থাকেন:

'প্রভু, মঙ্গলময়, তোমার জগতে সবই কেমন চমৎকার! সবই কী ভালো!'

প্রাণের অন্তস্তল থেকে কথাটা বেরিয়ে আসে। আর এই হচ্ছে তাঁর সমস্ত জীবনের মূলমন্ত্র।

আমার বেপরোয়া প্রকৃতির মামাটিকে কাঁদতে ও হা-হুতাশ করতে দেখে সত্যিই অবাক হই। একদিন দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়াকভ-মামা এভাবে কাঁদে কেন আর কেনই বা এভাবে কপাল চাপড়ায়।

আমার প্রশ্ন শুনে যে সুরে দিদিমা জবাব দিলেন সেটা ঠিক তাঁর স্বাভাবিক সুর নয়; যেন তিনি একটু বিরক্ত হয়েছেন এমনি অনিচ্ছুক ভাবে বললেন, 'সব কথাই তোর জানা চাই দেখছি! কোনো সবুর সয় না— এসব ব্যাপারে নাক গলাবার ঢের সময় পড়ে আছে!'

একথা শুনে আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। কারখানায় গিয়ে ইভানকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। কিন্তু সেও জবাব দিতে চায় না, কারিগরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে শুধু নিঃশব্দে হাসে, আর আমাকে ঠেলে কারখানা থেকে বার করে দেয়।

বলে, 'বাস্, আর একটি কথাও নয়! এক্ষুণি যদি বেরিয়ে না যাও তো ধরে রঙের গামলায় চুবিয়ে দেব। তখন দেখবে, সারা গায়ে কেমন রঙদার সবুজ ফুটে বেরোয়।'

কারিগর একটা নিচু থ্যাব্ড়া উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে গামলা তৈরি করা হয়েছে উনুনটার ওপরে। মস্ত একটা কালো লাঠি দিয়ে

সে একটি গামলার ভিতরটা নাড়াচাড়া করছিল। মাঝে মাঝে সেই লাঠি তুলে ধরে আর তাকিয়ে থাকে তার থেকে ঝরে পড়া রঙিন জলের দিকে। উনুনে গনগনে আঁচ — আর তার আভা এসে পড়েছে কারিগরের চামড়ার এপ্রনে; পাদ্রীদের আলখাল্লার মতো চিত্রবিচিত্র সেই এপ্রন। গামলাগুলিতে রঙগোলা জল চিড়বিড় শব্দে বুদ্‌বুদ তুলে ফুটছে আর একটা ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। সেই গন্ধ দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বাইরের শীতার্ত উঠোনে।

লাল-লাল টস্‌টসে দুটি চোখ তুলে চশমার ফাঁক দিয়ে কারিগর তাকাল আমার দিকে, তারপর ইভানের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'চোখ নেই নাকি? দেখছ না উনুনে কাঠ দিতে হবে?'

কাঠ আনবার জন্যে ৎসিগানক ছুটে বেরিয়ে গেল। আর তখন লাল চন্দন-রঙের একটা বস্তার উপরে বসে গ্রিগরি ডাকল আমাকে।

'এদিকে শুনে যাও তো হে।' বলল সে।

আমাকে কোলের ওপরে বসাল; তার সিল্‌কের মতো ফুরফুরে আর নরম দাড়ির ছোঁয়া লাগছে আমার গালে। তারপর আমি তার মুখে যে-কথাগুলো শুনলাম তা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

'তোমার মামা পিটোতে পিটোতে তার বৌকে মেরে ফেলেছে। আর এখন তার বিবেক কোনো শান্তি পায় না। সব কথাই তোমার জেনে রাখা ভালো, বুঝেছ? আর হ্যাঁ, একটু চোখ খোলা রেখে চলাফেরা কোরো বাপু, নইলে কপালে দুঃখ আছে।'

দিদিমার মতো গ্রিগরির সঙ্গেও সহজেই কথা বলা যায় কিন্তু তার কথাগুলো শুনে গা শির-শির করে ওঠে। কালো চশমার ফাঁক দিয়ে যখন তাকায় সে, তখন মনে হয় যেন শরীরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

তেমনি শান্ত নির্বিকার গলায় সে বলে চলল, 'কেমন করে পিটোতে পিটোতে বৌটাকে মেরেই ফেলল? ব্যাপারটা হত এই রকম — বৌয়ের সঙ্গে শুতে গিয়ে করত কি, বৌকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে জড়াতো — তারপর কিল, চড়, ঘুষি, লাথি। এমনি চলত রাতের পর রাত। শেষ পর্যন্ত মরেই গেল বৌটা। জিজ্ঞেস করো, এত মারপিট কেন বাপু? তা সে নিজেই বলতে পারত না।'

এক বোঝা কাঠ নিয়ে ঢুকল ইভান, তারপর আগুনের সামনে বসে

হাত গরম করতে লাগল। কিন্তু গ্রিগরি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আগের কথার জের টেনেই বলে যেতে লাগল:

'কেন মারপিট করত জান? হয়ত মনে মনে বুঝত যে "বৌয়ের সঙ্গে ও টেক্কা দিতে পারবে না, তাই বৌয়ের ওপর ওর ছিল হিংসে। একটা কথা কি জান দাদু, কাশিরিনরা কোনো ভালো কিছু সহ্য করতে পারে না। ভালো কিছু দেখলেই ওদের হিংসে। কিন্তু সেই ভালোটুকু দেখে যে নিজেরা শিখতে পারবে তা নয়, তাই সেই ভালোটুকুর যাতে কোনো চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে সেই ব্যবস্থা করবে। তোমার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমার বাবার এ-বাড়িতে থাকতে কী হাল হয়েছিল। দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলে সবই জানতে পারবে। দিদিমা তোমার কাছে কিছু ঢাকবেন না। তোমার দিদিমা হচ্ছেন সত্যিকার খাঁটি মানুষ, ছলচাতুরী তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না, ছলচাতুরী বুঝতেও চান না। ঋষিতুল্য মানুষ তিনি। অবশ্য মাঝে মাঝে মদ খান বটে, নস্যি নিতেও ভালোবাসেন — তা হোক্। তুমি দাদু কক্ষণো তোমার দিদিমার কাছছাড়াটি হয়ো না যেন...'

গ্রিগরি আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। বিমূঢ় ও আতঙ্কিত হয়ে আমি উঠোনে চলে এলাম। অলিন্দে যাবার আগেই ভানিয়া এসে আমার নাগাল ধরল এবং আমার মাথার ওপর হাত রেখে কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ওকে তুমি ভয় কোরো না যেন — ভারি ভালো লোকটি। সোজাসুজি চোখ তুলে ওর চোখের দিকে তাকাবে — এইটুকুই ও চায়, এমনি ধরনের লোককেই ও পছন্দ করে।'

সমস্ত কিছু বড়ো অদ্ভুতভাবে উল্‌টেপাল্‌টে যাচ্ছে। অন্য কোনো ধরনের জীবনের সঙ্গে আমার এতদিন পরিচয় ছিল না। তবুও অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ে, আমার বাবা ও মা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবন কাটিয়েছেন। তাঁদের কথাবার্তা ও আমোদপ্রমোদের ধরন ছিল অন্য রকম। দুজনে পাশাপাশি বসেছেন, পাশাপাশি চলেছেন — তার মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল না। সন্ধ্যার সময়ে জানলার ধারে বসে দুজনে প্রাণখুলে হাসতেন আর মনের আনন্দে গান গাইতেন। সেই গান আর হাসি শুনে জানলার নিচে লোক জড়ো হয়ে যেত। আমার মনে আছে, জানলার নিচে দাঁড়িয়ে যারা মাথা উঁচু করে তাকিয়ে থাকত তাদের দেখে কেন জানি অদ্ভুত একটা ধারণা আসত আমার মনে। মনে হত যেন খাওয়াদাওয়ার পরে কার এঁটো বাসনপত্র। আর এখানে ঠিক উল্‌টো ব্যাপার। এখানে মানুষ কদাচিৎ হাসে; আর যদিও বা হাসে, তা

অতি রহস্যময়, তার অর্থ বোঝা সর্বদা যায় না। সারাক্ষণ গালিগালাজ, হুমকি, শাসানি, ফিসফাস। বাচ্চারা চুপচাপ থাকে, তাদের দিকে কারও নজর নেই। আর বৃষ্টির সময়ে ধুলোর মতো তাদেরও মারতে মারতে মিশিয়ে ফেলা হয় মাটির সঙ্গে। এই বাড়ির সঙ্গে আমি কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না। চারদিককার এই জীবন হাজারটা সুচের মতো অনবরত আমাকে বিঁধছে। আমি সবকিছুকে সন্দেহের চোখে দেখছি আর চোখ-কান খাড়া করে সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি সবকিছু।

ইভানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেড়ে চলল। সূর্যোদয় থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত আমার দিদিমা সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং সারাটি দিন আমার কাটে ৎসিগানকের পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করে। যখনই আমার দাদামশাই আমাকে উত্তম-মধ্যম দিতে শুরু করেন তখনই রীতিমত ৎসিগানক নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে চলে এবং পরদিন নিজের ফুলে-ওঠা আঙুলগুলো আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে নালিশ জানায়, 'দূর দূর! তোমাকে আর কোনোদিন আমি বাঁচাতে চেষ্টা করব না। দেখ তো, আমার কী অবস্থা হয়েছে! এই কিন্তু শেষবার বলে রাখলাম। পরের বার থেকে যা কপালে আছে তোমাকেই ভুগতে হবে!'

কিন্তু দেখা যায়, পরের বারেও আমার প্রাপ্য শাস্তি সে অনর্থক হাত পেতে নিচ্ছে।

'কী, বলেছিলে না যে তুমি আর এর মধ্যে নেই?'

'কথা আর কাজ তো এক জিনিস নয় — কখন যে আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি নিজেই টের পাইনি।'

কিছুদিনের মধ্যেই ৎসিগানক সম্পর্কে আরও কিছু খবর আমি জানতে পারলাম। শুনে ওর প্রতি আমার আগ্রহ ও আনুগত্য আরও বেড়ে গেল।

প্রতি শুক্রবার ৎসিগানক বাজারে যায় সপ্তাহের খাবার কিনে আনবার জন্যে। কটা-লালরঙের ঘোড়া শারাপকে জুড়ে দেওয়া হয় চওড়া স্লেজগাড়িটার সঙ্গে (শারাপটা অত্যন্ত ধূর্ত ও বেয়াড়া জাতের ঘোড়া, মিষ্টি খুবই পছন্দ করে — আমার দিদিমার ভারি আদরের)। মস্ত একটা টুপি মাথায় দেয় ৎসিগানক, খাটো ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরে, কোমরে শক্ত করে আঁটে সবুজ রঙের উড়ুনী। কোনো কোনো বার বাজারে গিয়ে অনেক দেরি হয় ফিরতে। আর তখন ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করে সবাই, বারবার জানলার

কাছে যায়, তুষারঢাকা জানলার শার্সিতে ভাপ দিয়ে একটু সাফ করে নেয় আর তাকিয়ে দেখে রাস্তার দিকে।

'কী, আসছে?'

'দেখতে পাচ্ছি না তো।'

দুশ্চিন্তাটা আমার দিদিমারই সবচেয়ে বেশি। স্বামী আর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'পোড়া কপাল আমার! তোমাদের জন্যেই এই ভালো মানুষটা আর ভালো ঘোড়াটা মরবে! নির্লজ্জ বেহায়ার দল! তোমাদের কি বিবেক বলেও কিছু নেই? কেন রে বাপু, নিজেদের যা আছে তা নিয়েই খুশি থাকলেই হয়! বোকা গুষ্টি! হ্যাংলার দল! দেখ না, এজন্যে ভগবানের কী শাস্তি তোমাদের পেতে হয়!'

দাদামশাই চোখ কুঁচকিয়ে বিড়বিড় করে বলেন:

'আচ্ছা, আচ্ছা, আর পাঠাব না... এই শেষবার...'

কোনো কোনো বার দুপুর গড়িয়ে যাবার পরে ৎসিগানক ফিরে আসে। উঠোনে গাড়ি ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন আমার দাদামশাই ও মামারা। পিছনে পিছনে আসেন দিদিমা। ফোঁস ফোঁস করে নস্যি টানেন আর ভল্লুকের মতো এগিয়ে আসেন। যে জন্যেই হোক্, এই সময়টিতে তাঁর মধ্যে কেমন যেন একটু এলোমেলো ভাব দেখা যায়। বাচ্চারা ছুট্‌তে ছুট্‌তে বেরিয়ে আসে আর তারপরে শুরু হয় মহা উল্লাসে স্লেজগাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামান। জিনিসপত্রে ঠাসা গাড়িটা; আস্ত আস্ত শুয়োরছানা, মাছ আর ছোটবড়ো নানা আকারের মাংসের টুকরো।

ছোট কুতকুতে চোখ দিয়ে স্লেজগাড়িটাকে ভালো করে দেখে নিয়ে দাদামশাই জিজ্ঞেস করেন, 'কী হে, যা যা আনতে বলেছিলাম এনেছ তো সব?'

আনন্দে উঠোনের চারদিকে লাফাতে লাফাতে ইভান জবাব দেয়, 'সব এনেছি, একটি জিনিসও বাদ পড়েনি।' হাতদুটোকে গরম করবার জন্যে দস্তানা না খুলেই হাতে হাত ঘষে সশব্দে।

দাদামশাই কড়া স্বরে ধমক দিয়ে ওঠেন, 'দস্তানা শুদ্ধ হাত ওভাবে ঘষাঘষি কোরো না - দস্তানা কিনতে পয়সা লাগে। খুচরা কিছু ফেরৎ এনেছ?'

'না।'

আমার দাদামশাই স্লেজগাড়িটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখেন আর বড়বিড় করে বলেন:

'কী হে, মনে হচ্ছে একেবারে বাজার উজাড় করে জিনিসপত্র এনেছ?

তাই তো, এত কেনাকাটার সবই কি আর বিনে পয়সায় হয়েছে? তোমায় বলে রাখছি বাপু, আর যেন এমনটি না হয়।'

মুখটাকে বিকৃত করে তিনি তাড়াতাড়ি চলে যান।

তারপর মামারা স্লেজগাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়ায়। আহ্লাদে আটখানা হয়ে মুরগী, মাছ, মেটে, বাছুরের ঠ্যাঙ আর বড়ো বড়ো মাংসের টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর কোনটার কত ওজন হতে পারে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলে।

'বাঃ, চমৎকার বাছাই করেছ কিন্তু — বেশ, বেশ!' তারিফ করার ভঙ্গিতে চিৎকার করে আর শিস দেয়।

বিশেষ করে আমার মামা মিখাইল একেবারে গদ্‌গদ হয়ে ওঠে। স্লেজগাড়িটার চারপাশে এমন লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে যেন তার পায়ে স্প্রিং লাগানো আছে। কাঠঠোক্‌রার মতো নাক উঁচু করে শুঁকে শুঁকে দেখে, ঠোঁট চাটে, আবেশে মুদে আসে তার চঞ্চল চোখদুটো। লোকটির শুকনো চেহারা তার বাপের মতো, তবে লম্বায় বেশি আর পোড়া কাঠের মতো কালো।

'বুড়ো কত দিয়েছিল বাজার করতে?'

'পাঁচ রুবল।'

'আর এখানে যা জিনিস আছে তার দাম অন্তত পনেরো রুবল। কত খরচ হয়েছে তোমার?'

'চার রুবল দশ কোপেক।'

'তার মানে নব্বই কোপেক্ ফেরৎ নিয়ে এসেছ -- নয় কি? শুনছ তো ইয়াকভ? এও একটা পয়সা আয়ের রাস্তা।'

ইয়াকভ-মামা আল্‌তোভাবে হাসে। শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকে আর শীতল ঝাপ্‌সা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্‌পিট করে।

'তবে আর কী ভানিয়া, আমাদের এক গেলাশ করে খাইয়ে দাও হে!' টেনে টেনে বলে সে।

দিদিমা ঘোড়ার লাগাম খুলে দিয়েছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন: 'লক্ষ্মী সোনা আমার, বাছা আমার! ওহো, বুঝেছি, একটু খেলা করতে ইচ্ছে হচ্ছে? তাতে আর কী হয়েছে — যাও, যাও, একটু খেলা করে এসো... একটু-আধটু খেলা করলে কোনো দোষ নেই, ওতে ভগবান রাগ করেন না...'

তখন সেই প্রকাণ্ড শারাপ ঘোড়া তার কেশর দুলিয়ে সাদা সাদা দাঁত বার করে দিদিমার ঘাড়ের ওপর আঁচড় দিতে থাকে। টেনে খুলে ফেলে দিদিমার মাথার সিল্‌কের রুমাল। খুশিভরা চোখে তাকিয়ে থাকে দিদিমার চোখের দিকে। আর মৃদু হ্রেষা তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের পাতা থেকে তুষারের কণাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে।

'এক টুকরো রুটি খেতে চাও বুঝি যাদুমণি?' দিদিমা জিজ্ঞেস করেন আর তারপর চমৎকার ভাবে নুন মাখিয়ে মস্ত একটা রুটির টুকরো গুঁজে দেন ঘোড়ার দাঁতের ফাঁকে। ঘোড়াটা রুটি চিবোয় আর ওর মুখের তলায় এপ্রনটা মেলে ধরে তিনি তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন।

বাচ্চা ঘোড়ার মতোই তড়বড়িয়ে লাফাতে লাফাতে এসে ৎসিগানক বলে, 'ঠাক্‌মা, কী সুন্দর ঘোড়াটা — না? আর কী বুদ্ধিমান!'

'যা, যা, সরে যা এখান থেকে, খবরদার, এখানে ঘুরঘুর করবি না!' মাটিতে সজোরে পা ফেলে দিদিমা চিৎকার করে ওঠেন, 'তোকে বলেছি না যে হাটের দিনগুলোতে তোকে পছন্দ করি না!'

পরে দিদিমা আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন। ৎসিগানক বাজারে গিয়ে যতোটা না কেনাকাটি করে তার চেয়ে বেশি করে চুরি।

রুষ্ট স্বরে তিনি বললেন, 'এই ধর্, তোর দাদামশাই যদি ওকে পাঁচ রুবলের নোট দেয় তাহলে ও করে কি, তিন রুবল খরচ করে আর দশ রুবল দামের জিনিস চুরি করে আনে। হতচ্ছাড়াটার যেন চুরি করতে ভালো লাগে। প্রথমবার হয়তো এমনি করেছিল — হাতসাফাইটা ঠিকমতো লেগে যায়... ফিরে আসার পরে সবার কী নাচানাচি আর সে কী গুণকীর্তন... তারপর থেকে এটা ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর তোর দাদামশাইয়ের ব্যাপারটা কি জানিস, সারা জীবনটা এমন অভাব-অনটনের মধ্যে কাটিয়েছে যে এখন এই বুড়ো বয়সে হাত দিয়ে কিছুতেই পয়সা গলতে চায় না। ছেলেমেয়েদের চেয়েও পয়সার ওপরে টান বেশি। কাজেই, পয়সা খরচ করতে হয় না অথচ জিনিস আসে এতে তোর দাদামশাই ভারি খুশি। আর মিখাইল ও ইয়াকভের কথা যদি বলিস...'

হাত নেড়ে দুজনকেই তিনি বাতিল করে দেন, তারপর নস্যির কৌটোর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলে চলেন·

'আলিওশা, এ যেন এক অন্ধ বুড়ীর হাতে বোনা একটা ফিতে — আগাগোড়া জট্ পাকিয়ে গেছে, আসল নক্‌শাটা কিছুতেই চেনা যায় না।

তবু জানো, একবার যদি ভানিয়া চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে মারতে মারতে ওকে খুন করে ফেলবে ...'

আবার কিছুক্ষণের জন্যে দিদিমা চুপ করে থাকেন, তারপর আবার যখন তিনি কথা বলেন তখন তাঁর গলার স্বর অত্যন্ত নরম ও মৃদু শোনায়:

'ভাব দিকিনি আলিওশা, নীতিকথা তো অনেক কিছু আছে কিন্তু নীতিবোধের বেলা সব ফাঁকা ...'

পরের দিন আমি ৎসিগানকের হাতেপায়ে ধরে তাকে চুরি করতে বারণ করলাম। 'যদি ধরা পড়ো তো মারতে মারতে তোমাকে খুন করে ফেলবে ...'

'ইস্, আমাকে ধরতে পারলে তো — আমি ঠিক পালিয়ে যাব ... আমি তো চালাক আর আমার ঘোড়াও যথেষ্ট জোরে ছুট্‌তে পারে।' বলে ও হেসে উঠল; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসিটাকে গ্রাস করল একটা গম্ভীর বিমর্ষ ভাব, বলল, 'তুমি কি ভাবছ আমি জানি না, আমি জানি, চুরি করাটা অন্যায়, বিপজ্জনক। তবু আমি চুরি করি শুধু এতেই আমি খুশি। ভাবছ, চুরি করে যা দু-একটা পয়সা আমার হাতে আসে তা আমি জমাই — কক্ষণো না। এই যে তোমার মামারা আছে, তারাই সপ্তাহখানেকের মধ্যে সব পয়সা উড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমার তাতে বয়েই গেছে — ওরা যতো পারে নিক। খাবার ভাবনা আমার নেই।'

হঠাৎ সে আমাকে দু-হাতে তুলে নিয়ে অল্প একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল:

'তোমার শরীরটা রোগা আর হাল্‌কা বটে কিন্তু হাড়গুলো শক্ত আছে। দেখবে, বড়ো হলে তাগ্‌ড়া জোয়ান চেহারা হবে তোমার। আমি একটা কথা বলছি শোন, গীটার বাজাতে শেখো — ইয়াকভ-মামাকে বলো তোমাকে শেখাতে — ঠাট্টা নয়! অবশ্য আরেকটু বড়োসড়ো না হলে সুবিধে হয় না, তুমি একেবারেই বাচ্চা! কিন্তু বাচ্চা হলেও সত্যিকার মেজাজ তোমার আছে! আচ্ছা, তোমার ঐ দাদামশাই লোকটিকে তুমি পছন্দ করো না? কী বলো?'

'জানি না।'

'এক ঠাক্‌মা ছাড়া এই কাশিরিনদের মধ্যে একটা লোকও ভালো নেই। লোকগুলোকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না — শয়তানের ঝাড় সবকটা!'

'আর আমি?'

'তুমি তো আর কাশিরিন নও। তুমি হচ্ছ পেশ্‌কভ। পেশ্‌কভরা হচ্ছে একেবারে আলাদা একটা পরিবার, আলাদা একটা বংশ।'

হঠাৎ সে আমাকে দু-হাতে চেপে ধরে প্রায় কান্নার মতো ফুঁপিয়ে উঠল:

'হা ঈশ্বর, আমার যদি গান গাইবার ক্ষমতা থাকত! তাহলে গান গেয়ে লোকের মন গলিয়ে দিতে পারতাম! আচ্ছা ভাই, চলি। এবার কাজ শুরু করতে হবে।'

আমাকে সে মেঝের ওপরে নামিয়ে দিল। তারপর একমুঠো ছোট পেরেক মুখে পুরে লেগে গেল কাজে। মস্ত একটা চৌকো তক্তার ওপরে ভিজে কালো একটা কাপড়ের টুকরো পেরেক ঠুকে ঠুকে লাগিয়ে চলল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ৎসিগানক মারা যায়।

ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে: গেটের কাছে উঠোনের বেড়ার গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে মস্ত এক ওক্‌কাঠের ক্রুশ রাখা ছিল। ক্রুশের তলার দিকটা থামের মতো ভারী ও মোটা। অনেক দিন ধরে পড়ে ছিল ওটা। আমার মনে আছে, আমি যখন প্রথম এ-বাড়িতে আসি তখন থেকেই এই ক্রুশটা দেখছি। তখন অবশ্য নতুন অবস্থায় ছিল, গায়ের হল্‌দে রঙ চটে যায়নি -- আর এখন সারা শরৎকালের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে রঙটা কাল্‌চে হয়ে গেছে আর রোদজলে পোক্ত করা ওক্‌কাঠের ঝাঁঝালো একটা গন্ধ ছাড়ছে আমাদের ময়লা, নানা হাবিজাবি জিনিসে ঠাসা উঠোনটায় — তর মধ্যে ক্রুশটা ভারি অসুবিধের সৃষ্টি করত।

ক্রুশটা কিনে এনেছিল ইয়াকভ-মামা, বৌয়ের কবরের ওপরে বসাবার জন্যে। প্রতিজ্ঞা করেছিল বৌয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে নিজেই এই ক্রুশটা সমাধিস্থানে বয়ে নিয়ে যাবে।

শীতকালের শুরুতে এক শনিবারে পড়ল এই মৃত্যুবার্ষিকী। দিনটা ঠান্ডা, ঝোড়ো বাতাস বইছে, বাড়ির ছাদের ওপর থেকে বরফের টুকরো উড়ে উড়ে আসছে বাতাসে। মৃতের জন্য উপাসনায় যোগ দিতে আমার দিদিমা ও দাদামশাই তিনজন নাতিনাতনীকে নিয়ে গাড়িতে চেপে আগেই চলে গেলেন সমাধিস্থানের দিকে। অন্যেরা এসে দাঁড়াল উঠোনে। আমি যেন কী একটা দোষ করেছিলাম। তার শাস্তি হিসেবে আমাকে বাড়িতে আটক থাকতে হল।

আমার মামারা সবাই একই ধরনের কালো কোট পরেছে। দুজনে মিলে ধরাধরি করে ক্রুশটার একটা হাতল চাপিয়ে দিল ইয়াকভের ঘাড়ে, অন্য

হাতলটা মিখাইলের ঘাড়ে। গ্রিগরি এবং আর একজন অপরিচিত লোক অতি কষ্টে ক্রুশের থামের মতো তলাটা তুলে চাপিয়ে দিল ৎসিগানকের চওড়া কাঁধের ওপরে। ভারী জিনিসটা কাঁধে নিয়ে ৎসিগানক একবার টলে উঠল, তারপর দুটো পা ফাঁক করে কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে।

'কী হে, পারবে তো?' জিজ্ঞেস করল গ্রিগরি।

'কী জানি, বুঝতে পারছি না। ভয়ানক ভারী।'

মিখাইল-মামা ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফটক খোল্ না চোখ-কানা হতভাগা!'

ইয়াকভ-মামা বলল, 'কী লজ্জার কথা ভানিয়া তুমি বলছ — ভারী! অথচ আমরা তো দুজনেই তোমার তুলনায় রোগাপট্‌কা — আমরা তো নিয়ে চলেছি।'

কিন্তু গ্রিগরি ফটক খুলে দিয়ে ইভানের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় ধমক দিল: 'খবরদার বলছি! বেশি গায়ের জোর ফলাতে যেও না। ভগবান তোমাদের সহায় হোন!'

'ওরে টেকো বুড়ো শয়তান!' রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে উঠল মিখাইল-মামা।

উঠোনে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা সবাই হেসে উঠল আর জোরে জোরে কথা বলতে লাগল। ক্রুশটা যে এতদিনে নড়ানো গেছে এতে যেন সবাই খুশি।

আমার হাত ধরে আমাকে কারখানার ভিতরে নিয়ে এল গ্রিগরি। বলল, 'তোমার দাদামশাই হয়তো আজ আর তোমাকে মারবে না — মনে হচ্ছে আজকে তার মেজাজটা খুবই ভালো আছে।'

এক রাশি পশম জড়ো করা ছিল, তার ওপরে আমাকে বসিয়ে দিয়ে সযত্নে আমার সারা গায়ে পশম জড়িয়ে সে কথা বলতে লাগল। গামলা থেকে ফুটন্ত রঙের ধোঁয়া উঠছে আর সেই ধোঁয়া শুঁকতে শুঁকতে চিন্তাভারগ্রস্ত সুরে পুরনো দিনের কথা বলছে সে:

'জান দাদু, তোমার দাদামশাইকে আমি সাঁইত্রিশ বছর ধরে চিনি। এই ব্যবসা যখন শুরু হয় তখনো আমি ছিলাম আর এখন এই ব্যবসার শেষ অবস্থা — এখনো আমি আছি। সেকালে আমরা দুজনে ছিলাম সত্যিকার বন্ধু — একসঙ্গে ব্যবসা করতাম, একসঙ্গে ব্যবসার কথা ভাবতাম। ভারি চালাক-চতুর লোক তোমার এই দাদামশাই। দেখছ তো, সে এখানকার কর্তা

হয়ে বসেছে — আমার সাধ্য কি তার সঙ্গে টেক্কা দিই। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে কে টেক্কা দেবে বলো? ভগবানের কাছে মানুষ তো শিশু — তিনি যদি শুধু একটু হাসেন, তাহলেও সেই হাসির সামনে পৃথিবীর সেরা বুদ্ধিমান লোক বোকার মতো দাঁড়িয়ে চোখ পিট্‌পিট করবে। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার তোমার কিছু জানা নেই — কিন্তু আমার মনে হয়, সব কথা তোমার জেনে রাখাই ভালো। বাপ-মরা ছেলেকে জীবনে অনেক ঝক্কি পোয়াতে হয় কিনা। তোমার বাবা মাক্সিম সাভাতেয়েভিচ ছিল সত্যিকার খাঁটি মানুষ; সবকিছু সে বুঝত। আর এইজন্যেই তোমার দাদামশাই তাকে পছন্দ করত না, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি...'

দরদী কথাগুলো শুনতে আমার ভারি ভালো লাগছিল — এইভাবে চুপ করে বসে থাকা আর এই ধরনের কথা শোনা, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা — উনুনের ওপরে লাল্‌চে সোনালী আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে, গামলাগুলো থেকে দুধালো সাদা মেঘের মতো উঠছে বাষ্প আর ঢালু ছাদের তক্তার গায়ে আটকে গিয়ে জমে জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। তক্তার ফাঁকগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফিতের মতো টুকরো টুকরো নীল আকাশ। বাতাস শান্ত হয়েছে, ঝক্‌ঝক করছে সূর্যের আলো, উঠোনের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন ঘষা কাঁচের টুক্‌রো ছড়ানো রয়েছে চারদিকে। রাস্তা থেকে শোনা যায় বরফকে ভেঙে গুঁড়িয়ে স্লেজগাড়ি টেনে নিয়ে যাবার শব্দ। চারদিকের বাড়ির চিম্‌নি থেকে নীল ধোঁয়া উঠছে পাক খেয়ে খেয়ে। বরফের ওপরে হাল্‌কা ছায়া পড়ে, দ্রুত সরে তারা — তারাও যেন বলছে তাদের গল্প।

ঢ্যাঙা রোগা চেহারা গ্রিগরির। লম্বা দাড়ি, প্রকাণ্ড কান। মাথায় টুপি নেই, খোলা মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গামলায় ফুটন্ত রঙ মেশাচ্ছে। দেখে মনে হয়, এক পরদুঃখকাতর যাদুকর দাঁড়িয়ে আছে সামনে আর আমাকে নানা উপদেশ দিচ্ছে:

'সোজাসুজি তাকাবে মানুষের চোখের দিকে। তাহলে দেখো, কুকুর তাড়া করলে সেও পালাবে ল্যাজ গুটিয়ে...'

তার চশমার পুরু কাঁচদুটো নাকের ওপর চেপে বসেছে, ফলে দিদিমার নাকের মতো তার নাকও নীল হয়ে উঠেছে।

'কী হল?' হঠাৎ থেমে গিয়ে সে বলল। এক মুহূর্ত শুনল কান পেতে, তারপর পা দিয়ে বন্ধ করে দিল চুল্লির দরজা আর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট্‌ল উঠোনের দিকে। পিছন পিছন আমিও ছুটলাম।

রান্নাঘরের মেঝের মাঝে বরাবর ৎসিগানক চিত হয়ে পড়ে আছে। জানলা দিয়ে গলে দুটো চওড়া আলোর ধারা এসেছে ঘরের মধ্যে — একটা পড়েছে তার মাথায় আর বুকে, আরেকটা পায়ে। অদ্ভুত একটা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার কপাল থেকে, উৎক্ষিপ্ত ভুরু, বাঁকা চোখদুটো তাকিয়ে আছে ঝুলকালিমাখা ছাদের দিকে। কালো ঠোঁটদুটো কুণ্ঠিত হয়ে উঠেছে আর লাল্‌চে ফেনা বেরিয়ে আসছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে রক্ত, রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে তার কাঁধের ওপর দিয়ে মেঝে পর্যন্ত আর প্রচুর রক্ত ধারা বেরিয়ে আসছে তার শরীরের তলা থেকে। দুম্‌ড়ে বেঁকে আছে পা দুটো; তার পরনের ঢিলে প্যাণ্ট লেপ্‌টে রয়েছে মেঝের সঙ্গে, বোঝা যায় প্যাণ্টটা ভিজে সপ্‌সপে। ঘরের মেঝে বালি দিয়ে ঘষে ঘষে এমন পরিষ্কার করা হয়েছিল যে এখন চক্‌চক করছে সূর্যের আলোয়। রক্তের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে; সূর্যের আলোর সীমানাটুকু পার হবার সময় ঝলসে উঠে, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

ৎসিগানকের শরীরটা স্থির, অনড়। শুধু নড়ছে তার প্রসারিত হাতের আঙ্গুলগুলো। মেঝেটাকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে সেই আঙ্গুলগুলো -- রঙের ছোপ-লাগা নখগুলোর ওপরে সূর্যের আলো পড়ে চক্‌চক করছে।

ইয়েভগেনিয়া-ধাই ইভানের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তার হাতে একটা মোমবাতি দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ইভান মোমবাতিটাকে ধরতে পারছে না। মোমবাতিটা তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে রক্তে নিভে গেল তার শিখা। ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার তুলে নিল মোমবাতিটা, ভালো করে রক্ত মুছে নিয়ে আবার চেষ্টা করল ইভানের অস্থির আঙ্গুলগুলোর মুঠোয় ধরিয়ে দিতে। চাপা উত্তেজনার একটা ঢেউ রান্নাঘরের ভিতরে ফুঁসে উঠছে যেন। এই ঢেউ প্রচণ্ড একটা ঝাপ্‌টার মতো আমাকে দরজার চৌকাঠ থেকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল কিন্তু আমি দরজার বাজু শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে রইলাম।

'মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে।' মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেমন যেন নিষ্প্রাণ গলায় ইয়াকভ-মামা বলল। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ভাঁজ পড়েছে মুখের চারদিকে। নিষ্প্রাণ চোখদুটো অনবরত পিট্‌পিট করছে।

'ও পড়ে গেল আর ক্রুশটা পড়ল ওর পিঠের ওপরে — একেবারে পিষে ফেলেছে। আমরা যদি সময়মত ক্রুশ ছেড়ে দিয়ে সরে না দাঁড়াতাম তাহলে আমাদেরও পিষে ফেলত।'

ভাঙা-ভাঙা গলায় গ্রিগরি বলে উঠল, 'ওকে পিষে মারবার জন্যে তোমরা ইচ্ছে করে এ কাজ করেছ!'

'বললেই হল আর কি! আমরা কী করে...'

'হ্যাঁ, তোমরা!'

রক্ত গড়াচ্ছে। দরজার কাছে ইতিমধ্যেই একটা পুকুর হয়ে গেছে রক্তের। টক্‌টকে লাল রঙটা কাল্‌চে হয়ে গেছে আর ফুলে ফুলে উঠছে যেন। ৎসিগানক তেমনিভাবে পড়ে আছে, ঘুমের ঘোরে থাকার মতো ঘড়ঘড় শব্দ বেরচ্ছে গলা থেকে আর মুখ থেকে লাল্‌চে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। শরীরটা গলে যাচ্ছে একটু একটু করে, চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, মেঝের সঙ্গে মিলিয়ে যাবার মতো এক হয়ে যাচ্ছে।

চাপা স্বরে ইয়াকভ-মামা বলল, 'বাবাকে ডেকে আনবার জন্যে মিখাইল ঘোড়ায় চেপে গির্জায় গেছে। আর আমি একটা দ্রশ্‌কিতে ওকে চাপিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে এসেছি... বাবাঃ, ক্রুশের তলার দিকটা নিলেই হয়েছিল আর কি... তাহলে এতক্ষণে আমারও ওই অবস্থা হত...'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার মোমবাতিটা নিয়ে ৎসিগানকের হাতের মধ্যে দিল। ফোঁটা ফোঁটা মোম আর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল ৎসিগানকের হাতের তালুতে।

কর্কশ রুক্ষ স্বরে গ্রিগরি চেঁচিয়ে উঠল, 'মোমবাতিটা মাথার কাছে মেঝের ওপর রাখ না — বোকা কোথাকার!'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে!'

'মাথা থেকে টুপিটা খুলে নাও!'

ইয়েভগেনিয়া-ধাই টুপিটা টেনে খুলে ফেলল। ইভানের মাথাটা একটা ফাঁপা আওয়াজ তুলে ঠক্‌ করে ঠেকল মেঝের সঙ্গে। এবার মাথাটা একপাশে হেলে গেছে আর গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। সারা মুখ দিয়ে নয়, মুখের একটা কোণ থেকে। শংকায় ভরা দীর্ঘ কাল ধরে এইভাবে রক্ত বেরিয়ে এল। প্রথম দিকে প্রতি মুহূর্তে আমি আশা করছিলাম, এই বুঝি ৎসিগানক খানিকটা বিশ্রামের পরেই উঠে বসবে, তারপর বিরক্তির সঙ্গে থুথু ফেলে স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলে উঠবে:

'ফুঃ! কী বিশ্রী গরম!'

রবিবারে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার পরে ঘুম ভাঙলে ঠিক এই কথাগুলোই শোনা যেত তার মুখে। কিন্তু আজ উঠে বসা দূরে থাকুক ক্রমশ যেন গলে

গলে যাচ্ছে সে। সূর্য আরো নিচে নেমে গেছে। আর সূর্যের আলোর ফলকদুটি ছোট হতে হতে এখন জানলার কপাটে একটুখানি লেগে আছে মাত্র। কালো হয়ে গেছে ৎসিগানকের মুখ আর হাতদুটো, হাতের আঙ্গুল এখন আর নড়ছে না, মুখ থেকে এতক্ষণ যে ফেনা বেরিয়ে আসছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে। তিনটে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মাথার তিনদিকে, সেই সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার মাথার একরাশ নীল্‌চে কালো চুল, নাকের সরু ডগা আর রক্তমাখা দাঁত। তার কালো-হয়ে-আসা গালদুটির ওপরে সেই আলোর টুক্‌রো টুক্‌রো ছোপ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ইয়েভগেনিয়া-ধাই তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদতে লাগল।

'সোনা আমার, মাণিক আমার! তোর হাসি মুখ দেখে সব দুঃখ ভুলে যেতাম রে!' গুমরে গুমরে বলল সে।

ঘরের ভিতরটা যেমন ঠান্ডা তেমনি ভয়ানক। আমি গুড়ি মেরে টেবিলের তলায় লুকিয়ে রইলাম। তার পরেই ভারী ভারী পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন দাদামশাই; পরনে লোমের কোট। দাদামশাইয়ের পিছনে লোমওলা কলার লাগানো লম্বা কোট গায়ে দিদিমা। তাঁদের পিছনে পিছনে এল মিখাইল-মামা, বাড়ির বাচ্চারা এবং আরো অনেক অপরিচিত লোক।

দাদামশাই গায়ের কোটটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠলেন:

'হারামজাদার দল! এমন ছেলেটাকে মেরে ফেললি! বছর পাঁচেক পরে সোনা দিয়ে ওজন করলেও যে ওর দাম দেওয়া যেত না!'

মেঝের উপরে জামা-কাপড়ে আমার সামনের দিকটা আড়াল হয়ে গিয়েছিল, ইভানকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। গুড়ি মেরে আরো ভালো জায়গায় যেতে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম একেবারে আমার দাদামশাইয়ের সামনে। লাথি মেরে আমাকে একপাশে সরিয়ে দিলেন তিনি, তারপর ক্ষুদে লাল হাতের মুঠি মামাদের দিকে শাসানির ভঙ্গিতে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তোরা মানুষ নস, নেকড়ের দল!'

একটা বেঞ্চির ওপরে ধপ্‌ করে বসে পড়লেন। দু-হাতে আঁকড়ে ধরলেন বেঞ্চিটা। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ইনিয়ে-বিনিয়ে, ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন:

'জানি... ওকে যে তোরা দু-চোখে দেখতে পারতিস না তা আমি জানি... কী বোকা ছেলে তুই, ভানিয়া!.. আমাদের কপাল ভেঙেছে... এখন

আর কিচ্ছু করবার নেই... কিচ্ছুটি নয়... ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে, লাগাম পচে গেছে... ভগবান আমাদের কী অবস্থাই করেছেন গিন্নী গত কয়েক বছর ধরেই... কথা বলছ না যে তুমি?'

দিদিমা ঘরে ঢুকেই ইভানের পাশে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছিলেন। হাত স্পর্শ করে দেখছিলেন ইভানের মুখে, মাথায়, বুকে; নিশ্বাস ফেলছিলেন চোখের ওপরে, হাতদুটো তুলে নিয়ে ঘষছিলেন নিজের হাতে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন মোমবাতিগুলো। এবার তিনি ভারী পায়ে উঠে দাঁড়ালেন — প্রকাণ্ড কালো একটি মূর্তি, পরনের কালো পোশাক জ্বলজ্বল করছে, কালো চোখ ঘুরপাক খেতে খেতে ফুঁসে উঠছে। চাপা স্বরে বললেন:

'দূর হ, দূর হ সব হারামজাদারা!'

শুধু দাদামশাই ঘরের মধ্যে রইলেন, আর সবাই সরে এল।

বিনা সমারোহে, বিনা সোরগোলে সমাধিস্থ করা হল ৎসিগানককে।

চার

মোটা একটা কম্বল আষ্টেপৃষ্ঠে কয়েক পাক জড়িয়ে চওড়া একটা বিছানায় আমি শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে শুনছি, দিদিমা প্রার্থনা করছেন। হাঁটু মুড়ে বসেছেন তিনি, একহাতে বুক চেপে ধরেছেন, অপর হাতে মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছেন।

জানলার বাইরে ভীষণ শীত। জানলার শার্সির ওপরে বরফ জমে জমে বিচিত্র নক্‌শা তৈরি হয়েছে — সেই নক্‌শার ভিতর দিয়ে সবুজ চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে ঘরের মধ্যে। সেই অদ্ভুত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সদয় মুখখানি, উদ্‌গত নাক আর কালো চোখ। দিদিমার চুলগুলো রেশমি রুমাল দিয়ে বাঁধা আর সেটি ঠিক ধাতুর মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। পরনের কালো পোশাক কাঁধের কাছ থেকে ঢেউ তুলে ভাঁজের পর ভাঁজে নেমে এসেছে আর স্তূপ হয়ে রয়েছে মেঝের ওপরে।

প্রার্থনা শেষ হলে তিনি পোশাক বদলাতেন, কোণের একটা ট্রাঙ্কের ওপরে সযত্নে ভাঁজ করে রাখতেন পোশাকগুলো, তারপর এসে দাঁড়াতেন বিছানার কাছে। গভীর ঘুমের ভান করে আমি পড়ে থাকতাম।

নরম সুরে তিনি বলতেন, 'ওরে মিট্‌মিটে ক্ষুদে শয়তান, ভাবছিস মট্‌কা মেরে পড়ে থাকলেই আমি বিশ্বাস করব যে তুই ঘুমিয়েছিস! তুমি তো

ঘুমোওনি সোনামণি, যাদু আমার! এবার দেখি, কম্বলের একটা দিক ছেড়ে দাও তো।'

এর পরে কী ঘটবে তা আমি জানতাম। তাই কিছুতেই আর হাসি চাপতে পারতাম না। দিদিমা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'এই তো ধরা পড়ে গেছিস! বুড়ী দিদিমার সঙ্গে খেলা হচ্ছে — না?'

কম্বলের একটা প্রান্ত তিনি চেপে ধরলেন। তারপর এমন কৌশলে এমন একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিলেন যে ঘুরপাক খেতে খেতে শাঁ করে শূন্যে উঠে গেলাম, আবাব তেমনি ঘুরপাক খেতে খেতে ধুপ্‌ করে এসে পড়লাম নরম বিছানার ওপরে। দিদিমা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

'কী গো ক্ষুদে বিচ্ছু! হল কী? কুটুস্‌ করে মশা কামড়ে দিয়ে গেছে বুঝি?'

মাঝে মাঝে তিনি এত বেশিক্ষণ প্রার্থনা করেন যে আমি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ি এবং কখন তিনি শুতে আসেন টের পাই না।

যেদিন কোনো গোলমাল বা ঝগড়া-মারামারি হয়, বিশেষ করে সেই দিনেই দিদিমার প্রার্থনাও চলে অনেকক্ষণ ধরে। আর প্রার্থনা করতে বসে ভগবানের কাছে দিদিমা সংসারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা যে-ভাবে বলে যান তা শুনতেও ভারি মজা লাগে। মস্ত পাহাড়ের মতো শরীরটি নিয়ে তিনি তো বসেন প্রার্থনা করতে. প্রথমদিকে তাঁর উচ্চারণটা হয় দ্রুত ও দুর্বোধ্য, শেষদিকে তা হয়ে ওঠে গভীর বিক্ষোভের প্রকাশ।

'প্রভু, তুমি তো নিজেও জানো যে সব লোকই নিজের অবস্থা ভালো করতে চায়। এতে আর অন্যায় কী আছে বলো? এই ধরো মিখাইলের কথা। ছেলেদের মধ্যে ও-ই তো সবচেয়ে বড়ো, তাই ওর একটু স্থিতি হওয়া দরকার; কাজেই ওকেই থাকতে দেওয়া উচিত শহরে। এখন ওকে যদি নদীর ওপারে নতুন জায়গায় গিয়ে থাকতে বলা হয় — সেটা কি অন্যায় নয়? বলো তুমি? ওই নতুন জায়গাটা কেমন হবে তা কেউ জানে না, কেউ গিয়ে এর আগে থেকে দেখেওনি। কিন্তু তবুও কর্তার ইচ্ছে, ইয়াকভ এ-বাড়িতে থাকুক। ইয়াকভকেই তার বেশি পছন্দ। আচ্ছা, বাপ হয়ে এক ছেলেকে বেশি ভালোবাসা, আরেক ছেলেকে কম ভালোবাসা — এটা কি ঠিক কাজ? কিন্তু বুড়ো কর্তা তো একগুঁয়ে মানুষ। প্রভু, কর্তার মাথায় তুমি দু-এক ফোঁটা বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিও — কর্তা যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে।'

বড়ো বড়ো জ্বলজ্বলে চোখ মেলে তিনি তাকিয়ে থাকেন কালো কালো আইকনগুলোর দিকে, তারপর আবার তাঁর ভগবানকে উপদেশ দিয়ে চলেন:

'প্রভু, কর্তাকে তুমি বরং খুব একটা ভালো স্বপ্ন দিও। স্বপ্ন দেখে যেন বুঝতে পারে, কি ভাবে নিজের ছেলেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করতে হয়।'

বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে নিচু হয়ে প্রণাম করেন। এত নিচু হন যে তাঁর মোটা ভুরুটা ঠেকে যায় গালিচায়। তারপর আবার সোজা হয়ে বসে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে বলতে থাকেন:

'আচ্ছা, ভারভারাকে যদি দু-এক ফোঁটা আনন্দ দাও তাহলে কি কোনো ক্ষতি হয়? বলো তো প্রভু, ভারভারা কি এমন কোনো অপরাধ করেছে যে তোমার কৃপা থেকে বঞ্চিত হবে? ওর কপালটাই বা সবার চেয়ে মন্দ হবে কেন? দেখো তো প্রভু, শক্তসমর্থ শরীর, অল্প বয়স, আর এই মেয়ে এত দুঃখ ভোগ করবে — এমন কথা কে কবে শুনেছে বলো? তারপর প্রভু, গ্রিগরির কথাও তোমাকে একটু মনে করিয়ে দিই — ওর চোখদুটির কথা ভুলো না যেন — চোখদুটির অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। ও যদি অন্ধ হয়ে যায় তাহলে ওর গতি কি হবে বলো? দোরে দোরে ভিক্ষে করতে হবে যে! সেটা কি ভালো? যে নাকি সারা জীবন ধরে বুড়োকর্তার এই ব্যবসায়ে শরীরপাত করল — তার কি এমনটি হওয়া উচিত?.. কিন্তু বুড়ো ওকে একটি কাণাকড়িও সাহায্য করবে না... আহ্-হা প্রভু, প্রভু!..'

বহুক্ষণ তিনি নির্বাক হয়ে থাকেন, মাথাটা বুকের ওপর নেমে আসে, হাতদুটো ঝুলতে থাকে — মনে হয় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

'আর কী বলব?' আত্মগতভাবে ভুরুদুটো কুঁচকে অবশেষে তিনি আবার বলতে থাকেন, 'তোমার ওপর যাদের বিশ্বাস অটুট আছে, তাদের সবাইকে কৃপা কোরো। আর আমার দোষ নিও না প্রভু, আমাকে, বোকা বুড়ীকে ক্ষমা কোরো... তোমাকে আর কি বলব প্রভু, তুমি তো ভালো করেই জান আমি যে পাপ করি তা এই বোকা মনের জন্যেই, অসৎ অন্তঃকরণের জন্যে নয়।'

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলেন:

'প্রভু, প্রভু আমার, তোমার তো অজানা কিছুই নেই। হে পরম পিতা, তুমি তো সবই বোঝ!' শেষ কথাগুলো বলবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে ভালোবাসা ও আত্মতৃপ্তির সুর ফুটে ওঠে।

দিদিমার এই একান্ত আপন ও একান্ত নিকট ভগবানকে আমার ভারি পছন্দ হয়। প্রায়ই আমি বলি:

'আমাকে ভগবানের কথা বলো দিদিমা।'

ভগবানের কথা বলবার একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে দিদিমার, কখনো তার ব্যতিক্রম হয় না। সোজা হয়ে বসেন, চোখ বুজে খুব নরম সুরে কথা বলতে থাকেন, অদ্ভুতভাবে টেনে টেনে উচ্চারণ করেন শব্দগুলো। হঠাৎ উঠে তিনি রুমাল জড়ান মাথায় আর তারপর আবার বসে আপন মনে কল্পনার জাল বুনে চলেন। শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তিনি বলেন:

'শোন্ তবে। চারদিকে স্বর্গের উদ্যান, মাঝখানে একটা পাহাড়, আর সেই পাহাড়ের ওপরে রুপোলী লিণ্ডেনগাছের তলায় নীলকান্তমণির সিংহাসনে বসে আছেন প্রভু। সেই গাছগুলিতে সারা বছর ধরে ফল ফলে — জানিস তো স্বর্গে শীত-গ্রীষ্ম বলে কিছু নেই। বছরের প্রথম দিনটি থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত সেখানে ফুল ফোটে। স্বর্গের সাধুরা সেই ফুল দেখে খুশি হন। আর প্রভু সর্বক্ষণই কত কত দেবদূতদের পাঠাচ্ছেন — তুষারকণার মতো ঘন — কিংবা এক ঝাঁক মৌমাছির মতো — কিংবা এক ঝাঁক শাদা পায়রার মতো যারা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসে আবার স্বর্গে ফিরে যায় — ফিরে গিয়ে প্রভুর কাছে আমাদের কথা বলে। জানিস তো, আমাদের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা দেবদূত আছে— তোর আছে, আমার আছে, তোর দাদামশাইয়ের আছে — সবার প্রতিই প্রভুর সমান ভাব। যেমন ধর্, তোর কথা বলবার জন্যে যে দেবদূত আছে সে গিয়ে প্রভুর কাছে বলল, "লেক্সেই তার দাদামশাইকে জিভ বার করে দেখিয়েছে।" এই শুনে প্রভু আদেশ দিলেন, "তাহলে দাদামশাই লেক্সেইকে ধরে আচ্ছা করে মার দিক।" এই নিয়মই সব ব্যাপারে চলে আসছে — যেমন কর্ম তেমনি ফল। কেউ বা দুঃখ পায়, কেউ বা আনন্দ। আর সে কী মধুর দৃশ্য ভাব্ তো দেখি, দেবদূতেরা ডানা কাঁপিয়ে প্রভুর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আনন্দে গাইছে: "প্রভুর গুণ গাই! জয় হোক্ হে প্রভু!" সেই গান শুনে প্রভু হাসেন আর সেই হাসি যেন বলে: বেশ তো গান গেয়ে যদি তোমরা আনন্দ পাও বাছারা তবে গাও।'

দিদিমাও হাসছেন, মাথা দুলিয়ে, যেন তিনি নিজেই এ সব দেখেছেন।

'আচ্ছা দিদিমা, তুমি কি এ সব নিজের চোখে দেখেছ?'

আত্মগত সুরে দিদিমা জবাব দেন: 'না, দেখিনি, তবে আমি জানি।'

দিদিমা যখন প্রভুর কথা এবং স্বর্গ ও দেবদূতের কথা বলতে শুরু করেন, তখন তিনি যেন অনেক ছোট হয়ে যান, ভারি একটা কোমলতা আসে তাঁর মধ্যে, বয়সের ছাপগুলি মুছে যায় তাঁর মুখ থেকে, আর ভিজে চোখদুটি থেকে ভারি উষ্ণ ও অন্তরঙ্গ একটি আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তাঁর মাথার চিকন রেশমের মতো বেণীটা আমার গলায় জড়াতে জড়াতে চুপটি করে বসে আমি দিদিমার মুখের বিরতিহীন গল্প শুনে চলি এবং শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যাই। যতো শুনি কিছুতেই যেন আর আশ মেটে না।

'আমাদের মতো এই মরজগতের জীবরা প্রভুর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না — তাকালে তাদের চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। শুধু সাধুপুরুষরাই প্রভুর দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারে। কিন্তু দেবদূতদের আমি দেখেছি। মনে যদি কোনো পাপ বা গ্লানি না থাকে তাহলে দেবদূতদের দেখা যায়। একবার মনে আছে, গির্জায় ভোরের উপাসনা হচ্ছে আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি — এমন সময় আমি দুজন দেবদূতকে দেখতে পেলাম। ঠিক যেন সাদা কুয়াশার মতো — দৃষ্টিকে আটকায় না। আলো দিয়ে গড়া তাদের শরীর, ডানা নেমে এসেছে মেঝে পর্যন্ত, ঝল্‌মলে লেস বা সূক্ষ্ম কাপড় যেন বাতাসে উড়ছে। দেবদূতরা বেদীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে বুড়ো পাদরি ইলিয়াকে সাহায্য করছে। পাদরি যখন প্রার্থনা করবার জন্যে শীর্ণ হাত দুখানি তুল্‌ছেন — অমনি তারা আসে সেখানে, কনুইয়ের কাছে ধরে পাদরির হাত দু-খানি তুলে ধরে থাকে। পাদরি খুবই বুড়ো হয়েছেন, চোখে একেবারেই দেখতে পান না — চলতে ফিরতে যেখানে-সেখানে ধাক্কা খান। কিছুদিন পরেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। দেবদূত দুজনকে দেখে আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে আনন্দে আমার মূর্ছা যাবার উপক্রম, বুকের ভিতরটা এমন টন্‌টন করে ওঠে যে মনে হচ্ছিল বুকটা যেন ফেটে যাবে। চোখ দিয়ে ধারাস্রোতের মতো জল গড়াচ্ছিল। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আনন্দ যে প্রভুর স্বর্গে — আর আলিওশা, সোনা আমার, মানিক আমার, কী আনন্দ যে এই পৃথিবীতে, সবকিছু কতো ভালো, কতো সুন্দর!'

'দিদিমা, আমাদের এই বাড়িতেও সবকিছু ভালো?'

বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিদিমা জবাব দেন, 'হ্যাঁ বাবা, এই বাড়িতেও। পুণ্যময়ী মেরীমাতার জয় হোক্।'

দিদিমার এই কথাগুলো আমার কেমন গোলমেলে লাগে। আমাদের এই বাড়িতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে ক্রমশই বেশি চিড় ধরছে — এই বাড়িতেও সবকিছু ভালো একথা বিশ্বাস করা শক্ত।

আমার মনে আছে, মিখাইল-মামার ঘরের খোলা দরজার সামনে দিয়ে যেতে যেতে একবার আমি নাতালিয়া-মামীকে এক লহমার জন্যে দেখেছিলাম। নাতালিয়া-মামীর পরনে আগাগোড়া সাদা পোশাক, বুকের ওপরে দুই হাত চেপে ধরে নাতালিয়া-মামী ঘরের চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে আর মর্মান্তিক ও চাপা স্বরে চিৎকার করে চলেছে: 'ভগবান, আমাকে তুমি তোমার ওখানে নিয়ে যাও... এ-বাড়ি থেকে মুক্তি দাও আমাকে...'

ভগবানেব কাছে নাতালিয়া-মামীর এই প্রার্থনা আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেনি। তেমনি দুর্বোধ্য ঠেকেনি গ্রিগরির কতগুলো কথা যখন সে বিড়বিড় করে বলেছে:

'যেদিন একেবারে অন্ধ হয়ে যাব সেদিন বেরোব ভিক্ষে করতে... এখানকার এই জীবনের চেয়ে ভিক্ষে করাও ঢের ভালো!'

আমার ভারি ইচ্ছে করত, গ্রিগরি একটু তাড়াতাড়ি অন্ধ হয়ে যাক্। তাহলে গ্রিগরি যখন ভিক্ষে করতে বেরোবে, আমি তার হাত ধরে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাব — ভিক্ষে করতে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব দুজনে। আমার এই পরিকল্পনার কথা গ্রিগরির কাছে বলেছিলাম। শুনে দাড়ির আড়ালে মুচকে হেসে গ্রিগরি বলেছিল:

'ঠিক আছে দাদু, আমরা দুজনেই যাব একসঙ্গে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সমস্ত লোককে শুনিয়ে আমি চিৎকার করে বলব: '"রঙের কারখানার মালিক ভাসিলি কাশিরিনের নাতিকে, তার মেয়ের ছেলেকে নিয়ে আমি চলেছি। ভিক্ষে দাও গো তোমরা!" ভারি মজা হবে, না?'

মাঝে মাঝে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, নাতালিয়া-মামীর ঠোঁটদুটো ফুলে উঠেছে আর তার হলদেটে মুখের উপর কালশিটের দাগ।

'মামা কি মামীমাকে মারধোর করে?' দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'করে বৈকি। তবে লুকিয়ে। মিখাইলটা একটা জানোয়ার! তোর দাদামশাই এসব পছন্দ করে না, তাই হতভাগা রাত্রিবেলা বৌকে ধরে মারে। মিখাইলটা জানোয়ার আর ওর বৌটা হয়েছে এমনি মিন্‌মিনে।'

তারপর নিজের কথায় মত্ত হয়ে নিজেই বলে চলেন:

'তাও তো আজকাল আর তেমন মারধোর নেই — আগেকার কালে যা ছিল! আজকাল আর কি আছে — দাঁতে বা কানে দু-একটা ঘুষি বা দু-এক মিনিট বেণী ধরে টানা। কিন্তু সেকালে এমন দু-এক মিনিটের ব্যাপারই ছিল না। মারধোর চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা! মনে আছে, একবার তোর দাদামশাই আমাকে সারাদিন ধরে মেরেছিল। সেটা ছিল ইস্টার-সপ্তাহের প্রথম দিন। দুপুরের উপাসনার সময় থেকে মারতে শুরু করেছিল, আর থামল সূর্য ডুবে যাবার পরে। এক-একবার মারে — একটু বিশ্রাম নেয় — আবার শুরু করে। ঘোড়ার চাবুক বা হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়েই মারে।'

'কী দোষ করেছিলে তুমি?'

'তা এখন আমার মনে নেই। একবার তো মারতে মারতে একেবারে আধ-মরা করে ফেলেছিল -- তারপর পাঁচ দিন ধরে কিছু খেতে দেয়নি। কি-ভাবে যে বেঁচেছিলাম, তা আর তোকে কি বলব। কিংবা ধর্ না, সেই সেবারের কথা...'

এসব কথা শুনে আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি, মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়। চেহারার দিক থেকে দাদামশাইয়ের চেয়ে আমার দিদিমা অন্তত দ্বিগুণ। সুতরাং দাদামশাই কি করে যে দিদিমাকে মারপিট করতে পারতেন — তা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

'আচ্ছা দিদিমা, তোমার চেয়ে দাদামশাইয়ের গায়ের জোর কি এত বেশি?'

'গায়ের জোর বেশি নয়, কিন্তু বয়সে বড়ো। তাছাড়া, আমার স্বামী। ভগবান তো এই স্বামীর ওপরেই আমার ভার সঁপে দিয়েছেন। স্বামীকে মেনে চলতে হবে, এ তো ভগবানেরই আদেশ রে।'

দিদিমা যখন দেবতা ও সাধুদের আইকনগুলোকে ঝাড়পোঁছ করতে শুরু করেন তখন বসে বসে তাঁর হাতের কাজ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। আমাদের বাড়ির এই আইকনগুলোর নানারকমের বহু অলঙ্কার আছে। আইকনগুলোর গায়ে বসানো আছে রুপোর চুম্‌কি, বহুমূল্য পাথর ও মণিমুক্তো। তাঁর নিপুণ আঙ্গুল দিয়ে দিদিমা আইকনগুলোকে নাড়া-চাড়া করেন। এক-একটা আইকন হাতে নেন আর বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে তাতে চুমু খেয়ে হেসে আপন মনে বলেন: 'কী মিষ্টি মুখ! কী সুন্দর মূর্তি!'

'ইস্, কী ধুলোকালিই না পড়েছে! পরম মঙ্গলময়ী মেরীমাতা, হে শক্তি-রূপিণী, হে আনন্দদায়িনী! আলিওশা, সোনা আমার, মানিক আমার,

দ্যাখ্, দ্যাখ্, কী সুন্দর আইকন! এত ছোট ছোট মূর্তিগুলি — কিন্তু তবুও প্রত্যেকেই আলাদা-আলাদা দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে তাকিয়ে দ্যাখ্, এটার নাম—"বারোটি পুণ্য দিন"—ফিওদরোভস্কির পুণ্যময়ী মাতা দাঁড়িয়ে আছেন মাঝখানে—দয়া ও কারুণ্যের কি অপরূপ চিত্র! আর এই আইকনটির নাম—"ওগো মা, আমার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদো না .."'

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার বোকা মামাতো বোন কাতেরিনা যেমন অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তার পুতুল নিয়ে খেলা করে, আমার দিদিমাও ঠিক তাই করেন সাধুসন্তদের আইকনগুলো নিয়ে।

মাঝে মাঝে দিদিমা শয়তানদেরও দেখেন: শয়তানরা থাকে কখনো বা একা, কখনো বা দল বেঁধে।

'তাহলে শোন কী হয়েছিল। এক রাতে লেন্‌ৎ'এ। রুদল্‌ফ্'এর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি—চাঁদের আলোয় চারদিক ঝক্‌ঝক করছে—এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, ছাদের ওপরে চিমনির কাছে কালো অন্ধকার মতো কি যেন একটা জিনিস ঠ্যাঙ ফাঁক করে বসে আছে। কালো কুৎকুতে মস্ত চেহারা জিনিসটার, দুটো শিং ঢুকিয়ে দিয়েছে চিম্‌নির মধ্যে। ফোঁস ফোঁস করে নাক টানছে আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শব্দ করছে। ছাদের ওপরে আছড়ে আছড়ে পড়ছে লেজটা। আমি তার দিকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বলে উঠলাম, "যীশু খৃীষ্টের পুনরভ্যুত্থান হোক, আর নিপাত যাক তাঁর শত্রুরা।" সঙ্গে সঙ্গেই সেটা আর্ত চিৎকার করে উঠল আর ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ে উঠোনের মধ্যে, অদৃশ্য হয়ে গেল! মনে হয়, রুদলফরা উপোসের দিনে খাবার জন্যে কী যেন নিষিদ্ধ রান্না করছিল—এই রান্নার গন্ধেই ওটা এসেছে, লোলুপ নয়নে...'

শয়তান ডিগ্‌বাজি খেয়ে উঠোনের মধ্যে পড়ছে ভাবতেই আমার হাসি পায়। দিদিমাও সঙ্গে সঙ্গে হাসেন।

'বাচ্চারা যেমন দুষ্টুমি করতে ভালোবাসে, এই শয়তানগুলোও তাই। একদিন রাত্রে কাজ শেষ করতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় মাঝরাত্রে আমি স্নানের ঘরে কতগুলি জামাকাপড় ধুয়ে নিচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ চুল্লির দোরটা ঠাস্ করে খুলে গেল আর পিলপিল করে বেরিয়ে এল শয়তানের দল। কোনোটা লাল, কোনোটা সবুজ, কোনোটা কালো—কোনোটা ছোট, কোনোটা আরো ছোট— যেন এক ঝাঁক আরশোলা। আমি দরজার দিকে ছুটে যেতে চাইলাম কিন্তু শয়তানগুলো কিছুতেই যেতে দিল না। তখন আমার সে কী অবস্থা! আমার নড়বার-চড়বার উপায় নেই — আর হাজার-

হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি শয়তান আমাকে ঘিরে আছে। সারা স্নানের ঘরটা জুড়ে আছে তারা — পায়ের তলায় রয়েছে, পায়ের ওপরে রয়েছে — আঁচড়িয়ে, কামড়িয়ে, হুল ফুটিয়ে এমন একটা অবস্থা করে তোলে যে হাত তুলে ক্রুশচিহ্ন এঁকে শয়তানগুলোকে ভাগিয়ে দেব — সেই অবস্থাও আমার আর থাকে না। বেড়ালছানার মতো শয়তানগুলোর সারা গায়ে লোম, তেমনি তুলতুলে আর উষ্ণ ছোঁয়া। পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘুরপাক খায়, ডিগবাজি দিয়ে লাফিয়ে পড়ে, ইঁদুরের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁত বার করে, ছোট ছোট সবুজ চোখে পিট্‌পিট করে তাকায়, মাথার শিং গজাবার জায়গায় এইটুকু এইটুকু মুণ্ডি — সেই মুণ্ডি সমেত মাথা ঝাঁকিয়ে গুঁতো মারে, শুয়োরের ছানার মতো লেজগুলোকে পাকায়... সে যে কী অবস্থা আমার সে এক ভগবানই জানেন! প্রায় জ্ঞান হারাই আর কি। তারপর যখন আবার পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখলাম, মোমবাতিটা পুড়ে-পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে গেছে, কাপড়কাচার জল একেবারে ঠাণ্ডা, কাপড়কাচার আরক মেঝের ওপর ছিটিয়ে পড়েছে। মনে মনে ভাবলাম, চুলোয় যা তোরা, চুলোয় যা, মর্‌ মর্‌, নরকের কীট!'

আমি চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করি। চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে। ছাইরঙা পাথরের তৈরি চুল্লিটার মুখ খুলে গেছে আর হুড়মুড় করে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা রঙের ক্ষুদে-শয়তান বেরিয়ে আসছে, সারা গায়ে লোম। স্নানের ঘরটা ভর্তি হয়ে গেছে এই ক্ষুদে-শয়তানদের ভিড়ে আর হাওয়ার ঝাপ্‌টা লাগছে মোমবাতির শিখায়, লাল লাল জিভ বার করছে তারা। দৃশ্যটা যেমনি মজার তেমনি আতঙ্কজনক। দিদিমা নিঃশব্দে মাথা নাড়তে থাকেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার কতগুলি নতুন চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে ঝল্‌সে ওঠে এবং তিনি বলতে থাকেন:

'শয়তানে পাওয়া লোককেও আমি দেখেছি। এই ঘটনাও ঘটে রাত্রিবেলা, সময়টা ছিল শীতকাল আর একটা তুষার-ঝড় প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে। দ্যুকভ নালা আমি পার হচ্ছি। সেখানে পুকুরের ওপর জমে-থাকা বরফের একটা ফাঁক দিয়ে ইয়াকভ ও মিখাইলো তোর বাপকে ঠেলে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। সে কথা তোকে আরেকদিন বলেছি। সেদিনও সেই একই জায়গায় আমি চলেছি। রাস্তা ধরে নিচে নেমে নালাটার একেবারে নিচে এসে দাঁড়িয়েছি — এমন সময় সে কী প্রচণ্ড শিস আর আর্ত চিৎকার, সে আর কী বলব! চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি তিনটে কালো ঘোড়া একটা

গাড়ি টেনে আনছে; প্রচণ্ড গতিতে নেমে আসছে আমার দিকেই। গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে আসছে একটা গোলগাল শয়তান, মাথায় ছুঁচলো লাল টুপি, চালকের আসনে দাঁড়িয়ে উঠে দু-হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে আছে। ঘোড়াগুলোকে সে চালাচ্ছে লাগাম দিয়ে নয়, শেকল দিয়ে। লোকে পেরতে পারে না, অথচ তারা ঘোড়া নিয়ে নালা পেরিয়ে সোজা ছোটাল পুকুরের দিকে, পিছনে উড়তে লাগল বরফের মেঘ। গাড়ির মধ্যে যারা ছিল, সেগুলোও শয়তান; শিস দিচ্ছে, চিৎকার করছে, টুপি নাড়ছে। এইভাবে সাত-সাতটা ত্রয়কা আমার পাশ দিয়ে দমকলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। ঘোড়াগুলো সব কুচকুচে কালো, আর তারা সবাই মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো ছেলে। এই লোকগুলোর ওপরেই তো শয়তান ভর করে। শয়তানরা ঠিক খুঁজে খুঁজে বার করে এই লোকগুলোকে, এই লোকগুলোকে তাড়িয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায় হুল্লোড় করবার জন্যে। আমার মনে হচ্ছিল, শয়তানের বিয়ে হচ্ছে আর সেই দৃশ্য আমি চোখের সামনে দেখছি...'

এমন একটা সরল ও প্রত্যয়ের সুরে দিদিমা কথা বলেন যে তাঁর কথা কিছুতেই অবিশ্বাস করা চলে না।

আরো অনেক গল্প দিদিমা বলেন আর সেই গল্পগুলির মধ্যে সেরা ছিল ওই কবিতা যাতে বলা হয়েছে কি করে মেরীমাতা হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন পৃথিবীর যন্ত্রণাকাতর পথ দিয়ে, কি ভাবে তিনি 'ডাকাত-রাজকুমারী' ইয়েনগালিচেভা'কে অনুরোধ জানালেন রুশদেশে লুটপাট ও ডাকাতি বন্ধ করতে; আর ঈশ্বরানুগত আলেক্সেইয়ের সম্পর্কে কবিতা, বীরযোদ্ধা ইভানের গল্প, জ্ঞানপরী ভাসিলিসা, ছাগল-পুরোহিত ও ঈশ্বরানুগৃহীত লোকটির কাহিনী, মার্ফা-পসাদ্‌নিৎসা, ডাকাত-সর্দারণী উস্তা-মেয়ে, মিশর-পাপী মারিয়া, ডাকাত-মায়ের শোকের রূপকথা। কত গল্প, রূপকথা আর ছড়া যে দিদিমা জানেন তার কোনো সংখ্যা নেই — সে এক অফুরন্ত ভাণ্ডার।

কোনো মানুষকেই তিনি ভয় করেন না। এমন কি দাদামশাইকে নয়, শয়তানকে নয়, অন্য কোনো অশুভ শক্তিকেও নয়। কিন্তু আরশোলা দেখলে তাঁর মরণ-আতঙ্ক। অনেক দূরেও যদি থাকেন তবু চোখে না দেখেও আরশোলার উপস্থিতি টের পান তিনি। মাঝে মাঝে এমন হয় যে মাঝ-রাত্রে আমাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে চাপা স্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন:

'আলিওশা, লক্ষ্মীটি, একবার উঠে দ্যাখ্‌ তো — ঘরের মধ্যে একটা

আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্মী বাবা, যীশু খ্রীষ্টের দিব্যি আরশোলাটা মেরে ফ্যাল্।'

আধো-ঘুমে উঠে আমি মোমবাতি জ্বালাই এবং হামাগুড়ি দিতে দিতে শত্রুর সন্ধানে ঘরের চারদিকে ঘোরাফেরা করি। কিন্তু প্রত্যেকবারেই যে আমার প্রচেষ্টা সফল হয় তা নয়।

'কোথায় দিদিমা, আরশোলা তো নেই।' আমি হয়তো বলি।

দিদিমা ততোক্ষণে কম্বলের মধ্যে মাথা শুদ্ধ গুঁজে দিয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে আছেন। আমার কথা শুনে কোনো রকমে মুখ দিয়ে কতগুলি শব্দ বার করেন মাত্র।

'ওরে, আমি বলছি আছে। দ্যাখ্ বাবা, ভালো করে খুঁজে দ্যাখ্। লক্ষ্মী বাবা আমার! আমি বলছি, আছে, নিশ্চয়ই আছে।'

আর শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে তাঁর কথাই ঠিক। সাধারণত আরশোলাটা খুঁজে পাওয়া যেত হয় বিছানার কাছাকাছি নয় তো তার অনেক দূরে।

'কী রে, মেরেছিস তো? এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কাজ। ভগবান তোর ভালো করবেন!' বলে তিনি মাথার ওপর থেকে লেপ সরিয়ে নেন, তাঁর সারা মুখে খুশির হাসি ফুটে ওঠে।

কিন্তু আরশোলাটা যখন কিছুতেই খুঁজে পেতাম না— তখন সে রাতের মতো তাঁর ঘুমের দফা শেষ। বেশ টের পাই, রাত্রিবেলা বিছানায় হয়তো একটু খসখস আওয়াজ হয়েছে, অমনি তাঁর সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। আর রুদ্ধ নিশ্বাসে বিড়বিড় করে তিনি বলে চলেন:

'ওই তো, দরজার কাছে... এবার ট্রাঙ্কের তলায় ঢুকেছে...'

'আচ্ছা দিদিমা, আরশোলা দেখে তুমি এত ভয় পাও কেন বলো তো?'

এ-প্রশ্নের খুব ভালো একটা জবাবও তাঁর আছে। তিনি বলেন: 'আচ্ছা বল্, আরশোলা থেকে জগতের কারও কোনো উপকার হয়? ওগুলোর কাজ হচ্ছে শুধু গুটি-গুটি এগিয়ে চলা — শুধুই গুটি-গুটি এগিয়ে চলা। কেলে শয়তান! ভগবানের সৃষ্ট এই জগতে নিকৃষ্টতম প্রাণীরও জীবনের একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। এমন যে হাজার-ঠেঙে বিছের জাত—ওগুলোকে দেখেও অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে বাড়ি স্যাঁৎসেঁতে হয়েছে। বিছানায় যদি ছারপোকা হয় তাহলে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে ঘরের দেওয়ালে ময়লা জমেছে। শরীরে যদি উকুন হয় তাহলে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে শরীরে

রোগের বীজ ঢুকেছে। কেমন, ঠিক বলিনি? কিন্তু একবার ভাব তো ওহ আরশোলাগুলোর কথা। বলতে পারিস ওগুলো কেন আছে? জগতের কোনো কাজেই যখন আসে না — তবে ওগুলো কেন বেঁচে থাকবে?'

একদিন দিদিমা নতজানু হয়ে ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করছিলেন এমন সময় দাদামশাই দরজাটা খুলে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠলেন:

'গিন্নী শুনছো, প্রভু একেবারে সাক্ষাৎদূত পাঠিয়েছেন। কারখানায় আগুন লেগেছে!'

'বলছ কি!' ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে পড়ে দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন। তারপর দুজনেই ধুপ্‌ধাপ শব্দে ছুটলেন মস্ত বৈঠকখানা ঘরের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে।

'ইয়েভগেনিয়া, আইকনগুলো নামাও! আর নাতালিয়া, তুমি ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় পরিয়ে তৈরি করে রাখ দেখি!' দিদিমার অবিচলিত উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দাদামশাই আর্ত স্বরে শুধু 'আ-আ-আ' বলে বিলাপ করে চললেন।

আমি রান্নাঘরে ছুটে এলাম। এই ঘরে উঠোনের দিকে একটা জানলা আছে। জানলাটা সোনার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। টুকরো টুকরো সোনালী আলোর এক-একটা ঝলক মেঝের ওপরে ছুটোছুটি করে লুকোচুরি খেলা শুরু করেছে যেন। ইয়াকভ-মামা রয়েছে ঘরের মধ্যে, খালি পায়ে জুতো গলিয়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে — তাকে দেখে মনে হয় আলোর ঝলকে যেন পায়ের তলাটা পুড়ে যাচ্ছে তার। দাপাচ্ছে আর চিৎকার করছে:

'এটা নিশ্চয়ই মিখাইলের কান্ড! ও-ই আগুন লাগিয়েছে! আগুন লাগিয়ে পালিয়েছে!'

'চুপ কর্ হতভাগা!' বলে দিদিমা তাকে এমন একটা ধাক্কা দিলেন যে ইয়াকভ-মামা দরজার ওপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

জানলার শার্সির ওপর তুষার জমেছে; সেই তুষারের ভিতর দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি কারখানার ছাদে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে, লক্‌লকে আগুনের শিখা আবর্তিত হচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে। শান্ত রাত্রিতে নির্ধূম লাল আগুন ফুলের মতো ফুটে রয়েছে যেন। শুধু আকাশের অনেক উঁচুতে থিতিয়ে রয়েছে এক টুকরো কালো মেঘ। কিন্তু এই কালো মেঘ ছায়াপথের

রুপোলি ধারাকে আড়াল করতে পারেনি। আগুনের শিখায় টক্‌টকে লাল হয়ে ঝল্‌সে উঠেছে বরফ। বাইরের দিক্‌কার ঘরগুলোর দেয়াল যেন কাৎ হয়ে পড়েছে আর কাঁপছে — মনে হয়, দেয়ালগুলো সরে যেতে চায় উঠোনের কোণের দিকে যেখানে প্রচণ্ড আগুন জ্বলছে। কারখানা-ঘরের চওড়া চওড়া ফাটলগুলো ফুটে উঠেছে আগুনের আলোয়, আর সেইসব ফাটল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে আগুনের লক্‌লকে দীপ্ত জিহ্বা। কারখানার ছাদের ওপরে শুক্‌নো কাঠের তক্তা লাগানো, তক্তাগুলোর ওপর দিয়ে লাল আর সোনালী ফিতের মতো আগুনের স্রোত বইছে; ছাদের ফাঁক দিয়ে উঠেছে লম্বা সরু একটা মাটির চিম্‌নি। তার চারপাশ দিয়ে পাতলা একটা ধোঁয়ার ঢেউ উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। এত দূরে জানলার শার্সির ওপরে আগুনের শব্দটা অনেক মৃদু শোনায়, রেশমি কাপড়ের খস্‌খসের মতো। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, আগুনের দ্যুতিতে অপরূপ দেখাচ্ছে কারখানাটা, ঠিক যেন গির্জার উপাসনা-বেদী। এই আশ্চর্য দৃশ্য দুর্নিবার আকর্ষণে টানে, কিছুতেই চোখ ফেরানো যায় না।

একটা ভারী ভেড়ার চামড়ার জামা আমি মাথায় গলিয়ে নিলাম। কার যেন জুতো ছিল সামনে পড়ে, সেটাই পরে দিয়ে থপ থপ করে এগিয়ে গেলাম উঠোনের দিকে, তারপর অলিন্দে এসে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতেই আমার সমস্ত চেতনা অবশ হয়ে এল — দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা, প্রচণ্ড গর্জনে কানে তালা ধরে যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে দাদামশাইয়ের, মামার আর গ্রিগরির চিৎকার। এর ওপরে দিদিমার কাণ্ড দেখে ভয়ে তটস্থ হয়ে গেলাম। দিদিমা করেছেন কি, একটা খালি বস্তা মাথায় জড়িয়েছেন, আস্তাবল থেকে একটা কাঁথা টেনে এনে জড়িয়েছেন গায়ে আর তারপর জ্বলন্ত কারখানার দিকে ছুটে চলেছেন আর চিৎকার করছেন:

'ওরে হাঁদার দল, কারখানার ভিতরে সালফিউরিক এসিড আছে যে! ওই এসিডে আগুনের ছোঁয়া লাগলে আর রক্ষে আছে? উড়িয়ে নিয়ে যাবে যে সব।'

দাদামশাই আর্ত স্বরে চিৎকার করছেন, 'গ্রিগরি... ধরো... ধরো, ওকে যেতে দিও না... কি সর্বনাশ, ধরতে পারলে না তো গ্রিগরি... দেখো, আর ফিরে আসতে হচ্ছে না!..'

কিন্তু দিদিমা ফিরে এসেছেন। সর্বাঙ্গ দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, মাথা ঝাঁকুনি

দিচ্ছেন; দু-হাতে সালফিউরিক এসিডের মস্ত একটা পাত্র, সেই পাত্রের ওজনে নুয়ে পড়েছেন একেবারে।

প্রচণ্ড কাশির দমক সামলাতে সামলাতে ভাঙা ভাঙা গলায় দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন, 'কর্তা, আস্তাবল থেকে ঘোড়াটাকে বার করে আনো... ওরে, হাঁ করে দেখছিস কি? এই কাঁথাটা টেনে খুলে নে আমার গা থেকে... দেখছিস না চারদিকে আগুন ধরে গেছে?'

কাঁথাটায় ধোঁয়া উঠছে। দিদিমার কাঁধ থেকে তাড়াতাড়ি কাঁথাটা টেনে নিল গ্রিগরি, তারপর একটা কোদাল নিয়ে প্রচণ্ডভাবে কাজে লেগে গেল। চাঁই চাঁই তুষার নিয়ে কারখানার দরজার ভিতরে আগুনের মধ্যে ফেলছে। একটা কুড়ুল হাতে নিয়ে গ্রিগরির চারদিকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে ইয়াকভ-মামা। দাদামশাই চলেছেন দিদিমার পিছনে পিছনে, গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার ছিটিয়ে দিচ্ছেন দিদিমার গায়ে। এসিডের পাত্রটা নিয়ে একটু দূরে সরে এলেন দিদিমা, বরফ দিয়ে চাপা দিলেন পাত্রটাকে, তারপর ছুটে এলেন সদর দরজা খুলে দেবার জন্যে। পাড়ার লোকেরা ছুটতে ছুটতে এসেছিল, সদর দরজা খুলে দিয়ে তাদের সকলকে কাকুতি-মিনতি করে দিদিমা বলতে লাগলেন, 'আপনারা পাড়ার লোক, আসুন আমাদের সঙ্গে আপনারাও একটু হাত লাগান। আমাদের এই গোলাঘরটা যে-করে হোক্ বাঁচাতে হবে। গোলাঘরে যদি আগুন লাগে তাহলে খড়ের গাদাতেও আগুন ছড়াবে। এই গোটা বাড়িটাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে একেবারে। তা যদি হয় তো আশেপাশের আপনাদের বাড়িগুলোও আগুন থেকে বাঁচবে না। আসুন আপনারা, সকলে হাত লাগিয়ে গোলাঘরের চালাটা আগে খুলে ফেলুন। খড়ের গাদাটাও আছে, ওটাকে কোদালে করে সরিয়ে দিন বাগানের দিকে! ওকি গ্রিগরি, শুধু মাটিতে বরফ ফেলে লাভ কি? উঁচু দিকেও খানিকটা ছুঁড়ে দাও। আর ইয়াকভ, তোর ওই ছুটোছুটি বন্ধ কর্ তো দেখি। কোদাল আর কুড়ুল নিয়ে এসে সবার হাতে হাতে দে! আসুন আপনারা, সকলে হাতে হাত লাগিয়ে পড়শীর উপযুক্ত কাজ করুন। ভগবান সহায় আছেন!'

আগুনের মতো দিদিমার দিকেও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। আগুনের লক্‌লকে শিখা দিদিমাকে যেন গ্রাস করতে চাইছে; উজ্জ্বল লাল আভায় আলোকিত হয়ে কালো একটা ছায়ার মতো দিদিমা ছুটোছুটি করছেন, সর্বত্র দেখা যাচ্ছে তাঁকে, সবদিকে তিনি চোখ রাখছেন, সবাইকে হুকুম করছেন।

খারাপ ঘোড়াটা ছুটে এসেছে উঠোনের মাঝখানে, পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাদামশাই ঘোড়ার লাগামটা ধরেছিলেন, টাল সামলাতে না পেরে ছিট্‌কে পড়লেন। আগুনের আভায় ঘোড়াটার ঘূর্ণায়মান চোখদুটো রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে আর ঝল্‌সে উঠেছে, কিছুতেই ঘোড়াটাকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। সামনের দু'পায়ে জোরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা। দাদামশাই ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

'গিন্নী ঘোড়া সামলাও!' চিৎকার করে বললেন তিনি।

দিদিমা এগিয়ে এলেন, তারপর দু-হাত প্রসারিত করে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন ঘোড়াটার সামনে। ঘোড়াটা বশ মানল; নরম সুরে দু-একবার চিঁহি ডাক ছেড়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে দু-একবার আগুনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল শেষকালে।

'ভয় কী রে?' সান্ত্বনা দেবার সুরে দিদিমা বললেন, তারপর লাগামটা হাতে নিয়ে, ঘোড়ার ঘাড়ে আদর করে চাপড় মারতে মারতে বললেন, 'এই তো আমি আছি। হ্যাঁ রে দুষ্টু পুঁচকে ইঁদুর, তোর বিপদের সময়ে আমি কাছে থাকব না, এই বুঝি ভাবিস তুই?'

দিদিমার চেয়ে আকারে তিন গুণ বড়ো সেই পুঁচকে ইঁদুর কথাগুলো শুনে অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল; যেতে যেতে দিদিমার টক্‌টকে মুখখানার দিকে তাকিয়ে চিঁহি-চিঁহি করে ডাক ছাড়ল কয়েক বার।

ওদিকে ইয়েভগেনিয়া-ধাই বাচ্চাদের একসঙ্গে জড়ো করে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসেছে। কাপড়-জড়ানো বাচ্চাগুলোকে দেখাচ্ছে পোঁটলার মতো; পোঁটলাগুলোর ভিতর থেকে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন বেরিয়ে আসছে।

দাদামশাইকে ইয়েভগেনিয়া-ধাই বলল, 'ভাসিলি ভাসিলিচ, লেক্সেইকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

দাদামশাই জবাব দিলেন, 'যাও, যাও, এক্ষুণি বাইরে চলে যাও!'

অলিন্দের সিঁড়ির নিচে আমি লুকিয়ে রইলাম, যাতে ইয়েভগেনিয়া-ধাই খুঁজে পেয়ে আমাকে শুদ্ধ বাইরে না নিয়ে যায়।

কারখানার ছাদটা ভেঙে পড়েছে। বেরিয়ে পড়েছে ছাদের কঙ্কাল, আকাশের পটভূমিতে মোটা মোটা কড়িকাঠ পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে জ্বলন্ত কড়িকাঠ থেকে। আর এই কঙ্কালের ভিতর থেকে বিস্ফোরণের মতো দমকে

দমকে বেরিয়ে আসছে লাল সবুজ আর নীল আগুনের শিখা, লক্‌লকে জিভ বাড়িয়ে দিয়েছে উঠোন পর্যন্ত। উঠোনে অনেক মানুষের ভিড়; কোদালে বরফ ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারা এই প্রচন্ড অগ্নিকান্ড নেবাতে চেষ্টা করছে। আগুনে ঘেরা গামলা, টগ্‌বগ করে ফুটছে গামলার ভিতরকার তরল পদার্থ। রাশি রাশি ধোঁয়া উঠছে, ঘন ধোঁয়ার মেঘে ভরে গেছে উঠোনটা। বিশ্রী রকমের সব গন্ধ, আর সেই ধোঁয়ায় চোখে জল আসে। সিঁড়ির তলা থেকে আমি গুটি-গুটি বেরিয়ে আসতেই পড়ে গেলাম একেবারে দিদিমার সামনা-সামনি।

দিদিমা হাঁক দিলেন, 'যা এখান থেকে! এখানে ঘুরঘুর করছিস, একেবারে পিষে যাবি যে! যা এক্ষুণি বাইরে!'

এমন সময় টগবগিয়ে ঘোড়ায় চেপে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল পেতলের হেল্‌মেট মাথায় একজন অশ্বারোহী। লাল্‌চে বাদামী রঙের ঘোড়াটার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। অশ্বারোহীর হাতে চাবুক, শাসানির ভঙ্গিতে চাবুকটা তুলে সে হাঁক দিতে লাগল:

'হট্‌ যাও! হট্‌ যাও!'

শোনা যাচ্ছে ঢঙ ঢঙ শব্দে ঘণ্টা বাজার শব্দ। যেন উৎসব-দিনের মতো আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠেছে চারদিক। অলিন্দে দিদিমা আমায় ঠেলে বললেন:

'কথা কানে ঢোকেনি বুঝি? যা বলছি এখান থেকে!'

ঠিক এই মুহূর্তে দিদিমার আদেশ কিছুতেই অমান্য করা চলে না। আমি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম এবং আবার দাঁড়ালাম জানলার পাশে। কিন্তু জানলার সামনেই কালো কালো একদল মানুষের ভিড়ে আগুনটা আড়াল হয়ে গেছে। শুধু দেখা গেল লোকের মাথার শীতের কালো টুপি আর ক্যাপ আর তারই ফাঁকে ফাঁকে এক-একবার ঝল্‌সে উঠছে পেতলের হেল্‌মেট।

দমাদম পিটিয়ে আর জল ঢেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিবিয়ে ফেলা হল। মানুষের ভিড়কে দূরে সরিয়ে দিল পুলিস। তারপর এক সময়ে আমার দিদিমা এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে।

'কে, কে এখানে? ও, তুই? ঘুমোসনি বুঝি? ভয় পেয়েছিস? ভয় পাস্‌নে। ভয়ের আর কিচ্ছু নেই। আগুন নিবিয়ে ফেলা হয়েছে।'

দিদিমা আমার পাশে বসলেন, তারপর একটিও কথা না বলে দুলতে লাগলেন। আবার সেই নিঃশব্দ রাত্রি আর সেই অন্ধকার ফিরে এসেছে। ভালো লাগছে আমার। কিন্তু সেই আগুন আর নেই!

দাদামশাই এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

'গিন্নী?'

'উঁ?'

'পুড়ে-টুড়ে যাওনি তো?'

'না, তেমন কিছু নয়।'

ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালেন দাদামশাই। দেশলাইয়ের নীল আলোয় তাঁর ঝুলকালিমাখা কাঠবেড়ালির মতো ছোট মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। টেবিলের মোমবাতিটা জ্বালিয়ে তিনি এসে ধীরেসুস্থে একেবারে গা ছেড়ে দিয়ে বসলেন দিদিমার পাশে।

'একটু হাতমুখ ধুয়ে এলে পারতে।' দিদিমা বললেন। দিদিমা নিজেও ঝুলকালি মেখে বসে আছেন, তাঁর গা থেকেও ধোঁয়ার গন্ধ বেরোচ্ছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাদামশাই বললেন, 'মাঝে-মাঝে তোমাকে ঈশ্বর তাঁর করুণার পরিচয় দেন। অকস্মাৎ বুদ্ধি জোগান।'

দিদিমার কাঁধের ওপর মৃদু চাপড় দিতে দিতে হাসিমুখে তিনি বলে চলেন:

'অল্প কয়েক মিনিটের জন্য, সামান্য ক্ষণের জন্য হলেও তিনি বুদ্ধি জোগান।'

দিদিমাও মুচকে হাসছিলেন এবং কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে ভুরু কুঁচকিয়ে দাদামশাই বললেন:

'এই গ্রিগরিটাকে দূর করে দিতে হবে। ওর অসাবধানেই তো এই কাণ্ড হল। ওকে দিয়ে আর কিচ্ছু কাজ হবে না। ওর দিন অনেক আগেই ফুরিয়েছে। ওদিকে দেখ, বোকা ইয়াকভটা বারান্দায় বসে বসে কান্না শুরু করে দিয়েছে। তুমি বরং একটু ইয়াকভের কাছে যাও গিন্নী...'

দিদিমা উঠে দাঁড়ালেন, তারপর একটা হাত তুলে আঙ্গুলে ফুঁ দিতে দিতে বেরিয়ে চলে গেলেন।

'কী হে ছোক্‌রা, আগাগোড়া কাণ্ডটা দেখলে তো?' আমার দিকে না ফিরেই দাদামশাই নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'দিদিমাকে কী মনে হয় তোমার? আর ভুলে যেও না যেন, তোমার দিদিমা বুড়ী হয়েছে... অনেক ঝড়ঝাপ্‌টা গেছে, অনেক দুঃখ সয়েছে... তবুও দেখলে তো, মানুষ বলতে এই একজন... বাকি সব — ছ্যাঃ।'

কিছুক্ষণ একটিও কথা না বলে তিনি ঘাড় নিচু করে বসে রইলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মোমবাতির পোড়া সল্‌তেটা টোকা দিয়ে ভেঙে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে:

'তুমি ভয় পাওনি তো?'

'না।'

'এই তো চাই। ভয় পাবার কি আছে? কিচ্ছু নেই।'

বিরক্তির সঙ্গে গা থেকে জামাটা খুলে ফেললেন, তারপর রান্নাঘরের অন্ধকার কোণে গেলেন হাত-মুখ ধোবার জন্যে।

'নেহাৎ গো-মুখ্যু না হলে কারও বাড়িতে আগুন লাগে?' মেঝের ওপরে পা ঠুকতে ঠুকতে উচ্চকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, 'এবার থেকে নিয়ম হয়ে যাওয়া উচিত যে যার বাড়িতে আগুন লাগবে তাকে ধরে নিয়ে আসা হবে খোলা ময়দানে। কারণ সে লোক হয় বোকা নয় চোর, তা ও দুয়েতে কোনই তফাৎ নেই, আর সেই জন্যে শাস্তি দেওয়া উচিত তাকে। ধরে ধরে জনকয়েক লোককে এমনি শাস্তি দিতে পারলেই—ব্যস সব ঠান্ডা! আর কারও বাড়িতে আগুন লাগবে না!.. ওখানে বসে আছ কেন হে ছোকরা? শুতে-টুতে যাও!'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি শুতে গেলাম। কিন্তু সে-রাত্রে ঘুম আমার কপালে ছিল না। সবেমাত্র বিছানায় শুয়েছি এমন সময় প্রচণ্ড একটা অমানুষিক চিৎকার আমাকে বিছানা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার আমি ছুটে গেলাম রান্নাঘরে। দেখলাম, রান্নাঘরের মাঝখানে মোমবাতি হাতে খালি গায়ে দাদামশাই দাঁড়িয়ে আছেন; মোমবাতিটা তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে কাঁপছে, অনবরত তিনি এক পা থেকে আর-এক পায়ে শরীরের ভর দিচ্ছেন। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে একটুও নড়ছেন না।

রুদ্ধ স্বরে তিনি বলছেন, 'কী হয়েছে গিন্নী? ইয়াকভ, বল্‌ না কী হয়েছে?'

ছুটে এসে চুল্লির ওপর উঠে আমি এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে লুকিয়ে রইলাম। ঠিক আগুন লাগার সময় যেমন অবস্থা হয়েছিল তেমনি আবার সারা বাড়িতে প্রচণ্ড একটা হৈ-হট্টগোল- ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। ভীষণ চিৎকার ঠিক যেন একটা ছন্দের তালে তালে এসে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে দেওয়াল আর ছাদের গায়ে। পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন আমার দাদামশাই আর মামা। দিদিমা দুজনকেই ধমক দিয়ে রান্নাঘর থেকে চিৎকার

করে বার করে দিলেন। ওদিকে গ্রিগরি প্রচণ্ড সোরগোল তুলে চুল্লির মধ্যে কাঠ পুরে চলেছে। জল গরম করবার বয়লারগুলির কয়েকটাতে সে জল ভরে দিয়ে গেল। চলাফেরা করছে আস্ত্রাখানের উটের মতো ঘাড় নাড়তে নাড়তে।

দিদিমা হুকুম করলেন, 'আগে আগুনটা ঠিক করো দেখি!'

কিছু জ্বালানি কাঠ নামিয়ে নেবার জন্যে গ্রিগরি চুল্লির ওপরে উঠে এল। আমার পায়ের সঙ্গে তার পায়ের ছোঁয়া লাগতেই আঁতকে চিৎকার করে উঠল সে:

'কে? কে এখানে? ওঃ তুই! কী ভয় পাইয়েই দিয়েছিলি! এমন বিদকুটে স্বভাব তোর, যেখানে তোর আসার কোনো দরকার নেই, ঠিক সেখানেই আসা চাই।'

'আচ্ছা, এত হৈচৈ কিসের?'

চুল্লির ওপর থেকে নিচে লাফিয়া নেমে শান্ত স্বরে সে জবাব দিল, 'তোর মামী নাতালিয়ার বাচ্চা হবে।'

আমার মনে পড়ে, আমার মা'র যখন বাচ্চা হয়েছিল তখন কিন্তু মা এমন অমানুষিক চিৎকার করেনি।

চুল্লি জ্বালিয়ে তার ওপরে জলের পাত্রগুলি চাপিয়ে দিয়ে গ্রিগরি আবার ওপরে উঠে এল। পকেট থেকে একটা পোড়ামাটির পাইপ বার করে দেখাল আমাকে:

'এই দ্যাখ্, চোখ ভালো করবার জন্যে তামাক খেতে শুরু করেছি। তোর দিদিমা বলেছিল নস্যি নিতে কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, নস্যি নেওয়ার চেয়ে তামাক খাওয়া ঢের ভালো...'

চুল্লির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে সে তাকিয়ে রইল মোমবাতির মিটমিটে আলোর দিকে। তার গালে আর কানে বিশ্রীরকম কালিঝুলি লেগেছে, কামিজটা ছেঁড়া, আর তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আংটার মতো উঁচু উঁচু পাঁজরার হাড়। চোখের চশমার একটা কাঁচ ফাটা আর সেই কাঁচ থেকে খসে পড়েছে বড়ো একটা টুকরো। ফাঁক দিয়ে লাল-লাল ভিজে-ভিজে চোখের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়; মনে হয় যেন চোখ নয়, দগ্‌দগে ঘা। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকটি সমানে কাৎরে চলেছে। শুনতে শুনতে গ্রিগরি পাতা-তামাক ঠেসে ভরে নিল পাইপটাতে। সে নিজেও অনেকটা যেন মাতালের মতো বিড়বিড় করে অনবরত কি বলে চলেছে।

'কী আগুন বাবাঃ... তোর দিদিমার হাত-টাত নিশ্চয়ই ঝল্‌সে গেছে...

ওই পোড়া হাত নিয়ে কি করে যে প্রসব করাবে জানি না... তোর মামীমার কথা ভুলেই গিয়েছিল সকলে... আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তো তার কাৎরানি শুরু হয়... ভয়ে কাৎরাতে শুরু করেছিল... দেখছিস তো, একটি জীবন্ত মানুষকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসা কী শক্ত কাজ... কিন্তু তবুও স্ত্রীলোকের কাণাকড়িও দাম নেই। প্রত্যেকটি স্ত্রীলোককে সম্মান করে চলা উচিত — অর্থাৎ মাকে, নয় কি? — তুই কিন্তু এ-কথাটি কখনো ভুলিস না ভাই!'

ঢুলতে ঢুলতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আবার প্রচন্ড একটা সোরগোলে ঘুম ভেঙে গেল। দুমদাম করে দরজা বন্ধ হচ্ছে, মাতালের মতো চিৎকার করছে মিখাইল-মামা, একসঙ্গে গোলমাল জুড়ে দিয়েছে সবাই। আর শুনতে পেলাম, দুর্বোধ্য ভাষায় কারা যেন কথা বলছে:

'স্বর্গের ফটক অবাধ উন্মুক্ত হবার সময় হয়েছে...'

'এক কাজ কর হে, খানিকটা বাতির তেল, খানিকটা রাম আর কাজল মিশিয়ে খেতে দাও দেখি ওকে... পরিমাণটা কি হবে জান? আধ গ্লাশ তেল, আধ গ্লাশ রাম আর টেবিল-চামচ কাজল...'

মিখাইল-মামা অনবরত একই কথা বলে চলেছে, 'আমাকে একটু দেখতে দাও, আমি একবার দেখব ওকে।'

মেঝের ওপরে দু-পা ছড়িয়ে বসে আছে সে, দু-পায়ের মাঝখানে মেঝের ওপর থুথু ফেলছে মাঝে মাঝে, দু-হাতে চাপড় দিচ্ছে মেঝের ওপরে। চুল্লির ওপরে তাতটা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল, সুতরাং আমি নীচে নেমে এলাম। কিন্তু মামার কাছে আসতেই মামা আমাকে এক-পায়ে জড়িয়ে ধরে এমন একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিল যে আমি চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলাম, মাথাটা ঠক্‌ করে লাগল গিয়ে মেঝের সঙ্গে।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'বোকা কোথাকার!'

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আমার মামা। তারপর থাবার মধ্যে আমাকে তুলে নিয়ে শূন্যে দোলাতে দোলাতে গর্জন করতে লাগল:

'তোকে আজ আমি উনুনের গায়ে পিষে মেরে ফেলব!'

আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলাম দাদামশাইয়ের কোলের ওপর আমি শুয়ে আছি। আইকনের নীচে তিনি বসে আছেন এবং আমাকে কোলের ওপর নিয়ে দোলা দিচ্ছেন। চোখের দৃষ্টি ছাদের দিকে নিবদ্ধ আর বিড়বিড় করে বলছেন তিনি:

'আর আমাদের কারও রেহাই নেই... একজনেরও নেই...'

তাঁর মাথার উপরে, আইকনের সামনেকার প্রদীপ জ্বলছে আর ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা মোমবাতি। বাইরে শীতকালের কুয়াশাম্লান ভোরের আবির্ভাব জানলা দিয়ে দেখা যায়।

আমার ওপরে ঝুঁকে পড়ে দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'যন্ত্রণা হচ্ছে?'

সারা শরীরে যন্ত্রণা। ভিজে মাথাটা, শরীরটা হয়ে উঠেছে সীসের মতো। কিন্তু এসব কথা বলবার ইচ্ছে আমার নেই — চারদিকে তাকিয়ে অদ্ভুত সব লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি; ঘরের মধ্যে চেয়ারগুলোতে যারা বসে আছে তাদের অধিকাংশকে আমি চিনি না। বেগুনে রঙের আল্‌খাল্লা পরে বসে আছে একজন পুরোহিত, চশমা চোখে আর সামরিক উর্দি গায়ে একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ, এবং আরো অনেকে। কাঠের মূর্তির মতো সকলে স্থির হয়ে বসে আছে। কাছেই কোথায় যেন জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে আর উদগ্রীব হয়ে সেই শব্দ শুনছে সকলে। পিঠের দিকে দুটো হাত রেখে ইয়াকভ-মামা টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

দাদামশাই বললেন, 'ইয়াকভ ছেলেটাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দে তো।'

মামা আমাকে ইসারায় ডাকল এবং আমরা পা টিপে টিপে দিদিমার ঘরের দিকে চললাম। তারপর আমি যখন বিছানায় গুটিসুটি হয়ে শুয়েছি, এমন সময় মামা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'তোর নাতালিয়া-মামী গেছে রে...'

খবরটা শুনে খুব বেশি অবাক হলাম না। অনেককাল ধরেই আমি নাতালিয়া-মামীকে এ-বাড়ির কোথাও দেখতে পাইনি; নাতালিয়া-মামী একবারও রান্নাঘরে আসেনি বা খাবার টেবিলে এসে বসেনি।

'দিদিমা কোথায়?'

'ওখানে।' বলে হাত বাড়িয়ে দেখাল মামা। তারপর যেমনভাবে পা টিপে টিপে ঢুকেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই নগ্ন পায়ে বেরিয়ে গেল।

আমি বিছানায় শুয়ে রইলাম। উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি চারদিকে। অন্ধ আর পাকা চুলওলা শীর্ণ কতগুলি মুখ যেন জানলার শার্সি ঘেঁষে রয়েছে। কোণের দিকে ট্রাঙ্কের ওপরে একটা পোশাক ঝুলছে; আমি জানি ওটা দিদিমার পোশাক — কিন্তু তবুও এখন মনে হয়, একটা জীবন্ত প্রাণী ছায়া-ছায়া অন্ধকারে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। একটা চোখ দরজার দিকে রেখে বালিশে মুখ গুঁজে আমি শুয়ে থাকি, ইচ্ছে হয় পালিয়ে চলে যাই এ ঘর থেকে। বিশ্রী গরম ঘরটা, আর একটা শ্বাসরোধী ভারী গন্ধ — মনে

পড়ছে ৎসিগানকের মৃত্যুর দৃশ্য, সেই রান্নাঘরের মেঝের ওপরে রক্তের ধারা। আমার মাথাটা আর বুকের ভিতরটা ফুলে উঠেছে যেন; এ-বাড়িতে যে-সব দৃশ্য আমি দেখেছি, সেগুলো ঘষটে চলেছে আমার ভিতর দিয়ে শীতের রাস্তায় স্লেজগাড়ির মতো। আমাকে পিষে দিয়ে যাচ্ছে, আমার অস্তিত্বকে শুষে নিচ্ছে...

আস্তে আস্তে ঘরের দরজাটা খুলে গেল আর দিদিমা কাৎ হয়ে গলে এলেন দরজার ফাঁক দিয়ে। কাঁধের ধাক্কায় বন্ধ করে দিলেন দরজাটা, তারপর ঠাকুরের আইকনের সামনে নীল শিখার দিকে দু-হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালেন দরজায় ঠেস দিয়ে আর ছেলেমানুষের মতো কান্না-ভাঙা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন এক সময়ে:

'আমার এই হাত দুটো... কী যন্ত্রণা যে হচ্ছে

পাঁচ

সেই বছরেই বসন্তকালে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেল। ইয়াকভ রয়ে গেল শহরে আর মিখাইল গেল নদী পেরিয়ে। দাদামশাই পলেভায়া স্ট্রীটে একটি চমৎকার নতুন বাড়ি কিনলেন। বাড়িটির নিচুতলায় ছিল একটা শুঁড়িখানা আর ছাদের ওপরে ভারি স্বাচ্ছন্দ্যের ছোট একটি ঘর। বাড়ির পিছনে বাগান, বাগান পেরিয়ে এক নালা। নিষ্পত্র উইলো চারায় নালাটা ছেয়ে গেছে।

'এখানে দেখছি বেতের অভাব হবে না!' আমার দিকে চোখ ঠেরে মুচ্‌কি হেসে দাদামশাই বললেন। আমরা দুজনে বাগান দেখবার জন্যে বেরিয়েছিলাম, কাদাভর্তি প্যাঁচপেঁচে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম দুজনে। দাদামশাই বললেন, 'এবার আমি তোমাকে নিয়ে বর্ণপরিচয় শুরু করব। আর তখন এই বেতগুলো খুব কাজ দেবে।'

সারা বাড়িতে ভাড়াটে গিজগিজ করছে। নিজের ব্যবহারের জন্যে এবং অভ্যাগতদের বসবার জন্যে একটি মাত্র বড়ো ঘর দাদামশাই রেখে দিলেন এবং আমি আর দিদিমা আশ্রয় নিলাম ছাদের ওপরের ঘরে। আমাদের এই ঘরটিতে রাস্তার দিকে একটি জানলা আছে। এই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে তাকালে দেখা যায়, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে মাতালরা শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। টল্‌তে টল্‌তে তারা রাস্তা দিয়ে চলে, গলা

ফাটিয়ে চিৎকার করে আর ধুপ্‌ধাপ পড়ে রাস্তার ধারে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, এক-একজন লোককে ময়দার বস্তার মতো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু লোকগুলো আবার এগিয়ে আসে দরজার দিকে। দরজা খোলা-বন্ধ হওয়ায় ঠুন্‌ঠুন্‌ শব্দ পাওয়া যায়, আর শোনা যায় মর্‌চে-পড়া কব্‌জার কিচকিচ। তারপর মারামারি চলছে। ওপরের জানলা থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে খুব মজা লাগে আমার। রোজ সকালে দাদামশাই বেরিয়ে যান। মামারা দুটি আলাদা-আলাদা কারখানা খুলেছে; কারখানাগুলো যাতে চালু হয় সেই উদ্দেশ্যে দাদামশাই দেখাশোনা করতে যান; অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এবং মন মেজাজ খারাপ করে ফিরে আসেন সন্ধ্যার সময়।

দিদিমা ব্যস্ত থাকেন সেলাই, রান্না আর বাগান নিয়ে। সারা দিনে এক মুহূর্তও ফুরসৎ ছিল না তাঁর, অদৃশ্য এক সুতোর টানে মস্ত এক লাট্টুর মতো যেন অনবরত ঘুরপাক দিয়ে চলেছেন তিনি। মাঝে মাঝে নস্যি নেন, সশব্দে হাঁচেন, আর মুখের ঘাম মুছতে মুছতে আপন মনে বলেন:

'চিরকাল সব মানুষ যেন সুখী থাকে। আলিওশা, সোনা আমার, মানিক আমার, এতদিনে আমরা শান্ত ও নির্বিঘ্ন জীবন পেয়েছি। পুণ্যময়ী মেরীমাতার অশেষ কৃপায় এতদিনে আমাদের সমস্ত অশান্তি কেটে গেছে!'

তবে আমার কিন্তু সেই জীবনকে খুব বেশি শান্ত ও নির্বিঘ্ন বলে মনে হয় না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ভাড়াটেরা বাইরের উঠোনে আর এঘর থেকে ওঘরে ছুটোছুটি করে; পাশের ঘরের স্ত্রীলোক এঘরে হুড়মুড় করে ঢোকে; আর সব সময়েই তাদের কোথাও না কোথাও যাবার তাড়া পড়েছে, সব সময়েই তাদের কোনো না কোনো একটা কাজে দেরি হয়ে গেছে, সব সময়েই তারা কিছু না কিছু একটা করবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

'আকুলিনা ইভানোভনা!' দিদিমাকে তারা ডাকে।

আর এই ডাক শুনে আকুলিনা ইভানোভনারও ক্লান্তি নেই। তাঁর নিজস্ব অন্তরঙ্গতার ধরনে সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলেন, সবার কথা শোনেন মন দিয়ে। আর মাঝে মাঝে বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে নস্যি গোঁজেন নাকের মধ্যে; মস্ত একটা লাল চেক্‌কাটা রুমাল দিয়ে পরিষ্কার ভাবে মুছে নেন নাক আর আঙুল।

'উকুনের কথা বলছেন? উকুন তাড়াতে হবে?' বলেন তিনি, 'উকুনের হাত থেকে যদি বাঁচতে চান তাহলে একটি কাজ করতে হবে গিন্নী। স্নানঘরে গিয়ে আর-একটু ঘন ঘন স্নান করতে হবে। আর যদি পেপারমিণ্ট তেলের ধোঁয়া

দিয়ে শরীরটাকে মেজে নিতে পারেন তাহলে তো আর কথাই নেই। আর ধরুন যদি এমন হয় যে উকুন চামড়ার ওপরে না হয়ে ভিতরে হয়েছে, তাহলে করবেন কী জানেন — প্রথমে নেবেন বড় চামচের এক চামচ হাঁসের খাঁটি চর্বি, তারপর নেবেন চায়ের চামচের এক চামচ বিষ আর তিন ফোঁটা পারা; একটা খলের মধ্যে নিয়ে সাতবার জিনিসগুলোকে মেশাতে হবে। বাস্, তৈরি হয়ে গেল আপনার ওষুধ। শরীরের যেখানে উকুন হয়েছে সেখানে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিলেই ফল পাবেন। তবে খবরদার, হাড় বা কাঠের চামচ কক্ষণো ব্যবহার করবেন না যেন, তাহলে পারাটা নষ্ট হয়ে যায়; আর তামা বা রুপোর সঙ্গে যেন কিছুতেই ছোঁয়া না লাগে — সেটা শরীরের পক্ষে হবে খুবই ক্ষতিকর।'

জিজ্ঞেস করলেই যে ওষুধ বলেন তা নয়। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে কোনো একটি সমস্যা নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করে অবশেষে বলেন:

'আপনার অসুখের ওষুধ বাৎলানো আমার কর্ম নয় গিন্নী। আপনি বরং সাধু-আসাফের কাছে, পেচোরি মঠে যান।'

সব ব্যাপারেই আছেন তিনি। ধাইয়ের কাজ করেন, বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হলে মিটমাট করিয়ে দেন, ছেলেপুলের অসুখ হলে চিকিৎসা করেন। 'মেরীমাতার স্বপ্ন' আবৃত্তি করেন আর তাঁর কাছ থেকে শুনে শুনে অন্য মেয়েরা তা শিখে নেয় — 'গৃহস্থের কল্যাণে'। তাছাড়া সংসারের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে পরামর্শ দেন তিনি:

'শশা জরাতে তো ঝামেলা কিছু নেই। শশার গায়েই একরকম লেখা থাকে, কখন শশা দিয়ে আচার হবে। যদি দেখ যে শশা থেকে মাটি-মাটি বা অন্য কোনো গন্ধ ছাড়ছে না — তাহলেই হল। কেটে-ছাড়িয়ে নুন লাগাও, আর কোনো গোলমাল নেই — আচার হবেই। ভালো ক্ভাস* তৈরি করতে হলে পাঁচনটাকে ভালো করে ঘাঁটা দরকার। ক্ভাসের সঙ্গে মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু মিশ খায় না। কয়েকটা কিশমিশ কিংবা খানিকটা চিনি দেন — চায়ের চামচের এক চামচ এক বালতির জন্যে। ভারেনেৎস** অবশ্য নানাভাবে তৈরি করা যায়। এই ধরুন গিয়ে আপনার দানিয়ুব অঞ্চলের লোকরা একভাবে জিনিসটা তৈরি করেন। আবার স্পেন বা ককেশাস অঞ্চলের লোকরা অন্যভাবে তৈরি করেন। একেক অঞ্চলে একেক রকম স্বাদ-গন্ধ...'

সারাটি দিন আমি দিদিমার পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করি। তিনি হয়তো

---

* গমজাতীয় ফসলের ঝাঁজালো আরক। — সম্পাঃ

** দই। — সম্পাঃ

বাগানে বা উঠোনে গেছেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে আছি। তিনি পাড়াপড়শীর বাড়িতে বেড়াতে যান, আমিও চলি সঙ্গে সঙ্গে। পাড়াপড়শীর বাড়িতে গিয়ে দিদিমা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে চা খেতেন আর নানা রকমের গল্প বলতেন। মনে আছে, দিদিমার শারীরিক উপস্থিতির একটা অংশের মতো হয়ে উঠেছিলাম আমি। এই সময়ের কথা ভাবতে বসলে আমার মনে শুধু এই অক্লান্ত ও দয়ালু বৃদ্ধার কথাই ভেসে ওঠে — আর কিছু মনে পড়ে না।

মাঝে মাঝে কোথা থেকে মা আসে, অল্প কিছুদিন থেকেই চলে যায় আবার। তেমনি উদ্ধত, তেমনি ঋজু, পৃথিবীর দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকায় তা ছিল শীতকালের সূর্যালোকের মতো নিরুত্তাপ ও ধূসর। কোনো বারেই খুব বেশিদিন মা থাকে না, আর যখন চলে যায়, পিছনে নিজের কোনো স্মৃতি রেখে যায় না।

একদিন দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা দিদিমা, তুমি কি ডাইনী?'

দিদিমা হেসে উঠলেন: 'পাগল ছেলের কথা শোনো! কি দেখে একথাটা তোর মনে এল রে?' তারপরেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে চিন্তান্বিত স্বরে বললেন, 'তুক্‌তাক মন্ত্র জানাটা অত সহজ কথা নয়! আমি কোত্থেকে জানব বল্‌? আমার তো অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত নেই। ওদিকে তোর দাদামশাইকে দ্যাখ্‌, ভারি পণ্ডিত লোক তোর দাদামশাই। কিন্তু ভগবান আমাকে বিদ্যেবুদ্ধির দিক থেকে একেবারেই অপাত্র মনে করেছেন।'

তারপর তিনি তাঁর জীবনের এক নতুন পরিচ্ছেদের কাহিনী শোনালেন আমাকে:

'আমিও ছেলেবেলায় তোর মতোই ছিলাম রে। একেবারে অনাথা, বাপ ছিল না। আমার মা ছিল নেহাতই গরীব; বিকলাঙ্গ বলে কোথাও কাজ পেত না। মা যখন খুবই ছোট তখন এক বড়োলোকের বাড়িতে কাজ করত। একবার রাত্রে লোকটার ভয়ে মা জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। ফলে তার পাঁজরে আর কাঁধে এমন চোট লাগে যে তার একটা হাত আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। আসল হাতটাই অর্থাৎ ডান হাতটাই অক্ষম হয় এভাবে। আর লেসবোনার কাজে মা ছিল ভারি পাকা। কিন্তু হলে কি হবে, সেই ভদ্রলোক যখন দেখলেন যে মাকে দিয়ে আর কোনো কাজই করানো চলবে না তখন তিনি মাকে স্বাধীনতা দিলেন এবং তার ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ভাগ্য বললেই তো আর হবে না, নুলো লোকের কি আর ভাগ্য থাকতে পারে?

সুতরাং ভিক্ষে করা ছাড়া গতি ছিল না! যে সময়ের কথা বলছি, তখন বালাখনা অঞ্চল ছিল খুবই বর্ধিষ্ণু। ছুতোর আর লেসবোনার কাজে এক দল আরেক দলকে টেক্কা দিত। আমার মা আর আমি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতাম। শরৎকাল আর শীতকাল এভাবেই কাটত। তারপর যখন দেবদূত গাব্রিলো তলোয়ারের খোঁচায় তুষারকে তাড়িয়ে দিতেন আর পৃথিবীর ওপরে নেমে আসত ঝক্‌ঝকে বসন্ত — তখন আমরা বেরিয়ে পড়তাম দূরে। যতোদূর চোখ যায় শুধু চলতাম, যতোক্ষণ না পা একেবারে ভারী হয়ে উঠত। কত নতুন নতুন জায়গায় যে যেতাম আমরা। যেতাম মুরোম'এ, ইউরিয়েভেৎস্'এ, ভল্‌গা আর শান্ত ওকা নদীর ধারে ধারে নানা জায়গায়। কী ভালোই যে লাগত, বসন্তকালে আর গ্রীষ্মকালে হেঁটে হেঁটে দেশ ঘুরে বেড়াতে কি চমৎকার লাগে! তুলতুলে নরম মাটি আর ভেল্‌ভেটের মতো সবুজ ঘাস। মাঠেঘাটে মেরীমাতার আশীর্বাদের মতো ফুল ফুটে থাকে। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। আর সেই খোলা আকাশের নিচে অবারিত প্রান্তর — কার মন আনন্দে ভরে ওঠে না বল্! তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মার নীল চোখদুটো বুজে আসত আর তার গানের সুর ডানা মেলে উড়ে যেত স্বর্গের দিকে। ভারি মোলায়েম আর মিষ্টি গলা ছিল আমার মায়ের — মনে হত যেন বিশ্বপ্রকৃতি চুপ হয়ে যায় সেই গান শুনে, নিশ্বাস বন্ধ করে শোনে। ভিক্ষে করবার জন্যে ঘুরে বেড়াতেও কী ভালো লাগত যে তখন! কিন্তু যখন আমার বয়স হল নয় বছর তখন আর মা আমাকে নিয়ে ভিক্ষেয় বার হত না। আর মা'র পক্ষে এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার ছিল। সুতরাং মা বালাখনাতেই পাকাপাকি ডেরা বাঁধল। একা একাই দোর থেকে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াত, রবিবার দিন গিয়ে বসত গির্জার চাতালে। আর আমি থাকতাম বাড়িতে, বাড়িতে বসে বসে লেসবোনা শিখতাম। কিন্তু আমার মনে হত, কাজটা শিখতে বড়ো দেরি হচ্ছে আমার। তখন আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, কি করে মা'র কিছুটা সুসার করতে পারি। এজন্যে আমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম যে যখনই আমি কোনো লেসের নক্‌সা ঠিকমত বুনতে পারতাম না, আমার দুচোখ ভরে জল আসত। যাই হোক্, বছর দুয়েকের মধ্যেই কিন্তু আমি কাজটা শিখে নিয়েছিলাম। আর সারা শহরে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। যখনই কোনো বিশেষ ধরনের কাজ করাবার প্রয়োজন হত, সবাই আসত আমার কাছে, এসে বলত, "কই গো আকুলিয়া, কাজ এনেছি, মাকুতে সুতো পরাও।" শুনে কত আনন্দই যে হত আমার। তবে একথাও ঠিক যে আমার জাঁক করবার কিছু ছিল না,

সবই আমার মা'র কাছ থেকে শেখা। মা নুলো হাতে লেস বুনতে পারত না বটে, কিন্তু অপরকে কি-ভাবে শেখাতে হয় জানত। আর এই শিক্ষাটাই তো আসল কথা, যে লোক ভালোভাবে শেখাতে পারে তার দাম দশজন হাতের কাজের লোকের চেয়েও বেশি। যাই হোক্ নিজেকে আর ছোট ভাবতাম না। মাকে বললাম, "মা, তুমি কিন্তু আর ভিক্ষে করতে বেরুতে পারবে না, এই বলে দিলাম। আমিই এখন হাতের কাজ করে তোমাকে খাওয়াতে পারব।" মা উত্তর দিল, "উরে বাস রে! তোর টাকা তোরই থাক বাপু, তোর বিয়ের সময় যৌতুকে লাগবে।" এর কিছুদিন পরেই এল তোর দাদামশাই — তখন তার বাইশ বছর বয়স, তরুণকান্তি চেহারা, সহজেই চোখে পড়ে। তার আগেই সে বুর্লাকদলের মোড়ল হয়েছে। তার মা আমাকে প্রথম দেখে বেছে নিল। যখন জানল, খুব গরীব আমরা আর আমি ভিখিরীর মেয়ে — তখনই ধারণা করে নিল যে আমি খুব খাটিয়ে বৌ হতে পারব... সে নিজে মিষ্টি রুটি বিক্রী করত আর ছিল খুব কড়া প্রকৃতির। যাক্ গিয়ে, মরা মানুষের নিন্দে করতে নেই... ঈশ্বর আমাদের সাহায্য না নিয়ে নিজেই সব দেখতে পান, তিনি দেখেন আর শয়তানদের তা ভালো লাগে।'

প্রাণ খুলে দরাজ গলায় দিদিমা হেসে উঠলেন। তাঁর নাকটা অদ্ভুতভাবে কাঁপতে লাগল, চোখদুটো গানের সুরের মতো আলতোভাবে আদর করতে লাগল আমাকে। ভাষায় যেটুকু বলা যায় তার চেয়েও অনেক বেশি তিনি বললেন চোখের দৃষ্টিতে।

একদিনের কথা মনে আছে, এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যা। দিদিমা আর আমি দাদামশাইয়ের ঘরে বসে চা খাচ্ছিলাম। দাদামশাইয়ের শরীরটা সুস্থ ছিল না, তিনি বসেছিলেন বিছানার ওপরে। গায়ে জামা ছিল না, কাঁধের ওপরে চাপানো ছিল মস্ত একটা তোয়ালে, মাঝে মাঝে তোয়ালেটা দিয়ে তিনি কপালের প্রচুর ঘাম মুছছিলেন। ঘড়ঘড় শব্দ করে ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছিলেন, সবুজ চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল, মুখটা লাল আর ফুলো ফুলো। বিশেষ করে তাঁর ছোট ছোট খাড়া খাড়া কানদুটো লাল হয়ে উঠেছিল। একপাত্র চা নেবার জন্যে যখন তিনি হাত বাড়ালেন, তখন দেখলাম তাঁর হাতদুটো করুণভাবে কাঁপছে। ভারি শান্ত আর নিরীহ হয়ে উঠেছেন তিনি — তাঁর স্বভাবের সঙ্গে যা একেবারেই খাপ খায় না।

'তুমি আমাকে চিনি দিচ্ছ না কেন?' আদুরে শিশুর মতো আব্দেরে গলায় দাদামশাই নালিশ জানালেন।

'চিনি দিচ্ছি না কারণ চিনির চেয়ে মধু তোমার শরীরের পক্ষে উপকারী।' সাদর তবু দৃঢ় স্বরে দিদিমা জবাব দিলেন।

তেমনি ঘড়ঘড় শব্দে নিশ্বাস নিতে নিতে, গলা দিয়ে হাঁসফাঁস শব্দ করতে করতে তাড়াতাড়ি গরম চা-টা গিলে ফেললেন তিনি আর বললেন, 'দেখো গিন্নী, আমাকে মরতে দিও না যেন।'

'তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। মরতে দেব না।'

'এই তো কথার মতো কথা। আমি যদি এখন মরে যাই তাহলে সমস্ত হিসেব গোলমেলে হয়ে যাবে — মনে হবে যেন কখনো আমি বেঁচে থাকিনি — সমস্তই নিরর্থক হবে।'

'এবার কথা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো তো দেখি।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে রইলেন তিনি। কালো ঠোঁটদুটো চাটতে লাগলেন জিভ দিয়ে। তারপর হঠাৎ এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলেন যেন কেউ তাকে চিম্‌টি কেটেছে।

'শোন গিন্নী, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় ইয়াকভ আর মিখাইলের বিয়ে দিতে হবে। বউ আর নতুন ছেলেপুলে হলে দুজনেই হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, কি বলো?'

শহরের বিবাহযোগ্যা কন্যাদের স্মরণ করে যেতে থাকেন দাদামশাই। আর দিদিমা একটিও মন্তব্য করেন না, বসে বসে শুধু গ্লাশের পর গ্লাশ চা খেয়ে যান। এদিকে আমি কোথায় যেন একটু অশোভন আচরণ করেছি, তারই শাস্তি হিসেবে দাদামশাই বাইরে যাওয়া বন্ধ করেছেন আমার। সুতরাং আমি জানলার সামনে বসে আছি, বসে বসে তাকিয়ে দেখছি বাইরের দিকে — সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর তার ঝক্‌ঝকে আলোয় কি চমৎকার লালই না দেখাচ্ছে আশেপাশের বাড়ির জানলাগুলো।

নিচে বাগানে বার্চগাছের ডালগুলোর মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে গুবরে পোকা গুন্‌গুন শব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। পাশের বাড়ির উঠোন থেকে আসছে পিপে তৈরি কাজের শব্দ — কাছেই কোথা থেকে শুনতে পাচ্ছি ছুরি শানানো চাকার আওয়াজ। বাগান পেরিয়ে নালা, সেখানে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে খেলা করছে ছোট ছেলেরা — শোনা যাচ্ছে তাদের কলধ্বনি। আমারও ভারি ইচ্ছে করছে বাইরে গিয়ে ওই ছেলের দলে যোগ দিই, আসন্ন প্রদোষের বিষণ্ণতায় মনটা ভারী হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ দাদামশাই একটা নতুন বই বার করলেন। হাতের তালুর ওপরে বইটা দিয়ে সশব্দে চপেটাঘাত করে খুশিভরা স্বরে ডাকলেন আমাকে:

'ওহে অকালকুষ্মাণ্ড, ওহে লম্বকর্ণ, এবার এদিকে এসো দিকি! বসো এখানে। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ এই চিহ্নটা? বলো, অ-য়ে অজগর, আ-য়ে আম, হ্রস্ব ই-য়ে ইঁদুর। আচ্ছা, এবার বল্ তো দেখি এটা কী?'

'আ-য়ে আম।'

'ঠিক হয়েছে। আচ্ছা এটা?'

'হ্রস্ব ই-য়ে ইঁদুর।'

'হল না! এটা হচ্ছে অ-য়ে অজগর। আচ্ছা, এবার এই চিহ্নটাকে ভালো করে দ্যাখ্, এটা হচ্ছে দীর্ঘ ঈ-য়ে ঈগল। হ্রস্ব উ-য়ে উট। পড়্লি তো? এবার বল্ দিকিনি এটা কি?'

'হ্রস্ব উ-য়ে উট।'

'ঠিক হয়েছে। এটা?'

'দীর্ঘ ঈ-য়ে ঈগল।'

'বাঃ, বেশ বেশ। এটা?'

'অ-য়ে অজগর।'

দিদিমা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবারে দাদামশাইকে বললেন, 'তুমি অত কথা বোলো না, একটু চুপ করে শুয়ে থাকো।'

'থামো তো তুমি। বরং এতেই আমি ভালো থাকছি। ভাবনাচিন্তাগুলো মনের মধ্যে থাকছে না। পড়ে যা লেক্সেই।'

দাদামশাই তাঁর উষ্ণ ভিজে-ভিজে একটা হাত আমার কাঁধের ওপর দিয়ে নিয়ে গেছেন; সে হাত দিয়েই তিনি বইয়ের অক্ষরগুলো আমাকে দেখাচ্ছেন। আর অপর হাতে বইটা ধরে আছেন প্রায় আমার নাকের ডগায়। ভিনিগার, ঘাম আর সেঁকা পেঁয়াজের একটা মেশানো গন্ধ আসছে তাঁর গা থেকে — আর এই গন্ধে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা এসেছে তাঁর মধ্যে, আর আমার কানের পাশে অনবরত চিৎকার করে বলেছেন:

'ভ-য়ে ভল্লুক, ম-য়ে মহিলা।'

শব্দগুলো আমার কাছে খুবই পরিচিত কিন্তু স্লাভনিক অক্ষরগুলোর সঙ্গে কোনো মিল নেই। ভ-অক্ষরটার সঙ্গে ভল্লুকের যতোটা মিল আছে, তার চেয়ে বেশি মিল আছে পোকার সঙ্গে। দীর্ঘ ঈ-কে দেখে কিছুতেই ঈগল বলে মনে হয় না, ওই অক্ষরটার সঙ্গে কুঁজোপিট গ্রিগরির মিলটাই যেন

বেশি। পেটমোটা ব-কে দেখে আমার মনে হয়, দিদিমা ও আমি দুজনে যেন একসঙ্গে রয়েছি। আর সমস্ত অক্ষরগুলোর মধ্যেই কোথায় যেন কি একটা আছে যা ঠিক আমার দাদামশাইয়ের মতো। দাদামশাই একেবারে উঠেপড়ে লেগেছেন, একটির পর একটি অক্ষর চিনিয়ে চলেছেন আমাকে। এক-একবার অক্ষরগুলোকে ঠিক পর-পর, যেটির পর যেটি আসে, তেমনিভাবে ধরছেন, এক-একবার ধরছেন উল্‌টেপাল্‌টে। তাঁর উত্তেজনা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছে, আমিও ঘর্মাক্ত-কলেবর হয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলেছি। আমার কাণ্ড দেখে দাদামশাইয়ের বোধ হয় খুব মজা লাগছে। হেসে উঠতে গিয়ে তিনি ভয়ানকভাবে কেশে উঠলেন।

'দেখ, দেখ, গিন্নী, ছেলেটার কাণ্ড দেখ!' একহাতে বই এবং অন্য হাতে বুক চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন, 'ওরে আস্ত্রাখানী শয়তান, এমন হাঁকডাক শুরু করেছিস কেন রে?'

'আমি করছি না আপনি করছেন...'

দাদামশাই ও দিদিমার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভারি ভালো লাগছে আমার। টেবিলের ওপরে দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে, দুই হাতের মধ্যে গাল রেখে দিদিমা বসে আছেন আর আমাদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছেন।

'তোমরা থামো বাপু এবার দুজনে। মাথার খিল খুলে যাবে যে!' বললেন দিদিমা।

দাদামশাই এবারে সুর নরম করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, বুঝলি আমার না হয় অসুখ হয়েছে তাই আমি চেঁচাচ্ছি। কিন্তু তুই চেঁচাচ্ছিস কেন?'

ঘামে-ভেজা মাথাটা নাড়তে নাড়তে তারপর দিদিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাতালিয়া বেঁচে থাকতে যে-কথাটা বলেছিল তা কিন্তু ঠিক নয়। নাতালিয়া বলেছিল, ওর স্মৃতিশক্তি নাকি খুব দুর্বল। কিন্তু আমি তো দেখছি, ঘোড়ার মতো সব কথা মনে রাখতে পারে ও। ঠিক আছে খাঁদা-দাদু, এবার উঠেপড়ে লাগো!'

তারপরে একসময়ে তেমনি হাসতে হাসতে ও ঠাট্টা-তামাসা করতে করতে আমাকে বিছানা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন:

'বাস্‌ আর নয়। বইটা নিয়ে যা আর কষে পড়তে শুরু করে দে। কাল যদি আমাকে সবকটা অক্ষর ঠিক-ঠিক বলতে পারিস তবে আমি তোকে পাঁচ কোপেক্‌ দেব।'

হাত বাড়িয়ে আমি বইটা নিতে গেলাম। তিনি আমাকে নিজের দিকে টেনে নিলেন, তারপর ভাঙা-ভাঙা গলায় বিষণ্নস্বরে বলতে লাগলেন:

'কী ভাই, তোর মা'র কি একটুও দরদ নেই রে? নইলে এমন ছেলেকে ফেলে চলে যায়?'

'আবার কেন এসব কথা তুল্‌ছ? কিছু লাভ আছে?' বলে উঠলেন দিদিমা।

'বলি কি আর সাধে? আমার দুঃখ বলতে আমাকে বাধ্য করে যে... ইস্‌, ইস্‌, এমন মেয়েটা উচ্ছন্নে গেল!'

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন আমাকে।

'যা, এবার বাইরে একটু খেলা কর গিয়ে। কিন্তু খবরদার রাস্তায় যাসনে যেন — শুধু উঠোনে আর বাগানে খেলা করবি, বুঝলি?'

বাগানে যাবার জন্যেই আমি এতক্ষণ উস্‌খুস্‌ করছিলাম। জানি, যে-মুহূর্তে আমি বাগানে গিয়ে বাঁধের উপর দাঁড়াব, উল্‌টো দিকের ঝোপঝাড় থেকে ছেলের দল আমার দিকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করবে। আমিও তাই চাই, আমিও পাল্‌টা পাথর ছুঁড়তে শুরু করি।

আমাকে দেখলেই ওরা চিৎকার করে ওঠে, 'ওই আসছে রে, টুস্‌কা আসছে। নিয়ে আয় রে তাড়াতাড়ি!' তারপর সবাই মিলে ওদের অস্ত্রাগারের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে লেগে যায়।

টুস্‌কা বলে ওরা কি বোঝাতে চায় আমি জানি না। সুতরাং আমি একটুও অপমানিত বোধ করি না। কিন্তু যখন দেখি, একদিকে এক দঙ্গল ছেলে, আরেকদিকে আমি একা — তখন ভারি মজা লাগে আমার। একটিমাত্র পাথর ঠিক মতো তাক্‌ করে ছুঁড়তে পারলে শত্রুকে, ওরা পোঁ পোঁ করে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে লুকোয় ঝোপের আড়ালে। লড়াইটা হয় অত্যন্ত নির্দোষ ধরনের, এর মধ্যে কোনো রকম রাগারাগি ফাটাফাটি নেই বা লড়াইয়ের পর মনের মধ্যে কোনো ক্ষোভও থাকে না।

বর্ণপরিচয় হতে আমার খুব বেশি সময় লাগল না। আর বোধ হয় এই জন্যেই দাদামশাই আমার দিকে ক্রমশ বেশি করে নজর দিতে লাগলেন এবং ঘন ঘন বেতমারার অভ্যেসটা ছেড়ে দিলেন। তার মানে এই নয় যে আমি খুব সুবোধ বালক হয়ে উঠেছিলাম। বরং যতোই আমার বয়স ও সাহস বাড়ছিল ততোই দৌরাত্ম্য বাড়ছিল, আগের চেয়ে বেশি করেই দাদামশাইয়ের বিধিনিষেধ

ভাঙতে শুরু করলাম। কিন্তু তবুও তিনি পিঠে বেত না ভেঙে আমায় শুধু তিরস্কার করতেন আর ঘুষি উঁচিয়ে শাসাতেন।

আমার মনে হতে লাগল যে দাদামশাইয়ের হাতে নিতান্ত অকারণেই আমি বহু মার খেয়েছি। একদিন সে-কথাটা সোজাসুজি তাঁর মুখের ওপরে বললাম।

উত্তরে তিনি আমার থুত্‌নিটা একটু নেড়ে দিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'কি ব-ল্‌-লি-ই-ই কি-ই-ই?' তালুর সঙ্গে জিভের একটা শব্দ করে টেনে টেনে বললেন তিনি।

'ওরে ছুঁচো, ওরে গিদ্ধড়, তোকে উত্তম-মধ্যম দেব কি দেব না, তা ঠিক করব আমি — তুই ব্যাটা কে রে? আমি যা করব তাই হবে — বুঝলি হতভাগা?'

আমি মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম. তিনি আমার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকালেন।

'তুই কি চালাক না একেবারে গবেট?'

'আমি জানি না।'

'জানি না বলছিস তো? তাহলে শোন্‌, আমি বলে রাখছি। ধূর্ত হতে চেষ্টা করিস — গবেট হওয়ার চেয়ে ধূর্ত হওয়া ভালো। গবেট হয় ভেড়ারা — বুঝেছিস? এবার যা, খেলা কর্‌ গিয়ে।'

কিছুদিনের মধ্যেই আমি আরম্ভ করি প্‌সাল্টির* পড়তে। বইয়ের যে-কোনো লাইনের প্রতিটি অক্ষর আমি ধরে ধরে পড়তে পারি। সাধারণত আমার পড়বার সময় হচ্ছে সন্ধ্যেবেলা চায়ের পরে। আর প্রত্যেকবারেই পুরো একটি স্তোত্র আমাকে পড়তে হয়।

'স-য়ে সময়, হ্রস্ব উ-য়ে উট, খ-য়ে খাবার, সুখ, ভ-য়ে ভল্লুক, ও-কার ওড়না, গ-য়ে গগন, দীর্ঘ ঈ-য়ে ঈগল, ভোগী, সুখভোগী...' এইভাবে বানান করে করে আমি পড়ে যাই আর পড়তে পড়তে এত বিরক্তি লাগে যে নানারকম প্রশ্ন জাগে মাথার মধ্যে।

'আচ্ছা, সুখভোগী কে? ইয়াকভ-মামা?'**

* প্রার্থনা সংগীত। — সম্পাঃ

** রুশভাষায় শব্দের খেলা। সুখভোগী শব্দের অন্য মানে — মূর্খ, নির্বোধ। — সম্পাঃ

দাদামশাই রেগে ওঠেন: 'হতভাগা, কষে মাথায় গাঁট্টা মারলে তারপর টের পাবি সুখভোগী কে!' দাদামশাই যখন এই ধরনের কথা বলেন তখনই আমি টের পাই দাদামশাই আসলে রাগেননি; এভাবে কথা বলা তাঁর একটা অভ্যেস। না বললে খারাপ দেখায় তাই তিনি বলেন।

এবং আমার এই ধারণা যে ভুল নয় তা টের পেতেও বেশি দেরি হয় না। একটু পরেই তিনি ভুলে যান আমার কথা আর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলেন:

'হুঁ, গান করতে বলো, খেলা করতে বলো, তার বেলা একেবারে রাজা ডেভিডের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু কাজের বেলায়... আবেসালোমের মতো শয়তান! আহা-হা! সারাদিন শুধু নাচ, গান আর হল্লা! কেন রে বাপু? "নেচে বেড়াই ফুর্তি করি সবুজ মাঠে-মাঠে।" কিন্তু লাভটা কি হবে শুনি? নাচ তোকে কতদূরে নিয়ে যেতে পারবে?'

আমার পড়া বন্ধ হয়ে যায়, তাকিয়ে থাকি দাদামশাইয়ের দিকে। সারা মুখটার ওপরে দুশ্চিন্তার ছাপ, ভুরু কোঁচকানো, সরু সরু চোখে তাকিয়ে আছেন দূরের দিকে। চোখের দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা, ভারি অন্তরঙ্গ বলে মনে হয়। যেন তাঁর মুখের কাঠিন্যটুকু আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। কাঁপছে সোনালী ভুরুদুটো, চক্‌চক করছে রঙের ছোপ লাগানো আঙুলের নখ, আঙুল দিয়ে অস্থিরভাবে টেবিলের ওপরে টোকা দিয়ে চলেছেন।

'দাদামশাই!'

'কী রে?'

'একটা গল্প বলো না দাদামশাই।'

'পড়ার বই পড় না, কুঁড়ে বাদশা!' তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন। এমনভাবে চোখ রগড়াতে থাকেন যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন, 'প্‌সাল্টিরে তো মন নেই দেখছি! গল্প পেলেই হল, তা যে গল্পই হোক না কেন!'

কিন্তু দাদামশাইয়ের কথা শুনে আমার মনে হতে থাকে, তিনি নিজেও বোধ হয় প্‌সাল্টির চাইতে গল্প বলতে ভালোবাসেন। প্‌সাল্টিরের স্তোত্রগুলি তাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে আছে এবং প্রতিদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে তিনি কয়েকটি স্তোত্র চেঁচিয়ে পড়েন। এই স্তোত্রপাঠকে তিনি নিত্যকর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং গির্জার পাদ্রিরা যেমন উপাসনা-পাঠ করে তেমনি তিনি স্তোত্র পাঠ করেন।

শেষ পর্যন্ত আমাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে বৃদ্ধ বাধ্য হয়ে বলতে শুরু করেন:

'আচ্ছা বাপু বলছি। শোন, তাহলে। আর প্সাল্টির তো থাকবেই, সারা জীবন ধরেই থাকবে। কিন্তু আমি আর ক-দিন! আমার তো ওপারের ডাক আসবার সময় হল!'

পুরনো আরামকেদারার সেলাই করা দিকটায় ঠেস দিয়ে বসেন তিনি, পিছনে মাথা হেলিয়ে, চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন ছাদের ওপরে — আর পুরনো দিনের নানা স্মৃতি বলে যেতে থাকেন। ব্যবসায়ী জায়েভ'এর দোকান লুট করবার জন্যে একবার নাকি বালাখ্‌নাতে ডাকাতের দল এসেছিল। বিপদ ঘণ্টি বাজাবার জন্যে দাদামশাইয়ের বাবা ছুটে যাচ্ছিলেন ঘণ্টাঘরের দিকে; ডাকাতের দল তাঁকে ধরে ফেলে, তলোয়ার দিয়ে তাঁর শরীরটাকে কুচি কচি করে কাটে আর টুকরোগুলো ঘণ্টাঘরের ওপর থেকে ছুঁড়ে দেয় মাটিতে।

'আমি তখন খুবই ছোট। এসব ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখিনি আর আমার কিছু মনেও নেই। প্রথম যে ঘটনা আমি মনে করতে পারি তা হচ্ছে ফরাসীদের এদেশে আসা। সেটা ছিল ১৮১২ সাল — আমার বয়স তখন ঠিক বারো। সে-সময়ে বালাখ্‌নাতে জন-ত্রিশ ফরাসী বন্দীকে নিয়ে আসা হয়েছিল। মানুষগুলো শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, রোগা হাড়-জিরজিরে চেহারা, হাতের সামনে যা পেয়েছে তাই পরেছে—ভিখিরিরও অধম অবস্থা। শীতে কুঁকড়ে গেছে লোকগুলো, ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। ঠাণ্ডা লেগে হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে কয়েকজনের — তাদের উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। গাঁয়ের চাষীরা লোকগুলোকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু লোকগুলোর সঙ্গে যে সান্ত্রীর দল ছিল তারা বাধা দিল। তারপর ছাউনি থেকে এল সৈন্যরা। চাষীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে ফিরিয়ে দিল যার যার ঘরের দিকে। এই ধরনের ঘটনা অবশ্য পরে আর কোনো দিন ঘটেনি — পাশাপাশি থাকতে থাকতে ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল দু-দলেই। দেখা গেল, ফরাসীরা ভারি চালাকচতুর, যে-কোনো অবস্থায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে, হাসি-খুশি-আমুদে। আর মেজাজ এলেই গলা ছেড়ে গান শুরু করে দেয়। ফরাসী বন্দীদের দেখবার জন্যে নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ থেকে হোমরাচোমরা লোকরা আসত ত্রয়কা চেপে। কেউ কেউ ফরাসীদের গালিগালাজ করত, কেউ কেউ তাদের মুখের সামনে ঘুষি উঁচিয়ে শাসাত, কেউ কেউ মারধোর পর্যন্ত করত। আবার কেউ কেউ ছিল যারা ফরাসী ভাষাতেই তাদের সঙ্গে খুব দরদের সঙ্গে

কথা বলত, তাদের খুশি করবার জন্যে টাকাপয়সা ও পুরনো জামাকাপড় দিত। এক বৃদ্ধের কথা আমার মনে আছে, শহরের এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, তিনি তো দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন আর বলতে লাগলেন—"এই শয়তান বোনাপার্টটার জন্যেই ফরাসীদের এই অবস্থা!" একবার ভাব্‌তো দেখি ব্যাপারটা। একে রুশদেশের লোক, তার ওপরে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক — কিন্তু কী নরম হৃদয়! বিদেশী লোকদের দুঃখেও তাঁর মন কাঁদে!...'

মুহূর্তের জন্যে তিনি চুপ করেন, চোখ বুজে আঙ্গুল চালাতে থাকেন চুলের মধ্যে। পরে অতীতের মধ্যে ডুবে গিয়ে সতর্কভাবে আবার স্মৃতিমন্থন করে চলেন।

'সময়টা ছিল শীতকাল। সে কী হাড়কাঁপানো শীত, হি-হি হাওয়া আর তুষারঝড়। তুষার জমে জমে বাড়িঘর আট্‌কা পড়ে যেত। এই অবস্থায় ফরাসীরা ছুটে-ছুটে আসত আর আমাদের বাড়ির জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করত আমার মা'কে। আমার মা বাজারে বিক্রি করবার জন্যে এক ধরনের পিঠে তৈরি করতেন; সেই পিঠের জন্যে ফরাসীরা জানলার সামনে লাফঝাঁপ হাঁকডাক শুরু করে দিত আর ঠক্‌ঠক শব্দে টোকা দিত জানলায়। মা তাদের বাড়ির ভিতরে আসতে দিতেন না। জানলার ফাঁক দিয়ে পিঠে দিতেন তাদের হাতে। চুল্লির ভিতর থেকে সদ্য বার করে আনা সেইসব পিঠে, তখনো ধোঁয়া বার হচ্ছে আর আগুনের মতো গরম — কিন্তু লোকগুলো করত কি, সেই অবস্থাতেই পিঠেগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে জামার তলায় হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরত গায়ের চামড়ার ওপরে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শরীর আর বুকের ভিতরটাকে ছ্যাঁকা দিয়ে গরম করতে চেষ্টা করত এইভাবে। কি করে যে এতটা সহ্য করতে পারত জানি না! ওরা নিজেরা গরম দেশের লোক, এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর তুষারপাতে ওরা অভ্যস্ত নয়—ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে ওদের মধ্যে কত লোক যে মারা গিয়েছিল! আমাদের বাড়ির বাগানের দিকে ছিল একটা স্নানঘর, সেই ঘরে দুজন ফরাসী থাকত। একজন অফিসার, আর একজন তার এ্যাড্‌জুটাণ্ট — নাম মিরন। লম্বা, রোগা চেহারা অফিসারটির, যেন শুধু হাড় আর চামড়া। হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে-পড়া স্ত্রীলোকের কোট গায়ে চাপিয়ে ঘুরে বেড়াত। এমনিতে লোকটি ছিল সদয় কিন্তু রোজই মদ গিলত আর মাতলামি করত। আমার মা'র আরেকটা ব্যবসা ছিল — বীয়ার বানিয়ে বিক্রি করা। সেই লোকটি এই বীয়ার কিনে খেতে শুরু করত আর একেবারে মাতাল না হওয়া পর্যন্ত থামত না। আর তারপরেই শুরু হত গান।

আমাদের ভাষায় একটু-আধটু কথা বলতে পারার পর থেকেই সে মন্তব্য করত — "আপনাদের এই দেশটা সাদা নয়, দেশটা কালো — খারাপ!" তার কথাগুলো ছিল খুবই ভাঙা-ভাঙা কিন্তু সে কি বলতে চাইছে তা বুঝতে অসুবিধে হত না। আর সত্যি কথাই বলত সে, আমাদের দেশের এই উত্তরাঞ্চল সত্যিই তো আর স্বর্গরাজ্য নয়। কথাটা বুঝতে পারবি যদি ভল্‌গা নদী ধরে বরাবর দক্ষিণ দিকে নেমে যাস। দেখবি, দেশের আবহাওয়া ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছে। আর তারপর কাস্পীয় সাগর পেরিয়ে গেলে মনে হবে, সে-দেশের মাটি কোনো কালে বরফে ঢাকা পড়ে না। এ সব ঠিক। ধর্মের বই, সুসমাচার ও প্সাল্টিরে এ সব লেখা আছে। এই বইগুলিতে তুষারপাত বা শীতকালের কোনো উল্লেখ কোথাও নেই। তাহলেই ভেবে দ্যাখ্, যীশু খ্রীষ্ট তো ওই দেশেই জীবন কাটিয়েছেন... এই তো আমরা এখন প্সাল্টির পড়ছি, এটা শেষ হয়ে গেলেই সুসমাচার ধরব।'

আবার তাঁর মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় যেন ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ ঘুমে ঢলে পড়েছেন, খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে আধ-চোখে তাকিয়ে থাকেন, আর সমস্ত শরীরটা হয়ে ওঠে ছোট ও কেমন যেন খাড়া।

'কই দাদামশাই, বলুন!' শান্তভাবে আমি তাগিদ দিই।

চমকে উঠে তিনি বলেন, 'ও হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন? ফরাসীদের কথা, না? হ্যাঁ শোন্ তাহলে। ওরাও তো মানুষ! আমাদের চেয়ে যে নিকৃষ্ট স্তরের জীব, তা তো নয়! আমার মা'কে ওরা ডাকত "মাদাম" বলে, ওদের ভাষায় "মাদাম" কথাটার মানে "ভদ্রমহিলা"। কিন্তু "ভদ্রমহিলাটিকে" দেখা যেত, আড়াই-মণি এক-একটা ময়দার বস্তা অক্লেশে বয়ে এনে সার দিয়ে দিয়ে রাখছেন। অসুরের মতো ক্ষমতা ছিল তাঁর গায়ে। আমার যখন উনিশ বছর বয়স তখনো তিনি আমার চুলের মুঠি ধরে পাখির পালকের মতো আমাকে তুলে নিয়ে যেখানে-সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখ্, বিশ বছর বয়সে আমি নিজেও এমন কিছু রোগাপট্‌কা ছিলাম না। এ্যাড্‌জুটাণ্ট মিরন ছিল উঁচুদরের ঘোড়ার সমঝদার, ঘোড়া সে খুব ভালোবাসত। ঘোড়াকে একটু পরিচর্যা করতে পাবার জন্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত সে, হাত নেড়ে ইঙ্গিতে অনুমতি চাইত সবার কাছে। প্রথম প্রথম লোকে ভয় পেত; হাজার হোক শত্রুপক্ষের লোক, হয়তো ঘোড়াগুলোর সর্বনাশ করে দেবে। কিন্তু কিছুদিন পরে গাঁয়ের চাষীরা নিজেরাই ডাকাডাকি

করত মিরনকে : "ওহে মিরন, একটু শুনে যাও তো এদিকে!" ডাক শুনে হাসত মিরন, ষাঁড়ের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে ছুটে আসত। তার চুলগুলো ছিল গাজরের মতো লাল, নাকটা প্রকান্ড, ঠোঁটদুটো পুরু। ঘোড়ার পরিচর্যা-কাজে সে ছিল ওস্তাদ এবং ঘোড়ার নানারকম অসুখের চিকিৎসাও সে জানত। পরে এই নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদে ঘোড়ার চিকিৎসক হিসেবে সে থেকে গেল। কিন্তু লোকটার মাথা খারাপ হয়ে যায়। দমকলের লোকেরা ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। আর সেই অফিসারটির হল কি, ক্রমেই কেমন যেন শুকিয়ে শুকিয়ে আসতে লাগল। তারপর বসন্তকালে একদিন দেখা গেল যে সে মরে পড়ে আছে। এত নিঃশব্দে মরেছে যে কেউ টের পায়নি। সেটা ছিল সেণ্ট নিকোলাই দিবস, স্নানঘরের জানলার সামনে বসে বসে সে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিল, সেই অবস্থাতেই জানলার ওপরে মাথা কাৎ করে মারা গেছে।

'লোকটার জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল, কেঁদেওছিলাম। ভারি ভালো লোক ছিল। আমার কানের কাছে মুখ এনে প্রায়ই সে নিজের ভাষায় শান্ত গলায় কি-সব বলত। তার কথা আমি বুঝতে পারতাম না, কিন্তু ভারি চমৎকার লাগত আমার, বুঝতে পারতাম আমাকে আদর করেই কিছু বলছে। এই সংসারে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে আদর করে কিছু বলছে— এ-জিনিসটাই তো দুর্লভ! একবার সে আমাকে তার নিজের ভাষা শেখাতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু আমার মা বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, মা আমাকে নিয়ে এক পাদরির কাছে হাজির হয়। সেই পাদরি অফিসারটির নামে নালিশ করে আর আমাকে আচ্ছা করে মার দেবার হুকুম দেয়। বুঝলি তো দাদু, সেকালে সব বিষয়েই খুব বেশিরকম কড়াকড়ি ছিল! সেকালে আমাদের যতো কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে একালে তোদের তা করতে হয় না। যেসব কষ্ট তোদের সহ্য করতে হত তা তোরা আসবার আগেই তোদের হয়ে অন্য আরেক দল সহ্য করে গেছে। এই কথাটি কখনো যেন ভুলিসনে দাদু! এই ধর না আমার কথা — কী কষ্টই না আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল!'

অন্ধকার হয়ে আসে। সেই অন্ধকারে দাদামশাই বেখাপ্পা রকমের বড়ো হয়ে ওঠেন, তাঁর চোখদুটো বেড়ালের চোখের মতো জ্বলতে থাকে। দাদামশাই যখন গল্প বলেন তখন তাঁর গলার স্বরটা শান্ত থাকে, ভেবেচিন্তে রসিয়ে-রসিয়ে কথা বলেন; কিন্তু নিজের সম্পর্কে বলতে শুরু করলেই তাঁর গলার স্বরটা আবেগদীপ্ত হয়ে ওঠে, তখন তিনি জাঁক করতে শুরু করেন। দাদামশাইয়ের মুখে তাঁর নিজের কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না।

আর, 'এটা মনে রাখিস, এটা ভুলিসনে' বলে তিনি অনবরত যে উপদেশামৃত বর্ষণ করেন তাও আমার পছন্দ নয়।

এমন অনেক বিষয়ে তিনি আমাকে বলেছেন যা ভুলে যেতে পারলেই আমি খুশি হই। কিন্তু কথাগুলো যন্ত্রণাদায়ক ছুঁচের মতো আমার মনের মধ্যে বিঁধে আছে। কিছুতেই ভুলতে পারি না। আর সেই বিশেষ কথাটি মনে রাখবার উপদেশ তিনি একবারও না দিলেও ভুলতে পারি না। তিনি আমাকে কোনো দিন রূপকথা বলেননি, যা বলেছেন সবই সত্যি ঘটনার বিবরণ। আর আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, প্রশ্ন করলে দাদামশাই বিরক্ত হন। আমিও সেইজন্যে ইচ্ছে করেই হাজার রকম প্রশ্ন করে চলি।

'আচ্ছা দাদামশাই, রুশরা ভালো না ফরাসীরা ভালো?'

'কে জানে বাপু, অত-শত জানিনে। ফ্রান্সে গিয়ে তো আর আমি ফরাসীদের দেখতে যাইনি।' তারপরেই আবার বলেন, 'নিজের গর্তের মধ্যে যখন বসে থাকে তখন ইঁদুরও ভালো!'

'তাহলে রুশরা? রুশরা সবাই ভালো?'

'সবাই নয়, কেউ কেউ। রুশরা যখন ভূমিদাস ছিল তখন তাদের অবস্থা এখনকার চেয়েও ভালো ছিল। ঠিক যেন পেটালোহার মতো। এখন স্বাধীনতা পেয়ে গেছে কিন্তু খাবার সংস্থান নেই। এই ধর্ না কেন ভদ্রলোকদের কথা। ওদের প্রাণে দয়ামায়া বলে কোনো পদার্থ নেই — কিন্তু চাষীদের চেয়ে ওদের সাধারণ বুদ্ধিটা বেশি। অবশ্য সব ভদ্রলোকদের সম্পর্কেই একথা বলা যায় না। কিন্তু কথাটা কি জানিস, কোনো ভদ্রলোক একবার যদি ভালো হয় তবে সে সত্যি সত্যিই খুব ভালো হয়। আবার ভদ্রলোকদের মধ্যেই কতগুলো আছে একেবারে নিরেট বোকা — ঠিক বস্তার মতো। যা খুশি তাই দিয়ে ঠেসে দাও, মুখে রা-টি নেই। আমাদের মধ্যে ভেতর-ফাঁপা লোকের সংখ্যাই বেশি। প্রথমে দেখে মনে হয় যেন একটা গোটা মানুষ, কিন্তু আরেকটু ভালো করে তাকালেই বোঝা যায় যে ভেতরের সমস্ত শাঁস পোকায় খেয়ে ফেলেছে, শুধু খোলসটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখন আমাদের কী দরকার জানিস? দরকার একটু শেখা, দরকার বুদ্ধিকে আরেকটু শানিয়ে তোলা... কিন্ত শান দেবাব মতো কোনো জিনিসই নেই...'

'আচ্ছা রুশদের কি খুব শক্তি আছে?'

'তা কারও কারও আছে বৈকি। তবে শক্তিটা তো আর আসল কথা নয়,

আসল কথা হচ্ছে দক্ষতা। সবচেয়ে শক্তিশালী লোকও দেখবি একটা ঘোড়ার চেয়েও দুর্বল।'

'ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল কেন দাদামশাই?'

'যুদ্ধের কথাই যদি বলিস তো শোন্। ওটা হচ্ছে জারের ব্যাপার, যুদ্ধ হবে কি হবে না তা তিনিই বুঝবেন। আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে ওটা বুঝবার কথা নয়।'

আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, বোনাপার্ট কে? এই প্রশ্নের জবাবে দাদামশাই যা বলেছিলেন তা আমি জীবনে ভুলব না। দাদামশাই বলেছিলেন:

'ও ছিল খুব সাহসী একজন লোক। গোটা পৃথিবীটাকে ও দখল করে নিতে চেয়েছিল। কেন জানিস? ও চেয়েছিল, মানুষে মানুষে কোনো ভেদ থাকবে না — জমিদার থাকবে না, বড় চাকুরে থাকবে না, সব সমান হয়ে যাবে। মানুষের নামগুলোই শুধু আলাদা থেকে যাবে — কিন্তু সুযোগ-সুবিধার কোনো কমতি-বাড়তি হবে না। এমন কি মানুষের ধর্মকর্মগুলো পর্যন্ত এক হয়ে যাবে। কথাটার অবশ্যই কোনো মানে হয় না; একমাত্র কাঁকড়া ছাড়া আর কোনো প্রাণীই সবাই একরকম হয় না। এই ধর না মাছের কথা—মাছের মধ্যে পর্যন্ত কত আলাদা আলাদা ধরন-ধারণ রয়েছে। চাঁদামাছ সামন মাছ দেখলে পালিয়ে পালিয়ে যায়, হেরিংমাছ আর স্টার্জনমাছ তো পাশাপাশি থাকতেই পারে না। আমাদের দেশেও এমনি ধরনের বোনাপার্টরা ছিল — যেমন ধর, স্তেপান রাজিন বা এমেলিয়ান পুগাচভ*। কিন্তু এদের কথা আজ থাক্, আরেক দিন শুনবি...'

মাঝে মাঝে চোখদুটোকে বড়ো বড়ো করে আমার দিকে বহুক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হয় যেন তিনি এই প্রথম আমাকে দেখছেন। বড়ো অস্বস্তি লাগে আমার।

কিন্তু আমার বাবা বা মা'র কথা কোনো দিন আমি দাদামশাইয়ের মুখে শুনিনি।

আমাদের দুজনের মধ্যে যখন এই ধরনের কথাবার্তা হয় তখন মাঝে মাঝে দিদিমা এসে ঢোকেন ঘরে। নিঃশব্দে কোণের একটি আসনে বসে চুপচাপ শোনেন আমাদের কথা। তারপর হঠাৎ একেক সময়ে তাঁর স্বাভাবিক

* কৃষক-অভ্যুত্থানের দুজন নেতা। — সম্পাঃ

দরদভরা গলায় একেকটা প্রশ্ন করে বসেন, 'কর্তা, মনে পড়ে আমরা সেই যে মেরীমাতার কাছে প্রার্থনা করার জন্য মুরোম তীর্থে গিয়েছিলাম, কি ভালোই না লেগেছিলো? সেটা কোন বছর বল তো?'

'তা আমার ঠিক মনে নেই। তবে যে বছর কলেরা লেগেছিল, তার আগে। সেই যে গো, ওলন্‌চানরা বনে গিয়ে পালিয়েছিল আর তাদের খুঁজে বার করবার জন্যে সারা বন তোলপাড় করা হয়েছিল — সেই বছর।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। এবার আমার মনে পড়ছে, সেই লোকগুলোকে কী ভয়ই না করতাম আমরা!..'

'হুঁ!'

ওলন্‌চানরা কারা, আর কেনই বা তারা বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, আমি সেকথা জিজ্ঞেস করি। অনিচ্ছার সঙ্গে দাদামশাই জবাব দেন:

'ওরা হচ্ছে একদল গাঁয়ের লোক — ভূমিদাস। জারের কারখানায় কাজ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।'

'ওদের ধরল কী করে?'

'আর কী করে ধরবে? দেখিসনি, বাচ্চারা যখন খেলা করে তখন একদল ছোটে আর একদল তাদের পাকড়াও করবার জন্যে পেছনে পেছনে ধাওয়া করে। আর একবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। সমানে চলবে চাবুক আর বেতের বাড়ি, নাক ফেটে যাবে আর তারপর কপালের ওপরে দাগী বলে ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হবে।'

'কেন? ছাপ লাগাবে কেন?'

'কেন কে জানে? আগাগোড়া ব্যাপারটাই ছিল ভারি অস্পষ্ট। কেউ বলতে পারত না দোষটা কার — যারা পালিয়েছে তাদের না যারা পাকড়াও করেছে তাদের।'

দিদিমা আবার অন্য একটা কথা পেড়ে বসেন: 'মনে আছে গো তোমার, সেই যে মস্ত এক অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল — সেই সময়কার কথা?'

'কোন্ অগ্নিকাণ্ডের কথা বলছ তুমি?' একটা অবিচলিত জেদের সঙ্গে দাদামশাই প্রশ্ন করেন, যে-বিশেষ ঘটনার কথা দিদিমা বলছেন সে-সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে চান।

পুরনো স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়ে আমার উপস্থিতির কথা দুজনেই ভুলে যান। শান্তভাবে কথা বলেন দুজনে, সেই কথায় এমন একটা পরিমিত ছন্দ আছে যে মনে হয় একসঙ্গে একটা গান গাইছেন দুজনে। বড় বিষণ্ণ

বিষয়বস্তু সেই গানের — কবে আগুন লেগেছিল আর মহামারী শুরু হয়েছিল, কোথায় মানুষকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়েছে, দুর্ঘটনায় মারা গেছে কোন্ লোক, জাল-জোচ্চুরি, ধর্মান্ধতা, উচ্চতর শ্রেণীর ভদ্রলোকদের ক্রোধোন্মত্ততা, এই সব।

দাদামশাই বিড়বিড় করে বলেন, 'কত কিছুই না এই চোখদুটো দিয়ে দেখতে হয়েছে! কত ঝড়ঝাপ্টাই না গেছে এই জীবনটার ওপর দিয়ে!'

দিদিমা বলেন, 'আর আমাদের জীবনটা যে খুব খারাপ কাটিয়েছি— তাও নয়। কি বলো? ভারিয়ার যখন জন্ম হয়, কি সুন্দর বসন্তকাল এসেছিল সেবার!'

'সেটা ছিল ১৮৪৮ সালের কথা, সেই বছরেই হাঙ্গেরির ওপরে আমাদের সৈন্যরা চড়াও হয়। ভারভারাকে যেদিন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হল তার পরদিনই ওর ধর্মবাপ তিহনকে নিয়ে চলে যায়...'

দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, 'সেই যাওয়াই ওর শেষ যাওয়া।'

'হ্যাঁ, শেষ যাওয়া! সেই দিন থেকেই ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি আমরা পেয়েছি। ভেলার ওপর দিয়ে জল যেমন অনবরত গড়িয়ে পড়ে তেমনি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিও আমাদের ওপর গড়িয়ে এসেছিল। আহ-হা ভারভারা... সর্বনাশী...'

'যাক্ গিয়ে, ওসব কথা আর তুলো না...'

'কেন তুলব না?' দাদামশাই রেগে ওঠেন, 'ছেলেমেয়েগুলো সব অপোগণ্ড হয়েছে, একটাও যদি কোনো একটা দিকেও একটু ভালো হত! আমাদের শক্তি-সামর্থ্য মিথ্যেই আমরা জলাঞ্জলি দিয়েছি! আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম, একটা নিটোল ও অক্ষত পাত্রে চলেছে ভবিষ্যতের সঞ্চয়। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই লীলা যে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, যেটাকে আমরা নিটোল ও অক্ষত পাত্র বলে মনে করেছিলাম সেটা আসলে একটা ঝাঁজরা চালুনি...'

দাদামশাই এমনভাবে চিৎকার করে ওঠেন যেন কোনো কিছুতে ছ্যাঁকা লেগেছে, ঘরের চারদিকে ছুটোছুটি লাগিয়ে দেন, হা-হুতাশ করেন, নিজের ছেলেমেয়েদের যাচ্ছেতাই বলতে থাকেন আর হাড়-বের-করা হাতের মুঠি পাকিয়ে দিদিমাকে শাসাতে থাকেন।

'তোমার দোষেই ছেলেমেয়েগুলো উচ্ছন্নে গেছে। ডাইনী বুড়ী, সায় দিউনী!..'

গলার স্বরে এত বেশি তিক্ততা থাকে, যে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, ছুটে গিয়ে উপাসনা-বেদীর সামনে দাঁড়ান আর টিপ্‌টিপে রোগা বুকে চাপড় মারতে মারতে কান্নাভরা গলায় বিলাপ করতে থাকেন:

'তোমার কাছে আমি কী দোষ করেছি প্রভু? আমার মতো দুর্ভাগা আর তো কাউকে দেখিনে!'

ভিজে চোখদুটোতে যন্ত্রণা আর অভিসম্পাতের চিহ্ন ফুটে ওঠে, চক্‌চক করে চোখদুটো, সারা শরীর কাঁপে।

দিদিমা অন্ধকার কোণটিতে নিঃশব্দে বসে থাকেন আর বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন আঁকেন। শেষকালে দিদিমা উঠে এসে দাদামশাইয়ের কাছে দাঁড়ান, মিনতিভরা স্বরে বলেন:

'কেন মিথ্যে নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? প্রভুর লীলা একমাত্র তিনি নিজেই বোঝেন। আর সব বাড়িতেই তো এই এক অবস্থা — আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতোই অন্য সব বাড়ির ছেলেমেয়ে। দিনরাত শুধু ঝগড়া মারামারি নিয়েই আছে। সব বাপ-মাকেই চোখের জলে নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। একা তুমি নও...'

মাঝে মাঝে দিদিমার এই কথা শুনে দাদামশাই শান্ত হন, এবং ক্লান্তভাবে বিছানায় শুয়ে পড়েন। দাদামশাই শুয়ে পড়লে পর আমরা দুজনে পা টিপে টিপে ছাদের ঘরে চলে যাই।

কিন্তু একদিন হয়েছে কি, দাদামশাইকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে দিদিমা সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দাদামশাই দিদিমার মুখের ওপরে দুম্‌ করে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারলেন। দিদিমার সারা শরীরটা টলে উঠল, হাত দিয়ে তিনি নিজের ঠোঁটদুটো চেপে ধরলেন। তারপর একটু সামলে উঠতে পারলে পর শান্ত অনুত্তেজিত স্বরে বললেন:

'তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে...' বলে তিনি দাদামশাইয়ের পায়ের কাছে মুখ থেকে রক্ত ফেললেন। মাথার ওপর দু-হাত তুলে দাদামশাই চেরা গলায় চিৎকার করতে লাগলেন:

'বেরিয়ে যাও বলছি! নইলে খুন করব!'

'বুদ্ধিশুদ্ধি গেছে!' দরজার দিকে যেতে যেতে দিদিমা আবার বললেন। দাদামশাই ছুটে এলেন দিদিমার পিছনে পিছনে। কিন্তু দিদিমা একটুও তাড়াহুড়ো না করে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে এসে দাদামশাইয়ের মুখের ওপরেই সশব্দে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

'ডাইনী মাগী!' দাঁতে দাঁত চেপে দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন। জ্বলন্ত কয়লার মতো ফুঁসছেন তিনি, দরজার বাজুটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছেন, হাতের নখ দিয়ে আঁচড় কাটছেন বাজুর ওপরে।

চুল্লির উপরে মৃতপ্রায় অবস্থায় আমি বসেছিলাম। নিজের চোখকে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার সামনেই দিদিমার গায়ে হাত তুলতে দাদামশাইকে আমি এই প্রথম দেখছি। ব্যাপারটার কুশ্রীতায় আমি যেন চুরমার হয়ে গেছি! দাদামশাইয়ের এক নতুন চেহারা আমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে এবং এই চেহারাটা এমনই যে কোনো কিছু দিয়েই সমর্থন করা যায় না; ভয়ঙ্কর একটা বোঝার মতো সে চেপে ধরেছে আমাকে। দরজার বাজু আঁকড়ে ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন দাদামশাই। একটু একটু করে কুঁকড়ে যাচ্ছেন, একটু একটু করে ম্লান হয়ে যাচ্ছেন আর যেন সারা গায়ে ছাইয়ের গুঁড়ো এসে পড়েছে। হঠাৎ ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, হাঁটু মুড়ে বসে দুই হাতে ভর রেখে ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে। তারপরেই আবার শরীরটাকে টান করে নিয়ে দুই হাতে বুকের ওপর চাপড় মারতে মারতে চিৎকার করে উঠলেন:

'হায় ঈশ্বর! হায় ঈশ্বর!..'

চুল্লির আঁচে গরম তাকের ওপর থেকে আমি নেমে এলাম। তারপর ছুটে গেলাম ওপরে। দিদিমা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন আর জল দিয়ে মুখ কুলকুচো করছেন।

'ব্যথা লাগছে?'

এক কোণে গিয়ে ময়লা জল ফেলবার বালতির মধ্যে তিনি মুখ কুলকুচো করে জল ফেললেন। তারপর শান্তস্বরে জবাব দিলেন: 'নাঃ, ঠিক আছে। দাঁত ভাঙেনি, শুধু ঠোঁটের ওপর কেটে গেছে খানিকটা।'

'দাদামশাই কেন করলেন একাজ?'

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দিদিমা জবাব দিলেন, 'মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। বুড়ো হয়েছে তো, আর জীবনের ওপর দিয়ে কম ঝড়ঝাপ্‌টা তো যায়নি, এ-অবস্থায় মেজাজ ঠিক রাখা খুবই শক্ত... আচ্ছা, তুই এবারে শুয়ে পড় গে যা। এ ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলিস...'

আমি আরও কি যেন একটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক তীব্রতার সঙ্গে তিনি জবাব দিলেন, 'কথা কানে ঢুকছে না বুঝি?.. ভারি ত্যাঁদড় ছেলে তো...'

জানলার সামনে বসে তিনি ঠোঁট চুষতে লাগলেন। মাঝে মাঝে থুতু ফেলতে লাগলেন রুমালের মধ্যে। জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে আমি দিদিমার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দিদিমার মাথার ওপর দিয়ে একটুকরো চৌকোণা তারা-ছিটনো আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাইরে চারদিক ভারি শান্ত, ভিতরে থমথমে অন্ধকার।

আমি বিছানায় শুয়ে পড়তেই দিদিমা এগিয়ে এলেন বিছানার কাছে, আমার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তুই ঘুমো, ঘুমের মধ্যে ছট্‌ফট করিসনে যেন... আমি তোর দাদামশাইয়ের কাছে যাচ্ছি... সোনা আমার, আমার কথা ভেবে মন খারাপ করিসনে... আমার নিজের দোষটাও কম নয়... আচ্ছা, এবার ঘুমো তুই!'

আমাকে চুমু খেয়ে দিদিমা বেরিয়ে গেলেন। আমার মনটা অসহ্য খারাপ হয়ে গেল। নরম ও উষ্ণ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে আমি গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালাম। বাইরে জনশূন্য রাস্তা, অসহ্য এক যন্ত্রণায় বোবা হয়ে সেই রাস্তার দিকে চেয়ে রইলাম আমি।

ছয়

জীবনটা আমার আবার রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে উঠল। একদিন সন্ধ্যার সময় চা খাবার পরে আমি দাদামশাইয়ের পাশে বসে প্‌সাল্টির থেকে পড়া করছি, দিদিমা ডিশ ধুচ্ছেন—এমন সময় ছুটতে ছুটতে ইয়াকভ-মামা এসে হাজির। ইয়াকভ-মামার তেমনি চিরাচরিত উষ্ক-খুষ্ক চেহারা — জীর্ণ ঝাঁটার মতো দেখাচ্ছে তাকে। ঘরে ঢুকে কোনোরকম কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করল না; টুপিটা কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলে ভয়ানক উত্তেজিতভাবে হাত নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল:

'মিখাইলটা হুলস্থুল কান্ড বাধিয়ে দিয়েছে, বাবা! আমাদের ওখানে সন্ধ্যের সময় খেতে এসেছিল, তারপর মদ খেয়ে কান্ডজ্ঞান হারিয়েছে আর ভয়ানক পাগলামি শুরু করে দিয়েছে। সে যে কী পাগলামি তা আর কী বলব। কাপডিশ ভেঙেছে; একজনের ফরমাশী একটা পশমের পোশাক ছিল, সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে; জানলা ভেঙেছে; আমাকে আর গ্রিগরিকে গালাগালি দিয়েছে। এখন রাস্তায় বেরিয়েছে এদিকে আসবে বলে। আপনার ওপরে কী রাগ! রাগে ফুঁসছে আর বলছে, বুড়োকে আজ দেখে

নেব! বুড়োর দাড়িগুলো সব উপড়িয়ে ফেলব! বুড়োকে খুন করব! এসব কথা চিৎকার করে বলছে আর এদিকে আসছে। আপনি বরং রাস্তার দিকে একটু নজর রাখবেন...'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দাদামশাই আস্তে আস্তে দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মুখটা বেঁকে নাকের দিকে উঠে এল—ঠিক যেন একটা ধারালো টাঙ্গির মতো দেখতে হল।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে দাদামশাই উচ্চ স্বরে চিৎকার করলেন, 'শুনলে তো তোমার ছেলের কীর্তি! কী গুণধর ছেলে! নিজের বাপকেই খুন করতে চায়! কী মনে হচ্ছে গো তোমার! তবে হ্যাঁ, আমিও বলে রাখছি... আর সময় হয়ে এসেছে... সময় হয়ে এসেছে...'

কাঁধদুটোকে টান করে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন, তারপর দরজার কাছে গিয়ে প্রকাণ্ড লোহার হুড়কোটা তুলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

'আসল ব্যাপারটা যে কী, তা আমি জানি।' ইয়াকভ-মামার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'তোমাদের দুজনেরই নজর রয়েছে ভারভারার যৌতুকের টাকাটার ওপর। কিন্তু জেনে রেখো, কিচ্ছু লাভ নেই, এই অষ্টরম্ভাটি পাবে।' বলে তিনি হাতের আঙুলগুলো ইয়াকভ-মামার নাকের নিচে নাচাতে লাগলেন।

'তা আমার ওপর তম্বি করে লাভ কী?' লাফিয়ে দু-পা পিছনে সরে গিয়ে অপমানিত স্বরে ইয়াকভ-মামা বলল।

'তোমাকে চিনতে বাকি আছে? তুমিও এই দলে আছ।'

দিদিমা একটি কথাও বললেন না। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করে কাপডিশগুলো আলমারিতে তুলে রাখতে লাগলেন।

'আমি তো এসেছিলাম আপনাকে বাঁচাতে।'

বিদ্রুপের হাসি হেসে দাদামশাই বললেন, 'তাই নাকি? বেশ, বেশ! বাস্তবিক ভালো রসিকতা জানিস! কোথায় গেলে গো গিন্নী, তোমার এই শয়তানের ধাড়ী পুত্ররত্নটির হাতে যা-হোক একটা কিছু দিয়ে রাখ, চুল্লী খোঁচাবার লোহা বা ইস্ত্রি বা এই ধরনের যা-হোক কিছু। আর তোমাকেও বলে রাখছি ইয়াকভ ভাসিলিয়েভিচ — দরজা ভেঙে যেই না তোমার ভাইটি ঘরে ঢুকবে অমনি ধাঁই করে তাকে এক ঘা কষিয়ে দিও! সব দায়িত্ব আমার!'

মামা হাতদ্বটো পকেটে ঢুকিয়ে এককোণে সরে দাঁড়াল।

'বেশ, আমার কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়...'

মেঝের ওপরে পা ঠুকতে ঠুকতে দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন, 'তোর কথায় বিশ্বাস করব? তোর কথায়! আমি বরং বেড়ালকে বিশ্বাস করব, ইঁদ্বরকে বিশ্বাস করব, কুকুরকে বিশ্বাস করব — কিন্তু তোকে বিশ্বাস করব না। ভাবছিস, আমি কিছ্ব ব্বঝি না? তোরই কাজ এটা — তুই-ই ওকে মদ খাইয়ে খাইয়ে মাতাল করে ক্ষেপিয়ে তুলেছিস! এখন হয় তুই তোর ভাইকে খ্বন করবি, না হয় আমাকে খ্বন করবি—যা-হোক একটা কিছ্ব করতে হবে তোকে! কোন্‌টা করবি, এখন থেকেই ঠিক করে রেখে দে!'

আমার দিকে ফিরে দিদিমা চাপা স্বরে বললেন, 'যা তো, ছ্বটে ওপরের ঘরে চলে যা। জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ্‌ তো গিয়ে মিখাইল-মামা আসে কিনা। যদি দেখিস আসছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিয়ে যাবি। যা, ছ্বটে চলে যা!'

দিদিমার কথা শ্বনে আমি ওপরের ঘরে গিয়ে জানলার পাশে স্থান করে নিয়ে দাঁড়ালাম। রাগে ফ্বঁসতে ফ্বঁসতে আমার মামা যখন এসে হাজির হবে তখন কী কান্ডটা যে হবে তা ভেবে একটু ভয়-ভয়ও করছিল আমার। আবার, এমন একটি দায়িত্বপ্বর্ণ কাজের ভার যে আমার ওপর দেওয়া হয়েছে তাই ভেবে গর্বে ফুলেও উঠছিল ব্বকটা। চওড়া রাস্তা, প্বর্ব হয়ে ধ্বলো জমেছে আর সেই ধ্বলোর মধ্যে মধ্যে জেগে আছে পাথরের গোল কিনারাগ্বলো। রাস্তাটা বাঁ দিকে অনেক দ্বর পর্যন্ত চলে গেছে, একটা নালা ডিঙিয়ে অস্ত্রোজনায়া স্কোয়ার পর্যন্ত। সেখানে কাদামাটির মতো জমি, তারই ওপর টান করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্বরনো জেলখানার ছাইরঙা বাড়িটা। চারকোণে চারটে উঁচু উঁচু গম্ব্বজ। এই চিত্তাকর্ষক বাড়িটায় কেমন একটা বিষাদমাখা সৌন্দর্য আছে। ডানদিকে, আমাদের বাড়ি থেকে তিনটে বাড়ি পরেই রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে সেন্নায়া স্কোয়ারে। স্কোয়ারের অন্য দিকের সীমানায় আর একটি জেলের হল্‌দে ব্যারাক আর ছাইরঙা অগ্নি-গম্ব্বজ। কোথাও আগ্বন লেগেছে কিনা দেখবার জন্যে এই গম্ব্বজের ওপর থেকে একজন লোক চারদিকে নজর রাখে; শেকলবাঁধা কুকুরের মতো অনবরত চক্রাকারে ঘ্বরে বেড়ায় লোকটি। কতগ্বলো সর্ব্ব সর্ব্ব নালা স্কোয়ারটাকে চিরে দিয়েছে, তার মধ্যে একটি নালা সব্বজ ক্লেদে ভরা। ডানদিকে দ্যুকভ প্বকুর। দিদিমার ম্বখে শ্বনেছি, এই দ্যুকভ প্বকুরেই

একবার আমার মামারা আমার বাবাকে বরফের একটা ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। যে-জানলায় আমি দাঁড়িয়ে আছি তার প্রায় উল্‌টো দিকেই একটা গলি-রাস্তা, দু-ধারে বিচিত্রবর্ণের ছোট ছোট বাড়ি; 'তিন ঋষির' গির্জায় গিয়ে গলিটা শেষ হয়েছে। জানলা দিয়ে সোজাসুজি বাইরের দিকে তাকালে বাড়ির চালগুলোকে মনে হয় যেন সবুজ গাছপালার ঢেউয়ের মাঝখানে কতগুলো উল্‌টনো নৌকো।

আমাদের এই রাস্তার বাড়িগুলোর গায়ে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। সারাটা শীতকাল তুষার লেগে-লেগে আর শরৎকালের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ধুয়ে-ধুয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে বাড়িগুলো। গির্জার চত্বরে অপেক্ষমাণ ভিখিরির পালের মতো জড়াজড়ি গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলো, উদ্‌গত জানলার প্রচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে চারদিক। মনে হয়, আমি যেমন একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি, তেমনি এই বাড়িগুলোও কোনো কিছুর অপেক্ষা করছে। রাস্তায় যা দু-একজন লোককে দেখা যাচ্ছিল তাদের কারও কোনো তাড়াহুড়ো নেই; আরশোলা যেমন চিন্তাভারগ্রস্তের মতো উনুনের গা বেয়ে ওঠে, তাদের চলাফেরাও তেমনি। ভারী গরম বাতাসের হল্‌কা উঠে আসছিল জানলার কাছে, বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছিল বসন্তকালের পেঁয়াজ বা গাজরে ঠাসা 'পিরগ' রান্নার বিশ্রী একটা গন্ধ। এই গন্ধটায় আমার মন সর্বদা বিষন্ন হয়ে ওঠে।

দৃশ্যটা অস্বস্তিকর — এমন অদ্ভুত রকমের অস্বস্তিকর যে প্রায় অসহ্য। আমার বুকের ভিতরটা যেন গলা সীসেতে ভর্তি হয়ে গেছে, বুকে আর পাঁজরে অনবরত ধাক্কা দিচ্ছে সেই সীসে, বুদ্‌বুদের মতো আমি যেন ক্রমশ ফুলে ফুলে উঠছি — শেষকালে মনে হতে লাগল, কফিনের ঢাকনার মতো সিলিং চাপা এই ছোট ঘরের মধ্যে আমি আর কিছুতেই আঁটতে পারি না।

হঠাৎ মিখাইল-মামাকে আমি দেখতে পেলাম। উল্‌টো দিকের গলি-রাস্তাটার কোণে যে ছাইরঙা বাড়িটা আছে তারই পিছন থেকে মিখাইল-মামা উঁকি দিয়ে দেখছে। মাথার টুপিটা টেনে নামিয়ে দিয়েছে নিচের দিকে, ফলে কানদুটো বেরিয়ে আছে দু-দিকে। পরনে খাটো লালচে রঙের কোট আর হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা ধুলো-মাখা বুটজুতো। একটা হাত ঢুকিয়েছে চৌকো নক্সার প্যাণ্টের একটা পকেটে, অপর হাতে দাড়ির গোছা মুঠো করে ধরে আছে। মিখাইল-মামার মুখটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু মিখাইল-মামার

দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন মতলব করছে, একলাফে রাস্তাটা পেরিয়ে এসে কালো লোমশ হাতের থাবা দিয়ে দাদামশাইয়ের বাড়িটাকে গ্রাস করবে। আমার উচিত ছিল তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গিয়ে সবাইকে বলা যে মিখাইল-মামা এসে গেছে কিন্তু জানলাটার কাছ থেকে আমি কিছুতেই নিজেকে সরিয়ে আনতে পারছিলাম না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, মিখাইল-মামা পা টিপে টিপে রাস্তা পার হচ্ছে — পা ফেলার ধরন দেখে মনে হতে পারে, ছাইরঙা বুটজুতোয় রাস্তার ধুলো-ময়লা লেগে যাবার আশঙ্কায় যেন সে সন্ত্রস্ত। তারপরেই শুনতে পেলাম, দরজা খোলার কিচ-কিচ শব্দ আর কাঁচের ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ — মিখাইল-মামা শুঁড়িখানার দরজা খুলছে।

ছুটে নিচে গিয়ে আমি দাদামশাইয়ের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম।

দাদামশাই দরজা খুললেন না, ভিতর থেকে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে? ও, তুমি? কি চাই? শুঁড়িখানায় ঢুকেছে বলছ? আচ্ছা বেশ, যেখানে ছিলে সেখানেই যাও আবার!'

'আমার ভয় করছে...'

'কিছু হবে না।'

আমি আবার ফিরে গেলাম। অন্ধকার হয়ে আসছে। ক্রমশ আরো পুরু ও আরো কালো হয়ে আসছে রাস্তার ধুলো। জানলায় জানলায় দেখা যাচ্ছে চক্‌চকে হল্‌দে বাতি। রাস্তার উল্‌টো দিকের বাড়ি থেকে তারের বাজনার শব্দ ভেসে আসছে — বিষণ্ণ একটা গানের সুর কিন্তু ভারি চমৎকার। শুঁড়িখানায় কে যেন গান গাইছে। যখনই কেউ দরজা খোলে, একটা ভাঙা-ভাঙা ক্লান্ত স্বরের গান আমি শুনতে পাই। কানা ভিখিরি নিকিতুশ্‌কার গলা। বুড়ো হয়েছে নিকিতুশ্‌কা, একমুখ দাড়ি, বাঁ চোখের পাতা শক্তভাবে আঁটা, ডান চোখটা টকটকে লাল অঙ্গারের মতো। দরজাটা খুলছে, বন্ধ হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গানটাও কুড়ুল দিয়ে কাটার মতো টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

এই ভিখিরিটির ওপর আমার দিদিমার ভয়ানক হিংসে। যতোবার ওকে গান গাইতে শোনেন, ততোবারই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর বলেন, 'লোকটার কী বরাত! কতো সুন্দর গান গাইতে জানে!'

মাঝে মাঝে তিনি ওকে আমাদের বাড়ির মধ্যে ডেকে আনেন। অলিন্দের ওপর বসে ও, হাতের লাঠিটার ওপর শরীরের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে, তারপর

গান গায় ও আবৃত্তি করে। দিদিমা বসেন ঠিক ওর পাশটিতে, ওর গান বা আবৃত্তির মাঝখানেই মাঝে মাঝে নানারকম প্রশ্ন করে ওঠেন।

'তার মানে তুমি বলতে চাও যে মেরীমাতা র‍্যাজানেও গিয়েছিলেন?'

নীচু গলায় ও জবাব দেয়, 'মেরীমাতা যাননি এমন কোনো জায়গা নেই...'

একটা ক্লান্ত ঝিমুনি অলক্ষ্যে যেন রাস্তাটাকে গ্রাস করছে। আমার বুকের ওপরেও যেন চেপে বসেছে এই ঝিমুনির ভাব, আমার চোখদুটো ঘুমে ঢুলে আসছে। এই সময়ে যদি আমার দিদিমা আমার পাশটিতে থাকতেন! এমন কি, দাদামশাইও যদি থাকতেন! আমার বাবা নিশ্চয়ই এই বিচিত্র প্রকৃতির লোক ছিল। দাদামশাই ও মামারা আমার বাবার ওপরে এমন হাড়ে-হাড়ে চটা কেন? দিদিমা, গ্রিগরি আর ইয়েভগেনিয়া-ধাই আবার বাবার প্রশংসায় এমন পঞ্চমুখ কেন? আর মাই বা কোথায় চলে গেল?

সম্প্রতি মা'র কথাটাই আমার বারবার করে মনে পড়ে। কল্পনার চোখে দেখি, দিদিমা আমাকে যা-কিছু গল্প ও কাহিনী বলেন তার নায়িকা হচ্ছে আমার মা। মা যে নিজের বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকতে চায়নি এতে মা'র ওপরে আমার শ্রদ্ধা আরো অনেক বেশি বেড়ে গেছে। মনে মনে কল্পনা করি, মা আছে কোনো এক সরাইখানায় এক দস্যুদলের সঙ্গে। তারা ধনীদের টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলি করে। কিংবা মা হয়তো আছে গভীর অরণ্যে এক গুহার মধ্যে, এখানেও আছে তেমনি এক দরাজ-দিল ডাকাতের দল, মা তাদের জন্যে রান্না করে আর তাদের লুণ্ঠিত সোনা পাহারা দেয়। আবার কোনো কোনো সময়ে কল্পনা করি আমার মা যেন 'ডাকাত-রাজকুমারী' ইয়েনগালিচেভার মতো পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর ধনদৌলত গুণে দেখবার জন্যে। তার সঙ্গে আছেন পুণ্যময়ী মেরীমাতা। 'ডাকাত-রাজকুমারীকে' তিনি যা বলেছিলেন, আমার মাকেও তাই বলছেন:

> ধরণীর গর্ভ হতে, লুব্ধা, তব তরে --
> উত্তোলিত হয় নাই রজত-কাঞ্চন;
> ঢাকিতে নারিবে কভু, রে লালসাময়ী
> তব লজ্জা পৃথিবীর সকল সম্পদ...

এই শুনে 'ডাকাত-রাজকুমারী' যে-ভাষায় জবাব দিয়েছিল আমার মাও ঠিক সেই জবাবই দিচ্ছে:

> পুণ্যময়ী দেবী মোর ক্ষমা কর মাতা,
> আত্মা মোর কলুষিত, দয়া কর মোরে;

কিন্তু নহে নিজ তরে, প্রিয় পত্র লাগি
আমার এ দস্যুবৃত্তি, সম্পদ লুণ্ঠন।

পুণ্যময়ী মেরীমাতার মনটা ছিল আমার দিদিমার মতোই নরম। আমার মা'র জবাব শুনে মাকে তিনি ক্ষমা করলেন এবং বললেন:

চতুরা শৃগালী সম রে ভারিয়া তুই
তাতারী চরিত্র তব শোধন অযোগ্য!
নিজ পথ একান্তই না ছাড়িবি যদি — তবে পথ বাছি লহ,
দিবাভাগ কর্ পরিহার
কিন্তু যেন রুশভূমি নিবাসী মানব নাহি হয়
তব হস্তে কভু নিপীড়িত,
অরণ্যের পথে মর্দোভীয় কেহ কষাঘাতে না হয় জর্জর,
কালমিক কেহ যেন স্তেপ-ভূমে না হয় নিহত ..

মনে হতে লাগল, আমি স্বপ্ন দেখছি। এই সমস্ত গল্পগাথা আমার স্মৃতিতে ভিড় করে আসতে লাগল আর আমি তার মধ্যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললাম। হঠাৎ নিচের বারান্দার দিক থেকে একটা তর্জন-গর্জন ও হুটোপাটির শব্দ প্রচণ্ড ধাক্কায় জাগিয়ে দিল আমাকে। জানলা দিয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখলাম — আমার দাদামশাই, ইয়াকভ-মামা আর শুঁড়িখানার মালিকের অদ্ভুত চেহারার চাকর মেলিয়ান, এই তিনজনে ধাক্কা দিতে দিতে মিখাইল-মামাকে গেট দিয়ে রাস্তায় বার করে দিচ্ছে। মিখাইল-মামা তেড়েফুঁড়ে ফিরে আসছে বারবার আর ওরা তাকে লাথি মারছে, তার হাতে-পিঠে-কাঁধে সমানে কিল-চড় চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মিখাইল-মামা ছিট্‌কে গিয়ে রাস্তার ধুলোর ওপরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গেটটা দড়াম করে বন্ধ করে এ'টে দেওয়া হল একেবারে। দেওয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল মিখাইল-মামার দুমড়ানো-মোচড়ানো টুপিটা। তারপরেই সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় পড়ে থেকে উঠে দাঁড়াল মিখাইল-মামা। জামাপ্যাণ্ট ছিঁড়ে গেছে, বিপর্যস্ত চেহারা, উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তা থেকে পাথর তুলে ছুঁড়ে মারল গেটের দিকে। নলের মধ্যে নুড়ি ফেললে যেমন ফাঁপা আওয়াজ হয় তেমনি আওয়াজ হল একটা। শুঁড়িখানা থেকে কালো মুখওলা একদল লোক পিলপিল করে বেরিয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল আর হাত নাড়তে লাগল। বাড়ির জানলাগুলো থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল মানুষের মাথা, হাঁকডাক-চিৎকার-হাসিতে প্রাণের সাড়া জাগল রাস্তায়। এও

একটা র্পকথার গল্পের মতো — মনকে টানে কিন্তু ভালো লাগে না, এমন কি ভয় জাগিয়ে তোলে।

হঠাৎ এই দৃশ্যের ওপরে যবনিকা নেমে এল। চারদিক জনমানবশূন্য ও নিস্তব্ধ।

...দরজার কাছে ট্রাঙ্কের ওপরে আমার দিদিমা বসে আছেন। নিশ্চল শরীরটা কুঁজো হয়ে দলা পাকিয়ে ছোট্ট এতটুকু হয়ে গেছে যেন, নিশ্বাসও পড়ছে না বোধ হয়। আমি দিদিমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তাঁর নরম উষ্ণ ভিজে গালের ওপরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে। কিন্তু মনে হচ্ছে, দিদিমা তা টের পাচ্ছেন না, বসে বসে আপন মনেই শুধু বিড়বিড় করে বলে চলেছেন:

'হায় প্রভু, তোমার বিচার-বিবেচনার ভান্ডার কি এতই ছোট যে আমার আর আমার ছেলেমেয়েদের বেলায় তার ছিটেফোঁটাটুকুও অবশিষ্ট রইল না? তুমিই সহায় প্রভু...'

যতোদূর মনে পড়ে, পলেভায়া স্ট্রীটের বাড়িতে এক বছরের বেশি আমার দাদামশাই ছিলেন না — এক বসন্ত থেকে আরেক বসন্ত পর্যন্ত। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়িটার কুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় প্রতি রবিবারেই রাস্তার চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলো ছুটতে ছুটতে আমাদের বাড়ির গেটের সামনে আসত আর সারা পাড়াকে জানানি দিয়ে প্রচন্ড উল্লাসে চিৎকার করত:

ওরে, আয় রে আয়, কাশিরিনদের বাড়িতে আবার মারামারি শুরু হয়েছে!'

সাধারণত মিখাইল-মামা আসত সন্ধ্যার সময় আর সারা রাত এখান থেকে নড়ত না। বাড়ির লোকেরাও একটা আতঙ্ক নিয়ে মারামারির জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করত। মাঝে মাঝে আবার মিখাইল-মামার সঙ্গে থাকত তার দু-তিনজন চ্যালা—কুনাভিনো কারখানার গুন্ডা-ধরনের ছোক্‌রা সব। নালা পার করে তারা এসে ঢুকত বাগানে আর সেখানে তাদের মাতলামির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে যেত। বাগানে ফুলফলের যা কিছু গাছগাছড়া ছিল সমস্ত উপড়ে ফেলেছিল। একদিন এসে তারা ঢুকল স্নানঘরে এবং সেখানে ভাঙবার মতো যা কিছু ছিল সমস্ত ভেঙে চুরে স্নানঘরটা একেবারে নষ্ট করে দিয়ে গেল। বেঞ্চি, তাক, জল ফুটবার বয়লার কিছুই তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল না। চুল্লিটাকে

ভেঙে দু-খানা করে ফেলল, মেঝে থেকে কয়েকটা পাটাতন টেনে উপড়ে ফেলল, বাজু সমেত দরজাটা ফাঁক করে ফেলল একেবারে।

দাদামশাই কালো মুখে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন তাঁর জিনিসপত্র ভাঙাচোরার শব্দ। দিদিমা ছুটে চলে গেলেন উঠোনের কোথায় এবং উঠোনের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন একেবারে। শুধু তাঁর কাতর মিনতিভরা গলার স্বর ভেসে আসল:

'মিখাইল! ওরে মিখাইল! কি করছিস তুই ভেবে দ্যাখ্!'

উত্তরে কুৎসিত প্রলাপের মতো কতগুলি গালি ভেসে এল। যে-জানোয়ারেরা এই গালিগুলো উগ্রিয়েছে তাদের নিশ্চয়ই এমন বুদ্ধি বা বিবেচনা ছিল না যে একবার ভেবে দেখে এই গালিগুলোর অর্থ কী।

এ রকম একবারে দিদিমার পিছনে পিছনে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু একা একা থাকতেও ভয় করে। নিচে নেমে আমি দাদামশাইয়ের ঘরে গেলাম।

'হারামজাদা, বেরিয়ে যা বলছি এখান থেকে।' আমাকে দেখতে পেয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন।

ছুটে গিয়ে আবার ছাদের ঘরে উঠলাম আর তাকিয়ে রইলাম বাগানের অন্ধকারের দিকে। চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা করি দিদিমাকে, চিৎকার করে ডাকতে থাকি তাঁকে। আমার ভয় হচ্ছিল, দিদিমাকে ওরা মেরে ফেলবে। দিদিমা ফিরে আসেন না। কিন্তু আমার গলার স্বর শুনতে পেয়ে মাতাল মিখাইল-মামা এবার আমার মাকে উদ্দেশ করেই কুৎসিত গালাগালি দিতে লাগে।

এমনি আরেক সন্ধ্যায় আমার দাদামশাই অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। বালিশে তোয়ালে মোড়া মাথাটা অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করতে করতে মনের দুঃখ প্রকাশ করছিলেন চিৎকার করে:

'সারা জীবন এত জ্বলেপুড়ে, এত পাপ করে, অন্যায় করে, আমি যে টাকাপয়সা জমালাম — তা এর জন্যে! আমারই মুখে কালি পড়বে, নইলে ওটাকে ধরে আমি পুলিসে দিতাম আর আগামীকালই লাটসায়েবের সামনে উপস্থিত করতাম... কিন্তু কী লজ্জার কথা! কস্মিনকালে কেউ শুনেছে যে নিজের ছেলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পুলিসের সাহায্য বাপমাকে চাইতে হয়? শুনে রাখ্ রে বুড়ো তাহলে, তোর আর কোনো উপায় নেই, এমনিভাবেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে চুপ করে সহ্য করতে হবে!..'

কিন্তু হঠাৎ দাদামশাই এক হ্যাঁচ্‌কা টানে পা-দুটো বিছানার ধার দিয়ে নামিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চললেন জানলার দিকে। দিদিমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দাদামশাইয়ের একটা হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একি, কোথায় চলেছ?'

'একটা আলো জ্বালাও তো!' বললেন দাদামশাই। ভয়ানকভাবে হাঁপাচ্ছিলেন তিনি।

দিদিমা মোমবাতি জ্বালালেন আর তখন তিনি সেই জ্বলন্ত মোমবাতিটাকে বন্দুকের মতো সামনের দিকে উঁচিয়ে ধরে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে জানলা দিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'ও রে মিশ্‌কা! রাত্রিবেলার চোর তুই, ঘেয়ো কুকুরের মতো হন্যে হয়ে...'

সঙ্গে সঙ্গে জানলার ওপরের দিকের শার্সির কাঁচটা ঝন্‌ঝন শব্দে ভেঙে পড়ল আর একটা আধলা ইট ঠক্‌ করে এসে পড়ল টেবিলটায় দিদিমার পাশে।

'ফস্‌কে গেছে!' দাদামশাইয়ের গলা দিয়ে একটা চেরা আওয়াজ বেরিয়ে এল; সে আওয়াজ কান্নারও হতে পারে, হাসিরও হতে পারে।

দিদিমা ঠিক যেমনভাবে আমাকে কোলে তুলে নেন, তেমনিভাবে দাদামশাইকে কোলে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানায় আর আতঙ্কিত স্বরে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন:

'তুমি কি পাগল হলে নাকি? যীশু খ্রীষ্টের দোহাই, একটু চুপ করে থাকো! যদি কিছু হয় তাহলে ছেলেটাকে যে সারা জীবনের জন্যে সাইবেরিয়ায় ঠেলে দেবে! ওর কি কিছু জ্ঞানগম্যি আছে? ও কি আর বুঝতে পারছে যে ও যা কাণ্ডকারখানা শুরু করেছে তাতে ধরা পড়লে সাইবেরিয়ায় যেতে হবে?'

দাদামশাই বিছানায় শুয়ে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে, কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় চিৎকার করল: 'খুন করুক, ও আমাকে খুন করুক...'

বাইরে থেকে একটা তর্জন-গর্জন ও দাপাদাপির আওয়াজ ভেসে এল। টেবিলের ওপর থেকে সেই আধলা ইটটা তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটলাম জানলার দিকে। কিন্তু দিদিমা সময় থাকতেই এক হ্যাঁচ্‌কা টানে আমাকে সরিয়ে এনে কোণের দিকে ঠেলে দিলেন।

'এই আর এক বিচ্ছু শয়তান!' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন তিনি।

আরেকবার মিখাইল-মামা এল মস্ত একটা লাঠি নিয়ে। অলিন্দের ওপর দাঁড়িয়ে সদর দরজা ভেঙে ফেলছিল। ওদিকে সদলবলে দাদামশাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, মিখাইল-মামা একবার এলেই হয় আর কি! তাঁর সঙ্গে আছে

লাঠিহাতে দুজন ভাড়াটে আর রুটি বেলবার বেলনটাকে হাতের মুঠোয় ধরে শুঁড়িখানা-মালিকের বিরাটবপু বৌ। সবার পিছনে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করছেন দিদিমা। মিনতিভরা স্বরে দিদিমা বলে চলেছেন: 'আমাকে একবার ওর কাছে যেতে দাও! আমি একবার ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি!'

দাদামশাই হাতের লাঠিটাকে উঁচিয়ে ধরে এক পা সামনে বাড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'ভাল্লুক শিকার' ছবিটার বর্শা হাতে সেই চাষীর মতো তাঁকে দেখাচ্ছে। দিদিমা ছুটে এগিয়ে আসতেই দাদামশাই একটিও কথা না বলে পা আর কনুইয়ের সাহায্যে ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাঁকে। প্রতীক্ষমাণ চারটি মানুষ হিংস্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাতি ঝুলছে মাথার ওপরকার দেওয়ালে আর সেই বাতির কখনো-উজ্জ্বল কখনো-ম্লান আলো এসে পড়ছে মানুষ চারজনের মুখের ওপরে। ছাদের ঘরে উঠবার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমি তাকিয়ে আছি, দিদিমার জন্যে উদ্বিগ্ন আমি, দিদিমাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারলে খুশি হই।

ওদিকে সদর দরজায় প্রচণ্ডভাবে ঘা দিয়ে চলেছে মিখাইল-মামা। নিচের দিকের কব্জাটা ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে আর ভারি বিশ্রী একটা ঘশ্-ঘশ্ শব্দ হচ্ছে ওটা থেকে। দরজাটা এখন শুধু ঝুলে আছে ওপরের কব্জার জোরেই। তবে ওটার আয়ুও আর বেশিক্ষণ নয়। দাদামশাই নিজের দলবলের দিকে তাকিয়ে গলা থেকে তেমনি বিশ্রী একটা ঘশ্-ঘশ্ শব্দ বার করে বললেন: 'খেয়াল রেখো, ওর হাত আর পা লক্ষ্য করে বাড়ি মারবে কিন্তু মাথায় নয়।'

সদর দরজার ঠিক পাশেই ছিল একটা ছোট জানলা। জানলাটা দিয়ে কোনো রকমে শুধু একটা মানুষের মাথা গলতে পারে। মিখাইল-মামা ইতিমধ্যেই এই জানলার কাঁচের শার্সি ভেঙে ফেলেছে। এখন কেবল অন্ধকারের দিকে একটা হাঁ-করা গর্ত আর ভাঙা কাঁচের টুকরো টুকরো অংশগুলো লেগে আছে গর্তের কিনারায় — চোখ উপড়ে নেওয়া শূন্য কোটরের মতো দেখাচ্ছে জানলাটাকে।

দিদিমা ছুটে গেলেন এই জানলার কাছে, তারপর ফাঁক দিয়ে একটা হাত বার করে দিয়ে মিখাইলের দিকে সেই হাতটা নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে বলতে লাগলেন:

'মিশা, ওরে মিশা, যীশু খ্রীষ্টের দোহাই, তুই চলে যা! ওরা তোকে সারা জীবনের মতো নুলো করে দেবে! চলে যা তুই!'

মিখাইল-মামা হাতের লাঠিটা দিয়ে দিদিমার হাতের ওপর বাড়ি মারল।

আমি দেখতে পেলাম, ভারী একটা জিনিস বিদ্যুৎঝলকের মতো জানলার সামনে দিয়ে নেমে এসে পড়ল দিদিমার হাতের ওপরে। হাতের ওপরে বাড়ি খেয়ে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়লেন দিদিমা, কিন্তু নিশ্চল ও নির্বাক হবার আগে কোনো মতে আর একবার চিৎকার করে বলতে পারলেন: 'পালিয়ে যা, মিশ-শা...'

'হায় হায়, গিন্নী!' ভীতিপ্রদ গলায় কাৎরে উঠলেন দাদামশাই।

দরজাটা খুলে গেল আর খোলা দরজার কালো ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে ভিতরে ঢুকল মিখাইল-মামা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কোদালভর্তি ময়লার মতো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হল তাকে।

শুঁড়িখানা-মালিকের বৌ দিদিমাকে তুলে নিয়ে দাদামশাইয়ের ঘরে নিয়ে এল। শীঘ্রই সেখানে এলেন দাদামশাইও।

'হাড়-টাড় ভেঙেছে নাকি?' দিদিমার ওপরে বিষণ্নমুখে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'তাই তো মনে হচ্ছে।' চোখ না খুলেই দিদিমা জবাব দিলেন, 'কিন্তু ছেলেটার কী দশা করেছো — বলো, বলো!'

দাদামশাই ফুঁসে উঠলেন, 'চুপ করো! আমি কি পশু? ওকে আমরা হাত-পা বেঁধে ভাঁড়ারে ফেলে রেখেছি। আর এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছি ওর মাথায়... পাষণ্ড দেখতে চাও তো তাকে দেখো! কেমন করে এমন সে হোলো?'

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন দিদিমা।

বিছানার ওপরে দিদিমার পাশটিতে বসে দাদামশাই বললেন, 'আর কিছুক্ষণ সহ্য করো। হাড় ঠিকমতো বসিয়ে দেবার জন্যে আমি লোক আনতে পাঠিয়েছি। এক্ষুণি এসে যাবে। আর এই তোমাকে বলে রাখছি, এই ছেলেমেয়েগুলোর জন্যেই আমাদের মরতে হবে — আয়ু না ফুরোতেই আশ্রয় নিতে হবে কবরে।'

'যা আছে সব ওদের দিয়ে দাও।'

'তাহলে ভারভারার কী হবে?'

অনেকক্ষণ ধরে চলল দুজনের কথাবার্তা। দিদিমার স্বরটা শান্ত ও যন্ত্রণাকাতর, দাদামশাইয়ের ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত।

তারপর ঘরে ঢুকল এক কুঁজো আর বেঁটে বুড়ী। আকর্ণবিস্তৃত মুখ, মাছের মতো মুখটা হাঁ-করা, তলার চিবুকটা সব সময়েই থর্‌থর্‌ করে কাঁপে

আর ওপরের ঠোঁটটাকে খাড়া একটা নাক দু-ভাগে চিরে দিয়েছে মনে হয়। বুড়ীর চোখ দেখা যায় না। পা-দুটো নাড়াবার ক্ষমতাও বুড়ীর প্রায় নেই। লাঠির ওপর ভর দিয়ে মেঝের ওপর দিয়ে পা ঘষতে ঘষতে বুড়ী এগিয়ে এল। তার হাতে ছিল একটা পুঁটলি; ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হতে লাগল পুঁটলিটার মধ্যে থেকে।

আমি ভাবলাম, এই বুড়ী আর কেউ নয়, স্বয়ং মৃত্যু দিদিমার কাছে আসছে। বুড়ীর সামনে ছুটে গিয়ে আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

দাদামশাই আমাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরলেন, তারপর কোনো রকম মায়ামমতা না দেখিয়ে হ্যাঁচ্‌কা টানে আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে উঠে এলেন ছাদের ঘরে...

সাত

অত্যন্ত অল্প বয়সে আমি বুঝতে পারলাম, আমার দাদামশাইয়ের ও দিদিমার ভগবান এক নয়।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দিদিমা সাধারণত অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় বসে বসে তাঁর মাথার সেই আশ্চর্য গোছা-গোছা চুল আঁচড়াতে থাকেন। কালো রেশমের মতো লম্বা সেই চুলের গোছা আল্‌গা করে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা ঝাঁকুনি দেন। আর নিজের চুলকে গালাগালি দিয়ে মনেব ঝাল প্রকাশ করেন। নিশ্বাস-চাপা স্বরে উচ্চারণ করেন শব্দগুলো যাতে আমার ঘুম না ভাঙে।

'তোদের মুখে আগুন, তোদের মুখে আগুন!'

তারপর চুলের জট্‌ মোটামুটি ছাড়ানো হয়ে গেলে চুলগুলোকে ঘন বেণীতে পাকিয়ে নেন এবং ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কুলকুচো করতে করতে দ্রুত হাতমুখ ধুতে শুরু করেন। ঘুমের পরে তাঁর প্রকান্ড মুখে চামড়ার ভাঁজগুলো গভীর হয়ে উঠেছে, মুখে বিরক্তির চিহ্ন — হাতমুখ ধোবার পরেও সেই বিরক্তির খানিকটা থেকে যায়। এই অবস্থাতেই তিনি এসে হাঁটু মুড়ে বসেন বিগ্রহের সামনে। তারপরেই শুরু হয় তাঁর সত্যিকার প্রাতঃকালীন অবগাহন যা তাঁর সমস্ত গ্লানিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করে দেয়।

শিরদাঁড়া সোজা করে, মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে দিয়ে তিনি প্রীতিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কাজানের মেরীমাতার গোল মুখখানার দিকে; মনের সমস্ত ভক্তি উজাড় করে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন বুকের ওপরে আর ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন:

'পুণ্যময়ী মেরীমাতা, আসন্ন এই দিনটিতে তোমার আশীর্বাদ ঢেলে দাও ...'

তারপর মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করেন, ধীরে ধীরে মাথা তোলেন, ভক্তিরুদ্ধ কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে থাকেন আবার:

'হে সকল আনন্দের উৎস, হে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, ফুলভারাবনত আপেলবৃক্ষের মতো হে ...'

অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাসকে প্রায় প্রতিদিনই তিনি নতুন নতুন ভাষার অলঙ্কারে প্রকাশ করেন। এই নতুন নতুন ভাষার অলঙ্কার শোনবার জন্যে রোজই আমি উৎকর্ণ মনোযোগে তাঁর প্রার্থনা-বাণী শুনি।

'ওগো আমার প্রাণনিধি, পবিত্র, স্বর্গীয়! তুমি আমার আত্মার আলো, আমার রক্ষক! তুমি স্বর্গের সূর্য, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি স্বর্ণাভ! তুমি স্বর্গের জননী! পাপ আমাদের দিকে ছুটে আসছে — আমাদের বাঁচাও সেই পাপের হাত থেকে, আমাদের বাঁচাও গালাগালির হাত থেকে, আর আমি যে মাঝে মাঝে অকারণে চটে যাই তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর ...'

তাঁর কালো চোখের গভীরে একটুখানি হাসি যেন ঝিকমিক করে, তাঁর বয়স আরো কমে গেছে মনে হয়, ভারি হাতখানা তুলে আস্তে আস্তে আবার তিনি বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন।

'ঈশ্বরের সন্তান হে পরমপ্রিয় যীশু, আমি এক অধম পাপী — আমাকে করুণা করো ... স্বর্গের জননীর নামে আমাকে করুণা করো ...'

তাঁর উপাসনা হয়ে ওঠে প্রশংসাসূচক নামকীর্তন, সরল ও নিষ্ঠাভরা অন্তর থেকে উৎসারিত স্তবগান।

সকালবেলা তিনি বেশিক্ষণ উপাসনা নিয়ে থাকতে পারেন না। সামোভার জ্বালানোর তাগিদ থাকে। দাদামশাই বাড়ির চাকর ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন; সুতরাং দিদিমার দেরির ফলে দাদামশাইকে যদি কোনো দিন সকালের চায়ের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয় তাহলে আর দিদিমার রক্ষে নেই। দাদামশাই সেদিন প্রচণ্ড ফাটাফাটি শুরু করে দেন আর সহজে তা থামতে চায় না।

কোনো দিন যদি দিদিমার চেয়ে আগে দাদামশাইয়ের ঘ্নম ভাঙে তাহলে তিনি উঠে আসেন ছাদের ঘরে আর এসে দেখেন দিদিমা উপাসনায় বসেছেন। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিদিমার উপাসনা শোনেন তিনি, তাঁর কালো পাতলা ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। পরে চায়ের টেবিলে বসে তিনি মন্তব্য করেন:

'তোমার কি ব্লদ্ধিশ্লদ্ধি কিছ্ল হবে না গো! কি-ভাবে উপাসনা করতে হয় তা তোমায় কতদিন শিখিয়ে দিয়েছি কিন্তু সে সব তুমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছো না। জংলীদের মতো বিড়বিড় করে কী যে সব বলো কিছ্ল ব্লঝি না। আর ভগবান যে কী করে এসব সহ্য করেন তাও মাথায় ঢোকে না আমার!'

বিশ্বাসভরা স্লরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'ভগবান সবই বোঝেন। যা-ই বলা যাক্ না কেন, যেভাবেই বলা যাক্ না কেন, ভগবান নিশ্চয়ই ব্লঝতে পারেন।'

'উন্মাদ তুমি, ব্লঝলে! -- হ্যাঃ ...'

দিদিমার ভগবান সারাদিন দিদিমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। এমন কি জন্তুজানোয়ারকেও তাঁর এই ভগবানের কথা বলেন তিনি। আর তাঁর এই ভগবানের কোনো ঝামেলা নেই। যে কেউ — মানুষ, কুকুর, পাখি, মৌমাছি, এমন কি মাঠের ঘাস পর্যন্ত নিজেকে এই ভগবানের হাতে স'পে দিতে আপত্তি করবে না। এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছ্লর প্রতিই তাঁর সমান স্নেহ, সমস্ত কিছ্ল তাঁর কাছে সমান আদরের।

শ্লঁড়িখানার মালিক-গিন্নীর একটা পোষা হ্ললো-বেড়াল ছিল। ভারি স্লন্দর বেড়ালটা; ছাইরঙা শরীর, সোনালী রঙের চোখদ্লটো; আর যদিও মিটমিটে শয়তানি ও চুরি করে খাওয়া, দ্ল-ব্যাপারেই বেড়ালটা ছিল ওস্তাদ, তা সত্ত্বেও সবাই ভালোবাসত সেটাকে। একদিন বেড়ালটা একটা স্টার্লিংপাখি ধরেছিল। তাই না দেখে আহত পাখিটাকে বেড়ালটার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দিদিমা ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠেন:

'ওরে বিট্‌কেলে জানোয়ার, তোর প্রাণে কি ভগবানের ভয়ও নেই রে!'

দিদিমার কথা শ্লনে শ্লঁড়িখানার মালিক-গিন্নী আর বাড়ির দরওয়ান হাসছিল। দিদিমা ওদের দ্লজনের ওপরেই চটে গিয়ে চিৎকার করতে থাকেন:

'তোরা ভাবিস কী, জন্তুজানোয়াররা ভগবানের কথা জানে না? ওরে অবিশ্বাসী, শ্লনে রাখ্, জন্তুজানোয়ারের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে তুচ্ছ, সেও ভগবানের কথা তোদের চেয়ে কিছ্ল কম জানে না।'

মোটা আর ভগ্নোৎসাহ শারাপ ঘোড়াটাকে সাজিয়ে আস্তে আস্তে তিনি বলেন: 'কী রে ভগবানের দাস, এত মন খারাপ কেন? বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস বুঝি? ...'

ঘোড়াটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আর মাথা নাড়ে।

তবুও আমার দাদামশাই দিনের মধ্যে যতোবার ভগবানের নাম মুখে উচ্চারণ করেন, দিদিমা তা করেন না। দিদিমার ভগবানকে আমি বুঝতে পারি, দিদিমার ভগবানকে আমার ভয় করে না, কিন্তু দিদিমার ভগবানের সামনে মিথ্যে কথা বলবার সাহস আমার নেই। তা বলাটা খুবই লজ্জার ব্যাপার মনে হয় আমার কাছে। এই লজ্জার জন্যেই আমি দিদিমার কাছে কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারি না। যে ভগবানের এত দয়া, তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব, আর যতদূর আমার মনে আছে, এ-ধরনের ইচ্ছেও আমার মনে কোনো দিন জাগেনি।

একদিন শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নীর সঙ্গে আমার দাদামশাইয়ের ঝগড়া হয়ে গেল। আমার নিরীহ দিদিমাকেও অজস্র গালি পাড়ল শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী, এমন কি একটা গাজর ছুঁড়ে মারল দিদিমার দিকে।

দিদিমা শুধু শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে দেখছি!' কিন্তু দিদিমার এই হেনস্তা দেখে আমার প্রচণ্ড রাগ হল এবং ঠিক করলাম যে-করে হোক্ এ-ব্যাপারের প্রতিশোধ নিতে হবে।

তারপর থেকে এই চিন্তাটাই আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। এই স্ত্রীলোকটির শরীরটা বিপুল, মাথায় লাল চুল, মোটা চিবুক, চোখ প্রায় নেই বললেই চলে — কি করে যে এই স্ত্রীলোকটিকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে তাই আমি ভাবতে লাগলাম।

পাড়াপড়শীদের মধ্যে যখন ঝগড়াবিবাদ হয় তখন আমি দেখেছি একজন আরেক জনের ওপরে নানাভাবে প্রতিশোধ নেয়। যেমন, বেড়ালের ল্যাজ কেটে ফেলে দেওয়া, বিষ খাইয়ে কুকুর মেরে দেওয়া, মুরগী মেরে ফেলা; কিংবা রাত্রিবেলা চুপিচুপি শত্রুপক্ষের মাটির নিচের ভাঁড়ারে ঢুকে কপি বা শশাভরা পিপেয় কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আসা; কিংবা ক্‌ভাস'এর পাত্রের মুখ খুলে দিয়ে আসা ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার এই ধরনগুলোর একটাও আমার ভালো লাগল না। এর চেয়েও ভয়ংকর এবং এর চেয়েও দুঃসাহসী কিছু একটা উপায় ভাবা দরকার।

অনেক ভেবেচিন্তে যে উপায়টা আমি বার করলাম, তা হচ্ছে এই: একদিন শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী যেই না মাটির নিচের ভাঁড়ার ঘরে নেমেছে, আমি চট্ করে মাথার ওপরকার ঢাকনাটা দিলাম বন্ধ করে। তারপর ঢাকনাটায় তালা লাগিয়ে দিয়ে মহানন্দে কিছুক্ষণ নৃত্য করলাম ঢাকনাটার ওপরে তারপরে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ছাদের ওপরে। দিদিমা রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমি ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে দাঁড়ালাম সেখানে। আমার এই উল্লাসের কারণ দিদিমা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেননি। তারপরে ব্যাপারটা ধরতে পেরে ঠাস্ করে চড় লাগালেন কয়েকটা; মানুষের শরীরের যে-জায়গাটা চড় মারবার জন্যে তৈরি হয়েছে সেই জায়গাতেই চড় মারলেন। হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমাকে উঠোনে নিয়ে এসে ছাদে পাঠিয়ে দিলেন চাবিটা খুঁজে আনবার জন্যে। দিদিমার এই চোটপাটের বহর দেখে আমি তো হতভম্ব; একটিও কথা না বলে আমি চাবিটা এনে দিলাম দিদিমার হাতে, তারপর উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম, দিদিমা কি করেন। দেখলাম, দিদিমা বন্দিনীকে মুক্ত করে দিলেন এবং সেই স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন আমার দিকে। দুজনের মুখেই ভারি অমায়িক হাসি।

শুঁড়িখানার মালিক-গিন্নী তার মোটা মোটা হাতের মুঠি পাকিয়ে আমাকে শাসাল: 'আমি তোকে দেখাব!' কিন্তু মুখে একথা বললেও তার চোখশূন্য মুখটাতে সহানুভূতির হাসি ফুটে উঠেছিল, সে-মুখে এতটুকু ঝাঁজ নেই। দিদিমা আমার ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে আমাকে নিয়ে এলেন রান্নাঘরে, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'বল্ হতভাগা, কেন তুই ঢাকনাটা বন্ধ করেছিলি?'

'ও কেন তোমার দিকে গাজর ছুঁড়ে মেরেছিল?'

'ও-ও-ও! তাহলে আমার জন্যেই তুই একাজ করতে গিয়েছিলি বল্। দাঁড়া, আজ তোকে আমি মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি, ডান্‌পিটে শয়তান! ওই চুল্লির ছাইয়ের মধ্যে যখন তোকে গুঁজে দেব আর সারা গায়ে পিলপিল করে ইঁদুর ছুটোছুটি করবে — তখন কিছুটা বুদ্ধি আসবে! দেখো সকলে, আমার রক্ষক যে কেমন! ফাটবার আগে এই ছোট্ট বুদ্বুদকে দ্যাখো একবার। তোর দাদামশাইকে যদি বলে দিই তাহলে মারতে মারতে তোর পাছার ছালচামড়া তুলে ফেলবে — তা জানিস? যা, এক্ষুণি ঘরে গিয়ে পড়ার বই নিয়ে বোস্!'

সারাদিন দিদিমা আর আমার সঙ্গে কথা বললেন না। সন্ধ্যার সময় উপাসনায় বসার আগে তিনি এসে বসলেন আমার বিছানার

পাশে, তারপর যে কথাগুলো বললেন তা আমি কখনো ভুলব না। কথাগুলো এই:

'সোনা আমার, মানিক আমার, তোকে কতগুলো কথা বলে রাখছি, ভুলিসনে যেন। কক্ষণো বড়োদের কোনো ব্যাপারে থাকবি না। বড়রা উচ্ছন্নে গেছে — নানা প্রলোভন আর খাটুনির ফলেই। কিন্তু তুই এখনো যাসনি, এখনো না। তাই তুই তোর ছেলেমানুষী বুদ্ধি যা ভালো বলে তাই নিয়ে বড় হয়ে ওঠ, যতক্ষণ না ঈশ্বর তোর হৃদয়কে স্পর্শ করেন আর তোর পথ তোকে দেখান, দেখান কোন পথ দিয়ে তোকে এগিয়ে যেতে হবে। ভগবানই বিচার করবেন, ভগবানই শাস্তি দেবেন। তুই আমি কারও দোষগুণ বিচার করতে যাব না, সে-বিচারের ভার ভগবানের ওপর!'

এই বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার ফাঁকে তিনি একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর ডান চোখটা সরু করে বলে চললেন আবার:

'মাঝে মাঝে মনে হয় স্বয়ং প্রভুও বুঝতে পারেন না, দোষটা কার।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, তিনি তো সবই টের পান, নয় কি?'

বিষণ্ণ সুরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'তা যদি পেতেন তবে পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঘটে যা আর ঘটত না। প্রভু তো স্বর্গে বসে আছেন, সেখান থেকে নিচের দিকে, পৃথিবীতে, তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি দেখেন, এই পাপী মানুষরা কি করছে। মাঝে মাঝে মানুষের দুঃখে তার বুক ফেটে যায়, অঝোরে তিনি কাঁদতে থাকেন আর বলেন, "হায় আমার সন্তানরা! আমার নিজের সন্তানরা, আমার এত আদরের সন্তানরা! তোদের দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!"'

কথাগুলো বলতে বলতে দিদিমা নিজেও কাঁদলেন। চোখের জল মুছবার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না. আইকনের কাছে গিয়ে উপাসনা করতে শুরু করলেন।

সেদিন থেকে দিদিমার ভগবান আমার আরো আপনজন হয়ে উঠলেন, তাঁকে যেন আমি আরো বেশি করে বুঝতে পারলাম।

আমাকে পড়াতে বসে দাদামশাইও আমাকে বলেন যে ভগবান সবকিছু দেখেন, সবকিছু জানেন, সব জায়গায় আছেন -- মানুষের দুঃখে বিপদে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু দাদামশাইয়ের উপাসনা দিদিমার উপাসনার মতো নয়।

সকালবেলা উঠে বিগ্রহের সামনে যাবার আগে পরিপাটি করে হাতমুখ ধুয়ে আসেন তিনি, পোশাক পরেন, মাথার লাল চুল ও দাড়ি আঁচড়ান, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক করেন গায়ের জামা, ঠিক করেন ওয়েস্টকোটের ফাঁক দিয়ে গুঁজে দেওয়া কালো স্কার্ফটা। এতগুলো কাজের প্রত্যেকটি ঠিক-ঠিক হয়ে যাবার পরে চোরের মতো পা টিপে টিপে এগিয়ে আসেন আইকনের কাছে। প্রতিদিন ঠিক একই জায়গায় দাঁড়ান তিনি, কাঠের নক্‌শা-বসানো মেঝের এক বিশেষ সন্ধিস্থলে, ঘোড়ার চোখের মতো দেখতে জায়গাটা। হাতদুটো সৈনিকের মতো টান করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, মাথাটা নিচু ঝুঁকে পড়ে, পাতলা ঋজু শরীর — তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে বলতে থাকেন তিনি:

'আমাদের পরম পিতা এবং তাঁর সন্তান এবং দেবাত্মার নামে।'

আর তা শুনে প্রতিবারই মনে হয়েছে, কথাগুলো উচ্চারিত হবার পরে ঘরখানার মধ্যে থমথমে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। এমন কি মাছিগুলোর ভনভনানিতেও যেন কিছুটা সাবধানী ভাব।

এবার তিনি মাথাটা পিছনদিকে ঠেলে দেন, তাঁর সোনালী দাড়ি মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যায়, কুঁচি-কুঁচি ভুরুগুলো খাড়া হয়ে ওঠে — এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে উপাসনা করেন তিনি। ঋজু গলার স্বর, বেশ জোরের সঙ্গে দাবি জানানর ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেন প্রতিটি শব্দ — মনে হয় যেন পড়া মুখস্থ বলছেন।

'মানুষের জানা-অজানার নির্মোক খসিয়ে আসুক সেই পরম বিচারের দিন... শুরু হোক্ মানুষের পাপ-পুণ্যের শেষ বিচার...'

বুকের ওপরে আলগোছে চাপড় মারতে মারতে তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে চলেন:

'হে প্রভু, শুধু তোমার কাছেই আমার পাপ... আমার পাপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকো প্রভু...'

প্রত্যেকটি শব্দের ওপরে জোর দিয়ে তিনি বন্দনা-গীত আবৃত্তি করেন, ডান পা নাচিয়ে নাচিয়ে তাল দেন সঙ্গে সঙ্গে। ভারি পরিপাটি, ভারি পরিচ্ছন্ন, ভারি প্রভুত্বব্যঞ্জক চেহারা; দেবতার প্রতিমূর্তির সামনে টান করে মেলে দিয়েছেন নিজের শরীর, আরো যেন লম্বা হয়ে উঠেছেন, আরো পাতলা, আরো ঋজু।

'হে সর্বপাপহর! আমার অন্তরের সমস্ত পাপ দূর করো, হে স্বর্গের জননী! আমার আত্মার গভীর থেকে কান্না উঠে আসছে, আমাকে করুণা করো!'

গলার স্বরটা বিলাপের মতো হয়ে ওঠে, সবুজ চোখের কোণে অশ্রুর ফোঁটা চক্‌চক্ করে:

'হে ঈশ্বর, আমাকে বিচার কোরো আমার কৃতকর্ম দিয়ে নয়, আমার ভক্তি দিয়ে। আমার যতোটুকু শক্তি তার চেয়ে বেশি বোঝা আমার ওপরে চাপিও না প্রভু...'

উত্তেজনা-অস্থির হাতের দ্রুত বিক্ষেপে বারবার ক্রুশচিহ্ন আঁকেন বুকের ওপরে, মাথা নাড়েন ঢুঁ-মারতে-আসা ছাগলের মতো, কথা বলেন সাঁই-সাঁই করে, নিশ্বাস ফেলেন একঘেয়ে একটানা সুরে। পরে বড় হয়ে ইহুদিদের ভজনালয় দেখে বুঝতে পারি দাদামশাই ইহুদিদের মতো উপাসনা করেন।

ইতিমধ্যে অনেকক্ষণ থেকেই টেবিলের ওপরে রাখা সামোভার থেকে বাষ্প উঠছে, বাড়িতে তৈরি পনীর দিয়ে ঠাসা সদ্য-সেঁকা যবের কেকের গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। প্রচণ্ড খিদেতে গর্জন শুরু করেছে আমার পেটটা। দিদিমা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার বাজুতে ঠেস্ দিয়ে, চোখ মেঝের দিকে নামানো, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন আর ভুরু কোঁচকাচ্ছেন। খুশির সঙ্গে জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে সূর্যের আলো। গাছের পাতায় মুক্তোর মতো চক্‌চক্ করছে শিশিরবিন্দু। ভোরের বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে ধনে পাতা, কারাণ্ট আর পেকে আসা আপেলের তাজা গন্ধ। কিন্তু দাদামশাই তখনো পা নাচিয়ে নাচিয়ে একটানা সুরে প্রার্থনা করে চলেছেন:

'আমার কামনার আগুন নিভিয়ে দাও হে প্রভু, আমি অতি অধম, আমি অতি নীচ!'

দাদামশাইয়ের সকাল-সন্ধ্যার উপাসনা-বাণী আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। উপাসনা করবার সময়ে তিনি কোনো ভুল করেন কিনা বা কোনো শব্দ বাদ দিয়ে যান কিনা তা দেখবার তীব্র কৌতূহলে আমি লক্ষ্য করতাম তাঁকে।

দাদামশাইয়ের ভুলভ্রান্তি কদাচিৎ হত। আর যখনই হত, মনের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হবার মতো প্রচণ্ড উল্লাসে আমি মেতে উঠতাম।

উপাসনা শেষ হলে দাদামশাই আমার দিকে আর দিদিমার দিকে তাকিয়ে বলেন: 'সুপ্রভাত!'

আমরা মাথা নিচু করি এবং এতক্ষণ অপেক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত টেবিলের চারপাশে বসি গিয়ে নিজের নিজের জায়গায়।

'আজকের উপাসনায় "যথেষ্ট" কথাটি বাদ গেছে।' দাদামশাইয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলি আমি।

'তাই নাকি রে? ঠিক বল্‌ছিস?' সন্দেহভরা গলায় দাদামশাই জিজ্ঞেস করেন।

'ঠিকই বলছি। উপাসনা করবার সময়ে এক জায়গায় তুমি বলো—"হে প্রভু, আমার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ভক্তি যেন আমার থাকে"—সেই জায়গায় "যথেষ্ট" কথাটি বাদ গেছে।'

অপরাধীর মতো চোখ পিটপিট করতে করতে দাদামশাই বলেন, 'হুঁ!'

অবশ্য এই মন্তব্যটুকু করার জন্যে পরে একদিন দাদামশাই আমার ওপর শোধ তুলে নেন কিন্তু আপাতত এই সময়টুকুর জন্যে দাদামশাইয়ের বিব্রত ভাব দেখে আমি আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠি।

একদিন দিদিমা ঠাট্টার সুরে বললেন:

'তুমি রোজই সেই একই কথা বলো, একটুও এদিক ওদিক নেই—তোমার উপাসনা শুনে শুনে ভগবানের নিশ্চয়ই একঘেয়ে লাগে!'

'কী-ই-ই?' দাদামশাই ফুঁসে উঠলেন একেবারে, 'কী বলছ তুমি, খেয়াল আছে?'

'আমি কী বলছি জান? তোমার স্রষ্টার উদ্দেশে তুমি যেসব কথা বলো তা কক্ষণো তোমার প্রাণের কথা নয়।'

রাগে লাল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাদামশাই নিজের চেয়ারে বসে লাফিয়ে উঠলেন, তারপর একটা পিরিচ ছুঁড়ে মারলেন দিদিমার দিকে। কাঁচের ওপরে করাত ঘষলে যেমন শব্দ হয় তেমনি কিচ্‌কিচ্‌ গলায় তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'ডাইনি বুড়ী, দূর হয়ে যা এখান থেকে!'

ঈশ্বরের শক্তিমত্তার কথা যখনই তিনি বলেন তখনই তিনি জোর দেন ঈশ্বরের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার ওপর। একাধিক দৃষ্টান্ত দেন তিনি। একবার একদল পাপী বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। আরেকবার পাপীদের শহর ছাই হয়ে গিয়েছিল আগুনে পুড়ে। পাপের শাস্তি হিসেবে এসেছে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। ঈশ্বর হচ্ছেন উদ্যত তলোয়ারের মতো, দুর্বৃত্তদের মাথার ওপরে উদ্যত চাবুক।

'ঈশ্বরের আইন অমান্য করার পরিণাম অতি ভয়ংকর।' পাতলা পাতলা

বাঁকা আঙ্গুলে টেবিলের ওপরে টোকা দিতে দিতে তিনি আমাকে সতর্ক করে দেন।

ঈশ্বর যে এত নিষ্ঠুর, একথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। আমার কেমন জানি সন্দেহ হতে থাকে, ঈশ্বরের নামে দাদামশাই যা কিছু বলছেন সবই তাঁর বানিয়ে বলা। তাঁর উদ্দেশ্য, এসব কথা শুনে ঈশ্বরকে আমি যতোটা ভয় করি বা না করি, তাঁকে যেন ভয় করে চলি।

আমি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'আমি যাতে তোমার অবাধ্য না হই, সেজন্যেই কি এতসব কথা বলছ?'

দাদামশাইও তেমনি সোজাসুজি জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই। একবার অবাধ্য হয়েই দেখ না, মজাটা পাইয়ে দিই!'

'কিন্তু দিদিমার বেলায়?'

কঠোর স্বরে দাদামশাই বললেন, 'ওই বুড়ী বোক্‌চণ্ডীর কথায় খবরদার, কান দিস্‌নে। তোর দিদিমা আর কোনো দিন শোধরাবে না, সারা জীবনটাই মাথায় ছিট্ রয়ে গেল, কোনো কিচ্ছু শিখতে পারল না। আমি তোর দিদিমাকে বলে দেব যেন এইসব গুরুতর বিষয় নিয়ে সে তোর সঙ্গে কথা না বলে। আচ্ছা, এবার আমার একটা প্রশ্নের জবাব দে দেখি: বল্ তো পদমর্যাদার দিক থেকে দেবদূতদের কত ভাগে ভাগ করা যায়?'

দাদামশাইয়ের প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা দাদামশাই, "উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন চাকুরেরা" কথাটার মানে কী?'

'সব কথাই তোর জানা চাই — না?' ঘোঁৎঘোঁৎ করে তিনি জবাব দিলেন, তারপর চোখের দৃষ্টি মেঝের দিকে নামিয়ে চিবোবার ভঙ্গিতে নাড়তে লাগলেন ঠোঁটদুটো। একটু পরে কি ভেবে নেহাতই অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি:

'চাকুরেরা সব এমন একদল লোক যারা আইনের কথায় ডুবে থাকে — খুসিমতো আইন গিলে ফেলতে পারে।'

'আইন কাকে বলে?'

'আইন? আইন হচ্ছে, যাকে বলা যায় — কতগুলো রীতিনীতি যা সবাই মেনে চলে।' বৃদ্ধের বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ চোখদুটো খুশিতে চক্‌চক্ করছে; তিনি বলে চললেন, 'মানুষ দল বেঁধে বাস করে এবং নিজেদের মধ্যেই কতগুলি বিষয়ে একমত হয়ে নেয়। সেই সব রীতিনীতি সবাই মেনে চলে। বা বলা যায় কতগুলো নিয়ম। এগুলোকেই সবাই বলে আইন। এই ধর্

না কেন, বাচ্চারা যখন একসঙ্গে খেলতে আসে তখন খেলাটা কি-ভাবে চলবে সে-সম্পর্কে তারা নিজেদের মধ্যেই ঠিকঠাক করে নেয়। তারা যা ঠিকঠাক করে তাই হচ্ছে আইন।'

'আর চাকুরেরা?'

'ওরা হচ্ছে একদল খারাপ ছেলে যারা আইন মেনে চলে না।'

'কেন?'

ভুরু কুঁচকিয়ে দাদামশাই বললেন, 'ওসব কথা তুমি বুঝতে পারবে না। মানুষ যাই করুক না কেন, প্রভু আছেন সবার ওপরে। মানুষ হয়তো করতে চায় এক কিন্তু প্রভুর ইচ্ছে অন্য। মানুষের কোনো কাজ সম্পর্কেই নিশ্চিন্ত হয়ে বলা চলে না যে এটা হবেই। প্রভুর ছোট একটি নিশ্বাসের ফুৎকারে মানুষের এই সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে একমুঠি ধুলোর মতো বাতাসে উড়ে যেতে পারে।'

কিন্তু কতগুলি কারণে সরকারী চাকুরেদের সম্পর্কেই আমার কৌতূহলটা ছিল সবচেয়ে বেশি। সুতরাং সেই একই কথা আমি বারবার জিজ্ঞেস করে চললাম:

'জান দাদামশাই, ইয়াকভ-মামা একটা গান গায়, সেই গানের দুটো লাইন হচ্ছে:

> দেবদূতেরা পুণ্যবান ঈশ্বরের চাকরিতে
> আর চাকুরেরা কিন্তু শয়তানের নোকর।'

দাদামশাই চোখ বুজলেন, দাড়ির গোছা হাতের মুঠিতে নিয়ে চেপে ধরলেন মুখের মধ্যে। তাঁর গালদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমি বুঝতে পারলাম, প্রাণপণে হাসি চাপবার চেষ্টা করছেন দাদামশাই। বললেন:

'তোকে আর ইয়াকভকে, দুটোকেই বস্তার মধ্যে পুরে নদীর জলে ফেলে দিলে ঠিক হয়। ইয়াকভটাও যেমন হয়েছে, আর কোনো গান পায় না গাইবার মতো। আর তুইও হয়েছিস তেমনি ত্যাঁদড়, যে যাই গান গাক্ না কেন, শোনা চাই। এগুলো হচ্ছে হাড়-হাভাতেদের গান, স্বধর্মত্যাগীদের গান—বিশ্রী রসিকতা করা হয়েছে এই গানে!'

আমার মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে কী যেন ভাবলেন দাদামশাই, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ছ্যাঃ, কী সব মানুষ!'

ঈশ্বর সম্পর্কে দাদামশাইয়ের যা ধারণা সেখানে ঈশ্বর রয়েছেন সবার উ'চুতে, মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকান্ডের ওপরে সর্বপ্রভুত্বময় হিসেবে। দিদিমার মতো দাদামশাইও মনে করেন যে তাঁর সমস্ত কাজেকর্মে প্রভুর হাত আছে। একা প্রভুর হাতই নয়, অসংখ্য সাধুপুরুষেরও হাত। আমার দিদিমা কিন্তু কয়েকজন মাত্র গোণাগুণতি সাধুপুরুষকে মেনে চলেন — নিকোলাই, ইউরি, ফ্রল ও লাভ্‌র। এ'দের সকলেরই দয়ামায়া আছে, সকলেই খুব ভালো, গাঁ থেকে গাঁয়ে এবং শহর থেকে শহরে ঘুরে ঘুরে এ'দের সময় কাটে। মানুষকে এ'রা সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন — দোষেগুণে নিজেরাও হয়ে ওঠেন মানুষের মতোই। অন্য দিকে আমার দাদামশাইয়ের সাধুপুরুষরা সকলেই হচ্ছেন শহীদ। তাঁরা আইকন টান মেরে ফেলে দিয়েছেন, এক পাও পিছু না হটে লড়াই করেছেন সীজারদের সঙ্গে, আর ফলে খু'টির সঙ্গে বে'ধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাঁদের কিংবা জীবন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে তাঁদের শরীর থেকে।

মাঝে মাঝে চিন্তিত ভাবে দাদামশাই বলেন:

'প্রভু যদি আমাকে একটুকু দয়া করেন, বেশি না হোক, অন্তত পাঁচশো রুবল্ লাভ রেখে এই বাড়িটা বিক্রি করে দিতে পারি — তাহলে শহীদ নিকোলাইয়ের উদ্দেশ্যে আমি একটা বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করব।'

একথা শুনে দিদিমা হাসেন আর আমাকে বলেন:

'তোর দাদামশাইয়ের বুদ্ধি দেখেছিস! এমনভাবে কথা বলে যেন তার এই বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া নিকোলাইয়ের আর কোনো কাজ নেই।'

গির্জার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তারিখ সম্বলিত একটি পাঁজি দাদামশাইয়ের ছিল। বহু বছর সে পাঁজি আমি রেখে দিয়েছিলাম। এই পাঁজির পৃষ্ঠায় দাদামশাইয়ের নিজের হাতে লেখা মন্তব্য ছিল নানা ধরনের। ইয়োহিম ও আন্না এই দিবসদুটির পাশে লাল কালির খাড়া অক্ষরে তিনি এই কথাগুলি লিখে রেখেছিলেন:

'আপনাদের দয়ায় মস্ত দুর্ভাগ্য থেকে বে'চেছি।'

এই দুর্ভাগ্যটি যে কী, তা আমার মনে আছে। নিজের অপদার্থ ছেলেগুলোকে সাহায্য করবার চেষ্টা দাদামশাই সব সময়েই করতেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি শেষদিকে বন্ধকী কারবার শুরু করে দিলেন; দামী দামী জিনিসপত্র জমা রেখে টাকা ধার দিতেন তিনি। কে যেন পুলিসের কানে খবরটা পে'ৗছে দিয়েছিল, তারপর একদিন রাত্রে পুলিস আসে আমাদের বাড়ি

তল্লাশী করতে। সারা রাত সে কি দুশ্চিন্তা, তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায় না। দাদামশাই সকাল পর্যন্ত বসে বসে শুধু উপাসনা করেন। তারপর সকালবেলা আমার সামনেই এই কথাগুলো পাঁজির গায়ে লিখে রাখেন।

রাত্রিবেলা খেতে বসার আগে দাদামশাইয়ের সামনে বসে আমাকে প্সাল্টির, স্তোত্রের বই থেকে কিংবা ইয়েফরেম সিরিন'এর লেখা একাণ্ড ধর্মপুস্তকের কিছুটা পড়ে শোনাতে হয়। রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে তিনি আবার উপাসনা করতে শুরু করেন। সন্ধ্যার পরে চারদিক নিস্তব্ধ আর শুধু শোনা যায় একঘেয়ে সুরে তিনি অন্তরের অনুশোচনা প্রকাশ করে চলেছেন:

'হে পরম করুণাময় চিরন্তন রাজন, তুমিই দেবার মালিক আবার তুমিই ফিরিয়ে নাও... প্রলোভন থেকে বাঁচাও... দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করো... আমার অশ্রু আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে নিক...'

দিদিমা প্রায়ই বলেন:

'ইস্, শরীরটা ভারি ক্লান্ত লাগছে রে! মনে হচ্ছে আজ আর ভগবানের নাম নেওয়া হবে না, তার আগেই শুয়ে পড়তে হবে!'

দাদামশাই আমাকে গির্জায় নিয়ে যেতেন। শনিবারের সান্ধ্য উপাসনায় আর রবিবারের দুপুরের অনুষ্ঠানে। গির্জায় গিয়েও আমি বুঝতে পারতাম, কোন্ ঈশ্বরের ভজনা করা হচ্ছে। পাদ্রি পুরোহিতরা ভজনা করেন দাদামশাইয়ের ঈশ্বরকে আর সমবেত প্রার্থনাসঙ্গীতে ভজনা করা হয় দিদিমার ভগবানকে।

অবশ্য আমি এখানে যে ছবি দিলাম তা হচ্ছে ছেলেমানুষি বিচারবুদ্ধিতে আমি দুই ঈশ্বরের মধ্যে যে পার্থক্য টেনেছিলাম তারই খুব স্থূল একটা বর্ণনা। ঈশ্বরের মধ্যেও এই পার্থক্য টেনেছিলাম বলে তখন চিন্তাজগতে বহু ঘাতপ্রতিঘাত আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। দাদামশাইয়ের ঈশ্বরকে আমার ভয় করে এবং এই ঈশ্বরকে আমি মোটেও পছন্দ করি না। তিনি কাউকেই ভালোবাসেন না এবং কড়া নজর রাখেন সবার ওপরে। মানুষের মধ্যে যা কিছু নীচাশ্রয়ী, যা কিছু দুরাচার তাই খুঁজে বার করাতেই যেন তাঁর সমস্ত আগ্রহ নিবদ্ধ। স্পষ্টই বোঝা যায়, মানুষকে বিশ্বাস করেন না তিনি, অপেক্ষা করে আছেন কখন মানুষের মনে অনুশোচনা আসবে. আর মানুষকে শাস্তি দিতে পারলে ভারি খুশি হন।

আমার জীবনের এই দিনগুলিতে আমার মনের অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল প্রধানত ভগবানের চিন্তা। ভগবানই ছিলেন আমার কাছে জীবনের একমাত্র সৌন্দর্য। অন্যত্র শুধু নোংরামি আর হিংস্রতা দেখে দেখে আমি শিউরে উঠতাম, আমার মন ভারী হয়ে উঠত। আর এইসবের মধ্যে ভগবান ছিলেন আমার কাছে উজ্জ্বলতম ও শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ — আমার দিদিমার ভগবান, যিনি সকল মানুষের বন্ধু। আমি ব্যাকুল হয়ে ভাবতাম, কেন দাদামশাই ভগবানের করুণাময় রূপ দেখতে পান না।

আমাকে বাড়ির বাইরে গিয়ে খেলতে দেওয়া হয় না কারণ আমি অল্পেতেই বড়ো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠি। বাইরে খেলতে গিয়ে আমার মনে যে ভাব হয় তাতে আমি একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যাই আর তারপরেই প্রায় সর্বদা একটা মারামারি বা গোলমালের সূত্রপাত করে বসি। বন্ধুবান্ধব বলতে আমার কেউ নেই, পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমার উপর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করত। কেউ যদি আমাকে 'কাশিরিন' বলে ডাকে তাহলেই আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়; পাড়ার ছেলেমেয়েরা জানে একথা আর তাই আমাকে দেখতে পেলেই ওরা ওই নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে থাকে।

'ওই আসছে রে! কাশিরিন কিপ্‌টের নাতি আসছে! দ্যাখ্! দ্যাখ্!'

'দে না ঘুষি মেরে ফেলে!'

আর তারপরেই মারামারি শুরু হয়ে যায়।

বয়সের তুলনায় আমার গায়ে অস্বাভাবিক জোর, আর মারামারিও করতে পারি খুব। আমার শত্রুরাও স্বীকার করে একথা, সুতরাং কেউ কক্ষণো একা আমার সঙ্গে মারামারি করতে আসে না। ফলে মারামারি শুরু হলেই শত্রুপক্ষ দল বেঁধে এসে আমাকে বেধড়ক মেরে যায় আর প্রায় সর্বদাই আমি বাড়ি ফিরি কাটা নাক, কাটা ঠোঁট ও ছেঁড়া জামাকাপড় নিয়ে।

'হ্যাঁ রে ছোঁড়া, আবার মারামারি করে এসেছিস। দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি! কোথা থেকে শুরু করবো?'

দিদিমা আমার মুখ ধুয়ে দেন। হয় তামার মুদ্রা, নয়তো গাছগাছড়ার রস, না হয় কোনো আরক লাগাতে লাগাতে বলেন:

'হ্যাঁ রে, আমাকে বল্ দেখি, কেন তুই এভাবে মারামারি করে আসিস? বাড়িতে তো দিব্যি শান্তশিষ্ট ছেলে, আর রাস্তায় বেরোলেই বুঝি মারমুখী হয়ে উঠিস! ছি, ছি! তোর দাদামশাইকে এবার বলে দেব যেন তোকে আর বাইরে বেরোতে না দেয়!'

আমার মুখ কোথাও ফুলে উঠেছে, কোথাও কেটে গেছে, এসব দাদামশাইয়ের চোখ কখনো এড়ায় না। তবে তাতে তিনি কখনো সত্যিকারের রাগ করেননি, চাপা সুরে শুধু বলেছেন:

'বাঃ, আবার দেখছি মুখের ওপরে কারুকার্য ফলানো হয়েছে! কী আমার বীরপুরুষ। রে! এই তোকে বলে রাখছি, ফের যদি রাস্তায় বেরোবি তো ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেব! কথাটা কানে ঢুকছে তো?'

রাস্তায় যদি হৈচৈ না থাকে, তাহলে আর বাইরে যেতে আমার ইচ্ছে করে না। কিন্তু যেই আমার কানে আসে, পাড়ার ছেলেরা কলকল স্বরে কথা বলতে বলতে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি দাদামশাইয়ের শাসানি ভুলে গিয়ে ছুটে রাস্তায় চলে যাই। পাড়ার ছেলেদের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে আমার মুখ কেটে-ছিঁড়ে-ফুলে ওঠে, তাতে আমি বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করি না। কিন্তু ছেলেরা খেলাচ্ছলে যে-সব নিষ্ঠুর আচরণ করে তা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না আমি। প্রতিদিন চোখের সামনে আমাকে এইসব নিষ্ঠুরতা দেখতে হয়, আর যতোই দেখি ততোই রক্ত উঠে আসে আমার মাথায়। ওরা কুকুর আর মোরগের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেয়, বেড়ালের ওপর অত্যাচার করে, ইহুদিদের ছাগলগুলোকে তাড়া দেয়, মাতাল ভিখিরিগুলোর পিছনে লাগে, আর ধর্মভীরু ইগোশাকে ক্ষ্যাপায়, 'ইগোশা, তোর পকেটে রয়েছে মৃত্যু।' এসব আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

এই শেষোক্ত জনের লম্বা, রোগা, নোংরা চেহারা, হাড়-বের-করা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে একটা লম্বা ভেড়ার চামড়ার কোট আর শরীরটা সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে চলবার সময়ে শরীরটা অদ্ভুতভাবে দোলে, চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে মাটির দিকে। কালচে মুখখানায় ছোট ছোট চোখদুটো ভারি বিষণ্ণ — দেখে আমার মধ্যে একটা ভয় ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে। আমার মনে হয়, এই লোকটি নিশ্চয়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছে এবং এ সময়ে তাকে বিরক্ত করা উচিত নয়।

কিন্তু ছেলের দল তার পিছনে পিছনে ছোটে আর তার কুঁজো পিঠটা লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে। প্রথম কিছুক্ষণ সে আপন মনেই পথ চলে, যেন ইটের টুকরোগুলো তার পিঠে লাগলেও সে কিছুই টের পাচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, পিঠটা টান করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, মাথার মোটা ছেঁড়া টুপিটা ঠিক করতে করতে চারদিকে তাকিয়ে দেখে আর এমনভাবে আড়মোড়া ভাঙে যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে।

ছেলের দল চিৎকার করতে থাকে: ইগোশা, তোর পকেটে রয়েছে মৃত্যু! যাওয়া হচ্ছে কোথায় শুনি! দ্যাখ্ তো, তোর পকেটে রয়েছে মৃত্যু!'

পকেটটা সে মুঠো করে চেপে ধরে তারপর নিচু হয়ে একটা পাথর বা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নেয়, নিশ্বাসচাপা স্বরে গালাগালি দিতে দিতে লম্বা হাতের অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে ছুঁড়ে মারে। গালাগালির পুঁজিও তার খুব বেশি নয় — মাত্র তিনটি শব্দ। এদিক থেকে ছেলেদের পুঁজি অনেক বেশি সমৃদ্ধ — কোনো তুলনা হয় না। মাঝে মাঝে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছেলের দলের পিছনে ছোটে, লম্বা কোটটায় পা আট্‌কে আট্‌কে যায় আর হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে যায় একসময়ে। দুটো শুকনো কাঠির মতো নোংরা দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে কোনো রকমে সামলে নেয় নিজেকে। কিন্তু ছেলেরা ইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে ত্যক্তবিরক্ত করে তোলে আর ছেলের দলের মধ্যে যাদের সাহস একটু বেশি তারা সামনে এগিয়ে আসে, তার মাথায় একমুঠো ধুলো ছুঁড়ে ছুটে পালিয়ে যায় আবার।

আমাদের পূর্বতন দক্ষ কারিগর গ্রিগরি ইভানোভিচ মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে যায়; আমার মনে হয়, রাস্তায় যে-সব দৃশ্য দেখা যায় তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য। গ্রিগরি ইভানোভিচ এখন সম্পূর্ণ অন্ধ; রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে দিন কাটে তার। লম্বা, সুদর্শন চেহারা, মুখে একটিও শব্দ নেই, তার হাত ধরে নিয়ে চলে এক ছোট পাকাচুল বুড়ী। এই বুড়ী বাড়ীর জানলার সামনে এসে দাঁড়ায় আর সরু সরু নাকী গলায় বলে:

'এই অন্ধ ভিখিরিকে কিছু সাহায্য করো বাবারা, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন...'

গ্রিগরি ইভানোভিচ একটিও কথা বলে না। তার চশমার কালো কাঁচদুটো সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে বাড়ির দেওয়াল বা জানলার দিকে কিংবা যে কেউ সামনে এসে দাঁড়ায় তার দিকে। ঘন দাড়ির গোছায় রঙের ছোপ-বসে-যাওয়া হাত বুলায় কিন্তু একটিও কথা বলে না — শক্তভাবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে থাকে। আমি প্রায়ই তাকে দেখি কিন্তু সেই শক্তভাবে চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনো দিন একটিও শব্দ শুনতে পাই না। গ্রিগরির এই নিঃশব্দতাই আমার বুকের ওপরে সবচেয়ে বড়ো একটা ভার হয়ে চেপে বসে থাকে। আমি কিছুতেই তার সামনে যাই না — প্রাণপণ চেষ্টা করেও যেতে পারি না। তাকে রাস্তায় দেখতে পেলেই আমি ছুটে বাড়ির ভিতরে চলে আসি আর দিদিমাকে বলি:

'দিদিমা, গ্রিগরি আসছে!'

একটা ব্যথায় দিদিমার মুখের রেখাগুলো টান হয়ে ওঠে আর তিনি বলে ওঠেন: 'আহা রে! যা তো, ছুটে গিয়ে এটা ওকে দিয়ে আয়!'

তাঁর মুখের ওপরেই রেগে রুক্ষভাবে অস্বীকার করি। তখন দিদিমা নিজেই গেটের বাইরে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গ্রিগরির সঙ্গে কথা বলেন। গ্রিগরি মুচকিয়ে হাসে, দাড়ি নাড়ে কিন্তু কথা প্রায় বলে না বললেই চলে।

মাঝে মাঝে দিদিমা গ্রিগরিকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে এসে খাওয়াতে বসেন। একবার গ্রিগরি আমার খোঁজ করেছিল। দিদিমা আমাকে ডেকে পাঠান কিন্তু আমি ছুটে গিয়ে একটা কাঠের বোঝার পিছনে লুকিয়ে থাকি। গ্রিগরির সামনে আমি কিছুতেই যেতে পারি না। গ্রিগরির সামনে লজ্জায় মুখ তুলতে পারি না আমি। আমি জানি, আমার দিদিমারও ঠিক আমার মতোই মনোভাব। মনে আছে, মাত্র একবার দিদিমা আর আমি গ্রিগরির সম্পর্কে কথা বলেছিলাম। দিদিমা গ্রিগরিকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছিলেন। মাথাটা মাটির দিকে নামানো, খুব আস্তে আস্তে পা ফেলছিলেন তিনি। আমি দিদিমার কাছে গিয়ে দিদিমার হাত ধরলাম।

শান্ত স্বরে দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রিগরি এলেই তুই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস কেন বল্ তো? ও তোকে কত ভালোবাসে, ওর মতো দয়ালু লোক হয় নাকি...'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দাদামশাই কেন গ্রিগরির খাওয়াথাকার বন্দোবস্ত করেন না?'

'দাদামশাই?'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দিদিমা। তারপর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে এক অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন:

'আমি তোকে বলে রাখছি — মনে রাখিস আমার কথাগুলো। কাজটা ভালো হচ্ছে না। ভগবানের শাস্তি পেতে হবে এজন্যে। অতি ভয়ংকর হবে সেই শাস্তি!'

দিদিমা ভুল বলেননি। তারপর বছর দশেকও পার হয়নি, দিদিমা তখন চিরশান্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছেন আর আমার এই দাদামশাই বাতিকগ্রস্ত হয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঠিক এমনিভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর এমনি করুণ সুরে জানলায় জানলায় দুটি অন্নের জন্যে হাহাকার করেছেন:

'ভালো মানুষের ছেলেরা, একটুকরো "পিরোগ" খেতে দাও আমাকে — ছোট একটুকরো "পিরোগ"... আর কিছু চাই না বাবারা... হুঃ, কী সব মানুষ!'

'হুঃ, কী সব মানুষ!' এই একটুখানি কথার মধ্যেই আগেকার সেই মানুষটিকে চেনা যায়, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কথাটুকুর মধ্যে মনের সমস্ত জ্বালা ফুটে ওঠে, শুনলে কিছুতেই স্থির থাকা যায় না।

ইগোশা এবং গ্রিগরি ইভানোভিচ ছাড়াও ভরোনিখা নামে এক দুশ্চরিত্রা মেয়ে ছিল। তাকে দেখলেই আমি পথ ছেড়ে পালাতাম। প্রতি রবিবার দেখা যায় তাকে — প্রকাণ্ড শরীর, বিস্রস্ত বেশবাস, মদের নেশায় চুর। তার হাঁটার একটা অদ্ভুত ধরন আছে, মনে হয় সে নড়ছে না বা মাটিতে পা ঠেকাচ্ছে না, ঝড়ো মেঘের মতো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, অশ্লীল গান গেয়ে চলেছে ভাঙা ভাঙা গলায়। তাকে দেখলে রাস্তা থেকে লোক পালিয়ে যায়, গা ঢাকা দেয় দোকানের মধ্যে বা অলিগলিতে বা দেওয়ালের পিছনে। রাস্তাটা যেন ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিয়ে যায় বুড়ী। তার মুখটা নীল, বেলুনের মতো ফুলো ফুলো, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখদুটো এমন ঘোরে যে দেখলেই ভয় করে। মাঝে মাঝে কান্নাভরা গলায় চিৎকার করে ওঠে:

'কোথায়? কোথায় আমার ছেলেমেয়েরা?'

কথাটার অর্থ দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

প্রথমে তিনি বললেন: 'সব কথাই তোর জানতে হবে, না?' পরে তিনি খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলেন। ঘটনাটা হচ্ছে এই: বুড়ীর স্বামীর নাম ভরোনভ। লোকটা সরকারী চাকরি করত। যে পদে চাকরি করত তার চেয়েও উঁচু একটা পদ লাভ করবার জন্য সে আপিসের কর্তার হাতে তার বৌকে তুলে দেয়। আপিসের এই কর্তাটি স্ত্রীলোকটিকে দু'বছরের জন্য নিয়ে যায়। দু'বছর পরে ফিরে এসে স্ত্রীলোকটি দেখে, তার দুটি বাচ্চা — একটি ছেলে ও একটি মেয়ে — মারা গেছে আর তার স্বামী সরকারী তহবিল তছরুপের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করছে। শোকে স্ত্রীলোকটি মদ খেতে শুরু করে এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এখন প্রত্যেক রবিবার ও রাস্তায় বেরোয়, আর সন্ধ্যায় পুলিস এসে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যায় ওকে।

অবশ্য রাস্তায় যতো কিছু ঘটনাই ঘটুক না কেন, একথা ঠিক যে রাস্তার চেয়ে বাড়ির ভিতরটা অনেক ভালো। বিশেষ করে আমার ভালো লাগে সন্ধ্যার খাওয়াদাওয়ার পরে। এই সময়টিতে দাদামশাই বেরিয়ে যান ইয়াকভ-মামার

সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আর দিদিমা জানলার কাছে বসে বসে আমাকে নানা গল্প ও বাবার জীবনের নানা ঘটনার কথা বলতে শুরু করেন।

সেই যে স্টার্লিংপাখিটাকে তিনি বেড়ালের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তার ভাঙা ডানাটাকে কেটে দিয়েছেন, পায়ের দাঁড়ায় অত্যন্ত নিপুণভাবে বেঁধে দিয়েছেন ছোট একটা কাঠি। পাখিটা সুস্থ হয়ে উঠতেই দিদিমা উঠে-পড়ে লেগেছেন, পাখিটাকে কথা বলা শেখাবেন। হয়তো দেখা যায়, পুরো একঘণ্টা ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জানলার সামনে ঝোলানো খাঁচাটার কাছে, যে কথাগুলো তিনি পাখিটাকে শেখাতে চান, সেগুলো অক্লান্তভাবে বারবার বলে চলেছেন।

'আচ্ছা এবার বলো তো দেখি: পাখিকে পরিজ খেতে দাও!'

কথাগুলো শুনে পাখিটা সঙের মতো গোল গোল চোখ পাকিয়ে দিদিমার দিকে তাকায়, খাঁচার পাটাতনের ওপরে ঠকঠক করে কাঠের পা-টা ঠোকে, গলাটা টান করে দেয়, ঈগল পাখির মতো শিস্ দেয়, কাক বা কোকিলের নকল করে, বেড়ালের মতো মিউমিউ বা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ ডাকতে চেষ্টা করে — কিন্তু অনেক কসরৎ করেও মানুষের মতো গলার স্বর কিছুতেই বার করতে পারে না।

দিদিমা মুখখানা ভারিক্কী করে বলেন: 'যথেষ্ট বাঁদরাম হয়েছে। এবার বলো দেখি: পাখিকে পরিজ খেতে দাও!'

আর যদি সেই পালকঢাকা বাঁদরের কিচিরমিচিরের মধ্যে কোনো সময়েও এমন একটি শব্দ পাওয়া যায় যাকে দিদিমার কথার অনুকরণ মনে করা যেতে পারে তাহলে দিদিমা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠে নিজের হাত থেকে যবের তৈরী পরিজ খাওয়াতে শুরু করেন।

'ভাবছিস তোর শয়তানি আমি বুঝতে পারি না? সব তোর শয়তানি, সব তোর চালাকি! ইচ্ছে করলে কী না পারিস তুই?' পাখিটাকে আদরের ধমক দেন দিদিমা।

কিছুদিনের মধ্যে দিদিমা সেই পাখিটাকে সত্যি সত্যিই কথা বলতে শিখিয়েছিলেন। বেশ স্পষ্ট ভাষায় পরিজ খেতে চাইত পাখিটা। দিদিমাকে দেখলেই চিৎকার করে বলত কি যেন, শব্দগুলো অনেকটা যেন শোনাত এই রকম — 'নমস্কার!'

পাখিটা প্রথমে ছিল আমার দাদামশাইয়ের ঘরে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দাদামশাই পাখিটাকে আমাদের ছাদের ঘরে নির্বাসনে পাঠালেন।

এই নির্বাসনদণ্ডের কারণ — পাখিটা দাদামশাইকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছিল। দাদামশাই উপাসনা করেন প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করে; সেই শুনতে শুনতে একদিন স্টার্লিংপাখিটা খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে হলদে ঠোঁটটা বাড়িয়ে বলে ওঠে:

'সত্যি, সত্যি, ই-ই, ই-ই, খু-উ-উ-ব সত্যি-ই-ই!'

পাখিটার এই ধরনের ডাক শুনে দাদামশাই ভয়ানক চটে যান। একদিন উপাসনা করতে করতে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গিয়ে মেঝের ওপরে পা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠলেন:

'এই শয়তানটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে নইলে আমি এটাকে শেষ করে ফেলব!'

এমনি সব ঘটনা। কোনোটা কৌতূহল জাগায়, কোনোটাতে মজা লাগে। এমনি অজস্র ঘটনা ঘটত আমাদের বাড়িতে। তবুও মাঝে মাঝে এক গভীর বিষাদ গ্রাস করত আমাকে। যেন মস্ত একটা বোঝা পিষে ফেলতে চাইছে আমাকে, যেন কালির দোয়াতের মতো একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে আমি বাস করছি, সেখানে কিছু দেখা যায় না, কিছু শোনা যায় না, কিছু অনুভব করা যায় না — এক অন্ধ ও অর্ধস্তিমিত জীবন।

আট

শুঁড়িখানার মালিকের কাছে হঠাৎ দাদামশাই আমাদের বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন। আরেকটা বাড়ি কিনলেন কানাৎনায়া স্ট্রীটে। এই রাস্তাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গোলমাল হৈচৈ নেই, প্রচুর ঘাসে ঢাকা, কাঁচা, বরাবর গিয়ে মিশেছে খোলা মাঠে। দু-পাশে সার দেওয়া ছোট ছোট ঝক্‌ঝকে রং-করা বাড়ি।

পুরনো বাড়ির চেয়ে নতুন বাড়িটা আরো সুন্দর, আরো পরিপাটি, আরো তক্‌তকে। সামনের দিকে গাঢ় ও উষ্ণ লাল রং। এই লাল রঙের পটভূমিতে একতলার তিনটে জানলার নীল খড়খড়ি আর ওপরের ঘরের জানলার ঝিল্‌মিলি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এল্‌ম ও লাইম-গাছের ডালপালা নেমে এসেছে ছাদের বাঁ দিকটায়। উঠোন আর বাগানের মধ্যে সরু সরু রাস্তা এমন গোলকধাঁধার মতো ছড়িয়ে আছে যে মনে হয় এই স্থানটি বিশেষ করে লুকোচুরি খেলবার জন্যে তৈরি। নাতিবৃহৎ বাগানটি

অতি চমৎকার, ঝোপঝাড় লতাগুল্মের প্রাচুর্যে মুগ্ধ হতে হয়। এক কোণে স্নানঘর, খেলনার মতো ছোট্ট ও পরিচ্ছন্ন। আরেক কোণে প্রচুর আগাছায় ভরা একটা চওড়া গভীর গর্ত। এখানে আগে একটা স্নানঘর ছিল, এখন তার দগ্ধাবশেষটুকু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ দিকের সীমানায় কর্নেল অভসিয়ান্নিকোভের আস্তাবল, ডানদিকে বেৎলেঙ-এর বার বাড়ি। আর বাগানের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে গোশালার কর্ত্রী পেত্রভনার জমি। মেদস্ফীত, লালমুখ পেত্রভনা, সোরগোলে স্বভাব—মস্ত একটা ঘণ্টার মতো মনে হয় তাকে। বাড়িটা ছোট, অন্ধকার ও সাজসজ্জাহীন; পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে মাটির সঙ্গে থেব্‌ড়ে আছে মনে হয়। পুরু শ্যাওলায় ঢেকে গেছে বাড়িটা। খোলা মাঠের দিকে দুটো জানলা! গভীর নালা মাঠটাকে চিরে দিয়েছে। দূরের অরণ্যকে এক পোঁচ আবছা নীল রঙের মতো দেখায়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই মাঠে সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে; শরৎকালের রোদে বিদ্যুতের মতো ঝল্‌সে ওঠে তাদের বেয়নেটগুলো।

আমাদের বাড়িতে আর যে-সব লোক থাকে তাদের আমি আগে কোনোদিন দেখিনি। সামনের দিকের কামরাটায় থাকে সস্ত্রীক একজন ফৌজী লোক, জন্মগত পরিচয়ে তাতার। গোলগাল ছোটখাট চেহারার বৌটি সারাদিন হাসে, হৈচৈ করে, আর হাল্‌কা নক্সায় সজ্জিত একটা গীটার বাজায়। চড়া আর সুরেলা একটা মজার গান সে প্রায়ই গায়। গানটা হল:

একটি মেয়েকে ভালোবেসে থেকে
সন্তুষ্ট থাকা যায় না।
বিবেচনা রেখে খুঁজে পেতে দেখে
আনো মেয়ে অন্যজনা।
তবে পার পেতে সন্দ নেই তাতে
মন মত পুরস্কার
সে প্রিয়া যে তবে নিশ্চিতই হবে
সব রতনের সার!
সে যে স-ব র-ত-নে-র সা-র!

স্বামীটি বলের মতো গোল। ফুলো ফুলো নীল গাল নিয়ে জানলার সামনে বসে থাকে আর পাইপ টানে। বাদামী লালচে রঙের কুৎকুতে চোখদুটো

অনবরত ঘুরপাক খায়। মাঝে মাঝে কাশে আর কাশির সঙ্গে অদ্ভুত একটা শব্দ ওঠে: 'র্-র্-রা-আ-ফ্! র্-র্-রা-আ-ফ্!'

গুদামঘর ও আস্তাবলের ওপরে যে গরম ঘরটি তোলা হয়েছে সেখানে থাকে দুজন গাড়ি-চালক আর ভালেই নামে জাতে তাতার একজন লম্বা চেহারার বিষণ্ণ মেজাজের আর্দালি। গাড়ি-চালকদের একজনকে সবাই ডাকে পিওতর-কাকা বলে। ছোটখাটো বুড়িয়ে-যাওয়া মানুষটি। অপরজন তার বোবা ভাইপো স্তিওপা। চিকন মসৃণ চেহারা স্তিওপার, মুখখানা ঠিক তামার থালার মতো। এরা সবাই আমার অপরিচিত এবং এদের সবার প্রতিই আমি গভীর কৌতূহল বোধ করি।

কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি কৌতূহল এই বাড়ির অন্য এক বাসিন্দা 'বাঃ বেশ' সম্পর্কে। বাড়ির পিছনদিকে রান্নাঘরের পাশের লম্বা ঘরটি সে ভাড়া নেয়। দুটি জানলা ঘরটিতে, একটি বাগানের দিকে, অপরটি উঠোনের দিকে।

বাসিন্দাটি রোগা, কুঁজো। কালো দো-পাট্টা দাড়ি ফ্যাকাশে মুখটাকে আরো ফ্যাকাশে করে তুলেছে। চোখে চশমা। শান্ত, নির্বিরোধী মানুষ কোনো সাতেপাঁচে থাকে না। চা বা খাবার তৈরি হয়ে গেলে তাকে ডাকবার জন্যে কেউ গেলেই তার মুখে একটি অবধারিত জবাব শোনা যায়: 'বাঃ বেশ!'

দিদিমা লোকটির নাম দিয়েছেন 'বাঃ বেশ'; আড়ালে, এমন কি সামনা-সামনিও এই নামে ডাকেন।

'যা তো রে লেক্সেই, "বাঃ বেশ"কে বলে আয় যে চা দেওয়া হয়েছে।' কিংবা, 'একি "বাঃ বেশ", কিছুই খেলেন না যে, আরেকটু তুলে নিন!' এমনি ধরনের কথা দিদিমার মুখে শোনা যায়।

বড়ো বড়ো কাঠের বাক্স আর মোটা ব্যবহারিক বইয়ে তার ঘরটা ঠাসা। এরকমটি আমি এর আগে আর দেখিনি। আর ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে নানা রঙের তরল পদার্থে ভর্তি বোতল, তামার টুকরো, লোহা আর সীসের চাঁই। একটা বাদামী রঙের চামড়ার জ্যাকেট ও ছাইরঙের ছককাটা প্যাণ্ট সে সবসময়ে পরে থাকে। জামা ও প্যাণ্টের সর্বত্র রঙের ছিটে লেগেছে আর উৎকট একটা গন্ধ। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এই ঘরেই কাটায় সে। কখনো সীসে গলাচ্ছে, কখনো তামা ঝালাই করছে, কখনো ক্ষুদে ক্ষুদে নিক্তিতে কি যেন ওজন করছে। মাঝে মাঝে আঙুল পুড়িয়ে ফেলে নিজেই চিৎকার করে ওঠে আবার সেই পোড়া আঙুলে নিজেই ফুঁ দেয়। দেওয়ালে ব্যাখ্যা সম্বলিত

চিত্র ঝুলছে; এক এক সময়ে সেই চিত্রগুলির ওপরে ঝুঁকে পড়ে; চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে কাঁচদুটো মুছে নেয় এবং এতবেশি ঝুঁকে চিত্রগুলো দেখে যে তার চকখড়ির মতো সাদা নাকটা প্রায় ঠেকে যায় চিত্রের সঙ্গে। এক একসময়ে দেখা যায়, ঘরের মাঝখানটিতে বা জানলার পাশে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে; চোখদুটো বোজা, মাথাটা ঊর্ধ্বমুখী; নিস্তব্ধ নিশ্চল মূর্তির মতো একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বহুক্ষণ।

উঠোনের শেষদিকে একটা চালা আছে। এই চালার ছাদের ওপরে উঠে উঠোনের মধ্যে দিয়ে খোলা জানলার ভিতরে আমি লোকটিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। টেবিলের ওপরে অ্যাল্‌কোহল বাতি জ্বলে, তার নীল শিখাটা দেখা যায়। বাতির ওপরে ঝুঁকে রয়েছে সেই লোকটির কালো মূর্তিটা। মাঝে মাঝে একটা ছেঁড়া নোটবইয়ের পৃষ্ঠায় কী যেন লেখে, হিম একটা আভা ঠিকরে ঠিকরে পড়ে তার চশমার কাঁচ থেকে—নীল বরফের এক-একটা টুকরো যেন। আশ্চর্য এক যাদুকরের মতো মনে হয় তাকে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি সেই চালার ওপরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

মাঝে মাঝে জানলার ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো সে এসে দাঁড়ায় জানলার সামনে। হাতদুটো পিছনের দিকে রেখে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে উঠোনের চালাটার দিকে, কিন্তু একটিবারও আমাকে দেখতে পায় বলে মনে হয় না। এতে আমি অপমানিত বোধ করি। কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে একলাফে টেবিলটার কাছে ফিরে যায়, আরো বেশি ঝুঁকে পড়ে, অস্থিরভাবে খাতাকাগজ জিনিসপত্রের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে কি যেন।

লোকটির অনেক টাকাপয়সা থাকলে আর বেশভূষা ফিটফাট হলে হয়তো তাকে দেখে আমার ভয় হতে পারত। কিন্তু লোকটি গরীব। তার চামড়ার জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে যে কলারটা বেরিয়ে থাকে তা নোংরা ও কুঁচকনো, বিচিত্র দাগওলা প্যাণ্টটা তালি মারা, মোজাহীন পায়ে যে জুতোজোড়া সে পরে তার মধ্যে জুতোর গুণ আর বিশেষ কিছু নেই। গরীবদের দেখলে আমার দিদিমার মন গলে যায়, আমার দাদামশাই উপেক্ষা করেন তাদের; এ থেকে একটা শিক্ষা আমার হয়েছে—গরীব লোকেরা কখনো বিপজ্জনক হয় না, তাদের মধ্যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

'বাঃ বেশ'কে আমাদের বাড়ির কেউ পছন্দ করে না। সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করে। ফৌজী লোকটির আমুদে বৌ তার নাম দিয়েছে 'চকখড়ি

নাক'। পিওতর-কাকা বলে, 'রাসায়নিক', 'কুহকী'। দাদামশাই বলেন, 'যাদুকর শয়তান।'

দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমা, উনি কী করেন?'

দিদিমা মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠলেন, 'সে খোঁজে তোর কি দরকার শুনি? সব কথার মধ্যে তোর থাকা চাই, না?'

একদিন আমি আমার সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে তার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'তুমি কী করছ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। আমার উত্তেজনা আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিলাম না।

লোকটি চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে চশমার কাঁচের উপর দিয়ে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের ফোস্কাপড়া ঝল্‌সানো হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে:

'হাত ধরে উঠে এস।'

সে যে আমাকে দরজা দিয়ে না ঢুকে জানলা দিয়ে গলে ভিতরে যেতে বলেছে তাতে তার মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে গেল আমার চোখে। একটা বাক্সের উপরে বসল সে, আমাকে বসাল ঠিক তার সামনেটিতে, আমাকে একবার এপাশে একবার ওপাশে ফিরিয়ে দেখল বহুক্ষণ ধরে, শেষকালে বলল:

'তুমি কোত্থেকে আসছ?'

প্রশ্নটা অদ্ভুত; কারণ দিনের মধ্যে চারবার খাবার টেবিলে আমি তার পাশটিতে বসি।

'আমি এই বাড়ির নাতি।' আমি জবাব দিলাম।

'ও হ্যাঁ, তাইতো।' বলে সে আবার অন্যমনস্কভাবে চুপ করে গিয়ে হাতের একটা আঙ্গুল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

আমার মনে হল, কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা দরকার। বললাম:

'আমি এ-বাড়ির নাতি বটে কিন্তু আমি কাশিরিন নই—আমি হচ্ছি পেশ্‌কভ।'

'পেশ্‌কভ?' কথাটা উচ্চারণ করবার সময়ে জোরটা 'ক'-এর ওপরে না দিয়ে ভুলভাবে দিল 'পে'-এর ওপরে, তারপর বলল, 'বাঃ বেশ।'

তারপর আমাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার উঠে গেল টেবিলটার কাছে।

'ঠিক আছে। চুপটি করে বসে থাকো। গোলমাল কোরো না।'

বসে বসে বহুক্ষণ ধরে লোকটির কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখলাম। একটা তামার টুকরোকে চিম্‌টে দিয়ে ধরে উখো দিয়ে ঘষে ঘষে তামার গুঁড়ো বার করে নিল। বেশ কিছুটা গুঁড়ো জমবার পরে সেই সোনালী ধুলোগুলোকে একজায়গায় জড়ো করে ঢালল একটা পুরু পাত্রের মধ্যে। একটা গামলায় নুনের মতো সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো কি যেন ছিল, তার থেকে খানিকটা নিয়ে মিশিয়ে দিল তামার গুঁড়োর সঙ্গে। তারপর একটা গাঢ় রঙের বোতল থেকে তরল পদার্থ ঢালল পাত্রের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের মধ্যেকার মিশ্রিত পদার্থ টগবগিয়ে উঠল, ধোঁয়া উঠতে লাগল, আর এমন একটা ঝাঁজালো গন্ধ বেরিয়ে এল যে আমি ভয়ানক কাশতে লাগলাম।

'বিশ্রী গন্ধ, না?' ঐন্দ্রজালিক বেশ খানিকটা দেমাকের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'হ্যাঁ!'

'ঠিক আছে ভাইটি! এই তো চাই! খুব ভালো কথা!'

আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না এত দর্পের কারণ কী থাকতে পারে।

ঝাঁজালো গলায় আমি বললাম, 'যা খারাপ তা সব সময়েই খারাপ— কখনো ভালো হয় না।'

চোখ পিটপিটিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'কী বললে? জেনে রেখো ভাইটি, তোমার কথাটা সব জায়গায় খাটে না। আচ্ছা তুমি হাড়ের খেলা খেলতে ভালোবাস?'

'মানে, ঘুঁটিখেলা?'

'হ্যাঁ, ঘুঁটিখেলা।'

'নিশ্চয়ই ভালোবাসি।'

'আমি তোমাকে চমৎকার এক ঘুঁটি বানিয়ে দেব—কেমন? দেখবে, কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না।'

'তাহলে তো খুব ভালো হয়।'

'তাহলে তোমার ঘুঁটিগুলো নিয়ে এসো তো দেখি।'

ধূমায়মান পাত্রটা হাতে নিয়ে আবার সে আমার কাছে এগিয়ে এল।

'তোমাকে আমি ঘুঁটি বানিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে যে

তুমি আর কক্ষণো এখানে আসবে না। বলো, রাজি আছ?' একচোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল সে।

আমার আত্মসম্মানে ভয়ানক ঘা লাগল। আমিও পাল্টা জবাব দিলাম:

'এমনিতেই আমি আর কখনও আসব না।' বলে আমি বাগানে চলে এলাম।

বাগানে এসে দেখলাম, দাদামশাই আপেলগাছের গোড়ায় সার দিচ্ছেন। শরৎকাল। ইতিমধ্যেই গাছের পাতা ঝরতে শুরু করেছে।

গাছের ডাল ছাঁটবার কাঁচিটা আমার হাতে দিয়ে দাদামশাই বললেন, 'নে তো এটা, র‍্যাস্‌বেরির ডালগুলোকে একটু ছেঁটে দে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, "বাঃ বেশ" কী করে?'

দাদামশাই ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলেন, 'ঘরটাকে নষ্ট করছে লোকটা। মেঝেটাকে তো অনেক জায়গায় পুড়িয়েছে, তার ওপরে ওয়াল-পেপারে দাগ ধরিয়ে দিয়েছে, এমন কি ছিঁড়ে ফেলেছে দু-এক জায়গায়। ওকে উঠে যাবার জন্যে বলতে হবে।'

'তাহলেই ঠিক হয়।' আমিও সায় জানিয়ে গাছের ডাল ছাঁটবার কাজে মন দিলাম।

কিন্তু বড়ো তাড়াতাড়ি সায় জানিয়েছিলাম আমি।

বর্ষার দিনে সন্ধ্যায় দাদামশাই বাড়ি না থাকলে দিদিমা রান্নাঘরে ছোটখাটো একটি ভোজসভার ব্যবস্থা করেন। বাড়ির সমস্ত বাসিন্দাকে ডাকেন তিনি। গাড়ি-চালকরা ও আর্দালি বাদ পড়ে না, এমন কি একজন রসিকা বাসিন্দাও থাকে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। প্রাণরসে ভরপুর পেত্রভনাও আসে মাঝে মাঝে আর নিয়মিত অভ্যাগতদের মধ্যে থাকে 'বাঃ বেশ'। উনুনের পাশের কোণটিতে সে চুপচাপ বসে থাকে, একটুও নড়েচড়ে না। বোবা স্তিওপা তাস খেলে তাতার আর্দালি ভালেই'র সঙ্গে। তাস খেলতে খেলতে স্তিওপার ধ্যাবড়া নাকটায় টোকা দিতে দিতে ভালেই বলে, 'আচ্ছা ঘাগী শয়তান তো তুই!'

পিওতর-কাকা নিয়ে আসে মস্ত একটা সাদা পাঁউরুটি আর বড় একটি কলসীতে ভর্তি ফলের জ্যাম। রুটিটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে তার ওপরে পুরু করে ফলের জ্যাম লাগায়, তারপর হাতের ওপরে রুটির টুকরো নিয়ে অতিথিদের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

'দয়া করে একটুকরো রুটি নিন।' অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা নিচু করে

সাদরে বলে সে। আর যখনই কেউ রুটির টুকরোটা তুলে নেয়, সে নিজের কালচে হাতের তালুটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে। আর যদি দেখে যে কোথাও একফোঁটা জ্যাম লেগে আছে তাহলে তা জিভ দিয়ে চেটে নেয়।

পেত্রভনা নিয়ে আসে চেরিফলের মদ আর সেই রসিকাটি আনে বাদাম ও মিষ্টি। তারপর শুরু হয় ভোজপর্ব। আমার দিদিমা তা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

'বাঃ বেশ' আমাকে ঘুষ দিয়ে তার ঘরে যেতে নিষেধ করার কিছুদিন বাদেই দিদিমা এই ধরনের এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। শরৎকালের পচা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাইরে সোঁ সোঁ বাতাস, গাছগুলো ঝরঝর শব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে আর দেওয়ালের গায়ে আঁচড় দিচ্ছে। রান্নাঘরের ভিতরটা উষ্ণ ও আরামদায়ক। মানুষগুলো ঘন হয়ে বসেছে, সকলেই কেমন যেন বিশেষভাবে শান্ত আর খুসি। দিদিমাও আজ অন্য দিনের মতো নন, তাঁর মুখে আজ গল্পের খই ফুটছে।

দিদিমা বসেছেন উনুনের ধারে, পা রেখেছেন সিঁড়ির একটা ধাপে। শ্রোতাদের দিকে ঝুঁকে তিনি গল্প বলছেন, একটা টিনের বাতির আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে। যখনই দিদিমার জমিয়ে গল্প বলবার মেজাজ আসে তিনি বসবার জন্যে উনুনের এই উঁচু আসনটি বেছে নেন।

জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'উঁচু থেকে নিচের দিকে কথা বলা, এই আর কি! শ্রোতারা যদি তলায় থাকে তাহলে কথা বলতে আমার ভারি সুবিধে হয়!'

দিদিমার পায়ের কাছে একটি ধাপে আমি বসেছিলাম, 'বাঃ বেশ'এর মাথার প্রায় ওপরটিতে। দিদিমা বলছিলেন যোদ্ধা ইভান ও ঋষি মিরনের কৌতূহলোদ্দীপক গল্প। ছন্দোবদ্ধ ভাষার সমৃদ্ধ ধারা কলধ্বনি তুলে বয়ে চলেছিল। গল্পটা হচ্ছে এই:

> গর্দিয়ন নামে এক পাপিষ্ঠ অধিনায়কের বাস ছিল এই পৃথিবীতে। পাপে ভরা ছিল তার আত্মা, পাথরের মতো বিবেক, সত্যকে ঘৃণা করত সে। গর্তের উইপোকার মতো ছিল তার পঙ্কিল জীবন। পৃথিবীতে এত লোক আছে, তাদের মধ্যে একটি লোককে সে সব চেয়ে বেশি ঘৃণা করত: ঋষি মিরন। ঋষি মিরন ছিলেন শান্তি ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক, সত্য ও সুন্দরের পূজারী। একদিন এই গর্দিয়ন ডেকে পাঠাল অনুগত বীর যোদ্ধা ইভানকে। বলল: 'এক্ষুণি যাও তুমি অহঙ্কারী বুড়ো মিরনের কাছে, কেটে ফেলো তার মাথাটা তলোয়ারের এক কোপে। তারপর কাটা

মুণ্ডুটাকে পাকা দাড়ি ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসবে আমার কাছে। আমার কুকুরগুলোর ভোজে লাগবে সেটা!'

একান্ত বাধ্য ও অনুগত ইভান সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল ঋষি মিরনের মাথা কাটবার জন্যে। নিজের মনকে সে প্রবোধ দিল এই বলে যে, সে অপরের আদেশ পালন করতে বাধ্য। বোঝা যায় এটা ভগবানের ইচ্ছে।

তারপর ঋষির কাছে এসে তলোয়ারটা নীচে লুকিয়ে রাখে তার পোষাকের তলায়, হাসিমুখে অভিবাদন জানায় বুড়োকে আর বলে: 'কেমন আছ ঠাকুর? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!'

ঋষি মিরনের অজ্ঞাত ছিল না কিছুই—স্মিত হেসে ধীর স্বরে বলেন তিনি. 'কেন তুমি আমাকে প্রতারণা করছ? পরমমঙ্গলময় ঈশ্বরের অজানা থাকে না কিছুই, তোমার পাপ-মতলবের কথাও তিনি জানেন। আমি জানি তুমি কী করতে এসেছ!'

লজ্জা হল ইভানের, লজ্জায় অন্তর ভরে গেল। আবার গার্দিয়নের ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার কথা ভেবে শিউরে উঠল সে। চামড়াব খাপ থেকে টেনে বার করল তলোয়ার — সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র উঁচিয়ে ধরল সাহসের সঙ্গে।

'আমি তোমাকে এমন ভাবে মারতে চেয়েছিলাম যে তলোয়ারটাকে তুমি দেখতেই পাবে না। কিন্তু এখন অন্য কথা। ওরে বুড়ো, নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে শেষবারের মতো প্রার্থনা করে নাও। প্রার্থনা করো সকল মানুষের জন্য। আমার জন্য, তোমার জন্য। তারপব তলোয়ারের এক ঘায়ে তোমার মস্তক ছিন্ন হবে।'

হাঁটু মুড়ে বসলেন জ্ঞানী বৃদ্ধ। বসলেন এক নবীন ওক্‌গাছের নিচে। ওক্‌গাছ তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ল। স্মিত হেসে বললেন জ্ঞানী বৃদ্ধ: 'ভালো করে ভেবে দেখ ইভান, বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। সব মানুষের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা তাড়াতাড়ি শেষ হবে না। তার চেয়ে বরং অপেক্ষা করে কাজ নেই, এই মুহূর্তেই আমার মস্তক ছিন্ন করা ভালো।'

ঋষির কথা শুনে ইভান তাকিয়ে রইল ভুরু কুঁচকে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। গর্বোদ্ধত স্বরে মূর্খের মতো জবাব দিল: 'যা কথা দিয়েছি তাই হবে। প্রার্থনা করো তুমি। যতোদিন খুশি। যদি একযুগ অপেক্ষা করতে হয় তাহলে তাই সই।'

তারপর ঋষি বসলেন প্রার্থনায। আস্তে আস্তে এল রাত্রি। রাত্রি পার হয়ে এল সকাল। সকালের পরে আবার সন্ধ্যা। গ্রীষ্ম পার হয়ে বসন্ত। বৎসরের পর বৎসর। তেমনিভাবে ঋষি বসে রইলেন প্রার্থনায়। বসে রইলেন ওক্‌গাছের নিচে। নবীন ওক্‌গাছ আকাশছোঁয়া হল। চারপাশের ওক্‌গাছের বীজ থেকে উৎপন্ন ঝোপঝাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সৃষ্টি করল নিবিড় এক অরণ্য। তবুও তেমনিভাবে বসে রইলেন ঋষি মিরন।

ঋষি মিরনের ছেদহীন প্রার্থনা আজও চলেছে। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করছেন। কামনা কবছেন মেরীমাতার কল্যাণ হাস্য। আর ঋষি মিরনের পাশেই তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বীর যোদ্ধা ইভান। তলোয়ারে মরচে পড়েছে। খসে খসে পড়ছে তলোয়ারের খাপ। ধুলো হয়ে উড়ে উড়ে গেছে পরনের পোশাক। গরমে গলে গলে পড়ে শরীর — তবুও গলেনি। পঙ্গপালে কুরে কুরে খেয়েছে তাকে — তবুও খায়নি। জন্তুজানোয়াররাও এড়িয়ে চলে। নেকড়ে ভল্লুকও ধারে কাছে আসে না। ঝড়বৃষ্টি গায়ে লাগে না তার। তুষার স্পর্শ করে না তাকে। স্থির অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। একটু হাত তোলবার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা নেই একটু সরে দাঁড়াবার। দেখো: এই হোক সেই লোকেব শাস্তি — যে অপরের পাপপরামর্শে কান দেয়, নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দেয় অপরের ইচ্ছার কাছে। আর সেই প্রাচীন ঋষি এখনো প্রার্থনা করে চলেছেন। প্রার্থনা করছেন আমাদের মতো পাপীদের জন্য। আর নদী যেমন সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় — তেমনি তাঁর প্রার্থনাও ধারাস্রোতের মতো চলেছে ভগবানের কাছে।

গল্পটা শুরু হতেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম, 'বাঃ বেশ' যে জন্যেই হোক ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। হাতদুটো অস্থিরভাবে নাড়তে নাড়তে অদ্ভুত সব ভঙ্গি করছে, চশমাটা বারবার খুলছে আর পরছে কিংবা হয়তো চশমাটা দুলিয়ে দুলিয়ে তাল দিচ্ছে কবিতার সঙ্গে সঙ্গে, মাথা নাড়ছে, চোখ কচলাচ্ছে. কপাল আর গালের ওপর দিয়ে যেন টসটস করে গড়িয়ে পড়া ঘাম মুছে নিচ্ছে। কেউ কাশলে বা মেঝের ওপর পা ঘষলে সঙ্গে সঙ্গে চাপা অধীর স্বরে শব্দ করে উঠছে, 'শ্-শ্-শ্!'

দিদিমার গল্প বলা শেষ হতেই সে সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত নাড়তে নাড়তে আর ঘুরপাক খেতে খেতে বলতে লাগল বিড়বিড় করে:

'ভারি চমৎকার! সত্যিই ভারি চমৎকার! এই গল্পটি লিখে রাখা দরকার, কিছুতেই যেন হারিয়ে না যায়! আর কী যথার্থ ও খাঁটি গল্প ...'

এবার স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল যে সে কাঁদছে। চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা সত্যিই অস্বাভাবিক আর বড়ো মর্মস্পর্শী। অদ্ভুত ভঙ্গিতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘুরপাক খাচ্ছে রান্নাঘরের চারদিকে, বারবার চেষ্টা করছে চশমাটা চোখে পরতে কিন্তু চশমার তারটা কিছুতেই কানের পিছনে আঁটতে পারছে না। পিওতর-কাকা মুচকিয়ে হেসে ফেলল কিন্তু অন্যরা হতভম্ব।

দিদিমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'বেশ তো, বেশ তো, লিখে নিতে চান, লিখে নিন। এতে আর দোষ কী? এ-ধরনের কবিতা আমি আরও অনেক জানি।'

উত্তেজিত স্বরে সে চিৎকার করে উঠল, 'না! না! অন্যগুলোর কথা বলছি না! এইটেই! এই গল্পটা খাঁটি রুশদেশের গল্প!' হঠাৎ সে রান্নাঘরের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে উঁচু স্বরে কথা বলতে আরম্ভ করল। ডানহাতটা ঝাঁকাচ্ছে আর কম্পিত বাঁ হাতে ধরে আছে চশমাটা। উত্তাপ ও আবেগের সঙ্গে কথা বলে চলেছে সে, গলা চড়িয়ে জোর দিচ্ছে কথাগুলোর ওপর, পা ঠুকছে মেঝেতে।

'নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা ভুল।' বারবার বলে চলেছে এই কথাগুলো।

হঠাৎ তার গলাটা বুজে গেল। ঘরের মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সে, তারপর অপরাধীর মতো মুখ করে, মাথা নিচু করে, নিঃসাড়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ঘরের মানুষগুলো হাসল মুখ টিপে আর লাজুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল একজন আরেকজনের দিকে। দিদিমা তাকের অন্ধকারের মধ্যে শরীরটাকে সরিয়ে দিয়ে গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পুরু লাল ঠোঁটদুটোর ওপরে হাত বুলোতে বুলোতে পেত্রভনা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কী? একেবারে রেগে ক্ষেপে গেছে মনে হয়!'

'না, তা নয়। লোকটার ধরন-ধারণই ওই রকম...' জবাব দিল পিওতর-কাকা।

চুল্লির ওপর থেকে নেমে এসে দিদিমা সামোভারে আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।

'ভদ্রলোকেরা এইরকমই হয়— এমনি খামখেয়ালি।' শান্ত স্বরে কথাগুলো বলল পিওতর-কাকা।

'বিয়ে না করে আইবুড়ো থাকলে এই হয়।' বিড়বিড় করে বলল ভালেই।

হেসে উঠল সবাই। পিওতর-কাকা বলল, 'কী-ভাবে কাঁদছিল দেখেছ? রুই-কাৎলা যেখানে ঘাই মারে সেখানে এখন পুঁটিমাছের ফরফরানি আর সহ্য হয় না!'

কারও কথাবার্তাই আর ভালো লাগছে না। একটা বিষণ্ণ অবসাদ সূচের মতো আমার মনের মধ্যে বিঁধছে। 'বাঃ বেশ'কে দেখে আজ আমি খুবই অবাক হয়েছি, লোকটির ওপর আমার করুণা হচ্ছে, তার সেই

জল-ছাপিয়ে-ওঠা চোখদুটোর স্মৃতি কিছুতেই আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না।

সেদিন রাত্রে সে বাইরেই রইল; ফিরে এল পরদিন দুপুরবেলার খাওয়া শেষ হবার পরে। নিজের কৃতকর্মের কথা ভেবে সে খুব লজ্জা পেয়েছে আর মুষড়ে পড়েছে, কিছুতেই যেন আর মাথা তুলতে পারছে না।

ছোট ছেলেরা দোষ করলে পরে যেমন দোষ স্বীকার করে তেমনিভাবে সে এসে আমার দিদিমার কাছে বলল, 'কাল বড়ো গোলমাল করে ফেলেছি, না? আপনি নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছেন?'

'কেন, রাগ করব কেন?'

'আমার কথা শুনে।'

'কই, আপনি তো কাউকে ঠেকা দিয়ে কোনো কথা বলেননি।'

আমার মনে হল, দিদিমা এই লোকটিকে ভয় করে চলেন। দিদিমা লোকটির দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছেন না আর এমন নরম সুরে কথা বলছেন যে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

দিদিমার দিকে আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে সে নিতান্ত সরলভাবেই বলতে লাগল:

'দেখুন, আমি বড়ো একা, বড়ো বেশি একা। এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। সব সময়ে একা একা থাকি আর মাঝে মাঝে এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন ইচ্ছে করে নিজের মনটাকে উজাড় করে ঢেলে দিই। মনটা এমন হয়ে ওঠে যে গাছ-পাথরের সঙ্গেও কথা বলতে পারি তখন...'

লোকটির কাছ থেকে একটু দূরে সরে এসে দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বিয়ে করো না কেন?'

'বিয়ে!' হাত নেড়ে বলল সে, তারপর ভুরু কুঁচকিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দিদিমা লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর একটিপ নস্যি নিয়ে ফিরে তাকালেন আমার দিকে। রুষ্ট স্বরে বললেন:

'আর তোকেও বলে রাখছি, খবরদার ওই লোকটার কাছে ঘুরঘুর করবি না। কে জানে বাপু, কী ধরনের মানুষ।'

কিন্তু এই ঘটনার পরে লোকটির কাছে যাবার জন্যে আমার আগ্রহ আবার জ্বলে উঠল।

সে যখন বলছিল, 'আমি বড়ো একা, বড়ো বেশি একা' — তখন তার মুখের ভাবে যে পরিবর্তন এসেছিল তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কথাগুলির মধ্যে এমন কিছু ছিল যার অর্থটা আমি ধরতে পেরেছিলাম এবং যা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। লোকটির কাছে যাবার জন্যে আমি বেরিয়ে এলাম।

তার ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ঘরের মধ্যে কেউ নেই এবং আগাগোড়া ঘরটা অপ্রয়োজনীয় ও অদ্ভুত সব জিনিসে ঠাসা — ঘরের মালিক নিজেও যেমন অপ্রয়োজনীয় ও অদ্ভুত, ঘরের জিনিসগুলোও তাই। সেখান থেকে গেলাম বাগানে। বাগানে গিয়ে দেখলাম, গর্তের ধারে পোড়া গুঁড়ির ওপরে গুটিসুটি হয়ে সে বসে আছে। হাঁটুদুটো মোড়া, কনুই রেখেছে হাঁটুর ওপরে আর ঘাড়ের পিছনে একহাতের সঙ্গে আরেক হাত আট্‌কানো। গুঁড়িটা ধুলোকাদায় মাখামাখি, গুঁড়ির একটা মাথা আলকুশি সোমরাজ আর ভাঁটের ঝোপ ছাড়িয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এখানে এভাবে বসে থাকাটাও অস্বস্তিকর। কিন্তু তবুও সে বসে আছে। এই দৃশ্য দেখার পর লোকটির প্রতি আমার আগ্রহ আরো বেশি বেড়ে গেল।

পেঁচার মতো অন্ধ দৃষ্টিতে আমার মাথার ওপর দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'কি, আমাকে ডাকতে এসেছ নাকি?' তার গলার স্বরে একটু যেন রাগেব আভাস।

'না।'

'তাহলে এখানে কেন?'

'এমনি।'

চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে সে লাল-কালো ছোপ লাগানো একটা রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে লাগল।

'আচ্ছা, নেমে এসো।'

নিচে নেমে তার পাশে গিয়ে বসতেই আমাকে সে একবার জোরে জড়িয়ে ধরল।

'বসো এখানে। তুমিও কথাটি বলবে না, আমিও না। আমরা দু'জনে শুধু চুপচাপ বসে থাকব, কেমন? ঠিক, এইভাবে... তুমি তো ভারি একগুঁয়ে দেখি!'

'হ্যাঁ, আমি একগুঁয়ে।'

'বাঃ বেশ।'

বহুক্ষণ নির্বাক হয়ে আমরা সেখানে বসে রইলাম। সলজ্জ, শান্ত সন্ধ্যা; চমৎকার উষ্ণ একটি সন্ধ্যা; বিষণ্ণতার ছাপ চারিদিকে—যখন সবকিছুই রঙীন অথচ চোখের সামনে সব রঙ মুহূর্তে মুহূর্তে পাণ্ডুর হয়ে আসছে; যখন ফুরিয়ে আসে গ্রীষ্মকালের মাতাল সৌরভ আর রিক্তা পৃথিবীর শ্বাসের সঙ্গে উঠে আসে শুধু স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডার বুকচাপা গন্ধ; যখন বাতাস হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক রকমের স্বচ্ছ; যখন গোলাপী আকাশে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে পড়ে দাঁড়কাকগুলো, মনের মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক চিন্তার উদয় হয়। চারদিক নিথর ও মৌন। এই নিথর মৌনের রাজ্যে কোথায় একটা পাখি ডানা ঝট্‌পট্‌ করছে বা কোথায় একটা গাছের পাতা খসে পড়ছে--এই সামান্য শব্দটুকুই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে এমন একটা শব্দের ঝড় তোলে যে চমকে উঠে চারদিকে তাকাতে হয় এবং পর মুহূর্তেই আবার সেই সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতায় ডুবে যেতে হয় একেবারে।

এই ধরনের একেকটি মুহূর্তে মনের মধ্যে যে-সব চিন্তার উদয় হয় সেগুলো বিশেষ পবিত্র, তার মধ্যে এতটুকু মলিনতা নেই--মাকড়সার জালের মতো এই চিন্তা বড়ো বেশি স্বচ্ছ এবং বড়ো সহজেই ছিঁড়ে যায়। ভাষা দিয়ে এই চিন্তাকে বন্দী করা যায় না। তারা ঝলসে ওঠে আবার উল্কার মতো মিলিয়ে যায়। নিজের সত্তাকে বিষণ্ণতায় ভরে তোলে, নাড়া দেয়, আদর করে, দোলা দেয়—যাতে চিরকালের মতো ছাপ পড়ে তাতে। সেই সব মুহূর্তেই মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে।

আমার সঙ্গীর উষ্ণ গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখলাম আপেল-গাছের কালো ডালপালার আলপনার ভিতর দিয়ে লিনেৎ-পাখী উজ্জ্বল আকাশে উড়ছে, দেখলাম গোল্‌ড্‌ফিঞ্চ পাখীরা রসালো বীজের সন্ধানে শুক্‌নো শালগমে মাথা ঠুকরোচ্ছে, দেখলাম ছেঁড়াছেঁড়া ধূসর মেঘ—কোনগুলো এবড়ো-খেবড়ো, মাঠের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তাদের নীচে কাকগুলো উড়ে চলেছে, কবরখানায় নিজেদের বাসার দিকে। সবকিছুরই মানে আছে—অসাধারণ মানে।

মাঝে মাঝে আমার সঙ্গীটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে আর বলে উঠছে:

‘চমৎকার, না ভাইটি? সত্যিই চমৎকার! ইস্‌, মাটি ভিজে গেছে, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না তো?’

তারপর যখন আকাশ কালো হয়ে গেল আর রাত্রির অন্ধকারে ডুবে গেল সবকিছু, তখন বলল সে:

'বাস্, আর নয়, এবার উঠে পড়ো...'

বাগানের দরজার কাছে এসে থেমে গিয়ে আবার বলল, 'তোমার দিদিমার মতো আশ্চর্য মানুষ আমি আর দেখিনি। কী বিচিত্র এই সংসার!'

কথাগুলো বলে একটু হেসে চোখ বুজল, তারপর খুব চাপা স্বরে আর খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে আবৃত্তি করতে লাগল:

এই হোক্ সেই লোকের শাস্তি — যে অপরের পাপপরামর্শে কান দেয়, নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দেয় অপরের ইচ্ছার কাছে।

'কথাগুলো মনে রেখো ভাইটি!' উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে আমাকে ঠেলে দিল সামনের দিকে।

'তুমি লিখতে পার?'

'না।'

'শিখে নাও। আর যখন লিখতে শিখবে তখন তোমার দিদিমার এই ছড়াগুলো লিখে নিও। একটি বড়ো কাজ করা হবে তাহলে।'

এই ঘটনার পর থেকেই আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যাই। যখনই ইচ্ছে হয়, 'বাঃ বেশ'এর সঙ্গে দেখা করতে যাই আমি। ছেঁড়া কাপড়চোপড়ে ঠাসা একটা বাক্সের ওপরে নির্বিবাদে বসে বসে তার কাজ দেখি। সে সীসে গলায়, তামা গরম করে; লোহার পাতকে নেহাইয়ের ওপর রেখে সুন্দর কারুকার্য-করা হাতলওলা একটা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে নানা আকারের জিনিস তৈরি করে; নানা রকমের উখো আর সিরিশকাগজ দিয়ে ঘষে সেগুলোকে। কত রকমের উখো যে আছে! আর আছে একটা চুলের মতো সরু করাত। তামার নিক্তিতে ওজন করে প্রত্যেকটা জিনিস। পুরু মোটা চীনামাটির পাত্রে অনেক রকমের তরল পদার্থ মেশায়, ঝাঁজালো ধোঁয়ায় ভরে যায় ঘরটা। একটা মোটা বই দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে, বিড়বিড় করে বকে, নিজের লাল ঠোঁটদুটো কামড়ে নীচু কর্কশ গলায় সে গায়:

হায় রে সারন'এর গোলাপ...

'তুমি কী তৈরি করছ?'

'একটা জিনিস তৈরি করছি ভাইটি...'

'কী জিনিস?'

'কী করে তোমাকে বলি! তোমাকে বোঝাবার মতো করে বলতে পারব না মনে হচ্ছে...'

'দাদামশাই বলেন, তুমি নাকি জাল টাকা তৈরি করছ।'

'দাদামশাই? হুঃ!.. একেবারে বাজে কথা। একটা কথা মনে রেখো ভাইটি, টাকা জিনিসটা এমন কিছু নয় যে তার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে।'

'বলছ কি তুমি? টাকা না থাকলে রুটি কিনতে পারবে?'

'ঠিকই বলেছ ভাই, টাকা না থাকলে রুটি কেনা যায় না...'

'কেমন? আচ্ছা মাংস...'

'হাঁ, মাংসও কেনা যায় না।'

প্রশান্ত হাসি হাসল সে; ভারি ভালো লাগল আমার এই হাসিটুকু। বেড়ালছানাকে লোকে যেভাবে আদর করে তেমনিভাবে আমার কানের পিছনে সুড়সুড়ি দিতে দিতে সে আমাকে বলে:

'ভাইটি, তোমার সঙ্গে আমি বাদপ্রতিবাদ করতে পারব না। প্রত্যেকবারেই তুমি আমাকে কোণঠাসা করে ফেলছ। তার চেয়ে বরং কথাবার্তা না বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকা যাক্, কেমন?'

মাঝে মাঝে সে কাজ থামিয়ে জানলার সামনে আমার কাছে এসে চুপটি করে বসে থাকে। দু'জনে বহুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, আপেল গাছ বিবর্ণ হয়ে উঠছে, তার পাতা পড়ছে ঝরে, ঘাসে ঢাকা উঠোনের ও ছাদের ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। 'বাঃ বেশ' কখনো খুব বেশি কথা বলে না কিন্তু যেটুকু বলে যথার্থ কথাই বলে। যদি সে কোনো কিছু আমাকে দেখাতে চায় তাহলেও অধিকাংশ সময়ে কথা না বলে আস্তে ঠেলা দেয় আমার গায়ে এবং চোখ টিপে তাকিয়ে আমার দৃষ্টি জিনিসটির দিকে আকর্ষণ করে।

আমাদের বাড়ির উঠোনটিতে বিশেষ করে দেখবার মতো কিছু আছে বলে আগে আমার কোনো দিন মনে হয়নি। কিন্তু তার পাশে বসে থাকবার সময়ে মাঝে মাঝে আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে আর মাঝে মাঝে কথা বলে সে আমাকে যে-সব জিনিস দেখিয়েছে সেগুলোর মধ্যে যেন একটা বিশেষ তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছি, সেগুলো আমার স্মৃতিতে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে।

হয়তো একটা বেড়াল ছুটে উঠোনটা পার হয়ে যেতে যেতে কোনো খানা-ডোবায় নিজের ছায়াটা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর এমনভাবে থাবা উঁচিয়ে ধরে যেন জলের ভিতরকার ছায়াটাকে সে মারতে চাইছে।

'বাঃ বেশ' বলে, 'বেড়ালের ভয়ানক দেমাক আর স্বভাবটাও তেমনি অবিশ্বাসী।'

সোনালী-লাল রঙের মোরগ 'মামাই' উড়ে গিয়ে বসে বেড়ার ওপরে, ডানা ঝট্‌পট্‌ করে, টাল্‌ ঠিক রাখতে না পেরে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয়, রেগে যায়, ঘাড় টান করে ক্রুদ্ধ স্বরে কি যেন বিড়বিড় শুরু করে।

'এই সেনাপতি নিজেকে একজন হোমরাচোমরা মনে করে, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিটা একটু কম।'

উষ্কখুষ্ক চেহারার ভালেই বুড়ো-ঘোড়ার মতো কাদার ভিতর দিয়ে থপ্‌থপ্‌ করে হেঁটে আসে, ফুলো ফুলো চওড়া মুখটা তুলে আড়চোখে আকাশের দিকে তাকায়, শরৎকালের একফালি ফ্যাকাশে রোদ এসে পড়ে ওর বুকের ওপরে আর জ্যাকেটের পেতলের বোতামটা ঝক্‌ঝক্‌ করে ওঠে। ভালেই দাঁড়িয়ে পড়ে আর বাঁকা বাঁকা আঙ্গুল দিয়ে বোতামটা নাড়াচাড়া করে।

'এমন করছে যেন ওটা বোতাম নয়, বুকের ওপরে মেডেল ঝুলিয়েছে।'

কিছুদিনের মধ্যেই 'বাঃ বেশ'এর ওপর আমার টান খুব বেশি রকম বেড়ে গেছে। দুঃখই হোক্‌ বা আনন্দই হোক্‌, যে-কোনো ব্যাপারে তাকে না হলে আমার কিছুতেই চলে না। আর যদিও সে নিজে চুপচাপ থাকে, বেশি কথা বলাটা তার স্বভাব নয় তবু আমায় কথা বলতে কখনো বাধা দেয় না। তার সামনে বসে আমি খুশিমতো বক্‌বক্‌ করে যাই। আমার দাদামশাইয়ের স্বভাব ঠিক উল্টো। কথা বলতে গেলেই এক ধমক দিয়ে তিনি আমাকে থামিয়ে দেন:

'ওহে কথার জাহাজ, বক্‌বকানিটা একটু থামাও তো দেখি!'

আর আমার দিদিমা নিজের চিন্তা নিয়েই এত ব্যতিব্যস্ত যে অপরের কথায় কান দেবার অবসর তাঁর নেই।

কিন্তু 'বাঃ বেশ' আমার কথা সব সময়েই খুব মন দিয়ে শোনে আর মাঝে মাঝে অল্প একটু হেসে বলে:

'ঠিক বলোনি ভাইটি! এটা তুমি বানিয়ে বলছ!'

মন্তব্যগুলো সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঠিক সময়টিতে এবং ঠিক কথাটির ওপরে। এমনভাবে মন্তব্য করে যে মনে হতে পারে, সে আমার হৃদয়ের ও মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে আর কথাগুলো আমার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে আসবার আগেই বুঝতে পারছে, কোন্‌টা মিথ্যা ও অবান্তর। সঙ্গে

সঙ্গে সেই কথাগুলোকে খুন করছে স্নেহকোমল সুরে বলা তিনটি কথার সাহায্যে:

'বানিয়ে বলছ, ভাইটি!'

তার এই আশ্চর্য যাদুকরী ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্যে মাঝে মাঝে আমি ইচ্ছে করে গল্প বানিয়েছি আর এমনভাবে তার কাছে তা বলেছি যেন সেগুলো সত্যি ঘটনা। কিন্তু প্রতিবারেই অবধারিতভাবে দেখা যায়, অল্প কিছুক্ষণ শোনার পরেই সে মাথা নাড়ে আর বলে:

'বানিয়ে বলছ, ভাইটি!'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমি? আমি ঠিক জানতে পারি।'

সেন্নায়া স্কোয়ার থেকে জল আনবার সময় প্রায়ই দিদিমা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। একদিন যাবার পথে আমরা দেখলাম, পাঁচজন শহুরে লোক একজন গাঁয়ের চাষীকে ধরে পিটোচ্ছে। মাটিতে ফেলে দিয়ে একপাল কুকুরের মতো তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে। দিদিমা করলেন কি, বাঁক থেকে খুলে ফেললেন বাল্তিদুটো, তারপর সেই বাঁকটাকে লাঠির মতো ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে গেলেন শহুরে লোকগুলোর দিকে। আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তুই চলে যা!'

কিন্তু ভয় পেয়ে আমিও ছুটলাম দিদিমার পিছনে পিছনে। শত্রুদের লক্ষ্য করে আমি ঢিল ও পাথর ছুঁড়তে লাগলাম আর দিদিমা প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁর বাঁক দিয়ে তাদের খোঁচাতে লাগলেন আর তাদের মাথায় পিঠে দুমদাম বাড়ি মারতে লাগলেন। আরও বহু লোক জুটে গেল। মারতে মারতে তাড়িয়ে দেওয়া হল শহুরে লোকগুলোকে। চাষীর মুখটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, দিদিমা তার মুখ ধুইয়ে দিতে লাগলেন। এই ঘটনার কথা ভাবলে আজও আমি কেঁপে উঠি। আমার মনে পড়ে, লোকটা ধুলোমাখা আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরেছিল ছেঁড়া নাকের পাশটা আর সমানে আর্তনাদ করছিল, কাশছিল। ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসছিল তার দুই আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে, দিদিমার মুখ আর বুক ভেসে গিয়েছিল রক্তে, দিদিমাও চিৎকার করছিলেন, তাঁর শরীরটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর্থর্ করে কাঁপছিল।

বাড়ি ফিরেই আমি ছুটতে ছুটতে গেলাম আমাদের সেই বাসিন্দাটির কাছে। তার কাছে আগাগোড়া ঘটনাটা বলতে শুরু করলাম। কাজ থামিয়ে

আমার কাছে এসে দাঁড়াল সে। একহাতে মস্ত একটা উখো তলোয়ারের মতো উঁচিয়ে ধরে রইল। চোখের চশমার ফাঁক দিয়ে স্থির ও কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, তারপর হঠাৎ আমার কথায় বাধা দিয়ে অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বলল:

'চমৎকার! এই তো চাই! বেশ, বেশ!'

কিন্তু এই ঘটনা আমাকে এত বেশি অভিভূত করেছিল যে আমি তার এই কথাগুলোয় অবাক না হয়ে অনর্গল কথা বলে চললাম। তখন সে আমাকে একহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলতে লাগল:

'বাস্, বাস্, আর নয়! তুমি যে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলে তা বলা হয়ে গেছে, বুঝেছ? এবার থামো!'

আমি চুপ করে গেলাম। আমাকে এভাবে থামিয়ে দেওয়াতে প্রথমে আমার মনে খুবই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পরে ব্যাপারটা ভালো করে ভাবতেই বুঝতে পারলাম এবং বুঝতে পেরে অবাক হলাম যে ঠিক সময়টিতে সে আমাকে থামিয়েছে। সত্যি সত্যিই আমার যা কিছু বলার ছিল, সবই বলা হয়ে গেছে।

সে বলল, 'এসব কথা মনের মধ্যে পুষে রেখো না, ভুলে যেতে চেষ্টা কোরো।'

মাঝে মাঝে আচমকা সে আমাকে এমন সব কথা বলেছে যা আমি সারা জীবনেও ভুলিনি। একবার আমার শত্রু ক্ল্যুশ্নিকভের কথা তার কাছে আমি বলেছিলাম। ক্ল্যুশ্নিকভ হচ্ছে নোভায়া স্ট্রীটের আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। ছেলেটির মোটা শরীর, মস্ত মাথা। আমরা দু'জনেই কেউ কেউকে বাগে আনতে পারি না। আমার এই নিদারুণ সমস্যার কথা শুনে 'বাঃ বেশ' বলল:

'এ সব বাজে কথা! এই ধরনের জোরকে সত্যিকারের জোর বলে না! চটপটে হতে পারাটাই হচ্ছে আসল জোর। যতো তাড়াতাড়ি তুমি হাত-পা নাড়তে পারবে ততোই জোর বাড়বে তোমার। বুঝেছ?'

পরের রবিবার কথাটা পরীক্ষা করে দেখলাম। ঘুষিগুলো চালালাম আরো তাড়াতাড়ি। দেখা গেল, ক্ল্যুশ্নিকভকে কাবু করতে বেশি সময় পেতে হল না। এই ব্যাপারে আমাদের এই বাসিন্দাটির কথায় আমার আরও বেশি আস্থা এসে গেল।

'সব জিনিসকে কিভাবে আয়ত্তে আনতে হয় সেটা জানতে হয় — বুঝেছ? যে কোনো জিনিসকে পুরোপুরি আয়ত্তে নিয়ে আসা খুবই শক্ত।'

কথাগুলোর অর্থ আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু সেগুলো এবং এই ধরনের আরো অনেক কথা আমার মনে আছে। এসব মনে থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, কথাগুলো আপাতবিচারে খুবই সহজ কিন্তু তবুও তার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর দুর্বোধ্যতা থেকেই যায়, যেমন বলা যেতে পারে একটা ঢিল, একটুক্‌রো রুটি, একটা পেয়ালা বা একটা হাতুড়ি — এসব জিনিসকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসা কি শক্ত কাজ?

আমাদের বাড়ির অন্য সবাই কিন্তু দিন দিনই 'বাঃ বেশ'কে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। আমাদের বাড়ির হাসিখুশি তরুণীটির একটি পোষা বেড়াল আছে, ডাকলেই কাছে আসে, কোলে উঠে বসে, কিন্তু এই বেড়ালটিও কিছুতেই তার কোলে আসে না বা হাজার আদর করে ডাকলেও তার ডাকে সাড়া দেয় না। এজন্যে বেড়ালটাকে আমি মারতে ধরতে বাকি রাখিনি, আচ্ছা করে বেড়ালটার কান মলে দিয়েছি, নানাভাবে বেড়ালটাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে এই লোকটিকে ভয় পাবার কিছু নেই—কিন্তু আমার নিজের প্রায় কান্না এসে গেছে তবুও বেড়ালটাকে বোঝাতে পারিনি।

'কি জান ভাইটি, আমার জামাকাপড়ে অ্যাসিডের গন্ধ কিনা তাই বেড়ালটা আমার কাছে আসতে চায় না।' এই বলে সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু আমি জানতাম বাড়ির আর সবাই-ই, আমার দিদিমাও বাদ যান না, অন্য কথা বলে। সবাই তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। আমার মনে হত এটা অন্যায়, আমার কষ্ট হত এতে।

আমার দিদিমা রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'ওই লোকটার কাছে সব সময়ে ঘুরঘুর করিস কেন বল্‌ তো? বুঝেশুনে চলিস্‌ বাপু, নইলে তোর মাথাতেও তুকতাক মন্ত্র ঢুকিয়ে দেবে!'

আর আমার লালমুখো বদমেজাজী দাদামশাই যতোবার শুনতেন যে, আমি এই বাসিন্দাটির কাছে গিয়েছি ততোবারই নির্দয়ভাবে বেত মারতেন আমাকে। স্বভাবতই আমি 'বাঃ বেশ'কে কক্ষণো বলতাম না যে, তার কাছে আসতে আমাকে সবাই বারণ করে কিন্তু তার সম্পর্কে অন্যরা কী বলাবলি করে সেকথা আমি তার কাছে গোপন করিনি।

'দিদিমা তোমাকে ভয় করেন। দিদিমা বলেন, তুমি নাকি তুক্‌তাক কি

সব শয়তানী মন্ত্র জান। দাদামশাইয়েরও সেই ধারণা। দাদামশাই বলেন, তুমি নাকি ভগবান মানো না, তুমি খুবই ভীষণ লোক।'

কথাগুলো শুনে সে মাছি তাড়াবার মতো করে মাথাঝাঁকুনি দেয়। তার ফ্যাকাশে মুখে চাপা একটু হাসি ফুটে ওঠে। তাই দেখে আমার বুকের ভিতরটা কুঁকড়ে যায় আর মাথাটা ঘুরতে থাকে।

নীচু স্বরে সে বলে, 'ভাইটি, একথা আমি জানি। আমিও টের পাই। ভারি বিশ্রী ব্যাপার — না? কি বলো?'

'হ্যাঁ।'

'ভারি বিশ্রী, ভাইটি!'

শেষ পর্যন্ত তাকে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

একদিন সকালে প্রাতরাশের পর দেখলাম, নিজের ঘরে মেঝের ওপরে বসে সে একটা বাক্সের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছে আর আপন মনেই গুনগুন করে গাইছে, 'হায় রে সারন'এর গোলাপ!'

'ভাইটি, এবার তাহলে বিদায় দাও। আমি চলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

জবাব দেবার আগে তীব্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে একবার আমার দিকে তাকাল।

'কেন, তুমি কিছু জান না? তোমার মা আসছেন, সেজন্যে এই ঘরটি দরকার।'

'কে বলেছে একথা?'

'তোমার দাদামশাই।'

'দাদামশাই মিথ্যে কথা বলেছেন!'

'বাঃ বেশ' আমাকে টেনে নিয়ে কাছে বসাল। মেঝের ওপরে তার পাশটিতে আমি বসলাম। আর তখন নীচুস্বরে বলল সে:

'রাগ কোরো না ভাইটি! আমি ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা জেনেও তুমি আমার কাছে কিছু বলোনি। সেটা আমার ভালো লাগেনি।'

যে জন্যেই হোক, কথাটা আমাকে ঘা দিল এবং তার জন্যে আমি রেগে উঠলাম।

অল্প একটু হেসে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে সে বলল, 'শোন ভাইটি, তোমার মনে আছে তোমাকে যে একবার আমি আমার কাছে আসতে বারণ করেছিলাম?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় জানালাম।

'তখনই তোমার মনে খুব কষ্ট হয়েছিল, নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'আর আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনি। কিন্তু আমি জানতাম, তোমার সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব হয় তাহলে বাড়ির লোক তোমাকে বকাঝকা করবে।'

এমনভাবে সে কথা বলল যেন সে ছোট, আমার সমবয়স্ক। তার কথা শুনে আমি ভারি খুশি হলাম। আমার মনে হতে লাগল, সে এইমাত্র আমাকে যে-কথাটি বলেছে তা আমি অনেক আগে থেকেই জানতাম।

বললাম, 'আমি একথা অনেক আগেই জানতাম।'

'বেশ। তাহলে ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এই, বুঝলে তো ভাইটি? এই।'

আমার বুকের ভিতরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে লাগল।

'কেউ তোমাকে পছন্দ করে না কেন?'

আমাকে সে জোরে বুকের ওপরে চেপে ধরল আর চোখ মিটমিট করে বলল:

'কেন জান ভাইটি? আমি অন্য কারও মতো নই। আসল কারণটা তা-ই। আমি তাদের মতো নই!'

কী বলব বুঝতে না পেরে আমি তার জামার আস্তিনটা আঁকড়ে টেনে রইলাম।

'রাগ কোরো না ভাইটি।' তারপর ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল সে আমার কানে কানে: 'আর কেঁদোও না!'

কিন্তু তার অজান্তেই তার ঝাপসা চশমার কাঁচদুটোর নীচ দিয়ে টস্‌টস করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

অন্য দিনের মতো সেদিনও আমরা বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে সামান্য দু-একটা কথার আদানপ্রদান হল মাত্র।

সেইদিন সন্ধ্যায় প্রত্যেকের কাছে প্রসন্ন মুখে বিদায় নিয়ে এবং আমাকে একবার নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে সে চলে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলাম। শীতে কাদা জমে রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে, গাড়ির চাকা লাফাচ্ছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরেও ঝাঁকুনি লাগছে। যতোক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

এদিকে সে চলে যেতেই আমার দিদিমা নোংরা ঘরটা পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেছেন। আমি করলাম কি, ইচ্ছে করে ঘরের একোণ থেকে ওকোণে ঘোরাঘুরি করে তাঁর কাজে বাধা দিতে লাগলাম।

আমার গায়ে হোঁচট খেয়ে দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন, 'বেরো, বেরো এখান থেকে।'

'ওকে কেন তোমরা এখানে থাকতে দিলে না?'

'তাতে তোর কী?'

'তোমরা সবাই বোকা!' বললাম আমি।

একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে আমাকে সপাং সপাং করে মারতে মারতে দিদিমা চিৎকার করতে লাগলেন, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? বদ্ধ পাগল হয়েছিস নাকি?'

'বদ্ধ পাগল তো সকলেই, তুমি ছাড়া।' সংশোধন করে বললাম আমি কিন্তু দিদিমা তবুও শান্ত হলেন না।

রাত্রিবেলা খেতে বসে দাদামশাই বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে লোকটা চলে গেছে! যতোবার লোকটাকে দেখতাম, আমার বুকে যেন ছুরি বিঁধত। যাক্, এতদিনে রেহাই পাওয়া গেছে।'

রাগে আমি একটা চামচ ভেঙে ফেললাম এবং সেজন্যে যথারীতি শাস্তিও আমাকে পেতে হল।

এই ভাবে শেষ হোলো আমার প্রথম বন্ধুত্ব সেই ধরনের অসংখ্য লোকের সঙ্গে নিজের দেশে যারা পরবাসী — যারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতিনিধি।

নয়

আমার ছেলেবেলাটাকে মৌচাকের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই মৌচাকে জীবন সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধু আহরণ করেছে নানান সাধারণ ও সাদাসিধে মানুষ। আমার চরিত্রের গঠন ও বিকাশে এদের দান তুচ্ছ নয়। এই মধু মাঝে মাঝে নোংরা ও তেতো না হয়েছে তা নয়। কিন্তু যেহেতু সেগুলি জ্ঞান সেহেতু তারা মধু বৈকি।

'বাঃ বেশ' চলে যাবার পরে আমার সঙ্গে পিওতর-কাকার বন্ধুত্ব হল। আমার দাদামশাইয়ের সঙ্গে তার মিল এইদিক থেকে যে দাদামশাইয়ের মতো সেও রোগা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে চেহারার দিক থেকে এবং অন্য

সমস্ত দিক থেকে দাদামশাইয়ের চেয়ে সে খাটো। তাকে দেখে আমার মনে হত, বাচ্চা একটি ছেলে যেন শুধু মজা করবার জন্য বুড়ো মানুষের সাজপোশাক পরেছে। সরু সরু চামড়ার ফিতে পাকিয়ে চুবড়ির মতো তৈরি করা তার মুখখানা একটা খাঁচার মতো দেখতে হয়েছে আর এই খাঁচার ভিতর থেকে ছোট ছোট দুটো পাখির মতো কৌতুকোজ্জ্বল চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে থাকে। কোঁকড়ানো পাকা চুল, ছোট ছোট চক্রে পাক খাওয়া দাড়ি। পাইপ টানবার সময় মুখ থেকে যে ধোঁয়া বেরোয় তার রঙটাও ঠিক তার চুলের মতো আর তার প্রবাদভরা কথাবার্তাও সেই ধোঁয়ার ছোট ছোট চক্রের মতো পাক খায়। কথা বলার ধরনটা খুবই পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি, কথা বলে ভন্‌ভন্‌ স্বরে, মনে হয় কথাগুলোর মধ্যে দরদ ও নম্রতা আছে -- কিন্তু আমার কেমন জানি একটা ধারণা যে, তার কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে।

'আমার মনিব ছিলেন একজন কাউণ্টেস। নাম — তাতিয়ান, পৈতৃকনাম -- লেক্সেভনা। ব্যাপারটা শুরু হল এইভাবে। তিনি আমাকে বললেন — তুমি কামারশালায় কাজ শেখ গিয়ে। কিন্তু যেই না আমি কামারশালায় গিয়েছি, তিনি আমাকে ডেকে বললেন — তুমি বাগানের মালীর সঙ্গে কাজ করো গিয়ে। আমার তো কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই, এক জায়গায় হলেই হল। কিন্তু সেই যে কথায় আছে না — যার কাজ তারে সাজে, অন্য হাতে লাঠি বাজে! সুতরাং কিছুদিন পরেই দেখা গেল, আমাকে দিয়ে সুবিধে হচ্ছে না। কাউণ্টেস আমাকে ডেকে বললেন — "পেত্রুশ্‌কা, তার চেয়ে বরং তুমি মাছ ধরার কাজে লেগে যাও!" যেমন বলা তেমনি কাজ। আমিও উঠে-পড়ে লেগে গেলাম। তারপর কাজটা যখন একটু-আধটু রপ্ত হয়ে আসছে, বাস্‌, হয়ে গেল মাছ ধরা! গাড়ি চালাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল শহরে। তারপর থেকেই আমি গাড়ি-চালক। আরও কত কী হতাম কে জানে। কিন্তু কাউণ্টেসের ঝোঁক অন্য কোনো দিকে যাবার আগেই মুক্তি-আইন পাশ হয়ে গেল। তারপর আর কী! আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম, ঘোড়াটা রইলো আমার কাছে আর তখন থেকে কাউণ্টেসের বদলে ঘোড়াটার পিছন-পিছন চলি।'

সেটা বুড়ো হয়ে গেছে, গায়ের রং সাদা, কিন্তু দেখে মনে হয়, এক মাতাল চিত্রকর নানা রঙের তুলি নিয়ে ঘোড়াটার সারা গায়ে ফুটফুট দাগ দিয়েছে। পাগুলো বাঁকা, উল্টোপাল্টা লাগিয়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু কিমাকার

চেহারা—ছেঁড়া ন্যাকড়ায় সেলাই করা কোনো রকমে একটা ঘোড়ার চেহারা দাঁড় করানো হয়েছে যেন। ছানিপড়া দুটো চোখ সমেত হাড়গিলে মাথাটা কাতরভাবে ঘাড় থেকে ঝুলছে; কয়েকটা শীর্ণ পেশী ও শিথিল চামড়া কোনো রকমে আটকে রেখেছে মাথাটাকে। ঘোড়াটার ওপরে পিওতর-কাকার ভারি শ্রদ্ধা, ঘোড়াটাকে সে ডাকে 'তান্‌কা' বলে আর কক্ষণো তার গায়ে হাত তোলে না।

দাদামশাই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার ঘোড়াটাকে এমন একটা খ্রীষ্টান নাম দিয়েছ কেন বলো তো হে?'

সে জবাব দিয়েছিল, 'না, ভাসিল ভাসিলিচ, না, তোমার কথাটা ঠিক নয়। "তান্‌কা" খ্রীষ্টান নাম নয়—খ্রীষ্টান নাম হচ্ছে "তাতিয়ানা"।'

পিওতর-কাকাও লেখাপড়া জানে এবং তার শাস্ত্রজ্ঞানটা প্রখর। সাধুমহাত্মাদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট এই নিয়ে দাদামশাইয়ের সঙ্গে সব সময়েই তর্কবিতর্ক চলে তার। বাইবেলে যে-সব পাপীদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে দু'জনেই খড়্গহস্ত। দু'জনেই সবচেয়ে বেশি অপবাদ দেয় আবেসালোমকে। আবার মাঝে মাঝে দু'জনের তর্কবিতর্ক হয়ে ওঠে ব্যাকরণগত চুলচেরা বিচার। আমার দাদামশাই বলেন 'পাপাচারবাদ', 'উচ্ছৃঙ্খলবাদ', 'মূর্তিপূজাবাদ'। আর পিওতর-কাকা বলে--'পাপাচারিতা', 'উচ্ছৃঙ্খলচারিতা', 'মূর্তিপূজাচারিতা'।

রাগে মুখখানা লাল টকটকে করে আমার দাদামশাই হুঙ্কার ছাড়েন, 'তুমি বলছ এক কথা আর আমি বলছি অন্য কথা। তোমার ওই "-চারিতা"র কাণাকড়িও দাম নেই।'

পিওতর-কাকা একটুও বিচলিত হয় না, তেমনিই তার মাথার চারপাশ দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে। টেনে টেনে তিক্ত স্বরে বলে:

'আর তোমার "-বাদ"টা যে আরো উঁচুদরের ব্যাপার তা কিন্তু মোটেই নয়। ভগবানের কাছে সেটা আমার চেয়ে একটুও বেশি ভালো নয়। আবার এমনও হতে পারে, তোমার উপাসনা শুনে প্রভু হয়তো মনে মনে ভাবেন—উপাসনার কথাগুলো জাঁকালো বটে কিন্তু কাণাকড়িও তার দাম নেই!'

সবুজ দুই চোখে আগুন ঝরিয়ে দাদামশাই হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'এই লেক্সেই! তোর এখানে থাকার কি দরকার? যা, বাইরে যা!'

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে পিওতর ভালোবাসে। উঠোন দিয়ে

চলবার সময়ে পায়ের সামনে হাড়ের টুক্‌রো বা কাঠি পড়ে থাকলে পা দিয়ে সরিয়ে দেয় আর বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে:

'যত সব বাজে জিনিস, শুধু বাধার সৃষ্টি করে।' কথা বলে একটু বেশি, যেন হাসিখুশি দিলদরিয়া মানুষ। কিন্তু মাঝে মাঝে চোখদুটো নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে আর মড়ার মতো তাকিয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, কোনো একটা অন্ধকার কোণে সে আপনমনে বসে আছে; তার ভাইপোর মতো সেও তখন বিষণ্ণ ও নির্বাক।

'পিওতর-কাকা, কী হয়েছে তোমার?'

নিস্পৃহ গলায় যতোটা সম্ভব ঝাঁজ এনে সে জবাব দেয়, 'দূর হ!'

আমাদের এই রাস্তার একটা বাড়িতে এক ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁর কপালে আব্‌, আর একটা অদ্ভুত অভ্যেস আছে ভদ্রলোকের। রবিবার দিন তিনি জানলার কাছে বসে ছর্‌রা বন্দুক ছোঁড়েন; তাঁর লক্ষ্যস্থল হয় রাস্তার কুকুর, বেড়াল, হাঁস-মুরগি, কাক, এমন কি যে-সব পথচারীকে তাঁর পছন্দ হয় না তারাও। একদিন 'বাঃ বেশ'কে লক্ষ্য করে ছর্‌রা ছুঁড়েছিলেন; ছর্‌রা 'বাঃ বেশ'এর চামড়ার জ্যাকেট ফুটো কবতে পারেনি, কিন্তু কতগুলি ছর্‌রা এসে পড়েছিল তার পকেটের মধ্যে। আমার মনে আছে, আমাদের বাসিন্দাটিকে পকেট থেকে ছর্‌রা বার করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে দেখেছিলাম। আমার দাদামশাই তাকে নালিশ করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু সে-কথায় কান না দিয়ে সে ছর্‌রা রান্নাঘরের কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু বলে, 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে অত ঝামেলা পুইয়ে লাভ কি!'

আরেকবার এই লক্ষ্যভেদকারী ভদ্রলোকের ছর্‌রা এসে লাগে আমার দাদামশাইয়ের পায়ে। ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে দাদামশাই দোষীর বিরুদ্ধে বিচারকের কাছে নালিশ করেন এবং সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা যায়, ভদ্রলোক উধাও।

রাস্তার দিক থেকে সেই ভদ্রলোকের ছর্‌রা ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেলেই পিওতর-কাকা তাড়াহুড়ো করে গেট দিয়ে বেরিয়ে যায়। মাথায় গলিয়ে নেয় রবিবারের-জন্যে-তোলা মস্ত-কিনারওলা রং-চটা টুপিটা। রাস্তায় বেরিয়ে এসে কোটের ভিতর দিয়ে এমনভাবে হাত গলিয়ে দেয় যে কোটের পিছনদিককার অংশটুকু উঁচু হয়ে থাকে মোরগের লেজের মতো। পেটটা চিতিয়ে দিয়ে ভারিক্কী চালে পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়ায় বন্দুকধারী ভদ্রলোকটির জানলার সামনে। প্রথমবারের পরিক্রমা কার্যকরী না হলে দ্বিতীয়বার, দ্বিতীয়বার না

হলে তৃতীয়বার, এমনি সমানে। ঘটনাটা দেখবার জন্যে আমাদের বাড়ির সবাই ভিড় করে এসে দাঁড়ায় গেটের সামনে, কৃষ্ণমুখ ফৌজী লোকটি ও তার সোনালী-চুল বৌ তাকিয়ে থাকে জানলা দিয়ে। বেৎলেংদের বাড়ির লোকেরাও বেরিয়ে আসে রাস্তায়। শুধু অভসিয়ান্নিকোভদের ছাইরঙা বাড়িটায় জীবনের সাড়া পাওয়া যায় না।

মাঝে মাঝে পিওতর-কাকার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়— এমন একটি শিকারকে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে দেখেও বন্দুকধারী ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই দোনলা বন্দুকটা থেকে ছর্‌রা ছুটে আসে।

'বুম্‌—বুম্‌!'

পিওতর-কাকা পালিয়ে আসে না, তেমনি ভারিক্কী চালে ধীরেসুস্থে পা ফেলে এগিয়ে এসে আমাদের খবর দিয়ে যায়: 'কোটের পিছনদিকটার অংশেতে ছর্‌রা লেগেছে।'

একদিন ছর্‌রা এসে লাগল পিওতর-কাকার কাঁধে আর ঘাড়ে। সূচ দিয়ে ছর্‌রাকে বার করতে করতে দিদিমা বললেন, 'এই বুনো লোকটাকে এভাবে উস্‌কিয়ে তুলে লাভ কী! এমন করলে কোন্‌দিন চোখে ছর্‌রা করে বসবে!'

কথাটায় কিছুমাত্র আমল না দিয়ে পিওতর বলল, 'আকুলিনা ইভানোভনা, আপনিও যেমন! হাতের তাক্‌ বলে কোনো কিছু আছে নাকি ও-লোকটার!'

'তাহলে ওকে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া কেন?'

'প্রশ্রয়? আমি ভদ্রলোককে একটু ক্ষেপাই!'

হাতের ছর্‌রাগুলোর দিকে তাকিয়ে সে আবার বলল, 'এ লোকটা বন্দুক ছোঁড়ায় একেবারে আনাড়ি। তাহলে শুনুন, কাউণ্টেস তাতিয়ান লেক্সেভনার একটা গল্প বলি। এই কাউণ্টেসটি বিয়ের ব্যাপারে কোনো স্থায়ী বন্ধনের মধ্যে কখনো ধরা দিতেন না। যেমন তিনি চাকর বদ্‌লাতেন, তেমনি স্বামী বদ্‌লাতেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন এমনি ধারা অস্থায়ী স্বামিত্বে রয়েছে সেনাবাহিনীর একজন লোক, নাম মামন্‌ৎ ইলিচ। হ্যাঁ, হাতের তাক্‌ ছিল বটে এই লোকটির! বন্দুক নিয়ে কি না করতে পারত! ছর্‌রা সে ছুঁড়তো না, কেবল গুলি। ইগ্‌নাশ্‌কা নামে একটা ভ্যাবামার্কা লোককে দাঁড় করিয়ে দিত দূরে, এই পা চল্লিশেক হবে। তার বেল্টের সঙ্গে একটা বোতল বেঁধে দিত, আর বোতলটা ঝুলত দুই পায়ের মাঝখানে। দুই ঠ্যাঙ যতোটা সম্ভব ফাঁক করে ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো হাসতে

হাসতে দাঁড়িয়ে থাকত ইগ্‌নাশ্‌কা আর সেই বোতল লক্ষ্য করে গ্নলি ছ্বঁড়ত মামনৎ ইলিচ। ব্নম্‌! চুরমার হয়ে যেত বোতলটা। কিন্তু একবার হল কি, একটা ডাঁশপোকা বোধ হয় ইগ্‌নাশ্‌কাকে কামড়িয়েছিল বা যা-হোক একটা কিছ্ন হয়েছিল—লোকটি স্থির থাকতে না পেরে সরে গেল একটু, আর যাবে কোথায়, ব্নলেট এসে বে'ধে হাঁটুতে, একেবারে ঠিক গাঁটের হাড়টিতে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার এসে একটুও সব্নর করে না — চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঠ্যাঙটা কেটে বাদ দিয়ে দেয়। ঠিক যেমনটি বললাম তেমনটি ঘটেছে! সেই কাটা ঠ্যাঙটা পরে কবর দেওয়া হয়েছিল...'

'আর ইগ্‌নাশ্‌কার কী হল?'

'তার আবার কী হবে! সেরে উঠেছিল। ভ্যাবাগঙ্গারামের হাত-পা থাকাই বা কি, না-থাকাই বা কি। সবাই তাদের সাহায্য করে। সেই যে কথায় আছে— যার ব্নদ্ধি নেই তার শত্র্নও নেই।'

এই গল্প দিদিমাকে তেমন নাড়া দিতে পারেনি। এই ধরনের বহ্ন গল্প দিদিমার নিজেরও জানা আছে। কিন্তু আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

'বড়লোকরা খ্নশিমতো যে-কোনো লোককে খ্নন করতে পারে ব্নঝি?'

'কেন পারবে না? খ্নশিমতো খ্নন করতে পারে, কেউ আট্‌কাবার নেই। আবার কি জান, বড়মান্নষরা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যেও খ্ননোখ্ননি শ্নর্ন করে দেয়। একবার এক অশ্বারোহী সৈনিক দেখা করতে এল তাতিয়ান লেক্সেভনার সঙ্গে। মামনৎ'এর সঙ্গে তার হল ঝগড়া। তখন তারা দ্ন'জনেই পিস্তল বাগিয়ে ধরে হেস্তনেস্ত করবার জন্যে পার্কে চলে গেল। প্নকুরের ধারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সৈনিকটি গ্নলি করল মামনৎ'কে। ব্নম্‌! গ্নলিটা গিয়ে সোজা লাগল মামনৎ'এর যকৃতে। তারপর আর কি, মামনৎ'কে কবর দেওয়া হল আর সৈনিকটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ককেশাসে। ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য হয়নি। তাহলেই দেখছ তো? নিজেরাই খ্ননোখ্ননি করত! আর চাষাভুষোদের খ্নন করার কথা যদি বলো তো তাহলে আর লেখাজোখা নেই। যতো জনকে খ্নশি খ্নন করা চলে। বিশেষ করে আজকাল। আজকাল তো আর চাষাভুষোরা ওদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আগেকার দিনে চাষাভুষোরা ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তখন তব্ন যা হোক এমন চট করে প্রাণ নিত না।'

দিদিমা বললেন, 'কিন্তু তখনও প্রাণ নিতে তাদের কারুরই বিশেষ আফ্‌সোস দেখা যেত না।'

'তাও ঠিক।' পিওতর-কাকা সায় দিল, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল বটে তবে খুবই শস্তা দামের সম্পত্তি।'

আমার সঙ্গে কথাবার্তায় সে অতি নম্র। আমার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে সে আমার সঙ্গে কথা বলে; এত ভালো ব্যবহার বড়োদের সঙ্গেও সে করে না। কিন্তু তার মধ্যে কি যেন একটা আছে যা আমি কিছুতেই পছন্দ করতে পারি না। তার অতি প্রিয় খাদ্য ফলের জ্যাম যখন সে আমাদের খাওয়াতে আসে, তখন করে কি, অন্যদের রুটিতে যতোটা না পুরু করে জ্যাম মাখে তার চেয়ে অনেক বেশি পুরু করে মাখে আমার রুটিতে। শহরে গেলে সে আমার জন্যে আদা দেওয়া মিষ্টি কেক আর পোস্তর পিঠে নিয়ে আসে। ধীর মস্তিষ্কে এবং যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে আমার সঙ্গে সব সময়ে কথা বলে সে।

'আচ্ছা বলো তো দেখি, বড়ো হয়ে তুমি কি হতে চাও? সৈনিক হবে না কর্মচারী হবে?'

'সৈনিক।'

'সেই ভালো। আজকাল সৈন্য হওয়াটা শক্ত নয়। অবশ্য পাদ্‌রি হওয়াটাও খুবই সোজা—শুধু চোখ বুজে চিৎকার করে যাওয়া "পরমমঙ্গলময় প্রভু আমাকে বাঁচাও!" বাস্‌, আর কিচ্ছুটি করতে হবে না। আমার তো মনে হয়, সৈন্য হওয়ার চেয়েও পাদ্‌রি হওয়াটা সোজা। কিন্তু সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে জেলে হওয়া। কোন কিচ্ছু জানবার দরকার নেই—শুধু একটু অভ্যেস, বাস্‌!'

তারপর সে ভারি মজা করে দেখাতে শুরু করে, কি-ভাবে মাছ এসে টোপের চারপাশে ঘুরপাক খায়, কি-ভাবে টোপ গেলার পর বাস্‌ বা ব্রীম বা মাকেরেল জাতীয় মাছ হুটোপাটি করে।

সান্ত্বনার সুরে আমাকে বলে, 'তোমার দাদামশাই যদি তোমাকে মারধোর করেন তাহলে তো তুমি একেবারে ক্ষেপে ওঠো, নয় কী? কিন্তু তোমায় বলি শোনো, এসব ব্যাপারে অমন ক্ষেপে উঠবার কোনো কারণ নেই। তোমার দাদামশাই যে তোমাকে মারধোর করেন, সে তোমার মঙ্গলের জন্যেই। আর তোমার দাদামশাইয়ের মারধোর তো কিছুই নয়, নেহাতই একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। তাহলে শোন তোমাকে তাতিয়ান লেক্সেভনার একটা গল্প বলি।

মারধোর করার কথাই যদি ওঠে তাহলে এই হচ্ছে একটি লোক যার তুলনা নেই। মারধোর করার জন্যে ক্রিস্তোফোর নামে তাঁর একজন বিশেষ চাকর ছিল। আর মারধোর করার ব্যাপারে লোকটার এমন পাকা হাত যে আশেপাশের জমিদাররা তাতিয়ান লেক্সেভনার কাছে এই বলে খবর পাঠাত: "তাতিয়ান লেক্সেভনা, অনুগ্রহ করে আপনার ক্রিস্তোফোরকে একবার পাঠিয়ে দেবেন—দু-এক দফা মারধোরের ব্যাপার আছে।" আর খবর পেলেই কাউন্টেস পাঠিয়ে দিতেন ক্রিস্তোফোরকে।'

তারপর পিওতর-কাকা ভাবলেশহীন গলায় খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতে শুরু করে। তাঁর বাড়ির থামওলা অলিন্দে লাল আর্মচেয়ার পেতে, ধবধবে সাদা পোশাকের ঝলক তুলে, কাঁধে নীলরঙের স্কার্ফ জড়িয়ে, কাউন্টেস এসে বসেন। মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে ভূমিদাসদের চাবুক মারে ক্রিস্তোফোর আর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন কাউন্টেস।

'এই ক্রিস্তোফোর লোকটা এসেছিল র‍্যাজান থেকে। খানিকটা বেদে বা খখল'এর* মতো। আকর্ণবিস্তৃত গোঁফ কিন্তু দাড়ি কামিয়ে ফেলে বলে মুখটা নীলচে দেখায়। কিছুতেই বোঝা যেত না, লোকটি সত্যিই হাবাগোবা ছিল না বাইরের উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্যে লোকের কাছে হাবাগোবা সেজে থাকত। থেকে থেকে রান্নাঘরে এসে একটা পাত্র জলে ভর্তি করে নেয়, তারপর একটা মাছি বা আরশোলা বা গুবরে পোকা জাতীয় যা হোক্ একটা কিছু ধরে একটা সরু কাঠির ডগা দিয়ে ঠেসে চুবিয়ে ধরে জলের মধ্যে। অনেকক্ষণ চুবিয়ে ধরে রেখে দেয় এইভাবে। তার নিজের কলারের মধ্যে হয়তো উকুন আছে সেটাকেই খপ্ করে ধরে কয়েকবার জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরে...'

এ-ধরনের গল্প আমি ভালোভাবেই জানি, আমার দাদামশাই ও দিদিমার কাছ থেকে এ-ধরনের অনেক গল্পই আমি শুনেছি। এইসব গল্পের মধ্যে অমিল যতোটুকুই থাক্, একটা বিষয়ে কিন্তু মিল আছে এগুলো সবই মানুষের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার গল্প। শুনে শুনে আমার আর ভালো লাগে না।

আমি বলি, 'এসব গল্প নয়, অন্য গল্প বলো।'

গাড়ি-চালকের মুখটা রেখায় রেখায় কুটিল হয়ে ওঠে। একটু পরে মুখের

---

* তখনকার রাশিয়ায় প্রচলিত ইউক্রেনবাসীদের চলতি নাম। — সম্পাঃ

রেখাগুলি সরতে সরতে জড়ো হয় দুই চোখের চারপাশে। তারপর সায় জানিয়ে সে বলে:

'তোমার দেখছি আর আশ মেটে না। আচ্ছা শোনো তবে অন্য একটা গল্প। আমাদের এক পাচক ছিল...'

'আমাদের মানে কাদের?'

'কাউণ্টেস তাতিয়ান লেক্সেভনার।'

'আচ্ছা তুমি কাউণ্টেসকে তাতিয়ানা না বলে তাতিয়ান বলো কেন? তাতিয়ান তো পুরুষের নাম। কাউণ্টেস তো আর পুরুষ ছিলেন না, নয় কি?'

'সে কথা তো ঠিকই—কাউণ্টেস মহিলাই ছিলেন। কিন্তু মহিলা হলেও কাউণ্টেসের গোঁফ ছিল। ছোট কালো একটুখানি গোঁফ। তাঁর গায়ের রং ছিল কালো, জার্মান বংশে জন্ম—অনেকটা নিগ্রোদের মতোই একটা জাতি। তারপর শোনো কি কাণ্ড হল আমাদের এই পাচককে নিয়ে—সে এক ভারি মজার ঘটনা...'

মজার ঘটনাটা হচ্ছে এই: সেই পাচক একবার এক ধরনের মাংসের পুর-দেওয়া খাবার তৈরি করেছিল। রান্নার দোষে নষ্ট হয়ে যায় খাবারটা। তখন সেই পাচককে শাস্তি হিসেবে সমস্ত খাবার গিলিয়ে দেওয়া হয়। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে লোকটি।

রেগে উঠে আমি বলি, 'এটা কি খুব মজার ঘটনা হল?'

'তবে মজার ঘটনা কাকে বলে শুনি? বলো তুমি, তোমার মুখেই শোনা যাক্।'

'জানি না।'

'তাহলে বক্‌বক্ কোরো না। মুখটি বুজে থাকো।'

আবার সে তার একঘেয়ে গল্পের জাল বুনতে থাকে।

কোনো কোনো রবিবার আমার মামাতো ভাইয়েরা বেড়াতে আসে। দুই ভাইয়ের নামই সাশা। একজন মিখাইল-মামার ছেলে—গোমড়া মুখ আর ঢিলেঢালা গোছের। অপরজন ইয়াকভ-মামার ছেলে—ফিটফাট, সবজান্তা। একদিন আমরা তিনজনে বাইরের বাড়ির ছাদের ওপরে অভিযানে বেরিয়েছি এমন সময় দেখলাম, বেৎলেংদের বাড়ির উঠোনে একটা কাঠের গাদার ওপরে বসে এক ভদ্রলোক কতগুলো কুকুরছানার সঙ্গে খেলা করছেন। পরনে লোমের আস্তরদেওয়া একটা সবুজ রঙের ঝুলকোট কিন্তু মাথার হলুদরঙের

ছোট টাকটুকু অনাবৃত। আমার মামাতো ভাইদের একজন প্রস্তাব করল যে একটা কুকুরছানা চুরি করে আনা যাক্। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভেবেচিন্তে একটা পরিকল্পনা স্থির করলাম। আমার মামাতো ভাইয়েরা রাস্তায় বেরিয়ে বেৎলেংদের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমি গিয়ে লোকটাকে ভয় পাইয়ে দেব। আর যেই সে ভয়ে পালিয়ে যাবে, আমার মামাতো ভাইয়েরা একছুটে উঠোনের মধ্যে এসে একটা কুকুরছানা নিয়ে পালিয়ে আসবে।

'কিন্তু আমি ভয় দেখাব কী করে?'

মামাতো ভাইদের একজন পরামর্শ দিল: 'ওর টাকমাথায় থুতু ফেললেই লোকটা ভয় পেয়ে যাবে।'

টাকমাথায় থুতু ফেলে আসার মধ্যে যে বিশেষ রকমের দোষণীয় কিছু আছে তা আমার মনে হল না। এর চেয়েও বড়ো অপরাধ ঘটতে আমি দেখেছি এবং শুনেছি। সুতরাং আমার ওপরে যে দায়িত্ব দেওয়া হল তা পালন করতে আমি একটুও ইতস্তত করলাম না।

কিন্তু ঘটনাটি ঘটার পরেই একটা প্রচন্ড রকমের হৈচৈ আর গন্ডগোল শুরু হল। বেৎলেংদের বাড়ি থেকে এক দঙ্গল মেয়েপুরুষ চড়াও হল আমাদের বাড়িতে। সবার আগে আগে এল একজন সুন্দরপানা তরুণ অফিসার। এবং যেহেতু এই অপকর্মটি ঘটবার সময়ে আমার মামাতো ভাইয়েরা অত্যন্ত নিরীহের মতো রাস্তায় বেড়াচ্ছিল তাদের কোনো দোষ আছে বলে মনে করা হল না। একমাত্র আমিই দাদামশাইয়ের হাতে মার খেলাম। দাদামশাই আমাকে প্রচন্ড মার মারলেন। বেৎলেংদের বাড়িকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে, মারের প্রচন্ডতার মধ্যে দিয়ে তাকে লাঘব করবার চেষ্টা করলেন দাদামশাই।

থেৎলানো শরীর ও সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা নিয়ে আমি যখন রান্নাঘরে পড়ে আছি তখন পিওতর-কাকা এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। ফিটফাট সাজপোশাক আর বেশ খোসমেজাজ। চাপা স্বরে বলল:

'চমৎকার বুদ্ধি মাথা থেকে বার করেছিলে, হে ছোকরা। ঠিক শিক্ষা হয়েছে। পাজির পা-ঝাড়া। ওদের সবকটার মাথায় থুতু ফেললে ঠিক হয়। আরো ভালো হত যদি ওর গোবরঠাসা মাথাটা লক্ষ্য করে একটা ইট ছুঁড়তে পারতে।'

সবুজ কোট পরা ভদ্রলোকটির গোলগাল, চাঁচাছোলা, ছেলেমানুষি মুখটার কথা আমার মনে পড়ছে। ছোট ছোট হাত দিয়ে হলদে টাক থেকে

থুতু মুছতে মুছতে ভদ্রলোক সরু সরু গলায় সখেদে দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে উঠেছিলেন — ঠিক কুকুরছানার ডাকের মতো। তাই শুনে আমার মনে ভয়ংকর একটা অনুতাপ এসেছিল আর আমার মামাতো ভাইদের ওপরে এসেছিল ঘৃণা। কিন্তু এখন গাড়ি-চালকের চুবড়ির মতো পাকানো মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সমস্ত ভুলে গেলাম। আমাকে ধরে মারবার সময় আমার দাদামশাইয়ের মুখটা যেমন আতঙ্কজনক ও কুৎসিত হয়ে উঠেছিল, গাড়ি-চালকের মুখটাও অবিকল সেইভাবে কাঁপছে।

পিওতরকে হাত ও পা দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'চলে যাও এখান থেকে!'

হেসে হেসে আর চোখ টিপে তাকিয়ে সে উনুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সেই দিন থেকেই লোকটির সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তিটুকুও আমার আর নেই। তাকে আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করি; আবার সঙ্গে সঙ্গে তার গতিবিধির ওপরেও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখি। কি যেন একটা ঘটবে, এমনি একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা থেকে যায় আমার মনে।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই আরেকটি ঘটনা ঘটল। অনেকদিন থেকেই অভসিয়ান্নিকোভদের নিঃসাড় বাড়িটা সম্পর্কে আমার একটা চাপা কৌতূহল ছিল। কেন জানি আমার মনে হত, এই ছাইরঙা বাড়িটার মধ্যে এক রহস্যভরা রূপকথার জীবনের অস্তিত্ব।

বেৎলেংদের বাড়িতে সব সময়েই হৈচৈ আর সোরগোল। কয়েকটি আকর্ষণীয় চেহারার তরুণী এই বাড়িতে থাকে এবং তরুণীদের সঙ্গলিপ্সু ছাত্র ও অফিসারেরা আসে। তারা সব সময়েই কথা বলে, হাসে, গান গায় আর বাজনা বাজায়। বাড়িটার চেহারার মধ্যেই যেন একটা আনন্দের ছাপ। তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে জানলাগুলোর কাঁচ দেখা যায়, কাঁচের পিছনে ফুলগুলো সবুজ এক অপরূপ দ্যুতিতে জ্বলজ্বল করছে। আমার দাদামশাই এই বাড়িটা পছন্দ করেন না।

'বিধর্মী! নাস্তিক!' এই বাড়ির সমস্ত বাসিন্দার সম্পর্কেই দাদামশাই সাধারণভাবে এই মন্তব্য প্রয়োগ করেন। আর বিশেষ করে মেয়েদের সম্পর্কে ব্যবহার করেন একটি অতি কুৎসিত শব্দ। পিওতর-কাকা মহা উল্লাসের সঙ্গে আর অতি নোংরাভাবে আমাকে এই শব্দটির অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু অভসিয়ান্নিকোভের রূঢ় ও নিঃশব্দ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাদামশাই ভারি তারিফ করেন।

একতলা তবু উঁচু বাড়িটা, পিছনদিকে অনেকখানি লম্বা হয়ে এসে মিশেছে একটা পরিষ্কার ও খোলা উঠোনের সঙ্গে। সবুজ ঘাসে ঢাকা উঠোন, ঠিক মধ্যিখানে একটা কুয়ো। দু-দিকে দুটো থাম তুলে কুয়োর ওপরে ছাদ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়িটা যেন রাস্তার দিক থেকে সরে গেছে; মনে হতে পারে, বাড়িটা আড়ালে থাকতে চায়। সামনের দিকে খিলান দেওয়া তিনটে সরু সরু জানলা, জানলার শার্সির ওপরে সূর্যের আলো পড়ে রামধনু-রঙ হয়েছে। সদর দরজার ডানদিকে একটা গোলাঘর। মূল বাড়ির অনুকরণে গোলাঘরের সামনের দিকেও তিনটে জানলা। কিন্তু জানলাগুলো নকল, ছাই রঙের দেওয়ালের ওপরে ঢালাই করে দেওয়া হয়েছে, ফ্রেম ও শার্সি সাদা রঙ দিয়ে আঁকা। এই নকল জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। মনে হতে থাকে, গোলাঘরটা এই কথাই জোর গলায় ঘোষণা করছে যে এই বাড়ি আড়ালে থাকতে চায়, নিভৃত জীবন যাপন করতে চায় এই বাড়ি। শূন্য আস্তাবল আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শূন্য গাড়ি-ঘর সমেত সমস্ত সম্পত্তি যেন নিঃশব্দে অপমানিত হয়ে কিংবা শান্ত গর্বে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

মাঝে মাঝে এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠোনে ঘুরে বেড়ান। দাড়ি নেই, সূচের মতো খোঁচা খোঁচা সাদা গোঁফ। আরেকজন বৃদ্ধকেও প্রায়ই দেখা যায় — দুইগালে মোটা জুলপি, বাঁকা নাক। তিনি আস্তাবল থেকে একটা ছাইরঙা ঘোড়া বার করে নিয়ে আসেন। উঠোনে বেরিয়ে সরু-বুক রোগা-পা ঘোড়াটা চারদিকে তাকিয়ে বিনম্র মঠবাসিনীর মতো অনবরত মাথা নোয়ায়। খোঁড়া বৃদ্ধ চটাং করে একটা চড় মারেন ঘোড়াটার গায়ে, শিস দেন, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, তারপর অন্ধকার আস্তাবলের দিকে ফিরিয়ে দেন ঘোড়াটাকে। আমার মনে হয়, বৃদ্ধ এই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চান কিন্তু একটা অশুভ শক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে এখানে আটকে আছেন।

প্রায় প্রতিদিনই দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তিনটি ছোট ছেলে উঠোনে খেলা করে। তিনজনের পরনে একই রকমের ছাইরঙা প্যান্ট, জামা ও টুপি। চেহারার দিক থেকেও ওদের মধ্যে খুব বেশি মিল — তিনজনেরই একই রকম গোলগাল মুখ আর ছাইরঙা চোখ। ওদের মিল এমনি যে, ওদের চিনতে হলে আমি দেখি কে বড়ো আর কে ছোট, মুখ দেখে চেনা যায় না।

বেড়ার গায়ের একটা ফাটল দিয়ে ওদের লক্ষ্য করি। ওদের নজরে না পড়ায় আমি হতাশ হই। ওরা যে-সব খেলা খেলে তা আমার কাছে

নতুন। ঝগড়া নেই, মারামারি নেই, মনের আনন্দে ওরা খেলা করে — দেখে মন খুশি হয়ে ওঠে। যে-ভাবে ওরা সাজপোশাক করে, যে-ভাবে ওরা একে অপরের জন্যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে -- বিশেষ করে ছোটজনের জন্য বড়ো দু'জন — তা দেখে খুব ভালো লাগে আমার। এই ছোটটির চেহারা নাদুসনুদুস, চলন-বলন দেখলে হাসি পায়। যদি ও পড়ে যায় তাহলে বড়ো দু'জন হেসে ওঠে। কাউকে পড়ে যেতে দেখলে লোকে যে-ভাবে হাসে তেমনি ভাবেই ওরা হাসে — ওদের হাসির মধ্যে কোনো হিংস্রতার পরিচয় থাকে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ওকে তুলে ধরে, আগাছার পাতা বা রুমাল দিয়ে ওর হাত-পা মুছিয়ে দেয়।

মেজোজন বলে, 'একেবারে ক্যাবলা!'

ওরা কক্ষণো নিজেদের মধ্যে মারমারি করে না বা একজন আরেকজনকে জব্দ করতে চেষ্টা করে না। তিনজনেই শক্তসমর্থ, চটপটে এবং উৎসাহে ভরা।

একদিন আমি একটা গাছের ওপরে চেপে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে শিস দিলাম। শিসের শব্দ শুনে ওরা থামল তারপর এক জায়গায় জড়ো হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কী যেন আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে। আমার মনে হয়েছিল, ওরা বোধ হয় এবার আমার দিকে ইট ছুঁড়তে শুরু করবে। সুতরাং আমি নিচে নেমে এসে পকেট ভর্তি করে পাথর নিয়ে আবার গাছে উঠলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে ওরা উঠোনের অন্যদিকের কোণে গিয়ে আবার খেলা শুরু করে দিয়েছে এবং দেখে মনে হল, আমার কথা ওদের আর মনে নেই। ব্যাপারটা ভারি দুঃখের কিন্তু কী আর করা যায়, আমি প্রথমে যুদ্ধঘোষণা করতে চাই না। সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় জানলা দিয়ে কে ডেকে উঠল:

'বাড়ি এসো ছেলেরা — দেরি কোরো না!'

ডাক শুনে বাধ্য ছেলের মতো তারা বাড়ির দিকে ফিরল, খুব বেশি তাড়াহুড়ো করল না। ঠিক যেন পোষা হাঁস।

তারপর থেকে প্রায়ই আমি বেড়ার ওপরে গাছে চেপে বসে থাকি। মনে মনে আমার আশা থাকে যে ওরা আমাকে ওদের সঙ্গে খেলতে ডাকবে। কিন্তু একদিনও ওরা ডাকে না। কল্পনায় আমি প্রায়ই ওদের সঙ্গে গিয়ে ওদের খেলায় যোগ দিই, মাঝে মাঝে এমন মেতে উঠি যে সশব্দে হাঁকডাক শুরু করে দিই, হেসে উঠি। শব্দ শুনে ওরা তিনজনেই আমার দিকে তাকায়,

ফিসফাস করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে। তখন লজ্জা পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে আসি।

একদিন ওরা লুকোচুরি খেলতে শুরু করল। মেজো ভাই হল 'চোর'। গোলাঘরের একটা কোণে চোখের ওপরে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, একবারও হাতের ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে চেষ্টা করল না। এবার অন্য দু-ভাইয়ের লুকোবার পালা। গোলাঘরের চালাটা অনেকটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, তারই তলায় একটা স্লেজগাড়ি -- সবচেয়ে বড়ো ভাই গিয়ে লুকোল এই গাড়ির মধ্যে, ওদিকে ছোটটি কুয়োটার চারপাশে ঘুরছে, কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছে না কোথায় লুকোবে।

যে ছেলেটি চোর হয়েছে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গুণছে: 'এক! দুই!..'

ইতিমধ্যে ছোটটি কুয়োর কিনার বেয়ে ওপরে উঠেছে, বাল্‌তি সমেত দড়িটা ঝুলছিল। হাত বাড়িয়ে মুঠো করে ধরল দড়িটা, তারপর এক লাফ দিল শূন্য বাল্‌তিটার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দড়ি সমেত বাল্‌তিটা নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুয়োর ধারের সঙ্গে বাল্‌তির ধাক্কা লেগে লেগে ফাঁপা একটা আওয়াজ হতে লাগল শুধু।

নিঃশব্দে এবং দ্রুত পাক খুলে খুলে দড়িটাকে নিচে নামতে দেখে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। কিন্তু পরিণতির কথা ভেবে নিতে আমার এক মুহূর্তও দেরি হল না। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠোনে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগলাম:

'ও কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে!'

আমি যখন কুয়োর কাছে পৌঁছলাম, সেই একই সময়ে মেজো ভাইও চলে এসেছে। দড়িটা আঁকড়ে ধরল সে আর দড়ির টানে শূন্যে উঠে গেল; হাতটা ছড়ে গেল একেবারে। কিন্তু তখন আমি দড়িটাকে ধরলাম, ইতিমধ্যে বড়ো ভাইও উপস্থিত হয়েছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও দড়ি টেনে টেনে বাল্‌তিটাকে ওঠাতে লাগল।

'দয়া করে আরেকটু আস্তে টান, এত জোরে নয়,' বলল সে।

আমরা সকলে মিলে ছোটটিকে উদ্ধার করলাম। মারাত্মক রকমের ভয় পেয়েছে ছেলেটি। ডানহাতের আঙুল থেকে রক্ত পড়ছে, একটা গাল ছড়ে গেছে বিশ্রীভাবে। কোমর পর্যন্ত জলে ভেজা আর মড়ার মতো ফ্যাকাশে চেহারা। কিন্তু ওপরে উঠে এসে চোখদুটো মেলে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে হেসে বলল:

'আমি কেমন প-ড়ে গি-য়ে-ছি-লাম!'

'একেবারে থুন্‌কো!' এই বলে মেজো ভাইটি তাকে জড়িয়ে ধরে মুখ থেকে রক্ত মুছিয়ে দিল।

'বাড়ি যাই চল্‌। এটা তো আর লুকিয়ে রাখা যাবে না, দেরি করে লাভ কী।' ভুরু কুঁচকিয়ে মন্তব্য করল বড়ো ভাই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়ির লোক শুনে তোমাদের মারবে না?'

ঘাড় নেড়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল, 'কী ভীষণ জোরেই না ছুটে এসেছ!'

এই প্রশংসা শুনে আমি এত অভিভূত হলাম যে তার বাড়িয়ে-ধরা হাতটা ধরবার কথা মনে রইল না। ভালো করে খেয়াল ফিরে আসতে শুনলাম, সে মেজো ভাইকে বলছে, 'চল্‌ বাড়ি যাই। নইলে ওর ঠাণ্ডা লাগবে। বাড়ি গিয়ে বলব, ও ছুটতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেছে। কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, এসব বলে কোনো লাভ নেই।'

ছোটটি সায় দিল: 'ঠিক কথা। আমরা গিয়ে বলব যে আমি একটা জলভরা গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছি।'

তারপর ওরা তিনজনেই চলে গেল।

সমস্ত ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে ওপরের দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম, যে-ডালটা থেকে আমি লাফিয়ে পড়েছি সেটা তখনো নড়ছে আর হল্‌দে পাতা খসে খসে পড়ছে ডালটা থেকে।

তারপর প্রায় এক সপ্তাহ তিন ভাইকে উঠোনে খেলতে দেখা গেল না। যেদিন প্রথম খেলতে এল, সেদিন তাদের কলরবটা যেন আগের চেয়েও বেশি। বড়ো ভাইটি আমাকে দেখতে পেয়েই বন্ধুভাবে ডাক দিল:

'আমাদের সঙ্গে খেলবে তো চলে এস।'

সকলে গিয়ে স্লেজগাড়িটার ওপরে বসলাম। অনেকক্ষণ ধরে বসে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে নিলাম আমরা।

'সেদিন তোমরা মার খেয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তা খেয়েছিলাম বইকি।' জবাব দিল বড়োজন।

আমার কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না যে এদের মতো ছেলেদেরও আমার মতো মার খেতে হয়। ব্যাপারটা খুবই অন্যায় বলে মনে হতে লাগল আমার।

'আচ্ছা তুমি পাখি ধরো কেন?' জিজ্ঞেস করল ছোটটি।

'পাখি কী চমৎকার গান গায় বল তো! সেজন্যেই ধরি।'

'আর পাখি ধরো না। পাখিরা যদি খুশিমতো উড়ে উড়ে বেড়ায়, তাহলেই তো ভালো।'

'ঠিক আছে। আমি আর কোনো দিন পাখি ধরব না।'

'শুধু আর একটিমাত্র পাখি ধরবে আর সেটা দেবে আমাকে, কেমন?'

'বেশ তো, কোন্ পাখি চাও বলো?'

'যে পাখি খুব ফুর্তিতে থাকে—আমি খাঁচায় রাখব।'

'ঠিক আছে। তোমাকে একটা চেফিণ্ডপাখি ধরে দেব।'

এবার মেজো ভাই কথা বলল, 'বেলালে খেয়ে ফেলবে। আল বাবা থিক্ লাগ কলবেন।'

'ঠিক কথা।' বড়ো ভাই সায় দিল।

'তোমাদের মা নেই?'

'না।' জবাব দিল বড়ো ভাই কিন্তু মেজো ভাই কথাটাকে শুধরিয়ে বলল, 'মা আছে কিন্তু সে অন্য মা, থিক্ মা নয়--থিক্ মা মলে গেছে।'

আমি বললাম, 'তার মানে তোমাদের সৎ-মা।'

বড়ো ভাই সায় জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

তারপর তিনজনেই অন্যমনস্কভাবে চুপ করে রইল।

সৎ-মা যে কী তা দিদিমার কাছে গল্প শুনে শুনে আমি জানি। সুতরাং তাদের এইভাবে চুপ করে থাকার কারণও আমি বুঝতে পারলাম। মটরশুঁটির তিনটি বিচির মতো গায়ে গা লাগিয়ে তিনজনে বসে রইল। আমার মনে পড়ল সেই ডাইনী সৎ-মার গল্প। আসল মায়ের জায়গা নেবার জন্যে সেই ডাইনী সৎ-মা কত রকম ফন্দিফিকিরই না করেছিল। ছেলে তিনজনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি বললাম:

'কিছু ভেব না। তোমাদের আসল মা আবার ফিরে আসবেন।'

বড়োটি কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তা কী করে হবে? মা তো মরে গেছে। যে মরে যায় সে আর কক্ষনো ফিরে আসে না।'

বলে কী ছেলেটা? যে মরে যায় সে আর কক্ষনো ফিরে আসে না? সঞ্জীবনী জল ছিটিয়ে দিলে মড়া তো মড়া এমন কি যাদের কুচি-কুচি করে কেটে ফেলা হয়েছে তারাও বেঁচে ওঠে! আর এমন তো কতবারই দেখা গেছে যে একজন লোক মরে গেছে বলে মনে করা হল--কিন্তু পরে দেখা

গেল, সে সত্যি সত্যিই মরেনি; ভগবান তাকে মারতে চাননি, তাকে মেরেছে ডাইনী ও কুহকিনীরা!

দিদিমার কাছে যেসব গল্প শুনেছি সেগুলি মহা উৎসাহে আমি বলতে শুরু করলাম। কিন্তু বড়োটি ঠাট্টার হাসি হেসে বলল:

'ওসব গল্প আমরাও শুনেছি, ও তো রূপকথার গল্প!'

অন্য দু-ভাই চুপ করে বসে আমার গল্প শুনছিল। ছোটটি ভুরু কুঁচকে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে আছে, মেজোটি একটা কনুই রেখেছে হাঁটুর ওপরে, আরেকটা হাত দিয়ে ছোটটির কাঁধ জড়িয়ে ধরে আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। গোলাপী মেঘ নিচু হয়ে বাড়ির ছাদের ওপরে নেমে এসেছে। এমন সময় সাদা গোঁফওলা বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে পাদ্রিদের মতো বাদামী রঙের ঝুলকোট, মাথায় একটা ঝুলঝুলে লোমের টুপি।

আমার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ছেলেটা কে?'

বড়োটি উঠে দাঁড়িয়ে আমার দাদামশাইয়ের বাড়ির দিকে মাথা নেড়ে বলল, 'ওই বাড়ির ছেলে।'

'ওকে কে এখানে আসতে বলেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে সেই তিনটে ছেলে স্লেজগাড়িটা থেকে নেমে নিঃশব্দে বাড়ির দিকে চলে গেল। ওদের দিকে তাকিয়ে আমার আরেকবার মনে হল, ছেলেগুলো ঠিক পোষা হাঁসের মতো।

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার ঘাড় শক্তভাবে চেপে ধরে গেটের সামনে নিয়ে এলেন। আতঙ্কে আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে এমন তাড়াতাড়ি হিড়হিড় করে ঠেলে নিয়ে এলেন যে কান্না আসবার আগেই দেখলাম আমি একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমার দিকে আঙ্গুল তুলে শাসিয়ে তিনি বললেন:

'খবরদার বলছি এ-বাড়িতে আর আসবে না!'

আমিও ক্রুদ্ধ স্বরে পাল্টা জবাব দিলাম, 'বুড়ো শয়তান, তোমার মুখ দেখবার জন্যে আমি এ-বাড়িতে আসিনি।'

লম্বা হাত বাড়িয়ে তিনি আবার আমাকে ধরে ফেললেন। আর রাস্তার ধার দিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে যেতে মাথার ওপরে হাতুড়িপেটার মতো একই প্রশ্ন করতে লাগলেন:

'তোমার দাদামশাই বাড়িতে আছেন?'

আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে দাদামশাই বাড়িতে ছিলেন। সেই ভয়ানক বুড়োর সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, মাথাটা পিছনে হেলিয়ে, তাঁর দাড়িটা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভদ্রলোকের গোল ভাঁটার মতো অনুজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন:

'এই ছেলেটার মা এখানে নেই। আমি নিজে সবসময়ে কাজে ব্যস্ত থাকি। কেউ নেই যে ছেলেটার দিকে একটু নজর রাখে। কর্ণেল, আপনি এবারকার মতো অপরাধ মার্জনা করুন।'

কথাটা শুনে সারা বাড়ি কাঁপিয়ে কর্ণেল গলা খাঁকারি দিলেন। তার পরেই কাঠের থামের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন গট্ গট্ করে পা ফেলে। খানিকক্ষণ পরে পিওতর-কাকার গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল আমাকে।

ঘোড়ার লাগামটা খুলতে খুলতে গাড়ি-চালক জিজ্ঞেস করল, 'কী হে ছোকরা, আবারও দেখছি একচোট হয়েছে। তা এবার মার খাওয়া হল কী জন্যে?'

আগাগোড়া ঘটনাটা যখন তাকে বললাম, একেবারে ফুঁসে উঠল সে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল:

'ওদের মতো ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে গিয়েছিলে কেন শুনি? ওরা সব বড়লোকের বাচ্চা। দেখ তো, ওদের জন্যে তোমার কি দুর্ভোগটা হল? যাক্ গিয়ে, এরপর থেকে ছেলেগুলোর ওপরে আচ্ছা করে এর শোধ তুলো।'

এমনি বিড়বিড় করল সে অনেকক্ষণ। সদ্য ঘা-খাওয়া শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে প্রথম দিকে আমার ভালো লাগছিল তার কথাগুলো; কিন্তু কথাগুলো বলতে বলতে তার চুবড়ির মতো মুখটা এমন বিশ্রীভাবে কাঁপছে যে আমার মনে পড়ে যায়, ওই ছেলে তিনজনকেও এজন্য মার খেতে হবে আর ওরা তো আমার কাছে কোনো দোষ করেনি।

আমি বললাম, 'ওরা কোনো দোষ করেনি। ওদের ওপরে শোধ তুলতে যাব কেন? আর তুমি যা বলছ তার একবর্ণও সত্যি নয়।'

আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে একটা হুঙ্কার ছাড়ল:

'বেরিয়ে যা বলছি আমার গাড়ি থেকে।'

একলাফে গাড়ি থেকে নেমে আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'বোকা কোথাকার!'

'কী, আমাকে বোকা বলা? আমাকে মিথ্যেবাদী বলা? আমি তোকে মজা

দেখাব...' এই বলে সে আমার পিছনে উঠোনময় ধাওয়া করে বেড়াল, কিন্তু কিছুতেই আমাকে ধরতে পারল না।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দিদিমা এসে অলিন্দে দাঁড়ালেন। আমি ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। সেও এসে আমার নামে নালিশ করতে শুরু করল:

'এই বাঁদরটার জন্যে আমার একটুও শান্তি নেই। আমাকে যা-তা বলে। আমি ওর চেয়ে পাঁচগুণ বয়সে বড়ো অথচ আমাকে সব চেয়ে নোঙরা গালাগালি দিতেও কসুর করে না...'

লোকে যখন আমার মুখের উপর মিথ্যে কথা বলে তখন আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে যাই। এখনও এই কথাগুলো শুনে কী বলব বুঝতে না পেরে আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু আমার দিদিমা দৃঢ়স্বরে বললেন:

'দেখ পিওতর, কথাগুলো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? ও তোমাকে নোঙরা গালাগালি দেয়নি।'

দাদামশাই হলে গাড়ি-চালকের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে বসতেন।

সেইদিন থেকে গাড়ি-চালকের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দাঁড়ায় এক নিঃশব্দ ও হিংস্র বৈরিতা। সে তক্কে তক্কে থাকে, সুযোগ পেলেই হাতের লাগাম দিয়ে ধাঁই করে আমাকে এক ঘা লাগিয়ে এমন ভাব করে যেন হঠাৎ লেগে গেছে। খাঁচার মধ্যে আমি যে-সব পাখি ধরে রাখি সেগুলো সে ছেড়ে দেয়। একদিন পাখিগুলোর দিকে বেড়াল লেলিয়ে দিল। আর আমার দাদামশাইয়ের কাছে গিয়ে আমার নামে নানা নালিশ করে। যা নয় তাই বলে আমার নামে সাতখানা করে লাগায়। দেখেশুনে আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায় যে ওই লোকটাও আসলে বুড়োর সাজপোশাক পরা আমারই মতো ছেলেমানুষ। আমিও ছেড়ে কথা বলি না। যে লাপ্তিজোড়া আছে সেটার প্যাঁচ খুলে সুতো আল্‌গা করে এমন অবস্থায় রেখে দিই যে পায়ে দিলেই ছিঁড়তে শুরু করে। একদিন তার টুপির মধ্যে মরিচ ছড়িয়ে রেখেছিলাম। টুপিটা মাথায় দেবার পর পুরো একটি ঘণ্টা সে শুধু হেঁচেছিল। মোট কথা, আমার ক্ষমতায় যতোদূর কুলোয় আমি করে যাই, তার ঢিলের উত্তরে পাটকেল ছুঁড়তে কসুর করি না। রবিবার হলেই সে সারাটি দিন আমার পিছনে গোয়েন্দার মতো লেগে থাকে। সেই বড়োলোকের তিনটি ছেলের সঙ্গে গুপ্ত যোগাযোগ রাখতে গিয়ে বহুবার তার কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। আর যতোবার সে আমাকে ধরতে পেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা জানিয়ে এসেছে আমার দাদামশাইয়ের কাছে।

সেই ছেলে তিনটির সঙ্গে মেলামেশা আমি বন্ধ করিনি। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিন দিনই আমার বেশি ভালো লাগছে। দাদামশাইয়ের বাড়ির আর অভসিয়ান্নিকোভের বাড়ির মাঝখানে যে আঁকাবাঁকা বেড়া আছে সেই বেড়ার একটা কোণ গাছপালায় অন্ধকার হয়ে থাকে। এল্‌ম্‌ ও লাইম গাছ এবং এল্‌ডারবেরির ঘন ঝোপ। এই ঝোপের পিছনদিকে বেড়াটা কেটে আমি একটা ফাঁক করে নিয়েছি। এই ফাঁকের কাছে তিন ভাই এসে আমার সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলে। কখনো আসে একা একা, কখনো জোড়ায় জোড়ায়। কর্ণেল হঠাৎ এসে না পড়ে সেজন্যে একজন সর্বদা পাহারায় থাকে।

ওরা আমাকে ওদের নিজেদের জীবনের কথা বলে। ভারি একঘেয়ে জীবন ওদের, শুনতে শুনতে মন খারাপ হয়ে যায় আমার। নানা বিষয়ে কথা বলি আমরা। পাখির কথা, নানা ছেলেমানুষি ঝোঁকের কথা, কিন্তু ওরা কখনো আমাকে ওদের বাপ বা সৎ-মার কথা বলেনি, অন্ততঃ যতোদূর আমার মনে আছে। অধিকাংশ দিনই ওরা শুধু আমার কাছে গল্প শুনতে চায় এবং আমিও দিদিমার কাছ থেকে শোনা সমস্ত গল্প খুঁটিয়ে বলতে শুরু করি। গল্পের কোনো অংশই বাদ দিই না। যদি গল্পের কোনো অংশ ভুলে যাই তাহলে ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলে ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করে আসি। দিদিমা খুশি হয়েই গল্পের ভুলে যাওয়া অংশটুকু আমাকে বলে দেন।

আমার দিদিমার কথা ওদের কাছে প্রায়ই বলি। একদিন বড়োজন আমার কথা শুনতে শুনতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল:

'সব দিদিমাই খুব ভালো হয়। আমাদেরও এক সময়ে ভারি চমৎকার এক দিদিমা ছিল...'

এই ছেলেটির কথা বলার ধরনই এই রকম। 'এক সময়ে ছিল,' 'এতকাল ধরে যেমনটি হয়ে আসছে,' 'কোনো এক সময়ে,' ইত্যাদি ধরনের কথাগুলো সে এত বেশিবার বলে আর বলবার সময়ে তার গলার স্বরটা এত বেশি ভারি হয়ে ওঠে যে মনে হতে পারে, তার বয়স মাত্র এগারো নয়, একশো বছর পার হয়ে গেছে। আমার মনে আছে, ছেলেটির হাততালুদুটো ছিল রোগা, সরু লম্বা হাতের আঙুল। তার শরীরটাও ছিল রোগাটে আর পল্‌কা। চোখদুটি লাজুক, গির্জার উপাসনা-বেদীর বাতির মতো পরিষ্কার। তার দুই ভাইকেও আমার খুব ভাল লাগে। ওদের ওপরে দরদে আমার মনটা ভরে যায় আর ভারি ইচ্ছে করে ওদের জন্যে চমৎকার একটা কিছু করি। কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে বড়োজনকে।

ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি এমন মেতে উঠি যে পিওতর-কাকা এলেও টের পাই না। পিওতর-কাকা আমাদের সকলকে চম্‌কে দিয়ে টানা টানা স্বরে চিৎকার করে ওঠে:

'আ-বা-র!'

আমি দেখছিলাম পিওতর-কাকা আজকাল প্রায়ই বড়ো মনমরা হয়ে পড়ে। কাজ থেকে ফিরবার সময় তার মেজাজটা কি রকম আছে তা জানবার একটা উপায়ও আমি বার করেছিলাম। সাধারণত সে সদরের গেটটা খোলে ধীরেসুস্থে। সুতরাং কব্‌জাটায় অনেকক্ষণ ধরে একটানা কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ হয়। কিন্তু গাড়িওলার মেজাজ যদি ভালো না থাকে তাহলে কব্‌জাটা আচমকা যেন তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে।

তার বোবা ভাইপো গেছে দেশের বাড়িতে বিয়ে করবার জন্যে। একাই আছে পিওতর। আস্তাবলের ওপরে নিচু ছাদওলা তার ঘরটি, একটিমাত্র ছোট জানলা, আর ঘরের মধ্যে আলকাতরা, পুরনো চামড়া, তামাক আর ঘামের গন্ধ। এই গন্ধটার জন্যেই আমি তার ঘরে কিছুতেই যেতে পারি না। আজকাল আবার সে সারারাত বাতি জ্বালিয়ে ঘুমোয়; দাদামশাই ভারি অসন্তুষ্ট হন তাতে।

'ওহে পিওতর, তোমার যা কান্ডকারখানা দেখছি, কোন্‌দিন ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

অন্য কোন দিকে তাকিয়ে সে জবাব দেয়, 'না, সে ভয় নেই। রাত্রিবেলা একপাত্র জলের মধ্যে আমি বাতিটাকে বসিয়ে রাখি।'

আজকাল সে তার চোখদুটো অনবরত অন্য দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে। দিদিমার ভোজসভায় সে আর আসে না বা আমাদের আর ফলের জ্যামও খাওয়ায় না। তার মুখখানা আরো শুকিয়ে গেছে, মুখের রেখাগুলো আরো গভীর হয়েছে আর হাঁটাচলার সময়ে সে রোগীর মতো টল্‌তে থাকে।

একদিন রাত্রিবেলা খুব বেশি বরফ পড়েছিল, সকালবেলা দাদামশাই ও আমি বেল্‌চা দিয়ে সেই বরফ সরাচ্ছিলাম, এমন সময়ে সদরের গেট সশব্দে খুলে গেল আর খোলা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল একজন পুলিসের লোক। পিঠ ঠেস্‌ দিয়ে গেটটা বন্ধ করে সে দাঁড়াল। মোটা ধ্যাব্‌ড়া আঙ্গুলটা নেড়ে ডাকল দাদামশাইকে। দাদামশাই কাছে এগিয়ে গেলে পুলিসের লোকটি নিচু হয়ে নিজের মস্ত নাকটা দাদামশাইয়ের মুখের মধ্যে প্রায় ঢুকিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে কি যেন বলল। শুনে দাদামশাই একেবারে আঁতকে উঠে বললেন, 'এখানে? কখন? আমি যদি তা মনে করতে পারতাম...'

তারপরেই হাস্যকরভাবে এক লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর! এ যে বিশ্বাস করা যায় না!..'

'শ্-শ্-শ্,' পুলিসের লোকটি দাদামশাইকে রূঢ়ভাবে বলল।

দাদামশাই এদিক ওদিক তাকাল। তাঁর চোখ পড়ল আমার দিকে।

'বেল্‌চাদুটোকে নিয়ে বাড়ি চলে যা!'

বাড়ির দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি দু'জনকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। আস্তাবলের ওপরে গাড়ি-চালকের ঘরে গিয়ে ঢুকল দু'জনে। পুলিসের লোকটি ডান হাত থেকে দস্তানাটা খুলে নিয়ে বাঁ হাতের ওপরে দস্তানাটা দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি মারতে লাগল।

'লোকটা ঠিক টের পেয়েছে। ঘোড়া-টোড়া ফেলেই পালিয়ে গেছে এখান থেকে।'

রান্নাঘরে দিদিমার কাছে আমি ছুটে গেলাম। যা দেখেছি এবং শুনেছি, সবই বললাম দিদিমার কাছে। দিদিমা রুটি তৈরি করবার জন্যে আটা মাখছিলেন, সারা মুখে আটা লেগেছিল, সেই অবস্থাতেই মাথা নাড়তে লাগলেন, তারপর আমার বলা শেষ হলে শান্ত স্বরে বললেন তিনি:

'নিশ্চয়ই কোথাও কিছু চুরি-টুরি করে এসেছে। যা, বাইরে গিয়ে খেলা কর গিয়ে। সব ব্যাপারে তোর থাকার দরকার কি?'

আমি আবার ছুটে গিয়ে উঠোনে দাঁড়ালাম। দেখলাম, দাদামশাই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মাথায় টুপি নেই, চোখদুটো আকাশের দিকে তোলা আর বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছেন তিনি। মুখটা রাগে ফুলে ফুলে উঠছে আর একটা পা ঝাঁকি দিয়ে কেঁপে উঠছে।

আমাকে দেখেই মাটিতে পা ঠুকে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফের এসেছিস? বললাম না বাড়ির ভিতরে যেতে?'

আমি আবার রান্নাঘরে এলাম। পিছনে পিছনে দাদামশাইও এলেন।

'গিন্নি, একটু শুনে যাও।' দিদিমাকে বললেন তিনি।

দু'জনে পাশের ঘরে গেলেন। অনেকক্ষণ ফিস্‌ফাস্ কথা হল দু'জনের মধ্যে। ফিরে আসার পর দিদিমার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আমি বুঝতে পারলাম, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমা, কী হয়েছে? তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন?'

নীচুস্বরে দিদিমা বললেন, 'তুই চুপ করে থাক্ তো।'

তারপর সারা দিন বাড়ির আবহাওয়াটা সন্ত্রস্ত ও থম্‌থমে হয়ে রইল। দাদামশাই ও দিদিমা থেকে থেকে চম্‌কে উঠে তাকাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে যা একটু কথাবার্তা হল তা খুবই দুর্বোধ্য আর সংক্ষিপ্ত। এতে আতঙ্কের ভাবটা আরো ঘন হয়ে উঠল।

গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে দাদামশাই দিদিমাকে হুকুম দিলেন, 'গিন্নী, আইকনের সবকটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও।'

আহারপর্ব শেষ হল অতি দ্রুত যদিও কারও খিদে নেই। মনে হতে লাগল, কারও জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে। দাদামশাই বারবার ক্লান্তভাবে গাল ফোলাতে লাগলেন, বারবার গলা পরিষ্কার করলেন আর বিড়বিড় করে বললেন:

'শয়তান একবার ভর করলে তার আর নিস্তার নেই। এই ধরো না এই লোকটির কথা। দেখে তো মনে হয় দয়ালু আর দেবতায় ভক্তি আছে, কক্ষনো কোনো অধর্মের কাজ করে না---কিন্তু দেখো এই লোকটা কী কান্ডই না করেছে!'

দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

শীতকালের রুপোলি দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, এই দিনটির যেন আর শেষ নেই। আর যতোই সময় যেতে লাগল, ততোই বাড়ির আবহাওয়াটা হয়ে উঠল আরো বেশি অস্বস্তিকর ও আরো বেশি রুদ্ধশ্বাস।

সন্ধ্যার দিকে এল আরেকজন পুলিসের লোক। এই লোকটির শরীরটা মোটা, মাথাটা লাল। রান্নাঘরের একটা বেঞ্চিতে বসে নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে ঢুলতে লাগল সে।

দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল কি করে?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পুলিসের লোকটি ঘোঁৎঘোঁৎ করে জবাব দিল, 'এতো সহজ কথা। পুলিসের কাছে কোনো কথাই চাপা থাকে না।'

মনে আছে, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পুরনো একটা মুদ্রা মুখের মধ্যে পুরে গরম করতে চেষ্টা করছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তুষারঢাকা জানলার শার্সির ওপরে বিজয়ী সেন্ট জর্জের একটা ছাপ তোলা।

হঠাৎ সদরের দিক থেকে প্রচন্ড একটা হুটোপাটির শব্দ শোনা গেল। দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। চৌকাঠের ওপরে পেত্রভনা দাঁড়িয়ে। চিৎকার করে বলল সে:

'দেখতে আসুন, আপনাদের বাগানের পিছন দিকে কী কান্ড হয়েছে!'

তারপর পুলিসের লোকটির দিকে নজর পড়ল। সে আবার সদরের দিকে ফিরে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু পুলিসের লোকটি তার স্কার্ট ধরে তাকে আট্‌কে ফেলেছে। সন্ত্রস্ত স্বরে সেও সমানে চেঁচিয়ে উঠল:

'দাঁড়াও! তুমি কে? বাইরে কী কান্ড হয়েছে?'

চৌকাঠে হুমড়ি খেয়ে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদতে শুরু করে দিল পেত্রভনা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে আর ঢোক গিলতে গিলতে বলল সে:

'আমি দুধ দুইবার জন্যে বাইরে এসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, কাশিরিনদের উঠোনে একজোড়া বুটজুতোর মতো কি একটা জিনিস।'

দাদামশাই ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মিথ্যে কথা বলবার আর জায়গা পাস্‌ না মাগী! আমাদের উঠোনে কি আছে বা না-আছে তা তুই দেখবি কি করে? উঠোনের বেড়া যথেষ্ট উঁচু আর তাতে একটিও ফুটো নেই। ওপার থেকে দেখবি কি করে? সব মিথ্যে কথা! আমাদের বাগানে কোনো কান্ড ঘটেনি!'

একটা হাত দাদামশাইয়ের দিকে বাড়িয়ে আর একহাতে মাথা চেপে ধরে পেত্রভনা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে লাগল:

'শোন বাপু! ও সত্যিই বলছে যে আমি মিথ্যে কথা বলছি। হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম একটা পায়েচলা দাগ বেড়া পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে আর এক জায়গায় বরফ একেবারে পায়ে মাড়ানো হয়ে গেছে। তখন আমি বেড়া বেয়ে ওপরে উঠে উঁকি মেরে দেখলাম। সেই লোকটা ওখানে পড়ে আছে...'

'কে-এ-এ?'

টানা-টানা আর ভয়ার্ত একটা চিৎকার উঠল। তারপরেই রান্নাঘরের সবকটি লোক পাগলের মতো ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে ছুটল উঠোনের দিকে। সেখানে বরফঢাকা গর্তের মধ্যে পিওতর-কাকা পড়ে আছে। একটা পোড়া খুঁটিতে পিঠটা ঠেস্‌ দেওয়া, মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপরে। আর ঠিক ডান কানের নিচেই গভীর একটা হাঁ-করা ক্ষত। মনে হয় লাল একটা মুখ। ধারে ধারে নীল্‌চে অংশটুকু দাঁতের মতো বেরিয়ে আছে। ভয়ে আমি চোখ বুজেছিলাম। চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, পিওতর-কাকার ঘোড়ার লাগামের ছুরিটা তার কোলের ওপরে পড়ে আছে; পাশেই ডানহাতটা, ডানহাতের আঙুলগুলো কাল্‌চে হয়ে বেঁকে গেছে। বাঁ হাতটা বরফের মধ্যে গোঁজা। পাতলা শরীরটার চাপে খানিকটা বরফ গলে গেছে, পেঁজা তুলোর মতো সাদা বরফের মধ্যে বসে গেছে শরীরটা। এতে আরো

বেশি ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছে তাকে। ডানদিকে বরফের ওপরে লালরঙের ছোপ পড়েছে; বিশেষ একটা আকার নিয়েছে লালরঙের ছোপটুকু, পাখির মতো মনে হয়। বাঁ দিকে কোনো দাগ পড়েনি, মসৃণ বরফ ঝক্ঝক্ করছে। মাথাটা অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে নেমে এসে ঠেকে গেছে বুকের সঙ্গে, কোঁকড়ানো দাড়ি ঠেলে উঠেছে ওপরের দিকে। দাড়ির ঠিক নিচেই ঝুলছে মস্ত একটা পেতলের ক্রুশ। রক্তের ধারা শুকিয়ে জমাট বেঁধে ক্রুশটাকে ফ্রেমের মতো ঘিরে রয়েছে। চারদিকে এলোমেলো কলরব, আমার মাথাটা ঘুরছে। তারস্বরে একটানা চিৎকার করে চলেছে পেত্রভনা, পুলিসের লোকটা চিৎকার করে ভালেইকে সেখান থেকে চলে যেতে বলছে; আমার দাদামশাই চিৎকার করছেন, 'খবরদার, পায়ের দাগগুলো যেন নষ্ট না হয়!'

হঠাৎ তিনি ভুরু কুঁচকিয়ে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিলেন।

'মিথ্যে আপনি অত চেঁচামেচি করছেন,' উঁচু গলায় কর্তৃত্বের সুরে তিনি পুলিসের লোককে বললেন, 'এ হচ্ছে ঈশ্বরের লীলা, ঈশ্বরের বিচার। আপনারা যতোই হম্বিতম্বি করুন না কেন -- এখানে সবই নিষ্ফল!'

আর তখনই সব চুপ করে গেল। মৃতের দিকে তাকিয়ে সবাই বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে।

পেত্রভনার বাড়ির দিক থেকে বেড়া ডিঙিয়ে অনেকে এসেছে এপারে। ছুট্তে ছুট্তে এসেছে উঠোনের ওপর দিয়ে। পড়ে গেছে বারবার, বিড়বিড় করেছে আপন মনে—কিন্তু কোনো রকম হৈচৈ না করে। অবশেষে আমার দাদামশাই চারদিকে তাকিয়ে হতাশার সুরে চীৎকার করে উঠলেন, 'পড়শীরা, কী করছ তোমরা! তোমাদের পায়ের চাপে আমার ফলের গাছগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের কি চক্ষুলজ্জা বলেও কিছু নেই?'

আমার হাত ধরে দিদিমা বাড়ির ভিতরে চলে এলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কী করেছিল দিদিমা?'

কান্না চেপে তিনি জবাব দিলেন, 'তা তো দেখলিই এতক্ষণ ধরে।'

সেদিন সারাটা সন্ধ্যে এবং তারপরেও অনেক রাত পর্যন্ত অজানা অচেনা সব লোক যাতায়াত আর হৈচৈ করতে লাগল আমাদের বাড়ির রান্নাঘরে ও তার পাশের ঘরে। হুকুমের স্বরে চলল পুলিসের হাঁকডাক। পাদরির মতো দেখতে একটা লোক খাতায় কী সব লিখতে লিখতে হাঁসের মতো প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে অনবরত শুধু বলতে লাগল:

'কী করে? কী করে?'

প্রত্যেককে চা দিলেন দিদিমা। চায়ের টেবিলে বসেছিল একজন গোলগাল চেহারার লোক। গোঁফওলা মুখটিতে বসন্তের দাগ। তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় সে বলল:

'ওর আসল নাম কেউ জানে না। শুধু এটুকু জানা গেছে, ওর দেশ এলাথমা। আর ওই যে বোবা-কালা লোকটি ছিল, সে আসলে বোবাও নয়, কালাও নয়। সে সবকিছুই স্বীকার করেছে। আরো একজন তাদের সঙ্গে ছিল। সেও স্বীকার করেছে সব কথা। বহুদিন থেকেই এই দলটি একটা কাজে হাত পাকিয়েছিল — তা হচ্ছে গির্জার সম্পত্তি লুট করা...'

পেত্রভনা দরদর করে ঘামছিল, দীর্ঘনিঃশ্বেস ফেলে সে বলে উঠল, 'কী কান্ড মাগো!'

তাকের ওপরে শুয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি দেখছিলাম লোকগুলোকে। মনে হতে লাগল, তারা যেন একদল বেঁটে, মোটা আর কুৎসিত চেহারার লোক...

দশ

এক শনিবার খুব ভোরে বুলফিঞ্চ পাখী ধরবার জন্যে আমি গেলাম পেত্রভনার বাগানে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও একটি পাখিও আমার ফাঁদে ধরা দিল না। বুকে লাল রঙের ছিটে দেওয়া পাখিগুলো: আর কী দেমাক তাদের। রুপোলী বরফের ওপরে ভারিক্কী চালে বেড়িয়ে চলে। কিংবা উড়ে যায় ঝোপের মধ্যে, সেখানে তুষারঢাকা গাছের ডালে চিক্‌চিকে নীল্‌চে বরফের গুঁড়োর মধ্যে উজ্জ্বল একটা ফুলের মতো দুলতে থাকে আপন মনে। দৃশ্যটা এত সুন্দর যে পাখি ফাঁদে না পড়ার হতাশা আমার মনে আসতে পারে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে আমি যে একজন খুব একাগ্র শিকারী তাও নয়। কোনো ঘটনার ফলাফলটা যাই হোক্ না কেন, তার রূপায়ণের প্রক্রিয়াই আমার মনে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে পাখিদের জীবনযাত্রা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে আর তাদের নিয়ে চিন্তা করতে।

শীতের দিনের ঘনীভূত নিস্তব্ধতায় বরফঢাকা মাঠের ধারে একা-একা বসে পাখির কিচির-মিচির শোনা — এর চেয়ে আনন্দ আর কী আছে! অনেক

দূর দিয়ে চলে যায় একটা ত্রয়কা, টিং টিং করে বাজে তার ঘণ্টা — ঠিক যেন রুশদেশের শীতকালের বিষণ্ণ লার্কপাখী।

তারপর ঠাণ্ডায় আমার হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরে গেল, আর যখন অনুভব করলাম আমার কানগুলো জমে আসছে, তখন ফাঁদ আর খাঁচা তুলে নিয়ে বেড়া টপকে আমি চলে এলাম বাড়ির দিকে। আমাদের বাড়ির গেটটা খোলা আর প্রকাণ্ড চেহারার একজন চাষী তিন-ঘোড়ার এক মস্ত ঢাকা স্লেজগাড়িকে গেট দিয়ে রাস্তায় বার করে নিচ্ছে। কুণ্ডলি পাকিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে ঘোড়াগুলোর গা থেকে, মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে লোকটি। আমার হৃৎপিণ্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন থমকে পড়ল।

'এই গাড়িতে কে এসেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার দিকে ফিরে হাতের তলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল লোকটি, তারপর লাফিয়ে চালকের আসনে উঠে বলল:

'পাদ্রিমশাই এসেছেন!'

পাদ্রিমশাই এসেছেন কি আসেননি — তা নিয়ে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল না। তিনি যদি এসে থাকেন তবে খুব সম্ভব তিনি কোনো ভাড়াটের বাড়িতে এসেছেন।

'হট্! হট্! চল্ রে আমার মাণিকরা!' ঘোড়াগুলোর গায়ে চাবুকের বাড়ি মেরে লোকটি চিৎকার করে উঠল। একলাফে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াগুলো, টিং টিং শব্দ উঠল বাতাসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটা চলে যেতে দেখলাম, তারপর গেটটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকতেই শুনতে পেলাম পাশের ঘর থেকে আমার মা'র গভীর গলার স্বর ভেসে আসছে।

'বেশ তো, তোমরা কী করতে চাও তাহলে? আমার মাথা কাটবে—না কি?'

হাতের খাঁচা আর ফাঁদ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি ছুটলাম পাশের ঘরের দিকে। গায়ের কোট খুলবারও তর সইল না। কিন্তু হঠাৎ দাদামশাই আমাকে আটকালেন। তিনি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, ঢোঁক গিলে একটা যন্ত্রণা চাপতে চেষ্টা করলেন যেন, তারপর মুখ দিয়ে জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে বললেন:

'আচ্ছা যাও!'

দরজার কাছে এসে আমি অন্ধের মতো হাতড়াতে লাগলাম। উত্তেজনা ও

ঠান্ডায় আড়ষ্ট হয়ে আমার আঙ্গুলগুলো কাঁপছিল, কিছুতেই দরজায় তালা লাগানর আংটাটা খুঁজতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে আমি চৌকাঠের ওপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

মা বলল, 'এই তো, এসেছিস এতক্ষণে! আরে বাব্বাঃ, কত বড়ো হয়ে গিয়েছিস! কী রে, চিনতে পারছিস না আমাকে? আচ্ছা তোমাদের কী কান্ড বলো তো! জামাকাপড়ের কী অবস্থা! আরে, কানদুটো যে দেখছি ঠান্ডায় জমে গেছে! মা, শীগগির যাও তো, আমাকে একটু হাঁসের চর্বি এনে দাও!'

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে আর ঠিক একটা বলের মতো আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মা আমার গা থেকে জামাকাপড় খুলে ফেলতে লাগল। দীর্ঘ উন্নত গড়ন আমার মা'র; তুলতুলে আর নরম লালরঙের একটা পোশাক রয়েছে গায়ে, পুরুষের জামার মতো চওড়া; বড়ো বড়ো কালো বোতাম কাঁধ থেকে একেবারে নিচে পর্যন্ত কোণাকুণি নেমে এসেছে। এ-ধরনের পোশাক আমি আগে আর কোনো দিন দেখিনি।

মা'র মুখটা যেন আরো ছোট হয়ে গেছে, আরো ফ্যাকাশে, চোখগুলো হয়েছে আরো বড়ো বড়ো, আরো গভীর, চুলগুলো আরো সোনালী। লাল ঠোঁটদুটো বিরক্তির সঙ্গে বেঁকিয়ে, আমার গা থেকে খুলে নেওয়া জামাকাপড়গুলো চৌকাঠে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে, মা ধমকের সুরে বলে উঠল:

'কি রে, কথা বলছিস্‌নে কেন? আমাকে দেখে খুশি হস্‌নি? ইস্‌, কী ময়লা জামা বাবা!'

তারপর আমার কানে হাঁসের চর্বি ঘষতে লাগল মা। ভারি ব্যথা লাগছিল, কিন্তু মা'র গা থেকে স্নিগ্ধ আর চমৎকার একটা গন্ধ নাকে আসতেই সমস্ত ব্যথা আমি ভুলে গেলাম। মা'র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি, উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিলাম না। মা'র কথার ফাঁকে ফাঁকে কানে আসছিল দিদিমার কথা। অনুচ্চ বিষণ্ণ স্বরে দিদিমা বলে চলেছেন:

'ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গেছে, এমন কি দাদামশাইকে পর্যন্ত ওর ভয়ডর নেই। ভারিয়া রে, ভারিয়া...'

'মা, তুমি আর ঘ্যানঘ্যান কোরো না বাপু। সব ঠিক হয়ে যাবে!'

মা'র সঙ্গে এই পরিবেশটা খাপ খাচ্ছে না। মা এসে দাঁড়াতেই চারদিকের সবকিছু মনে হচ্ছে পুরনো করুণ আর ময়লা। এমন কি আমি নিজেও যেন দাদামশাইয়ের মতো বুড়ো হয়ে গেছি।

দুই হাঁটুর মধ্যে আমাকে শক্তভাবে চেপে ধরে ভারি ভারি উষ্ণ হাত দিয়ে আমার চুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে আমার মা বলল:

'তোর চুলগুলো কাটতে হবে দেখছি। আর এবার তোকে স্কুলে ভর্তি করে দেব। আর দেরি করা উচিত নয়। কি রে, লেখাপড়া শিখবি তো?'

'লেখাপড়া তো আমি শিখেছি।'

'আরো কিছু শিখতে হবে। ইস্, কী গাঁট্টাগোঁট্টা হয়েছিস রে তুই!' আমাকে আদর করতে করতে খুশিভরা প্রাণোচ্ছল হাসি হাসল মা।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন দাদামশাই। মুখখানা থম্‌থমে আর রেখাকুটিল, চোখদুটো রক্তবর্ণ। দাদামশাইকে ঢুকতে দেখে একটা ঠেলা দিয়ে আমাকে সরিয়ে মা উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে বাবা, আমি কী করব? চলে যাব এখান থেকে?'

দাদামশাই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে নখ দিয়ে বরফ আঁচড়াতে লাগলেন। একটি কথাও বললেন না। আবহাওয়াটা উৎকণ্ঠায় টান হয়ে রইল। আমার মনে হতে লাগল, আমার দুই চোখ আর দুই কান বাড়তে বাড়তে সারা অবয়ব জুড়ে বসেছে। চিৎকার করার আবেগে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে বুকটা।

'লেক্সেই, তুই যা তো বাইরে।' নিস্তেজ গলায় বললেন দাদামশাই।

'কেন? ও কেন বাইরে যাবে?' আমাকে আবার নিজের দিকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল মা।

'খবরদার বল্‌ছি তুই বাইরে যাবি না!'

মা উঠে দাঁড়াল, তারপর সূর্যাস্তের লাল মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে ঘরের অপর প্রান্তে গিয়ে দাদামশাইয়ের পিছনে দাঁড়াল।

'বাবা, আমার কথাটা শোন...'

'চুপ!' তার দিকে ফিরে চেরা গলায় দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন।

'আমার সঙ্গে অমন ধমক দিয়ে কথা বলা চলবে না বলে রাখছি!' নীচু স্বরে বলল মা।

'ভারভারা!' ডিভান ছেড়ে দাঁড়িয়ে শাসানির ভঙ্গিতে আঙ্গুল নাড়তে নাড়তে দিদিমা বলে উঠলেন।

দাদামশাই একটা চেয়ারে বসে পড়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন আপন মনে:

'কী হল ব্যাপারটা, এ্যাঁ? দাঁড়াও, ভাবতে দাও আমাকে... আমি একটু ভেবে নিই... কোথা দিয়ে কি যে হচ্ছে...'

তারপরেই আহত পশুর মতো হঠাৎ প্রচণ্ড একটা হুংকার ছাড়লেন:

'আমাদের সকলের মুখে কালি দিয়েছিস তুই ভারভারা!'

'তুই যা তো এখান থেকে।' দিদিমা আমাকে বললেন। মনের মধ্যে একটা বিষণ্ণ ভার নিয়ে রান্নাঘরে চলে এলাম আমি। উঠে বসলাম চুল্লির ওপরে; সেখান থেকে পাশের ঘরের কথাবার্তা শোনা যায়। শোনা গেল, একেকবার সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠছে, আবার একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার মতো সবাই হঠাৎ চুপ করে যাচ্ছে। যতোদূর বোঝা গেল, আমার মা'র একটি বাচ্চা হয়েছে এবং বাচ্চাটিকে মা অন্য একজনের কাছে দিয়ে এসেছে--এই নিয়েই কথাবার্তা। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না, দাদামশাইয়ের মত না নিয়েই মা'র বাচ্চা হয়েছে সেজন্যে দাদামশাইয়ের রাগ, না দাদামশাইয়ের কাছে বাচ্চাটিকে মা নিয়ে আসেনি সেজন্যে দাদামশাইয়ের রাগ।

তারপর একসময়ে দাদামশাই এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে। মুখচোখ লাল হয়ে রয়েছে, এলোমেলো চেহারা, ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছেন। দাদামশাইয়ের পিছনে পিছনে এলেন দিদিমা, ব্লাউজের কোণ দিয়ে চোখের জলে ভেসে যাওয়া গাল মুছছেন। একটা বেঞ্চির ওপরে ধপ্ করে বসে পড়ে দু-হাত দিয়ে বেঞ্চির ধারটা আঁকড়ে ধরে রইলেন দাদামশাই; মুখখানা কুঁকড়ে রয়েছে, ছাইরঙের ঠোঁটটা কামড়াচ্ছেন। দাদামশাইয়ের পায়ের কাছে জানু মুড়ে বসে পড়লেন দিদিমা।

'এবারকার মতো তুমি ওকে ক্ষমা করো! যীশু খ্রীষ্টের দোহাই, একবারটি মুখ তুলে চাও! এর চেয়ে অনেক বেশি শক্ত আর মজবুত নৌকোও তো ভরাডুবি হচ্ছে! বড়োমানুষদের ঘরে কিংবা বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের বাড়িতে এসব ঘটনা কি ঘটে না? আকছার ঘটে। একবার তাকিয়ে দেখো কী সুন্দর মেয়ে সে! এবারকার মতো তোমার মেয়েকে ক্ষমা করো... দোষ কার নেই?..'

শরীরটা এলিয়ে দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন দাদামশাই, দিদিমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন:

'তা তো বটেই... ঠিক কথাই বলেছ... সত্যিই তো! তোমার আর কি,

তুমি তো হাত বাড়িয়েই বসে আছ, তোমার কাছে সবারই সব দোষ মাপ হয়ে যায়... হুঃ, কী সব মানুষ!'

তারপর দিদিমার দিকে ঝুঁকে দিদিমার কাঁধটা আঁকড়ে ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন।

'শুধু মানুষ তো নয়, ঈশ্বরও আছেন,' চাপা স্বরে বলতে লাগলেন তিনি, 'ঈশ্বরের ক্ষমা পাবার কি হবে? তিনি এত সহজে সবকিছু ক্ষমা করেন না। এই দেখ না, আমরা তো কবরের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, আর তো এই শেষ কয়েকটা দিন — কিন্তু এখনো শাস্তির ভোগ চলছে। শান্তি নেই, আনন্দ নেই, আশা-ভরসা করবার মতো কেউ নেই। ভিখিরির মতো মরতে হবে আমাদের — দেখে নিও, আমার এই কথা মিথ্যে হবে না — ভিখিরির মতো মরতে হবে আমাদের!'

দাদামশাইয়ের হাত নিজের হাতে নিয়ে তার পাশটিতে বসলেন দিদিমা, সান্ত্বনার হাসি হেসে বললেন:

'তাতে আর কী হয়েছে? ভিখিরি হওয়া যদি কপালে থাকে তো ভিখিরিই হব। ভয়ের কী আছে? তোমার কিচ্ছুটি করতে হবে না, চুপটি করে বাড়িতে বসে থেকো — আমিই ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দোরে দোরে ঘুরব। সবাই ভিক্ষে দেবে আমাকে — না খেয়ে থাকতে হবে না আমাদের। আমি যতোদিন আছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এসব কথা ভেবে মাথা গরম কোরো না!'

দাদামশাইয়ের মুখে হঠাৎ বেঁকা এক হাসি ফুটল। হঠাৎ ছাগলের মতো মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরে জোরে চেপে ধরলেন দিদিমাকে। দিদিমার হাতের মধ্যে ছোট এতটুকু দেখাতে লাগল তাঁকে। এলোমেলো উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি বলতে লাগলেন:

'তুমি সেই বোকাই রয়ে গেলে গো! নেহাতই বোকা! আবার তুমিই আমার একমাত্র ভরসা! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই! কিন্তু তোমার তো আর কোনো দিন বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না। যেটুকু আছে তা খুইয়ে বসতেও তোমার আপত্তি নেই! একবার ভাব তো, এই ছেলেমেয়েদের জন্যে কত কীই না করেছি আমরা! কত পাপ পর্যন্ত করেছি আমি! আর এই শেষ বয়সে কিছুই রইলো না, এতোটুকু টুকরোও না...'

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমার দু-গাল বেয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল, চুল্লি থেকে লাফিয়ে নেমে আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম আমি — কাঁদতে লাগলাম

এই আনন্দে যে আমার মা এসেছে, আমার দাদামশাই ও দিদিমা এমন অভাবিতপূর্ব মাধুর্য ও কোমলতায় একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদের দুঃখের ভাগ দিয়েছেন আমাকে, কারণ দুজনেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আদর করতে লাগলেন, চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেন।

'এই যে বিচ্ছু, শয়তান, তুইও আছিস এখানে!' আমার কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগলেন আমার দাদামশাই, 'এখন আর কী, তোর মা এসে গেছে, এখন কি আর আমার কাছে কোনো দরকারে আসবি? তোর এই বুড়ো শয়তান দাদামশাইকে কি আর মনে থাকবে? কী রে, ঠিক বলিনি? আর দেখিস, ওই করুণাময়ী দিদিমার কথাও ভুলে যাবি! এই দিদিমা কেবল জানে আদর দিয়ে তোর পরকাল ঝরঝরে করতে। হুঃ, কী সব মানুষ!'

আমাদের দু'জনকেই ঠেলে সরিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন:

'সবাই আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে -- সবাই এখান থেকে চলে যেতে চায়... হাঁ করে দেখছ কি, ডেকে আন না মেয়েটাকে... তাড়াতাড়ি যাও!'

দিদিমা রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেলেন আর দাদামশাই মাথা নিচু করে কোণের দিকে গিয়ে বলেন:

'পরম করুণাময় হে ঈশ্বর, দেখতে পাচ্ছ কি, আমার কী অবস্থা হয়েছে?'

তারপর নিজের বুকের উপর সশব্দে এক ঘা বসালেন। এ-ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি। শুধু এখনকার কথা নয়, দাদামশাই সাধারণত যে-ভাবে ঈশ্বরের কাছে কথা বলেন তা আমার মোটেই ভালো লাগে না। ভারি একটা দম্ভের ভাব থাকে তাঁর মধ্যে।

আমার মা ঘরে ঢুকল; তার লাল পোশাকের খুশিভরা ঝলক উঠল ঘরের মধ্যে। টেবিলের পাশে বেঞ্চটাতে একপাশে দাদামশাই ও একপাশে দিদিমাকে নিয়ে বসল মা, জামার আস্তিন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল দু-জনের কাঁধ। খুব নরম সুরে আর প্রত্যেকটি কথার ওপরে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে কথা বলল মা, দাদামশাই ও দিদিমা নির্বাক হয়ে মা'র কথা শুনলেন। মা'র পাশে দু'জনকেই এত ছোট দেখাচ্ছে যে মনে হতে লাগল আমার মা-ই হচ্ছে দাদামশাই ও দিদিমার মা আর ওঁরা দুজন তার ছেলেমেয়ে।

উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে আমি তাকের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় দাদামশাই ও দিদিমা তাঁদের সেরা পোশাক পরে

গির্জার সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিলেন। সর্দার কারিগরের পোশাকে আর রেকুনের লোমের তৈরি কোট গায়ে দিয়ে দাদামশাইয়ের চেহারার শোভা বেড়ে গিয়েছিল। একগাল হাসি নিয়ে দাদামশাইয়ের দিকে চোখ টিপে আর মা-র গায়ে কনুইয়ের একটা গুঁতো দিয়ে দিদিমা বললেন:

'দেখ্ রে, তাকিয়ে দেখ্, তোর বাবা কেমন পরিপাটি ছাগলটি সেজে বসে আছে।'

মা হো হো করে হেসে উঠল।

তারপর যখন ঘরের মধ্যে মা ও আমি ছাড়া আর কেউ রইলাম না তখন মা পা দুটো মুড়ে ডিভানের ওপরে বসে পাশের জায়গাটা হাত দিয়ে দেখিয়ে বসতে বলল আমাকে।

'আয় বোস্ এখানে। তারপর, কেমন আছিস বললি না তো? ভালো নয়, না?'

'কেমন আছি আমি? সে-কথা আমি জানি না।'

'তোর দাদামশাই কি তোকে মারে?'

'না, আজকাল আর তেমন নয়।'

'সত্যি? আচ্ছা, যা তোর মনে আসে আমাকে বলে যা।'

দাদামশাইয়ের কথা বলবার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি বলতে শুরু করলাম আমাদের সেই বাসিন্দাটির কথা। বললাম, কী চমৎকার লোক ছিল সে, আমরা এখন যে-ঘরে বসে আছি সেই ঘরেই থাকত; কেউ তাকে পছন্দ করত না, শেষ পর্যন্ত দাদামশাই তাকে উঠিয়ে দেন। মা'কে দেখে মনে হল, এই লোকটির গল্প মা'র ভালো লাগেনি। মা বলল:

'আচ্ছা, এবার অন্য কিছু বল্ শুনি।'

তখন আমি তাকে সেই তিনটি ছোট ছেলের কথা বললাম; আর বললাম, কর্নেল আমাকে কী-ভাবে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল।

শুনে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মা বলল, 'চামার, একেবারে চামার!'

তারপরেই আবার চুপ করে গেল মা। চোখদুটো কুঁচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মা, দাদামশাই তোমার ওপর এত রেগে গেছেন কেন?'

'আমারই দোষ।'

'তুমি যদি বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে তাহলে আর এমন হত না...'

আমার কথা শুনে মা চমকে উঠল। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই হো হো করে হেসে উঠে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিল আবার।

'তবে রে পাজি ছেলে! এসব কথা কক্ষণো বল্‌বিনে, বুঝেছিস্‌? একটি কথাও নয় — মুখটি বুজে থাকবি! এমন কি এসব চিন্তাও যেন আর কখনো মাথায় না আসে!'

শান্ত ও কঠোর স্বরে আরো অনেক কথা বলে গেল মা। সেগুলোর একবর্ণও আমি বুঝতে পারলাম না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চিবুকে আঙ্গুলের টোকা দিতে দিতে আর পুরু ভুরুদুটো নাচাতে নাচাতে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

টেবিলের ওপরে একটা মোমবাতি জ্বলছে। গলে গলে পড়ছে মোম। একটা আয়না থেকে ঠিকরে আসছে মোমবাতির আলো। লম্বা লম্বা বিশ্রী ছায়া পড়েছে মেঝের ওপরে। কোণের আইকনের সামনে জ্বলছে একটা প্রদীপ। চাঁদের আলোয় রুপোলী হয়ে উঠেছে তুষার ঢাকা জানলাগুলো। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মা, যেন শূন্য দেওয়াল ও সিলিং-এর মধ্যে কী একটা খুঁজছে।

'তুই শুতে যাবি কখন?'

'আরেকটু পরে!'

'তাই তো, আমার মনেই ছিল না বিকেলবেলা খানিকক্ষণ তুই ঘুমিয়েছিস।' নিজেকে মনে করিয়ে দেবার মতো করে মা বলল।

'তুমি কি এখান থেকে চলে যাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কোথায় যাব,' অবাক হয়ে মা জবাব দিল। তারপর এগিয়ে এসে আমার মুখটা তুলে ধরে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সেই স্থিরদৃষ্টির সামনে আমি কিছুতেই চোখের জল চেপে রাখতে পারলাম না।

'কাঁদছিস কেন?'

'আমার ঘাড়ে ব্যথা লাগছে।'

কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি ব্যথা লাগছে আমার বুকের মধ্যে। আমি বুঝতে পারলাম, মা'র পক্ষে এ-বাড়িতে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়; একদিন না একদিন তাকে যেতেই হবে...

মেঝের ওপর পাতা কার্পেটটা পা দিয়ে নাড়তে নাড়তে মা বলল, 'বড়ো

হলে তুই ঠিক তোর বাবার মতোই দেখতে হবি। তোর দিদিমা নিশ্চয়ই তোর কাছে তোর বাবার গল্প করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোর দিদিমা মাক্সিমকে খুব ভালোবাসত। তেমনি সেও খুব ভালোবাসত তোর দিদিমাকে...'

'আমি জানি।'

মোমবাতিটার দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মা সেটাকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল।

'এই ভালো হয়েছে।' বলল মা।

মোমবাতির আলোটুকু না থাকাতে ঘরের ভিতরটা যেন আরো স্নিগ্ধ ও আরো পরিষ্কার দেখাতে লাগল। মেঝের ওপরে সেই লম্বা লম্বা বিশ্রী ছায়াগুলো আর নেই, তার বদলে নীল চাঁদের আলোয় ঘরটা ভরে গেছে। জানলার শার্সিগুলোতে চিক্‌চিক্‌ করছে একটা রুপোলী আভা।

'আচ্ছা মা, এখানে আসবার আগে তুমি কোথায় ছিলে?'

একাধিক শহরের নাম করল আমার মা। যেন বহুদিন আগের ভুলে যাওয়া কোনো ঘটনার কথা মনে করছে এমনিভাবে বলল শহরগুলির নাম। আর সর্বক্ষণ ঘরের মধ্যে বাজপাখির মতো পাক খেতে লাগল।

'এই পোশাকটা তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'এটা আমি নিজে তৈরি করেছি। আমার নিজের সবকিছু আমি নিজেই করি।'

মা যে অন্য সকলের মতো নয়, সবার থেকে এত বেশি আলাদা, এতে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু মা এত কম কথা বলছে দেখে আমার কষ্ট হতে লাগল। আমি যদি প্রশ্ন না করি তাহলে মা একটিও কথা বলে না।

তারপর মা আবার এসে ডিভানে আমার পাশটিতে বসল। দু'জনে দু'জনকে জোরে আঁকড়ে ধরে নিঃশব্দে আমরা বসে রইলাম। একসময়ে দাদামশাই ও দিদিমা সারা গা থেকে মোম আর ধুপের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে গম্ভীর সমাহিত মুখে বাড়ি ফিরে এলেন।

সাড়ম্বরে রাত্রের আহারপর্ব শেষ হল থমথমে আবহাওয়ায়। আমরা কথা বললাম খুবই কম, যেটুকু বললাম তা এত সতর্কভাবে যেন কারও খুব পাতলা ঘুম ভেঙে যাবার আশঙ্কা আছে।

একটুও সময় নষ্ট না করে আমাকে 'পার্থিব' শিক্ষায় শিক্ষিত করে

তোলার কাজে মা উঠেপড়ে লাগল। ‘মাতৃভাষায় প্রথম পাঠ’ নামে একটা বই কিনে দিল আমাকে। কিছুদিনের মধ্যেই পার্থিব ভাষার বর্ণমালা শিখে ফেললাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মা আমাকে কবিতা মুখস্থ করাতে চাইল। আর তা করতে গিয়েই আমাদের দু'জনের পক্ষে একটা মর্মান্তিক অবস্থার সূত্রপাত হয়।

আমাকে প্রথম যে কবিতাটি মুখস্থ করতে হয়েছিল তা হচ্ছে এই:

পথখানি আঁকাবাঁকা নিঃসীম শূন্যে মিলায়,
ঘরবাড়ি খামারের পাশ দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়,
কোদাল কিম্বা গাঁইতি এ পথ তো করেনি সৃজন,
হাজারো পায়ের ছাপ এ পথেরে করে রূপায়ণ।

কবিতাটি আবৃত্তি করবার সময়ে আমার সব সময়েই কতগুলো ভুল হত। আঁকাবাঁকা না বলে বলতাম ছাঁকাছাঁকা, কোদালকে বলতাম কোটাল, পায়ের-কে বলতাম ভায়ের।

মা আমাকে শুদ্ধ করে দিত, ‘আচ্ছা, তুই একবার ভেবে দ্যাখ্ তো, রাজপথ কখনো ছাঁকাছাঁকা হয়? রাজপথকে ছাঁকাছাঁকা বললে লোকে বোক বলবে যে! ছাঁকাছাঁকা নয়! বল্ আঁকাবাঁকা, ভুলিসনে যেন।’

কথাটা আমিও বুঝতাম। কিন্তু তবুও আবৃত্তি করবার সময়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসত ‘ছাঁকাছাঁকা’, আর ভয়ে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হত।

শেষকালে রেগে গিয়ে মা একদিন বলে বসল যে আমার মাথায় কিছুু নেই আর আমি ভীষণ একগুঁয়ে। নিজের নামে এই অপবাদ শুনে ভয়ানক লাগল আমার মনে এবং আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম যাতে এই গোলমেলে লাইনগুলোকে ঠিকঠিক মনে রাখতে পারি। মনে মনে যখন আবৃত্তি করি তখন আমার একটিও ভুল হয় না, কিন্তু চেঁচিয়ে বলতে গেলেই অবধারিতভাবে শব্দগুলো গুলিয়ে ফেলি। শেষকালে এই কুহকী লাইনগুলো আমার দু-চোখের বিষ হয়ে উঠল। তারপর থেকে আমি ইচ্ছে করে শব্দের সঙ্গে শব্দের মিল দিয়ে দিয়ে লাইনগুলোকে বিকৃত করতে লাগলাম। আর লাইনগুলো যতোই কিম্ভূতকিমাকার অর্থহীন হয়ে উঠতে লাগল ততোই আনন্দ হতে লাগল আমার।

কিন্তু এই আনন্দ আমার কাছে শেল হয়ে উঠেছিল। একদিন মা'র কাছে পড়া দিচ্ছিলাম, কোথাও একটিও ভুল করিনি, এমন সময়ে মা আমাকে

কবিতাটা আবৃত্তি করতে বলল। তখন নিজের আপ্রাণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মুখ থেকে যে কবিতাটা বেরিয়ে এল তা হচ্ছে এই:

রাজপথ, গাছপথ, রথ নথ ঘর্ঘর
শাবল ধর্, মাদল ধর্, বাদল বাকল মর্মর...

ব্যাপারটা যে কী ঘটছে তা আমি বুঝতে পারলাম খুবই দেরিতে। টেবিলের ওপর দু-হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল মা, তারপর প্রত্যেকটি কথার ওপর জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'এটা তুমি কোত্থেকে শিখেছ?'

আমার তো এদিকে হৃৎকম্প শুরু হয়েছে, বললাম, 'জানি না।'

'তবুও বলো আমাকে!'

'এই এমনি বললাম।'

'কী এমনি বললে?'

'এই একটু মজা করবার জন্যে।'

'যাও, কোণে গিয়ে দাঁড়াও।'

'কী জন্যে?'

'কোণে যাও বলছি!' মা প্রচন্ড একটা ধমক দিল।

'কোন্ কোণে?'

এবার আর মা কোনো জবাব দিল না। কিন্তু এমন একটা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যে আমার আর জ্ঞানবুদ্ধি বলতে কিছু রইল না। আমি কি করতে চলেছি বা মা আমাকে কি করতে বলছে, এসব চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল একেবারে। আইকনের নীচের কোণে রয়েছে একটা গোল টেবিল; টেবিলের ওপরে ফুলদানিতে মিষ্টিগন্ধওলা কতকগুলো শুক্নো ফুল আর ঘাস। আরেকটা কোণে রয়েছে একটা গালিচাঢাকা ট্রাঙ্ক। তৃতীয় কোণে বিছানা আর চতুর্থ কোণে দরজা।

'মা, তুমি আমাকে কি করতে বলছ তা আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না।' ব্যাপারটা বুঝতে পারার জন্যে মরিয়া হয়ে আমি বললাম।

মা একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে নিঃশব্দে কপাল আর গাল ঘষতে লাগল।

'তোমার দাদামশাই কি কোনো দিন তোমাকে কোণে দাঁড় করিয়ে রাখেনি?'

'কবে?'

'যবেই হোক্, দাঁড় করিয়েছে কিনা?' টেবিলের ওপরে দু-বার ঘুষি মেরে অধৈর্যের সঙ্গে মা চেঁচিয়ে উঠল।

'কই, আমার তো মনে পড়ছে না।'

'কোণে দাঁড়িয়ে থাকা যে একটা শাস্তি তাও তুমি জান না?'

'না। কেন, এটা শাস্তি কেন?'

'পোড়া কপাল আমার!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলল, 'আচ্ছা, এদিকে আয় দেখি।'

মা'র কাছে এসে আমি বললাম, 'তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ কেন মা?'

'একটা কবিতা ঠিক করে বলতে পারিস না? কেন তুই ইচ্ছে করে বারবার গুলিয়ে ফেলিস!'

আমি মাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম যে চোখ বুজে মনে মনে বললে আমি কবিতাটি যেমন লেখা আছে বলতে পারি কিন্তু চেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করলেই অন্য নানারকম শব্দ এসে পড়ে।

'ঠিক বলছিস তো? বানিয়ে বলছিস না?'

আমি বললাম বানিয়ে বলছি না। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা চিন্তা এল: ঠিক কথা বললাম তো? তারপর হঠাৎ আরেকবার একটু সময় নিয়ে চেষ্টা করতেই কবিতাটি আমার মুখ থেকে নির্ভুলভাবে বেরিয়ে এল। শুনে আমি নিজেই অবাক ও অভিভূত হলাম।

নিজেই বুঝতে পারলাম, আমার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, কানদুটো জ্বলছে। মা'র সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জায় আমি মরে যেতে লাগলাম। চোখের জলে ঝাপ্সা দৃষ্টি দিয়েই দেখতে পেলাম, আমার মা'র মুখটা হতাশায় কালো হয়ে গেছে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তাকিয়ে আছে ভুরু নামিয়ে।

'এবার কি হল?' অদ্ভুত স্বরে মা জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, তুমি সত্যি সত্যিই বানিয়ে বলছিলে!'

'কী জানি। আমি অনিচ্ছায়...'

মাথা নিচু করে মা বলল, 'তোর সঙ্গে পেরে ওঠা যার-তার কর্ম নয়! আচ্ছা, যা তুই।'

তারপর দিনের পর দিন মা আমাকে আরো অনেক কবিতা মুখস্থ করাল। কিন্তু কবিতাগুলোকে কিছুতেই মনের মধ্যে গেঁথে নিতে পারি না।

কবিতার লাইনগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে এবং নতুন নতুন শব্দ বানিয়ে লাইনগুলোকে বিকৃত করে তোলার বদ ইচ্ছেটা ভয়ানকভাবে আমাকে পেয়ে বসে। এজন্যে আমাকে একটুও ভাবনাচিন্তা করতে হয় না, বিদ্‌কুটে শব্দগুলো আপনা থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আমার মন জুড়ে বসে। এই শব্দগুলো এসে কবিতার আসল শব্দগুলোকে হটিয়ে দেয়। প্রায়ই এমন হয় যে কবিতার গোটা একেকটা লাইন মন থেকে মুছে যায় একেবারে, হাজার চেষ্টা করেও তা আর মনে করতে পারি না। মনে আছে, একবার একটি কবিতা — প্রিন্স ভিয়াজেম্‌স্কির লেখা — আমার শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল। কবিতাটি হচ্ছে এই:

পাখী-ডাকা ভোর থেকে, রাতের গভীরে,
বুড়ো-বুড়ি, বিধবা আর অনাথার দল
এক মুঠি অন্ন লাগি ফেলে অশ্রুজল।

এই কবিতার তৃতীয় লাইনটি আমার কিছুতেই মনে থাকে না, আবৃত্তি করবার সময়ে সব সময়েই বাদ দিয়ে যাই। লাইনটি হচ্ছে এই:

হাত পেতে ভিখ্‌ মাগে অসহায় সুবে

শেষ পর্যন্ত মা আমার ওপরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে দাদামশাইয়ের কাছে গিয়ে আমার এই এলোমেলো স্মৃতিশক্তির কথা বলল।

দাদামশাই বললেন, 'ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে, এই আর কি! ওর স্মৃতিশক্তিতে কোনো গোলমাল নেই। প্রার্থনাগুলো আমার যতোটা না মনে থাকে তার চেয়েও ওর অনেক বেশি মনে থাকে। ওর স্মৃতিশক্তিটা হচ্ছে ঠিক একটা পাথরের মতো — একবার কোনো একটা জিনিস দাগ কাটলে চিরকাল থেকে যায়। ওকে একবার উত্তম-মধ্যম দেওয়া দরকার।'

দিদিমাও এই মতের সঙ্গে সায় দিলেন।

'রূপকথার গল্প আর গান তো ও কখনো ভোলে না। আর গান ও কবিতা তো একই জিনিস।'

এসবই সত্যি কথা। আমি অনুভব করলাম যে আমারই দোষ। কিন্তু যেই আবার কবিতা মুখস্থ করতে যাই অমনি নানা নতুন শব্দ আরশোলার মতো গুটিগুটি এসে ভিড় করে সারি দিয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের সদরে রাত্রি আর দিন
খোঁড়া কানা ভিখিরি অতি দীনহীন।
ভিখ্ মাগে বারবার বোবা কান্না কাঁদে
ভিখ্ নিয়ে চলে যায় পেত্রভ্নার ফাঁদে।
পেত্রভনার গোয়ালেতে বহু গোরুগাই
পয়সা দিয়ে নগদ দামে কিনে নেয় সে তাই।
তারপর চলে মদ, চলে হুটোপুটি —
মদের নেশায় তারা করে লুটোপুটি।

রাত্রিবেলা দিদিমার পাশটিতে শুয়ে শুয়ে আমি তাঁর কাছে আমার বইয়ের পড়া আর আমার বানানো কবিতাগুলো বলে যাই। মাঝে মাঝে তিনি হেসে ওঠেন কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তিনি আমাকে তিরস্কার করে বলেন:

'এই দ্যাখ্, ইচ্ছে করলে তুই কী না পারিস! কিন্তু এভাবে ভিখিরিদের নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করে কবিতা বানানোটা ঠিক নয়। যীশু খ্রীষ্টও ভিখিরি ছিলেন। সাধুমহাত্মারা সকলেই তাই।'

আমি নিজের মনে কবিতা আবৃত্তি করে জবাব দিই:

ভিখিরিকে আমি
দু-চোখে দেখতে পারি না
তেমনি পারি না দু-চোখে দেখতে
দাদামশাইকে।
তাই ভগবানের কাছে বলি
আমার আর ক্ষমতা কী
বলে দাও আমাকে
কী করলে পরে
আমার ভাগ্যকে আর দাদামশাইয়ের বেতকে
দেখাতে পারি অপক্ব কদলী।

দিদিমা বলে ওঠেন, 'তোর জিভ খসে পড়বে যে পাজি ছেলে! তোর দাদামশাই শুনলে আর আস্ত রাখবে না।'

'শুনুক গে!'

তারপর একসময়ে হয়তো আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে দিদিমা বলেন, 'হ্যাঁ রে, তোর মা'কে তুই এত জ্বালাতন করিস কেন রে? এমনিতেই

তোর মা'র জ্বলুনি-পুড়ুনির শেষ নেই—তার ওপরে তোকে নিয়ে যদি এতটা ভুগতে হয় তাহলে কি করে বাঁচবে বল্ তো!'

'কেন, জ্বলুনি-পুড়ুনি কেন?'

'চুপ কর্ হতভাগা ছোঁড়া! সব ব্যাপার নিয়ে তোর মাথা না ঘামালেও চলবে!'

'আমি জানি দাদামশাইয়ের জন্যেই...'

'ফের কথা বল্‌ছিস!'

ভারি বিশ্রী লাগতে লাগল আমার। এত বিশ্রী যে প্রায় একটা হতাশা এসে পড়ে। তবু জানি না কেন, আমার এই মনোভাব মা'র চোখ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই। তখন আমি আরো দুর্বিনীত ও আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠি। আমার মা'র আমাকে লেখাপড়া শেখানোর বহরটা যেমন বেড়ে যায় তেমনি লেখাপড়া ব্যাপারটাও আরো শক্ত হয়ে ওঠে। অংকটা নিয়ে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয় না, কিন্তু হাতের লেখা শেখাটা আমার পক্ষে একটা অসহ্য ব্যাপার, আর ব্যাকরণ আমি বুঝতে পারি না। আমি টের পাই, আমার দাদামশাইয়ের এই বাড়িতে মা'র জীবনটা একেবারেই সুখের নয় এবং এই চিন্তাটা অন্য সবকিছুকে চাপা দিয়ে আমার মনের ওপর একটা ভার হয়ে চেপে বসে থাকে। যতো দিন যায় মা ততোই মনমরা হয়ে ওঠে। সবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, বাগানের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানলায় বসে থাকে, আর দিন-দিন কেমন যেন শুকিয়ে যায়। এখানে আসার পরে কিছুদিন পর্যন্ত আমার মা ছিল প্রাণের আনন্দে ভরপুর আর সদাচঞ্চল। কিন্তু এখন তার চোখের চারদিকে কালো দাগ পড়েছে, চেহারার দিকে আর আগেকার মতো নজর নেই, চুল না আঁচড়ে একটা বোতামছেঁড়া দুমড়ানো মুচ্‌ড়ানো ব্লাউজ পরে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। মা'কে এমন বিশ্রী চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে ভারি খারাপ লাগে আমার। মা থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে, মা হবে এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ।

আমাকে পড়াতে বসে মা অন্যমনস্ক হয়ে দেওয়ালের দিকে বা জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন করে ক্লান্ত স্বরে আর আমি যে জবাব দিই তা শুনতে ভুলে যায়। আর মা'র মেজাজটা ভারি তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে, কারণে অকারণে আমাকে ধমক দেয়। এটাও আমাকে আঘাত দিত: মা হবে অন্যদের চেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণা, রূপকথার গল্পের মায়েদের মতো।

মাঝে মাঝে আমি মাকে বলতাম:

'মা, তোমার কি আমাদের সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে না?'

'নিজের চরকায় তেল দে।' ধমকের সুরে মা বলত।

আমি আরও টের পেলাম, দাদামশাই এমন একটা কিছু করতে চলেছেন যা আমার দিদিমাকে ও মা'কে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। প্রায়ই দেখি, দাদামশাই মা'র ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেন আর তারপর শোনা যায় রাখাল-ছেলে নিকানোরের বিরক্তিকর কাঠের বাঁশিটার কিচকিচানির মতো দাদামশাইয়ের ফোঁসানি। একদিন তো আমার মা এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে বাড়ির সব জায়গা থেকে শোনা গেল সেই কথাগুলো:

'না, কক্ষণো না, না, না, না!'

তারপরেই ঠাস্ করে কপাটের আওয়াজ ও দাদামশাইয়ের হুঙ্কার।

ঘটনাটা ঘটেছিল সন্ধ্যেবেলা। দিদিমা রান্নাঘরে বসে দাদামশাইয়ের জন্যে একটা শার্ট সেলাই করছিলেন। সেলাই করতে করতে আপন মনে বিড়বিড় করে বলছিলেন কি যেন। ঠাস্ করে কপাটের শব্দ হতেই দিদিমা কান পেতে শুনলেন, আর তারপর বললেন:

'হা ভগবান! মেয়েটা ভাড়াটেদের ঘরে গেল!'

হঠাৎ দাদামশাই রান্নাঘরে ছুটে এসে দিদিমার মাথায় ঘা কতক লাগিয়ে দিলেন। তারপর নিজের ব্যথা-পাওয়া হাতটায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন দাঁতে দাঁত চেপে:

'বুড়ী ডাইনী! তোর পেটে কথা থাকে না কেন?'

মাথার টুপি ঠিক করতে করতে শান্ত স্বরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'জেনে রাখ, তুমিও একটি আস্ত বোকা! ভাব কি আমাকে? তোমার ভয়ে মুখ বুজে থাকব? এই তোমাকে বলে রাখছি, তোমার মতলব যেটুকু আমি টের পাব তা ওর কাছে গোপন রাখব না...'

একথা শুনে দাদামশাই দিদিমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দিদিমার মাথায় সমানে ঘুষি মারতে লাগলেন। দিদিমা বাধা দিলেন না, শুধু বলতে লাগলেন:

'মারো, মারো, বোকা বুড়ো যতো খুশি মারো।'

আমি বসেছিলাম তাকের ওপরে। সেখান থেকে দাদামশাইকে লক্ষ্য করে বালিশ, কম্বল আর জুতো ছুঁড়তে লাগলাম। কিন্তু দাদামশাই রাগে আমার দিকে দৃকপাত করলেন না। দিদিমা পড়ে গেলেন মেঝের ওপরে আর দিদিমার মাথায় সমানে লাথি মারতে লাগলেন দাদামশাই। শেষকালে টাল্ সামলাতে

না পেরে জলের একটা পাত্র উল্‌টে দিয়ে নিজেই পড়ে গেলেন চিৎপটাং হয়ে; লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বুনো দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে মুখ থেকে থুতু ছিটিয়ে ফুঁসতে লাগলেন। তারপরেই রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে গেলেন ওপরে নিজের ঘরে। যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে উঠে বেঞ্চটার ওপরে বসলেন দিদিমা; মাথার চুলের জট্ ছাড়াতে লাগলেন। তাক থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এলাম আমি।

রাগের সঙ্গে দিদিমা বললেন, 'নে খুব হয়েছে! এবার এই বালিশ আর অন্য সব জিনিস তুলে ঠিক জায়গায় রেখে দে। বালিশ ছুঁড়ে ছুঁড়ে খুব বীরত্ব দেখানো হয়েছে! আচ্ছা তুই কেন সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসিস? আর এই বুড়ো শয়তানটাও হয়েছে তেমনি। যখন তখন মাথা গরম করে বসে!'

হঠাৎ দিদিমার মুখ থেকে ছোট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। ভুরু কুঁচকে আমাকে কাছে ডেকে তিনি বললেন, 'দ্যাখ্ তো, এ-জায়গাটা ব্যথা করছে কেন?'

দিদিমার মাথার ভারি চুলের গোছা সরাতেই আমার চোখে পড়ল, একটা চুলের কাঁটা দিদিমার মাথার চামড়ায় ঢুকে গেছে। কাঁটাটাকে আমি টেনে তুললাম। তখন চোখে পড়ল, আরেকটি কাঁটাও তেমনিভাবে ঢুকে আছে। আমার হাতের আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেল।

বললাম, 'আমি বরং মা'কে ডেকে আনি। আমার ভয় করছে।'

হাতটাকে ঝাঁকিয়ে দিদিমা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'কী বললি—"মা'কে ডেকে আনি।" ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এটা সে দেখতে বা শুনতে পায়নি! আর তুই কিনা তাকে ডেকে আনতে চাইছিস! যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে!'

লেস্ বোনার দক্ষ আঙুল দিয়ে মাথার সেই রাশি রাশি কালো চুলের গোছার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে দিদিমা খুঁজতে লাগলেন আর কোথায় কোথায় চুলের কাঁটা মাথার চামড়ার মধ্যে বসে গেছে। আমার সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে হাত চালিয়ে আমি আরো দুটো চুলের কাঁটা টেনে তুললাম।

'ব্যথা লাগে?'

'এমন কিছু নয়। দেখিস না, কাল আচ্ছা করে গরম জলে স্নান করব আর সমস্ত ব্যথা চলে যাবে!' তারপর আদরের সুরে তিনি আমাকে বলতে

লাগলেন, 'সোনা আমার, মাণিক আমার, তোর মা'কে গিয়ে আবার বলিসনে যেন যে দাদামশাই আমাকে মেরেছে। এমনিতেই দু'জনে দু'জনের ওপরে রেগে আছে—বুঝলি না? বলবি না তো, কেমন?'

'না, বলব না।'

'বাঃ, এই তো চাই! ভুলে যাসনে যেন! আচ্ছা এবার এদিকটা একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া যাক্। দ্যাখ্ তো, আমার মুখে কোনো চিহ্ন আছে কিনা? নেই? খুব ভালো। বাস্, আর কোনো গোলমাল নেই। একেবারে ডেজি ফুলের মতো নিষ্কলঙ্ক।'

বলেই তিনি মেঝে মুছতে শুরু করলেন। গভীর আবেগের সঙ্গে আমি বললাম:

'দিদিমা তুমি ঠিক ঋষির মতো। তোমাকে মারে, তোমার ওপর অত্যাচার করে—কিন্তু তুমি নির্বিকার, কক্ষণো শোধ তুলতে চেষ্টা করো না!'

'দূর! দূর! বাজে বকিসনে! আমি হলাম গিয়ে ঋষি! আচ্ছা লোককে ঋষি বানিয়েছিস যা হোক্!'

বিড়বিড় করে বকতে বকতে দিদিমা উবু হয়ে ঘর মুছতে লাগলেন। আর দরজার কাছে সিঁড়িতে বসে আমি জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম, যে করে হোক্ দাদামশাইয়ের কৃতকর্মের শোধ তুলতে হবে।

আমার সামনেই দিদিমাকে এভাবে মারপিট করা দাদামশাইয়ের এই প্রথম। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেও আমি যেন দেখতে পেলাম, তাঁর লাল মুখটা চোখের সামনে ভেসে আছে আর তাঁর মাথার লাল চুলগুলো উড়ছে। প্রচণ্ড রাগে আমার বুকের ভিতরটা জ্বলছিল আর কি করলে যে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হয় সেটা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

দু-দিন পরে ওপরের তলায় দাদামশাইয়ের ঘরে ঢুকে দেখলাম, একটা খোলা সিন্দুকের সামনে মেঝের ওপরে বসে দাদামশাই কতকগুলো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। পাশেই একটা চেয়ারে পড়ে আছে তাঁর অতি প্রিয় সাধু-মহাত্মাদের চিত্রসম্বলিত পাঁজিটা। পুরু মোটা ছাইরঙা কাগজ, বারো মাসের জন্যে বারোটি। প্রত্যেকটি কাগজে মাসের দিনগুলোর জন্যে চৌকো চৌকো ঘর কাটা; আর এই ঘরগুলোতে সাধু-মহাত্মাদের ছবি। এই পাঁজিটাকে দাদামশাই মূল্যবান সম্পত্তি বলে মনে করেন। ক্বচিৎ কখনো যদি আমার ওপরে বিশেষ রকমের খুশি হবার কোনো কারণ ঘটে একমাত্র তাহলেই তিনি আমাকে এই পাঁজিটা দেখতে দেন। পাঁজির সেই ছোট ছোট বুড়োটে

ছবিগুলো দেখে আমার ভারি ভালো লাগে আর তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত একটা আবেগ আসে আমার মনে। এই সাধু-মহাত্মাদের কয়েকজনের জীবনীও আমি জানি; যেমন, কিরিক ও উলিতা, শহীদ ভারভারা, পানতেলেইমোন্ এবং আরো অনেকে। বিশেষ করে ঈশ্বরানুগত আলেক্সেইয়ের করুণ জীবনী আমাকে বিচলিত করে; আমার দিদিমা তাঁর সম্পর্কে চমৎকার চমৎকার সব ছড়া বলেন আর তা শুনে গভীর আবেগে আমি অভিভূত হই। পাঁজির কয়েকশো সাধু-মহাত্মার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গভীর একটা সান্ত্বনা আসে মনের মধ্যে; এই উপলব্ধি হয় যে পৃথিবীতে কোনো কালেই শহীদের অভাব হয়নি।

কিন্তু সেদিন আমি স্থির করলাম যে এই পাঁজিটাকে কেটে টুক্রো টুক্রো করে ফেলব। ঈগলপাখির শীলমোহর দেওয়া একটা নীল কাগজ ভালো করে পড়বার জন্যে দাদামশাই জানলার কাছে উঠে যেতেই আমি এক থাবায় পাঁজির কতকগুলো পাতা মুঠো করে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে চলে এলাম। তারপর দিদিমার টেবিল থেকে কাঁচিটা তুলে নিয়ে সটান চলে এলাম চুল্লির ওপরে এবং সাধু-মহাত্মাদের মাথাগুলো কাটতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু একটি সারির সবকটি মাথা কাটবার পরেই ছবিগুলোকে দেখে আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। তখন মাথা না কেটে আমি শুধু দাগ বরাবর কাঁচি চালিয়ে যেতে লাগলাম অর্থাৎ কাগজগুলোকে কাটলাম চৌকো চৌকো ঘরের দাগ বরাবর। কিন্তু প্রথম সারি শেষ করে দ্বিতীয় সারিতে কাঁচি চালাবার আগেই আমার দাদামশাইয়ের মূর্তি ভেসে উঠল দরজার সামনে।

'কার হুকুমে এই পাঁজিটা নিয়ে এসেছ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

হঠাৎ তাকের ওপরে ছড়ানো চৌকো চৌকো কাগজের টুক্রোগুলোর দিকে নজর পড়ল তাঁর। হাতের মুঠিতে কাগজগুলোকে তুলে নিলেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন টুক্রোগুলোর দিকে; একমুঠি শেষ হলে, আরেক মুঠি। আর তারপর যখন বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কী ঘটেছে তখন তাঁর মুখটা হাঁ হয়ে গেল, দাড়ি কাঁপতে লাগল, এত জোরে নিশ্বাস ফেললেন যে উড়তে লাগল কাগজের টুক্রোগুলো।

'এ কী করেছিস তুই?' শেষ পর্যন্ত তাঁর গলা দিয়ে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। কথাটা বলেই তিনি আমার পা ধরে এক হ্যাঁচ্কা টান মারলেন। শূন্যে ডিগ্বাজি খেয়ে আমি পড়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু দিদিমা ধরে ফেললেন আমাকে।

'তোকে আমি খুন করব!' চেরা গলায় চিৎকার করতে করতে আমার ও দিদিমার দু'জনের মাথাতেই সমানে ঘুষি চালাতে লাগলেন দাদামশাই।

হঠাৎ আমার মা এসে হাজির হল। দেখলাম, আমি একটা কোণে দাঁড়িয়ে আছি আর মা রয়েছে ঠিক আমার সামনেটিতে।

দাদামশাইয়ের ঘুষিগুলোকে হাত দিয়ে ঠেকিয়ে মা চেঁচিয়ে উঠল, 'এসব কী পাগলামি হচ্ছে! মাথাটা একটু ঠান্ডা করো!'

জানলার পাশে বেঞ্চটিতে ধপ্ করে বসে পড়ে দাদামশাই কান্নার সুরে বলে উঠলেন, 'আমার সর্বনাশ হয়েছে! সবাই আমার শত্রু! বাড়িশুদ্ধ সবাই!'

মা'র চাপা গলার স্বর শোনা গেল, 'এমন হৈচৈ কান্ড বাধিয়ে তুলতে তোমার লজ্জা করে না!'

দাদামশাই একটা হুঙ্কার ছেড়ে লাথি ছুঁড়লেন। চোখদুটো শক্তভাবে বোজা, আর মুখের দাড়ি অতি অদ্ভুত ভঙ্গিতে সিলিং-এর দিকে উঁচিয়ে আছে। আমার মনে হতে লাগল, মা'র সামনে এমন একটা হৈচৈ কান্ড বাধিয়ে তোলবার জন্যে দাদামশাই বোধ হয় সত্যিই লজ্জিত আর সেজন্যেই চোখ বুজে আছেন।

পাঁজির কাগজগুলোকে হাত দিয়ে সমান করতে করতে মা বলল, 'এই টুকরোগুলো ক্যালিকোর ওপরে আঠা দিয়ে সেঁটে দেব'খন। তখন দেখো, পাঁজিটা আরো অনেক সুন্দর দেখাবে, আরো অনেক মজবুত হবে। এই দেখ না, কাগজগুলো তো এমনিতেই পুরানো হয়ে খসে খসে পড়ছে।'

পড়তে বসে আমি যদি কোনো একটা জিনিস না বুঝতে পারি তাহলে মা যেমনভাবে আমাকে সেটা বুঝিয়ে দেয় ঠিক তেমনিভাবেই এখন কথা বলছে মা। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন দাদামশাই, বেশ ভারিক্কী চালে জামা ও কোট সমান করে নিয়ে গলাটা কেশে পরিষ্কার করে বললেন:

'আচ্ছা বেশ, কিন্তু কাগজগুলো যেন আজকের মধ্যেই সাঁটা হয়। পাঁজির বাকি কাগজগুলো আমি এনে দিচ্ছি।'

দরজা দিয়ে বাইরে যেতে যেতে হঠাৎ চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'তবু ছেলেটাকে একবার আচ্ছা করে পিটুনি দেওয়া দরকার!' বলে বিকৃত আঙ্গুল তুলে ধরলেন আমার দিকে।

'হ্যাঁ, তাই দরকার।' সায় দিল মা তারপর আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, তোর কি কান্ডজ্ঞান নেই?'

'আমি ইচ্ছে করেই একাজ করেছি। আর দাদামশাই যদি আবার কোনো

দিন দিদিমাকে মারে তাহলে আমি দাদামশাইয়ের দাড়ি কেটে ফেলব!'

দিদিমা গা থেকে ছেঁড়া ব্লাউজটা খুলে ফেলবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমার কথা শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে থু থু করে মনের বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'এই তোর কারও কাছে না বলা! এই তোর কথা রাখা! তোর জিভ ফুলে ঢোল হয়ে উঠুক, ওই জিভ নেড়ে কাউকে যেন আর কোনো দিন কোনো কথা না বলতে হয়!'

দিদিমার দিকে একবার তাকিয়ে মা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কবে মেরেছে রে?'

'হ্যাঁ রে ভারভারা, তুইও কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিস? ওকে জিজ্ঞেস করছিস এসব কথা? এতসব জেনে তোর কী দরকার বাপু!' ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন দিদিমা।

আবেগের সঙ্গে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মা বলে উঠল, 'মা আমার, মা-মণি আমার!'

'থাক্, থাক্, খুব হয়েছে! মা-মণি না আরো কিছু! ছাড়্, আমি যাই...'

দু'জনে দু'জনের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর দূরে সরে বসল। ওদিকে বাইরের ঘর থেকে দাদামশাইয়ের পায়চারির শব্দ ভেসে আসছে।

এখানে আসার প্রথম কয়েক দিন থেকেই ফৌজী লোকটির হাসি-খুশি বৌয়ের সঙ্গে মা'র খুব ভাব। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় মা এই বৌটির ঘরে যায়। বেৎলেংদের বাড়ির লোকেরাও সেখানে আসে — সুন্দর সুন্দর চেহারার তরুণী আর জোয়ান চেহারার অফিসার। আমার দাদামশাই এ-ব্যাপারটা খুব পছন্দ করেন না। প্রায়ই রাত্রিবেলা খেতে বসে হাতের চামচটা সেই বিশেষ ঘরের দিকে উঁচিয়ে নাড়তে নাড়তে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন:

'আবার সেই খাওয়াদাওয়া আর ফুর্তি শুরু হয়েছে, বাস, আজ রাত্রে ঘুমের দফা শেষ। চুলোয় যাক।'

কিছুদিন না যেতেই তিনি সমস্ত ভাড়াটেকে উঠে যেতে বললেন। ভাড়াটেরা চলে যেতেই দু-গাড়ি বোঝাই আজেবাজে আসবাব নিয়ে এলেন কোত্থেকে যেন। শূন্য কামরাগুলোতে আসবাব বোঝাই করে বড় তালা লাগিয়ে দিলেন দরজায়।

'দরকার নেই আমার এমন ভাড়াটে দিয়ে। এবার থেকে আমি নিজেই লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করব।'

তারপর থেকে প্রতি রবিবার এই নিমন্ত্রিতজনের আবির্ভাব হতে লাগল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন হচ্ছেন দিদিমার বোন মাত্রিওনা ইভানোভনা। এই হৈ-চৈ-করা ধোবানীর নাকটি প্রকাণ্ড, ডোরাকাটা সিল্কের পোশাক পরেন, সোনালী রঙের টুপি জড়ান মাথায়। তাঁর সঙ্গে আসে তাঁর দুই ছেলে। একজনের নাম ভাসিলি, নক্‌শা আঁকার কাজ করে, পরনে ছাইরঙা পোশাক আর লম্বা চুল — হাসিখুশি খোশমেজাজী ধরনের মানুষ। অপরজন ভিক্টর, ঘোড়ার মতো মাথা, বসন্তের দাগওলা লম্বাটে মুখ। সদরে ঢুকে যখন সে পায়ের জুতো থেকে রবারের ওভারশু খোলে তখনই শোনা যায় ক্লাউনের মতো পিন্‌পিনে গলায় সে একটা সুর ভাজছে:

'আন্দ্রেই-বাবা, আন্দ্রেই-বাবা...'

শুনে আমি অবাক ও আতঙ্কিত হই।

ইয়াকভ-মামা তার গীটার নিয়ে আসে। আর একজনও আসে তার সঙ্গে। ঘড়ি মেরামতের ব্যবসা লোকটির, টাক-মাথা, একচোখ কাণা। ভারি চুপচাপ লোকটি, পরনে লম্বা কালো কোটটার জন্যে তাকে মনে হয় যেন মঠের সন্ন্যাসী। ঘরের এক কোণে তার বাঁধা জায়গা; পরিষ্কার ভাবে কামানো চেরা চিবুকের ভর একটা আঙ্গুলের ওপর দিয়ে মাথাটা একদিকে কাত করে হাসিমুখে বসে থাকে সে। তার রংটা কালো, একচোখের তীব্র ও ধারালো দৃষ্টিতে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কথাবার্তা বলে খুবই কম আর একটি কথাই অনবরত তার মুখে শোনা যায়:

'সব ঠিক হয়ে যাবে — ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই...'

প্রথম দিন তাকে দেখে হঠাৎ আমার অনেক দিন আগেকার (তখনো আমরা নোভায়া স্ট্রীট' থেকে উঠে আসিনি) একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একদিন শুনলাম রাস্তার দিকে ড্রাম বাজছে। সেই বাজনার মধ্যে যেন একটা অশুভ বার্তা প্রচ্ছন্ন ছিল। বাইরে এসে দেখলাম, প্রকাণ্ড একটা কালো গাড়ি ঘিরে একদল সৈন্য ও লোকজনের ভীড় চলেছে। কয়েদীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জেলখানা থেকে ময়দানে। গাড়ির ভিতরে বেঞ্চির ওপরে গোল টুপি মাথায় একটি লোক বসেছিল। দু-হাত ও পায়ে শেকলে বাঁধা, আর শরীরের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে সেই শেকল ঝন্‌ ঝন্‌ করে বেজে উঠছে। কালো একটা বোর্ড ঝুলছে তার গলা থেকে, বোর্ডটার ওপরে গোটা গোটা সাদা অক্ষরে কী যেন লেখা। লোকটির মাথা বুকের ওপরে এমনভাবে ঝুলে পড়েছে যেন সে পড়বার চেষ্টা করছে এই লেখাগুলো। ঘড়িওলাটির সঙ্গে আমার পরিচয়

14- 725

করিয়ে দিয়ে মা যখন বলল, 'আমার ছেলে,' তখন শ্নে পিঠের দিকে হাত ঢেকে ভয়ে আমি দ্-পা পিছিয়ে এলাম।

একটা আতঙ্কজনক ভঙ্গিতে ম্খের হাঁ-টা ডান কান পর্যন্ত প্রসারিত করে লোকটি বলল, 'ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।' তারপর আমার কোমরের বেল্ট ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে দক্ষ জহ্রীর মতো পাকা হাতে আমাকে ঘ্রিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

'নাঃ ঠিক আছে! ডাঁটো ছেলে!' তারিফের স্রে এই মন্তব্য করে ছেড়ে দিল আমাকে।

আমি গিয়ে বসলাম একটা চামড়ার আর্মচেয়ারে। চেয়ারটা এত প্রকাণ্ড যে তার মধ্যে অনায়াসে ঘ্মিয়ে থাকা যায়। দাদামশাই সব সময়েই জাঁক করে বলেন যে এটা নাকি প্রিন্স গ্রুজিন্‌স্কির চেয়ার। কোণের সেই চেয়ারটাতে বসে বসে আমি দেখতে লাগলাম, একটুখানি ফুর্তি করবার জন্যে বড়োদের কী পরিমাণ চেষ্টাই না করতে হয়, আর সেই ঘড়িওলার অদ্ভুত ও সন্দিগ্ধ ম্খের ভাব ম্হূর্তে ম্হূর্তে কি ভাবে বদ্‌লে যাচ্ছে। ম্খটা তার তেলতেলে; থলথলে একটা জিনিস যেন গলে গলে পড়ছে। যখন সে হাসে তার প্র্ ঠোঁটদ্টো ডানদিকে সরে যায় আর ঝোলের মধ্যে মাংসের টুক্‌রোর মতো ছোট নাকটা টলটল করতে থাকে। কুলোর মতো প্রকাণ্ড কানদ্টোও অদ্ভুতভাবে নড়ে। কখনো ওপরে ওঠে একচক্ষ্ ভুর্টা উঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, কখনো পিছনে চলে আসে চোয়ালের হাড়ের দিকে। আমার মনে হতে লাগল, ইচ্ছে হলে ঠিক দ্টো হাতের মতো এই কানদ্টোকেও সে নাকের ওপর দিয়ে ভাঁজ করে রাখতে পারে। মাঝে মাঝে ম্ষলের মতো গোল গাঢ়রঙের জিভটা বার করে চক্রাকারে ঘ্রিয়ে নিয়ে তেলতেলে প্র্ ঠোঁটদ্টো ভিজিয়ে নেয়। দেখেশ্নে আমার যতোটা না মজা লাগতে লাগল তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম। এবং কিছ্তেই লোকটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলাম না।

অতিথিরা রম্‌-সহযোগে চা খেল। পোড়া পেঁয়াজের মতো গন্ধ বেরোচ্ছিল পানীয়টা থেকে। দিদিমা বাড়িতে যে-সব মদ তৈরি করেছেন তাও খেল অতিথিরা। তার কোনোটা সোনালী, কোনোটা সব্জ, আবার কোনোটা আলকাতরার মতো কালো। আহার্যের মধ্যে ছিল রসানো 'ভারেনেৎস্‌', মধ্ আর পোস্তদানা দিয়ে তৈরি কেক্‌। অতিথিরা ফুলতে লাগল, ঘামতে লাগল আর আমার দিদিমার স্খ্যাতি করে চলল। তারপর এক পেট খেয়ে, ম্খ

লাল করে প্রফুল্ল হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ইয়াকভ-মামাকে গান গেয়ে শোনাতে বলল অলসভাবে।

গীটারের ওপরে ঝুঁকে পড়ল ইয়াকভ-মামা, তারপর গীটারের টুং-টাং শব্দ তুলে বিরক্তিকর গলায় গাইতে শুরু করে দিল:

> কী পরিপূর্ণ জীবন ছিলো হায়রে
> অকারণ গোলমাল উন্মত্ততা তায়রে।
> কাজান মেয়েকে সবাই আমরা দেখেছিলাম
> সবাইকার সব কথাই তাকে বলেছিলাম।

আমার মনে হল ভারি বিষণ্ণ গান এটি। দিদিমা বললেন, 'অন্য একটা গান গাও ইয়াকভ। একটা সত্যিকারের গান। মাত্রিয়া, তোর মনে আছে কত সব গান আমরা শুনতাম?'

ধোবানী বেশ ভারিক্কী চালে পোশাকের খসখসানি তুলে বললেন, 'বোন, সে-সব গান আর নেই। আজকাল গানের ধারাই পাল্টে গেছে।'

ইয়াকভ-মামা আধবোজা চোখে দিদিমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন দিদিমা অনেক দূরের কোনো মানুষ। কিন্তু তার গান থামেনি। গীটারের বিষণ্ণ টুং-টাং আর সেই বিশ্রী গানটা সমানে চলেছে।

দাদামশাই ঘড়িওলার সঙ্গে কী যেন আলাপ করছেন আর মাঝে মাঝে হাত নেড়ে দেখাচ্ছেন কী যেন। ঘড়িওলা ভুরু তুলে আমার মা'র দিকে তাকাচ্ছে আর একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে তার তল্তলে মুখের ওপর।

অন্যদিনের মতোই মা বসেছে সের্গেয়েভদের পাশে, চাপা ভারিক্কী গলায় কথা বলছে ভাসিলির সঙ্গে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাসিলি বলছে, 'হুঁম্! কথাটা ঠিকই বটে তবে ভেবে দেখতে হবে।'

ভরা-পেটের পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে ভিক্টর, মেঝের ওপরে পা ঘষছে আর হঠাৎ সরু সরু গলায় গান গাইতে শুরু করে দিল:

'আন্দ্রেই-বাবা, আন্দ্রেই-বাবা...'

এই গান শুনে সবাই কথা থামিয়ে অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে।

ব্যাপারটা গর্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বললেন ওর মা: 'এটা হচ্ছে থ্যাটরের গান। আজকাল থ্যাটরে এই রকমের গানই গাওয়া হয় কিনা!'

অসহ্য ক্লান্তির জন্যে স্মরণীয় এই ধরনের দুটি কি তিনটি সন্ধ্যা পার হতেই এক রবিবার দুপুরবেলা ঘড়িওলা এসে হাজির। রবিবারের পূর্বাহ্নকালীন উপাসনা তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। মা'র ঘরে আমি বসে আছি। পুঁতির কাজ করা পুরানো একটা এম্‌ব্রয়ডারি থেকে মা সুতো খুলছিল আর সে-কাজে তাকে আমি সাহায্য করছিলাম। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল আর খোলা দরজার ফাঁকে দিদিমার মুখটা একবার ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল আবার। আর সেই সময়টুকুর মধ্যেই উচ্চস্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করে তিনি বলে গেলেন:

'ভারিয়া, সে এসেছে!'

শুনে মা যেমনি বসেছিল তেমনি বসে রইল, তার মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন এল না। কিছুক্ষণ পরে দরজাটা আবার খুলে গেল আর খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাদামশাই গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন:

'ভারভারা, এক্ষুণি তৈরি হয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো!'

তাঁর মুখের দিকে না তাকিয়ে এবং তেমনি ভাবে বসে থেকেই মা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'এসোই না বলছি! ঈশ্বর তোমার সহায় হবেন! এই নিয়ে এখন আর তর্ক জুড়ে দিও না। সব দিক দিয়েই ভালো এই লোকটি, কাজেকর্মে চৌকস, আর লেক্সেইও সত্যিকারের বাপ পাবে...'

অস্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়ে দাদামশাই কথা বলছেন। কথা বলতে বলতে হাতদুটো আস্তে আস্তে বুলোচ্ছেন উরুর ওপরে। কনুই এমনভাবে কাঁপছে যে মনে হয়, হাতদুটো বারবার থাবা বাড়িয়ে আসতে চাইছে কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে সে ইচ্ছাকে সংযত করেছেন।

শান্ত স্বরে মা বলল, 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, এ হবার নয়।'

দু-হাত অন্ধের মতো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দুম্‌ দুম্‌ করে পা ফেলে দাদামশাই এগিয়ে এলেন মা'র দিকে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠলেন:

'আসবি তো আয়! নইলে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাব!'

'টানতে টানতে নিয়ে যাবে?' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মা বলল। তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে, হিংস্র দৃষ্টিতে কুটিল হয়ে উঠেছে চোখদুটো। ফর্‌ ফর্‌ করে টেনে গা থেকে স্কার্ট আর ব্লাউজ খুলে ফেলল মা; শুধু একটা

পেটিকোট ছাড়া আর কিছু পরনে নেই — এমনি অবস্থায় দাদামশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলল:

'এসো এবার! টানতে টানতে নিয়ে যাও আমাকে!'

দাঁত কড়মড় করে ঘুষি পাকিয়ে দাদামশাই বললেন, 'ভালো হচ্ছে না ভারভারা, শীগ্গির জামাকাপড় পরে নে!'

দাদামশাইকে ঠেলে সরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মা, চিৎকার করে বলল:

'কই, আসছ না যে? চলো।'

দাদামশাই ফুঁসে উঠলেন, 'তোর সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না!'

'আমি ভয় পাই না। কই, চলো!'

মা দরজা খুলল। মা'র পেটিকোটের একটা প্রান্ত চেপে ধরে দাদামশাই হাঁটু মুড়ে বসে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে উঠলেন:

'ভারভারা, ওরে শয়তানী! তোর সর্বনাশ হবে বলে দিচ্ছি! আমার মুখে এভাবে চুনকালি দিস্‌নে! গিন্নি! গিন্নি!'

দিদিমা আগেই এসে মা'র পথ আটকিয়েছিলেন। মুরগীর মতো মাকে তাড়া দিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে আনতে বিড়বিড় করে বললেন:

'তোর কি বুদ্ধিলোপ হয়েছে, ভারভারা! হতভাগী, লজ্জাশরম বলেও কি কিছু নেই!'

মা'কে ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে এনে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিলেন দিদিমা। তারপর ফিরে দাঁড়ালেন দাদামশাইয়ের দিকে। একহাতে মেঝে থেকে টেনে তুললেন দাদামশাইকে, অপর হাত শাসানির ভঙ্গিতে তাঁর সামনে নাড়তে লাগলেন।

'বুড়ো শয়তান! ভীমরতি ধরেছে!'

দাদামশাইকে ধরে ডিভানের ওপরে বসিয়ে দিলেন দিদিমা। ন্যাকড়ার পুতুলের মতো ঝুলঝুল করতে লাগল দাদামশাইয়ের মাথাটা, মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

মা'র দিকে তাকিয়ে দিদিমা ধমক দিলেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি। জামাকাপড় পর না!'

স্কার্ট আর ব্লাউজ কুড়িয়ে নিতে নিতে মা বলল, 'আমি কিন্তু ওই লোকের কাছে যাব না তা আগে থেকেই বলে রাখছি।'

আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে দিদিমা বললেন, 'যা তো, একটা পাত্র করে খানিকটা জল নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি যা!'

চাপা স্বরে দিদিমা কথা বলছেন। শান্ত ও আদেশব্যঞ্জক গলার স্বর। এক ছুটে আমি বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। সেখান থেকে শুনতে পেলাম, সামনের দিককার ঘরে কে যেন আস্তে আস্তে পায়চারি করছে।

শুনতে পেলাম মা বলছে, 'আমি কালই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব!'

স্বপ্নচালিতের মতো রান্নাঘরে গিয়ে জানলার কাছে বসলাম আমি।

দাদামশাইয়ের হাঁকডাক চিৎকার শোনা যাচ্ছে। দিদিমা ফিস্‌ফিস্‌ করে কী যেন বলে চলেছেন। একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল। তারপরেই চারিদিক নিস্তব্ধ আর থম্‌থমে। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমাকে কী জন্যে পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাত্রে জল নিয়ে আমি বাইরের ঘরে এলাম। এবার দেখা গেল, বাড়ির সামনের দিক থেকে ঘড়িওলা বেরিয়ে আসছে, ফারের টুপিটায় টোকা দিতে দিতে কাতরাচ্ছে ভাঙা গলায়। ঘড়িওলার পিছনে পিছনে আসছেন আমার দিদিমা। হাতদুটো পেটের ওপরে আড়াআড়ি করে রেখে মাথা নুইয়ে শান্ত স্বরে তিনি বলছেন:

'ব্যাপারটা আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন তো! কাউকে তো আর জোরজবরদস্তি করে অপরকে ভালো লাগানো যায় না!'

হোঁচট খেতে খেতে ঘড়িওলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠোনে চলে গেল। দিদিমা সেই জায়গায় দাঁড়িয়েই বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন। তাঁর সারা শরীরটা কাঁপছিল। তিনি হাসছিলেন না কাঁদছিলেন তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না।

দিদিমার দিকে ছুটে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?'

এক ঝটকায় জলের পাত্রটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, খানিকটা জল চল্‌কে ফেলে আমার পা ভিজিয়ে দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন:

'জল আনতে কোন্‌ রাজ্যে গিয়েছিলি তুই? দরজা বন্ধ করে দে!'

দিদিমা আমার মা'র ঘরে ফিরে গেলেন, আমি আবার এলাম রান্নাঘরে। মা'র ঘর থেকে গোঙানি, দীর্ঘনিশ্বাস আর অস্ফুট কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসতে লাগল; যেন ঘরের লোকগুলো কোনো সাধ্যাতীত ভারি জিনিস ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

দিনটি ভারি চমৎকার। শীতকালের রোদ দীর্ঘ রেখায় জানলাদুটির তুষারঢাকা শার্সির ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। টেবিলে বৈকালিক

আহার্য সাজানো। সীসার মেশাল দেওয়া টিনের তৈরি ডিশ আর কাঁচের পাত্র ঝক্‌ঝক্‌ করছে। কাঁচের পাত্রগুলোতে রয়েছে সোনালীরঙের 'ক্‌ভাস' পানীয় আর দাদামশাইয়ের নিজের হাতে তৈরি মেঠো ফুলের সুগন্ধিযুক্ত সবুজরঙের ভদ্‌কা। জানলার শার্সিতে এক জায়গায় তুষার গলে গিয়েছিল, সেই ফাঁক দিয়ে আমি দেখলাম, বাড়ির ছাদগুলোতে চোখঝলসানো বরফ জমেছে, চক্‌চকে রুপোলী টোপর মাথায় বেড়ার খুঁটি ও পাখির বাসাটি। জানলার খিলান থেকে ঝোলানো খাঁচার মধ্যে রয়েছে আমার ধরা সব পাখি; প্রচুর সূর্যের আলো এসে পড়েছে খাঁচাগুলোর ওপর। মনের আনন্দে কিচিমিচির করছে চেফিঞ্চ্‌ পাখিগুলো, বুল্‌ফিঞ্চের দল হুটোপাটি লাগিয়েছে, গান গাইছে গোল্‌ড্‌ফিঞ্চ্‌রা। কিন্তু এই রুপোলী দিনের সুর ও উজ্জ্বলতা আমাকে কোনো আনন্দই দিতে পারছে না। একটা না-চাওয়া দিন। সব কিছুই না-চাওয়া। ইচ্ছে হচ্ছে, খাঁচা খুলে পাখিগুলোকে মুক্ত করে দিই। হয়তো দিতামও। খাঁচাগুলোকে নামাতে যাচ্ছি এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন দিদিমা। উরুতে চাপড় দিতে দিতে আর চিৎকার করতে করতে দিদিমা ছুটলেন চুল্লির দিকে।

'মরণও হয় না তোমাদের! হায়, হায়, আমার কি বুড়ো বয়সে বুদ্ধি নাশ হল গো!'

বলতে বলতে চুল্লির ভিতর থেকে 'পিরোগ' টেনে বার করলেন তিনি। ওপরের পোড়া ছালটায় দু-তিনবার টোকা দিয়ে মুষড়ে পড়লেন একেবারে।

'ইস্‌, একেবারে শুকিয়ে গেছে! তোদের জ্বালায় কি ধীরেসুস্থে কিছু করবার জো আছে! রাক্ষুসে গুষ্টি, তোদের ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাক্‌ না, ভাসিয়ে নিয়ে যাক্‌ না বন্যায়! অমন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছিস কেন রে প্যাঁচা-মুখো! ভাঙা কল্‌সীর টুকরোর মতো তোদের সবকটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তবে আমার শান্তি!'

দিদিমা কাঁদতে শুরু করে দিলেন। উল্‌টেপাল্‌টে দেখছেন 'পিরোগ'-টাকে, পোড়া ছালটার ওপরে টোকা দিচ্ছেন, চোখের জলের বড়ো বড়ো ফোঁটায় ভিজিয়ে দিচ্ছেন খাদ্যবস্তুটিকে।

আমার মা ও দাদামশাই এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে। নষ্ট-হয়ে-যাওয়া 'পিরোগ'টা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দিদিমা। টেবিলের ডিশগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল।

'দেখ, জিনিসটার কী হাল্ হয়েছে! তোমাদের দোষেই তো হল এটা! উচ্ছন্নে যাও তোমরা!'

আমার মা'র মেজাজ এতক্ষণে শান্ত হয়েছে, মনটাও প্রফুল্ল। দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে মিষ্টি কথায় শান্ত করতে চেষ্টা করল। দাদামশাইকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তিনি খুব দমে গেছেন। চোখের ওপরে রোদ এসে পড়েছিল; ফোলা ফোলা চোখ পিটপিট করে, গলায় ন্যাপ্‌কিন জড়িয়ে বিড়বিড় করে বললেন তিনি:

'যাক গে, যা হবার হয়েছে! ভাল 'পিরোগ'ও তো আমরা আগে খেয়েছি। প্রভুর ধরনই এমনি! তাঁর স্বভাবটা হচ্ছে একটু কৃপণ—কয়েক বছরেরটা শোধ দেন একটি মুহূর্তে। আবার সুদের ধার ধারেন না! বোসো ভারিয়া... যা হবার হয়ে গেছে!'

দাদামশাই এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন তিনি কোনো একটা ব্যাপারে অভিভূত হয়েছেন। খেতে বসে সারাক্ষণ তিনি ঈশ্বরের কথা বললেন, বললেন অধার্মিক আহাব'এর কথা; আর বাপ হলে কত কিছু যে সহ্য করতে হয় ও কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় সে কথা। দিদিমা রেগে গিয়ে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'হয়েছে বাপু হয়েছে! এবারে বক্‌বক্ না করে খাওয়ার দিকে মন দাও তো!'

মা হাসছে, চক্‌চক্ করছে তার পরিষ্কার চোখদুটো।

আমাকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে মা জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, একটু আগে খুব ভয় পেয়েছিলি তো?'

আমি তখন যে খুব ভয় পেয়েছিলাম তা নয়। কিন্তু এখন আমার কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে। কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কী হয়েছে আমার।

রবিবারে যেমন হয়, তেমনি অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু খাওয়া হল। বিশ্বাস করা শক্ত যে আধ ঘণ্টা আগে এই লোকগুলো নিজেদের মধ্যে এত চোটপাট করছিল, প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল। মাত্র আধ ঘণ্টা আগেই এত কান্নাকাটি, রাগারাগি আর ফোঁসফোঁসানি — কিন্তু এখন আর কিচ্ছু নেই। আমি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এ-ধরনের ঘটনা এদের কাছে বিশেষ গুরুতর ঘটনা আর এর জন্যে এদের বিশেষ কোনো চেষ্টা করতে হয়। এদের স্বভাবই এই রকম--এই হয়তো ভয়ানক কান্নাকাটি, চোটপাট আবার পরের মুহূর্তেই কিছু নেই। কতবার যে এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে, দেখে দেখে আমি অভ্যস্ত

হয়ে উঠেছি। প্রথম দিকে এ-ধরনের ঘটনা আমার মনে দাগ কাটত, এখন আর কাটে না।

অনেক কাল পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, রুশদেশের তখনকার জীবনে এইটেই ছিল স্বাভাবিক। সেই জীবনে একদিকে ছিল চরম দারিদ্র্য, অন্যদিকে এতটুকু বৈচিত্র্যের অভাব—সুতরাং তারা এ-জীবনকে ভুলে থাকতে চাইত দুঃখের মধ্যে, শিশুর মতো পুতুলখেলার অভিনয় করে। নিজেদের দুর্ভাগ্য নিয়ে নিজেদের মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জা ছিল না।

জীবনে যদি কোন কিছু বৈচিত্র্য না থাকে তাহলে দুঃখকেও আশীর্বাদের মতো মনে হয়; ঘরে আগুন লাগলেও তা উপভোগের দৃশ্য হয়ে ওঠে; আঁচিল হচ্ছে ভাবলেশহীন মুখের শোভা...

এগার

এই ঘটনার পর থেকে আমার মা'র প্রতাপ বেড়ে গেল এবং আমার মা-ই হয়ে উঠল বাড়ির সর্বেসর্বা। দাদামশাই অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ ও নির্বিরোধী হয়ে গেলেন।

দাদামশাই বাড়ি থেকে এখন বিশেষ আর বেরোন না। ওপরের ঘরটিতে একা একা বসে তিনি একটি রহস্যজনক বই পড়েন। বইটির নাম 'আমার বাবার লেখা থেকে'। বইটি তিনি রাখেন সিন্দুকের মধ্যে তালাচাবি বন্ধ করে। বহুবার আমি দেখেছি, বইটি বার করার আগে তিনি ভালো করে হাত ধুয়ে নেন। বইটি ছোট এবং মোটা পাটকিলে রঙের চামড়া দিয়ে বাঁধানো। বইয়ের নীলচে রঙের পরিচয়পত্রে অস্পষ্ট কালিতে এই কথাগুলো লেখা আছে:

'আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত পরমপূজনীয় ভাসিলি কাশিরিনকে'।

লেখাটির নিচে যে নামটি স্বাক্ষর করা আছে তা ভারি অদ্ভুত। স্বাক্ষরের শেষে যেন উড়ন্ত পাখির ছবি এঁকে খানিকটা অলংকরণ করা হয়েছে। দাদামশাই বইটাকে হাতে নিয়ে অতি সাবধানে চামড়ার বাঁধাই এক ভারি আবরণ খুলে চোখে আঁটেন রুপোর ফ্রেমের চশমা আর এই লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বহুক্ষণ ধরে নাকটা কোঁচকান চশমাটা ঠিক করে নেবার জন্যে। এই বইটির কথা আমি তাঁকে একাধিকবার জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু প্রত্যেকবারেই তিনি তদ্‌গতভাবে সেই একই জবাব দিয়েছেন:

'এখনো তোর জানবার সময় হয়নি। একটু সবুর কর—মরবার সময় আমি তোকে এই বইটা দিয়ে যাব। আর সেই সঙ্গে রেকুনের লোমের তৈরি আমার কোটটাও।'

মা'র সঙ্গে কথাবার্তা আজকাল তিনি কমিয়ে দিতে শুরু করেছেন। যেটুকু বলেন তাও অনেক নম্রভাবে। আবার মা যখন কোনো কিছু বলে তখন তিনি মন দিয়ে শোনেন আর অদ্ভুত সব ভঙ্গিতে পিওতর-কাকার মতো চোখ পিটপিট করে মা'র কথার জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করে বলেন:

'আচ্ছা, যা খুশি করো।'

তাঁর ট্রাঙ্কগুলো ভর্তি রয়েছে নানা রকমের দামী আর আশ্চর্য সব পোশাকে। সিল্কের সার্ট, সাটিনের জ্যাকেট, রেশমী রুপোখচিত সারাফান, কিকা ও কোকোশ্নিক*, উজ্জ্বল রঙের রুমাল ও স্কার্ফ, মর্দোভীয় হার এবং বিচিত্রবর্ণের পাথর ও পুঁতি। জিনিসগুলো তিনি মা'র ঘরে নিয়ে এসে টেবিল ও চেয়ারের ওপরে বিছিয়ে দিলেন। এই সূক্ষ্ম কারুকার্য করা জিনিসগুলোকে মা যখন প্রশংসা করতে লাগল, দাদামশাই বললেন:

'আজকাল লোকে কি আর এমন সাজপোশাক করে। আমাদের সময়ে সাজপোশাকের যেমন ঘটা ছিল তেমনি খুব দামী আর চমৎকার পোশাকও লোকে পরত। তবে সাজপোশাকের যতোই চটক থাকুক, মানুষগুলোর জীবন আরো অনেক সাদাসিধে ছিল। অনেক বেশি মিলেমিশে থাকতে পারত। সে-সব দিন আর ফিরে আসবে না! এগুলো তোর কাছেই রইল, খুশিমতো পরিস...'

একদিন মা কিছুক্ষণের জন্যে পাশের ঘরে উঠে গেল, তার পর ফিরে এল সোনালী কাজকরা গাঢ় নীল রঙের সারাফান আর মুক্তো-খচিত কিকা পরে। দাদামশাইয়ের সামনে এসে নীচু করে মাথা নুইয়ে বলল:

'মান্যবরের কি এই পোশাক পছন্দ হয়?'

দাদামশাইয়ের খুশি আর ধরে না: চোখেমুখে খুশি ফেটে পড়ছে। স্বপ্নচালিতের মতো মা'র চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে হাত-পা নেড়ে বিড়বিড় করে বলে চলেছেন:

'ওরে ভারভারা, তোর যদি অনেক টাকা থাকতো আর কাছাকাছি যদি থাকতো সজ্জন মানুষ।'

* সারাফান—লম্বা আস্তিনশূন্য পোশাক। কিকা ও কোকোশ্নিক—বিশেষ মস্তকাবরণ। — সম্পাঃ

বাড়ির সামনের দিককার ঘরদুটি মা নিজের থাকার জন্যে বেছে নিয়েছে। প্রায়ই অতিথি-আপ্যায়ন করে মা। অভ্যাগতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাদের দেখা যায় তারা হচ্ছে মাক্সিমোভ ভ্রাতৃ-যুগল। একজন পিওতর—প্রকান্ড শরীর ও সুন্দর চেহারার একজন অফিসার, মস্ত সোনালী দাড়ি আর নীল চোখ। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের টাকে থুতু ফেলবার জন্যে এই লোকটির সামনেই সেবার দাদামশাই আমাকে মেরেছিলেন। অপরজন ইয়েভগেনি; ফ্যাকাশে লম্বা চেহারা, সরু সরু লম্বা ঠ্যাঙ, ছুঁচলো আর ছোট কালো দাড়ি, চোখদুটো কুলের মতো; সোনালী বোতাম আর সরু সরু দুই কাঁধে সোনালী প্রতীক-চিহ্ন লাগানো সবুজরঙের পোশাক পরে থাকে সব সময়ে। মাথায় লম্বা লম্বা কোঁকড়ানো চুল; চুলগুলো উঁচু কপালটার ওপরে এসে পড়ে; মাথাটা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো সরিয়ে নেওয়া এবং মাতব্বরী চালে হাসা একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে তার। ভাঙা ভাঙা নীচু গলায় সব সময়েই কোনো একটি বিষয়ে মত প্রকাশ করে চলেছে, আর যাই বলুক না কেন, বক্তব্য শুরু করে অবধারিতভাবে এই কথাগুলো বলে:

'আমি যে-ভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছি তা হচ্ছে...'

আধ-বোজা চোখে মা এই লোকটির কথা শোনে আর কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রায় হেসে উঠে বলে:

'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয় আপনি এখনো একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন...'

'ঠিক কথা—একেবারে ছেলেমানুষ!' অফিসারটি হাঁটুতে চাপড় মেরে মা'র কথায় সায় জানায়।

বড়োদিনের ছুটিগুলো হৈ-হল্লা আমোদপ্রমোদের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় মা ও তার বন্ধুরা বাহারওলা সাজপোশাক পরে বেড়াতে যেত। দলের মধ্যে মা'র পোশাকই হত সবচেয়ে সুন্দর।

উচ্চস্বরে কথা বলতে বলতে এই দলটি গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই মনে হত, আমাদের বাড়িটা যেন মাটির অন্ধকারে ডুবে গেছে, চারদিকে থম্‌থমে বিষণ্ন নিস্তব্ধতা আর কোথাও এতটুকু প্রাণের চিহ্ন নেই। বুড়ো হাঁসের মতো নিঃশব্দ সঞ্চারে ঘর থেকে ঘর ঘুরে বেড়িয়ে ঝাড়ামোছা করতেন দিদিমা আর টালির চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে পিঠ গরম করতে করতে দাদামশাই আপনমনে বিড়বিড় করে বলতেন:

'থাকুক... যে-ভাবে খুশি থাকুক ও... দেখিয়ে দেবে কী হবে...'

বড়োদিনের ছুটির পর আমাকে আর মিখাইল-মামার ছেলে সাশাকে স্কুলে ভর্তি করে দিল মা। সাশার বাবা অরেকবার বিয়ে করেছে এবং সাশার সৎ-মা প্রথম দিন থেকেই সাশাকে একেবারে দেখতে পারে না। ছেলেটাকে তার সৎ-মা এমন মার মারত যে দাদামশাইকে বলে-কয়ে দিদিমা ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। মাসখানেক আমরা দুজনে একসঙ্গে স্কুলে যাই। এই একমাস স্কুলে গিয়ে যেটুকু শিক্ষা আমার হয়েছে তার মধ্যে একটা জিনিস আমার মনে আছে। তা হচ্ছে এই: আমাকে যদি আমার নাম জিজ্ঞেস করা হয় আর আমি যদি জবাব দিই — 'পেশ্‌কভ' — তাহলে জবাবটা ঠিক হবে না। বলতে হবে — 'আমার নাম পেশ্‌কভ'। আর মাস্টারমশাইকে একথাও কিছুতেই বলা চলবে না — 'আমার ওপর অমন চোটপাট করিস না ভাই। আমি তোকে ভয় করিনে...'

স্কুলকে আমি প্রথম দিন থেকেই অপছন্দ করি। ওদিকে আমার মামাতো ভাই ঠিক উল্‌টো। তার কিন্তু গোড়া থেকেই স্কুল ভালো লেগেছে, আর বন্ধুত্বও হয়েছে অনেকের সঙ্গে। কিন্তু একদিন হল কি, ক্লাশের পড়ার সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চিৎকার করে ওঠে — 'না, কক্ষণো না!' তারপর জেগে উঠে মাস্টারমশাইয়ের অনুমতি নিয়ে ক্লাশ ছেড়ে চলে যায়। এই ব্যাপারটা নিয়ে অন্য ছেলেরা তার পিছনে লেগে লেগে তাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে তোলে।

পরদিন সেন্নায়া স্কোয়ারের সামনে নালাটার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বলল:

'তুই একাই যা, আমি আজ আর স্কুলে যাব না। আমি বরং একটু টহল দিয়ে আসি।'

নিচু হয়ে বরফের মধ্যে বইগুলোকে চাপা দিয়ে সে চলে গেল। জানুয়ারি মাসের উজ্জ্বল দিন, ঝক্‌ঝকে সূর্যের আলোয় সারা পৃথিবী হাসছে। মামাতো-ভাইকে আমার হিংসে হতে লাগল। কিন্তু মা'র কথা ভেবে নিজের ইচ্ছাকে চাপা দিয়ে স্কুলে গেলাম। সাশা যে বইগুলোকে বরফ চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিল সেগুলো চুরি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল এবং তাই হল। সুতরাং পরদিনও সে স্কুলে গেল না — বই-খাতা খুইয়ে বসে সেদিন আর স্কুলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তৃতীয় দিন সাশার এই স্কুল-পালানোর ব্যাপারটা দাদামশাই টের পেয়ে গেলেন।

আমাদের দুজনকেই ডাকা হল বিচারসভায়। আমাদের জেরা করবার

জন্যে রান্নাঘরের টেবিলের পিছনে সারি দিয়ে বসলেন দাদামশাই, দিদিমা ও মা। দাদামশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে সাশা যে-সব মজার মজার জবাব দিয়েছিল তা এখনো আমার মনে আছে।

'ব্যাপারটা কি যে তুমি বাড়ি থেকে রওনা হয়ে স্কুলে আর পেঁছতে পারলে না?'

ভীরু দুই চোখ তুলে সোজাসুজি দাদামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সাশা জবাব দিল, 'স্কুলের রাস্তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

'ভুলে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। কত আঁতিপাঁতি খুঁজলাম...'

'তা লেক্সেইয়ের সঙ্গে সঙ্গে গেলেই তো পারতে। লেক্সেই তো আর ভোলেনি।'

'সেই যে কোথায় হারিয়ে গেল তা বুঝতে পারলাম না।'

'লেক্সেই হারিয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'কী করে হারাল?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সাশা বলল, 'আমি যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিলাম না—সে কী ভয়ানক তুষারঝড় উঠেছিল!'

তুষারঝড়ের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল কারণ সেটা ছিল রোদ-ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার দিন। সাশা নিজেও একটু মুচ্‌কি হাসল। দাদামশাই দাঁত বার করে উপহাসের স্বরে বললেন:

'তা, তুমি তো লেক্সেইয়ের হাত বা কোমরের বেল্ট শক্তভাবে চেপে ধরতে পারতে?'

'আমি তো চেপে ধরেছিলাম। কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল।'

ধীরে ধীরে হতাশভাবে কথার পিঠে কথা বলে যাচ্ছে সে। এই নিষ্ফল ও এলোমেলো মিথ্যে কথা শুনে আমি নিজেও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম এবং সাশার এই গোঁয়ার্তুমির অর্থ বুঝে উঠতে পারলাম না।

সেদিন আমরা দু'জনেই মার খেলাম। দমকলের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে রাখা হল আমাদের দু'জনকে স্কুলে পেঁছে দিয়ে আসবার জন্যে। লোকটার একটা হাত মুচড়ে ভেঙে গেছে। বিশেষ করে তাকে সাশার ওপরে নজর রাখতে বলা হল; সাশা যেন কিছুতেই জ্ঞানের পথ থেকে বিচ্যুত

না হয়। কিন্তু এসব ব্যবস্থা ব্যর্থ হল। পরদিন স্কুলে যাবার পথে স্কোয়ারের সামনে নালাটার কাছাকাছি আসতেই আমার মামাতো-ভাই করল কি, পায়ের জুতোজোড়া খুলে নিয়ে একপাটি ছুঁড়ে ফেলল ডানদিকে, আর একপাটি বাঁদিকে। তারপর মোজা পায়ে চোঁচা ছুট্ দিল স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে। কাণ্ড দেখে সেই বুড়ো লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর জুতোজোড়া খুঁজেপেতে কুড়িয়ে নিয়ে এল। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে স্কুলের দিকে আর না গিয়ে আমাকে নিয়ে সোজা ফিরে এল বাড়িতে।

তারপর সারাদিন ধরে দাদামশাই, দিদিমা ও মা সারা শহরে পলাতক আসামীকে খুঁজে বেড়ালেন। সন্ধ্যার দিকে মঠের কাছে চিরকোভের শুঁড়িখানায় পাওয়া গেল তাকে: সেখানে সে ক্রেতাদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচছিল। এবার সে একেবারে মুখ বুজে রইল এবং ব্যাপার-স্যাপার দেখে সবাই এমন থ' হয়ে গিয়েছিল যে তাকে উত্তম-মধ্যম দেবার কথাও কারও মনে হয় না। তাকে আমার পাশে শুয়ে ছাদে লাথি ছুঁড়তে ছুঁড়তে শান্ত স্বরে সে বলল:

'আমার সৎ-মা আমাকে ভালোবাসে না, আমার বাবা আমাকে ভালোবাসে না, আমার ঠাকুর্দা আমাকে ভালোবাসে না। যারা আমাকে ভালোবাসে না তাদের সঙ্গে আমি কেন থাকতে যাব? ঠাকুমার কাছ থেকে আমি জেনে নেব কোথায় গেলে ডাকাতদলের দেখা পাওয়া যায়, তারপর বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যাব তাদের কাছে। তখন আমার কথা ভেবে তোদের কষ্ট হবে দেখিস! আচ্ছা চল্ না দু'জনে একসঙ্গে যাই—যাবি?'

কিন্তু আমার পক্ষে তার সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সে-সময়ে আমার জীবনের অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল—তা হচ্ছে, মস্ত এক সোনালী দাড়িওলা অফিসার হওয়া, কিন্তু তার জন্যে পড়াশুনো করা দরকার। মামাতো-ভাইকে আমার পরিকল্পনার কথা বলতেই সে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে আমার কথায় সায় জানাল:

'আচ্ছা ঠিক আছে। তুই হবি অফিসার আর আমি হব ডাকাতদলের সর্দার। তারপর তুই আসবি আমাকে ধরতে। তারপর হয় তুই মরবি, না হয় আমি মরব। কিংবা, হয় তুই ধরা পড়বি, না হয় আমি ধরা পড়ব। আমি কিন্তু কিছুতেই তোকে খুন করব না।'

'আমিও তোকে খুন করব না।'

এইভাবে মতের মিল হবার পর আমাদের আলোচনা শেষ হল।

দিদিমা ঘরে ঢুকলেন; চুল্লির ওপরের তাকে আমাদের বিছানায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে কথা বলতে লাগলেন আমাদের সঙ্গে।

'কুটুর কুটুর মাণিকরা আমার! বাপমায়ের আদর-ছাড়া দস্যি ছেলেরা আমার!..'

আমাদের জন্যে গভীর দরদে ভরা দিদিমার মন। সেই মন নিয়েই তিনি সাশার সৎ-মাকে নিন্দে করতে লাগলেন; এক শুঁড়িখানার মালিকের মেয়ে মোটা নাদেজ্দা-মামী হচ্ছে সাশার সৎ-মা। সাশার সৎ-মাকে নিন্দে করতে গিয়ে তিনি পৃথিবীর সমস্ত সৎ-মা ও সৎ-বাপকেই নিন্দে করতে শুরু করলেন এবং এই প্রসঙ্গে কথায় কথায় বললেন জ্ঞানী-ঋষি আয়োনের গল্প। আয়োন তখন ছেলেমানুষ, কিন্তু তখনই তিনি নিজের সৎ-মার ওপরে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের দণ্ড নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। আয়োনের বাপ ছিল সাদা হ্রদের জেলে; আর তার ছিল এক দজ্জাল বৌ। তাকে টেনে এনেছিল সর্বনাশের পথে।

একদিন তাকে ছলাকলায় ভুলিয়ে খাওয়াল মদ — মদের নেশায় বেহুঁশ করে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াল।

ওক্‌কাঠের তৈরি এক ডিঙ্গির মধ্যে — কফিনের মতো সরু আর অন্ধকার এক ডিঙ্গির মধ্যে — তুলে নিল অচেতন শরীরটাকে। মেপ্‌লকাঠের দাঁড় টেনে নৌকো বেয়ে চলল নিজেই। চলল যেখানে জল ফুঁসছে আর অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে এক লজ্জাহীনার দুষ্কৃতির প্রতীক্ষায়।

ডিঙ্গি থেকে ঝুঁকে পড়ে, ডিঙ্গিকে টলিয়ে দিয়ে, নড়িয়ে দিয়ে, উল্‌টিয়ে দিল একেবারে। কেউ সাক্ষী রইল না। হ্রদের অতল গভীরে ভারি পাথরের মতো তলিয়ে গেল তার স্বামী।

তারপর জল সাঁতরে ফিরে এল সর্বনাশী। মাটিতে আছড়ে পড়ে, বুক চাপড়ে, মৃত স্বামীর নাম স্মরণ করে, শুরু করল মড়া-কান্না। যে স্বামীকে সে নিজেই খুন করেছে তারই জন্যে মায়াকান্না!

গাঁয়ের লোকেরা সবাই তার দুঃখে দুঃখপ্রকাশ করল। তার বিধবার বেশ দেখে, তার চরম দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে, চোখের জল ফেলল একই সঙ্গে। এত অল্প বয়সেই যে মেয়েকে বিধবা হতে হল, এক আশাভরসাহীন অন্ধকার জীবন যার ভবিতব্য — তাকে সান্ত্বনা দিল এই বলে যে, ঈশ্বরের বিধান অমোঘ ও দুর্লঙ্ঘ, মানুষের জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন।

কিন্তু সেই দলের মধ্যে একজন মাত্র ছিল — তার সতীনের ছেলে আয়োনুশ্‌কা — যে তার সৎ-মার মায়াকান্নাকে বিশ্বাস করেনি। সৎ-মার বুকের ওপরে হাত রেখে ধীর স্বরে বলতে লাগল তাকে.

তোমাকে বিশ্বাস করি না, কুচক্রী নারী তুমি, রাত্রিচর সুখোন্মত্ত পাখি, বিশ্বাসঘাতিনী। তোমার ওই অজস্র মায়াকান্না টলাতে পারবে না আমাকে। বাইরে তোমার যতোই কান্না থাকুক, বুকের ভিতরটা আনন্দে উছলে উছলে উঠছে। এসো তবে ঈশ্বরের বিচার প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের দণ্ড আসুক নেমে। যে কেউ একজন একটা ধারালো ছুরি আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিক্। যদি আমি অপরাধী হই ছুরি বিঁধবে আমার বুকে। যদি তুমি অপরাধী হও ছুরি বিঁধবে তোমার বুকে।

একথা শুনে সৎ-মা ধীরে মুখ ফেরাল। ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। জ্বলে উঠেছে তার চোখদুটি। ঘৃণা ঝরে পড়ছে তার মুখ থেকে। দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। শ্লেষ ও প্রতিহিংসায় তীব্র হয়ে উঠল গলার স্বর। বলল:

নির্বোধ না হলে এমন কথা কেউ বলে? শয়তানীর গর্ভে জন্ম তোমার — মায়ের গর্ভপাত। যে কথা মুখে আনাও পাপ — তাই বলে চলেছ তুমি। যে কথা মিথ্যে — তাই উগরে চলেছ। বলো কোন্ পাপ-চক্রান্ত করেছ তুমি?

যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল সেখানে — তারা শুনল এসব কথা।

শুনল যে ব্যাপারটা অমঙ্গলে ভরা।

নিঃশব্দে তাকাল পরস্পরের দিকে। বুকের ভিতরটা ভারি হয়ে উঠল সকলের। ফিসফিস করে আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে।

তারপর ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল একজন বুড়ো জেলে। প্রণাম করল সকলকে। অভিবাদন জানাল চেনা-পরিচিত জনকে। কথা বলল প্রত্যয় নিষ্ঠ স্বরে:

এখানে সৎ মানুষ যারা আছে তাদের বলছি শোনো। সেই ধারালো ছুরি এনে দাও আমার কাছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো — ছুরিটা নিয়ে আমি ছুঁড়ব আকাশের দিকে। তারপর নেমে আসুক ছুরি পাপীর বুকে। খুন করুক তাকে।

এল ছুরি। বুড়ো জেলের হাতে তুলে দিল সবাই। একমাথা পাকা চুল ঝাঁকিয়ে ছুরিটাকে ছুঁড়ল সে আকাশের দিকে। ঘন নীল আকাশে পাখির মতো মিলিয়ে গেল ছুরিটা।

তারপর নিঃসীম গাঢ় নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষা করল তারা। অপেক্ষা করল — কখন ঘন নীল আকাশ থেকে ছুরিটা নেমে আসে। টুপি খুলে ফেলল মাথা থেকে, দাঁড়িয়ে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে।

নিঃশব্দে নামল রাত্রি।

হ্রদের ওপারে ফুটে উঠল ঊষার রক্তিমাভা।

তখন সৎ-মার উল্লাস দেখে কে! আহ্লাদে ডগমগ সে।

এমন সময় নীল আকাশ চিরে বাবুইপাখির মতো সহসা নেমে এল সেই ছুরি। তীরের মতো গিয়ে বিঁধল সৎ-মার বুকে।

তখন সেই ধার্মিক লোকেরা বসল হাঁটু মুড়ে। প্রাণের ভক্তি উজাড় করে প্রার্থনা করতে লাগল। জয় হোক্ ঈশ্বরের ন্যায়-বিধান!

তারপব সেই বৃদ্ধ এল আয়োনুশ্‌কার কাছে। নিয়ে গেল তাকে এক আশ্রমে।

অনেক দূরে কেরজেনেৎস নদীর ধারে সেই আশ্রম — অনেক দূরে যেখানে আছে রূপকথার শহর কিতেজ...*

পরদিন সকালে আমার যখন ঘুম ভাঙল তখন আমার সর্বাঙ্গে লাল লাল গুটি বেরিয়েছে। এটা ছিল বসন্তরোগের আক্রমণের সূচনা। বাড়ির পিছন দিকে চিলেকোঠার একটা ঘরে আমার জন্যে স্থান নির্দিষ্ট হল। বহুদিন আমাকে থাকতে হল সেই ঘরে। চোখ বন্ধ, হাতপায়ে চওড়া চওড়া ব্যান্ডেজ বাঁধা — এই অবস্থায় ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিন কাটল আমার। একদিন এক দুঃস্বপ্ন দেখে প্রায় মরতে বসেছিলাম আর কি। বাইরের লোকের মধ্যে শুধু দিদিমাই আসতেন, চামচ দিয়ে শিশুর মতো খাইয়ে দিতেন আমাকে। অজস্র গল্প রূপকথা বলতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় একটা কান্ড ঘটল; তখন আমি অনেকটা সেরে উঠেছি, আমার হাতপায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে — শুধু দুই হাতে দস্তানা পরিয়ে রাখা হয়েছে যাতে আমি মুখ চুলকোতে না পারি। সেদিন নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাবার পরেও দিদিমা এলেন না। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার মনে হতে লাগল, চিলেকোঠা থেকে নামবার সিঁড়ির মুখেই ধুলোভর্তি জায়গাটায় দিদিমা মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। দুই হাত দু-দিকে ছড়ানো আর ঘাড়ের কাছে প্রকান্ড একটা হাঁ-করা ক্ষতচিহ্ন — পিওতর-কাকার বেলায় যেমনটি দেখেছিলাম। আর ধুলো ও নোংরা কোণ থেকে প্রকান্ড একটা বেড়াল গুটি গুটি বেরিয়ে এসে মস্ত সবুজ চোখদুটো পাকিয়ে, লোভীর মতো কটকট করে তাকিয়ে আছে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পা ও কাঁধের গুঁতোয় দু-দিকে শার্সি দেওয়া জানলার কাঁচ আমি গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙে ফেললাম। বাইরের দিকে জানলার ঠিক নিচেই বরফ জমেছিল, ছিট্‌কে তারই মধ্যে এসে পড়লাম আমি। সেদিন সন্ধ্যায় আমার মা অতিথি-আপ্যায়নের কাজে ব্যস্ত ছিল, সেই সোরগোলে কেউ কাঁচভাঙার শব্দ শুনতে পেল না। এইভাবে সকলের অলক্ষ্যে বেশ কিছুক্ষণ আমি পড়ে রইলাম সেই বরফের মধ্যে। আমার হাড় ভাঙেনি, শুধু কাঁধের হাড় সরে গিয়েছিল আর সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল

* তামবোভ প্রদেশের বরিসগ্লেবস্ক জেলায় কলুপানোভকা গ্রামে থাকবার সময়ে আমি এই গল্পটিরই রূপান্তর শুনেছি। রূপান্তরিত গল্পে ছেলে সৎ-মায়ের কুৎসা করছে আর ছুরিটা এসে খুন করছে ছেলেকে। — গোর্কি

ভাঙা কাঁচে। কিন্তু আমার পা সাময়িকভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। তিনমাস আমি হাঁটতে পারিনি। নিজের ঘরটিতে চুপচাপ শুয়ে থেকে শুনতাম—বাড়ির মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র কলরব চলেছে, ঠাস-ঠাস শব্দে দরজা বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে, মানুষজন অনবরত যাতায়াত করছে।

ছাদের ওপর দিয়ে তুষারঝড় বয়ে যেত, গোঁ গোঁ শব্দে বাতাস আছড়ে পড়ত চিলেকোঠার ছাদে। চিমনির মধ্যে ভীত মড়াকান্নার মতো বাতাসের শোঁসানি, আগুনের চিম্‌নির খড়খড়িতে হত বাতাসের খট্‌ খট্‌ আওয়াজ। আর শুনতাম, দিনের বেলায় কাকের কা-কা ডাক, নিস্তব্ধ রাত্রিতে দূরের মাঠে নেকড়ের ক্রুদ্ধ হুংকার।

এই বিচিত্র ঐকতানের মধ্যে আমার আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ করল। তারপরেই কুণ্ঠিতপদে, নিঃশব্দসঞ্চারে এবং ক্রমবর্ধমান প্রগল্‌ভতার সঙ্গে এল বসন্ত। ঝল্‌মলে চোখ মেলে তাকাল আমার ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে। শুরু হল বেড়ালের চিৎকার আর ডাকাডাকি। দেওয়ালের ওপার থেকে ভেসে আসতে লাগল বসন্তদিনের নানা শব্দ: তুষারকণাগুলো সহসা গলে গিয়ে মাটিতে খসে খসে পড়ে, ছাদের ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে বরফ, আর ঘণ্টা বাজতে থাকে এমন একটা ভরাট আওয়াজ তুলে যা শীতকালে কখনো শোনা যায় না।

দিদিমা আসেন আমাকে দেখতে। আজকাল দিদিমার মুখ থেকে যখন-তখন ভদ্‌কার গন্ধ বেরোয় এবং সেই গন্ধের উগ্রতাও ক্রমশ বাড়ে। এমন কি, শেষ দিকে আমার ঘরে আসবার সময় তিনি প্রকাণ্ড একটা সাদা চায়ের পাত্রও নিয়ে আসতে শুরু করেছেন। পাত্রটাকে তিনি আমার বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখেন এবং আমাকে চোখ টিপে বলেন:

'সোনা আমার, মাণিক আমার, তোর ওই পিশাচ দাদামশাইকে যেন বলে দিস্‌নে!'

'দিদিমা, তুমি এত মদ খাও কেন?'

'চুপ, চুপ! বড়ো হলে তুই নিজেই বুঝতে পারবি, কেন খাই।'

তারপরেই তিনি চায়ের পাত্রের নলটা মুখে ঢুকিয়ে এক ঢোঁক গিলে নেন, জামার আস্তিন দিয়ে মুখ মোছেন, এবং প্রাণখোলা হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন:

'মাণিক আমার, সোনা আমার, বলো শুনি কাল তোমাকে কোন্‌ কথাটা বলছিলাম!'

'আমার বাবার কথা।'

'কোন্ পর্যন্ত বলেছিলাম?'

কোন্ পর্যন্ত বলা হয়েছে বলতেই গানের সুরের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মুখ থেকে কথা বেরিয়ে আসে।

একদিন ভারি ক্লান্ত ও মনমরা হয়ে এবং মদ না খেয়েই দিদিমা আমার ঘরে এসেছিলেন; সেদিন নিজের থেকেই বলতে শুরু করেছিলেন বাবার কথা।

'শোন্ দাদু, কাল রাত্রে তোর বাবাকে স্বপ্নে দেখেছি। হেজেলগাছের একটা ডাল হাতে নিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে তোর বাবা যেন হেঁটে যাচ্ছিল। জিভটাকে ঝুলিয়ে হ্যা-হ্যা করতে করতে একটা কুকুর ছুট্ছিল তার পিছনে। জানিস্ দাদু, আজকাল কেন জানি মাক্সিম সাভাতেয়েভিচকে আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখি — মনে হয় ওর আত্মা শান্তি পায়নি, এই আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে...'

তারপরেই পর-পর কয়েক সন্ধ্যা ধরে দিদিমা আমার কাছে বাবার গল্প করেছেন। দিদিমার মুখে শোনা অন্য সব গল্পের মতোই বাবার গল্পও সমান কৌতূহলোদ্দীপক। আমার বাবা ছিলেন এক সৈনিকের ছেলে। আমার ঠাকুর্দা সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করে পরে অফিসার হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের অপরাধে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। সাইবেরিয়ায় আমার বাবার জন্ম হয়। বাবার ছেলেবেলাটা ছিল খুবই কষ্টের এবং বাচ্চা বয়সেই তিনি বারকয়েক বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। একবার এমনি পালিয়ে যাবার পরে আমার ঠাকুর্দা শিকারী কুকুর নিয়ে ঠিক খরগোশ-খোঁজার মতো আমার বাবাকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। আরেকবার এমনি পালিয়ে যাবার পরে বাবাকে ধরে এনে ঠাকুর্দা এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগলেন যে পাড়াপড়শীরা এসে বাবাকে উদ্ধার করে এবং লুকিয়ে রেখে দেয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ছোটদের মারপিট করাটা সবকালেই ছিল, না দিদিমা?'

দিদিমা সহজভাবেই জবাব দিলেন, 'ছিল বৈকি।'

বাবার খুব ছোট বয়সে তার মা মারা গেছেন আর বাবার যখন নয় বছর বয়স তখন তার বাপ মারা যান। বাবার ধর্মবাপ পোষ্যপুত্র নেন বাবাকে। বাবার ধর্মবাপ ছিলেন ছুতোরমিস্ত্রী এবং বাবাকে তিনি পের্ম শহরের ছুতোরমিস্ত্রী-দলে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু আমার বাবা পালিয়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে। প্রথমে কিছুদিন তাঁর জীবিকা ছিল অন্ধদের হাত ধরে রাস্তায়-বাজারে পথ

দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া। তারপর ষোল বছর বয়সে তিনি এলেন নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদে। সেখানে কলচিনের স্টীমবোটে ছুতোরমিস্ত্রীর একটি কাজ পেলেন তিনি। বছর কুড়ি যখন তাঁর বয়স তখন তিনি নিজেই একজন পাকা ছুতোরমিস্ত্রী এবং কামরার আভ্যন্তরিক সাজসজ্জা-অভিজ্ঞ। যে কারখানায় তিনি কাজ করতেন সেটি ছিল কোভালিহা স্ট্রীটের আমার দাদামশাইয়ের বাড়ির ঠিক পাশেই।

দিদিমা হাসতে হাসতে বললেন, 'বেড়াটা ছিল খুবই নিচু আর এমন লোক আছে যারা বেড়ার আড়াল মানে না। ব্যাপার হল কী জানিস, একদিন ভারিয়া আর আমি বাগানে ঘুরে ঘুরে র‍্যাস্‌প্‌বেরি ফল তুলছি এমন সময় হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই ধুপ্‌ করে এক লাফ দিয়ে তোর বাবা বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে আমাদের বাগানের মধ্যে হাজির। আমি তো হতভম্ব! ওমা, মানুষটা দেখি আপেলগাছের ফাঁক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের দিকেই আসে! লম্বাচওড়া দৈত্যের মতো চেহারা, পরনে সাদা শার্ট ও ভেল্‌ভেটের ট্রাউজার। তবু খালি পা, খালি মাথা। চামড়ার একটা ফিতে দিয়ে মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মানুষটা কেন এসেছিল জানিস? তোর মা'কে বিয়ে করবার কথা বলতে! আগেও কয়েকবার ওকে জানলার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি। যতোবার চোখ পড়েছে, মনে মনে ভেবেছি—বাঃ, ভারি চমৎকার লোকটি কিন্তু! তারপর মানুষটা যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন বলি—বাপুহে, সোজা রাস্তায় না গিয়ে এমন বাঁকা রাস্তা ধরেছ কেন? — শুনে সে আমার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে বলে—"আকুলিনা ইভানোভনা, আমি তোমার পায়েই নিজেকে সঁপে দিচ্ছি। একবারটি মুখ তুলে তাকাও। একবার তাকিয়ে দেখো আমার দিকে আর ভারিয়ার দিকে। যীশু খ্রীষ্টের দোহাই, আমাদের দু'জনের যাতে বিয়ে হয় সেই ব্যবস্থা করো তুমি!" বোঝ্‌ একবার ব্যাপারটা। কথা বলব কি, থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওদিকে তাকিয়ে দেখি—মাগো মা, তোর মা হতচ্ছাড়ী একটা আপেলগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ইঙ্গিতে মানুষটাকে কি যেন বলছে। দু-চোখ টলটল করছে জলে আর মুখটা ঠিক র‍্যাস্‌পবেরি ফলের মতো টকটকে লাল। আমি বলি — তোমাদের দু'জনেরই এখনো খুব কাঁচা বুদ্ধি — তাই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারনি। কিন্তু এ-ধরনের কিছু করার চেয়ে শুকিয়ে মরে যাওয়া ভালো। আর ভারভারা, তোকেও বলিহারি যাই, তুইও কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে খুইয়েছিস? আর শোনো

বাপু, তোমাকেও বলি, তুমি যে কত বড়ো গর্হিত কাজ করেছ তা বুঝতে পারছ না। তুমি কি তার সমান মর্যাদার লোক? — যে সময়ের কথা বলছি তখন তোর দাদামশাই রীতিমতো পয়সাওলা লোক। তখনো ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়নি, চার-চারটে বাড়ি ও অগাধ টাকাপয়সার মালিক সে এবং একজন গণ্যমান্য লোক। এই ঘটনার কিছুদিন আগেই সবাই মিলে তোর দাদামশাইকে জরি ও ফিতের কাজ করা টুপি আর উনিফর্ম উপহার দিয়েছিল। তোর দাদামশাই একটানা ন-বছর কারিগরদের প্রধান কর্মকর্তা থেকেছেন কিনা তাই। সে-সব কী দিনই গেছে—তোর দাদামশাইয়ের অহঙ্কার কি তখন! এই অবস্থায় আমি আর কী করি বল্? যেটুকু আমার না বললে চলে না তাই বলি ওদের। ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করছিল। আর ওরা দু'জনে এত মুষড়ে পড়েছিল যে ভারি করুণা হচ্ছিল ওদের দেখে। আমার কথা শুনে তোর বাবা দাঁড়িয়ে বলে — "ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে আমি যতোদূর জানি, তিনি কিছুতেই নিজের ইচ্ছায় তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। সুতরাং এই অবস্থায় ভারিয়াকে চুরি করে নিয়ে আমার পালিয়ে যেতেই হবে। আর পালিয়ে যাবার ব্যাপারেই আমরা দু'জনে তোমার সাহায্য চাই।" শোন্ একবার কথাটা! আমার নিজের মেয়েকে আমি চুরি করে পালিয়ে যেতে সাহায্য করব! মানুষটাকে আমি ভাগিয়ে দিতে চাইলাম—এমন কি হাত নাড়িয়ে শাসালাম — তবু সে সরে যায় না, বলে — "ইচ্ছা হয় তো তুমি ঢিল তুলে নিয়ে আমার গায়ে ছুঁড়ে মারতে পারো—কিন্তু এ-ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতেই হবে। তোমার সাহায্য না নিয়ে আমি এখান থেকে কিছুতেই নড়ব না।" এমন সময়ে ভারভারা এগিয়ে আসে, মানুষটার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে —"শোনো মা, আমরা অনেক দিন থেকেই স্বামী-স্ত্রী হয়ে আছি। বলতে গেলে গত মে মাস থেকে। এখন শুধু আমাদের বিয়েটা হওয়া দরকার।" কথাগুলো শুনে আমার একেবারে বসে পড়বার মতো অবস্থা। কী কাণ্ড, মাগো!'

হাসির দমকে দিদিমার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল। তারপর একটিপ নস্যি নিয়ে, চোখ থেকে জল মুছে, আরামের নিশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন:

'তুই এখনো খুবই ছোট, দু'জনে স্বামী-স্ত্রী হওয়া আর দু'জনের বিয়ে হওয়া—এ-দুটোর মধ্যে যে কি তফাৎ তা তুই এখনো বুঝতে পারবিনে। কিন্তু কোনো মেয়ের বিয়ে হবার আগেই যদি বাচ্চা হয় তবে তার চেয়ে কলঙ্ক আর

কিছু নেই। আমার এই কথাটা বড়ো হয়েও মনে রাখিস কিন্তু। কক্ষণো কোনো মেয়েকে লোভ দেখিয়ে এ-ধরনের বিপদের মধ্যে ফেলিসনে যেন। কোনো মেয়েকে এই ধরনের বিপদের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যাওয়া আর আইনের চোখে বাচ্চাকে জারজ হতে দেওয়া — এর চেয়ে বড়ো পাপ আর কিছু নেই। তাহলে আমার কথাটা মনে থাকবে তো? মনে রাখিস কিন্তু! স্ত্রীলোককে সব সময়ে দরদ ও প্রীতির চোখে দেখবি, স্ত্রীলোককে ভালোবাসবি সমস্ত মন দিয়ে, শুধু খানিকটা আমোদ করবার জন্যে নয়। আমার এই কথাগুলো ফেল্‌না মনে করিসনে যেন।'

কথাগুলো বলে দিদিমা কিছুক্ষণের জন্যে নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে চুপ করে রইলেন, তারপর এক সময়ে গা ঝাড়া দিয়ে এগিয়ে চললেন গল্পের সূত্র ধরে।

'শোন্ তারপর। আমি তো ব্যাপারটার কোনো কুলকিনারাই পেলাম না। মাক্সিমের মাথায় একটা চাটি মারলাম, ভারভারার চুলের ঝুঁটি ধরে টানলাম। কিন্তু ওসব করে তখন আর লাভ কি? তোর বাবাই বলে—"আমাদের মারধোর করে তো কোনো ফল হবে না।" তোর মাও তার প্রতিধ্বনি করে— "তার চেয়ে কিছু একটা উপায় ভাবা দরকার। মারধোরের সময় তো অনেক পড়ে আছে।" তখন আমি বলি—তা, টাকাপয়সা কিছু আছে তো? সে বলে—"ছিল। কিন্তু ভারিয়ার জন্যে একটা আংটি কিনে সব খরচ হয়ে গেছে।" তাহলে কি তোমার তিন রুব্‌লই ছিল? সে বলে—"তিন রুব্‌ল নয়! প্রায় একশো।" যে সময়ের কথা বলছি তখন জিনিসপত্রের দাম শস্তা, টাকাটাই ছিল মাগ্‌গি। তোর মা ও বাবার মুখের দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম। দু'জনেই একেবারে ছেলেমানুষ! দু'জনেই একেবারে বোকা! তোর মা বলে—"আংটিটা আমি মেঝের পাটাতনের তলায় রেখে দিয়েছি যাতে তোমার চোখে না পড়ে। আংটিটা বিক্রি করলেই তো টাকা আসে।" এমনি সব কথা। এক্কেবারে ছেলেমানুষ—তাই মনে হচ্ছে না তোর? যাই হোক্, তিনজনে মিলে ঠিক করলাম যে সেই সপ্তাহের মধ্যেই বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে আর আমিই গিয়ে পাদ্‌রির সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিকঠাক করে আসব। কথাবার্তা হল বটে কিন্তু দু-চোখ ফেটে কান্না আসছিল আমার। তোর দাদামশাইয়ের ভয়ে বুকের ভিতরটা কাঁপছিল আর ধুকপুক করছিল। আর ভারভারারও ভয়ংকর অবস্থা। যাই হোক্, সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করলাম আমরা।

কিন্তু তোর বাবার একজন শত্রু ছিল—তোর দাদামশাইয়ের কারখানার এক সর্দার কারিগর। ভীষণ হিংসুটে লোকটা। অনেকদিন থেকেই লোকটা আমাদের ওপর চোখ রেখে সমস্ত ব্যাপারটাই টের পেয়েছিল। তারপর বিয়ের দিন তো এল। বুঝতেই পারছিস, আমার একমাত্র মেয়ে, সুতরাং আমার কাছে সবচেয়ে ভালো পোশাক যা কিছু ছিল তাই দিয়ে তাকে সাজালাম, তারপর হাত ধরে গেটের বাইরে নিয়ে এলাম তাকে। বাইরে রাস্তায় একটা ত্রয়কা অপেক্ষা করছিল; ভারভারা গিয়ে গাড়িতে ওঠে, মাক্সিম শিস দেয়—আর তারপরেই দু'জনকেই নিয়ে গাড়ি চলল। চোখের জল চাপতে চাপতে আমি তো বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই কার সঙ্গে দেখা হল জানিস? সেই শয়তানটার সঙ্গে। আমার কাছে এসে সে বলে — "আমার মনে কোনো বদ মতলবও নেই বা আমি কারও সুখের কাঁটাও হতে চাই না। আকুলিনা ইভানোভনা, আমার দাবি খুবই সামান্য, মাত্র পঞ্চাশটা রুব্‌ল আমাকে দিতে হবে। তাহলেই আমি আর কোনো বাদ সাধব না।" আমার হাতে তখন একটি টাকাও ছিল না। টাকার জন্যে আমার যেমন আকাংক্ষাও নেই, তেমনি টাকা হাতে থাকলেও জমিয়ে রাখতে পছন্দ করিনে। সুতরাং তার কথার জবাবে বোকার মতো আমি বলে বসি—আমার হাতে কিচ্ছু নেই, কাজেই তোমাকে আমি একটি পয়সাও দিতে পারব না। সে বলে—"তাহলে তুমি আমাকে কথা দাও যে পরে দেবে, তাহলেই হবে।" আমি বলি—কথা দেওয়া? কথা দিলেই বা কি, টাকা আসবে কোত্থেকে? সে বলে—"বড়োলোক স্বামীর পুঁজি থেকে পঞ্চাশটা রুব্‌ল সরিয়ে নেওয়া কি খুবই শক্ত কাজ?" আমি কী বোকা, আমার দরকার ছিল তার সঙ্গে কথা বলা, তাকে সেখানে থামানো, আর আমি তার বদলে তার মুখে থুথু ফেলে বাড়ি এসেছিলাম। কিন্তু আমার আগেই সে গিয়ে ঢুকল বাড়ির মধ্যে। তারপরেই সে কী হৈচৈ আর সোরগোল!'

দিদিমা চোখ বুজে রইলেন। অস্পষ্ট একটু হাসি তাঁর মুখের ওপরে খেলা করতে লাগল।

'সে দৃশ্য কল্পনা করে আজও আমার বুক কেঁপে ওঠে। সে যে কী এক এলোপাতাড়ি কাণ্ড! পাগলা বুনো জানোয়ারের মতো হুঙ্কার দিয়ে ওঠে তোর দাদামশাই। তার পক্ষে এ আঘাত সহ্য করা সত্যিই খুব কষ্টের ব্যাপার ছিল। কতদিন ভারভারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জাঁক করে বলেছে যে মস্ত এক উঁচু ঘরে মস্ত বড়োলোকের সঙ্গে ভারভারার বিয়ে দেবে। শেষকালে এই

কিনা সেই উঁচু ঘর, এই সেই বড়োলোক! তবে কি জানিস, যে যাই ভাবুক না কেন, পুণ্যময়ী মেরীমাতা যার সঙ্গে যার জোট বেঁধে রেখেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু হবার উপায় নেই, তারপর তোর দাদামশাই উন্মানময় দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল—যেন সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে। ডাকাডাকি করে জড়ো করল সবাইকে। ইয়াকভ, মিখাইল, কোচ্‌মান ক্লিম, আর সেই সারামুখে ফুটফুট দাগওলা সর্দারকারিগর লোকটা—সবাই এল তৈরি হয়ে। দেখলাম, দাদামশাইয়ের হাতে রয়েছে একটা লাঠি আর ভারি ওজন ঝোলানো চামড়ার ফিতে। মিখাইলের হাতে বন্দুক! আমাদের ঘোড়াগুলো ছিল খুবই ভালো আর তেজী, আমাদের গাড়িটাও ছিল খুব হাল্‌কা ধরনের। মনে মনে আমি ভাবি—ওরা নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবে। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে যায়; ভারভারার ভার রয়েছে যে দেবদূতের ওপর তাঁরই দয়াতে এই বুদ্ধি এসেছিল। আমি করলাম কি, একটা ছুরি নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম কেটে দিয়ে এলাম। আমার ধারণা ছিল, এইভাবে লাগাম কেটে দিলে জোয়াল চলতে চলতে ছিঁড়ে যাবে আর গাড়ি অচল হয়ে যাবে। আর শেষ পর্যন্ত হলও তাই। গাড়ির জোয়াল আল্‌গা হয়ে খসে পড়ল এবং এই দুর্ঘটনায় প্রায় মরতে বসেছিল তোর দাদামশাই, মিখাইল ও ক্লিম। কাজে কাজেই রাস্তায় তাদের অনেকটা দেরি হয়ে গেল। আর ভগবানের অশেষ দয়া, তারা যখন শেষ পর্যন্ত গির্জায় পৌঁছল তার আগেই মাক্সিম ও ভারিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে।

আমাদের বাড়ির লোকরা অত সহজে ছাড়বে কেন। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাক্সিমের ওপর। কিন্তু মাক্সিমও কম যায় না, লম্বাচওড়া চেহারা তার, গায়ের জোরে খুব কম লোকেই তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে। মিখাইলকে সে ধাপের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়; পড়ে গিয়ে একটা হাত জখম হয় তার। আর ক্লিম তো একটা ঘুষি খেয়েই চিৎপটাং। ব্যাপার দেখে তোর দাদামশাই, ইয়াকভ আর সেই সর্দার-কারিগর ভয়েই আর কাছে এগোয় না।

কিন্তু মাক্সিম রাগলেও মাথা গরম করে না। রাগকে সে ঘেন্না করে। তোর দাদামশাইকে সে বলে—"তোমার হাতের ওই লাঠিটা রেখে দাও। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাকে যেটুকু দিয়েছেন তাই আমি নিয়েছি। এখন কোনো মানুষের সাধ্য নেই ঈশ্বরের এই দানকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। তোমার কাছ থেকেও আমি শুধু এইটুকুই চাইছি!" তারপর আমাদের বাড়ির লোকরা ফিরে আসে। গাড়িতে বসে তোর দাদামশাই চিৎকার করে বলে—"ভারভারা, জন্মের মতো বিদায় দিলাম

তোকে। তুই আর আমার মেয়ে বলে পরিচয় দিস্‌নে। আমি আর তোর মুখদর্শন করতে চাই না! তুই মরিস, বাঁচিস, আমার আর কিছু এসে যায় না তাতে!" বাড়ি ফিরে এসে তোর দাদামশাই আমাকে খুব একচোট গালাগালি দিল আর মারল কিন্তু আমি মাঝে মাঝে উঁ-আঁ করা ছাড়া মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করলাম। আমি জানতাম প্রথম চোটটা কেটে গেলেই সব শান্ত হয়ে যাবে এবং যা হবার তা হবেই। তারপর তোর দাদামশাই আমাকে শাসিয়ে রাখে—"শোনো, আকুলিনা, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার মেয়ের সঙ্গে এ-বাড়ির সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে গেছে একথাটি যেন কক্ষণো ভুলে যেও না। মনে করবে, তোমার কোনো মেয়ে নেই — এখানেও নেই, অন্য কোথাও নেই। বুঝেছ তো?" আমি তবু মনে মনে বলি—তোমার ওই লালচুলওলা মাথা নেড়ে যতোই বলো না কেন বাপু, আমি চিনি—রাগ পড়ে গেলে এসব কথা আর কিছু মনে থাকবে না।'

রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি দিদিমার গল্প শুনছিলাম। দিদিমার গল্পের কোনো কোনো অংশ শুনে আমি অবাক হয়েছি। আমার মা'র বিয়ে সম্পর্কে দাদামশাইয়ের মুখে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বর্ণনা শুনেছি আমি। দাদামশাই বলেছেন যে তিনি মা'র এই বিয়ের বিরোধী ছিলেন এবং বিয়ের পরে মা'কে আর নিজের বাড়িতে ঢুকতে দেননি। কিন্তু দাদামশাইয়ের বর্ণনা অনুসারে, মা'র বিয়ে এভাবে গোপনে হয়নি এবং বিয়েতে দাদামশাই নিজেও উপস্থিত ছিলেন। দিদিমাকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, মা'র বিয়ে সম্পর্কে দু'জনের দু-ধরনের বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টা সত্যি, কিন্তু আমার কেমন বাধো-বাধো ঠেকল। তাছাড়া দিদিমার বর্ণনাটাই আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে কারণ দিদিমার গল্পটাই অনেক বেশি চমকপ্রদ। দিদিমা গল্প বলেন দুলে দুলে যেন নৌকায় ভেসে; গল্পের যে-সব অংশ করুণ বা ভয়ঙ্কর সেই সব জায়গা বলবার সময় তাঁর শরীরের এই দুলুনি আরো বেড়ে যায়। একটা হাতে কি যেন তুলে ধরেছেন। চোখ বুজে থাকেন সব সময়েই, ঘন ভুরুদুটো কাঁপতে থাকে আর তাঁর গালে ফুটে ওঠে নিবিড় এক হাসির রেখা। জগতের সবকিছুর প্রতি তাঁর এক অন্ধ ক্ষমা আছে যা দেখে আমি প্রায়ই অভিভূত হই—কিন্তু একেক সময়ে ইচ্ছে হয়, দিদিমা যেন প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠেন।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। প্রথম সপ্তাহ দুয়েক আমি কোনো খোঁজখবরই পেলাম না, ভারিয়া আর মাক্সিম কোথায় আছে। তারপর ওরা বাচ্চা একটা

ছেলেকে দিয়ে আমাকে খবর পাঠাল। পরের শনিবার আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম যেন গির্জার সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগ দিতে চলেছি। কিন্তু তার বদলে সোজা গিয়ে হাজির হলাম ওদের বাড়িতে। অনেক দূরে চলে গেছে ওরা। সুয়েতিনস্কি স্ট্রীটের এক বাড়ির একটা অংশে থাকে। কারখানার কুলিমজুর এবং নানা ধরনের লোক রয়েছে এই বাড়িতে। নোংরা বাড়ি আর হৈ-হট্টগোল লেগেই আছে। কিন্তু ওদের দু'জনের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—দুটি বেড়ালছানার মতো মনের খুশিতে ঘড়ঘড় আওয়াজ করে একসঙ্গে খেলা করছে। আমি ওদের জন্যে কয়েকটা জিনিস এনেছিলাম—চা, চিনি, কিছু ফসলদানা, জ্যাম্, শুকনো ব্যাঙের ছাতা, আর কিছু টাকাপয়সা। টাকাপয়সা ঠিক কত তা আমার মনে নেই, তোর দাদামশাইয়ের থলে থেকে যা পেরেছি চুরি করে এনেছি। নিজের জন্যে যদি না হয় তাহলে আর চুরি করতে দোষ কি! কিন্তু তোর বাবা তো এসব জিনিস কিছুতেই নিতে চায় না, ক্ষুব্ধস্বরে বলে—"আমরা কি ভিখিরি নাকি?" ভারিয়াও স্বামীর সুরে সুর মেলায়—"মা, আপনি আবার এতসব জিনিস আনতে গেছেন কেন?" কিন্তু এসব বললে কি হবে, জিনিসগুলো আমি ঠিকই দিয়ে এসেছিলাম। মাক্সিমকে আমি বলি—হ্যাঁ রে বোকা, ভগবান সাক্ষী করে তুই আমাকে মা বলে মেনে নিয়েছিস না? আর এই বোকা মেয়েটা! তোকে বলি, তুই আমার পেটের মেয়ে নোস্? নিজেদের মা'কে অপমান করলে তোদের ভালো হবে—এ-শিক্ষা তোদের কোত্থেকে হয়েছে? পৃথিবীর মা'কে অপমান করলে স্বর্গের মা চোখের জল ফেলেন যে! আমার কথা শুনে মাক্সিম করে কী, দু-হাতে আমাকে জাপ্টে ধরে ঘরের মধ্যে নাচানাচি শুরু করে দেয়, এমন কি খানিকক্ষণ নাচে আমার সঙ্গে। ভাল্লুকের মতো জোর লোকটার গায়ে! আর ভারিয়ার তো যেন মাটিতে পা পড়ে না। স্বামীর দেমাকে ময়ূরের মতো পেখম তুলে হেঁটে বেড়ায়। তারপর এমন ভারিক্কী চালে নিজের "সংসারের" কথা বলতে শুরু করে যেন সত্যিকারের গিন্নী সে—শুনতে শুনতে আমার তো পেটে খিল ধরবার মতো অবস্থা! ওদিকে চায়ের সঙ্গে যে "ভাত্রুশ্কা"গুলি খেলাম, তা চিবোতে হলে মানুষ তো কোন্ ছার নেকড়ের দাঁতও ভেঙে যায়! আর ঘরেতৈরি পনির বলে যে-জিনিসটা দেওয়া হল তা ঠিক যেন বালি আর কাঁকরের মণ্ডা!

এইভাবেই কাটল অনেক দিন। তুই তখন মায়ের পেটে কিন্তু তবুও তোর দাদামশাই টুঁ শব্দটি করেন না। ভারি একগুঁয়ে এই বুড়ো, পিশাচ! বুড়ো

টের পেত, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। কিন্তু এমন ভাব করত যেন কিছু জানে না। বাড়িতে ভারভারার নাম পর্যন্ত মুখে আনতে পারত না কেউ। কেউ মুখে আনতও না, আমিও না। কিন্তু আমি জানতাম, হাজার হলেও বাপের হৃদয় তো — একদিন না একদিন টলবেই। এবং টললও শেষ পর্যন্ত। একদিন রাত্রে প্রচণ্ড তুষারঝড় হচ্ছে, একপাল ভালুকের মতো জানলাগুলোকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চাইছে বাতাস, গোঁ গোঁ আর্তনাদ করছে চিমনিগুলো, নরকের শয়তানগুলো যেন নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর ওপরে—তোর দাদামশাই আর আমি পাশাপাশি শুয়ে আছি, কারও চোখে ঘুম নেই, হঠাৎ আমি বলে ফেলি — "কী ভয়ংকর রাত গো! গরীব মানুষগুলোর আজ বড়ো হেনস্তা। বিশেষ করে যাদের মনে শান্তি নেই, তাদের আরো কষ্ট!" আমার কথা শুনে তোর দাদামশাই আচমকা জিজ্ঞেস করে বসে — "ওরা কেমন আছে?" আমি বলি — ভালোই আছে। তোর দাদামশাই বলে — "চট্ করে যে জবাব দিলে, কাদের কথা জিজ্ঞেস করছি বলো তো?" আমাদের মেয়ে ভারভারা আর জামাই মাক্সিমের কথা। "কী করে বুঝলে যে ওদের কথাই জিজ্ঞেস করছি?" আমি বলি — হয়েছে গো, হয়েছে! আর কথা ঘুরোতে হবে না! এসব ভড়ং করে লাভ কি — এতে কারও কি শান্তি হচ্ছে? গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে তোর দাদামশাই বলে — "ও রে, শয়তানের দল! হুঃ, কী সব মানুষ!" তারপরে জিজ্ঞেস করে — "তা সেই গবেট্‌টার খবর কী? ওটা একেবারেই গবেট — না?" গবেট কাকে বলছে বুঝলি তো? তোর বাবাকে। আমি বলি — আসল গবেট কারা জান? যারা নিজেরা খেটে খায় না, অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকে। তোমার দুই ছেলে ইয়াকভ আর মিখাইলের কথা ভেবে দেখ তো! গবেট যদি বলতে হয় তো ওদেরই বলা উচিত। এ-বাড়িতে খেটে পয়সা আনছে কে? তুমি। আর ওরা কুটোটি নেড়েও তোমাকে সাহায্য করে না! আমার কথা শুনে তোর দাদামশাই যা মুখে আসে তাই বলে আমাকে গালাগালি করতে শুরু করে। বলে, আমি বোকা, আমি কুঁদুলে, আমি ডাইনী, আরো কত কি তা আমার মনে নেই। আমি একটিও কথা বলি না। তোর দাদামশাই বলে — "তোমাকেও বলিহারি! লোকটা কোত্থেকে এল, কী ধরনের লোক — কিছু জানা নেই, শোনা নেই, তবুও তার পেছনে কি করে তোমার সায় থাকে বুঝি না!" তবুও আমি চুপ করে থাকি। শেষকালে মনের সমস্ত ঝাল ঝেড়ে তোর দাদামশাই যখন শান্ত হয়, তখন আমি বলি — তুমি তো একবার গেলেও পার। নিজের চোখেই

দেখে আসতে পার, দু'জনে কেমন চমৎকারটি আছে। তোর দাদামশাই বলে — "বটে! ওদের অহঙ্কার তো কম নয় যে আমি যাব ওদের কাছে! কেন, ওরা আসতে পারে না?" বাস্, যেই না একথাটি বলা আমি তো একেবারে আনন্দে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করে দিই। আর তোর দাদামশাই আমার চুলের বিনুনিটা খুলতে শুরু করে — আমার চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে ভারি ভালোবাসত তোর দাদামশাই। আমার কান্না দেখে বলে — "হয়েছে গো হয়েছে! তুমি কি ভাব, আমার বুকটা পাথর দিয়ে তৈরি?" তখন তোর দাদামশাইয়ের মনটা খুবই ভালো ছিল রে। পরে এক সময়ে তার মাথায় ঢুকল যে তার মতো চালাক-চতুর আর কেউ নেই। তখন থেকেই তার মনটা ছোট হয়ে গেছে আর বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পেয়েছে।

তারপর আর কি, দু'জনে, অর্থাৎ তোর মা আর বাবা, একদিন এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। সেদিনটি ছিল "সর্বপাপক্ষয় রবিবার"। মস্ত মানুষ দু'জনেই — কী পরিচ্ছন্ন, কী শ্রীমন্ত! তোর দাদামশাইয়ের পাশে মাক্সিম যখন দাঁড়ায়, তোর দাদামশাই তার কাঁধের নিচে পড়ে থাকে। মাক্সিম বলে — "ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, মনে করো না আমি তোমার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক নেবার জন্যে এসেছি। সেই উদ্দেশ্যই আমার নেই। আমি এসেছি আমার সহধর্মিণীর পিতাকে শ্রদ্ধা জানাতে।" একথা শুনে তোর দাদামশাই খুব খুশি; হাসতে হাসতে বলে — "বটে! তোমার বজ্জাতিটা তো কম নয় দেখছি! ওসব চলবে না এখন! আর ওসব বাইরে বাইরে থাকাও নয়, আমার সঙ্গে এ বাড়িতে এসে থাকতে হবে।" ভুরু কুঁচকে মাক্সিম বলে — "ভারিয়া যা ঠিক করবে তাই হবে। আমার এ-বিষয়ে বলার কিছু নেই — ভারিয়ার ইচ্ছাই সব।" তখন শুরু হয়ে যায় তর্কাতর্কি — কিছুতেই দু'জনকে থামানো যায় না। আর তোর বাপও তেমনি, যতোই আমি চোখ টিপি, যতোই আমি টেবিলের নিচ দিয়ে পা দিয়ে ওর পা চেপে ধরি — সে গোঁ ধরে নিজের কথাই বলে চলে! তার চোখদুটো ছিল ভারি সুন্দর — পরিষ্কার আর খুসিতে ভরা দুটি চোখ; ঘন ভুরু। মাঝে মাঝে দু-চোখের ওপরে ভুরুদুটো টেনে নামিয়ে যখন তাকায়, তখন মুখটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। শুধু আমার কথাই শোনে তখন, আর কারও সাধ্য নেই সে-অবস্থায় তার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে। আমার নিজের পেটের ছেলেদের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসতাম ওকে। ও নিজেও সেকথা জানত আর আমাকেও তেমনি ভালোবাসত। দস্যুটা করত কী, আমাকে জড়িয়ে ধরে পাঁজাকোলা করে তুলে

নিত আর সেই অবস্থাতেই ঘরময় ঘুরত আর বলত — "তুমি হচ্ছ আমার সত্যিকারের মা — মাটি-মায়ের মতোই তুমি আমার মা! ভারভারাকে যতোটা না ভালোবাসি তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি তোমাকে!" দুষ্টুমিতে তোর মাও তখন কিছু কম যেত না। একথা শুনে মাক্সিমের দিকে ছুটে এসে সে রাগ দেখাত — "বটে! বটে! তোমার সাহস তো কম নয় হে কাপ-কর্ণ, শালগমের ছা!" আর তারপরেই শুরু হত ঘরের মধ্যে একজনের পিছনে আরেকজনের ধাওয়া আর তিনজনের ছুটোছুটি। কী সব দিনই গেছে তখন, সোনা আমার, মাণিক আমার! আর নাচতে জানত বটে মাক্সিম! অমন নাচ আর কাউকে নাচতে দেখিনি। গানই বা জানত কত! কী চমৎকার সব গান — অন্ধ ভিখিরিদের কাছে শেখা কিনা, অন্ধ ভিখিরিরা যেমন গান গাইতে পারে তেমন আর কেউ পারে না।

তারপর, কী বলছিলাম। দু'জনে উঠে এল আমাদের বাড়ির বাগানের দিককার অংশে। সেখানেই একদিন ঠিক দুপুরবেলা তোর জন্ম হয়। দুপুরবেলা তোর বাবা খেতে আসে বাড়িতে। বাড়িতে এসে ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে তোর অভ্যর্থনা শুনে আহ্লাদে সে যে কী করবে ঠিক করতে পারে না। একেবারে অস্থির কাণ্ড! তোর মাও রেহাই পায় না। তোর মা'কে নিয়ে এমন রাখ্-রাখ্ ঢাক্-ঢাক্ শুরু করে দেয় যে মনে হতে থাকে, এ-জগতে বাচ্চা বিয়োবার মতো শক্ত কাজ আর কিছু নেই! তারপর আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হয় তোর দাদামশাইয়ের কাছে এবং তোর দাদামশাইকে বলে যে তার আরেকটি নাতি হয়েছে। কাণ্ড দেখে তোর দাদামশাইও না হেসে থাকতে পারে না, বলে — "তুমি তো আচ্ছা শয়তান হে মাক্সিম!"

কিন্তু তোর মামারা ওকে দেখতে পারত না। কারণ কী জানিস? ও মদ খায় না, ওর সঙ্গে কথায় কেউ এঁটে উঠতে পারে না, আর কত রকমের ফন্দিফিকির যে ওর মাথায় ঘোরে তার হদিস কেউ পায় না। এই ফন্দিফিকিরই ওর কাল হয়েছিল! একবার "লেণ্ট" উপবাসের সময় প্রচণ্ড এক ঝোড়ো বাতাস উঠেছিল। হঠাৎ শোনা যায়, এক কানে-তালা-লাগানো অমানুষিক শিস্ দেওয়ার শব্দ উঠছে — গোটা বাড়িটা যেন কেঁপে ওঠে। সকলের সে কী ভয় আর আতঙ্ক! বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে বসেছিল। তোর দাদামশাই তো ছুটোছুটি লাগিয়ে দিলেন, আর্তস্বরে চিৎকার করে বললেন যে আইকনের নিচে সমস্ত আলো যেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আর সবাই যেন

প্রার্থনায় বসে। কিছুক্ষণ পরে, যেমন হঠাৎ শব্দটা উঠেছিল তেমনি হঠাৎ সব একেবারে চুপচাপ হয়ে যায়। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। এতে আগের চেয়েও আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল সকলে। তবে তোর ইয়াকভ-মামা কিন্তু ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল। সে বলল — "নিশ্চয়ই মাক্সিমের কাণ্ড এটা!" কথাটা মিথ্যে হয়নি। পরে মাক্সিমই আমাদের বলেছে, সেদিন সে চিলেকোঠার জানলায় এমনভাবে কতগুলো বোতল সাজিয়ে রেখেছিল যে বাতাসের ধাক্কায় বোতলগুলি থেকে শিস দেওয়ার মতো শব্দ হতে থাকে। শুনে তোর দাদামশাই মাক্সিমকে সাবধান করে দিয়ে বলে — "আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি মাক্সিম, বুঝেশুনে চলতে চেষ্টা কোরো, নইলে কোন্‌দিন এই ফন্দিফিকির করতে গিয়েই আবার না তোমাকে সাইবেরিয়ায় চালান হতে হয়!"

একবার এমন শীত পড়ল যে স্তেপ্‌অঞ্চল থেকে নেকড়েগুলো পর্যন্ত পালিয়ে আসে। তারপর থেকে এই নেকড়েগুলোর জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠে সবাই! কখনো কুকুর পাওয়া যায় না, কখনো ঘোড়া ভয় পায়, একবার দেখা যায় একজন মাতাল পাহারাওলার আধ-খাওয়া মরা শরীরটা পড়ে আছে। তোর বাবা করত কি, পায়ে স্কি এঁটে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যেত রাত্রিবেলা। কখনো খালি হাতে ফিরত না — দু-একটা নেকড়েকে শিকার করে আনত। নেকড়েগুলোর ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে ভিতরটা অন্য জিনিস দিয়ে ঠেসে কাঁচ বসিয়ে দিত দু-চোখে। দেখে বোঝাই যেত না যে সেগুলো জ্যান্ত নেকড়ে নয়। একদিন রাত্রে তোর মিখাইল-মামা পায়খানায় গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফিরে আসে। তখন তার এমন অবস্থা যে কথা বলবার ক্ষমতা নেই — চোখদুটো কপালে উঠেছে, মাথার চুল খাড়া হয়ে রয়েছে, নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে প্যাণ্টে জড়াজড়ি হয়ে ধপাস্‌ করে পড়ে যায় আর হাঁপাতে হাঁপাতে কোনো রকমে বলে — "নেকড়ে!" শুনে যে যা হাতের সামনে পায় তুলে নিয়ে ছুটে যায় বাইরের দিকে। গিয়ে দেখে, মিখাইলের কথাই সত্যি; একটি সিন্দুক থেকে নেকড়ের মাথাটা বেরিয়ে আছে। মাথাটাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয় ও লাঠির বাড়ি মারা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু না; মাথাটা নড়েচড়ে না, যেমনি ছিল তেমনি থাকে। তখন সকলে পা টিপে টিপে এগিয়ে উঁকি দিয়ে দ্যাখে। আর তখন বোঝা যায়, আসলে ওটা নেকড়েই নয়, শুধু একটা চামড়া; মাথার ভিতরটায় অন্য জিনিস ঠেসে দেওয়া হয়েছে আর সামনের ঠ্যাঙদুটোয়

পেরেক ঠুকে আট্‌কে দেওয়া হয়েছে সিন্দুকের সঙ্গে! এবারে এই কাণ্ডের জন্যে তোর দাদামশাই মাক্সিমের ওপরে মারাত্মক রকমের ক্ষেপে গেল। অমন চণ্ডালে রাগ আমি আর দেখিনি! কিছুদিন পরে মাক্সিমের এই সমস্ত ফন্দিফিকিরের দোসর হয় ইয়াকভ। হয়তো মাক্সিম একটা কার্ডবোর্ড কেটে মানুষের মাথা তৈরি করেছে, তার মধ্যে চোখ-নাক-মুখ এঁকে দিয়েছে রং দিয়ে, খানিকটা চটের ফেঁসো লাগিয়ে তৈরি হয়েছে চুল — তারপর দু'জনে মিলে বেরিয়ে এই কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটিকে লোকের বাড়ির জানলায় এঁটে দিয়ে আসে। স্বাভাবিকভাবেই পাড়াপড়শীরা ভয় পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে। মাঝে মাঝে দু'জনে চাদর মুড়ি দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। একবার তো এই মূর্তি দেখে একজন পাদ্‌রি ভীষণ ভয় পেয়ে যায় এবং ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে হাজির হয় একজন পাহারাওলার কাছে। পাহারাওলা আরো ভয় পেয়ে প্রাণপণে "বাঁচাও, বাঁচাও!" বলে চিৎকার করতে থাকে। দিনের পর দিন এমনি চলে, ফন্দিফিকিরের আর শেষ নেই। নিজেদের গোঁ ধরে চলে। লোকের পিছনে এভাবে না লাগতে আমি কতবার বলেছি, ভারিয়া বলেছে — কিন্তু কারও কথায় তারা কান দেয় না। বারণ করতে গেলে মাক্সিম হো-হো করে হাসে আর বলে, লোকে যখন না ভেবে না চিন্তে নিতান্তই একটা হাস্যকর কারণে বেসামাল হয়ে পড়ে তখন নাকি তার খুব মজা লাগে। তারপর কী করে তার সঙ্গে কথা বলা যায়, এ্যাঁ?

কিন্তু মানুষকে নাকাল করবার এই স্বভাবের জন্যেই সে নিজেও প্রায় মরতে বসেছিল। তোর মিখাইল-মামার স্বভাবটা ঠিক তার বাপের মতো — তেমনি ছোট মন আর মনের মধ্যে তেমনি একটা আক্রোশ পুষে রাখে। এই মিখাইল মনে মনে ঠিক করল, যে করে হোক্ তোর বাবাকে এই পৃথিবী থেকে সরাতে হবে। শীতের শুরুতে একদিন কোথায় যেন বেড়াতে গেল ওরা। ওরা ছিল চারজন — মাক্সিম, তোর দুই মামা আর একজন পাদ্‌রি (একজন কোচ্‌মানকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অপরাধে এই পাদ্‌রিটি পরে পদচ্যুত হয়)। ইয়ামস্কায়া স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ওরা যায় দ্যুকভ পুকুরের দিকে — ভাব দেখায় যেন ওখানে তারা স্লাইডিং করতে যাচ্ছে। তোর বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু দ্যুকভ পুকুরে পেঁছেই ওরা করে কি, তোর বাবাকে ধাক্কা দিয়ে বরফের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে পুকুরে ফেলে দেয়। এ ঘটনাটা তোকে বোধ হয় আগেও একদিন বলেছি...'

'মামারা এত বদ কেন?'

একটিপ নস্যি নিয়ে শান্ত স্বরে দিদিমা জবাব দিলেন, 'ওরা বদ নয়, বোকা। একেবারেই বোকা। মিশ্‌কা শুধু বোকা নয়, ধূর্তও; ইয়াকভটার তো এখনো জ্ঞানগম্মি কিছু হয়নি... হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওকে তো ওরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়; আর ও যতোবার ভেসে উঠে হাত দিয়ে বরফের কিনারটা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে, ওরা পায়ের বুট দিয়ে ঠুকে ঠুকে ওর আঙুলগুলোকে থেঁতলে দিতে চায়। ওর কপাল ভালো বলতে হবে যে ও ছিল স্বাভাবিক অবস্থায় আর তোর মামারা ছিল মাতাল। কোনো রকমে ও গর্তের মাঝখানটিতে ভেসে থাকে আর জল থেকে নাকটা উঁচু করে নিশ্বাস নেয়। তোর মামারা ওর মাথা লক্ষ্য করে বরফ ছুঁড়তে থাকে, কিন্তু যতোই ছুঁড়ুক, ওকে ঘায়েল করতে পারেনি। তোর মামাদের যখন ধারণা হল যে আর ওদের চেষ্টা করতে হবে না, এমনিতেই ও জলে ডুবে মরবে — তখন ওরা চলে গেল। তার পর দু-হাতে ভর দিয়ে যা হোক্ করে ও জল থেকে বেরিয়ে আসে এবং সোজা ছুটে যায় পুলিসের কাছে। দেখেছিস তো, পুলিসের সদরদপ্তর স্কোয়ারটার ঠিক পাশেই। থানার সার্জেণ্ট ওকে এবং আমাদের বাড়ির সকলকেই জানত। কি করে ব্যাপারটা ঘটেছে জানতে চাইল সার্জেণ্ট।'

বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে কৃতজ্ঞতাভরা স্বরে দিদিমা বলতে লাগলেন:

'মাক্সিম সাভাতেয়েভিচের আত্মাকে ভগবান শান্তি দিন! খাঁটি মানুষ ছিল ও! খাঁটি পথে থাকার পুরস্কার সে পাবেই! পুলিসের কাছে গিয়ে সে আসল ঘটনা একেবারেই ফাঁস করেনি। বলে যে, দোষটা নাকি তার নিজের, মদ খেয়ে বেহুঁশ অবস্থায় ছিল, আচমকা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। সার্জেণ্ট তার কথা বিশ্বাস করেনি, বলে যে সে মিথ্যে কথা বলছে, মাক্সিম যে মদ খায় না তা সে জানে। পুলিসের লোকরা তার সারা গা ভদ্‌কা দিয়ে ডলে দেয়, শুক্‌নো পোশাক পরিয়ে তার ওপরে চাপিয়ে দেয় একটা গরম ভেড়ার চামড়ার কোট, তারপর নিয়ে আসে বাড়িতে। সার্জেণ্ট ও আরো দুজন লোক আসে তার সঙ্গে। ইয়াকভ ও মিখাইল তখনো বাড়ি ফেরেনি, নিজেদের বাবা মা'র মর্যাদা বাড়াতে অন্য কোথাও মদ গিলতে গিয়েছিল। মাক্সিমকে দেখে তোর মা আর আমি তো একেবারেই চিনতে পারি না; সারা শরীর লাল হয়ে গেছে, হাতের আঙুলগুলো থেঁৎলানো — রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, রগের কাছে সাদা সাদা বরফের মতো কি লেগে আছে যেন কিন্তু সেগুলো কিছুতেই গলে পড়ছে না; পরে বোঝা যায় যে ওগুলো হচ্ছে তার মাথার সাদা-হয়ে-যাওয়া চুল।

ভারভারা আর্ত স্বরে চিৎকার করে ওঠে — "মাক্সিম, কী হাল করেছে ওরা তোমার?" ওদিকে সেই সার্জেণ্ট সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে আর হাজার রকম প্রশ্ন করছে। আমার কেমন যেন মনে হতে থাকে, ব্যাপারটা বড়ো গোলমেলে। তখন সার্জেণ্টের কাছে ভারভারাকে পাঠিয়ে মাক্সিমের কাছে এসে আসল ঘটনাটা জেনে নিতে চেষ্টা করি। ফিস্‌ফিস্ করে মাক্সিম বলে — "আগে মিখাইল আর ইয়াকভকে খুঁজে বার করো গিয়ে। ওদের বোলো, ওরা যেন পুলিসের কাছে বলে যে ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে — ওরা গেছে পোক্রভকার দিকে, আর আমি প্রিয়াদিলনি গলির দিকে। ওদের ভালো করে বলে দিও যেন পুলিসের কাছে এই কথাগুলো ঠিকঠাক বলে, নইলে ভারি বিশ্রী পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে।" তখন আমি তোর দাদামশাইয়ের কাছে যাই। বলি — তুমি গিয়ে সার্জেণ্টের সঙ্গে কথা বলো, আমি গেটের কাছে ছেলেদের অপেক্ষায় থাক্‌ছি। তারপর তার কাছে দুর্ঘটনা ও বিপদের কথা খুলে বললাম। শুনে তোর দাদামশাই তো কেঁপেই অস্থির, পোশাক পরতে পরতে বিড়বিড় করতে থাকে — "আমি জানতাম! এমনটি যে ঘটবে তা আমি জানতাম!" অবশ্য তোর দাদামশাইয়ের এই কথাটা ঠিক নয় — কিছুই জানত না সে! তারপর আমার সুপুত্তুররা তো বাড়ি ফিরল। আচ্ছা করে দু'জনের কান মলে দিলাম। মিশ্‌কার মদের নেশা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। কিন্তু ইয়াকভের পেটে বোধ হয় একটু বেশি পড়েছে, সে আবোল-তাবোল বকতে থাকে — "আমি কিছু জানি না! এটা মিশ্‌কার কাণ্ড — ও-ই তো গোদা!" যাই হোক্, সার্জেণ্টকে তো কোনো রকমে শান্ত করা হল, লোকটা এমনিতে খারাপ ছিল না। যাবার সময়ে সে বলে যায় — "তবে আপনারা খেয়াল রাখবেন। যদি আপনাদের বাড়িতে কোনো গণ্ডগোল হয় তো অপরাধীকে আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে বার করব!" সার্জেণ্ট চলে যেতে তোর দাদামশাই মাক্সিমের কাছে গিয়ে বলে — "তোমাকে আর কী বলব বাবাজী! আমি ভালো করেই জানি, তুমি না হয়ে আর কেউ হলে আজ অন্য ব্যাপার দাঁড়িয়ে যেত। আর ভারভারা, তোকেও ধন্যবাদ, এমন একজন সৎ লোককে আমাদের বাড়িতে আনার জন্যে।" সে-সময়ে তোর দাদামশাই ইচ্ছে করলে খুব চমৎকার কথা বলতে পারত। অবশ্য এখন আর সে-লোক নেই, এখন মানুষটার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে আর বুকের ভিতরটাকে কুলুপ এঁটে রেখেছে। ঘরের মধ্যে তখন আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। মাক্সিম কাঁদতে শুরু করে; রোগীর মতো

যেন প্রলাপ বকে—"ওরা কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল? আমি ওদের কাছে কি অপরাধ করেছি? মাগো, কেন ওরা একাজ করতে গেল?" ও আমাকে সবসময়েই ডাকত "মাগো" বলে, ঠিক যেমনভাবে শিশুরা তাদের মা'কে ডাকে; কক্ষণো শুধু "মা" বলত না। আর ওর স্বভাবের মধ্যেও এমন অনেক কিছুই ছিল যা শুধু শিশুদের মধ্যেই থাকে। "কেন? মাগো, কেন?" ও জিজ্ঞেস করে। আমি আর কি করতে পারি? নিরুত্তর হয়ে বসে থাকি আর ওর সঙ্গে সঙ্গেও কাঁদি। তবে ওরাও তো আমার ছেলে, ওদের জন্যেও আমার দুঃখ হতে লাগল। তোর মা করে কি, পট্‌পট্‌ করে ব্লাউজের বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেলে এমন এলোমেলো চেহারা করে বসে থাকে যে মনে হতে পারে যে সে এইমাত্র কারও সঙ্গে লড়াই করে এসেছে, হুঙ্কার দিয়ে বলে সে—"চলো মাক্সিম, আমরা এখান থেকে চলে যাই! আমার ভাইরা আমাদের শত্রু—ওদের দেখলেই ভয় করে! চলো, চলে যাই এখান থেকে!" মেয়েটাকে একটা ধমক দিই—তুমি আর আগুনে খড় গুঁজবার চেষ্টা কোরো না, এমনিতেই বাড়িতে যথেষ্ট ধোঁয়া হয়েছে! এমন সময় তোর দাদামশাই সেই দুটো নির্বোধকে পাঠিয়ে দেয় মাক্সিমের কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে। মেয়েটা করে কি, মিশ্‌কার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে বলে, "এই নাও তোমার ক্ষমা চাওয়া!" আর তোর বাবা বারবার সেই একই প্রশ্ন করে চলে—"তোমরা কি করে একাজ করতে পারলে ভাই? তোমরা তো আরেকটু হলে আমাকে সারা জীবনের মতো পঙ্গু করে ফেলতে? আমার আঙুলগুলোই যদি না থাকত তাহলে আর আমি কাজ করে খেতাম কি করে?" যাই হোক্, কোনো রকমে ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলা হল। তারপর সাত সপ্তাহ কি তারও বেশি শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিল তোর বাবা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমাকে খালি বলত—"মাগো, চলো যাই আমরা অন্য কোনো শহরে। আমার এখানে ভালো লাগে না, বিষণ্ণ জীবন তোমাদের।" তারপরে শীঘ্রই তাকে আস্ত্রাখানে পাঠানো হয়। আস্ত্রাখানে জারের যাবার কথা ছিল, সেই উপলক্ষে বিজয়-তোরণ তৈরি করবার ভার পড়ে তোর বাবার ওপরে। বসন্তকালে প্রথম যে স্টীমবোট ছাড়ে তাতেই তারা চলে যায়। আমার মনে হতে লাগল, আমার বুকের আধখানা কে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। মাক্সিমেরও ভারি কষ্ট হয়েছিল, বারবার আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলে। কিন্তু খুশি হয়েছিল ভারভারা, এত খুশি হয়েছিল যে লুকোবার চেষ্টাও করেনি বেহায়া পাষাণী! এই ভাবে তারা চলে গেল... বাস...'

একঢোঁক ভদ্‌কা গিলে, একটিপ নস্যি নিয়ে, জানলার বাইরে তাকিয়ে স্মৃতি-মন্থন করতে করতে দিদিমা বললেন:

'তোর বাবার সঙ্গে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আমরা ছিলাম অভিন্ন আত্মা...'

মাঝে মাঝে দিদিমার গল্প বলার মধ্যে দাদামশাই এসে ঘরে ঢোকেন, পাখির মতো মুখটা তুলে গন্ধ শোঁকেন বাতাসে, সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাকান দিদিমার দিকে, খানিকক্ষণ গল্প শোনেন দিদিমার, তারপর বিড়বিড় করে বলেন:

'মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা, আগাগোড়া বানানো...'

একদিন দাদামশাই আচমকা জিজ্ঞেস করে বসলেন:

'লেক্সেই, তোর দিদিমা কি এখানে এসে মদ খায়?'

'না।'

'তুই মিথ্যে কথা বলছিস—তোর চোখ দেখেই বুঝতে পারছি, তুই মিথ্যে কথা বলছিস...' অবিশ্বাসের ভাব নিয়েই চলে গেলেন দাদামশাই। তাঁর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে চোখ মটকে একটি প্রবাদবাক্য বললেন দিদিমা:

'জলে দিলে নাড়া, মাছে খায় তাড়া!'

একদিন দাদামশাই এসে দাঁড়ালেন ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে। মেঝের থেকে একটিবারের জন্যেও চোখ না তুলে বললেন:

'গিন্নী...'

'উঁ?'

'ব্যাপারটা দেখছ তো?'

'দেখছি।'

'কী মনে হয় তোমার?'

'কপালের লেখা, বুঝলে গো, কপালের লেখা। মনে আছে অভিজাত ভদ্রলোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে?'

'আছে বৈকি।'

'মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলেছিলে।'

'তবু তার কিছুই অবশিষ্ট যে নেই, সে এখন গরীব।'

'যাক্‌ গিয়ে, মেয়ের ব্যাপার মেয়ে নিজেই বুঝুক।'

দাদামশাই চলে গেলেন। আমার মনে হতে লাগল, একটা কিছু দুর্বিপাক ঘটতে চলেছে। দিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম:

'তোমরা কি বিষয়ে কথা বলছিলে?'

আমার পায়ে মালিশ করতে করতে দিদিমা মনের ঝাল প্রকাশ করতে লাগলেন, 'সব কথা তোর জানা চাই—না? এইটুকু বয়সেই যদি সবকথা জেনে বসে থাকিস তাহলে বড়ো হলে আর জানবার কিছুই বাকি থাকবে না।' বলে তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে হেসে উঠলেন।

'হায় রে লেক্সেই, তোর দাদামশাইয়ের আজ কী অবস্থা! ভগবানের চোখে কতটুকু সে? একটা ধূলোকণার মতো! কাউকে কিছু বলিসনে লেক্সেই, কিন্তু তুই শুনে রাখ, তোর দাদামশাইয়ের আর নিজের বলতে কিছু নেই—শেষ কপর্দক পর্যন্ত হারিয়েছে। এক ভদ্রলোককে মোটা রকমের টাকা ধার দিয়েছিল, বেশ কয়েক হাজার হবে। সেই ভদ্রলোক ফতুর হয়ে গেছে...'

নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে বহুক্ষণ তিনি চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গিয়ে সারা মুখটা জুড়ে বসল একটা থম্‌থমে বিষণ্ণতা।

'কী ভাবছ দিদিমা?'

'ভাবছি তোকে কোন্ গল্পটা বলব।' হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে তিনি বললেন, 'আচ্ছা শোন্ তাহলে ইয়েভস্তিগনেই-এর গল্পটাই বলি, কেমন? গল্পটা হচ্ছে এই:

এক যে ছিল বুড়ো ডীকন — ইয়েভস্তিগনেই নাম
মনে মনে ভাবত সে যে, প্রকাণ্ড তার দাম।
অগ্নিসম উজ্জ্বলতা তার কোথায় তুলনা
আর পুরোহিত সবার চেয়েও অধিক মহিমা।
দোকানদার বা ব্যবসায়ী — এরা তো কোন্ ছার
আর কেউ নাই তাহার মতো কী অপরূপ বাহার।
দেমাক-ঠাসা ময়ূর কিংবা বোকা মুরগীর মতো
বকম বকম চলাফেরা চাউনি পেঁচার মতো।
পাড়াপড়শী সবার তরে আছে অনুক্ষণ
বড়ো বড়ো বুলি ঠাসা বাছা অনুশাসন।
সকাল থেকে রাত অবধি বিরাম বিশ্রাম নাই
সবার কান ঝালাপালা সবাই খোঁজে ঠাঁই।
এ পৃথিবীর কোনো কিছুই নয়কো মনমতো
সবখানেতেই দোষত্রুটি আপদ জঞ্জাল যতো।

তাকিয়ে দেখেন ছাদের দিকে — ছাদটা নিচু অতি
হাঁকিয়ে চলেন ঘোড়ার গাড়ি — গাড়ির নেইকো গতি।
কামড় বসান আপেলফলে — একটুও নয় মিঠে
বসেন এসে বাইরে রোদে — পান না স্বস্তি মোটে।
যতোই দেখেন দুনিয়াটাকে ততোই বলেন তিনি:

চোখ ঘুরিয়ে গাল ফুলিয়ে গল্প বলতে লাগলেন দিদিমা, তাঁর মুখে ফুটে উঠল একটা চেষ্টাকৃত অদ্ভুত বোকামির ছাপ, সুর করে করে তিনি বলে চললেন:

দুনিয়া গড়ার ফন্দিফিকির ভালোমতোই জানি।
সৃষ্টিকর্তা হতাম যদি দেখিয়ে দিতাম ক্ষণে
এই পৃথিবী হত ভালো হাজার হাজার গুণে।
কিন্তু আমার নেইকো সময় নেইকো কোনো সায়
হাজার কাজের মানুষ আমি হাজার রকম দায়।

এক মুহূর্ত থেমে চাপা স্বরে বলে চললেন আবার:

হঠাৎ একদিন শয়তানেরা এসে হাজির হয়
বলে তাকে: 'এ পৃথিবীর কোনো কিছুই পছন্দ তো নয়?
চলো তবে সবাই মিলে নরকে বাস করি
কী চমৎকার আগুন সেথায় আহা মরি মরি।'
এই না শুনে ডীকনমশাই যেই না উঠে দাঁড়ায়
জোড়া শয়তান চাপে পিঠে ঘাড়টি ধরে হায়।
বাদবাকিরা কামড়ে ছিঁড়ে আঁকড়ে ধরে তাকে
ডীকনমশাই নাকাল ভারি মুখটি বুজে থাকে।
শয়তানেরা ঠেলা মারে — পড়েন গিয়ে শেষে
ফুঁসছে যেথায় আগুন সেথায় প্রচণ্ড আক্রোশে।
'এবার বলুন ডীকনমশাই ভালো লাগছে কিনা?'
ডীকনমশাই ভাজা-ভাজা চক্ষু রক্তপানা।
তবুও তাঁর ভারিক্কী চাল বজায় রাখেন তিনি
ঠোঁট বাঁকিয়ে ঝাঁজ ফুটিয়ে বলেন, 'জানি জানি,
নরক দেশের আগুনটা তো চোখধাঁধানো বটে
কিন্তু বড়ো বেশি ধোঁয়া ভালো নয়কো মোটে।'

ঘুমজড়ানো গভীর টানা সুরে গল্পটা শেষ করলেন তিনি, তারপর মুখের ভাব বদলে আমার দিকে ফিরে বললেন:

'ইয়েভস্তিগনেই শেষ পর্যন্ত হার মানেনি। লোকটার এই একটা মস্ত গুণ ছিল—নিজের গোঁ বজায় রাখতে পারত সব সময়ে—ঠিক তোর দাদামশাইয়ের মতো! নে, এবার রাত হয়েছে, ঘুমো...'

আমার মা কচিৎ আমাকে দেখবার জন্যে ওপরে আসত। এলেও বেশিক্ষণ থাকত না, দু-একটা কথা বলেই চলে যেত তাড়াতাড়ি। মা দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে, আরো ভালো ভালো পোশাক পরে—কিন্তু দিদিমার মতো মা'র মুখেচোখেও একটা কেমন নতুন ভাব, কী যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে মা। ব্যাপারটা কী হতে পারে, আমি অনুমান করতে চেষ্টা করলাম।

দিদিমা আমাকে গল্প বলেন কিন্তু আমার আর তাতে আগ্রহ নেই। অস্পষ্ট একটা আতঙ্ক দিনের পর দিন আমার মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে—এমন কি দিদিমা যখন বাবার গল্প বলতে শুরু করেন তখনো এই আতঙ্কের ভাব আমার মন থেকে দূর হয় না।

একদিন আমি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার বাবার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না কেন?'

চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে দিদিমা জবাব দিলেন, 'তা আমি কী করে জানব? ওসব হচ্ছে স্বর্গের ব্যাপার—ঈশ্বরের রাজ্য। আমাদের মতো মানুষের পক্ষে ওসব বোঝা সম্ভব নয়...'

মাঝে মাঝে রাত্রে যখন ঘুম আসে না, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি গাঢ় নীল আকাশে তারার মিছিল চলেছে। কল্পনায় নানা করুণ গল্প ভেসে ওঠে, আর প্রত্যেকটি গল্পেরই নায়ক আমার বাবা। তিনি চলেছেন একা একা, তাঁর হাতে লাঠি, আর একটা লোমশ কুকুর চলেছে তাঁর পিছনে...

বার

বিকেল বেলা একদিন অল্প একটু ঘুমিয়েছিলাম। সন্ধ্যার সময়ে ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম, আমার পাদুটোতেও সাড়া জেগেছে। বিছানার ধার দিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম পাদুটোকে; তখন আবার পাদুটোকে অসাড় ও অবশ মনে হতে লাগল। তবে যাই হোক্, একটা উপকার হয় এ-ব্যাপারে; আমার পাদুটো যে আস্ত আছে এবং আবার আমি হাঁটা-চলা করতে পারব—এই বিশ্বাসটুকু ফিরে আসে আমার মনে। এই অভিজ্ঞতা আমার মনে এমন একটা তীব্র আনন্দ সঞ্চারিত করে যে আমি চিৎকার করে উঠি এবং মেঝের ওপরে পায়ে

ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। অবশ্য চেষ্টাটা সফল হয় না; আমি পড়ে যাই। কিন্তু তবুও হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাই দরজার দিকে; সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামি। আর ভাবি—আমাকে দেখে নিচের সবাই কি-ভাবেই না আঁতকে উঠবে।

এখন আর আমার মনে নেই, সে-অবস্থায় কী করে আমি মা'র ঘরে পেঁাছেছিলাম। দেখলাম, আমি দিদিমার কোলে শুয়ে আছি আর আমার চারদিকে অপরিচিত সব লোকের ভিড়। সবুজ রোগা এক বুড়ীও ছিল সেই ভিড়ের মধ্যে।

ঘরের অন্য সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে বুড়ী বলল, 'ওকে র‍্যাস্পবেরি জ্যাম দিয়ে একটু চা খেতে দাও আর কম্বল দিয়ে মুড়ে দাও ভালো করে...'

বুড়ীর আপাদমস্তক সবুজ। পোশাক সবুজ, টুপি সবুজ, মুখ সবুজ, বাঁ চোখের নিচের আঁচিল সবুজ, এমন কি আঁচিলের মাঝখান থেকে যে একগাছি চুল বেরিয়ে এসেছে তাও সবুজ ঘাসের মতো। তলার ঠোঁটটাকে নিচের দিকে নামিয়ে আর ওপরের ঠোঁটটা উঁচু দিকে তুলে, সবুজ দাঁতের পাটি বার করে এবং আঙুল খোলা লেসের কালো দস্তানাপরা হাত দিয়ে চোখদুটোকে আড়াল করে বুড়ী তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমতা আমতা করে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে, দিদিমা?'

জবাব দিলেন দাদামশাই, অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন, 'ইনি তোমার আরেকজন ঠাকুমা হতে চলেছেন।'

আমার মা মুচকে হেসে ইয়েভগেনি মাক্সিমোভকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল:

'আর এই হবে তোর বাবা।'

আরও কি সব কথা মা তাড়াতাড়ি বলে গেল কিন্তু আমার মাথায় একবর্ণও ঢুকল না। চোখদুটো কুঁচকে মাক্সিমোভ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছে:

'আমি তোমাকে এক বাক্স রং কিনে দেব খোকা।'

ঘরের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল আলো। কোণের একটা টেবিলের ওপর রুপোর ঝাড়বাতি জ্বলছে; প্রত্যেকটি ঝাড়ে পাঁচটি করে মোমবাতি। ঝাড়বাতিগুলোর ঠিক মাঝখানে দাদামশাইয়ের প্রিয় আইকন: 'ওগো মা, কেঁদো না!' মোমবাতির আলোয় আইকনের মুক্তাখচিত ফ্রেম ঝল্সে উঠছে, গলে গলে পড়ছে; সোনালী মুকুটে বসানো গাঢ় লাল পাথরগুলি উঠছে ঝিকমিকিয়ে। জানলার

বাইরের অন্ধকার থেকে কতগুলো অস্পষ্ট মুখ শার্সির ওপরে নাক চেপে পিটপিট করে তাকিয়ে আছে ঘরের মধ্যে। আমার চারদিকে দুলে উঠেছে সমস্ত কিছু। সেই সবুজ স্ত্রীলোকটি ঝুঁকে পড়েছে আমার ওপরে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে আমার কানের পিছনদিক পরীক্ষা করে বিড়বিড় করে বলছে:

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...'

আমাকে কোলে নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে দিদিমা বললেন, 'মূর্ছা গেছে।'

আমি কিন্তু মূর্ছা যাইনি, শুধু চোখ বন্ধ করে ছিলাম। আমায় নিয়ে যখন দিদিমা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন, আমি বললাম:

'তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। বাস, আর একটিও কথা নয়।'

'ঠকের দল...'

আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দিদিমা নিজেই বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। আর বারবার বলতে লাগলেন আমাকে:

'ওরে, এবার কেঁদে নে, প্রাণ ভরে কেঁদে নে!'

কিন্তু কাঁদবার ইচ্ছে আমার ছিল না। ওপরের এই ঘরটা ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। আমার শরীরটা কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা নড়ছে আর কিচ-কিচ শব্দ করে উঠছে। সেই সবুজ স্ত্রীলোকটি যেন দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে: কিছুতেই মিলিয়ে যায় না। আমি ভান করলাম যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। দিদিমা আমাকে একা রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

তার পরের কয়েকটা দিন কাটল একটা নিরুৎসাহ একঘেয়েমির মধ্যে দিয়ে। বিয়ের কথা ঘোষণা করেই আমার মা চলে গেছে। বাড়ির মধ্যে বুক-চাপা নিস্তব্ধতা নেমে এল।

একদিন সকালে একটা বাটালি হাতে নিয়ে দাদামশাই হাজির। শীত-জানলার পুটিং তিনি বাটালি দিয়ে কেটে কেটে তুলে ফেলতে লাগলেন। তারপরেই দিদিমা এলেন এক বালতি জল আর খানিকটা ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে।

নীচু গলায় দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর গো?'

'কিসের খবর?'

'তুমি কি খুশি হয়েছ?'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দিদিমা আমাকে যে-জবাব দিয়েছিলেন, এবারে দাদামশাইকেও সেই একই জবাব দিলেন:

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। বাস, আর একটিও কথা নয়।'

এই সরল কথাগুলোর এখন একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। মস্ত আর অপ্রিয় একটা ঘটনা গোপন করে রাখতে চাইছে কথাগুলো। এমন একটা ঘটনা যা সবাইকে মেনে নিতে হচ্ছে কিন্তু মুখে যা উল্লেখ করা যায় না।

শীত-জানলার কপাটটা সাবধানে খুলে নিয়ে দাদামশাই সেটা নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। দিদিমা গিয়ে দাঁড়ালেন উন্মুক্ত জানলার সামনে। বাইরে বাগান থেকে স্টার্লিং আর চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। ভিজে মাটির মাথা-ঝিমঝিম-করা গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। চুল্লির নীলাভ টালিগুলো ঔদাসীন্যে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে — সেদিকে তাকিয়ে আমার শরীরটা শিরশির করে উঠল। সাবধানে বিছানা থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

'এখন আর খালি পায়ে হাঁটাচলা করিসনে বাপু,' দিদিমা আমাকে সাবধান করে দিলেন।

'আমি একটু বাগানে যাচ্ছি।'

'আরেকটু পরে যাস। এখনো মাটি ভিজে রয়েছে।'

দিদিমার কথা মেনে চলবার ইচ্ছে আমার ছিল না। বড়োদের সান্নিধ্য এখন আর আমার ভালো লাগছে না।

ফ্যাকাশে সবুজ রঙের কচি কচি ঘাসের ডগা ইতিমধ্যেই মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলেছে। আপেল গাছগুলো ছেয়ে গেছে নবমঞ্জরীতে। পেত্রভনার বাড়ির ছাদে সবুজ শ্যাওলার চমৎকার কার্পেট বিছানো। চারদিকে পাখির মেলা। বরফ-গলা মাটির গন্ধে আমার নেশা ধরে গেল। বরফের তাড়নায় নুয়ে-পড়া বাদামী রঙের আগাছায় চিহ্নিত হয়ে আছে কালো গর্তটার কিনারা। এখানেই পিওতর-কাকা নিজের গলায় ছুরি বসিয়েছিল। সারা বাগানের মধ্যে এই আগাছাগুলোকেই সবচেয়ে বিশ্রী দেখতে। এই আগাছাগুলো বা আগুনে-পোড়া এই নিঃসঙ্গ খুঁটিগুলো চারদিকের বসন্ত-আবহাওয়ায় একেবারেই বেমানান। এক কথায়, সারা বাগানের মধ্যে এই গর্তটাই গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেবার মতো একটা বেখাপ্পা ব্যাপার হয়ে উঠেছে। আমার কেমন একটা রোখ চেপে গেল যে এক্ষুণি গিয়ে আগাছাগুলোকে উপড়ে ফেলি, ইট আর আগুনে পোড়া খুঁটিগুলোকে সরিয়ে দিই ওখান থেকে, যতো জঞ্জাল জড়ো

হয়ে আছে সব ঝেঁটিয়ে ফেলে পরিষ্কার করে ফেলি জায়গাটা, তারপর নিজের জন্যে একটা কুঞ্জ রচনা করি ওখানে—যেটা হবে বড়োদের নাগালের বাইরে আমার নিভৃত গ্রীষ্মযাপনের স্থান। সঙ্গে সঙ্গে আমি কাজে লেগে গেলাম। এতে আমার খানিকটা উপকারও হল। কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমাদের বাড়ির সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো ভুলে গেলাম আমি। ঠিক যে ভুলে গেলাম তা নয়, ক্ষতটা রয়েই গেল, কিন্তু তার যন্ত্রণাটা কমে এল আস্তে আস্তে।

আমার দিদিমা ও মা জিজ্ঞেস করেন, 'অমন মনমরা হয়ে থাকিস কেন রে?' এ-প্রশ্নের কী জবাব দেব ভেবে পাই না। বাড়ির কারও ওপর আমার রাগ নেই, কিন্তু বাড়ির কোনো ব্যাপারই আমার আর ভালো লাগে না, সব কিছু যেন আমার পর হয়ে উঠল। সেই সবুজ স্ত্রীলোকটি প্রায়ই আসে আমাদের বাড়িতে; কখনো বিকেলের খাবার সময়ে, কখনো চায়ের সময়ে, কখনো রাত্রের খাবার সময়ে। এসে বসে থাকে পুরনো বেড়ার জীর্ণ খুঁটির মতো। তার চোখদুটো যেন অদৃশ্য সুতো দিয়ে মুখের সঙ্গে সেলাই করা; হাড়-বের-করা গর্তের মধ্যে চোখদুটো অতি অনায়াসে ঘুরপাক খায়; সমস্ত কিছু দেখে, সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। ঐশ্বরিক বিষয়ে কথা বলবার সময় ছাদের দিকে চোখদুটো নিবদ্ধ হয়, আর পার্থিব বিষয়ে কথা বলবার সময় মেঝের দিকে। তার ভুরুদুটোকে দেখে মনে হয়, কোনো একটা দুর্জ্ঞেয় পদ্ধতিতে ভুষির প্রলেপ দিয়ে তৈরি। চওড়া চওড়া দাঁতগুলো যা কিছু সে মুখের মধ্যে পোরে তা নিঃশব্দে গুঁড়িয়ে ফেলে। খাবার সময়ে কাঁটাটা ধরে অদ্ভুত তির্যক ভঙ্গিতে, হাতের ছোট আঙুল উঁচিয়ে থাকে। কানের সামনে গোল গোল বলের মতো হাড় চরকির মতো ঘোরে আর কানদুটো নড়তে থাকে। মুখের চামড়া হল্‌দে আর কুঁচ্‌কনো আর এত বেশি মাজাঘষা যে গা ঘিন্‌ঘিন্ করে। আর এই চামড়ার ওপরে আঁচিলের সবুজ চুলগাছা নড়াচড়া করে বেড়ায়। মা ও ছেলে দু'জনেই এত মাজাঘষা যে ওদের কাছে ঘেঁষতে আমার ভয় করে। আমাদের দেখাসাক্ষাতের প্রথম কয়েকদিন বুড়ী বারকয়েক চেষ্টা করেছিল, ধুনো আর ধোবিখানার সাবানের গন্ধওলা তার শুক্‌নো হাতটায় যেন আমি চুমু খাই। কিন্তু যতোবারই এই উপলক্ষ উপস্থিত হয়েছে, আমি পালিয়ে গেছি।

বুড়ী তার ছেলেকে বারবার বলে, 'বুঝলি তো ইয়েভগেনি, ছেলেটাকে ভালোমতো শিখিয়ে পড়িয়ে একটু সভ্যভব্য করা দরকার।'

একথা শুনে ইয়েভগেনি বাধ্য ছেলের মতো ভ্রু কুঁচকে মাথা নোয়ায় কিন্তু একটিও কথা বলে না। বুড়ীর এই সবুজ উপস্থিতির সামনে সবাই ভ্রু কোঁচকায়।

এই বুড়ীকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। বুড়ীর ছেলেকেও না। আমার এই বিদ্বেষ এত বেশি প্রগাঢ় যে এজন্যে আমাকে বহু প্রহার সহ্য করতে হয়েছে।

একদিন আমরা একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম। বুড়ী হঠাৎ চোখ ভয়ানকভাবে পাকিয়ে বলে উঠল:

'বাছা আলিওশা, অমন গপ্‌গপ করে রাক্ষসের মতো গিলছ কেন? খাবার গলায় আটকে যাবে যে।'

আমি করলাম কী, খাবারের টুকরোটা মুখ থেকে বার করে নিয়ে কাঁটায় বিঁধিয়ে বাড়িয়ে ধরলাম তার দিকে।

'খাবারের ওপর আপনার এতই যদি লোভ তো এই নিন।' বললাম আমি।

মা আমাকে এক ঝট্‌কায় টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপরে লজ্জাকরভাবে আমাকে বন্ধ করে রাখা হল ছাদের ঘরে।

কিছুক্ষণ পরেই দিদিমা উঠে এলেন ওপরের ঘরে। তারপরেই মুখে হাত চাপা দিয়ে তাঁর সে কী হো-হো হাসি।

'আরে, বাবাঃ, কোথায় যাব রে আমি! তোর মাথায় এত দুষ্টু বুদ্ধিও খেলে!'

দিদিমার মুখে হাত চাপা দেবার ভঙ্গিটুকু আমার ভালো লাগল না। দিদিমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমি ছাতে উঠে এলাম এবং সেখানে চিম্‌নির পিছনটিতে বসে রইলাম বহুক্ষণ। হ্যাঁ, আমার ভয়ানক ইচ্ছে করে, ওদের সবাইকেই মুখের ওপরে যা-তা বলি, ওদের সবাইকেই খানিকটা নাকানি-চোবানি খাওয়াই। এই ইচ্ছেকে আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারি না। চেপে রাখাটা আমার পক্ষে ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাকে এই শক্ত ব্যাপারটাই আয়ত্ত করতে হয়েছিল।

একদিন আমি করলাম কী, আমার ভাবী সৎ-বাপ আর ভাবী ঠাকুমা যে চেয়ারদুটিতে বসে, তার ওপরে চেরি-আঠা মাখিয়ে রেখে দিলাম। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনেই শক্তভাবে এ'টে গেল চেয়ারের সঙ্গে—সে এক ভারি মজার ব্যাপার। সেজন্যে দাদামশাই তো আমাকে ধরে আচ্ছা করে পিট্‌টি দিলেন। এসব হয়ে যাবার পরে মা উঠে এল আমার

ছাদের ঘরে। আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে শক্তভাবে চেপে ধরে বলল:

'হ্যাঁ রে, তুই এত দুষ্টুমি করিস কেন বল্ তো? তোর এই দুষ্টুমির জন্যে আমাকে যে কতখানি ভুগতে হয় তা যদি তুই জানতিস!'

মা'র দু-চোখ ভরে উজ্জ্বল জল টলটল করছে। গালের ওপরে আমার মাথাটা চেপে ধরেছে মা। মা'র মারের চেয়েও এতে বেশি কষ্ট হ'ত। মা'র কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, মা যদি না কাঁদে তাহলে আর আমি কক্ষণো মাক্সিমভদের পিছনে লাগব না।

আমাকে নীচু গলায় মা বলল, 'এই তো চাই। আর কক্ষণো দুষ্টুমি করিসনে। এই দ্যাখ্ না, শীগ্গিরই আমাদের বিয়ে হবে, বিয়ের পরে আমরা যাব মস্কোতে। মস্কো থেকে ফিরে এলে তুইও থাকবি আমাদের সঙ্গে। ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ খুব ভালো লোক — যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি মনটাও নরম। দেখিস তুই, ওকে তোরও ভালো লাগবে। তোকে আমরা হাইস্কুলে ভর্তি করে দেব। তারপর তুইও হবি ওর মতো ছাত্র। তা হলে পর তুই ইচ্ছে করলে ডাক্তারও হতে পারিস বা অন্য যা খুশি হতে পারিস। লেখাপড়া যে শেখে তার কি আর কিছু অসাধ্য থাকে! যা এবার একছুটে বাইরে গিয়ে একটু খেলা কর গিয়ে...'

আমার মনে হতে লাগল, এই 'তারপর' বা 'তা হলে পর' ইত্যাদি কথাগুলো সিঁড়ির ধাপের মতো পর পর নেমে গেছে আর সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি ক্রমশ মা'র কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে এক অন্ধকার নিঃসঙ্গতায় চলে যাচ্ছি। আমার জন্যে ভবিষ্যতের যে চিত্র মা এঁকেছে তাতে আমি কিছুমাত্র উল্লসিত হইনি। ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে বলি:

'মা, তুমি বিয়ে কোরো না। আমি নিজেই কাজ করে তোমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেব।'

কিন্তু কথাটা আমি বলতে পারিনি। মা যখনই আমার সঙ্গে কথা বলে তখন আমার মনটা আবেগে একেবারে গলে যায় আর মা'র জন্যে মস্ত কিছু একটা করতে ইচ্ছে করে—কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে কোনো দিনই মা'র কাছে বলতে পারিনি।

এদিকে বাগানে আমার পরিকল্পনামতো কাজ এগিয়ে চলেছে। আগাছাগুলোকে টেনে তুলেছি আর গোড়া থেকে কেটে দিয়েছি। ইটের গাঁথুনি তুলেছি, গর্তের ঢালু কিনারের চারদিক থেকে ইট সাজিয়ে দিলাম,

সেগুলি দিয়ে তৈরি করেছি বেশ চওড়া একটি আসন যাতে শুয়ে থাকাও চলতে পারে। নানা রঙের কাঁচ আর ডিশের ভাঙা টুক্‌রো যোগাড় করে চমৎকারভাবে বসিয়ে দিয়েছি ইটের ফাঁকে ফাঁকে গাঁথুনির মধ্যে। সূর্যের আলো এসে যখন পড়ে তখন এই কাঁচ আর ডিশের টুক্‌রোগুলো গির্জার উপাসনা-বেদির মতো চক্‌চক্‌ করে আর ঝল্‌সে ওঠে।

মনোযোগের সঙ্গে আমার কাজ পর্যবেক্ষণ করতে করতে একদিন আমার দাদামশাই বললেন, 'বাঃ, মাথা খাটিয়ে চমৎকার জিনিসটা করেছিস তো! তবে কি জানিস, আগাছাগুলোর শেকড় মাটির মধ্যে রয়ে গেছে. ওগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আচ্ছা, ওজন্যে তোকে ভাবতে হবে না। তুই একটা কাজ কর তো, আমাকে একটা কোদাল এনে দে, আমি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে শেকড়গুলো বার করে দিচ্ছি।'

কোদাল আনতেই তিনি প্রথমে থুথু দিয়ে হাত ভিজিয়ে নিলেন, তারপর হুঁম হুঁম শব্দ করতে করতে গভীরভাবে খুঁড়তে শুরু করে দিলেন জমিটা।

'এবার আগাছার শেকড়গুলোকে ফেলে দে। দেখিস তুই, তোর জন্যে আমি এখানে সূর্যমুখী আর হলিহক্‌'এর চারা লাগিয়ে দেব। তাহলে কী সুন্দর যে হবে জায়গাটা— সত্যিই ভারি সুন্দর...'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি কোদালে ঠেস দিয়ে নিশ্চল ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ক্ষুদে ক্ষুদে, কুকুরের মতো বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর চোখদুটো থেকে দর দর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

'কী হল দাদামশাই?'

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মুখটা মুছে নিয়ে তিনি তাকালেন আমার দিকে।

'হুঁঃ, এর মধ্যেই শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে গেছে। আরে বাবাঃ, পোকাগুলো কি-রকম কিলবিল করছে দেখছিস!'

আবার খুঁড়তে শুরু করলেন তিনি। হঠাৎ বলে উঠলেন:

'এসব করে কিছু লাভ নেই। মিথ্যে এসব করা, ভাই। শীঘ্রই এই বাড়িটা আমাকে বিক্রি করে ফেলতে হবে। হয়তো সামনের শরৎকালের মধ্যেই। তোর মা'র বিয়ের যৌতুক দিতে হবে তো — সেজন্যে টাকা দরকার। বুঝলি কিনা, আর যে-ভাবেই থাকুক না কেন, অন্তত তোর মা'র যেন কোন কালে থাকাখাওয়ার কষ্ট না হয়...'

কোদালটা ছ‍ুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতটা একবার ঝাঁকিয়ে তিনি চলে গেলেন স্নানঘরের পিছনে; বাগানের ওই কোণটিতে কতকগ‍ুলো লালনক্ষেত্র তৈরি করেছেন তিনি। আমি নিজেই খ‍ুঁড়তে শ‍ুর‍ু করলাম এবং আচমকা কোদালটা লেগে গিয়ে আমার পায়ের ব‍ুড়ো আঙ্গ‍ুলটায় বড় আঘাত দিল।

এই আঘাতের ফলে মা'র বিয়েতে আমি আর যোগ দিতে পারিনি। কোনোমতে গেট পর্যন্ত হে'টে এসে দ‍ূর থেকেই মা'র যাওয়া দেখেছি। মাক্সিমভের হাতটা ধরে আছে আর মাথা নিচু করে পথ চলছে মা। পাথরবসানো ফুটপাথের ফাটল দিয়ে কচি কচি ঘাসের ডগা মাথা তুলেছে; সেই ঘাসের ডগাগ‍ুলোকে সতর্কভাবে বাঁচিয়ে সাবধানে পা ফেলছে মা— যেন পেরেক-বসানো রাস্তা দিয়ে হাঁটিতে হচ্ছে তাকে।

কোনো রকম ধ‍ুমধাম না করে বিয়ে হয়ে গেল। অন‍ুষ্ঠানের শেষে যে চায়ের আসর বসল সেখানেও কোনো রকম হৈচৈ হল না। চা-খাওয়া হয়ে যেতেই কালবিলম্ব না করে মা নিজের ঘরে গিয়ে বাক্সপে'টরা গ‍ুছোবার কাজে লেগে গেল। আমার সৎ-বাপ বসল এসে আমার পাশে, বলল:

'মনে আছে তো, তোমাকে বলেছিলাম, এক বাক্স রং উপহার দেব। কিন্তু এখানকার বাজারে ভালো রং কিনতে পাওয়া যায় না। আমার নিজের রঙের বাক্সটাও দেওয়া চলে না। মস্কো থেকে তোমাকে আমি রঙের বাক্স পাঠিয়ে দেব।'

'রঙের বাক্স নিয়ে কী করব আমি?'

'কেন, ছবি আঁকতে তোমার ভালো লাগে না?'

'আমি ছবি আঁকতে জানি না।'

'তাহলে তোমার জন্যে আমি অন্য কিছ‍ু পাঠাব।'

এই সময়ে আমার মা ঘরে ঢুকে আমাকে বলল:

'আমরা শীগ্‌গিরই ফিরে আসব। তোমার বাবা পড়াশ‍ুনো শেষ করে পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই ফিরে আসব আমরা।'

দ‍ু'জনে আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে যেন আমি আর ছোটটি নই। এতে ভারি ভালো লাগছে আমার। কিন্তু যে-লোকের দাড়ি গজিয়ে গেছে সে এখনো পড়াশ‍ুনা করছে শ‍ুনে আমার খ‍ুব অবাক লাগল।

'আপনি কী পড়েন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জরিপবিদ্যা।'

'জরিপবিদ্যা' জিনিসটা কী, জিজ্ঞেস করতেও আলস্য লাগছে আমার।

বাড়ির আবহাওয়াটা ভারি হয়ে রয়েছে একটা থম্‌থমে নিস্তব্ধতায়; লোমশ কিছুর খসখসানি যেন। উৎকণ্ঠ হয়ে আমি রাত্রির জন্যে প্রতীক্ষা করছি: আরো তাড়াতাড়ি রাত্রি নেমে আসুক। চুল্লির দিকে পিছন ফিরে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাদামশাই আধ বোজা চোখে তাকিয়ে আছেন জানলার বাইরের দিকে। সবুজ বুড়ীটা ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে আর বিড়বিড় করতে করতে মা'কে বাক্সপেঁটরা বাঁধতে সাহায্য করছে। দিদিমা দুপুর থেকেই মদে বেসামাল; তিনি যাতে বিসদৃশ কিছু কাণ্ড করে পরিবারের নাম না ডুবিয়ে বসেন, সেজন্যে তাঁকে ছাদের ঘরে আটকে রাখা হয়েছে।

পরদিন সকালবেলা মা চলে গেল। যাবার আগে আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সে আমাকে অনায়াসে তুলে নিল মাটি থেকে এবং বুকের ওপরে চেপে ধরে স্থির অপরিচিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। আমাকে চুমু খায়, বলে, 'এবার যাই, কেমন?'

'ওকে বলে যা যেন আমার অবাধ্য না হয়।' তখনও গোলাপী আকাশের দিকে তাকিয়ে নিরুৎসুক গলায় দাদামশাই বললেন।

'শুনছিস তো. দাদামশাইয়ের কথা মেনে চলবি।' আমার মাথার ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে মা আমাকে উপদেশ দিল। আমি আশা করছিলাম, মা হয়তো আমাকে অন্য কিছু বলবে। মা'র কথায় এভাবে বাধা দেওয়াতে আমি দাদামশাইয়ের ওপরে রেগে গেলাম।

দু'জনে গিয়ে গাড়ীতে চেপে বসল। গাড়ীতে উঠবার সময় কিসে যেন আটকে গেল মা'র পরনের স্কার্ট। বেশ খানিকক্ষণ মা'র সময় লাগল স্কার্টটাকে খুলতে; হিমসিম খেয়ে রেগে উঠল মা।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি? দ্যাখ্‌ না গিয়ে স্কার্টটা কোথায় লেগেছে!' দাদামশাই আমাকে বললেন কিন্তু আমার নিজের মনের বিষণ্ণ ভার আমাকে তখন এমনভাবে গ্রাস করেছে যে কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

মাক্সিমভের পরনে আঁটসাঁট নীল ট্রাউজার। ট্রাউজার-মোড়া পা দুটোকে সতর্কভাবে গুটিয়ে নিয়ে বসল সে। তার হাতে কতকগুলো পুঁটলি দিলেন দিদিমা। পুঁটলিগুলোকে সে হাঁটুর ওপরে পরপর সাজিয়ে নিয়ে চিবুক দিয়ে চেপে ধরে রইল।

'বাস, বাস, অনেক হয়েছে!' ফ্যাকাশে কপালটা আতঙ্কে কুঁচকে আমতা-আমতা করে বলল সে।

অপর একটি গাড়ীতে উঠেছে সেই সবুজ বুড়ীটা আর তার বড়ো ছেলে। বুড়ী বসে আছে ঠিক মোমের পুতুলের মতো টান হয়ে আর তার বড়ো ছেলে তলোয়ারের বাঁটটা দিয়ে দাড়ি ঘষছে আর অনবরত হাই তুলছে।

'তাহলে আপনাকে যুদ্ধেই যেতে হবে, না কী বলুন?' দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন।

'নিশ্চয়।'

'খুব ভালো কথা। ওই তুর্কীগুলোকে একটু ধোলাই দেওয়া দরকার।'

তারা রওনা হয়ে গেল। বারবার পিছন ফিরে তাকিয়ে মা রুমাল নাড়ছে। বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন দিদিমা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনবরত চোখের জল মুছছেন দাদামশাইও।

'ভালো হবে না... এই বিয়ের ফল কক্ষণো ভালো হবে না...' বিড়বিড় করে বললেন দাদামশাই।

একটা টুলের ওপরে বসে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ীদুটো লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। একসময়ে রাস্তার একটা বাঁক ঘুরে গাড়ীদুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরেও একটা কপাট সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল যেন... এতটুকু ফাঁক রইল না... নিশ্ছিদ্র...

তখনো ভালো করে সকাল হয়নি। রাস্তা জনশূন্য, বাড়ির জানলাগুলো খড়খড়ি-আঁটা। এমন শূন্যতা এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি। দূরের কোথা থেকে যেন এক রাখালের বাঁশির টানা-টানা বিলাপ ভেসে আসছে।

আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে যেতে দাদামশাই বললেন, 'আয় রে, চা-টা খাবি আয়। মনে হচ্ছে, আমার কাছে পড়ে থাকাটাই তোর কপালের লেখা। পাথরের ওপরে দেশলাইয়ের কাঠির মতো আমার ওপর লেগে থাকবি।' ,

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমরা দু'জনে নিঃশব্দে বাগানের কাজ করে চলি। দাদামশাই মাটি খোঁড়েন, র‍্যাস্‌পবেরির ঝোপ ছেঁটে দেন, আপেলগাছের ছালের ওপর থেকে ঘষে ঘষে শ্যাওলা ওঠান, শুঁয়োপোকাগুলোকে থেঁতলে মেরে ফেলেন -- আর আমি লেগে থাকি আমার নিভৃত কুঞ্জটিকে আরো পরিপাটি করে তোলার কাজে। আগুনে পোড়া খুঁটিকে কেটে ফেলে দিয়ে দাদামশাই বাঁশ পুঁতে দিয়েছেন; আমি আমার পাখির খাঁচাগুলোকে সেই বাঁশে ঝুলিয়ে রেখেছি। শুকনো ঘাসপাতার চাঁচ বুনে

বুনে রোদ আর শিশির থেকে আড়াল করেছি আমার এই কুঞ্জটিকে। স্থানটি অতি চমৎকার হয়ে উঠেছে।

আমার দাদামশাই বলেন, 'তুই যে নিজেরটা নিজেই করে নিতে শিখছিস এটা সত্যিই খুব ভালো কথা।'

জীবন সম্পর্কে দাদামশাইয়ের মতামতের আমি যথেষ্ট মূল্য দিয়ে চলি। বসবার যে জায়গাটুকু আমি ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিয়েছি সেখানে এসে মাঝে মাঝে তিনি বসেন। কথা বলেন ধীরে ধীরে, কোনো রকম তাড়াহুড়ো না করে — যেন রীতিমতো চেষ্টা করে করে প্রত্যেকটি শব্দ মুখের ভিতর থেকে টেনে বার করতে হচ্ছে।

'এখন থেকে তোর মা'র সঙ্গে তোর আর কোনো সম্পর্ক রইল না। তুই একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে গেলি। এবার তোর মা'র আরো ছেলেপুলে হবে। তোর চেয়ে তাদের ওপরেই তোর মা'র টানটা হবে বেশি। আর তোর দিদিমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস, সব সময়েই মদে বেহুঁশ হয়ে থাকে।'

কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ চুপ করে যান, অনেকক্ষণ আর কোনো কথা বলেন না। মনে হয় যেন কান পেতে কোনো কিছু শুনছেন। তারপর আবার একসময়ে তাঁর মুখ থেকে গুরুভার শব্দগুলো একটি করে বেরিয়ে আসতে থাকে।

'তোর দিদিমার এভাবে মদে বেহুঁশ হয়ে থাকা -- এই নিয়ে দু-বার এই ব্যাপারটা হল। প্রথমবার এমনি হয়েছিল যখন মিখাইলকে পল্টনে ডেকে পাঠায়। এই বোকা বুড়ীর কথায় পড়ে সেবার আমি ছেলেটার জন্যে রিক্রুট সার্টিফিকেট কিনে আনি। এখন মনে হচ্ছে, ছেলেটা যদি পল্টনে যেত তাহলে হয়তো ভালোই হত ওর পক্ষে। এমনটি হয়তো ও থাকত না। হুঁঃ, কী সব মানুষ! আমি আর ক'দিন! শীঘ্র মরব! তার মানে আর কেউ থাকবে না — একেবারে অনাথ হবি। বুঝলি তো? তোকে একাই পাড়ি দিতে হবে সংসারে। দ্যাখ, একটা কথা বলি। নিজের হুকুম তামিল করে চলতে শিখিস কিন্তু কক্ষণো অপর কেউ যেন তোকে দিয়ে হুকুম তামিল করিয়ে নিতে না পারে। লোকের সঙ্গে ব্যবহার করবি ধীরস্থির ভাবে কিন্তু নিজে যে-পথে চলবি ঠিক করেছিস তা থেকে সরে দাঁড়াবি না। সবার কথা শুনবি কিন্তু নিজের বিবেচনায় যা সবচেয়ে ভালো মনে হবে তাই করবি...'

বর্ষার দিনগুলো বাদ দিয়ে সারাটা গ্রীষ্ম আমি বাগানেই কাটিয়ে দিই। এমন কি, গরম হলে রাত্রিবেলা বাগানেই ঘুমোই। দিদিমা আমাকে একটুক্রো

ফেল্‌ট্‌'এর কাপড় দিয়েছেন, তাই হয় আমার বিছানা। দিদিমা নিজেও মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে রাত্রি কাটান; একরাশ খড় নিয়ে এসে আমার বিছানার পাশটিতে পেতে শুয়ে পড়েন। শুয়ে শুয়ে গল্প বলেন আমাকে। তাঁর নিজেরই অন্য দু-একটা মন্তব্যে মাঝে-মাঝে সেই গল্পে ছেদ পড়ে। মন্তব্যগুলো এই ধরনের:

'দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌, একটা তারা খসে পড়ছে! ও হল মাটি-মায়ের কথা মনে-পড়া উৎকণ্ঠিত একজনের আত্মা। এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন ভালো মানুষের জন্ম হল।'

কিংবা:

'ওই দ্যাখ্‌ রে, একটা নতুন তারা উঠেছে! কী অসীম ঐশ্বর্য! ভাব তো দেখি একবার — কত দূরে রয়েছে এই আকাশ... ভগবানের উত্তরীয় মুক্তোবসানো এই আকাশ!'

দাদামশাই বিড়বিড় করে বলেন: 'সাধে কি আর বোকা বলে! মরবার পথ হয়েছে! কোমরে গেঁটে বাত ধরবে যে — আর নইলে চোরের দল এসে গলা কাটবে!..'

এমনি চলে — সূর্য ডোবে, আগুনের নদী বন্যার মতো বয়ে যায় সারা আকাশ দিয়ে। আর সেই আগুন যখন নিভতে থাকে তখন বাগানের সবুজ ভেলভেটের ওপরে সোনালী-লাল ছাইয়ের গুঁড়ো ঝরে ঝরে পড়ে। স্পষ্ট বোঝা যায়, বিশ্ব-চরাচর আঁধার হয়ে যাচ্ছে আর প্রদোষের উষ্ণতায় অবগাহন করে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। রৌদ্র-পরিতৃপ্ত গাছের পাতাগুলি ডালের ওপরে মুদে আসে, ঘাসের ডগাগুলি মাটিতে মাথা নুইয়ে দেয়। চারদিকে বিপুলতর ঐশ্বর্য ও কমনীয়তা; গানের সুরের মতো নরম একটা সুগন্ধ চারদিক থেকে নিঃসৃত হয়। আর বাজনার সুর ভেসে আসে দূর-মাঠের সৈন্যদের তাঁবু থেকে। মা'র ভালোবাসার মতো জোরালো আর তাজা একটা অনুভূতি জেগে ওঠে রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে; নিঃশব্দতা তার উষ্ণ আর তুলতুলে ছোঁয়া দিয়ে শান্ত করে তোলে মনকে। সারাদিনে যা কিছু ধুলো আর জঞ্জাল জমে, যা কিছু ভুলে যাওয়া উচিত — সমস্ত গ্লানি কেটে যায়। আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে শুয়ে থাকতে কী ভালোই না লাগে তখন। একটি একটি করে তারা ফুটে ওঠে আকাশের গায়ে; আর প্রত্যেকটি তারা আকাশের গভীরতাকে নতুন করে উদ্ঘাটিত করে। সেই দূরপ্রসারী গভীরতা মানুষকে আলতোভাবে মাটি থেকে তুলে ধরে — তখন কিছুতেই বোঝা যায় না, পৃথিবীটা কুঁকড়ে

কুঁকড়ে ছোট হয়ে মানুষটার সমান হয়ে গেছে, না, মানুষটা এক আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় ফুলেফেঁপে বড়ো হতে হতে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। তারপর নিঃশব্দতা আরো বেড়ে চলে, অন্ধকার আরো গাঢ় হয়, সর্বত্র ছোট ছোট ঝঙ্কার তুলে অদৃশ্য তারগুলি কাঁপতে থাকে। একটা ঘুমন্ত পাখি গান গেয়ে ওঠে, একটা শজারু খস্‌খস্‌ শব্দে ছুটে চলে যায়, একটা মানুষের গলার স্বর ভেসে আসে — আর এই প্রত্যেকটি ঝঙ্কারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক একটা রূপ আছে, এই বিশিষ্টরূপের জন্যেই এই শব্দগুলোকে দিনের বেলার বিভিন্ন শব্দ থেকে আলাদা করে চেনা যায়; আর প্রত্যেকটি ঝঙ্কারের নিজস্ব এই রূপ স্পর্শকাতর নিঃশব্দতার পটভূমিকায় আরো চমৎকারভাবে রেখায়িত হয়ে ওঠে।

দিনের মৃত্যু হচ্ছে। ঝরে পড়ছে দিনের শেষ পাতাগুলি — একর্ডিয়নের সুর, স্ত্রী-কণ্ঠের হাসি, পাথরবাঁধানো রাস্তায় তলোয়ারের আঘাতের খট্‌খট্‌ শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক।

আর মাঝে মাঝে হঠাৎ বাইরের রাস্তা বা খোলা মাঠের দিক থেকে মাতলামির সোরগোল ও ছুটে-চলার ধুপ্‌ধাপ শোনা যায়। এই শব্দগুলি এতবেশি নিত্যনৈমিত্তিক যে মনোযোগ আকর্ষণ করে না।

দিদিমা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতের ওপরে মাথা দিয়ে চোখ খোলা রেখে শুয়ে থাকেন। নিজের আবেগেই বলে চলেন পুরনো দিনের অনেক কথা। সে-সব কথা আমি শুনছি কি শুনছি না, সেদিকে দিদিমার বিশেষ ভ্রূক্ষেপ থাকে বলে মনে হয় না। আর কাহিনী নির্বাচনে তাঁর এমন একটা দক্ষতা আছে যা প্রতিটি রাত্রিকেই বিশেষ সৌন্দর্য ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে।

দিদিমার কথার সুর আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ঘুম ভাঙে যখন মুখের ওপরে রৌদ্র এসে পড়ে আর কানের কাছে পাখিরা গান গায়। রৌদ্রের উত্তাপে সকালবেলার বাতাস আড়মোড়া ভাঙে, আপেল গাছের পাতাগুলি গা-ঝাড়া দিয়ে শিশির ঝরিয়ে দেয়, সবুজ ঘাসগুলো এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে কাঁচের মতো স্বচ্ছ মনে হয়, ঘাসের উপর থমকে থাকে পাতলা কুয়াশা। সূর্যের রশ্মি সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে আর লাইলাক-রঙা আকাশ নীল হয়ে ওঠে একটু একটু করে। চোখের দৃষ্টির বাইরে আকাশের অনেক উঁচু থেকে ভেসে আসে লার্কপাখির গান। নবজাত দিনের সমস্ত শব্দ আর বর্ণ শিশিরবিন্দুর মতো চুঁইয়ে চুঁইয়ে আমার আত্মার গভীরে প্রবেশ করে আর

এক অনির্বচনীয় শান্ত আনন্দে ভরে যায় আমার অন্তর। ইচ্ছে জাগে, দিনের কর্মতৎপরতার মধ্যে নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিই, মনের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ না রেখে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকি।

আমার সারা জীবনের মধ্যে এই সময়টিতেই আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশান্তি ও অনুধ্যান এসেছিল। এই গ্রীষ্মকালটিতে আমার নিজের শক্তি সম্পর্কে একটা চেতনা জেগে উঠেছিল আমার মধ্যে। সে-সময়ে লোকজনকে আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করি। অভসিয়ান্নিকোভদের বাড়ির ছেলেদের ডাকাডাকি ও চিৎকার কানে আসে, তবুও ওদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে ইচ্ছে করে না। আবার মামাতো-ভাইরা যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন খুশি তো হই-ই না, বরং প্রতি মুহূর্তে ভয় হতে থাকে, ওরা আমার বাগানটিকে না নষ্ট করে ফেলে। এই বাগানটাই হচ্ছে আমার নিজের হাতে তৈরি জিনিসের প্রথম নিদর্শন।

দাদামশাইয়ের বচন শুনতেও আমার আর ভালো লাগে না। বচনগুলি ক্রমাগতই বেশি কাটা-কাটা ও নালিশে ভরা হয়ে উঠেছে। দিদিমার সঙ্গে প্রায়ই তাঁর ঝগড়া লেগে যায় আর দিদিমাকে তখন তিনি বাড়ি থেকে বের করে দিতেন। আর যখনই এ-ধরনের ব্যাপার হয়, দিদিমা গিয়ে ওঠেন ইয়াকভ-মামা কিংবা মিখাইল-মামার বাড়িতে। একেকবার এমন হয় যে কিছুদিন তিনি আর বাড়িই ফেরেন না। বাধ্য হয়ে দাদামশাইকেই নিজের হাতে রান্না করতে হয়। রান্না করতে গিয়ে চিৎকার আর গালিগালাজ করে, আঙুল পুড়িয়ে, কাপ-ডিশ ভেঙে এক তুমুল কাণ্ড শুরু করে দেন এবং দিনের পর দিন আরো বেশি কৃপণ হয়ে ওঠেন।

মাঝে মাঝে বাগানের মধ্যে আমার কুঞ্জটিতে এসে হাজির হন। বেশ আয়েসের সঙ্গে ঘাসের চাপড়ার ওপরে বসে নিঃশব্দে বহুক্ষণ তাকিয়ে দেখেন আমাকে। তারপরে একসময়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন·

'কী রে, মুখে কথা নেই কেন?'

'জানি না।'

তারপরেই শুরু হয় তাঁর উপদেশ-বর্ষণ:

'আমাদের আর কতটুকু দাম রে! কেউ আমাদের কোনো কিছু শেখাতে আসবে না — সব আমাদের নিজেদের শিখে নিতে হবে। এত বই লেখা হয়েছে, এত স্কুল তৈরি হয়েছে — কিন্তু সে-সব অপরের জন্যে, আমাদের জন্যে নয়। নিজেদেরটা নিজেদেরই করে নিতে হবে আমাদের...'

বলতে বলতে নিজের চিন্তাতেই ডুবে গিয়ে চুপ করে যান, নিস্পন্দ ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর দিকে তাকাতে ভয় করে সে-সময়ে।

সেই বছর শরৎকালেই দাদামশাই বাড়ি বিক্রি করে দিলেন। বাড়িটা বিক্রি করার আগে একদিন সকালবেলা চায়ের টেবিলে বসে বিষণ্ণ ও দৃঢ় স্বরে দিদিমার কাছে ঘোষণা করলেন খবরটা:

'গিন্নী, তোমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা এতদিন ধরে আমিই করে এসেছি। কিন্তু আমার পক্ষে আর তা সম্ভব নয়। এবার থেকে তোমার নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে।'

খবরটা শুনে দিদিমা কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না মনে হল, যেন অনেক দিন থেকেই তিনি ঠিক এই কথাগুলোই দাদামশাইয়ের মুখ থেকে শুনবেন বলে আশা করছিলেন। ধীরে-সুস্থে নস্যির কৌটা বার করে ছিদ্রবহুল নাকের মধ্যে নস্যি ঠেসে জবাব দিলেন তিনি:

'তা কী আর করা যাবে। যেমন অবস্থা, তেমনি ব্যবস্থা — এছাড়া আর উপায় কি!'

একটা বন্ধ গলির মধ্যে পুরনো এক বাড়ির মাটির নীচের দুটি অন্ধকার ঘর ভাড়া নিলেন দাদামশাই। বাড়ি ছেড়ে উঠে যাবার আগে দিদিমা করলেন কি, লম্বা ফিতে লাগানো বাকলের তৈরি একটা জুতো নিয়ে গুঁজে দিলেন চুল্লির নীচে। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে বাড়ির উপদেবতাকে ডাকতে লাগলেন:

'হে বাড়ির উপদেবতা, তোমাকে ডাকছি, তুমি বেরিয়ে এসো। তোমার জন্যে বাহন এনেছি — চেপে বসো বাহনটিতে। তারপর আমাদের সৌভাগ্যকে বহন করে নিয়ে চলো আমাদের নতুন বাড়িতে।'

দাদামশাই গিয়েছিলেন বাইরের উঠোনে। সেখান থেকে জানলা দিয়ে তাকিয়ে বললেন:

'আবার ওইসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড শুরু হয়েছে! ধর্মকর্ম আর কিছু রইল না দেখছি! খবরদার বলছি থাম! আমার মুখে কালি লাগাতে তোমাকে দেব না!'

'আমি তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে বাধা দিও না গো। বাধা দিলে অকল্যাণ হবে! কিছুতেই তা তুমি ঠেকাতে পারবে না!' দিদিমা সাবধান করে দিতে চাইলেন। কিন্তু দাদামশাই ততোক্ষণে রাগে অগ্নিশর্মা — দিদিমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিলেন তিনি।

তারপর তিনদিন ধরে চলল বাড়ির পুরানো আসবাব বেচাকেনা — পুরানো মালের আড়ৎদার একদল তাতারের কাছে দাদামশাই বিক্রি করলেন

আসবাবগুলোকে। প্রচণ্ড হাঁকডাক আর গালাগালি করে দরাদরি করলেন। জানলায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলেন দিদিমা; কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন, কখনো মৃদু স্বরে বলছেন—'ভাঙুক, সব জিনিস ভাঙুক! ধাড়ি উজাড় করে নিয়ে যাক্ সব!..'

আমার খেলার জায়গা সেই কুঞ্জটিকে ছেড়ে যেতে হবে বলে আমারও কান্না পাচ্ছে।

আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে দুটো গাড়ি এল। মালপত্র ও টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা যে গাড়িটাতে আমি চেপে বসলাম, সেটা রাস্তায় চলতে চলতে এমন ঝাঁকুনি দিতে লাগল যেন আমাকে ছিট্‌কে ফেলে দিতে চাইছে।

এই ঘটনার দু-বছর পরে আমার মা মারা যায় এবং এই দুটি বছরের প্রতিটি মুহূর্তে এই অনুভূতিই আমাকে তাড়া করে ফিরেছে—সব সময়ে মনে হত, কিসের যেন একটা ঝাঁকুনি অনবরত ছিট্‌কে ফেলে দিতে চাইছে আমাকে।

নীচের তলার ঘরদুটোতে উঠে আসার কিছুদিন পরেই মা এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। মা'র শরীরটা রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আচম্‌কা একটা বিস্ময়েই যেন জ্বলজ্বল করছে বড়ো বড়ো চোখদুটো। সবকিছুকে এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মা যেন তার নিজের বাপ-মাকে এবং তার নিজের ছেলেকে এই প্রথম দেখছে। একটি কথাও না বলে মা শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ওদিকে আমার সৎ-বাপ অনবরত ঘরের এমাথা-ওমাথা পায়চারি করছে, চাপা স্বরে শিস্ দিচ্ছে, গলা খাঁকারি দিচ্ছে, পিঠমোড়া করে হাত রেখে আঙুল কচ্‌লাচ্ছে।

'আরে বাবাঃ, কত বড়োটি হয়ে গেছিস রে!' দুই হাতের উত্তপ্ত তালুর মধ্যে আমার মুখখানাকে নিয়ে বলল আমার মা। মা'র পরনে বাদামী রঙের বিশ্রী একটা ঢিলেঢালা পোশাক—পেটের কাছটায় উঁচু হয়ে ঢোল হয়ে আছে।

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সৎ-বাপ বলল, 'নমস্কার খোকা, কেমন আছ?'

ঘরের বাতাসটা শুঁকে নিয়ে বলল আবার:

'বড়ো স্যাঁৎসেঁতে ঘরটা।'

ভারি শ্রান্ত আর এলোমেলো দেখাচ্ছে দু'জনকেই; যেন, দু'জনকে অনবরত শুধু ছুটতে হয়েছে এবং আপাতত দু'জনেরই যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার তা হচ্ছে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম।

সার্থকতা আছে কিনা। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে কথাগুলো সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতেই হবে। কারণ এ হচ্ছে সেই সময়কার এক অতি ভয়ঙ্কর ও বাস্তব সত্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত এর মূল উৎপাটিত হয়নি। এ হচ্ছে এমন এক সত্য যা পুরোপুরি উদ্ঘাটিত করতে হবে এবং আমাদের এই লজ্জাকর ও বীভৎস জীবন থেকে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে—যেন মানুষের স্মৃতিতে আর মানুষের আত্মায় এর চিহ্নমাত্র না থাকে।

তাছাড়া, এই সমস্ত বীভৎসতাকে বর্ণনা করবার কাজে আমাকে যে হাত দিতে হয়েছে, তার পিছনে আরও বাস্তব কারণ আছে। এই বীভৎসতা দেখে শিউরে উঠতে হয়, এমনিতে অতি চমৎকার মানুষকেও এই বীভৎসতা বিকৃতচরিত্র করে তোলে—কিন্তু তবুও রুশজাতির এখনো এমন তারুণ্য ও সুস্থ প্রাণশক্তি আছে যে এই বীভৎসতাকে সে একেবারে মুছে দিতে পারে এবং সম্পূর্ণভাবে তা মুছে দেবেও।

আমাদের জীবনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় শুধু এইজন্যে নয় যে এই জীবনের একদিকে আছে পশুসুলভ প্রচণ্ড একটা নোংরামি যা দিনের পর দিন পাহাড়প্রমাণ হয়ে উঠেছে; আশ্চর্য হতে হয় এইজন্যেও যে এই জীবনের অন্তরালে এক সুস্থ সৃজনশীল শক্তিও দেদীপ্যমান। সৎশক্তির প্রভাব বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস জাগে যে একদিন না একদিন আমাদের দেশের মানুষ এক পূর্ণ প্রস্ফুটিত জীবনের সৌন্দর্যে ও উজ্জ্বল মানবিকতায় অধিষ্ঠিত হবে।

তের

আবার সেই দাদামশাইয়ের সঙ্গে থাকা।

'কী রে হতচ্ছাড়া, এসেছিস!' টেবিলের ওপরে অস্থিরভাবে আঙুলের টোকা দিতে দিতে দাদামশাই আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন, 'আমি কিন্তু তোকে আর খাওয়াব না বলে রাখছি। এবার তোর ভার তোর দিদিমাকেই নিতে হবে।'

দিদিমা বললেন, 'সে আমি ব্যবস্থা করব'খন। এ আর এমন কি শক্ত কাজ!'

'আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে,' দাদামশাই হুঙ্কার ছাড়লেন, আর তৎক্ষণাৎ

শান্ত হয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন আমার কাছে, 'জানিস তো, আমাদের এখন সব আলাদা আলাদা—যার যার, তার তার।'

জানলার কাছে বসে বসে দিদিমা লেস বোনেন। তাঁর হাতের শলাকা আনন্দের সুরে টুংটাং শব্দে বেজে ওঠে, নিচে পেতলের পিন বসানো ছোট্ট বালিশটা বসন্তকালের রোদে সোনালী সজারুর মতো ঝক্‌ঝক্‌ করে। আর চেহারার দিক থেকেও দিদিমা এতটুকু বদ্‌লাননি, মনে হয় যেন ব্রোঞ্জের গড়া মূর্তি। কিন্তু দাদামশাই আরো রোগা হয়ে গেছেন, তাঁর গায়ের চামড়ায় আরো বেশি ভাঁজ পড়েছে, মাথার লাল চুল পাতলা হয়েছে আরো। তাঁর চালচলনের মধ্যে যে একটা প্রশান্ত আড়ম্বর ছিল তা আর নেই, তার বদলে মেজাজটা উগ্র আর খিটখিটে হযে গেছে, কিছু না কিছু নিয়ে সব সময়েই তোলপাড় করছেন। সবুজ চোখদুটো দিয়ে সবকিছুই দেখেন সন্দেহের দৃষ্টিতে।

দিদিমা ও দাদামশাইয়ের মধ্যে কি-ভাবে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়েছে সেকথা হাসতে হাসতে দিদিমা বললেন আমাকে। থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি জিনিসগুলো দিদিমাকে দিয়ে দাদামশাই বলেছেন, 'এগুলি সব তোমার। বাস, এই শেষ। এছাড়া আর কিছু চাইতে এস না আমার কাছে।'

একথা বলে দিদিমার সমস্ত পুরানো পোশাক এবং সম্পত্তি বলতে যা কিছু ছিল, তার মধ্যে শেয়াল-কোটটা, তিনি নিয়েছেন। সাতশো রুব্‌লে বিক্রি করেছেন জিনিসগুলো। তারপর এই সাতশো রুব্‌ল সুদে ধার দিয়েছেন নিজের ধর্মপুত্রকে; এই ধর্মপুত্রটি একজন দীক্ষিত ইহুদি, ফলের ব্যবসা আছে তার। নির্লজ্জ রকমের লোভী হয়ে উঠেছেন দাদামশাই, এত বেশি লোভ যে সেটা তাঁর প্রায় অসুখে দাঁড়িয়ে গেছে। পুরনো দিনের পরিচিত লোকজনের কাছে যাতায়াত শুরু করেছেন। এরা কেউ বা ধনী ব্যবসায়ী, কেউ বা কারিগর—সকলেই তাঁর পুরনো দিনের সহকর্মী। এদের কাছে গিয়ে তিনি বলেন যে ছেলেরা তাঁর সর্বনাশ করেছে এবং এই বলে টাকা চান। পুরনো দিনের খাতিরে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে এবং দরাজ হাতে টাকা দেয়। বাড়ি ফিরে এসে মোটা মোটা নোটের তাড়া দিদিমার নাকের নিচে নাড়তে নাড়তে ছোটো ছেলের মতো আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলতে থাকেন:

'দেখে নাও, ভালো করে দেখে নাও! দেবে তোমাকে কেউ এতগুলি টাকা? এর দশভাগের একভাগ টাকাও কেউ তোমাকে দেয় তো কি বলেছি!'

এই টাকাটা আমার দাদামশাই দু'জন নতুন পরিচিত লোককে সুদে ধার দিলেন। একজনকে সবাই ডাকে 'চাবুক' বলে; পশুর লোমের ব্যবসা করে লোকটি, লম্বা চেহারা, মাথায় টাক। অপরজন হচ্ছে তার বোন; একটি দোকান চালায় সে; লাল গাল, কালো চোখ, ঝোলাগুড়ের মতো মিষ্টি ও টইটম্বুর চেহারা।

বাড়ির মধ্যে সব ব্যাপারেই ভাগাভাগি। একদিন হয়তো দিদিমা তাঁর নিজের টাকা দিয়ে খাবার কিনে এনে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন, আবার পরের দিন রুটি ও খাবার কিনে আনেন দাদামশাই। যেদিন দাদামশাইয়ের পালা সেদিন খাওয়াদাওয়াটা যাচ্ছেতাই হয়। দিদিমা কিনে আনেন সরেস মাংস আর দাদামশাই কেনেন কলিজা ও নাড়িভুঁড়ি। চা আর চিনির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা তবে চা ভেজানো হয় একই পাত্রে। প্রতিবার চা ভেজানোর পরে দাদামশাই আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন:

'দাঁড়াও, দেখি, কতটা চা ভিজিয়েছ?'

তারপর চায়ের পাতাগুলো হাতের ওপর নিয়ে খুব সাবধানে একটি একটি করে গুণতে থাকেন।

'তোমার চায়ের পাতাগুলো সরু সরু আর আমার গুলো মোটা মোটা। আমার চায়ে ভালো লিকার হয়—কাজেই তোমার চায়ের ভাগটা আমার চেয়েও বেশি হওয়া দরকার।'

তারপর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, তাঁর নিজের পাত্রের চা দিদিমার পাত্রের চায়ের মতোই ঠিক সমান কড়া হচ্ছে কিনা এবং দিদিমা নিজের কাপে যতোবার চা ঢালছেন তাঁর কাপেও ঠিক ততোবার চা ঢালছেন কিনা। শেষবার চা ঢালবার সময় দিদিমা জিজ্ঞেস করেন, 'শেষবারের মতো আরেক কাপ হবে নাকি?'

চায়ের পাত্রের ভিতরটা দেখে নিয়ে দাদামশাই সায় জানান, 'আচ্ছা বেশ, শেষবারের মতো আরেক কাপ হোক না!'

এমন কি আইকনের প্রদীপে যে তেলটুকু খরচ হয় তাও দু'জনে পালা করে কিনে আনেন। আর এ সব ঘটে পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে ঘর করার পরে!

প্রতিটি ব্যাপারে দাদামশাইয়ের এইসব খুঁতখুঁতানি দেখে আমি মজাও পাই আবার বিরক্তও হই। দিদিমা কিন্তু শুধু মজাই পান। দিদিমা আমাকে বলেন:

'এসব কথা মনে রাখিসনে! এতে আর কী হয়েছে? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো বাতিক হয়েছে—এই আর কি। চার কুড়ি বয়স হয়ে গেছে—ব্যাপারটা একবার ভাব তো দেখি! এই বয়সে অমন একটু-আধটু বাতিক হয়েই থাকে—ওটুকু সহ্য করে নিতেই হয়, এতে কারুরই কিছু যায় আসে না। আর তোর আর আমার কথা যদি ধরিস—আমাদের দু'জনের জন্যে তো ভাবনা নেই, যে করে হোক দু-মুঠো জুটিয়ে নিতে পারব!'

আমিও রোজগার করতে শুরু করি। প্রতি রবিবার ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ি একটা থলে নিয়ে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি: হাড়ের টুক্‌রো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, পেরেক ও কাগজ কুড়োই। আধ মণ ছেঁড়া ন্যাকড়া বা কাগজ বা ধাতুর বদলে আবর্জনার কারবারী আমাদের কুড়ি কোপেক দেয়, আর আধ মণ হাড়ের টুক্‌রোর জন্যে আট বা দশ কোপেক। আবর্জনা কুড়োবার কাজটা সারা সপ্তাহ ধরেই চালিয়ে যাই আমি; রবিবার ছাড়া অন্যান্য দিনগুলোতে বেরোই স্কুল ছুটির পরে। প্রত্যেক শনিবারে আমার রোজগার হয় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কোপেক (কপাল খুলে গেলে কোনো সপ্তাহে এর চেয়ে বেশিও হয়)। রোজগারের পয়সা দিদিমার হাতে এনে দিলেই দিদিমা পয়সাগুলোকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের স্কার্টের পকেটে রেখে দেন, চোখ নিচু করে থাকেন ও আমার সুখ্যাতি করেন:

'সোনা আমার, মাণিক আমার, কী বলে যে তোকে আশীর্বাদ করব! দেখছিস তো, তোকে আর আমাকে কোনো দিন উপোস করতে হবে না! আমরা তো সব পারি?'

একদিন আমার চোখে পড়ে গেল, আমার রোজগারের পয়সার পাঁচ-কোপেক হাতে নিয়ে দিদিমা নিঃশব্দে কাঁদছেন। তাঁর তুলতুলে নাকের ডগা থেকে একফোঁটা আলো-ঠিকরনো চোখের জল ঝুলে রয়েছে।

আমি কিন্তু টের পেয়ে গেলাম যে রাস্তার আবর্জনা কুড়িয়ে যতোটুকু না লাভ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয় কাঠগোলাগুদাম থেকে কাঠ চুরি করতে পারলে। লাকড়ি-গুদাম আছে ওকা নদীর ধারে আর বালুচর নামে একটা দ্বীপে। এই দ্বীপে বছরে একবার মেলা বসে, সেখানে ধাতু কেনাবেচা হয়। কাজ চলা গোছের অস্থায়ী ঘর তৈরি হয় এই উদ্দেশ্যে। মেলা শেষ হয়ে গেলে ঘরগুলো খুলে ফেলে কাঠ আর তক্তা সাজিয়ে রাখা হয় থাক্ দিয়ে। বসন্তকালে নদীর জল বেড়ে ওঠা না পর্যন্ত এই কাঠগুলো বালুচর দ্বীপেই থাকে। ভালোমতো একটা তক্তা এনে দিতে পারলে গৃহস্থদের কাছে

দাম পাওয়া যায় দশ কোপেক। সারা দিনের মধ্যে এই রকম দু-তিনটে তক্তা আমরা চুরি করতে পারি। অবশ্য এক বিষয়ে নজর রাখা দরকার। যে-সব দিনে কুয়াশা হয় বা বৃষ্টি পড়ে, যখন পাহারাদাররা গিয়ে ঢোকে ঘরের মধ্যে, সেই দিনগুলোতেই অভিযান চালাতে হয়।

অভিযান হয় সদলে; সবার ওপরে সবার টান আছে—ছেলে-ছোকরাদের এমনি একটি দল। এই দলে আছে মর্দোভীয় ভিখিরি-মায়ের দশ বছরের ছেলে শান্তশিষ্ট সান্‌কা ভিয়াখির*—নরম প্রকৃতির ছেলে সে, কখনো কারও অনিষ্ট করে না; আছে গৃহহীন কস্ত্রমা—চামড়াসার চেহারা, খোঁচা খোঁচা চুল, প্রকাণ্ড কালো চোখ, পরে, যখন তার বয়স তেরো বছর, সে-সময়ে এক জোড়া পায়রা চুরি করার অপরাধে তাকে পাঠানো হয়েছিল এক শিশু-শোধনাগারে; সেখানে গলায় দড়ি দিয়ে সে আত্মহত্যা করে; আছে তাতার ছেলে খাবি—বারো বছর বয়স, অসাধারণ শারীরিক শক্তি এবং উদার ও সরল স্বভাবের মিশ্রণ ঘটেছে তার মধ্যে; আরো আছে খ্যাঁদানাক ইয়াজ—আট বছর বয়স, এক কবরখননকারী ও কবরখানার পাহারাদারের ছেলে, মাছের মতো নির্বাক; অসুখে ভুগছে ছেলেটি। এছাড়া আমাদের দলে আরেকজন যে আছে সে হচ্ছে আমাদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো। নাম গ্রিশ্‌কা চুরকা। তার মা বিধবা, সেলাইয়ের কাজ করে। এই ছেলেটি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ঘুষোঘুষিতে রীতিমতো ওস্তাদ। আমরা সবাই একই রাস্তায় থাকি।

আমাদের এই অঞ্চলে চুরিকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। যারা ক্ষুদে ক্ষুদে ব্যবসাদার, আধপেটা খেয়ে যাদের দিন কাটে, তাদের অধিকাংশেরই অন্নসংস্থানের প্রায় একমাত্র উপায় হচ্ছে এটি। দেড় মাস ধরে বছরে একবার যে মেলা হয় তার আয় সারা বছরের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বহু সম্ভ্রান্ত গৃহস্থঘর 'নদীপথে বাড়তি আয়' করে। অর্থাৎ, নদীর স্রোতে ভেসে-যাওয়া কাঠের গুঁড়ি বা তক্তা ধরে, অল্পস্বল্প মালপত্র নিয়ে পাড়ি দেয়। তার অধিকাংশ সময়েই তাদের নজর থাকে চুরি করার দিকে; ভল্‌গা আর ওকা নদীর ধারে ধারে 'অন্ধিসন্ধি খুঁজে খুঁজে' বেড়ায়, জাহাজঘাটায় বা বজরায় বা নদীর পাড়ে যা কিছু হাতিয়ে নিতে পারে তাই আত্মসাৎ করে। কে কত বেশি জিনিস

*রুশ ভাষায় ভিয়াখির বলতে বোঝায় পায়রার একটা বিশেষ রূপ। — সম্পাঃ

হাতিয়ে নিতে পেরেছে তাই নিয়ে রবিবারে বড়োরা নিজেদের মধ্যে বড়াই করে আর ছোটরা তা শোনে ও শেখে।

বসন্তকালে যখন মেলার তোড়জোড় চলে তখন কর্মব্যস্ত কারিগর ও শ্রমজীবীরা সারা দিনের কাজের শেষে মদে চুর হয়ে দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। আর ঠিক সেই সময়ে শুরু হয় এই অঞ্চলের বাচ্চাদের পকেটকাটা-ব্যবসার মরশুম। এই বিশেষ ব্যবসাটির মধ্যে যে কোনো কিছু অবৈধ ব্যাপার আছে তা একেবারেই মনে করা হয় না এবং বড়োদের চোখের ওপরেই নির্ভয়ে এই ব্যবসাটি চালানো হয়।

ছুতোর মিস্ত্রীর হাতুড়ি, ফিটার মিস্ত্রীর চিম্‌টে, গাড়ির ধুরোর বল্টু — সবই তারা চুরি করে। কিন্তু আমাদের দলটি এসব চুরির দিকে যায় না।

'আমি ভাই, চুরির ব্যাপারে নেই — মা শুনলে রাগ করবে,' চুরকা একদিন বলে।

'আমিও নেই। আমার ভয় করে,' খাবি বলে।

কস্ত্রমা পারতপক্ষে চোরের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে আর 'চোর' শব্দটা সে উচ্চারণ করে অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে। যদি সে দেখে, কোনো ছেলে কোনো মাতালের পকেট মারছে তাহলে সে সেই ছেলের পিছনে তাড়া করে যায় আর তাকে পাকড়াও করতে পারলে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। বিষণ্ণ মুখ, বড় বড় চোখ, এই ছেলেটির হাবভাব চালচলন সব সময়েই বড়োদের মতো। পথ চলে খালাসীদের মতো হেলেদুলে, চেষ্টা করে গলার স্বরকে গুরুগম্ভীর ও বাজখাঁই করে তুলতে। সব মিলিয়ে তার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যেজন্যে তাকে অস্বাভাবিক বুড়োটে বলে মনে হয়। আর ভিয়াখিরের স্থির ধারণা যে চুরি করাটা পাপ।

কিন্তু বালুচর থেকে খুঁটি বা তক্তা পাচার করে আনাটাকে আমরা একেবারে অন্য ধরনের কাজ বলে মনে করি। এ কাজে আমাদের কারও ভয় নেই এবং এমন একটা কৌশল আমরা উদ্ভাবন করি যে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে যাবার পরে কিংবা কুয়াশার দিনে ভিয়াখির আর ইয়াজ সকলের চোখের ওপর দিয়েই গিয়ে হাজির হয় বালুচর দ্বীপে। পায়ের নিচে এবড়োখেবড়ো গলা বরফ, তার ওপর দিয়েই প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে শুরু করে। ওদের দু'জনের চেষ্টা থাকে, পাহারাওলাদের নজর যেন ওদের দু'জনের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইতিমধ্যে আমরা চারজনে গা ঢাকা দিয়ে নানা দিক থেকে গুটিগুটি এগিয়ে আসি। ওদিকে পাহারাওয়ালা ভিয়াখির

চুপচাপ চা খেলাম আমরা। আবহাওয়াটা যেন থমকে রয়েছে। জানলার শার্সির ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আর দাদামশাই তাকিয়ে আছেন সেদিকে।

'তাহলে তুমি বলছ যে ঘরে আগুন লেগে তোমরা সর্বস্বান্ত হয়েছ?'

'একেবারে সর্বস্বান্ত,' দৃঢ় স্বরে বলল আমার সৎ-বাপ, 'আরেকটু হলে আমরাও আট্‌কা পড়তাম, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হত না।'

'হুঁ, আগুন তো আর ছেলেখেলা নয়।'

দিদিমার দিকে ঝুঁকে পড়ে দিদিমার কানে কানে কি যেন বলল আমার মা। শুনতে শুনতে, উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মতো করে দিদিমা চোখদুটো কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। আবহাওয়াটা আরো বেশি থমকে রইল।

হঠাৎ দাদামশাই বিষভরা গলায় শান্ত স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, লোকে বলাবলি করে, ওসব আগুন-টাগুন কিছু নয়, তাস-খেলায় তুমি সর্বস্বান্ত হয়েছ।'

ঘরের মধ্যে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা নেমে এল; শুধু জানলার শার্সিতে বৃষ্টি পড়ার রিমঝিম শব্দ আর সামোভারে জল ফুটবার শোঁ শোঁ আওয়াজ।

'বাবা...' অনেকক্ষণ পরে কথা বলল আমার মা।

'বাবা!' দাদামশাই হিংস্র একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'এবার? এবার কী হবে? তখন আমি বলিনি যে ত্রিশ বছরের মেয়ের পক্ষে কুড়ি বছরের ছোকরাকে বিয়ে করার মতো পাগলামি আর কিছু নেই? কেমন, এবার শিক্ষা হয়েছে তো? আর এই যে তুমি এখানে, চমৎকার নমুনা — নয় কী? তোকে ভদ্রঘরের বৌ করেছে, না? এখন কেমন লাগছে বেটি?'

একথার পর চারজনে একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। সবচেয়ে বেশি চিৎকার করল আমার সৎ-বাপ। ঘর থেকে বেরিয়ে সদরের দিকে চলে এলাম আমি এবং একটা কাঠের স্তূপের ওপরে হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। যাকে আমি দেখছি, সে কক্ষণো আমার মা হতে পারে না — আমার মা ছিল একেবারে আলাদা ধরনের মানুষ। ঘরে থাকার সময়েই এই ধারণা খানিকটা আমার মধ্যে এসেছিল কিন্তু এখন বাইরের এই অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে পুরানো দিনের মা'কে আমি খুব স্পষ্টভাবে মনে করতে পারলাম।

তারপরের ঘটনাগুলি আমি ভুলে গেছি। শুধু এটুকু মনে আছে,

সর্মোভো'র* একটা নতুন বাড়িতে আমাকে উঠে আসতে হয়েছিল। কাঠের বাড়ি, দেওয়ালগুলোতে কাগজ আঁটা নেই। পাট গুঁজে রাখা হয়েছে ফাটলগুলোতে — অসংখ্য আরশোলার বাস সেখানে। রাস্তার দিকের ঘরদুটিতে থাকে আমার মা ও আমার সৎ-বাপ আর দিদিমা ও আমি থাকি রান্নাঘরে। রান্নাঘরটিতে একটিমাত্র জানলা; জানলাটা খুললে একটা ছাদ দেখা যায়। তার পিছনে আকাশের পটভূমিকায় কালো ছবির মতো ফুটে আছে কারখানার কালো কালো চিম্‌নি। চিম্‌নিগুলো থেকে পাক খেয়ে খেয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া ওঠে আর শীতকালের বাতাসে সেই ধোঁয়া সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। সেই চিম্‌নির ধোঁয়ার তেল-চিটচিটে গন্ধে আমাদের শীতল ঘরগুলো সব সময়ে ভরে থাকে। ভোর না হতেই কারখানার বাঁশি নেকড়ের মতো হুঙ্কার ছাড়ে:

'উ-উ-ওয়া! উ-উ-ওয়া!'

একটা বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে জানলার ওপর দিকের শার্সি দিয়ে তাকিয়ে দেখলে কারখানার আলোকোজ্জ্বল গেট দেখতে পাওয়া যায়; গেটটা বুড়ো ভিখিরির দন্তহীন মুখের মতো হাঁ করে আছে আর ক্ষুদে মানুষগুলোকে পালে পালে গিলছে। দুপুরবেলা আবার কারখানার বাঁশি বেজে ওঠে। তখন কারখানার গেট আরেকবার তাদের কালো কালো ঠোঁটগুলো ফাঁক করে দেয় আর বেরিয়ে পড়ে একটি অতল গহ্বর। সেই গহ্বর থেকে জীর্ণ ও অবসন্ন অবস্থায় উগরে উগরে বার করে দেয় সেই ক্ষুদে ক্ষুদে মানুষগুলোকে; কালো একটা স্রোতের মতো রাস্তা থেকে রাস্তায় প্রবাহিত হয়ে চলে সেই মানুষের দল। তুষারতাড়িত বাতাস রুক্ষ সাদা হাতের মতো তাদের ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ঘরের মধ্যে। আকাশ প্রায় দেখাই যায় না। সারি সারি ছাদ ও বরফের পাড়ের ওপরে নিচু হয়ে ঝুলে থাকে আরেকটা ধূসর ও সমতল ছাদ যা কল্পনাশক্তিকে ব্যাহত করে এবং নিরানন্দ একঘেয়েমিতে দৃষ্টি অন্ধ করে দেয়।

সন্ধ্যার সময়ে কারখানার ওপরে আকাশে আবছা একটা লাল আভা থমকে থাকে। আলোর রেখা পড়ে চিম্‌নির কিনারগুলোতে আর তা দেখে মনে হয় — চিম্‌নিগুলো মাটি থেকে আকাশে উঠছে না, আকাশের পাণ্ডুর মেঘ থেকে

* নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদ'এর শিল্প-অঞ্চল। এই অঞ্চলেই জাহাজ-তৈরির কারখানা ও অন্যান্য কারখানা ছিল। — সম্পাঃ

নেমে আসছে নিচের দিকে; আগুন গিলে খাচ্ছে আর পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ঢেঁকুর তুলছে আর হুঙ্কার ছাড়ছে। দিনের পর দিন এই একই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অসহ্য একটা যন্ত্রণা হয় আর মনের মধ্যে একটা হিংস্রতার জ্বালা অনুভব করতে থাকি। গৃহস্থালির সব কাজই করেন দিদিমা। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাঁর ফুরসৎ নেই — রান্না করেন, ঘর মোছেন, কাঠ কাটেন, জল তোলেন। সারাদিনের পর সন্ধ্যের দিকে আর চুপ করে থাকতে পারেন না, কাৎরাতে থাকেন ক্লান্তিতে। মাঝে মাঝে রান্না হয়ে যাবার পরে তিনি একটা তুলো-ঠাসা খাটো জ্যাকেট পরে স্কার্টটা তুলে ধরে বেরিয়ে পড়েন শহরের দিকে। বলেন:

'যাই একটু দেখে আসি বুড়ো কেমন দিন কাটাচ্ছে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব দিদিমা!'

'পাগল হয়েছিস নাকি! ঠাণ্ডায় জমে যাবি একেবারে! কী রকম হাওয়া দেখছিস তো!'

বরফে চাপা পড়ে রাস্তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। তার ওপর দিয়েই পুরো সাত ভার্স্ট* পথ হেঁটে তিনি শহরে যান।

আমার মা অন্তঃসত্ত্বা; শরীরটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আর ফুলে উঠেছে। লম্বা পাড় বসানো একটা ছাইরঙা ছেঁড়া শাল গায়ে দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে মা বসে থাকে। এই শালটাকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। এই শালটা মুড়ি দিয়ে বসলে মা'র দীর্ঘাঙ্গ সুন্দর চেহারাটা কেমন বিকৃত হয়ে যায়। শালের পাড়টা ঝুলঝুল করছে, দেখে আমার গা জ্বালা করে, এই পাড়টা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে; এই কারখানা, এই গোটা অঞ্চলটাই আমার দু-চোখের বিষ হয়ে উঠেছে। একটা পুরনো ছেঁড়া ফেল্টের জুতো পায়ে দিয়ে মা বেড়ায়, কাশে, আর কাশতে গিয়ে মস্ত পেটটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। মা'র ধূসর-নীল চোখদুটোতে একটা কঠোর ও শুষ্ক ক্রোধের আগুন ঝিলিক দিয়ে যায়। কিংবা ফাঁকা দেওয়ালের দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে মা, মনে হয় যেন দেওয়ালের সঙ্গে তার চোখের দৃষ্টি এঁটে গেছে। মাঝে মাঝে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে, হয়তো পুরো একটি ঘণ্টা কেটে যায় তবুও খেয়াল হয় না। রাস্তাটা যেন একটা চোয়ালের মতো; এই চোয়ালের কতগুলো দাঁত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কালো আর বিশ্রী হয়ে গেছে, বাকিগুলো

* দেড় ভার্স্ট এক মাইলের কাছাকাছি। — সম্পাঃ

খসে পড়েছে একেবারে; আর এই খসে-পড়া দাঁতের জায়গায় লাগানো হয়েছে চোয়ালের তুলনায় বেমানান রকমের বড়ো থ্যাব্ড়া থ্যাব্ড়া নতুন দাঁত।

'এমন জায়গায় আমরা থাকি কেন?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'চুপ, চুপ, একথা বলিসনে।' মা জবাব দেয়।

আজকাল মা আমার সঙ্গে খুবই কম কথাবার্তা বলে। যেটুকু বলে তাও হচ্ছে শুধু ফাইফরমাশ। যেমন:

'এটা নিয়ে আয় তো, ওটা নিয়ে যা তো, যা তো একবার চট্ করে দোকানে...'

বাইরে খেলাধুলো করতে যাওয়া আমার প্রায় একেবারেই বারণ; মা আমাকে সহজে ছাড়তে চায় না। বাইরে গেলেই আমি সঙ্গীদের হাতে প্রচণ্ড রকমের মার খেয়ে ফিরে আসি — মারামারি করে আমি যা আনন্দ পাই এমন আর কোনো কিছুতে নয়, আমার সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই কাজেই লেগে থাকি। মা আমাকে বেল্ট দিয়ে প্রহার করে কিন্তু যতোই শাস্তি পাই ততোই এ-ব্যাপারে আমি একরোখা হয়ে উঠি। ফল হয় এই যে, পরের বার মারামারি করবার সময় আমার গোঁয়াতুর্মিটা আরো বেশি বেড়ে যায় আর বাড়ি ফিরে এলে মা আমাকে আরো বেশি শাস্তি দেয়। একবার তো মা'কে আমি সাবধান করে দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিই যে মা যদি আমাকে মারপিট করা বন্ধ না করে তাহলে মা'র হাত কামড়ে দিয়ে আমি বাইরে মাঠে গিয়ে পড়ে থাকব আর ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মরে যাব। আঁতকে উঠে মা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে আর ক্লান্তিতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে:

'আস্ত একটা জানোয়ার হয়েছিস তুই!'

মানুষের মনের যে জীবন্ত আর রামধনুর মতো উচ্ছল অনুভূতির নাম ভালোবাসা, তা আস্তে আস্তে আমার মন থেকে মুছে যেতে থাকে। আর সে জায়গায় দেখা দেয় সবার বিরুদ্ধে ও সবকিছুর বিরুদ্ধে আক্রোশের নীল ঝলক, ধিকি ধিকি অসন্তোষ, আর এই একঘেয়ে ও বীভৎস রকমের অর্থহীনতায় আমি একেবারেই একা — এমনি একটা ধারণা।

আমার সৎ-বাপ আমাকে কড়া শাসনে রাখে আর আমার মা'র সঙ্গে প্রায় কথাই বলে না। এই লোকটি সব সময়েই শিস দেয় আর কাশে আর একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁকা-বাঁকা দাঁতগুলো খোঁটে। প্রায়ই ঝগড়া করে আমার মা'র সঙ্গে আর এই ঝগড়াটা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। মাকে এমন

নীরস ও অনাত্মীয় স্বরে ডাকে যা আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি না। ঝগড়ার সময়ে রান্নাঘরের দিকের দরজাটা সে বন্ধ করে দেয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে তার কথাগুলি আমি শুনি, এটা তার ইচ্ছে নয়। কিন্তু সেই গম্ভীর ও রূঢ় গলার স্বর শোনবার জন্যে আমি ওৎ পেতে থাকি।

একদিন শুনলাম, মেঝেতে পা ঠুকতে ঠুকতে সে চিৎকার করে বলছে:

'কুত্তী কোথাকার, তোর ওই জয়ঢাক পেটটার জন্যে আমি লোকজনকে বাড়িতে ডাকতে পারি না!'

শুনে আমি একেবারে থ' হয়ে গেলাম। রাগে আমার সর্বাঙ্গ রি-রি করতে লাগল। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে মাথাটা ছাদের সঙ্গে এমন জোরে ঠুকে গেল যে দাঁত বসে গেল আমার জিভে।

প্রতি শনিবার দলে দলে মজুর আসে আমার সৎ-বাপের কাছে। কোম্পানির দোকান থেকে খাদ্যবস্তু কেনবার জন্যে মজুরদের বরাদ্দ কুপন আছে; কুপনগুলি তারা বিক্রি করে যায়। কারখানা থেকে এই কুপনগুলি দেওয়া হয় মজুরির বদলে আর আমার সৎ-বাপ সেগুলি কেনে আধাআধি দরে। মজুরদের সঙ্গে সে দেখা করে রান্নাঘরে টেবিলের সামনে বসে, মুখে বেশ একটা ভারিক্কী ভাব ফুটিয়ে তোলে আর প্রতিটি কুপন হাতে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভুরু কুঁচকিয়ে থাকে।

'দেড় রুবল।'

'ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচ, যীশু খ্রীষ্টের দোহাই...'

'দেড় রুবল।'

এই বিপর্যস্ত ও অন্ধকার জীবন খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মা'র যখন আঁতুড়ঘরে যাবার সময় হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দাদামশাইয়ের বাড়িতে। দাদামশাই তখন কুনাভিনো অঞ্চলে পেশ্চানায়া স্ট্রীটে একটা দোতলা বাড়িতে থাকেন। বাড়িটার অদূরে নাপোলনায়া গির্জার সমাধিস্থান। দাদামশাইয়ের ঘরটি ছোট আর এই ছোট ঘরটিতে একটি বৃহৎ রুশ চুল্লি। উঠোনের দিকে দুটি জানলা।

'এই যে, এসে গেছিস!' আমাকে দেখে দাদামশাই একটু যেন শব্দ করেই হেসে উঠলেন, 'কথায় আছে না, মা'র চেয়ে বড়ো আপন নেই — কিন্তু তোর বেলায় দেখছি কথাটা খাটছে না। এই বুড়ো-শয়তান দাদামশাইটাই কিনা হয়ে উঠল তোর সবচেয়ে আপন জন! হুঃ, কী সব মানুষ!'

এই বাড়িটার সঙ্গে সবে আমি খানিকটা পরিচয় করে নিয়েছি এমন সময়

বাচ্চা কোলে নিয়ে আমার মা ও দিদিমা এসে হাজির। মজুরদের ঠকাবার অপরাধে কারখানার চাকরিটি খুইয়েছে আমার সৎ-বাপ। কিন্তু বন্ধুবান্ধবকে ধরাধরি করে সঙ্গে সঙ্গে রেলস্টেশনের ক্যাশিয়ারের চাকরি পেয়ে গেছে।

তারপর বেশ কিছুটা ফাঁকা সময় কেটে যাবার পরে আবার আমাকে পাঠানো হল মা'র সঙ্গে থাকবার জন্যে। এবারে পাথরে তৈরি একটা বাড়ির মাটির তলার ঘর। সঙ্গে সঙ্গে মা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিল আর প্রথম দিন থেকেই আমি স্কুলকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখলাম।

স্কুলে হাজির হবার সময়ে আমার সাজপোশাকটা ছিল এইরকম: পায়ে মা'র একজোড়া জুতো; পরনে দিদিমার ব্লাউজের কাপড় কেটে তৈরি কোট, হল্‌দে শার্ট আর লম্বা ট্রাউজার। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আমার পিছনে লাগতে শুরু করে দিল আর গায়ের হল্‌দে শার্টটার জন্যে সবাই ঠাট্টা করে আমার নাম রাখল — 'রুইতনের টেক্কা'। ছেলেদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হল না। কিন্তু স্কুলের পাদরি ও শিক্ষকমশাই গোড়া থেকেই আমাকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখলেন।

শিক্ষকমশাইটির টাকমাথা ও হল্‌দে মুখ। মাঝে মাঝে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। নাকের ফুটোদুটোয় তুলো গুঁজে দিয়ে তিনি ক্লাশঘরে ঢোকেন, ডেস্কের সামনে নিজের জায়গাটিতে বসে নাকি নাকি সুরে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন আমাদের। আর মাঝে মাঝে হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে নাক থেকে তুলো টেনে বার করেন আর মাথা ঝাঁকিয়ে সেটাকে পরীক্ষা করতে শুরু করেন। তাঁর মুখটা থ্যাবড়া আর কট্‌কটে। মুখের রঙটা তামার মতো, চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে সবুজ একটা আস্তরণ পড়েছে মনে হয়। কিন্তু তাঁর মুখের যে জিনিস দেখে সবচেয়ে বেশি গা ঘিন ঘিন করে তা হচ্ছে তাঁর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো। সারা মুখমণ্ডলের সঙ্গে এই চোখদুটোর যেন এতটুকু সঙ্গতি নেই। আর এই চোখদুটো সারাক্ষণ আমার মুখের ওপরে এ'টে আছে। তখন আমার এমন একটা অবস্থা হয় যে ইচ্ছে হতে থাকে, হাত দিয়ে আমার মুখটা মুছে নিই।

প্রথম কয়েকদিন আমি বসেছিলাম সামনের বেঞ্চিতে, শিক্ষকমশাইয়ের একেবারে নাকের নিচে। ক্রমশ সেটা অসহ্য হয়ে ওঠে। আমার মনে হতে থাকে, শিক্ষকমশাই যেন আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পান না, এবং নাকি নাকি সুরে আমাকেই শুধু বলে চলেছেন:

'পেস্কো-ও-ভ, শার্ট বদলে আসবে! পেস্কো-ও-ভ, মেঝের ওপরে পা ঘোষো না! পেস্কো-ও-ভ, তোমার জুতো থেকে আবার মেঝের ওপরে কাদার দাগ লেগেছে!'

আমিও ছেড়ে কথা বলি না। মাথা থেকে অতি মারাত্মক রকমের সব কৌশল আবিষ্কার করে তাঁকে নাস্তানাবুদ করে তুলি। একদিন করলাম কী, একটা আধ-পচা তরমুজ যোগাড় করে সেটাকে আধখানা করে ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর একটা কপিকল দিয়ে সেটাকে ঝুলিয়ে দিলাম অন্ধকার বাইরের ঘরের দিকের দরজাটার ওপরে। দরজাটা খুললেই তরমুজের টুক্‌রোটা শূন্যে উঠে যায় কিন্তু শিক্ষকমশাই যেই না দরজাটা বন্ধ করলেন অমনি তরমুজের টুক্‌রোটা নেমে এসে টুপির মতো থপ্‌ করে বসে গেল তাঁর টাকমাথার ওপরে। এই ঘটনার পরে স্কুলের রাত্রিবেলার পাহারাদার শিক্ষকমশাইয়ের চিঠি নিয়ে আমাকে বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে গেল। অপকর্মটির জন্যে একচোট পিটুনি খেতে হল আমাকে।

আরেকবার তাঁর ডেস্কের ড্রয়ারে নস্যির গুঁড়ো ছড়িয়ে রেখেছিলাম। ফলে হাঁচতে হাঁচতে তাঁর এমন অবস্থাই হল যে বাধ্য হয়ে তিনি ক্লাশ ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি নিজে আর আসতেই পারলেন না, সে-জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এক জামাইকে। এই জামাইটি হচ্ছে একজন অফিসার। সে ক্লাশ নিতে এসে আমাদের দিয়ে সারাক্ষণ শুধু দুটি গান গাওয়াল। একটি হচ্ছে, 'ভগবান জারকে দীর্ঘজীবী করুন!' অপরটি, 'স্বাধীনতা, আমার প্রিয় স্বাধীনতা!' কেউ বেসুরো গেয়ে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে তার মাথায় রুল দিয়ে টোকা মারে। টোকা মারার ভঙ্গিটা ভারি মজার; বেজায় শব্দ হয় কিন্তু একটুও ব্যথা লাগে না।

ধর্মপুস্তক যিনি পড়ান তিনি একজন তরুণ বয়সী পাদ্‌রি, মাথায় ফুলো ফুলো ঘন চুল এবং তাঁর চেহারাটা সুন্দর। তিনি আমাকে অপছন্দ করেন কারণ 'বাইবেলের গল্প' বইটা আমার নেই আর তাঁর কথা বলার ভঙ্গি আমি নকল করি।

ক্লাশঘরে ঢুকেই তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞেস করা:

'পেশ্‌কভ, তুমি বই এনেছ কি আননি? হ্যাঁ, বই।'

'না, আনিনি। হ্যাঁ।'

'"হ্যাঁ" মানে?'

'না।'

'যাও, এক্ষুণি বাড়ি চলে যাও! হ্যাঁ, বাড়ি। কারণ তোমার মতো ছেলেকে পড়াবার ইচ্ছে আমার নেই। হ্যাঁ, বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।'

বাড়ি ফিরে যেতে আমার আপত্তি নেই। তাহলে আমি স্কুল-ছুটির সময় না হওয়া পর্যন্ত এই অঞ্চলের নোংরা রাস্তাগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারি এবং চারপাশের বিচিত্র কোলাহলপূর্ণ জীবনকে লক্ষ্য করতে পারি।

পাদরিমশাইয়ের মুখটি সুকুমার, যিশু খ্রীষ্টের মুখের মতো। মেয়েলি চোখদুটো থেকে স্নেহ ঝরে পড়ছে। ছোট ছোট হাত; বই বা রুল বা কলম বা অন্য যা-কিছুর ওপরে সেই হাতের ছোঁয়া পড়ে, মনে হয় যেন আদর করছেন। মনে হয়, প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনি ভালোবাসেন, প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনি জীবন্ত বলে মনে করেন — যেন অসতর্কভাবে নাড়াচাড়া করলে এই জিনিসগুলোর ব্যথা লাগবে। তবে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ওপরে তাঁর স্নেহটা এর চেয়ে কমই — তা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা তাঁকে ভালোবাসে।

স্কুলে সাধারণত আমি মোটামুটি ভালোই নম্বর পেয়েছিলাম কিন্তু তবুও আমাকে জানিয়ে দেওয়া হল যে আমার বেয়াদবির জন্যে আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। খবরটা শুনে আমি বিচলিত হলাম। ব্যাপারটা যদি তাই ঘটে তবে নিঃসন্দেহে এই ব্যাপারের ফলাফল আমার পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠবে। আমার মা'র মেজাজটা দিনের পর দিন তিরিক্ষি হয়ে উঠছে এবং আজকাল প্রায়ই সে আমাকে মারধোর করে।

কিন্তু এই চরম বিপদ থেকে আমি উদ্ধার পেয়ে গেলাম। বিশপ ক্রিসান্‌ফ* আমাদের স্কুল পরিদর্শনে এলেন; একেবারেই হঠাৎ-আসা, আগে থেকে কোনো রকম ঠিক ছিল না। যতোদূর আমার মনে আছে বিশপ ক্রিসান্‌ফের পিঠে কুঁজ ছিল।

মানুষটি ছোট, পরনে ফুরফুরে কালো পোশাক; তিনি যখন ক্লাশঘরে ঢুকে ডেস্কের সামনে আসন গ্রহণ করলেন তখন খুশি ও অন্তরঙ্গতার একটা অপরিচিত হাওয়ায় ক্লাশঘরটা যেন ভরে গেল।

* বিশপ ক্রিসান্‌ফ — বিখ্যাত তিনখণ্ডে-সমাপ্ত 'প্রাচীন পৃথিবীর ধর্ম' পুস্তকের গ্রন্থকার এবং 'মিশরীয় দেহান্তরবাদ' ও 'নারী ও বিবাহ' প্রবন্ধদ্বয়ের লেখক। শেষোক্ত প্রবন্ধটি আমাকে তরুণ বয়সে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। প্রবন্ধটির শিরোনামা হয়তো আমি ভুল লিখে থাকতে পারি — প্রবন্ধটি অষ্টম দশকে একটি ধর্ম-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। — গোর্কি

জামার মস্ত মস্ত আস্তিনের ভিতর থেকে হাতদুটো বার করে তিনি বললেন, 'বাবারা, এস একটু গল্পগুজব করা যাক্।'

নাম ধরে ধরে তিনি এক-একজনকে ডেস্কের সামনে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। আমার পালা এল তালিকার একেবারে শেষ দিকে।

'তোমার বয়স কত?' জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, 'সত্যি? বাব্বাঃ, এইটুকু বয়সেই কী প্রকান্ড শরীর হয়েছে তোমার! অনেক রোদজল গায়ের ওপর দিয়ে গেছে নিশ্চয়ই?'

রোগা রোগা হাত, আঙ্গুলের নখগুলো লম্বা আর ছুঁচলো। একটা হাত রাখলেন টেবিলের ওপরে, আরেক হাতে ধরলেন মুখের অল্প কয়েক গোছা দাড়ি। দরদভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি:

'আচ্ছা, ধর্মপুস্তকের যেসব গল্প তোমার ভালো লাগে তার একটা বলো তো শুনি।'

যখন আমি তাঁকে বললাম যে পাঠ্য ধর্মপুস্তকের বইটি আমার নেই, সুতরাং কোনো গল্পই আমি পড়তে পারিনি — তিনি তাঁর টুপি ঠিকঠাক করে বসে বললেন:

'বই না থাকলে তো চলবে না। এসব তো তোমাকে শিখতেই হবে — বুঝেছ তো? বইয়ের গল্পগুলোর কথা থাক্। আচ্ছা, অন্যের মুখে শুনে-টুনেও তো কিছু জানা থাকতে পারে — এই কোনো একটা গল্প বা যা-হোক্ কিছু — তাই একটা বল তো শুনি। তুমি প্সাল্টির পড়েছ? বেশ, বেশ! উপাসনা করতে শিখেছ? বাঃ, কে বলে তুমি কিছু জান না? আচ্ছা, কোনো সাধু-মহাপুরুষের জীবনী জানা আছে? কি বললে, ছড়ায় বলে যেতে পার? কী কান্ড, তুমি যে দেখছি একেবারে পন্ডিত লোক হয়ে উঠেছ!'

এমন সময়ে আমাদের স্কুলের পাদ্রিমশাই এসে হাজির। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে আর জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন। বিশপ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, তারপরেই তিনি আমার নামে বলতে লাগলেন বিশপের কাছে।

'একটু সবুর করুন!' হাত উঠিয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে বিশপ বললেন, তারপর আবার ফিরে তাকালেন আমার দিকে, 'আচ্ছা, তুমি আমাদের "ঈশ্বরানুগৃহীত আলেক্সেই"এর গল্পটা একটু শোনাও তো দেখি...'

একটা লাইন ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা মনে করবার জন্যে একটু থামতেই তিনি বললেন, 'ভারি চমৎকার ছড়া, না বাবা? মনে হচ্ছে, এ গল্পটা ছাড়াও

আরো কিছু কিছু গল্প তোমার জানা আছে। আচ্ছা, রাজা ডেভিডের গল্পটা জানো? বেশ, বেশ। ভারি খুশি হলাম তোমার কথা শুনে!'

আমি বুঝতে পারছিলাম, এই গল্পগুলি শুনতে তাঁর খুবই ভালো লাগছে এবং ছড়া তিনি খুবই ভালোবাসেন। অনেকক্ষণ ধরে আমি বলে চললাম। আমাকে বাধা না দিয়ে চুপ করে শুনে গেলেন তিনি, শেষকালে বললেন:

'তোমার কি প্সাল্টির থেকে বর্ণপরিচয় হয়েছে? কে তোমাকে পড়িয়েছিলেন? ভালো-মানুষ দাদামশাই? ভালো নয়? খারাপ-মানুষ দাদামশাই! ছি, ছি. এমন কথা বলতে নেই! আর তুমি কি খুব দুষ্টুমি কর?'

আমি লজ্জা পেলাম কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলাম। শিক্ষকমশাই আর পাদ্রিমশাই ফলাও করে আমার অপরাধের বর্ণনা দিতে শুরু করলেন। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বিশপ শুনলেন তাঁদের কথা।

শেষকালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'শুনছ তো, তোমার সম্পর্কে ওঁরা কী বলছেন? এদিকে এস!'

একটা হাত রাখলেন আমার মাথার ওপরে, তাঁর হাতে সাইপ্রেসের গন্ধ। বললেন:

'তুমি এত দুষ্টুমি করো কেন?'

'স্কুল আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না? শোন বাবা, তোমার একথা শুনে বুঝতে পারছি, তোমার মধ্যে কোথাও একটা কিছু গলদ আছে। স্কুল যদি তোমার ভালো না লাগে তাহলে বলতে হবে যে তুমি খারাপ ছেলে। কিন্তু তোমার পরীক্ষার নম্বর দেখে বুঝতে পারছি যে তুমি খারাপ ছেলে নও। নিশ্চয়ই কোথাও একটা কিছু গলদ আছে।'

আলখাল্লার ভিতর থেকে ছোট একটা বই বার করে তিনি লিখলেন, 'পেশ্‌কভ, আলেক্সেই'। আর বলতে লাগলেন, 'তোমার ওই দুষ্টুমি যদি বন্ধ করতে পার বাবা, তবেই তোমার মঙ্গল। একটু-আধটু দুষ্টুমি করলে কোনো ক্ষতি নেই, ওতে লোকে কিছু মনে করে না। কিন্তু দুষ্টুমির মাত্রাটা বড়ো বেশি হয়ে গেলে সবার পক্ষেই তা অসহ্য। ঠিক বলিনি বাবারা?'

'ঠিক বলেছেন!' কলকণ্ঠে ও সমস্বরে জবাব এল।

'আচ্ছা এবার তোমাদের কথা বলো তো শুনি। তোমরা সবাই খুব লক্ষ্মী ছেলে — না?'

'না, না, মোটেই নই।' ছেলেরা হাসতে লাগল।

বিশপ আমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর এমন একটা অবাক-হওয়া সুরে কথা বলতে লাগলেন যে শিক্ষকমশাই ও পাদ্রিমশাই পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারলেন না।

'শোন তোমাদের বলি — তোমাদের মতো বয়সে আমিও খুব দুষ্টু ছিলাম! কেন আমাদের ও-রকম হয় জানো?'

ছেলেরা হাসছে। তিনি তাদের প্রশ্ন করছেন; প্রশ্নগুলি এমন চালাকির সঙ্গে করছেন যে ছেলেরা নিজেদের কথার জালে নিজেরাই আটকা পড়ে যাচ্ছে। ভারি একটা ফুর্তির আবহাওয়া এসে গেছে ক্লাশঘরের মধ্যে, ফুর্তিটা ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে। শেষকালে একসময়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন:

'তোমাদের মতো দুষ্টু ছেলেদের ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করে না! কিন্তু আমার যাবার সময় হয়ে গেছে, এবার রওনা হতে হবে।'

চওড়া আস্তিনটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাত তুলে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন ক্লাশের উদ্দেশে:

'বেঁচে থাক বাবারা। ভালো কাজে মন দাও। জগৎ-পিতা আর তাঁর সন্তানের নামে, পরম আত্মার নামে, তোমাদের এই আশীর্বাদই করি। বিদায়।'

'বিদায়, প্রভু! তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসবেন!' ছেলেরা চেঁচিয়ে বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি জবাব দিলেন, 'আসব, নিশ্চয়ই আসব। তোমাদের জন্যে বই নিয়ে আসব আমি।' তারপর শিক্ষকমশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'আজ ওদের ছুটি দিয়ে দিন।'

আমাকে নিয়ে সদরের কাছে এসে থামিয়ে চাপা স্বরে তিনি বললেন, 'বাবা, আমাকে কথা দিতে হবে যে আর কক্ষণো এমন দুষ্টুমি করবে না। কথা দিচ্ছ তো বাবা? কেন যে তুমি এমন দুষ্টুমি করো তা আমিও বুঝি — কিন্তু বাবা, একটু রয়ে-সয়ে। আচ্ছা চলি এবার, কেমন?'

কথাগুলো শুনে আমি খুবই বিচলিত হলাম। অদ্ভুত একটা আবেগ বুকের মধ্যে ফুলেফেঁপে উঠছে। অবস্থা এমন হল যে, আমার শিক্ষকমশাই যখন আমাকে ক্লাশের পরে আটকে রেখে উপদেশ দিতে শুরু করলেন এবং

বললেন যে এবার থেকে আমাকে ভেড়ার মতো বাধ্য হয়ে চলতে হবে—তখনো আমি স্বেচ্ছায় ও স-মনোযোগে তাঁর কথা শুনলাম।

কোটটা পরতে পরতে সস্নেহে পাদ্রিমশাই বললেন, 'এখন থেকে আমার ক্লাশে তোমাকে থাকতে হবে। হ্যাঁ, থাকতে হবে। আর চুপটি করে বসে থাকতে হবে। হ্যাঁ, চুপটি করে।'

স্কুলের গোলমাল মিটে গেল। কিন্তু বাড়িতে একটা ভারি বিশ্রী কান্ড করে বসলাম। একটা রুবল চুরি করলাম মা'র তহবিল থেকে। ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত নয়। একদিন সন্ধ্যার সময় মা যেন কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল এবং বাচ্চাটিকে আগলে আমি ছিলাম বাড়িতে। চুপ করে বসে থেকে থেকে যখন ভালো লাগছিল না তখন যা-হোক একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে আমার সৎ-বাপের একটা বই টেনে নিয়েছিলাম। বইটার নাম, 'চিকিৎসকের স্মারকলিপি'। লেখক জ্যেষ্ঠ ডুমা। বইটা ওল্টাতে ওল্টাতে পাতার ভাঁজে একটা এক-রুবল ও একটা দশ-রুবলের নোট পেলাম। বইটার একবর্ণও আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু বইটা বন্ধ করে রেখে দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার মাথায় একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল। রুবল্টা যদি আমি নিয়ে নিই তাহলে সেটা দিয়ে শুধু যে 'বাইবেলের গল্প' বইটাই কেনা চলে তা নয়, 'রবিনসন ক্রুসো' বইটাও কেনা চলে। রবিনসন ক্রুসো নামে যে একটা বই আছে, এ-খবরটা আমি অল্প কিছুকাল হল পেয়েছি। এক শীতের দিনে টিফিনের সময় আমি ছেলেদের কাছে রূপকথার গল্প বলছিলাম, হঠাৎ একটি ছেলে ঠোঁট উল্টিয়ে বলে উঠল, 'এসব রূপকথার গল্প একেবারে বাজে! গল্পের মতো গল্প হচ্ছে, রবিনসন ক্রুসো—সত্যিকারের গল্প।'

ছেলেদের দলে আরো কয়েকজন ছিল যারা রবিনসন ক্রুসো পড়েছে। সকলেই বইটার সুখ্যাতি করল। দিদিমার গল্পকে এভাবে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দেখে আমি খুবই আঘাত পেলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যে-করে হোক্ রবিনসন ক্রুসো বইটা যোগাড় করব এবং বইটা পড়ে নিয়ে দেখিয়ে দেব যে দিদিমার গল্পের চেয়ে বইটা কিছুতেই ভালো হতে পারে না!

পরদিন আমি যখন স্কুলে এলাম তখন আমার সঙ্গে ছিল 'বাইবেলের গল্প', এন্ডারসনের রূপকথার দুটি জীর্ণ খন্ড, তিন পাউন্ড সাদা রুটি আর এক পাউন্ড সসেজ। ভ্লাদিমির গির্জা পেরিয়ে রাস্তার মোড়ে যে অন্ধকার ছোট বইয়ের দোকানটা আছে সেখানেই 'রবিনসন ক্রুসো' বইটাও

পেয়েছি। বইটা খুবই পাতলা, হলদে মলাট, মলাট উলটিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় বইয়ের নাম ও এক দাড়িওলা লোকের ছবি। লোকটির মাথায় ফারের টুপি আর কাঁধে বাঘের ছাল। এই ছবিটা আমায় মোটেই আকর্ষণ করতে পারেনি। বরঞ্চ রূপকথার বইয়ের পুরনো আর ছেঁড়া বাঁধাইটুকু পর্যন্ত আমার কাছে মনোমুগ্ধকর ঠেকেছে।

টিফিনের সময়ে অনেকক্ষণ ছুটি। সেই সময়ে ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গে ভাগ করে আমি রুটি আর সসেজ খেলাম, তারপর সকলে মিলে 'বুলবুল' নামে গল্পটা পড়তে শুরু করলাম। ভারি চমৎকার গল্পটি, একেবারে প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়।

'চীনদেশে সব মানুষই চীনা, এমন কি সম্রাটও চীনা।' আমার এখনো মনে আছে, এই লাইনটির সহজ সরসতা ও উচ্ছল সুর এবং তা ছাড়াও আশ্চর্যরকমের ভালো আরো কিছু আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

'বুলবুল' গল্পটা স্কুলে শেষ পর্যন্ত পড়বার সময় পাইনি। বাড়ি ফিরে আসতেই এক কাণ্ড। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিম ভাজছিল, আমাকে দেখেই মুখ তুলে থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল:

'তুই একটা রুব্‌ল নিয়েছিস?'

'হ্যাঁ। এই যে বই কিনেছি...'

সঙ্গে সঙ্গে লাঠি দিয়ে মা আমাকে দমাদম পিটোতে শুরু করল। রূপকথার বইগুলো ছিনিয়ে নিল আমার হাত থেকে এবং এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখল যাতে আমি আর কোনো দিনই বইগুলো খুঁজে না পাই। পিটুনি দেওয়ার চাইতেও এই শাস্তিটাই আমার কাছে অসহ্যরকমের যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়েছিল।

তারপর কয়েকদিন আমি আর স্কুলে যাইনি। ইতিমধ্যে আমার সৎ-বাপ আমার এই কীর্তির কথা কারখানার লোকদের কাছে বলেছে, আবার কারখানার লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করেছে এই নিয়ে, তারপর ছেলেদের মুখে মুখে স্কুলেও ছড়িয়ে পড়েছে এই গল্প। আমি যতোদূর বুঝতে পারি এইভাবেই গড়িয়েছিল ব্যাপারটা। তারপর আমি যেদিন আবার প্রথম স্কুলে গেলাম, সবাই আমাকে অভ্যর্থনা জানাল নতুন একটা ডাকনামে ডেকে: চোর! নামটি সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট—কিন্তু অসঙ্গত। রুব্‌লটা যে আমি নিয়েছি এ-ব্যাপারটা গোপন করবার কোনো চেষ্টা আমি করিনি, ব্যাপারটা তাদের আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু

কেউ আমার কথা বিশ্বাস করল না। তাই বাড়ি ফিরে এসে আমি মা'কে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম যে স্কুলে আমি আর কোনো দিন যাব না।

আমার মা আবার অন্তঃসত্ত্বা। জানলার ধারে বসে খাওয়াচ্ছিল আমার ভাই সাশাকে। পাশ্‌ফিরে মুখটা ফিরিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত আর ক্লিষ্ট দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, মুখটা হাঁ হয়ে গেল মাছের মতো।

'তুই মিথ্যে কথা বলছিস,' মৃদুস্বরে বলল মা, 'তোর রুবল নেবার কথা অন্য লোক শুনবে কি করে?'

'যাও তুমি, জিজ্ঞেস করে দেখ গিয়ে।'

'নিশ্চয় তুই নিজেই তাদের বলেছিস। সত্যি কথা বল্ তো—বলেছিস কিনা? খবরদার যা-তা বলবিনে—কাল আমি স্কুলে গিয়ে নিজেই খোঁজ করে আসব, কে একথা বলেছে।'

আমি ছাত্রটির নাম করলাম। শুনে মা'র মুখটা কেমন মুষড়ে গেল আর চোখের জলে ভিজে গেল।

রান্নাঘরে চুল্লির পিছনদিকে পুরানো কাঠের বাক্স সাজিয়ে আমার জন্যে বিছানা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলাম, পাশের ঘরে আমার মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে:

'হায় প্রভু! হায় প্রভু!..'

তেলচিট্‌চিটে গরম ছেঁড়া কম্বলগুলোর গন্ধ অসহ্য মনে হতে লাগল। বিছানা ছেড়ে বাইরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'কোথায় যাচ্ছিস রে? আয়, আমার কাছে আয়?' মা ডাকল আমাকে।

তারপর মেঝের ওপরে পাশাপাশি বসে রইলাম দু'জনে। সাশা শুয়ে আছে মা'র কোলে আর মার জামার বোতাম ধরে টানাটানি করছে। মাঝে মাঝে আপন মনেই মাথা নাড়ে আর বলে, 'বুবম।' মানে, বোতাম।

মা'র গা ঘেঁষে আমি বসে রইলাম। একটা হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল মা। বলল:

'জানিস তো, আমরা খুবই গরীব। আমাদের কাছে প্রত্যেকটি কোপেক... প্রত্যেকটি কোপেক...'

উষ্ণ হাত দিয়ে মা আমাকে জোরে চেপে ধরেছে। যে কথাগুলো সে বলতে চাইছে তা আর কিছুতেই শেষ করতে পারছে না।

'চামার, একেবারে চামার!' হঠাৎ কথাগুলো বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। ঠিক এই কথাগুলো মা'র মুখে আগে আরেকবার আমি শুনেছি।

'মার,' মা'র কথাটাকে নকল করতে চেষ্টা করছে সাশা।

ভারি অদ্ভুত হয়েছে এই বাচ্চাটা। ল্যাকপেকে চেহারা আর প্রকাণ্ড একটা মাথা। চোখদুটো আশ্চর্যরকমের নীল, আর হাসি-হাসি চোখে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যে মনে হয় যে কিছু একটা ঘটবে বলে সে আশা করছে। অস্বাভাবিক অল্প বয়সেই সে কথা বলতে শুরু করেছে। কক্ষণো কাঁদে না, আনন্দের একটা তুরীয় অবস্থায় বাস করছে যেন। সে এত দুর্বল যে হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতাটুকুও তার প্রায় নেই। কিন্তু আমাকে যখনই দেখে ভারি খুশি হয়। ক্ষুদে ক্ষুদে হাতদুটো বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে আর নরম-নরম ছোট-ছোট আঙ্গুলে আমার কান নিয়ে খেলা করে। আর ওর আঙ্গুলগুলোতে সব সময়েই কেন জানি ভায়োলেট ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। এই বাচ্চাটি আচমকা মারা গিয়েছিল, কোনো রকম অসুখ পর্যন্ত করেনি। সকালবেলাতেও নিজের চাপা আনন্দে নিজেই মশগুল হয়ে ছিল, আর সন্ধ্যেবেলায় যখন গির্জার সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা বাজছে তখন কবর দেবার জন্যে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। ব্যাপারটা ঘটেছিল ওর পরের ভাই নিকোলাইয়ের জন্মের ঠিক পরেই।

স্কুলে গিয়ে সকলের ভুল ধারণা কাটিয়ে দিয়ে আসবে বলে মা যে কথা দিয়েছিল তা রেখেছে। তারপর থেকে আবার আমি নিয়মিত লেখাপড়া করছি। কিন্তু আবার এমন একটা ঘটনা ঘটে যার ফলে আবার আমাকে দাদামশাইয়ের কাছে চলে যেতে হয়। ঘটনাটি এই:

একদিন চায়ের সময়ে আমি উঠোন থেকে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় শুনতে পেলাম, আমার মা ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করছে:

'ইয়েভগেনি, ইয়েভগেনি, তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি যেও না!'

আমার সৎ-বাপ জবাব দিল, 'বাজে বোকো না!'

'কিন্তু আমি জানি তুমি ওই মেয়েটির কাছেই যাও।'

'বেশ করি যাই—তাতে কী হয়েছে?'

দুজনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কাশির দমকের ফাঁকে ফাঁকে মা বলল:

'কী নীচ আর অপদার্থ চামার হয়েছ তুমি!'

তারপরেই শুনলাম, আমার সৎ-বাপ আমার মাঁকে মারছে। ছুটে ঘরের ভিতরে ঢুকলাম আমি। দেখলাম, আমার মা হাঁটু মুড়ে বসে আছে, পিঠ আর কনুই দিয়ে একটা চেয়ার শক্তভাবে চেপে ধরে, আটকে রেখেছে নিজেকে, মাথাটা হেলে পড়েছে পিছনদিকে, অস্বাভাবিক চক্‌চক্‌ করছে চোখদুটো—আর মা'র ঠিক সামনেটিতে ফিটফাট নতুন পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে আমার সৎ-বাপ, লম্বা পা তুলেছে মাকে লাথি মারবার জন্যে। রুপোর বাঁট লাগানো একটা ছুরি তুলে নিলাম টেবিলের ওপর থেকে—আমার বাবার যে-সমস্ত জিনিস মা'র কাছে ছিল তার মধ্যে এই ছুরিটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারপরে আমার সৎ-বাপের শরীরের পাশের দিকটা লক্ষ্য করে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুরি বসালাম।

আমার সৎ-বাপের কপাল বলতে হবে, আমার মা ঠিক সময়টিতে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। ছুরিটা তার কোট ফুঁড়ে গায়ের চামড়া ছুঁয়ে গেছে মাত্র। কাৎরে উঠে একপাশটা চেপে ধরে সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর্ত চিৎকার করে আমার মা শক্তমুঠোয় আমাকে ঠেসে ধরল মেঝের ওপরে। উঠোন থেকে ফিরে এসে আমার সৎ-বাপ মা'র কবল থেকে মুক্ত করল আমাকে।

আর এতসব কাণ্ডের পরেও আমার সৎ-বাপ সেদিন সন্ধ্যার পরে বেরিয়েছিল। চুল্লির পিছনদিকে যেখানে আমি শুয়েছিলাম, সেখানে মা এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আলতোভাবে আমাকে বুকের ওপরে চেপে ধরে চুমু খেয়ে বলল:

'কিছু মনে করিসনে, আমারই দোষ। কিন্তু তোর কি মাথা খারাপ হয়েছিল? ছুরি নিয়ে তেড়ে এসেছিলি!'

আমি যে-জবাব দিয়েছিলাম তার অর্থ সম্পর্কে আমার মনে কোনো রকম অস্পষ্টতা ছিল না। মা'কে জানিয়ে দিলাম যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার সৎ-বাপকে খুন করব এবং তারপরে নিজেও খুন হব। আরেকটু হলে করে বসতামও—অন্তত একবার চেষ্টা তো করতাম। এখনো পর্যন্ত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই কলুষিত পাটাকে। উজ্জ্বল রঙের ফেটি লাগানো ট্রাউজার পরা সেই পাটা বাতাসে দুলছে আর একটি স্ত্রীলোকের বুক লক্ষ্য করে নেমে আসছে।

মাঝে মাঝে যখন এই বর্বরোচিত রুশ জীবনের ঘৃণিত অস্তিত্বের কথা ভাবি তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এ-সব কথা নতুন করে বলার কোনো

আর ইয়াজের ওপরেই নজর রাখতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়ে তক্তাগুলোকে বাছাই করি। তারপর আমাদের সঙ্গী দু'জন নানা ছলছুতোয় পাহারাওলাদের নাকাল করে পালিয়ে চলে যায় আর আমরাও ফিরতি পথ ধরি। আমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে থাকে একটা করে দড়ি; দড়িটার একপ্রান্তে থাকে বড় একটা বাঁকানো পেরেক; এই পেরেকটাকে আটকে দেওয়া হয় তক্তার সঙ্গে, যাতে বরফ ও তুষারের ওপর দিয়ে তক্তাটাকে টেনে নেওয়া চলে। ক্বচিৎ আমরা পাহারাওলাদের নজরে পড়েছি, আর যদি নজরেও পড়ি তাহলেও পাহারাওলারা আমাদের ধরতে পারে না। তক্তাগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে লভ্যাংশ ছয়টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকের ভাগে পড়ে পাঁচ কিংবা সাত কোপেক।

একদিন পেট পুরে খাওয়ার পক্ষে এই যথেষ্ট। কিন্তু মা'কে ভদ্‌কার টাকা ভিয়াখির যদি না দিয়ে যায় তাহলে তার মা তাকে ধরে মারে। কস্ত্রমার অনেক দিনের শখ, সে পায়রা পুষবে এবং এই স্বপ্নকে চরিতার্থ করবার জন্যে সে টাকা জমায়। চুরকার মা রোগে ভুগছে সুতরাং চুরকার প্রতিটি পয়সার দরকার হয় মা'র চিকিৎসার জন্যে। খাবিও টাকা জমায়, কারণ যে-শহর থেকে সে এখানে এসেছে সেখানেই ফিরে যেতে চায় আবার। খাবির এক মামা তাকে নিয়ে এসেছিল সেই শহর থেকে কিন্তু নিজ্‌নি-নভ্‌গরোদে আসার অল্প কিছুদিন পরেই তার মামা জলে ডুবে মারা যায়। শহরটির নাম খাবি ভুলে গেছে; তার শুধু এটুকু মনে আছে যে শহরটি হচ্ছে ভল্‌গার কাছে কামা নদীর ধারে।

কেন জানি আমাদের মনে হয়, খাবির কল্পনাজগতের এই শহরটি খুবই একটা মজার ব্যাপার। এই শহরের কথা তুলে আমরা ট্যারাচোখ তাতার ছেলেটিকে অনবরত ক্ষেপাই:

আছে এক শহর অতি অপরূপ
খোঁজ করে করে হন্যে।
দেখ যদি পাও এখানে ওখানে
কিংবা আকাশে শূন্যে।

এই ছড়া শুনে প্রথম প্রথম খাবি আমাদের ওপর রেগে যেত। কিন্তু একদিন ভিয়াখির তাকে বলে:

'হয়েছে বাপু, হয়েছে। বন্ধুবান্ধবরা অমন বলেই থাকে, তাই বলে রাগ করতে হয় নাকি?'

মিষ্টি স্বরে কথাগুলি বলে; আমরা যে ওর নাম 'পায়রা' রেখেছি তা মিথ্যে নয়।

তাতার ছেলেটি লজ্জা পায়। তারপর থেকে আমরা পিছনে লাগলেও ও আর গায়ে মাখে না, এমন কি কামা নদীর ধারের শহরটি সম্পর্কে এই ছড়া নিজেই সুর করে করে বলতে শুরু করে।

কিন্তু তবুও তক্তা চুরি করার চেয়ে রাস্তার টুকিটাকি কুড়নোটাই আমরা বেশি পছন্দ করি। আর বিশেষ করে বসন্তকালে তো কথাই নেই; তখন একাজে খুবই মজা। বরফ গলে যায় আর বৃষ্টির জল ধুয়ে দিয়ে যায় শূন্য মেলার মাঠ। সে-সময়ে মেলার মাঠ থেকে কখনো শূন্য হাতে ফিরতে হয় না; আবর্জনার স্তূপে খুঁজলেই পেরেক বা ধাতুর টুকরো পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে তামা ও রুপোর মুদ্রাও হাতে এসেছে। কিন্তু পাহারাওলারা দেখলেই তাড়া করে এবং আমাদের থলেগুলোকে কেড়ে নেয়। পাহারাওলাদের ঠেকাবার জন্যে হয় আমাদের দু-কোপেক করে ঘুষ দিতে হয়, নইলে ধরতে হয় হাতে-পায়ে। মোট কথা, পয়সা উপায় করাটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না কিন্তু এই পয়সা উপায় করার মধ্যে দিয়েই আমাদের মধ্যে সেরা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে ঝগড়াও হয়েছে কিন্তু কখনো মারামারি করেছি বলে মনে পড়ে না।

আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মিটমাট করে দেয় ভিয়াখির। উত্তেজনার যতো কারণই থাকুক না কেন, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলতে পারে ও এবং ওর কথা শুনে আমরা শান্ত হই। কথাগুলো খুবই সহজ ও সাধারণ কিন্তু এমনই যে আমরা অবাক হই এবং নিজেদের ব্যবহারে নিজেরাই লজ্জা পাই। এমন কি কথাগুলো বলে ভিয়াখির নিজেও অবাক হয়ে যায়। ইয়াজকে নীচুস্তরের ফন্দিফিকির করতে দেখেও ও কোনো দিন রাগ করেনি বা আতঙ্কিত হয়নি। এসব ও ভ্রূক্ষেপই করে না; বলে, এসব হচ্ছে মূর্খতা, এসবের কোনো অর্থ হয় না—আর এই বলে শান্তভাবে উড়িয়ে দেয় সবকিছু।

ও প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, বল্ তো কেন তুই এসব কাজ করিস?' আর ওর প্রশ্ন শুনে সকলেই স্পষ্ট বুঝতে পারে যে সত্যি সত্যিই এসব কাজের কোনো অর্থ হয় না।

নিজের মা'র সম্পর্কে কিছু বলতে হলে, মা'কে বলে 'আমার মর্দোভীয়নী'। আমাদের কারও কিন্তু কোনো দিন মনে হয়নি যে এই কথাগুলোর মধ্যে কোনো মজা আছে।

গোল দুই সোনালী চোখের ঝিলিক তুলে হাসতে হাসতে সে বলে, 'গত রাত্রে আমার মর্দোভীয়নী একেবারে চুর হয়ে বাড়ি ফেরে। তারপরে সদরের সিঁড়ির ওপরেই থেবড়ে বসে গান জুড়ে দেয়। গান গেয়েই চলে, থামেই না আর—এমনি বেহায়া! ধাড়ী মুরগীর মতো!'

গুরুগম্ভীর চুরকা জিজ্ঞেস করে, 'কী গান গাইছিল রে?'

মা'র গাওয়া গানটা ভিয়াখির গেয়ে শোনায়: সরু সরু চড়া গলা, আর গানের সঙ্গে সঙ্গে চাপড় মারে হাঁটুতে। গানটা হচ্ছে এই:

ঠক্ ঠক্ ঠক্!
রাখাল টোকা দিচ্ছে শার্সিতে
ঘরে আমি রইতে নারি কোনো মতে!
সুর্যি ডোবে পশ্চিমে — রাখাল বাজায় বাঁশি
অতি মধুর সুরের লহর, অতি মধুর হাসি।
থমকে শোনে লোক।
ঠক্ ঠক্ ঠক্!

এমনি ধরনের অজস্র মজাদার গান জানে ও। আর গাইতেও পারে চমৎকার ভাবে।

তারপর সে বলে চলে, 'তারপর কী হল শোন্। ওখানে, ওই সদরের চৌকাঠে সে ঘুমিয়ে পড়ে। আর খোলা দরজা দিয়ে সে কি হি-হি ঠান্ডা হাওয়া। জামাকাপড় ফুঁড়ে আমার সর্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। আর সেই বিরাট বপু দরজা থেকে সরিয়েও আনতে পারি না। সকাল হলে তাকে বলি, আচ্ছা কেন বলো তো তুমি এতবেশি মদ খাও? সে জবাব দেয়, আর ক'টা দিন একটু মুখ বুজে সহ্য করে যা, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না রে!'

'ঠিকই তো, বেশিদিন আর বাঁচবে না। তোর মা'র সারা শরীরটা কি-রকম ফুলে উঠেছে দেখেছিস তো?' অভিভূত স্বরে চুরকা সায় জানায়।

'মা মরে গেলে তোর মন খারাপ হবে না রে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

আমার প্রশ্ন শুনে ভিয়াখির একটু যেন অবাক হয়ে জবাব দেয়, 'হবে বৈকি। নিশ্চয়ই হবে। সে যে ভালো মেয়ে।'

আমরা সবাই জানি, ভিয়াখিরের মা ওকে প্রায়ই ধরে মারে। তবুও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মানুষ হিসেবে সে ভালো। আর তাই, কোনো দিন আমাদের লাভের বখরা নগণ্য হলে চুরকা বলে:

'ভিয়াখিরের মা'কে ভদ্‌কা কিনে দেবার জন্যে সবাই একটা একটা কোপেক দিয়ে দাও। নইলে ভিয়াখিরকে ওর মা মারবে।'

দলের মধ্যে চুরকা ও আমি ছাড়া আর কেউ লিখতে পড়তে জানে না। এজন্যে ভিয়াখির হিংসে করে আমাদের।

ইঁদুরের মতো ছুঁচলো কান টেনে ধরে মিহি সুরে সে বলে, 'আমার এই মর্দোভীয়নী যেদিন মারা যাবে, সেদিন আমিও গিয়ে স্কুলে ভর্তি হব। মাস্টারমশাইয়ের পায়ে মাথা কুটে রাজি করাব তাঁকে। তারপর লেখাপড়া শেষ হয়ে গেলে আর্চবিশপের বাগান তদারক করার কাজ নেব আমি। চাই কি, আর্চবিশপের বাগান না হয়ে জারের বাগানও হতে পারে।'

সেই বছরই বসন্তকালে ভিয়াখিরের মর্দোভীয়নীটি কাঠের স্তূপে চাপা পড়ে গেল। তার সঙ্গে ছিল এক বোতল ভদ্‌কা। গির্জার নতুন বাড়ি তুলবার জন্যে এক বুড়ো চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিল, সেও চাপা পড়ল একই সঙ্গে। স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে।

ভিয়াখিরকে বলে গুরুগম্ভীর চুরকা: 'তুই আয়, আমাদের সঙ্গে থাকবি। আমার মা তোকে অক্ষর চিনিয়ে দেবে।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই দোকানগুলির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ভিয়াখির পড়তে লাগল:

'মুদিরদো কান।' লেখাটা পড়তে পেরে গর্বের সঙ্গে মাথা তুলে তাকাল সে।

চুরকা শুধরে দিল, 'দূর গাধা! মুদিরদো কান নয়, মুদির দোকান।'

'জানি বাবা জানি। তবে কি জানিস, কাব্য গুলিয়ে যায়।'

'কাব্য নয়, বাক্য!'

'অক্ষরগুলো নেচে নেচে বেড়ায়। অক্ষরগুলোকে কেউ একজন পড়বে--এতেই অক্ষরগুলোর খুশি যেন আর ধরে না।'

গাছ এবং ঘাসকে ও ভালোবাসে। ওর ভালোবাসার বহর দেখে আমরা অবাক হই, আবার মজাও পাই।

আমাদের এই অঞ্চলে বালু-জমি। গাছগাছড়া প্রায় নেই বললেই চলে। গাছগাছড়া বলতে উঠোনের এখানে-ওখানে দু-একটা সরু সরু উইলো,

কুঁকড়নো এল্‌ডারবেরির ঝোঁপ বা বেড়ার আড়ালে অলক্ষ্যে কিছু শুকনো ঘাস। আমাদের মধ্যে কেউ যদি এই ঘাসের ওপর বসে তাহলেই ভিয়াখির রেগে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক দেয়:

'ঘাসগুলোর দফারফা করছ কেন? বালির ওপরে বসতে পার না? ঘাসের ওপর বসা আর বালির ওপর বসা—একই কথা।'

ও যদি হাজির থাকে তাহলে গাছগাছড়ায় হাত দেবার সাহস হয় না আমাদের। এল্‌ডারবেরির ঝোপে ফুল ফুটে থাকে, তার একটা শীষ, বা ওকা নদীর ধার থেকে উইলো গাছের একটা ডাল—কোনো কিছুই ভাঙি না।

অবাক হয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ও বলে, 'আচ্ছা, এভাবে শয়তানি করে যে জিনিসপত্র নষ্ট করিস—এতে কী লাভ হয় বল্‌ তো?'

ওকে অবাক হতে দেখে আমরা লজ্জা পাই।

প্রতি শনিবার আমাদের একটা খেলা আছে। এই খেলার তোড়জোড় চলে সারা সপ্তাহ ধরে—তোড়জোড় মানে, রাস্তা থেকে ফেলে-দেওয়া গাছের ছালের চটিজুতো কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখা। শনিবার সন্ধ্যার সময় যখন সাইবেরিয়ার জাহাজঘাট থেকে তাতার খালাসীরা ফিরে যায় তখন আমরা রাস্তার মোড়ে কোনো একটা আড়ালে লুকিয়ে থেকে তাদের দিকে চটিজুতোগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি। প্রথমে ওরা রেগে যায় ও আমাদের পিছনে তাড়া করে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেরাই খেলায় মেতে ওঠে। তখন ওরাও আসন্ন লড়াইয়ের কথা ভেবে গাছের ছালের চটিজুতো দিয়ে নিজেদের অস্ত্রাগার ভরিয়ে তোলে। আমরা কোথায় অস্ত্র লুকিয়ে রাখি সেটা ওরা লক্ষ্য করে আর মাঝে মাঝে আমাদের অস্ত্রাগার থেকে চুরি করতে আসে।

আমরা প্রতিবাদ করি, 'এভাবে খেলা হয় না।'

ওরা তখন চুরি-করা জিনিসগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। তারপর চলে লড়াই। সাধারণত ওরা দাঁড়িয়ে থাকে খোলা জায়গায় আর আমরা তারস্বরে চিৎকার করতে করতে ওদের চারপাশে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াই ও হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি। ওরাও তারস্বরে চিৎকার করে। আর যখনই একটা চটিজুতো খুব ভালোভাবে তাক্‌ করে ছুঁড়ে মারা হয় আর সেই জুতোয় পা আটকে গিয়ে আমাদের কেউ বালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে—অমনি ওরা হো-হো করে গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠে।

অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত মাঝেমাঝে খেলা চলে। ক্ষুদে ব্যবসাদাররা কোণে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখে আমাদের কাণ্ডকারখানা। মুখে অবশ্য ভর্ৎসনা

করে আমাদের—না করলে ভালো দেখায় না ভাই। কিন্তু জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি চলে সমানে; ছাইরঙা, ধুলোমাখা পাখির মতো শূন্যে উড়তে থাকে জুতোগুলো। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো মারাত্মক রকমের আঘাত পায়। কিন্তু লড়াইয়ের আনন্দে কোনো আঘাত বা যন্ত্রণা আমরা গায়ে মাখি না।

তাতাররাও আমাদের মতোই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। লড়াই শেষ হয়ে গেলে মাঝে মাঝে আমরা ওদের সঙ্গে ওদের বাড়িতে যাই। ওরা আমাদের খেতে দেয় ঘোড়ার মাংস আর শাকসব্জির একটা অদ্ভুত রান্না। ঘন চা ও পিঠে দেয় খাওয়ার পরে। এই লোকগুলোর চেহারা প্রকাণ্ড, গায়ের জোরে একজন আরেকজনকে ছাড়িয়ে যায় মনে হয়—ভারি ভালো লাগে ওদের। ওদের স্বভাবের মধ্যে কি একটা আছে যাতে মনে হয় ওরা শিশুর মতো সরল ও সাদাসিধে। আমি বিশেষ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম এই দেখে যে ওরা কক্ষণো রাগারাগি করে না আর প্রত্যেকের ওপরেই প্রত্যেকের ভারি দরদ।

প্রাণ খুলে হাসে ওরা, সে-হাসি আর থামতেই চায় না। একজন ছিল (এই লোকটি হচ্ছে কাসিমভ'এর চাষী, নাকটা ভাঙা, রূপকথার বীরের মতো গায়ের জোর; একবার সে একটা দশমণি গির্জার-ঘণ্টা বজরা থেকে তুলে নিয়ে পাড় ভেঙে ডাঙায় উঠেছিল)—সে হাসতে শুরু করলে গাঁক গাঁক করে হুংকার ছাড়ে আর চিৎকার করে বলে:

'উ-উ! উ-উ! মুখের কথা—আকাশের চিড়িয়া! কথা শুনলে তো চিড়িয়া ধরা পড়ল! আর শুধু সোনার মুদ্রাই হোলো আসল কথা!'

একদিন ভিয়াখিরকে হাতের তালুর ওপরে বসিয়ে একেবারে শূন্যে তুলে ধরল।

'আকাশে থাকার সোয়াদটা বুঝে নাও!' বলল সে।

বাদলার দিনে আমরা জড়ো হই ইয়াজের বাড়িতে। গোরস্থানের মধ্যে ছোট একটি বাড়িতে ইয়াজ তার বাবাকে নিয়ে থাকে। ইয়াজের বাবার বাঁকা তোবড়ানো শরীর, লম্বা লম্বা হাত, মাথায় ও মুখে খোঁচা খোঁচা নোংরা চুল। তার মাথাটাকে দেখে মনে হয়, বোঁটার মতো লিকলিকে ঘাড়ের ওপরে যেন একটা শুকনো শালগম। খোশমেজাজে হল্‌দে হল্‌দে চোখদুটোকে সরু করে বিড়বিড় করে সে বলে চলে: 'কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই! হুঃ হুঃ!'

আমরা খানিকটা চা, চিনি, রুটি আর ইয়াজের বাবার জন্যে অল্পকিছু ভদ্‌কা কিনে নিয়ে যাই।

চুরকা হুকুম দেয়, 'ওরে পাজী চাষী, সামোভারে আগুন দাও তো দেখি!'

শুনে পাজী চাষী হাসে ও হুকুম-মতো কাজ করে। জল ফুটে উঠতে উঠতে আমরা নিজেদের ব্যাপারগুলো একটু আলোচনা করে নিই। সেও আমাদের পরামর্শ দেয়:

'নজর রেখো বাবুরা—পরশুদিন গ্রুসভ'দের বাড়িতে শ্রাদ্ধের খাওয়া আছে। অনেক হাড় পড়ে থাকবে কিন্তু!'

সবজান্তা চুরকা বলে, 'গ্রুসভদের বাড়িতে যে মেয়েলোকটা রান্না করে, সে একটা হাড়ও পড়ে থাকতে দেয় না। সব নিজে নেয়।'

জানলা দিয়ে বাইরের কবরখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভিয়াখির বলে, 'শীঘ্রই আবার জঙ্গলে ঢোকা যাবে।'

ইয়াজ খুব কমই কথা বলে। বিষণ্ণ চোখদুটো তুলে ও শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আমাদের দিকে। ছাইগাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে কতগুলো পুতুল পেয়েছে ও; সেগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখায় আমাদের। পুতুল বলতে একটা কাঠের সেপাই, একটা ঠ্যাঙ-ভাঙা ঘোড়া, কয়েকটা বোতাম আর কয়েক টুক্‌রো পেতল।

ওর বাবা টেবিলের ওপরে পেয়ালা সাজিয়ে দেয়, সামোভার নিয়ে আসে। পেয়ালাগুলো কিম্ভূতকিমাকার, কোনোটার সঙ্গে কোনোটা মেলে না। কস্ত্রমা চা ঢালে। বুড়ো ভদ্‌কা খেয়ে নিয়ে সোজা গিয়ে ওঠে চুল্লির ওপরে আর সেখান থেকে লিকলিকে ঘাড় নিচু করে প্যাঁচার মতো চোখে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে আর বিড়বিড় করে বলে:

'উচ্ছন্নে যা! উচ্ছন্নে যা! তোরা কি মানুষ নাকি? হুঃ! তোরা হচ্ছিস একদল চোর! কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই!'

'আমরা চোর নই।' ভিয়াখির বলে।

'ক্ষুদে চোর আর কি।'

ইয়াজের বাবার বকবকানি শুনে যখন আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠি, চুরকা ধমক দিয়ে ওঠে:

'চুপ করো বলছি, পাজী চাষী!'

ইয়াজের বাবা বসে বসে ফিরিস্তি দিল, এই অঞ্চলের কতজন লোকের

অসুখ করেছে; তারপর জল্পনা-কল্পনা করে, এদের মধ্যে কে আগে মরবে, তার কথা শুনতে ভিয়াখির, চুরকা ও আমার অসহ্য লাগে। ইয়াজের বাবাকে দেখে মনে হয়, কে আগে মরবে ভাবতে পেরেই যেন সে খুশিতে ঠোঁট চাটছে। তার মধ্যে একটুকু মায়াদয়া দেখা যায় না। আর যখন সে বুঝতে পারে যে এসব কথা শুনতে আমরা বিরক্তি বোধ করছি, তখন ইচ্ছে করে করে আরো আমাদের পিছনে লাগে।

'হুঃ, হুঃ, বাবারা, ক্ষুদে মহারাজদের মনে অমনি ভয় ঢুকে গেছে! এই আমি বলে রাখছি, শুনে রাখ্, ওই যে মোটা হোঁৎকা লোকটা আছে, ও শীগ্গিরই পটল তুলবে। তারপর পচে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ও ব্যাটার অনেক দিন লাগবে!'

আমরা তাকে থামিয়ে দিই কিন্তু কিছুতেই তার মুখ বন্ধ করতে পারি না।

'আর দেখে নিস, তোদের পালাও শীগ্গিরই আসছে! ছাইগাদার ময়লা ঘেঁটে ঘেঁটে খাবার জোটাস—তোদের পরমায়ু খুব বেশি বলে মনে করিস নাকি তোরা!'

ভিয়াখির বলে, 'বেশ, বেশ, মরবই তো। ভালোই হবে, মরলে পরে আমরা সবাই দেবদূত হয়ে যাব।'

'তোরা হবি দেবদূত? তোরা!' থ' হয়ে তাকিয়ে থাকে ইয়াজের বাবা, তারপরেই হাসিতে ফেটে পড়ে আর আবার মরা মানুষের বিশ্রী বিশ্রী গল্প বলে উত্যক্ত করে তোলে আমাদের।

কিন্তু মাঝে মাঝে গুনগুনে চাপা গলায় অদ্ভুত সব কথা বলতে শুরু করে সে:

'ওরে শোন, শোন। পরশুদিন একজন মহিলাকে কবর দিতে এনেছিল। মহিলাটির সে এক অদ্ভুত ইতিহাস। খোঁজ করে করে আমি সব জানতে পেরেছি। ভাবিস কি তোরা?..'

প্রায়ই সে মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করে। মেয়েদের সম্পর্কে সর্বদাই কথা বলে অতি নোংরাভাবে। কিন্তু তার গল্পগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যাকুলতার সুর ও প্রশ্ন থেকে যায় যাতে মনে হতে পারে, সে যেন ভেবেচিন্তে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করতে পারে তার জন্যে আমাদের সাহায্য সে চাইছে। মন দিয়ে আমরা শুনি। থেমে থেমে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার জন্যে মাঝে মাঝে কথা বন্ধ করে সে বলে চলে। কিন্তু যা-ই বলুক

না কেন, তার কথাগুলো আমাদের স্মৃতিতে একটা অস্বস্তিকর ছাপ ও কাঁটা-বেঁধার মতো জ্বালা সৃষ্টি করে।

'মেয়েটিকে ওরা জিজ্ঞেস করে, "কে আগুন লাগিয়েছিল?" মেয়েটি বলে, "আমি আগুন লাগিয়েছিলাম!" "বললেই হল আর কি, সেদিন রাত্রে তুমি তো হাসপাতালে ছিলে!" মেয়েটি আবার বলে, "আমি আগুন লাগিয়েছিলাম" এই একই কথা বলে চলে। কেন বলেছিল কে জানে! কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই! হুঁ, হুঁ!..'

এই বৈচিত্র্যহীন ও বিষাদমাখা কবরখানায় মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে যতোজন লোককে সে কবর দিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জীবন-কাহিনী সে জানে। যখন সে কথা বলে তখন মনে হয় যেন আশেপাশের সমস্ত বাড়ির অন্দরমহলের দরজা আমাদের সামনে সে খুলে ধরেছে। সেই খোলা দরজা দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকেছি আর দেখছি বাড়ির বাসিন্দারা কি-ভাবে দিন কাটায়। মনে হচ্ছে যেন কাজটা হেলাফেলার নয়, এর মধ্যে গুরুগম্ভীর ব্যাপার কিছু আছে। তাকে দেখে মনে হয়, শুধু কথা বলেই সে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জানলার বাইরে যেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে অমনি চুরকা উঠে দাঁড়ায় আর বলে:

'আমি বাড়ি যাচ্ছি — নইলে মা আমার ভয় পাবে। তোরা কেউ উঠবি নাকি?'

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠি। ইয়াজ আমাদের সঙ্গে সদর পর্যন্ত আসে, গেটটা বন্ধ করে দেয়, বাখারির ওপরে চোয়াড়ে কালো মুখটা চেপে ধরে চাপাস্বরে বিদায় জানায় আমাদের।

আমরাও বিদায় জানাই। ওকে এই কবরখানার মধ্যে ফেলে রেখে যেতে সর্বদা অস্বস্তি লাগে আমাদের। একদিন কস্ত্রমা ফিরে আসতে আসতে মুখ ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বলল:

'কোন্ দিন না সকালে উঠে শুনতে হয় যে ও মরে গেছে।'

চুরকা প্রায়ই বেশ জোর দিয়ে বলে যে আমাদের মধ্যে ইয়াজের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। কিন্তু ভিয়াখির একথা স্বীকার করে না।

'আমাদের অবস্থা তো খারাপ নয়। খারাপ কেন হতে যাবে?' সমান জোর দিয়ে ও বলে।

ভিয়াখিরের কথায় আমি সায় দিই। বাইরের এই মুক্ত জীবন আমার খুবই ভালো লাগে। আর আমার সঙ্গীদেরও আমি পছন্দ করি। ওদের সঙ্গ

পেয়ে আমার মন এক মস্ত নতুন অনুভূতিতে ভরে গেছে। মনের মধ্যে সব সময়ে ইচ্ছা জাগে, ওদের সাহায্য ও উপকার করি। আর এই ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে আমাকে।

এদিকে স্কুলে আবার আমি বিভ্রাটে পড়েছি। স্কুলের ছেলেরা আমাকে বাউণ্ডুলে ও আবর্জনা-কুড়ুনে বলে ডাকতে শুরু করেছে। একদিন ঝগড়া হয়ে যাবার পরে ওরা মাস্টারমশাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করে যে আমার গায়ে নাকি ভয়ানক জঞ্জালের গন্ধ এবং আমার পাশে কিছুতেই বসে থাকা যায় না। মনে আছে, একথা শুনে আমার খুবই কষ্ট হয় এবং এ ঘটনার পর আবার স্কুলে যেতে খুবই খারাপ লাগে। ছেলেদের এই নালিশটা ছিল মনগড়া; এটা ওদের কুচুটেপনা ছাড়া কিছু নয়। রোজ সকালে আমি খুব ভালো করে স্নান করি; আর যে জামাকাপড় পরে আমি রাস্তার আবর্জনা কুড়োই, তা পরে কক্ষণো স্কুলে যাই না।

অবশেষে আমি তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। ভালো ভাবে লেখাপড়া করার পুরস্কার হিসেবে আমাকে দেওয়া হল একটা সুকৃতিজ্ঞাপক সার্টিফিকেট, একটা বাইবেল, একখন্ড ক্রিলভের উপকথা আর 'ফাতা মরগানা' এই দুর্বোধ্য নামের কাগজের মলাট দেওয়া একটা বই। উপহারগুলো নিয়ে বাড়ি এলাম। উপহারগুলো দেখে দাদামশাইয়ের খুবই আনন্দ হল এবং তিনি খুবই অভিভূত হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে বইগুলোকে সযত্নে রাখা দরকার এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি বইগুলোকে নিজের সিন্দুকের মধ্যে রেখে দেবেন। এদিকে গত কয়েক দিন ধরে দিদিমা অসুস্থ, তাঁর হাতে একটিও পয়সা নেই। দাদামশাই বিড়বিড় করে মনের ঝাল প্রকাশ করছেন:

'তোরাই আমার সর্বনাশ করবি দেখছি — তোদের খাইয়ে খাইয়েই ফতুর হতে হবে আমাকে...'

এই ব্যাপার দেখে আমি এক বইয়ের দোকানে গিয়ে বইগুলোকে পঞ্চান্ন কোপেকে বিক্রি করে ফেললাম। টাকাটা এনে দিলাম দিদিমার হাতে। সুকৃতিজ্ঞাপক সার্টিফিকেটটার ওপরে হিজিবিজি লিখে নষ্ট করে ফেললাম সেটা। তারপর সার্টিফিকেটটা দিলাম দাদামশাইয়ের হাতে। হিজিবিজি লেখাগুলো দাদামশাইয়ের চোখে পড়ল না। তিনি সেটা সযত্নে তুলে রাখলেন।

স্কুলের শেষে আমি আবার রাস্তার জীবনে ফিরে যাই। বসন্ত এসে গেছে; এখন এই রাস্তার জীবনে আগের চেয়েও অনেক বেশি যাদু রয়েছে।

এখন আমরা আরও বেশি পয়সা উপায় করি। রবিবার পুরো দল আমরা বেরিয়ে পড়ি মাঠে কিংবা জঙ্গলে, ফিরে আসি সন্ধ্যা পার করে, মধুর ক্লান্তিতে সারা শরীরটা ভেঙে পড়ে, আর দলের প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকের টান আরো অনেকখানি বেড়ে যায় যেন।

কিন্তু এই জীবনের স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয়নি। আমার সৎ-বাপ আবার চাকরি খুইয়ে বসে এবং কোথায় যেন চলে যায়। আমার মা ও ছোট ভাই নিকোলাই এসে ওঠে দাদামশাইয়ের বাড়িতে। এদিকে দিদিমা চলে গেছেন এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে, সেখানে তিনি যীশু খ্রীষ্টের শয্যাবরণীর ওপরে সুচের কাজ করছেন এবং সেখানেই থাকেন তিনি। সুতরাং ছোট ভাইকে দেখাশোনার ভার পড়ল আমার ওপরে।

আমার মা কথা বলে না, তার শরীরটা রক্তহীন হয়ে গেছে, এমন কি একটা পা নাড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত তার নেই। ছোট ভাইয়ের পায়ের গোড়ালিতে বিষাক্ত ঘা; বাচ্চাটা এত দুর্বল যে কাঁদতে পর্যন্ত পারে না। খিদে পেলে ভয়ানকভাবে গোঙায়, আর পেট ভরা থাকলে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে আর ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে — বেড়ালের মতো ঘড় ঘড় আওয়াজ হয় গলা থেকে।

একদিন দাদামশাই বাচ্চাটাকে খুব ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, 'ওর এখন যেটুকু দরকার তা হচ্ছে ভালো খাওয়া। কিন্তু তোদের এতগুলি লোককে খাওয়াবার সামর্থ্য কই আমার বল্‌?'

শ্বাস টেনে টেনে ভাঙা ভাঙা গলায় মা বলল, 'ওর জন্যে আর কতটুকু বা দরকার।'

'এর জন্যে একটুখানি — ওর জন্যে একটুখানি — সব মিলিয়ে অনেকখানি...'

বিরক্তির সঙ্গে হাতটাকে ঝাঁকিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালেন:

'নিকোলাইয়ের গায়ে একটু রোদ-হাওয়া লাগা দরকার। ওকে নিয়ে বাইরে বালির ওপর শুইয়ে দে...'

কয়েক বস্তা শুক্‌নো আর পরিষ্কার বালি নিয়ে এলাম আমি। জানলার নিচে যেখানে রোদ এসে পড়ে, সেখানে ঢেলে দিলাম। তারপর দাদামশাই যেমনটি বলেছেন সেইভাবে ছোট ভাইকে ঘাড় পর্যন্ত ডুবিয়ে দিলাম বালির মধ্যে। বাচ্চাটাকে দেখে মনে হল এভাবে থাকতে ওর ভালো লাগছে। একইভাবে বসে থাকে; আরামে চোখ বুজে আসে আর টেরিয়ে তাকায়

আমার দিকে। কী আশ্চর্য চোখ ওর! মনে হয়, নীল মণিকে ঘিরে আরো ফিকে সাদা নীল একটা চক্র দিয়েই শুধু বুঝি ওর চোখদুটো তৈরি।

ভাইটি আমার খুবই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল। মনে হয়, আমার চিন্তাগুলোও ও বুঝতে পারে। জানলার নিচে ওর পাশটিতে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ শুয়ে থাকি। জানলা দিয়ে ভেসে আসে দাদামশাইয়ের কিচকিচে গলার স্বর:

'মরতে তো বোকারাও পারে। তুমি যদি জানতে কী করে বাঁচতে হয়...'

শোনা যায় মা'র কাশি; অনেকক্ষণ ধরে চলে সেই কাশি...

নিকোলাই তার ক্ষুদে ক্ষুদে হাতদুটো বালির ভিতর থেকে টেনে বার করে আনে; ফ্যাকাশে মাথাটা নাড়তে নাড়তে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ওর মাথায় পাত্‌লা রুপোলি চুল, মুখটা বুড়োটে ও গুরুগম্ভীর।

যদি কোনো বেড়াল বা মুরগী কাছে আসে তাহলে নিকোলাই নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে আর তারপর এক সময়ে আমার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে মুচ্‌কি হাসে। ওর এই হাসি দেখে আমি অস্বস্তি বোধ করি। ওর পাশে চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে বলে আমার ভারি বিশ্রী লাগছে — এটা কি ভাইটি টের পায়? ও কি বুঝতে পারে যে আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখান থেকে উঠে চলে যাই এবং রাস্তায় গিয়ে আমার দলবলের সঙ্গে জুটি?

উঠোনটা ছোট আর যতো আবর্জনায় ভর্তি। সদর থেকে উঠোনের পিছনদিককার স্নানঘর পর্যন্ত এলোমেলো কাঠের গুদাম ও চালা জড়াজড়ি করে রয়েছে। চালার ওপরে স্তূপ করা রয়েছে তক্তা, কাঠের গুঁড়ি, ভিজে চ্যালাকাঠ আর ভাঙা নৌকোর টুক্‌রো। বসন্তকালে যখন বরফ গলতে শুরু করে আর নদী ফে'পে ওঠে সেই সময়ে ওকা নদী থেকে সংগৃহীত সামগ্রী এগুলো। নদীর জলে জবজবে ভিজে কাঠ ছড়ানো রয়েছে সারাটা উঠোনে। কাঠগুলো যখন রোদে শুকোতে শুরু করে তখন একটা পচা গন্ধ বেরোয়।

আমাদের বাড়ির একেবারে পাশেই একটা কসাইখানা। প্রায় রোজই ভোরে শোনা যায় বাছুর আর ভেড়ার আর্ত চিৎকার। আর রক্তের গন্ধ এত ঝাঁজালো হয়ে ওঠে যে আমার মনে হয়, ধুলোভরা বাতাসে সূক্ষ্ম একটা জালের মতো রক্ত ঝুলে আছে।

দুই শিঙের মাঝখানে খাঁড়ার ঘা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারগুলোর চিৎকার শোনা যায়। আর নিকোলাই তখন ভুরু কু'চকে ঠোঁট ফুলোয়। দেখে

মনে হয় যেন জানোয়ারের ডাক ও নকল করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর মুখ থেকে 'ফু' 'ফু' শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরোয় না।

দুপুর হলে দাদামশাই জানলা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে ডাক দেন:

'খাবার তৈরি!'

তিনি নিজেই বাচ্চাকে কোলের ওপরে তুলে নিয়ে খাওয়ান। রুটি আর আলু নিজে চিবিয়ে নিয়ে গুঁজে দেন বাচ্চার ক্ষুদে ক্ষুদে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। বাচ্চার সারা মুখে আর ছুঁচলো ছোট চিবুকে রুটি আর আলু মাখামাখি হয়ে যায়। এইভাবে অল্প একটু খাওয়ানো হয়ে গেলেই তিনি বাচ্চার গায়ের জামাটা তুলে ফুলো ফুলো পেটের ওপরে টোকা দিতে দিতে বলেন:

'কে জানে বাপু পেট ভরেছে কিনা। নাকি, আরেকটু লাগবে?'

'দেখতে পাচ্ছেন না ও হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে রুটিটা ধরতে চাইছে?' অন্ধকার কোণ থেকে বিছানায় শুয়ে শুয়েই মা বলে ওঠে।

'তাহলেই হয়েছে! বাচ্চাদের আর কতটুকু বোধ আছে যে পেট ভরে গেছে কিনা বুঝতে পারবে?'

একথা বলার পরে তিনি আবার মুখ থেকে একটা দলা বার করে বাচ্চার মুখে দিয়ে দেন। এই ধরনের খাওয়ানো দেখে আমি লজ্জায় মরে যাই। আমার গলার কাছটায় কী যেন উঠে এসে শ্বাসরোধ করে, ভেতরে বমি পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে।

অবশেষে দাদামশাই বলেন, 'বাস, হয়ে গেছে। এবার ওকে ওর মা'র কাছে নিয়ে যা।'

নিকোলাইকে কোলে তুলে নিয়ে আসার পরেও ও গোঙাতে গোঙাতে খাবার টেবিলের দিকে হাত বাড়াতে থাকে। মা বিছানায় উঠে লম্বা অস্থিসার হাতদুটো বাড়িয়ে দেয় বাচ্চাকে নেবার জন্যে। মা এত রোগা হয়ে গেছে যে তাকে দেখে মনে হয় যেন ডালপাতা ছাঁটা পাইনগাছ।

আজকাল মা কথা প্রায় বলেই না। কখনো-সখনো দু-একটা কথা যা বলে, সেগুলো তার সারা বুকের মধ্যে হাঁপানি তুলে বুকটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসে। সারাটি দিন পড়ে আছে ঘরের কোণে। আর এই অবস্থায় নিঃশব্দে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। আমি বুঝতে পারি, মা'র মৃত্যু আসন্ন। আর দাদামশাইয়ের কথা শুনে এ-বিষয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়। দাদামশাই আজকাল বড়ো বেশি আর বড়ো ঘন ঘন মৃত্যুর কথা বলেন:

বিশেষ করে বলেন সন্ধ্যার সময়ে যখন বাইরে পচা গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

ঘরের কোণে আইকনের প্রায় নিচে দাদামশাইয়ের বিছানা। জানলা ও আইকনের দিকে মাথা দিয়ে শোয়া অভ্যেস তাঁর আর রোজই ঘুমিয়ে পড়ার আগে বিড়বিড় করে বলেন:

'আর কি, মরবার সময় তো হয়েছে। এবার সৃষ্টিকর্তার কাছে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব? কী কৈফিয়ৎ দেব তাঁর কাছে? খেটে খেটে সারাটা জীবন পাত করেছি—কাজ ছাড়া একটি দিনও কাটাইনি। কিন্তু কী লাভ হয়েছে তাতে? নিজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছি!'

চুল্লি আর জানলার মাঝখানে মেঝের ওপরে আমি ঘুমোই। জায়গাটা আমার পক্ষে বড়ো ছোট। বাধ্য হয়ে আমার পা-দুটোকে চালিয়ে দিতে হয় চুল্লির ফোকরের মধ্যে। সেখানে আরশোলাগুলো আমার পায়ের আঙুলের ফাঁকে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই বিশেষ জায়গাটা থেকে অন্য একটা দিকে লক্ষ্য রাখার সুবিধা আছে। রান্না করতে গিয়ে দাদামশাই অনবরত জানলার শার্সিগুলো ভেঙে ফেলেন; যে শলাকা বা বাঁশ দিয়ে তিনি পাত্রগুলো নামিয়ে নেন তারই উল্‌টো দিকের ঘা লেগে শার্সিগুলো ভেঙে যায়। আমি দেখি আর একটা কুচুটে আনন্দে খুশি হই। বাঁশের মাথাটা কেটে ফেললেই আর কোনো গোলমাল থাকে না; এই সামান্য বুদ্ধিটুকু দাদামশাইয়ের মতো বুদ্ধিমান লোকের মাথায় কেন যে আসে না — এটা আমার কাছে একটা অদ্ভুত ও উদ্ভট ব্যাপার বলে মনে হয়।

একদিন হল কী, চুল্লির ওপরে কি যেন ফুটছিল, এমন সময় বাঁশটা ধরে তিনি এমন এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিলেন যে চুল্লির ওপরে বসানো মাটির পাত্রটা উল্‌টে গিয়ে ভেঙে গেল, দুটো শার্সি আর শার্সির ফ্রেম চুরমার হয়ে গেল একেবারে। এত বড়ো একটা দুর্বিপাক দাদামশাই সহ্য করতে পারলেন না, মেঝের ওপরে বসে পড়ে কেঁদে ফেললেন আর বিলাপ করতে লাগলেন, 'হায় প্রভু! হায় প্রভু!'

পরে তিনি বেরিয়ে যেতেই আমি রুটি কাটার ছুরিটা নিয়ে বাঁশের মাথার খানিকটা অংশ থুড়ে থুড়ে বাদ দিয়ে দিলাম।

ফিরে এসে আমার কীর্তি দেখেই একেবারে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি: 'বেআক্কেল! নরকের কীট! করাত দিয়ে কাটতে পারলি না? শুনতে পাচ্ছিস তো? করাত, করাত, করাত! তাহলে বাড়তি টুকরোটা দিয়ে বেলুন তৈরি করে

বিক্রি করা যেত বাজারে। যত্তো শয়তানের ঝাড় এসে জুটেছে আমার কপালে!'

কথাগুলো বলে সদরের দিকে ছুটে গেলেন দাদামশাই। আর তখন মা আমাকে বলল, 'কেন তুই সব ব্যাপারে সর্দারি করতে যাস? নিজেরটা নিয়ে নিজে থাকবি।'

আগস্ট মাসের এক রবিবারের দুপুরে মা'র মৃত্যু হয়। তার কিছুদিন আগে আমার সৎ-বাপ বাইরে থেকে ফিরে এসেছে এবং একটা চাকরি পেয়েছে। থাকে স্টেশনের পাশে একটা ছোট পরিষ্কার বাড়ীতে। দিদিমা ও নিকোলাই আগেই চলে গেছে সেখানে। আর কয়েক দিনের মধ্যে মা'কেও নিয়ে যাবার কথা।

মৃত্যুর দিন সকালবেলা মা আমাকে বলল, 'যা তো রে, ইয়েভগেনি ভাসিলিয়েভিচকে এক্ষুণি একবার আসতে বল।' ক্ষীণ গলার স্বর, কিন্তু সচরাচর যেমন থাকে তার চেয়ে স্পষ্ট ও হাল্‌কা।

বিছানায় মা উঠে বসল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এলিয়ে দিল শরীর। তারপর বলে উঠল, 'দেরি করিসনে — ছুটে যা!'

মনে হচ্ছিল, মা হাসছে। একটা নতুন আলো ঝিকমিক করছে তার চোখে। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে শুনলাম, আমার সৎ-বাপ গির্জার উপাসনায় যোগ দিতে গেছে। সেখানে থেকে দিদিমা আমাকে দোকানে পাঠালেন নস্যি কিনে আনবার জন্যে। দোকানে নস্যি ছিল না এবং ইহুদী দোকানদার মহিলা আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নস্যি তৈরি করে দিল।

শেষকালে আবার যখন আমি দাদামশাইয়ের বাড়িতে ফিরে এলাম তখন চোখে পড়ল, মা টেবিলের কাছে বসে আছে। পরনে ফিকে নীল রঙের পরিষ্কার পোশাক, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো। ঠিক সেই আগেকার দিনের মতো গর্বোদ্ধত চেহারা।

'শরীরটা ভালো লাগছে — না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। কেন জানি না আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।

'এদিকে আয়,' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মা বলল, 'এতক্ষণ কোথায় টো-টো করে ঘুরছিলি?'

আমি জবাব দেবার সময় পেলাম না। তার আগেই মা আমার চুলের মুঠি ধরেছে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে করাতের মতো একটা লম্বা ছুরি তুলে নিয়ে ছুরিটার চ্যাপ্‌টা ফলা দিয়ে মারতে লাগল আমাকে। মারতে মারতে শেষ পর্যন্ত ছুরিটা পড়ে গেল মা'র হাত থেকে।

'তুলে আন! দে এখানে!'

ছুরিটা তুলে আমি টেবিলের ওপরে রাখলাম। মা আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। আমি গিয়ে বসলাম চুল্লির ধারে, সেখান থেকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইলাম মা'র দিকে।

চেয়ার থেকে উঠে মা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কোণের বিছানার দিকে, তারপর বিছানায় শুয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগল। তার হাতের নড়াচড়াটা এলোমেলো, দু-বার হাতটা এলিয়ে পড়ল বালিশের ওপরে... রুমালটা দলা পাকিয়ে গেল হাতের আঙ্গুলের মধ্যে।

'জল...'

পাত্র থেকে পেয়ালাভর্তি জল নিয়ে আমি সামনে ধরলাম। অতি কষ্টে মাথাটা তুলে একঢোঁক জল খেল মা তারপর ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল আমাকে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকাল কোণের আইকনের দিকে, তারপর আমার দিকে; ঠোঁটদুটো নড়তে লাগল — যেন হাসছে; তারপর তার চোখের পাতা আস্তে আস্তে নেমে এল চোখের ওপর। দু-হাতের কনুই শরীরের দু-দিকে শক্তভাবে এ'টে রয়েছে; হাতদুটো ধীরে ধীরে চলেছে বুকের ওপরে, গলার কাছে। অলক্ষ্যে একটা ছায়া নেমে এল মুখের ওপরে। এবার মুখের হল্‌দে চামড়া টান হয়ে রয়েছে, নাকটা ধারালো। মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল, কিন্তু নিশ্বাস বেরিয়ে এল না।

পেয়ালাটা হাতে নিয়ে আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম যেন অনন্তকাল ধরে। আমার দৃষ্টির সামনে মা'র মুখটা শক্ত ও পাঁশুটে হয়ে গেল।

দাদামশাই ঘরে ঢুকলেন।

'মা মরে গেছে,' আমি বললাম।

'মিথ্যে কথা বলে তোর কী লাভ হচ্ছে?' বললেন তিনি বিছানার দিকে তাকিয়ে।

তারপর তিনি চুল্লির কাছে গিয়ে কড়াই ও বাঁশের ঘটাং ঘটাং শব্দ করে 'পিরোগ' তুলে আনতে লাগলেন চুল্লির ভিতর থেকে। আমি জানি আমার মা মরে গেছে, সুতরাং আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম দাদামশাইয়ের দিকে। দাদামশাই নিজের থেকেই ব্যাপারটা টের পেয়ে নিক।

আমার সৎ-বাপ ঘরে ঢুকল। পরনে লিনেনের কোট, মাথায় সাদা ক্যাপ। একটিও কথা না বলে সে একটি চেয়ার তুলে মা'র বিছানার কাছে নিয়ে গেল।

তারপরেই হঠাৎ চেয়ারটা খসে পড়ল তার হাত থেকে, পেতলের শিঙার মতো আওয়াজ তুলে বলে উঠল সে, 'আরে! মরে গেছে যে!'

দাদামশাই অন্ধের মতো টলতে টলতে এগিয়ে এলেন বিছানার কাছে; তাঁর হাতের মুঠোয় বাঁশটা ধরা আছে, আর চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে।

মা'র কবর যখন শুকনো বালি দিয়ে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে, তখন দিদিমা অন্য সব কবরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অন্ধের মতো হোঁচট খেলেন একটা ক্রুশের ওপরে, মুখে চোট লেগে কেটে গেল। ইয়াজের বাবা দিদিমাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। সেখানে দিদিমা যখন ক্ষতস্থানটা ধুয়ে নিচ্ছিলেন তখন ইয়াজের বাবা আমার কাছে এসে চাপা স্বরে আমাকে সান্ত্বনার কথা শোনাতে চেষ্টা করল:

'কৃপা কোরো প্রভু, রাত্তিরবেলা যেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই! কী ব্যাপার হে তোমার? এসব ব্যাপারকে কক্ষণো মনে ঠাঁই দিতে নেই। ঠিক বলিনি ঠানদি? গরীব ধনী সবাই আসতে হবে এ-ঠাঁই। ঠিক বলিনি ঠানদি?'

জানলা দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকাল, তারপর হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ফিরে এল যখন, তার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর ভিয়াখিরকে নিয়ে এসেছে টানতে টানতে।

'দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে কী আছে,' একটা ভাঙা জুতোর-নাল বাড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ বলল, 'কী চমৎকার জিনিস বলো তো! ভিয়াখির আর আমি তোমাকে এটা উপহার দিচ্ছি। এটা যে কোনো একজন কসাকের জুতো থেকে খসে পড়েছে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই! ভিয়াখিরের কাছ থেকে এটা আমি কিনে নেব ভাবছিলাম — দু কোপেক দামও দিতে চেয়েছিলাম ওকে...'

দাঁতে দাঁত ঘষে ভিয়াখির বলল, 'মিথ্যে কথা বলছ কেন?' এদিকে ইয়াজের বাবা চোখদুটো পিটপিট করতে করতে আমার সামনে লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে।

'ভিয়াখির কেমন চীজ দেখছ তো? আচ্ছা, আচ্ছা, শোনো, আমি নয়, ও নিজেই এটা তোমাকে উপহার দিচ্ছে...'

ক্ষতস্থান ধোয়া হয়ে গেলে দিদিমা নিজের নীল ও ফুলে-ওঠা মুখে একটা রুমাল জড়ালেন তারপর আমাকে ডাকলেন বাড়ি যাবার জন্যে। কিন্তু আমি বাড়ি যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। আমি জানতাম, বাড়িতে এখন

শেষকৃত্যের খাওয়াদাওয়া উপলক্ষে মদ্যপান চলবে এবং হয়তো একচোট ঝগড়াও হয়ে যাবে। গির্জা থেকে তখনো আমরা বেরিয়ে আসিনি, শুনেছিলাম মিখাইল-মামা ইয়াকভ-মামাকে বলছে:

'আজ বেশ খানিকটা মদ-টদ টানা যাবে রে! কী বলিস!'

ভিয়াখির আমাকে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করছে। সেই জুতোর নালটা গলায় ঝুলিয়েছে ও, আর চেষ্টা করছে তাতে জিভ ঠেকাতে। ইয়াজের বাবা হাসছে, ইচ্ছে করে বেশি বেশি করে হাসছে, তা বোঝা যায়। আর সমানে চিৎকার করে চলেছে:

'দেখ, দেখ, ওর কাণ্ড দেখ!' কিন্তু যখন দেখল যে এত করার পরেও আমি কিছুমাত্র কৌতুক বোধ করছি না তখন সে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে বলল:

'বাড়াবাড়ি ভালো নয়! অমন মুষড়ে পোড়ো না। সবাইকেই মরতে হবে। এমন কি পাখিদেরও মরতে হয়। শোনো—যদি চাও তো আমি তোমার মা'র কবরের ওপরে ঘাসের চাপড়া বসিয়ে দিতে পারি। তাহলে বেশ হবে, না? চলো না এখনই মাঠে চলে যাই। তুমি যাবে, ভিয়াখির যাবে, আমি যাব — আমার ইয়াজও যাবে। আমরা সবাই মিলে ঘাসের চাপড়া কেটে নিয়ে আসব, তারপর কবরের ওপরে সুন্দরভাবে বসিয়ে দেব। আর তখন কবরটি দেখে মনে হবে যে এর জুড়ি আর নেই!'

এই পরিকল্পনা আমার ভালো লাগল। তারপর আমরা সকলে মিলে মাঠে গেলাম।

আমার মা'র শেষকৃত্য হবার কয়েকদিন পরে দাদামশাই আমাকে বললেন:

'শোনো লেক্সেই, তোমাকে এভাবে মেডেলের মতো গলায় ঝুলিয়ে রাখব, তা তো আর চলতে পারে না। এখানে আর তোমার জায়গা হবে না। এবার তোমার দুনিয়ার ঘাটে বেরুবার সময় হয়েছে...'

তাই আমি দুনিয়ায় বেরিয়ে পড়লাম।

১৯১৩—১৯১৪